ভারতীয় উপমহাদেশের

ছাত্র আন্দোলন

ভারতীয় উপমহাদেশের

হীরেন দাশগুপ্ত

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা

শহিদ

ছাত্র - যুবদের

কৃতজ্ঞতা

বিশ্বনাথ মুখার্জি
গীতা মুখার্জি
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
নন্দ বোস
সন্তোষ ভট্টাচার্য
ড. অরুণ সেন
প্রবীর রায়চৌধুরী
বাসব দাশগুপ্ত
অসীম চ্যাটার্জি
শৈবাল মিত্র
সন্তোষ রাণা
বিনোদ মিশ্র
সুনীল সেন
চণ্ডী সামন্ত
বিপ্লব চক্রবর্তী
ডা. অনুপ ধর
প্রতাপ মিত্র
মিন্টু দত্ত

এবং অন্যান্যরা

আমাদের কথা

পুস্তকটি প্রকাশ সম্পর্কে লেখকদ্বয়ের পক্ষ থেকে কিছু কৈফিয়ৎ দেবার দায় থেকেই যায়। ১৯৫৩ সালে হাওড়ার বাগনান গ্রামে সদ্য পুলিশি নিষেধাজ্ঞা-মুক্ত ছাত্র ফেডারেশনের একটি শিক্ষাশিবিরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা যেমন ছিল খণ্ডিত এবং সবই ছিল স্মৃতিভিত্তিক। এই আলোচনা করেছিলেন অতীতের প্রখ্যাত ছাত্র-নেতা প্রয়াত শ্রদ্ধেয় রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে তখনই নানাধরনের প্রশ্নসহ ছাত্র আন্দোলনের যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু নানা ঘটনার বিবর্তনে, নানা প্রতিকূল অবস্থায় তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপর ১৯৫৯ সালে রাজস্থানের উদয়পুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন থেকে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস লেখার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬১-তেও উড়িষ্যার বেহারামপুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল সভায় একই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কিছু করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রয়োজনটা মাথায় থাকায় আমরা লেখার উপাদান সংগ্রহের কাজটি চালিয়ে গেছি। ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত কাগজপত্র যা পেয়েছি তা সংগ্রহ করেছি। তারই ফলশ্রুতিতে প্রায় দীর্ঘ আড়াই বৎসরের নিরলস প্রচেষ্টায় আজকে এই 'রাজনৈতিক পটভূমিতে ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন' পুস্তকটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

এই ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু উপলব্ধি, কিছু বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু নিঃসঙ্কোচে বলতে চাই ঘটনার বিবরণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা তথ্যভিত্তিক থাকতে চেষ্টা করেছি এবং যতটুকু সম্ভব নিরপেক্ষভাবেই লেখার চেষ্টা হয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও যদি কোথাও তা ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে পাঠক-সুহৃদবৃন্দ তা ধরিয়ে দিলে, তা অবশ্যই সময় সুযোগে সংশোধনসাপেক্ষ।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত এই পুস্তকে বিভিন্ন ঘটনাবলির আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা যেভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার নানা দিক আগামী দিনের ছাত্র-যুব প্রজন্মকে সচেতন ও ওয়াকিবহাল করার লক্ষ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ জুড়ে গোটা এই ভারতীয় উপমহাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই লেখায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে ছাত্র-যুব সমাজ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী রাজনৈতিক ক্ষমতা অদল-বদলের ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলনের যে অংশগ্রহণ ছিল, এই পুস্তকে তার উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সময়কার ছাত্র সংগঠনের সংগঠক এবং নেতারা তাঁদের নিজ দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসে দেশকে পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে এইরূপ ঘটনা

বিশেষ করে তাৎপর্যবাহী এবং পরে এই দেশের মুক্তি আন্দোলন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা থেকে সামরিক শাসক এরশাদের অপসারণ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলিকে এই পুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতে ষাটের দশকের যুগ থেকে ছাত্র আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতার রাজ্যে-রাজ্যে পরিবর্তন, নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের উত্থান প্রভৃতি ঘটনার সাথে ছাত্র আন্দোলনের যোগসূত্র এবং বিশেষ করে এই দশকের ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানীসহ পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন এবং ভারতের তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনকেন্দ্রিক প্রভাব ইত্যাদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। কোনটা ভুল কোনটা সঠিক—এই সরলীকরণে সিদ্ধান্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে নেবার জন্য তথ্য ও ঘটনার সন্নিবেশ রয়েছে। ছাত্রফ্রন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছে তার বিষয়বস্তুকে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে পুস্তকের নানা অধ্যায়ের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুব আন্দোলনের কতকগুলি ঘটনার বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হলেও এই বইটির নামকরণের ক্ষেত্রে শুধু ছাত্র আন্দোলন বলা হল কেন? তার কৈফিয়ৎ হচ্ছে— ছাত্র-যুব আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক। এই পরিপূরক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা যুক্ত রয়েছে, সেই ঘটনাগুলিই লেখায় স্থান পেয়েছে। তাছাড়া যুব সংগঠন এবং যুব আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। এই স্বতন্ত্র বিষয় নিয়ে আলাদা একটি পুস্তক হতে পারে। এই চিন্তা মাথায় রেখেই নামকরণে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুব আন্দোলন নামকরণ যুক্ত করা হয়নি।

সর্বশেষে আমরা বলতে চাই—পৃথিবীব্যাপী অবক্ষয়ের এই মুহূর্তে অবস্থা যতই নিরাশার ছবি তুলে ধরুক, 'মানুষে বিশ্বাস হারান পাপ'—এই কথা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আরো বিশ্বাস করি 'ফাঁকি দিয়া কোন মহৎ কাজ সাধন হয় না'। তাই আজ বা কাল পৃথিবীব্যাপী আজকের অবিচার, মানসিক সাংস্কৃতিক চরম বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানুষ জাগবে। সেই জাগরণের মুহূর্তকে ত্বরান্বিত করতে অংশ নেবে অবশ্যই আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় :

"মুহূর্ত তুলিয়া শির দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে।"

জানি না যে মহৎ প্রচেষ্টার লক্ষ্য ও ইচ্ছা রেখে আমরা অগ্রসর হয়েছি—তাতে আমরা কতটুকু সার্থক।

সর্বশেষে আমাদের এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নানাভাবে যাঁরা সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

নিবেদক—

অক্টোবর
১৯৯৩ সাল

হীরেন দাশগুপ্ত
হরিনারায়ণ অধিকারী

র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ প্রসঙ্গে

'র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন' থেকে 'ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন' বইটি যখন প্রকাশ হচ্ছে, তখন আমার সহ-লেখক হরিনারায়ণ অধিকারী আমাদের মধ্যে নেই— গত ১৯৯৬ সালের ২রা জানুয়ারি তিনি ক্যানসারে মারা গেছেন। প্রাথমিকভাবে বইটি প্রকাশিত হবার পরে বেশ কিছু আলোচনা ও সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বের হয়— বইটির দুর্বলতা, ভালো দিক ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু মতামত আসে। আমার এবং হরিনারায়ণের মধ্যে এ নিয়ে একাধিক আলোচনাও হয় বইটিকে চূড়ান্ত রূপ দেবার প্রসঙ্গে। তাঁর মৃত্যু এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তবে বহু ত্রুটি পরিহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তকে প্রকাশিত সমসাময়িক বিশ্বসহ ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলনের কালানুক্রমিক কিছু ঐতিহাসিক চিত্র (১৯২৯-১৯৮৩) এবং দলিল— যা পাঠকদের সামনে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে, তাদের ভাবাবে, নতুন প্রজন্মকে শেখাবে দায়বদ্ধতা।

তবে ইতিহাস-গবেষক, রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্র-যুব আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী পাঠককে, অর্থাৎ যাঁরা নানা ধরনের গণ-আন্দোলন, গণসংগঠন এবং স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক আদর্শ, বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করছেন, তাঁদেরকে এই বইটি খুবই সাহায্য করবে আশা রাখি।

স্বাধীনতা-পূর্ব ছাত্র আন্দোলনের উৎস-প্রেরণা-অভিমুখ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। আজ আবার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাসী-আগ্রাসন থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসহ আমাদের ভারতবর্ষও মুক্তি পাচ্ছে না, পাবেও না। আমাদের ছাত্র-যুব সমাজকে তাই এক নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে— এটাই তাদের পবিত্র কর্তব্য। আমাদের এই বইটিতে আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেই রুখে দাঁড়াবার ইতিহাস— যা ছাত্র-যুবদের অনুপ্রাণিত করবে। এখানেই হবে আমাদের সার্থকতা।

বইটির 'নির্ঘন্ট' অতি অল্প সময়ে দ্রুততার সাথে করে দিয়েছেন 'জাতীয় গ্রন্থগার কর্মী সমিতি'র উৎসাহী সদস্যরা— তাঁদেরকে ধন্যবাদ। প্রকাশককে ধন্যবাদ— এহেন বইকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।

হীরেন দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

—

ভারতের ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি

আধুনিক যুগের গোড়াপত্তন ও ইংরাজ শাসনের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আমরা জানতে পারলেও তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অগ্রগমনে অবশ্যম্ভাবী শ্রেণিদ্বন্দ্বে ছাত্রদের ভূমিকার কথা আমাদের জানা নেই। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে সমাজ বিবর্তনে এখানেও ভাববাদ ও বস্তুবাদী দর্শনের সংঘাত অবশ্যই ঘটেছে এবং সে ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে যারা শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা অবশ্যই কোন না কোন ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন একদিকে যখন শ্রীচৈতন্য তাঁর ছাত্র ও অনুগামীদের মন জাত-পাত, ধর্মীয় বিভেদমুক্ত করতে চেয়েছেন, ঠিক তখনই শ্রীরঘুনন্দন তাঁর ছাত্রদের মন বাঁধতে চেয়েছেন চূড়ান্ত ধর্মীয় ও সামাজিক রক্ষণশীল মানসিকতায়।

যাই হোক, আধুনিক ছাত্র আন্দোলনের জন্ম এক বিশেষ পটভূমিকায়। এককথায় বলা চলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের অসমসাহসিক সংগ্রামের মধ্যেই এদেশে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন জন্মলাভ করেছে। কিন্তু বোধহয় এইটুকু বলাই সব নয়।

ইংরাজরা যখন এদেশে দখলের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিচিত্র ভাঙ্গাগড়ার আবর্তে ঘুরছে। মুঘল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে। মুঘল সম্রাট, মুঘল সুবেদার, মারাঠা ও আফগান শক্তির বিরোধে, শিখ, নিজাম, মহিশূর প্রমুখ ক্ষুদ্র-বৃহৎ শক্তির অভ্যুত্থান ও পারস্পরিক বিরোধিতায় ভারতীয় সমাজ তখন এমনি শতধাবিভক্ত যে তার পক্ষে ইংরাজের মত একটা উন্নত উৎপাদন প্রথা, অস্ত্র ও সামাজিক শৃঙ্খলার অধিকারী জাতির কাছে বিজিত না হয়ে অন্য কোন উপায় ছিল না।

১৭৪০ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত কখনও দ্রুত কখনও ধীরে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইংরাজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো— যার সীমানা হল উত্তর থেকে দক্ষিণে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ২০০০ (দু হাজার) মাইলেরও বেশি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ থেকে বালুচিস্থান পর্যন্ত ২৫০০ (আড়াই হাজার) মাইল। উত্তরে হিমালয় ধরে দীর্ঘ সমুদ্রতীরভূমি নিয়ে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মাইল তার সীমানা। এরই নাম হ'ল ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য। তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল দক্ষিণ-পূর্ব আরবের এডেন বন্দর। এইখান থেকেই শাসন হতে লাগল আরও দূরের বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশ।

এই সমগ্র সাম্রাজ্য যদিও দু-ভাগে বিভক্ত ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য, যার সংখ্যা

ছিল ছোট বড় মিলিয়ে ছ'শরও (৬০০) বেশি। কিন্তু সবটুকুর উপর অবিমিশ্র ক্ষমতা ছিল বৃটিশ সরকারেরই। বৃটিশ ভারতের আয়তন ছিল সেই সময় ১,৮০,৮৬৭ বর্গমাইল, সমগ্র ভারতের ৬১ ভাগ এবং সমগ্র জনসংখ্যার ৭৭ ভাগ, অর্থাৎ মোটামুটি ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ জন। সারা বিশ্বের তৎকালীন জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। ওই জনসংখ্যার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ছিল ৬৮ জন হিন্দু, ২২ জন মুসলমান, ৩ জন শিখ, ৩ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া খ্রিস্টান, জৈন প্রভৃতি। দেশীয় রাজ্য সমগ্রদেশের দখল করেছিল ৩৯ ভাগ, আয়তনে ৭,১২,৫০৮ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৮,১৩,১০,৮৪৫ জন।

সমগ্রদেশের শতকরা ৯০ জনের জীবিকা ছিল কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তারা বাস করতেন গ্রামে। অন্য দশজন শহরে। তাদের জীবিকা ছিল নানাবিধ।

ভারতবর্ষ প্রাচীনতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। এর অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বারবার বাইরের থেকে মানুষকে আকর্ষণ করেছে। কেউ এসেছে যোদ্ধাবেশে বিজয়ী হয়ে। কেউবা বণিক, বাণিজ্যের পশরা নিয়ে, কেউবা সাংস্কৃতিক দূতরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার উদ্দেশে। এইসব মিলিয়ে এক অখণ্ড ভারত গড়ে উঠেছিল, সেখানে নানা ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি বেড়েছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, সামাজিক অনাচার ও অবিচার। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশের ধারায় ছাত্র আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সেই শ্রেণি বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ বুঝতে হ'লে ইংরাজরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করে তখনকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সৃষ্টি ও বিকাশের পথে ইংরাজ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করা ও ধারণা থাকা একান্তভাবেই অপরিহার্য।

ইংরাজরা যখন আমাদের দেশ অধিকার করে তখনকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস অনবদ্য ভাষায় অভ্রান্তভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। "যারা হিন্দুস্থানের স্বর্ণযুগের কথা বিশ্বাস করেন আমি তাদের সঙ্গে মোটেই একমত নই। ভারতের দুর্দশার কাল শুরু হয়েছে সুদূর অতীতের বিশ্বসৃষ্টির খ্রিস্টীয় ধারণার বহুপূর্ব থেকে। ভারতের অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক (১৮১০) পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। সে সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হল হাতে চাষ করা। হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে লক্ষ লক্ষ তাঁতি আর সুতাকাটুনির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিম্নমানের। স্মরণাতীতকাল থেকে সরল ধরণের পৌর শাসনের আওতায় ভারতের গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে। গ্রামের সীমানা কদাচিৎ বদল হয়েছে। রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া, ভাগ-বিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা কোনদিন মাথা ঘামায় নি। গ্রামটি অখণ্ড থাকলেই হ'ল। কোন সম্রাটের তা করায়ত্ব হল, এ নিয়ে তাদের কোন ভাবনাচিন্তা ছিল না। গ্রামের অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে চিরদিন।" এ অবস্থার মধ্যেই 'ইংরাজের থাকা ও ইংরাজের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এইসব ছোট ছোট গতানুগতিক অনড় অচল সামাজিক সংস্থাগুলি বহুলাংশে ভেঙ্গে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে। এইভাবে ভারতে যে সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, আর

সত্যকারে বলতে গেলে বলা চলে একমাত্র বিপ্লব।"

"ঐ সমস্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দ্দশার অতল সমুদ্রে, সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, একই সঙ্গে তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকা অর্জনের বংশানুক্রমিক উপায়। এটা দেখতে মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, আমরা এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল গ্রাম্যগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, তাবাই চিরকাল প্রাচ্য দেশগুলিতে স্বৈরাচারের ভিত্তি হয়ে রয়েছে, মানুষের চিন্তাধারাকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, করে রেখেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত মহিমা এবং ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। একথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই হীন অনড় ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য, লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটি হিন্দুস্থানে পরিণত হয়েছে এক ধর্মীয় প্রথায়। এই ছোট ছোট গ্রামগোষ্ঠীগুলি জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত। অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নিত না করে তাকে করেছে বাইরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রকৃতির নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূজা। প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমান নামক বানর ও অবলানামী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে চরম অধঃপাতে নিয়ে গেছে।"

"এ কথা সত্য যে হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে ইংরাজ বুর্জোয়ারা প্ররোচিত হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং তাদের প্রয়োগপদ্ধতি ছিল নির্বোধের মত, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল, এশিয়ার সামাজিক অবস্থার মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মানবজাতি কি তার অভীষ্ট সাধন করতে পারে? তা তারা পারে না। কাজে কাজেই ইংল্যাণ্ডের অপরাধ যত গভীরই হোক সেই বিপ্লব সংগঠনে ইংল্যাণ্ড ছিল ইতিহাসের অবচেতন অস্ত্র।"

(মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে', অনুবাদ লেখকের)

মার্কসের এই ব্যাখ্যা কতদূর সত্য তার প্রমাণ আমরা পাবো ভারতীয় সমাজের তৎকালীন অবস্থা একটু আলোচনা করলেই। অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ (Self Sufficient Village Community)—অনুন্নত এবং মূলত কৃষিনির্ভর। উৎপাদনের উপকরণ ছিল নামমাত্র। তাও ছিল গ্রামীণ। ফলে যন্ত্রপাতির উন্নতির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সমাজ বিন্যাসে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য, জন্মগত জাতিভেদ সমাজ জীবনকে করেছে পঙ্গু; এর সঙ্গে পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজধর্মের প্রধান কথা। এর ফলে মানুষ বিশ্বাস করেছে— মানুষের সামাজিক অবস্থান আর পূর্বজন্মের ফল এবং তার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ছিল অশাস্ত্রীয় এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রতি যেন অবজ্ঞা। এইভাবেই সমাজে এসেছে স্থাণুত্ব, এখানে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই, উদ্যোগ পুরস্কার মোটেই স্বীকৃত নয়। এই অন্ধ বিশ্বাসকে উঁচুতলার মানুষ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছে নিচের মানুষকে দাবিয়ে রাখতে। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল রাজবংশের উত্থান-পতনের মধ্যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার অদলবদলে, শাস্ত্র আর টীকার কচকচানিতে। কিন্তু সমাজের মূল জায়গা উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। আবার ক্রমান্বয়ে

সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে ধর্মের নামে উৎকোচ, ব্যভিচার, জাতিভেদপ্রথা, কুৎসিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, দাসপ্রথা, গঙ্গায় শিশু বিসর্জন, সতীদাহ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। সামাজিক প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রম হয়ে উঠল নিন্দনীয় কাজ। জ্ঞানের চর্চা, জীবন কতখানি অনিত্য, তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল, তারই বিচারের মধ্যে সমাপ্ত।

এমন একটা সময়ে আধুনিক ইউরোপীয়রা আমাদের দেশে এল। তার মধ্যে ইংরাজরাই প্রাধান্য পেল, এরা অতীতের বিজেতাদের মত নয়। এরা আধুনিক জীবনযাত্রা, উন্নত সামাজিক অর্থনৈতিক উপাদান প্রথার অধিকারী। এদেব বাধা দেবার মত কোন শক্তি ভারতীয় সমাজে ছিল না। তাই এদের হাতে পরাজয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এরা একদিকে লুঠ করেছে। আবার নিজেদের অবাধ-বাণিজ্য ও লুঠের প্রয়োজনেই এ দেশের অর্থনীতিকে আধুনিকীকরণ করে পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে নূতন সমাজের গোড়াপত্তন করেছে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক প্রভাবের মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়। এই দুই ধারার পর্যালোচনাও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ও গতি-প্রকৃতি বুঝতে অনেক সহজ হবে।

বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক দিকের কথাই প্রথমে ধরা যাক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বৃটিশ শাসনের পূর্বে দেশের মধ্যে কতগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি উপকৃত হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে সেচব্যবস্থার কথা। বেশ উন্নত ধরনের এই সেচব্যবস্থা। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নত ধরনের উপায়ে পরিচালিত হয়ে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করত। ইংরাজরা এই ব্যবস্থা ধ্বংস করে। যার অনিবার্য ফল হল আরও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতে এই ধরণের ঘটনার ফলে দেশে এক-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত বলা চলে, বাংলাদেশে সরাসরি বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পূর্বেই অভূতপূর্ব আর্থিক লুণ্ঠন। মীরজাফর, মিরকাশেম প্রমুখ শিখণ্ডী নবাবের কাজ থেকে করবাবদ ইংরাজরা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করে।

পলাশীর যুদ্ধের পর শিখণ্ডী নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে ফোর্ট উইলিয়মের ইংরাজ কর্তারা উৎকোচ ও তথাকথিত উপহার বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছিল তার একটি চিত্র নিচে দেওয়া হল :

ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গের গভর্নর ড্রেক		২.৮০,০০০ টাকা
কর্নেল ক্লাইভ (তখনও লর্ড হন নি)		
কাউন্সিলের সভ্য হিসেবে	২,৮০,০০০ টাকা	
সেনাপতি হিসাবে	২,০০,০০০ টাকা	
বিশেষ উপহার হিসাবে	১৬,০০,০০০ টাকা	
		২০,৮০,০০০ টাকা
ওয়াটস্		
কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে	২,০০,০০০ টাকা	
বিশেষ উপহার হিসাবে	৮,০০,০০০ টাকা	
		১০,০০,০০০ টাকা

মেজর কিলপ্যাট্রিক সভ্য হিসাবে	২,৪০,০০০ টাকা	
বিশেষ উপহার	৩,০০,০০০ টাকা	
		৫,৪০,০০০ টাকা
ম্যানিং হাম		২,৪০,০০০ টাকা
বিচার		২,৪০,০০০ টাকা
ওয়ালস		৫,০০,০০০ টাকা
স্কার্ফটন		২,০০,০০০ টাকা
ল্যাসিংটন		৫০,০০০ টাকা
		মোট— ৫১,৩০,০০০ টাকা

এছাড়া আরও ডজন খানেক যারা সিলেক্ট কমিটির সভ্য নন, অথবা কোনভাবেই পলাশীর যুদ্ধ কিম্বা মীরজাফরকে (মীরজাফব আলি খান) নবাব করার অংশীদার নন, কেবলমাত্র ফোর্ট উইলিয়াম ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তা বলে, উদার নবাব বদান্যতা দেখাতে তাদের ১ লক্ষ করে টাকা 'উপহার' দিতে বাধ্য হন।

এর বাইরে ১৭৫৭-এর ৫ই জুনের সন্ধি অনুসারে বাংলার নবাবকে দিতে হয় ২'২৯,০০,০০০ টাকা। বলাই বাহুল্য এই সব টাকাটাই যোগাতে হয়েছে দেশের গরীব কৃষক ও সাধারণ মানুষকে।

শুরু থেকেই এই অমানুষিক অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ইংরাজরা শেষদিন পর্যন্ত বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানা মারফৎ মুনাফার সিংহভাগ নিয়ে গেছে সরাসরি ইংল্যাণ্ডে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে বৃটিশ সরকারের সমস্ত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ আয় হত ভারত থেকে। বিশ্বব্যাপী ইংরাজরা যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে; এশিয়া-আফ্রিকায় যে সাম্রাজ্যবিস্তার করেছে তার প্রায় সব খরচই আদায় হয়েছে ভারতবর্ষ থেকে। ১৮৬১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে যুদ্ধ বাবদ ভারতবর্ষ থেকে যে খরচ আদায় হয়েছে এবং ভারতের বাইরে ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবিস্তারে দরিদ্র ভারতবাসীর রক্ত শোষণের এক ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখতে পাব নিচের ছবিটিতে—

সময়কাল (Time)	অভিযান (Expedi-tion)	প্রধান খরচ খরচ (ভারত দিয়েছে)	প্রধান খরচ খরচ (ইংল্যাণ্ড দিয়েছে)	অতিরিক্ত বিশেষ খরচ (প্রধান খরচ থেকে অনেক কম) ভারত দিয়েছে	অতিরিক্ত বিশেষ খরচ (প্রধান খরচ থেকে অনেক কম) ইংল্যাণ্ড দিয়েছে
১৯৩৮-১৮৪২	প্রথম আফগান যুদ্ধ	সমস্ত	—	—	সমস্ত
১৮৩৯-৪০	প্রথম চীন যুদ্ধ	সমস্ত	—	—	সমস্ত

সময়কাল (Time)	অভিযান (Expedition)	প্রধান খরচ খরচ (ভারত দিয়েছে)	প্রধান খরচ খরচ (ইংল্যাণ্ড দিয়েছে)	অতিরিক্ত বিশেষ খরচ (প্রধান খরচ থেকে অনেক কম) ভারত দিয়েছে	অতিরিক্ত বিশেষ খরচ (প্রধান খরচ থেকে অনেক কম) ইংল্যাণ্ড দিয়েছে
১৮৫৬-৫৭	দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ	—	সমস্ত	—	সমস্ত
১৮৫৬	পারস্য যুদ্ধ	সমস্ত	—	অর্ধেক	অর্ধেক
১৮৫৯	তৃতীয় চীন যুদ্ধ	—	সমস্ত	—	সমস্ত
১৮৬৭-৬৮	পর্ক যুদ্ধ	সমস্ত	—	—	সমস্ত
১৮৭৮	মাল্টা যুদ্ধ		সমস্ত	—	সমস্ত
১৮৭৮-৮১	দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ	সমস্ত	—	৫ মিলিয়ন পাউণ্ড	৫ মিলিয়ন পাউণ্ড
১৮৮২	ইজিপ্ট (মিশর) যুদ্ধ	সমস্ত ---	অর্ধ মিলিয়ন বাদে সমস্ত	অর্ধ মিলিয়ন	—
১৮৮৫-৮৬	সুদান যুদ্ধ	সমস্ত	—	—	সমস্ত
১৮৮৫-৯১	ব্রহ্ম যুদ্ধ	সমস্ত	—	সমস্ত	—
১৮৯৬	মোম্বাসা	–	সমস্ত	—	সমস্ত
১৮৯৬	সিকিম	সমস্ত	—	—	সমস্ত
১৮-১৯১৪	দ: আফ্রিকা চীন, পারস্য	অংশ বিশেষ	বাকিটা	অংশ বিশেষ	বাকিটা
১৯১৪ ২০	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	সমস্ত	—		সমস্ত

এইসব যুদ্ধে টাকার অঙ্ক কেমন দাঁড়াবে তা কয়েকটি যুদ্ধে ভারতের প্রদত্ত টাকার অঙ্কের হিসাব দেখলেই বোঝা যাবে—

		পাউণ্ডের হিসাবে
পর্ক যুদ্ধ	...	৪১,০০০
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ	...	১২,৫১,৬,০০
ঈজিপ্ট যুদ্ধ	...	১,২৫০,০০০
ব্রহ্মদেশ যুদ্ধ	...	৪,৭০,৫,০০০
সিকিম যুদ্ধ	..	২,৩১,৯০০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ		টা: ১৩৭,৭০,০০,০০০

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এর পরিণাম খুবই বিষময় হয়ে উঠেছিল। কৃষকদের উপর চাপানো হ'ল নানারকম বাধ্যবাধকতা। এর ফলে কৃষকরা অল্পমূল্যে ইংরাজদের কাছে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হত। সেই পণ্য বিক্রয় করেই ইংরাজ বেনিয়ারা বিপুল পরিমাণ মুনাফা করত।

মীরকাশেমের এক চিঠিতে জানা যায়, এক টাকার পণ্য ইংরাজরা পাঁচ টাকায় বিক্রয় করত। তাঁতিদের বস্ত্রশিল্প জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হল। দিল্লীর পুতুল বাদশাহ ফারুক সিররের কাছ থেকে পাওয়া বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সনদের অধিকার বলে দেশের বাইরে ও ভিতরে পেল বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা। আবার সেই সুবিধাবলেই দেশীয় ব্যবসায়িদের কাছে কালোবাজারী মারফৎ লাভ করত অগাধ মুনাফা, এর ফলে দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় কোনঠাসা হয়ে পড়ল। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দেখা গেল আমদানিজাত পণ্যে দেশীয় বাজার প্রচুর ফুলে ফেঁপে উঠল আর রপ্তানী গেল কমে। এতদিনকার Favourable Balance of Trade পাল্টে unfavourable হয়ে গেল। ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়াল ইংল্যাণ্ডের কলকারখানা শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানীকারক; আর এটা হতে হল নিতান্ত বাধ্য হয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইংল্যাণ্ডেব এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ভারতবর্ষ থেকেই শুষে নেওয়া শুরু হয়েছিল।

অপরদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের শুরুর প্রথম দিকেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটল, রাজস্ব-প্রথা এবং শিল্পব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুরু হল এক নিপীড়নের যুগ।

এর পাশাপাশি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের গঠনমূলক দিকও আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন—

প্রথমত মোঘল শাসনে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিক থেকে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। সাম্রাজ্য ছিল নামেই। কার্যত প্রদেশগুলি ছিল স্বাধীন এবং সবসময়ই আত্মকলহে মত্ত। আইন ও বিচার পদ্ধতি ছিল এক-এক জায়গায় এক-একরকম। ইংরাজরাই প্রথম এদেশে পাশ্চাত্য আধুনিক আইন ও শৃঙ্খলা কায়েম করল। নতুন বিচার ব্যবস্থা তৈরি হল। অবশ্য পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ দেওয়া হল না। তা'সত্ত্বে ভারতে এক আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হল।

দ্বিতীয়ত সমস্ত দেশে একই ধরণের অর্থনীতি চালু হল, যদিও তার চেহারা ঔপনিবেশিক। রাজস্বপ্রথা সর্বত্র একরকম করা হল; যদিও কৃষকদেব উপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ল। ১৭৯২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হল। ১৮১২ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট স্বীকার করে যে এই ব্যবস্থার রাজস্বের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বাড়লেও কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত দেশেব অর্থনীতি ছিল নিম্নস্তরের। বলা চলে নিম্নমানের জীবন ধারণের অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কূপমণ্ডুক। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া তখনও এদেশে লাগেনি। দেশের সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থাও স্থাপিত হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাণিজ্যের পথে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল। ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্ক দৃঢ়তর হল। তা ছাড়া আধুনিক শিল্পের গোড়াপত্তনও আমাদের দেশে এই সময় সম্ভব হল। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সুফলটুকু ইংরাজরা ভারতবাসীর জীবনে পৌঁছে দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও বাজার এবং সেই প্রয়োজন মেটাতেই ভারতের কিছু কিছু শিল্প তৈরী করতে ইংরাজরা বাধ্য হল; যেমন— কয়লা, চা শিল্প প্রভৃতি। অপরদিকে খনি থেকে কাঁচামাল, তুলা বিদেশে যেত; আবার তৈরী মাল চড়া দামে ভারতের বাজারেই বিক্রয় হত।

তৃতীয়ত রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিধান। কাঁচামাল রপ্তানীর সুবিধার জন্য ইংরাজরা রাজপথ নির্মাণ করে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে বাধ্য হল। এরই ফলে গ্রামীণ কূপমণ্ডুক অর্থনীতি ভেঙ্গে বৃহত্তর ধনতান্ত্রিক বাজারের গোড়াপত্তন হল। ফলে ভারতের বুকে সামাজিক

পরিবর্তনেরও সূচনা হল এই সময় থেকেই। এইসূত্রে বলা চলে যে, ওই লক্ষ্যেই ১৮৫৩ সালে বোম্বাই-এ রেলপথ চালু হলো। চালু হলো কলকাতা-আগ্রার মধ্যে ডাকব্যবস্থা। দেশের উপকূল ও অভ্যন্তরে বাষ্পচালিত জাহাজ চলতে শুরু করল। দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ল।

চতুর্থত ইংরাজ শাসনের সঙ্গে এলো পাশ্চাত্য ভাবধারা, ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ভাবধারার প্রভাবে ভারতের চিন্তাজগতেও বিপ্লবের সৃষ্টি করল। ফলে সংবাদপত্রের প্রবর্তন, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদির সংস্কার সম্ভব হল।

এইসব ঘটনার প্রভাবে দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে। বোধহয় এর প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে এর ফল কেবলই বিয়োগান্ত হলেও অদূর ভবিষ্যতে এর সুফলও কিছু কিছু অনুভূত হয়। এই দ্বিধারা থেকেই জন্ম নেয় দুই ধারার আন্দোলন। একটি হল গণসংগ্রামমূলক, অপরটি হল সংস্কারমূলক। এই দুই ধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। ছাত্র আন্দোলনও অনুপ্রেরণা পায় এই দুই ধারা থেকেই।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তারি প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষক সমাজ ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। ইংরাজ-বেনিয়া, দেশি জমিদার, সুদখোর, মহাজনদের নিরবচ্ছিন্ন শোষণে গ্রামের কৃষক ও দরিদ্র কারিগরেরা নিজেদের পেশা ও জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট আইন করেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতি বছর ইংরাজ রাজকোষে ৪ লক্ষ পাউণ্ড জমা দিতে হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাভ, কর্মচারীদের বেতন, ঘুষ, সামরিক খরচের সঙ্গে এই টাকা প্রধানত ভারতের দরিদ্র কৃষক ও কারিগরশ্রেণির গলা টিপে আদায় করা হয়েছে। এরই সঙ্গে ছিল অনবরত কৃষকদের উপর বর্ধিত করের বোঝা।

এইসব ঘটনায় দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনই (ক) গণসংগ্রামমূলক (খ) সংস্কারপন্থী—এই দুই ধারায় আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করেছিল।

গণসংগ্রামমূলক আন্দোলন মূলত ছিল কৃষক, নুতন শিল্প ব্যবস্থায় নিপীড়িত গ্রাম্য কারিগর নবাবদের ভেঙ্গে দেওয়া সৈন্যবাহিনীর লোকজন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বঞ্চিত পুরাতন জমিদারশ্রেণি ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরোধী হিন্দু, মুসলমান ধর্মীয় সংস্থাগুলির আন্দোলন। বৃটিশ শাসকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক সংস্কারে এরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

প্রাথমিক অবস্থায় এই আন্দোলনের মান ছিল অত্যন্ত নিচুস্তরের। এদের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ অনেক সময়ই বিভিন্ন ধরণের খুন, জখম, লুণ্ঠন, ডাকাতি ইত্যাদির মধ্যেই প্রকাশ পেত। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেও প্রথম যুগের গণআন্দোলনের অভিব্যক্তি এই ধরণের ছিল। রবীন হুড, উইলিয়াম টেল প্রমুখদের গল্প এই ধারারই প্রতীক। অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত পথ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ভাবনা না থাকায় অত্যাচারিত মানুষ ঐ ধরণের পথকেই গ্রহণ করত। যেমন বলা চলে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরে ডাকাতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানের ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে দেখেছেন,

এই সমস্ত ডাকাতরা মূলত অত্যাচারিত কৃষকদের মধ্য থেকেই এসেছে। তারাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতনে অসহ্য হয়ে এই পথ নিত। সময় সময় ব্যক্তিগত বা কয়েকজনের সংঘবদ্ধ ডাকাতির স্তর সমষ্টিগত লুঠপাটের কায়দায় বিদ্রোহের রূপ নিত এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। যেমন বলা চলে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চুয়ার বিদ্রোহ—মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক নিঃস্ব কৃষকও বাধ্য হয়ে জীবিকা হিসাবে ডাকাতির পথ নিত। ক্রমান্বয়ে এই সব আন্দোলন গণচরিত্র পেয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্বাহ্ন পর্যন্ত এমন একটি বছর যায় নি যখন কোথাও না কোথাও বিদ্রোহ ফেটে পড়ে নি। ১৮৩০ সালে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে নিয়োজিত খাসিয়া শ্রমিকরা ইংরাজ কর্মকর্তাদের অত্যাচার ও তাদের উপর একরকম দাসপ্রথা চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উড়িষ্যায় ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৫ সাল অবধি কৃষকদের বিদ্রোহ চলেছে। বাংলাদেশে ১০ বছর ধরে চলেছে ফরাজী আন্দোলন (১৮৩৮-৪৭); হয়েছে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন। দুই যুগ ধরে রায়বেরিলিতে সইদ আহমেদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলেছে। বিদ্রোহ করেছে কোলেরা, সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালে। জোর করে বেশি খাজনা আদায়ের বিরূদ্ধে এদের প্রতিরোধ ধ্বংস করে দেবার জন্য জমিদার সাঁওতালপল্লীর সামনে পোষা হাতি ক্ষেপিয়ে ছেড়ে দিত। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬১ সালে নীল বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ ঐতিহাসিকরা এইসব আন্দোলনের অধিকাংশই চোর, ডাকাত, সামাজিক অপরাধীদের কাজ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে এইসব আন্দোলনের মান ছিল নিচু। এসব আন্দোলনের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকত না। সর্বোপরি এইসব আন্দোলনের মধ্যে প্রায়ই ধর্মীয়ভাবের আধিক্য থাকত। অনেক সময়ই পবিত্র ইসলাম অথবা রামরাজ্যের নামে আন্দোলন হ'ত। আবার সেই পুরাতন পবিত্র ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কথা হত। মাঝে মাঝে যে সাম্প্রদায়িকাও দেখা দিত না এমন নয়, তবে সাধারণভাবে এইসব আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বজায় থাকত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উচ্ছেদ হওয়া গরিব কৃষক, ইংরাজের নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক, কারিগর, পুরাতন সৈনিক, উদ্বাস্তু, জমিদার, ইংরাজদের প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারে ভীত ধর্মীয় সংস্থাগুলি মূলত এইসব আন্দোলনে অংশ নিত। আন্দোলনগুলি কখনও জমিদার, কখনও ইংরাজ কখনও উভয়ের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হত। কোন কোন সময় তখনকার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে জমিদারদের বিরুদ্ধে এদের দাবীদাওয়া মেনে নিত। এসব সত্ত্বেও এইসব আন্দোলন চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল কারণ সাম্রাজ্যের শোষণব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভই ছিল জমিদারশ্রেণি।

এই সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিত সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে উঠে আসা নেতারা ছিলেন খুবই সাধারণ মানুষ এবং স্বভাবতই এদের চেতনার মান অনুন্নত থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে ইংরাজদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জমিদারও এদের নেতৃত্বে এগিয়ে যে আসতেন না তা নয়। যেমন বলা চলে ১৭৭০ সালে ধলভূমের মহারাজ এবং ১৮৩২-এ রাজা গঙ্গানারায়ণ এই ধরণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহে কানওয়ার সিং, নানাসাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নাম আমাদের সকলেরই জানা।

সাধারণত এইসব আন্দোলনে লুণ্ঠন, হত্যা এ সবই হত, তবে অনেক সময়ই এইসব আন্দোলনের সংগঠকেরা উৎকৃষ্ট সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিত। সাঁওতালদের মধ্যে এক ধরণের সঙ্কেত ব্যবস্থা ছিল, যার সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অতি দ্রুত খবর পাঠিয়ে দিতে পারত। দামামার শব্দে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার সাঁওতাল একত্রিত হত। ১৮১০ সালে বেনারসে House Tax বিরোধী এক আন্দোলন হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে শহরে ধর্মঘট চলে, দোকানপাট বন্ধ থাকে। রোজ বিকালে সভায় বক্তৃতা হত। গ্রামাঞ্চল থেকে আগত লোকেদের জন্য খাওয়া দাওয়ার সুষ্ঠ ব্যবস্থা কবা হত। এমনকি Tax-এর প্রতিবাদ জানানোর জন্য এরা পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার পরিকল্পনা নেয়। পরিশেষে সরকার এই Tax প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়, কলকাতায় পায়ে হেঁটে মিছিল করে আসার পরিকল্পনাও বাতিল হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন যে, এইসব আন্দোলন সাফল্য লাভ করলে দেশ আরও পিছিয়ে যেত। এই মত মেনে নেবার কোন কারণ নেই। যদিও এই আন্দোলনের কোনও পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য থাকত না, তা সত্ত্বেও অধিকাংশই ক্ষেত্রেই এরা শোষণের বিরুদ্ধে সাম্য ও মৈত্রীর কথা বলতেন; এক কথায় খুব সচেতন ভাবনা না হলেও এদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক চেতনা পরিলক্ষিত হত। ওয়াহাবী নেতা তিতুমীরকে ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব কমিউনিস্ট বলে অভিহিত করেছেন। ফরাজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিঞার বক্তব্যই ছিল— "আল্লা হলেন জমির মালিক, জমি মানুষের নয়, অতএব সব জমির উপর সব মানুষের সমান অধিকার।" ময়মনসিং-এর পাগলাপন্থীদের আদর্শ ছিল সত্য ও সাম্য।

প্রাথমিক স্তরের নিচুমানের এইসব গণআন্দোলন সরাসরিভাবে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার আন্দোলনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল সেটা খুবই বিতর্কিত বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরাজ শাসন থেকে উদ্ভুত দ্বিতীয় ধারার সংস্কারপন্থী আন্দোলনের কথা সাহিত্যে, ইতিহাসে বলা হয়েছে— যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নীল চাষীদের পরিপ্রেক্ষিতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', সন্ন্যাস বিদ্রোহের বাতাবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', তিতুমীরেব বাঁশের কেল্লার কাহিনী, সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহী মঙ্গলপাণ্ডে, লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা। অবশ্যই এসব আন্দোলনের ইতিহাস, তার নেতাদের বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগ ছাত্র মনকে আকর্ষণ করেছে, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সামিল হতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের অপর ধারা হলো শিক্ষিতশ্রেণির সংস্কারপন্থী জাগরণ বা আন্দোলন।

ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের পুরাতন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ে, পুরাতন আইন-কানুনের পরিবর্তনের ফলে নতুন এক সামাজিক অবস্থা তখন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির জায়গায় স্থান নিয়েছে সম্পত্তির উপর নুতন ধরণের ব্যক্তিমালিকানা, টাকার মাধ্যমে লেনদেনের ভিত্তিতে আধুনিক অর্থনীতি (money economy)। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত আধুনিক শহরগুলি নতুন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকার পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে জমজমাট হয়ে উঠেছিল। সেইসঙ্গে এইগুলি হয়ে উঠল নব্য শিক্ষা সংস্কৃতিব চর্চা ও প্রসারের কেন্দ্র। আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রগতিশীল কার্যকলাপের উন্মেষ ও পরিচালনার কেন্দ্রও হল এগুলি।

এর পাশাপাশি খাজনা পাওয়া নতুন জমিদার শ্রেণি, শহরের মহাজন, ব্যবসাদার, সরকারি চাকুরীয়া, ইংরাজ বেনিয়া ও স্বদেশী উৎপাদকদের মধ্যেকার দালালশ্রেণি ভারতীয় সমাজে একটি নতুন অংশের সংযোজন করল। ইংরাজ সরকারের শাসন, অর্থনৈতিক নীতি এই সব নতুন মানুষগুলি সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম দিল। এই ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণি প্রথম দিকে বিশ্বাস করত যে, একমাত্র পশ্চিম থেকে আসা নতুন প্রথা ও রীতির দ্বারাই তাদের অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠা যাবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হলেন তাঁরা, শিক্ষাদান যাদের ঐতিহ্য। এঁরাই প্রথমে ইংরাজ পরিচালিত শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ধ্যান-ধারণাকে স্বীকার করে নেবার মানসিকতা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে এদেশের পক্ষে ইংরাজ শাসন কল্যাণকর বলেই মনে করলেন। যেমন রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দাদাভাই নৌরজী, ডঃ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ আরও অনেকে। কিন্তু বেশিদিন ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণি ও ইংরাজ শাসকদের মধ্যে এই আদান প্রদানের সম্পর্কটা "ইংরাজ শাসনের কল্যাণকর," ধারণা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। এই মধ্যবিত্তশ্রেণি ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারি চাকুরী প্রভৃতিতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা চাইতে আরম্ভ করল এবং ক্রমান্বয়ে তা যত বাড়তে লাগল ইংরাজ শাসনের সঙ্গে বিরোধও ততই বাড়তে লাগল। স্বার্থের এই সংঘাতই এই শ্রেণির মধ্যে বিদেশি শাসন মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং তাই ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থেই এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে দাঁড়িয়েছে।

১৮৩৩ সাল থেকে ভারতে একদিকে ইংরাজ শাসন আরও কেন্দ্রীভূত হল, সেই সঙ্গে শিক্ষার বিস্তারও ঘটতে লাগল। এর সমন্বয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এই মধ্যবিত্তশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং এই ঐক্যবোধ প্রকাশিত হলো নব্য জাতীয়তাবোধের মধ্যে।

সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই অবস্থায় সমাজের বুকে ইংরাজ শাসকদের নিতান্ত অনিচ্ছা ও কৃপণতা সত্ত্বেও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত অনুপ্রাণিত এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হল। আর শুরু হয়েছিল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম রাজা রামমোহন রায়, হিন্দু কলেজের বিস্ময়কর প্রতিভাশীল তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর অনুবর্তীদের নিয়ে। এই সংস্কারপন্থী জাগরণ আন্দোলনের যারা পরিচালনায় ছিলেন, সেইসব নতুন সৃষ্ট বুর্জোয়াশ্রেণি, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ চাইতেন না; এরা সাম্রাজ্য শাসনের দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করে ইংল্যাণ্ডে ইংরাজদের শাসনের অনুরূপ শাসন ওখানে চালু হোক, তার জন্য আন্দোলন করার পক্ষপাতি ছিলেন। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ছিলেন এই ধরণের আন্দোলনের প্রবক্তা। এঁদের কঠোর পরিশ্রমেই সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহের প্রচলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও ছিল এঁদের অদম্য প্রচেষ্টা। এইসব আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এঁরা দেশবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায় Lord Amherst-কে যে পত্র লেখেন তার গুরুত্ব অপরিসীম—

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real

knowledge, the Beconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the school men which was the best calculated to perpetuated ignorance. In the same manner the sanskrit system of education could be the best calculated to keep the country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will be consequently promote a liberal and enlightened system of education, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, anatomy with other useful science which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlement of talent and learning, educated in Europe and prouding a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

অপরদিকে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আধুনিক সজ্জায় নতুন করে পাঠের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম মিশনারী কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হল কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়; মূলত মেকলের উৎসাহেই ইংরাজি ও ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলো। যদিও রামমোহন, বিদ্যাসাগরের ইংরাজি শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা আর মেকলে, ট্রাভালিয়ন প্রমুখের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী ও উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্ন। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী সময়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করব। কারণ এদেশের তৎকালীন শিক্ষাদর্শনও শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

যাই হোক, এই সময়কার সংস্কারবাদী আন্দোলনের মূল দিক ছিল মানবতাবোধ, এরজন্যই বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা। এইসময় একইসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, টেকচাঁদঠাকুর, মাইকেল প্রভৃতি সাহিত্যিক কবির সাহিত্য ভাষায়, আঙ্গিকে, বাস্তবতায় মানবপ্রীতির অনন্য সাধারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছাপ পরিস্ফুট হয়। একমাত্র মহাবিদ্রোহ ছাড়া নীল বিদ্রোহ এবং অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই চিন্তা-বিপ্লবকে অনেকেই ইউরোপের রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই তুলনা অর্থহীন। ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লব স্বভাবতই এই ঔপনিবেশিক চিন্তা বিপ্লবের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী ছিল।

আধুনিক ছাত্র সমাজ

কলকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্রমে ক্রমে কলকাতা ও তার আশে পাশে আরও স্কুল গড়ে উঠল। এখানকার ছাত্ররাই হল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক ছাত্রসমাজ।

এই সময়কার কলকাতার ছাত্রদের সম্পর্কে ফাদার লং ১৮৪৩ সালের মে মাসের ব্রিটিশ ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিনে লেখেন "হাজার হাজার ছাত্র শহরতলী ও মফঃস্বল থেকে কলকাতায় পড়তে আসছে। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা নতুন চেতনার জোয়ার দেখা

যাচ্ছে...'' ''অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলমুক্ত চেতনা সম্পন্ন ছাত্রের সংখ্যা কলকাতায় দুই থেকে পাঁচ হাজার''।

ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই নতুন বুদ্ধিজীবীদের ইংরাজ শাসকরা চেয়েছিলেন দেশের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের শাসনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে। ইতিহাসে ঘটেছে অন্যরকম, এই তরুণ বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা। যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ইউরোপকে এরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে শিখলেন পরাধীনতা, সামাজিক কুসংস্কার ও অন্যায়কে ঘৃণা করতে। এই নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে। তাঁরা নিজেদের চিন্তাজগতের গুরুরূপে অভিষিক্ত করেছেন বস্তুবাদী চিন্তানায়ক মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, এ্যাডাম স্মীথকে। আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে। টম পেইনের, 'রাইট্স অব ম্যান' (Rights of Man), বেন্থামের 'ইমানসিপেট দি কলোনিজ' (Emancipate the Colonies) বিলেত থেকে জাহাজে করে কলকাতা পৌঁছলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তা চোখের নিমেষে বিক্রি হয়ে যেত। অচলায়তন জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মূলে সাহসিকতার সঙ্গে আঘাত হানার দুরন্ত আশায় প্রচলিত গোঁড়ামীকে অস্বীকার করে মদ খেয়েছেন, গোমাংস খেয়েছেন কেউ, কেউ ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেই এদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নবীন ছাত্র মনের বিক্ষোভ। যদিও সেদিন এ-বিক্ষোভ সমাজ সচেতন সংগঠিত আন্দোলনের ব্যাপক রূপ পায় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অসমসাহসী বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহীসত্তা প্রবাহিত হয়েছে সর্বব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্রসংগ্রামের শিরায়-উপশিরায়। এই প্রক্রিয়া শুরু হল কলকাতা হিন্দু কলেজের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ১৭ বছর বয়সের ভিভিয়ান ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে। তাঁরই নেতৃত্বে Young Bengal-কে কেন্দ্র করে। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন ছাত্রবন্ধু ও গুরু। ১৮২৭-২৮ সালে তাঁর বাড়িতে আলোচনার মাধ্যমে গড়ে উঠল 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' আর তার শিষ্যরা হলেন এর পথিকৃত। ডিরোজিওর ছাত্ররাই যে প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮২৯ সালে তার নাম 'পার্থেনন'। পত্রিকাটি মূর্তিপূজা, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতিতে আঘাত করে শিক্ষা প্রসারের পক্ষে জোরালো মতামত প্রকাশ করায় রক্ষণশীলরা খুবই ক্ষেপে যান। ১৯৩০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হলে তাঁরা খুবই খুশি হন। সেই খুশি প্রকাশ পেল রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'য়। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাগজে জনবুলের পাতায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে ''পার্থেনন-কর্তৃক বিপজ্জনক মত প্রচার করা বন্ধ হয়েছে... এদেশীয় ছাত্রদের একচুল স্বাধীনতা দিলে তারা মাথায় চেপে বসতে চায়। তাদের এই এঁচোড়ে-পাকা বাড়াবাড়ি বন্ধ করে তাদের অভিভাবকরা ভাল কাজই করেছেন।'' (জনবুল)

১৮৩০ সালে ফরাসী দেশের জুলাই বিপ্লবের সাফল্যের প্রতি অভিনন্দন জানাবার জন্য হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র অক্টারলনি মনুমেন্টের মাথায় ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা সাম্য-মৈত্রীর পতাকা উড়িয়ে দেন, নামিয়ে আনেন ইংরাজদের ইউনিয়ন জ্যাক। ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারি মাসের 'ক্যালকাটা মান্থলী জার্নাল'-এর জনৈক ছাত্রের এক পত্র প্রকাশিত হল। তিনি লিখলেন, ইংরাজদের একথা ভাবার অধিকার কে দিল যে তারা আসার আগে ভারতবর্ষ বর্বর ছিল। আমেরিকার সংগ্রামের দৃষ্টান্ত এই কথাই প্রমাণ করে যে ইংরেজদের পরাধীনতার

বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জনের পথই কেবল ভারতবাসীর দুর্গতি দূর করতে পারে।

রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হল, কিন্তু নবজাগ্রত চেতনা স্তব্ধ হল না। সেদিন এই তরুণ বুদ্ধিজীবীদের জীবনাদর্শ যে নবজাগরণের সূচনা করল তারই মর্মবাণী পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামপ্রসূত ছাত্র আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করল এক নতুন আদর্শে। সে আদর্শ হোমারের ইউলিসিসের আদর্শ—আত্মসমর্পণ না করে নতুনকে জানা বোঝা, তাকে অধিগত করার প্রচেষ্টা করা, বাধাকে চূর্ণ করে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার। এই প্রসঙ্গে ১৮৪২-এ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' কাগজ লিখল "পার্থেনন রক্ষণশীল হিন্দুদের চমকে দিয়েছিল এবং তারাও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। কিন্তু নবজাগ্রত চেতনাকে স্তব্ধ করা যায় নি, যায় না।"

এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতির সামাজিক ও চিন্তা রাজ্যের মুক্তি প্রচেষ্টার মাঝে ছাত্র আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হল, পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীক-মুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রামের মাঝে তা ফলে ফুলে শোভিত হয়ে শুধু ছাত্রসমাজ গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তাই নয়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করেছে।

আমরা একটু পেছিয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর কিছু পর থেকে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত কখনও কোন ছাত্র এককভাবে বা কিছুটা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তাদের কাজে ও লেখায় ইংরেজের রাজনৈতিক অনাচার, পরাধীনতা, সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ছাত্রমনের ভাষা প্রকাশ পাওয়া যায়। এইসব প্রতিবাদ ও প্রতিবাদের প্রচেষ্টা, সংগঠন প্রধানত বাংলাদেশেই গড়ে উঠেছিল; তার কারণ সীমিত অর্থে হলেও নবজাগরণের আন্দোলন। রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, তিলক প্রমুখের লেখা, সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক মতামতে বলিষ্ঠ প্রকাশের প্রভাব।

১৯৩৫ সালে হিন্দু কলেজের ১৬ বছরের ছাত্র কৈলাস চন্দ্র দত্ত "শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনায় ভাবতবর্ষ" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় একটি প্রবন্ধ লেখে ও প্রথম হয়। প্রবন্ধটির নাম "১৯৩৫-এ ৪৮ ঘন্টার রোজনামচা"। তার বিষয়বস্তু ছিল ইংরাজ শাসনে, অত্যাচারে অসহ্য হয়ে ভারতীয়রা সশস্ত্র গণবিদ্রোহের মাধ্যমে বড়লাট বুচারকে গদিচ্যুত করে, দেশভক্তদের নিয়ে নতুন সরকার গঠন। কিন্তু বিদ্রোহ পরাজিত হল। দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী নেতা তরুণ বাঙালি মৃত্যুদণ্ড নেবার পূর্বে উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করল যে দেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেওয়ার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না।

(ক্যালকাটা লিটারেরাবী গেজেট, ৬ই জুন, ১৯৩৫)

একই বছর ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে জনসভায় বক্তৃতা করেন ডিরোজিওর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার তরুণ ছাত্র সম্পাদক রসিক কৃষ্ণ মল্লিক। তাব বক্তৃতার মূল বিষযই ছিল এদেশে ইংরেজ মিশনারীদের জনবিরোধী কার্যকলাপ! বক্তৃতায় তিনি বলেন "গরীব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেড়ে নেওয়া হবে? কেন তারা নিরন্ন ও অর্ধ-উলঙ্গ থাকবে; আর বিদেশী শাসনের ও বিজাতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন?

(বেঙ্গল হরকরা, ক্রোড়পত্র, ৬ই জানুয়ারি, ১৮৩৫)

১৮৩৮ সালে ১২ই মার্চ তারিনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়মিত আলোচনার উদ্দেশ্যে

একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ার জন্য সংস্কৃত কলেজে এক সভা আহ্বান করেন। সভায় উপস্থিত ২০০ জনের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র, এদের মধ্যে আবার অধিকাংশই হিন্দু কলেজের ছাত্র। "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল— এই সংগঠনের প্রায় ২০০ জন সভ্যের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিলেন ছাত্র। এই সভ্য তালিকায় পরবর্তীকালে যারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন তারাও ছিলেন, যেমন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা ১৮৪০ থেকে ৪৩ সালের মধ্যে সভ্য ছিলেন এই সভার।

১৮৪১ সালে ছাত্র-যুবকরা আর একধাপ এগিয়ে আধা রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল। সংগঠনের নাম হ'ল 'দেশহিতৈষণী সভা' হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সারদাপ্রসাদ ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। ঘোষিত হল এই সংগঠন হবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়র জন্য। উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষিত হলো "ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই আমাদের শাসক শ্রেণির মতলব ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। এই স্বাধীনতাহীনতাই আমদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। দেশের এই দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশপ্রেম হবে এই ঐক্যের ভিত্তি। সংঘকে পরিচালনা করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে।

(ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, নভেম্বর ১৮৮১)

ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা জর্জ টমসনের উপস্থিতিতে কলকাতার ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবীরা 'বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল। সংগঠনের উদ্দেশ্য ঘোষিত হল—ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের অভাব অভিযোগ রাজদরবারে পেশ করা ও অপশাসনের সমালোচনা করা। সংগঠনের সভাপতি হলেন জর্জ টমসন, সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র ও কোষাধ্যক্ষ রামগোপাল ঘোষ। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪৩ সালের ২৫শে এপ্রিল। জুলাই মাস নাগাদ এই সংগঠন আরও গতিশীল হয়ে উঠল। চাষের ও চাষীদের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় প্রশ্নমালা ছাপা হ'ল। যদিও এই সংগঠন বা উদ্যোগ ক্ষণস্থায়ী হয়, তথাপি বলা চলে ছাত্রদের একাংশের মধ্যে দেশপ্রেম একটা স্থায়ী চেহারা নিতে শুরু করে।

১৮৪৬ সালে হিন্দু কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা সাহসের সঙ্গে লিখল— শাসকের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে তার বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা অনেক মহৎ কাজ।

সামাজিক শৃঙ্খল মোচনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের শুরু হবার ১০ বছর আগেই সাধারণ জ্ঞানোপার্জনিক সভায় ডিরোজিয়র শিষ্য ছাত্র তরুণ মহেশচন্দ্র দেব বিধবা বিবাহের সমর্থনে এক বলিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখেন।

সমাজে এক ঘরে হবার সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই একদল তরুণ ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল। শুধু তাই নয়, মড়া কেটে আধুনিক ডাক্তারি শিক্ষার পথ খুলে দিল।

আজকের নিরিখে হয়ত এগুলিকে ঠিক আন্দোলন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। কিন্তু এগুলির উল্লেখ না করে আধুনিক ছাত্র আন্দোলনের ধারার বৈশিষ্ট্য ধরা যাবে না। উপরোক্ত

ঘটনা, আন্দোলন, বিচ্ছিন্ন একক বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি—

১। কোনও সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন শুরু হবার এমনকি ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম লাভের বহু পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকেই ছাত্ররা সমাজের একটা সচেতন অংশ হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম থেকেই ছাত্র সমাজ নিজেরাই সংগঠিতভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করল। এই সময়ের পূর্বের আন্দোলনের চেহারা ছিল খামখেয়ালী ও লক্ষ্যহীন— ইংরাজি শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছাত্ররা এদেশীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সামাজিক রীতিনীতিকে সহ্য করতে না পেরে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মদ, গরুর মাংস খেয়ে, প্রকাশ্যে দেবমূর্তি ভেঙ্গেও প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেছিল।

৩। এই ধরণের প্রতিবাদের কায়দা আমাদের কাছে বর্তমান অবস্থায় নেহাতই হঠকারী, হাস্যকর, এমনকি ক্ষতিকারক মনে হতে পারে। কিন্তু বোঝা দরকার সেই সময় ব্যাপক কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন না থাকা সত্ত্বেও, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের উঠে দাঁড়াবার একটা দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা প্রকাশ পেয়েছে।

৪। ছাত্র সমাজের এই প্রতিবাদ স্পৃহাই ছাত্রসমাজকে পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে একটা সংগঠিত শক্তি হিসাবে নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে ও তার পটভূমিকাও তৈরি করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু (১৮৫৭-১৯০০)

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ অথবা মহাবিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যে নামেই অবহিত করি না কেন, ছাত্র সমাজের উপর এর কোন প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ বরং এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধ-মতই পোষণ করতেন।

স্বভাবতই তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ছাত্রদেরও এ সম্পর্কে উদাসীন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ছাত্ররা নিজেরাই সংগঠিতভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে বাংলাদেশের মত ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কোন কার্যকলাপ বা সংগঠনের লক্ষণ দেখা যায় নি। তাই এই পর্যায়ে মূলত বাংলাদেশের কথাই বলা হয়েছে। স্বভাবতই ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ও তার গতিপ্রকৃতি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পর্যায়ে ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ চড়া সুরে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে লেখাগুলি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রভাবিত করেছে। অনেক সময় ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের হাতাহাতি, মারামারি হয়েছে। তার কারণ ছিল এ দিকে ফিরিঙ্গি ছাত্রদের ঔদ্ধত্য অন্যদিকে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে জাগ্রত নতুন স্বাদেশিকতা। এই ধরণের সংঘর্ষের কথা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "আমার বাল্যকথা"য় উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক ছাত্র আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমাদের দেশে তার উন্মেষ ঘটে নি। কিন্তু স্বাদেশিকতার একটা বিশেষ প্রকাশ ছাত্রদের অগ্রণী অংশের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।

১৮৭৬ সালে কলকাতায় হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার সময় যুব সমাজেব অগ্রণী উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন কিশোর। পরবর্তীকালে তার স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন যে ঐ সময়ে দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নাটক ছাত্র-যুবসমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্রদের মুখে মুখে তখন শোনা যেত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় দাসত্ব", "শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়" মধুসূদন দত্তের "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে" প্রভৃতি গান।

ভারতে প্রথম ছাত্র সংগঠন

ভারতবর্ষে বোধ হয় প্রথম ছাত্র সংগঠন আত্মপ্রকাশ করল ১৮৫৭ সালে। এই সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আনন্দমোহন বসু ও তরুণ ব্রাহ্ম ছাত্ররা। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মিত্র তার আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন। যে আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পর কিছু ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়। আনন্দমোহনই ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম, সমাজচেতনা, সৎসাহস প্রভৃতি সঞ্চার করতে হলে ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা ছাত্রদের বলেন। কৃষ্ণকুমার প্রমুখ ছাত্রদের এই প্রস্তাব মনোমত হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে এই প্রস্তাবের কথা বলেন। সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সহযোগিতায় কলকাতায় 'স্টুডেন্টস এসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

হিন্দু স্কুলের ঘরে ছাত্র এসোসিয়েশনের সভা হতো। সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিময়ী প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করতেন। স্বভাবতই এর ফলে তরুণ ছাত্রদের মনে দেশপ্রেম, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ইচ্ছা জাগ্রত হ'তে থাকে।

১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখের উদ্যোগে "ভারত সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠা সভায় শতকরা ৭০ জনই ছিল ছাত্র। বিপিন পাল তার "নবযুগের বাংলা" বই-এ লিখেছেন "কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলিকে অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেমন সেকালে শিক্ষানবীশ বাঙালীদের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ ছাত্রমণ্ডলিই সুরেন্দ্রনাথের এবং আনন্দমোহনের রাষ্ট্রনায়কত্বও গড়িয়া তুলিয়াছিল।'

ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশপ্রেম ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা লক্ষ্যণীয়। তিনি তাঁর কিছু ছাত্র ও তরুণ অনুগামীদের নিয়ে "সমদর্শী গোষ্ঠী" প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা অগ্নি সাক্ষী করে শপথ করে— "স্বায়ত্ত্ব শাসনই" আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। ... আমরা জাতিভেদ মানিব না। ... আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না।

"যে যাহা অর্জন করিবে, তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।" (বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা) প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারীদের

মধ্যে ছিলেন পরবর্ত্তীকালের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সুন্দরীমোহন দাস, গগনচন্দ্র হোম প্রমুখ। এই সঙ্গে যুক্ত হন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন, কালীশঙ্কর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ। এরা এই ঘোষণার মধ্যেই কেবল থেকে থাকেন নি— জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বোধহয় এরাই প্রথম গরীব চাষী, চা-বাগানের কুলি-মজুরদের দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন। এদের প্রধান সমর্থকও ছিল কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার অগ্রণী ছাত্ররা।

এই পর্যায়ে খুবই উল্লেখযোগ্য 'ইলবার্ট বিল' সংক্রান্ত আন্দোলন। এতদিন পর্যন্ত খুন-জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মেয়েদের উপর অত্যাচারে অভিযুক্ত ইংরেজ অপরাধীদের বিচার করার কোন অধিকার ভারতীয় বিচারক ও জুরিদের ছিল না। ইলবার্ট বিলে ভারতীয় বিচারকদের এই অধিকার দেওয়া হয়। ফলে এদেশের ইংরেজ চা-বাগানের মালিক, ব্যবসাদার ইংরেজরা ক্ষেপে গিয়ে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। পাল্টা আন্দোলন অর্থাৎ ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ভারতীয়দের আন্দোলন শুরু কবতে হয়। এই আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এলো ছাত্রসমাজ। আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সময় আদালত অবমাননার দায়ে কারাদণ্ড দেওয়া হলে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। শুধু কলকাতা নয় বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত শহরে, এমনকি মফঃস্বলেও স্কুল কলেজের ছাত্ররা সভা, মিছিল, ধর্মঘটে সামিল হয়। স্কুলের ছাত্ররা কালো ব্যাজ পরে এই গ্রেপ্তারের ব্যাপক প্রতিবাদ জানায়। চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় তার পুরানো কথায় লিখেছেন "স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কিছুদিন পরই সুরেনবাবুর জেল হল, আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম। সভা করে বক্তৃতা হল, সব বুঝলাম না, মনে একটা স্থির বিশ্বাস হল যে একটা কিছুর সূত্রপাত হচ্ছে।"

এইভাবেই জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল রেখে ছাত্রদেব মধ্যে চেতনা ও আন্দোলনের বিকাশ ঘটতে শুরু করলো। এই ভাবেই চলল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের সচেতন সক্রিয় ভূমিকা, সর্বোপরি সংগঠিত ছাত্রদের গণসংগ্রামেব বিকাশ ঘটতে শুরু করলো।

ইংরেজ-সৃষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব

ইংরেজরা কোনদিনই এদেশে সকলের জন্য শিক্ষা এই নীতি স্বীকার করে নি। প্রথমদিকে এদেশে শিক্ষা বিস্তার তা যতই সীমিত হোক তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। কোম্পানীর শাসনকালে ১৭৯২ সালে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর-এর উক্তি থেকেই তাদের মনোভাব ও নীতি আমরা বুঝতে পারি। শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, "We had just lost America as our folly, in having allowed the establishment of Schools and Colleges, and it would not do good for us to repeat the same act of folly in regard to India, and that if the natives required anything in the way of education they must come to England for it." লর্ড হেস্টিংস্ এদেশের পুবাতন টোল, মাদ্রাসার শিক্ষা বজায় রাখার পক্ষেই ছিলেন তার জন্য ১৮১৩ সালে এক লক্ষ টাকা খরচ ধার্য করেন।

এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে গোড়াপত্তন করেন ইংরেজ মিশনারিরা। এ দেশীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন, স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ প্রমুখ মনীষীদের অবদান অনেকখানি। প্রকৃতপক্ষে লর্ড বেন্টিঙ্কের রাজত্বকালে এ দেশে পাশ্চাত্য ও ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়। কিন্তু এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের উন্নতি ছিল না, ছিল ইংরেজ শাসনকে দৃঢ় করার প্রয়াস। তাদের শিক্ষানীতির দর্শনগত আদর্শ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হ'ল রাজনৈতিক কারণে। ইংরাজি শিক্ষা এবং ইংরাজিকেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে চালু হল। ইংরাজি শিক্ষা চালু করার উদ্দেশ্য হিসাবে লর্ড মেকলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন "to form a class who may be interpretors between us and the millions we govern and a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinion, words and intellect." এই শ্রেণিই ইংরেজ শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কেরানী ও শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় লোকের যোগান দেবে। ইংরাজদের এই প্রচেষ্টা যেমন একদিকে তাদের স্বার্থরক্ষা করেছে; পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান, আবার জাতীয় চেতনা স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি স্থাপনেও সাহায্য করেছে।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কলেজীয় শিক্ষার প্রকৃত পত্তন হল ১৮৫৬ সালে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে। পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল ১৮৮৭ সালে।

১৯০১ সালে লর্ড কার্জন সিমলায় ইউরোপীয় শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন ডাকলেন। উদ্দেশ্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর নিরঙ্কুশ সরকারী কর্তৃত্ব স্থাপন। কিভাবে ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও আন্দোলনকে বাধা দেওয়া যায়, সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে ১৯০২ সালে আবার সম্মেলন হলো ও তাদেরই সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হল। এই কমিশনের সুপারিশক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হলো। এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর সরকারি কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সদস্য সংখ্যা পূর্বের থেকে কমিয়ে ১০০তে আনা হলে তার মধ্যে ৮০ জনই হবে সরকারের মনোনীত, ১০ জনকে নির্বাচিত করবে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা, আর ১০ জন নির্বাচিত করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ (faculty)। ছাত্রদের স্বাধীন গতিবিধির উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যবস্তু, বই সবই নির্দিষ্ট করার একচেটিয়া অধিকার সরকার তাদেরই বশংবদ মনোনিত সিনেট মারফৎ করায়ত্ত করল।

বড় বড় শহরে ছাত্রদের রাজনৈতিক জাগরণে বাধা দেবার জন্যই কার্জনের এই পরিকল্পনা।

এই সময় বিভিন্ন জাতীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্ররাও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা শুরু করে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হল। তাদের নেতৃত্বে তখনও কোন বৈপ্লবিক গণআন্দোলন রূপ নেয় নি। তখনকার দিনে কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আবেদন-নিবেদন মারফৎ কিছুটা পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা নেবার চেষ্টা করছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত
(১৯০৫—১৯১৮)

ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য

এই সময়কার ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১। রাজনৈতিক আন্দোলনে বৃটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনই এই পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে।

২। ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ থেকে ক্রমান্বয়ে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের রূপ পেয়েছে।

৩। কোন সংগঠন ছাড়াই ছাত্ররা সংগঠিত হয়েছে তবে নেতৃত্ব রয়েছে মূলত জাতীয় নেতাদের হাতে। এই সময় জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম জাতীয় নেতাদের আহ্বানে এগিয়ে এসে সর্বব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনা ঘোষণা করেছে ও আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে একটা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। (Bugler + Pioneer)

৪। ছাত্ররা এই পর্যায়ে নিজেদের চেতনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে নিজেদের উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সাময়িক সংগঠনের রূপ দিয়েছে।

৫। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যখনই বাম ও দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ প্রগতিশীল ভাবধারা ও পশ্চাদপদ আদর্শের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, ছাত্র সমাজের অধিকাংশই অগ্রগামী ও বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গেই নিজেদের একাত্ম করেছে ও সেই মতবাদের জন্য অতুলনীয় আত্মত্যাগ করেছে।

৬। এই সময়কার ছাত্র আন্দোলনের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। এমনকি শিবাজী উৎসবের মত ব্যাপারে ছাত্রদের একেবারেই কোন মতে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় বলেও তৎকালীন ছাত্র নেতারা মত প্রকাশ করেন। কারণ শিবাজী উৎসবে হিন্দুত্বের বাড়াবাড়ি মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে বাংলার ছাত্রদের মধ্যেই এই অগ্রসর মানসিকতার প্রকাশ লক্ষণীয়।

১৯০৫ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি (১৯১৮-১৯) পর্যায় পর্যন্ত ভারতের নানা প্রান্তে ছাত্র জনতার আন্দোলন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হত। ১৯০৬-০৭-এর বয়কট আন্দোলনের সময় বাংলার ছাত্ররা নিজেরাই একটা জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করে এক

সমাবেশে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ যথা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে তুলে দেয়। ছাত্ররাই এই পতাকাটির পরিকল্পনা করেছিল। পতাকাটিতে ৩টি রং— লাল, সবুজ ও হলদে— তাতে আঁকা ছিল ৮টি আধ-ফোটা পদ্মফুল। বলা হয় এগুলি তৎকালীন ভারতের ৮টি প্রদেশের প্রতীক। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক হিসাবে পতাকার গায় আঁকা হয়েছিল সূর্য ও একফালি চাঁদ।

মহারাষ্ট্রের বোম্বাই-এ অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যান্ডকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু এই হত্যাকান্ডের তাৎক্ষণিক কারণ সমর্থনযোগ্য কিনা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এই সময় বোম্বাই অঞ্চলে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তখন হিন্দুদের মধ্যে ইন্‌জেকশন নেওয়া ধর্মীয় সংস্কারে বাধতো। র‍্যান্ড সাহেব হিন্দুদের এই সংস্কারপ্রসূত অনুভূতির কোন মূল্য না দিয়ে জোর করে প্লেগের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করায় এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়। ছাত্র মদনলাল ধিংড়া বিলেতে অত্যাচারী ইংরাজ রাজপুরুষ কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করে ফাঁসিতে গেলেন। ১৯০৫ সালেই লাহোরে King Edward Medical College-এ ইংরাজ ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রভেদজনিত পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সফল ছাত্র ধর্মঘট সম্ভবত **ভারতে প্রথম ছাত্র ধর্মঘট**। এই ধর্মঘট সফল হয়েছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ সত্য পাল— তখন ওখানকার ছাত্র। পরবর্তী সময় পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি।

লর্ড মিন্টোর শাসনকালে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ (বর্তমান তামিলনাড়ু), অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশে ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এইসব বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের যারা প্রাণশক্তি তার একটা বড় অংশ ছাত্র-কিশোর। এবং এই ছাত্র আন্দোলন সব সময়ই দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাই একদিকে গণ আন্দোলনে যেমন ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসেছে, তেমনি দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনেও তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার চেষ্টার জন্য কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, আলিপুর বোমার মামলায় বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই তার সঙ্গে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে জেলের মধ্যে হত্যা করে আত্মদান করেন কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলন ছাত্রদের, যুবসমাজের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারার কার্যক্রমের বিশেষ বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সরকারও তাদের উপর প্রচন্ড দমননীতি প্রয়োগে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু সরকারের দমননীতি যুব, ছাত্র সমাজের মনোবলকে একেবারেই ভাঙ্গতে পারে নি বরং ইংরাজের দমন-পীড়ন যত বেড়েছে, স্বাধীনতার জন্য ততবেশী ছাত্র-যুবসমাজ নির্ভিকভাবে এগিয়ে এসেছে। অবশ্য অনেককেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু তারা সেখান থেকেই ভারতে মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজ করেছেন।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী দুই নেতা লালা লাজপাত রায় ও অজিত সিং-কে নির্বাসন দন্ড দিলে তার প্রতিবাদে লাহোর ও অমৃতসরের ছাত্র জনতা সর্বাত্মক ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানায়। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের ফাঁসির আদেশ হবার পরে ঐ দন্ড মকুব করে তাঁদের আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, তুতিকোরিণ, তিন্নেভেলি প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে

স্বদেশী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পায়। দক্ষিণের দুই বিশিষ্ট নেতা, চিদাম্বরম পিল্লাই ও সুব্রহ্মণ্য শিবের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে ১১ ও ১২ই মার্চের ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট সফল হয়। এই ধর্মঘটে তুতিকোরিণের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শ্রমিকরা ধর্মঘটে যোগদান করেন।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে জীবনরক্ষার জন্য পাঞ্জাবের তরুণ ছাত্র অম্বিকা প্রসাদ, সামসুল হক্ ইরানে পলায়ন করেন এবং ভারতে ছাত্র বিপ্লবীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আর একজন হরদয়াল ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে বার্মাদেশ হয়ে ইজিপ্টে পলায়ন করেন। জার্মানীতে তারকনাথ দাস, চেম্পক রামন পিল্লাই, বঙ্কিম প্রমুখরা ভারতীয় জাতীয় লিগ সংগঠিত করছিলেন। উদ্দেশ্য একটিই, ভারতে বিপ্লবীদের সাহায্য করা।

ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যদিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে মাত্রাহীন হিংস্র আক্রমণ শুরু করল। ১০ হাজারেরও বেশি তরুণকে বিপ্লবী সন্দেহে বিনা বিচারে আটক করা হল; যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র।

এই সময় জাতীয় কংগ্রেস প্রায় সমস্ত রকম আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসে এবং যুদ্ধে সর্বতোভাবে ইংরাজদের সাহায্য করতে সম্মতি জানায়। আশা ছিল, যুদ্ধে জেতার পর ইংরাজরা ভারতকে অন্তত স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেবে। জাতীয় কংগ্রেসের এই আপোষকামী মনোভাব ও নীতি কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারেনি। এই সময় আমেরিকা থেকে 'কোমাগাতামারু' (Komagatamaru) জাহাজে গদর দলের সভ্যরা ভারতে উপস্থিত হলে বজবজের কাছে ইংরাজদের সঙ্গে তাদের খন্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তরুণ ও শিখ ছাত্র। এই দলেরই তরুণ ছাত্র কর্তার সিং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই কর্তার সিং তখন মাত্র ১৮ বছরের যুবক, আমেরিকায় বিমানবন্দরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষানবীশ। এই সময় নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পরবর্ত্তী সময় এম. এন. রায় নামে বিশ্ববিখ্যাত, বিপ্লবের জন্য অস্ত্র সংগ্রহে ভারতের বাইরে পলায়ন করেন। কথা ছিল তিনখানি অস্ত্রভর্তি জাহাজ ভারতের পূর্বতীরের সাগর পারে আসবে। তারা মাদ্রাজ বন্দরের লাইট হাউসে ও তীরবর্ত্তী কয়েক স্থানে গোলবর্ষণ করে ইংরাজ সৈন্যদের দিকভ্রান্ত করবে এবং আন্দামান থেকে বিপ্লবী বন্দিদের মুক্ত করে ভারতের মাটিতে অবতরণ করবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা ও পরিকল্পনার ভুল জার্মান সরকারের অস্ত্র দেবার মিথ্যা আশ্বাসের পরিণতিতে বুড়িবালামের তীরে যে অস্ত্রের জাহাজ কোনদিনই আসবে না, তেমন জাহাজ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘাযতীন সহ (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) যে সব বীর তরুণ ইংরাজদের সঙ্গে অসম সম্মুখ যুদ্ধে আত্মদান করেন, তারাও ছিলেন তরুণ ও ছাত্র। এই সময়ই স্থির হয়েছিল গদর দল লীগের ১৫০০ থেকে ২০০০ যারা চীন, শ্যাম, মালয়ে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিলেন তারা বঙ্গদেশের পৈলী রোড ধরে ভারত আক্রমণ করবে। কারণ তাদের ধারণা ছিল, তারা উপস্থিত হলেই এখানকার ভারতীয় সৈনিকরা বিদ্রোহ করে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং তা'হলে ভারতে অবস্থিত অল্প সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যকে তারা অনায়াসে বিতাড়িত করতে পারবে। এই উদ্যোগে যারা বিশেষ উদ্যোগী ও নেতৃস্থানীয় তারা হলেন কর্তার সিং, বাসু, বিষ্ণু, গণেশ, পিংলে, আলি আহমেদ সিদ্দিকী, এইচ্ ফারুকী আলি প্রমুখ। এরা সবাই ছিলেন তরুণ,

হয় তখনও ছাত্র, অথবা ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে ছাত্র ছিল, না হয় শিক্ষক। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারীরাও ছিলেন প্রায় সকলেই ঐ পর্যায়ের।

এই সময় কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ভেদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সেভাবে ভারতের রাজনীতিকে গ্রাস করতে পারেনি। তাই বিভিন্ন স্থানের মুসলিম ছাত্ররা ভারতকে স্বাধীন করার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। যেমন উত্তরপ্রদেশের দেওবন্ধ বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী মাহমুদ উল হাসান ও তার সহকর্মী মৌলানা উবাইদুল্লা ইংরাজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৯১৫ সালে উবাইদুল্লা ১৫ জন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান বালুচিস্থানে ও সেখানে এক স্বাধীন সরকার গঠন করেন। তারা বিশাল ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর চাপ সহ্য করতে না পেরে আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে আশ্রয় নেন। সেখানে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলানা বরকততুল্লাহ প্রভৃতির সহযোগিতায় এক অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন। এরা কাবুল থেকে রেশমী রুমালে সাংকেতিক লিপি ব্যবহার করে ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় গোপনে প্রচার চালাত।

১৯১৬ সালে ইংরাজ গোয়েন্দারা এই প্রচেষ্টা ধরে ফেলে এবং ঐ সালেই শুরু হল 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র মামলা'। মাহমুদ উল-হাসানকে সুদূর মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ভারতে তৎকালীন 'আল হেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সহ বহু তরুণ জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। বাংলাদেশ সহ ভারতের ছাত্র, যুব সমাজের ত্যাগ সাহস ও আত্মদানকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে' লিখলেন—

"মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি, এমন কোন দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে ... আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি, যে বাংলাদেশের এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। ... তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চশিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধি সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্ত পত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই। ... এই রকমের দৃঢ় সংকল্প, বিষয়বুদ্ধিহীন, কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ।" (কালান্তর, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)

এই সময়ের ছাত্র আন্দোলন ত্যাগে, সাহসে, আত্মদানে ছাত্র সমাজের অবদান ও গৌরব অতি মহৎ; কিন্তু প্রথম যুদ্ধের অবসানের পরে ছাড়া ছাত্রদের সত্যকার নিজেদের কোন ব্যাপক সংগঠন বা স্বকীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলন রূপ পায়নি। যে যুগ আরম্ভ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রধানত ১৯১৯ সাল থেকে।

তবে ১৯১৯ পূর্ব ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা বোধহয় অবান্তর হবে না। প্রথমত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ইংরাজ পণ্য বয়কট আন্দোলন ছাত্রদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, যার ফলে তাদের মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তারা বেশি বেশি করে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে চলে যায়। যে ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে তাদের শাসন, ইউরোপীয় ভাবধারা, আচার আচরণ, শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে নব্য বাবুদের চোখ ধাঁধিয়েছিল—সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্ত্তী যুগে তার প্রভাব ও আবেশ দ্রুত কাটতে শুরু করে। ইংরাজদের শাসন ও শোষণের চেহারা যত প্রকট হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজও নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশা বোধ করতে শুরু করে।

ফলে একদিকে তারা ইংরাজ শাসন সম্পর্কে হয়েছে মোহমুক্ত, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর সন্দিহান। দ্বিতীয়ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলন ছাত্রদের নবীন মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্র অংশগ্রহণের সংখ্যা দেখলেই তার প্রমাণ মেলে। তৃতীয়ত স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লবী কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার ফলে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার গুণগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই চেতনার উন্মেষ ও সুনির্দিষ্ট রূপ পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন বিদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন, বিশেষভাবে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। রুশ বিপ্লবের ফল দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের আদর্শ, এমনকি ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী দেশেও মুক্তি সংগ্রামকে প্রভাবিত করতে শুরু করল। ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ ক্রমান্বয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভাবধারায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হতে লাগল।

তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে একদিকে যেমন স্বাধীন গণছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনের বিকাশ ঘটল; তেমনি পাশাপাশি ছাত্রদের মধ্যে সমাজ বিকাশের ধারা ও স্বাধীন ভারতে সমাজ বিন্যাসের ধারণার ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রাম ও তৎজনিত সমস্যারও উদ্ভব হতে লাগল।

বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত ও তার প্রতিক্রিয়া

ইতিহাসে আমরা দেখেছি রাজনীতি আর সেই রাজনীতি যদি আদর্শগতভাবে ত্যাগ, আত্মত্যাগ ও সেই সঙ্গে প্রয়োজনে নিজেদের রক্ত দিয়েও ইতিহাস তৈরী করার আহ্বান জানায়, ছাত্রসমাজ অতি দ্রুত আদর্শগতভাবে সেইদিকে আগত হয়। ছাত্র রাজনীতির এই বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের। কিন্তু এব পিছনে দীর্ঘ প্রচেষ্টা, নানাভাবে প্রগতিশীল আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, সময় সময় আন্দোলনের অগ্রগামী অংশের ভূমিকাও ছাত্ররা গ্রহণ করে থাকে। পূর্বের অধ্যায়ে ভারতবর্ষে তার বীজ কিভাবে ছাত্রদের মধ্যে গ্রথিত হয়েছিল উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত গণমুখি হবার সঙ্গে যে বারবার জঙ্গী চেহারা গ্রহণ করেছে, এবং প্রগতিশীল ভাবধারাতেই প্রধানত নিজেদের যুক্ত করেছে, তার পটভূমিকায় মনে রাখা দরকার আমাদের দেশের তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অবদান। সেই সঙ্গে ইটালীর মুক্তি আন্দোলনের পুরধা গ্যারিবল্ডি মাৎসীনি, আয়ারল্যান্ডের সিন ফিন দলের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, জারশাসিত রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য। পরবর্ত্তীকালে অবশ্যই রুশ বিপ্লব, ডঃ সান ইয়েৎ সেনের নেতৃত্বে চীনের মুক্তি সংগ্রাম ও ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন ভারতের ছাত্র আন্দোলনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুর দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছাত্রদের কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল রাউলাট রিপোর্টে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অপরাধে ইংরাজদের হাতে ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে নিহত-ধৃত-দন্ডিত শতকরা ৮২ জনের বয়স ১৬ থেকে ৩০। আর এর মধ্যে শতকরা ৪৫ জন ছাত্র অথবা শিক্ষক। ইংরাজ সরকারের সিডিসন কমিটির রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করা হয় যে মাধ্যমিক ইংরাজি স্কুল ও কলেজগুলিই বিশেষ

করে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কর্মী সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হত। কিন্তু এই পর্যায়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের একক অংশগ্রহণকে ছাত্রদের গণআন্দোলন বলা চলে না। ইংরাজদের শাসননীতি ক্রমে ক্রমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিজস্ব দাবি-দাওয়াকে ভিত্তি করে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে শুরু অবিভক্ত বাংলাপ্রদেশে। তৎকালীন ভারতের বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনের উৎসাহী সমর্থনে ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর ইংরাজ সরকার বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করলেন। অনেকদিন থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণকে বিপদজনক মনে করে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলা ভাগের কথা ভাবতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সাল থেকেই ইংরাজ ভারত শাসনের ক্ষেত্রে Divide and Rule নীতির পত্তন করে। তার কিছু ইতিহাস আমরা ভারতে সাম্প্রদায়িক ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের জন্ম ও কার্যকলাপ আলোচনার সময় কিছু কিছু তথ্য আলোচনা করব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯০৩ সালে বাংলাদের তৎকালীন ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবই বাংলা ভাগের প্রস্তাব দেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে ঢাকা, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ (বরিশাল) ফরিদপুর বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হোক। এর ফলে পূর্ব বাংলার জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তি একদিকে দুর্বল হবে তার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তফাতকে আরও ব্যাপক করা যাবে। কারণ ঐক্যবদ্ধ বাংলা ইংরাজদের পক্ষে বিপদজনক। ফ্রেজারের সমর্থনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মিঃ রিজলি মন্তব্য করেন : ''বিভক্ত বাংলাদেশ আমাদের তেমন বিপদে ফেলতে পারবে না।''

ভারতের তদানীন্তন বড়লাট কার্জন সব সময়ই বঙ্গভঙ্গের একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ সমর্থনে লর্ড কার্জন লিখলেন ''বাঙালিরা নিজেদের একটি জাতি হিসাবে গণ্য করে, ইংরাজ রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন তারা দেখে। বাঙালিরা জানে বাংলাদেশ বিভক্ত হলে তাদের ঐ স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। তাই বঙ্গভঙ্গ অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে— এই মুহূর্তে এই কাজ না করে আমরা যদি পিছু হটি, তাহলে আর কোনোদিনই বাংলাকে দু-ভাগ করতে পারব না।'' লর্ড কার্জনের আক্ষেপের যে কোন কারণ ছিল না সে ইতিহাস আমরা পরে পাব। বঙ্গভঙ্গের পিছনে অবশ্য মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটানো। ১৯০৪ সালেই লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলা সফর করেন ও পর পর বৈঠক করে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান সমাজকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে বাঙালি মুসলমানদের আধিপত্যে একটি আলাদা প্রদেশ হবে, যার ফলে সেখানে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্যই মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের একটা অংশ এই প্রচারে সাড়া দেন নি। তাঁরা স্পষ্টই বললেন যে, ইংরাজদের মতলব হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক নরককুণ্ডে পরিণত করা। তবে পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চলে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেহারা দেখে একথা বলা যায় না যে কার্জনের প্রচার একেবারেই নিস্ফল ছিল। বিশেষ করে স্মরণে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক ক্ষেত্রে সব সিদ্ধান্তই নির্ভর করে আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগের যে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, যাই হোক তাদের উপর। যদিও সব কাজ হয় জনগণের নামে। এর কারণ আজও আমাদের দেশে এমন কোন রাজনৈতিক দল হয়নি যারা আগাপাশতলা এই শ্রেণির দখলে নয়। স্বভাবতই ছাত্র আন্দোলনে এই চেহারা আরও প্রকট ও ব্যাপক বলা যেতে পারে।

যাই হোক বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করে তৎকালীন ভারত সচিব সদম্ভে জানালেন : বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এর কোন রদবদল হবে না।

কিন্তু বাংলাদেশ ভাগের সরকারী আদেশনামা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নয় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখা দিল। স্বভাবতই বাংলাদেশে এই বিক্ষোভ সর্বাত্মক ও ব্যাপক রূপ নিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে ছাত্ররা হাজারে হাজারে স্কুল কলেজ থেকে বেড়িয়ে এসে যোগ দিল এবং বলা চলে, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রতিবাদ সংস্কারের জন্য আন্দোলনের গন্ডী ছাড়িয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ব্যাপক সংগঠিত গণ-চরিত্র পেল। অবশ্য তখনো পর্যন্ত সেভাবে কোন ছাত্র নেতৃত্ব বা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। নেতৃত্ব অবশ্যই ছিল তৎকালীন জননায়কদের হাতেই, তাদের আহ্বানেই ছাত্ররা দলে দলে আন্দোলনে অংশ নেয়।

এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিলেন তারা হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, রংপুরের উমেশচন্দ্র গুপ্ত, রাজশাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের যোত্রমোহন সেন। এই সময় ছাত্র-যুবকদের সর্বাধিক প্রিয় নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, ব্যারিস্টার আবদুল রসুল প্রমুখ।

এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিশেষ ভূমিকা নিলেন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিনটি জাতীয় শোক ও প্রতিবাদের দিন হিসাবে পালিত হল। বিশাল জনসভায় বঙ্গভঙ্গ না মানার প্রতিজ্ঞাপত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই পাঠ করেন। ১৯০৫ সালের রাখী-পূর্ণিমার দিন হিন্দু-মুসলমানসহ সকল শ্রেণির তরুণদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ রাখী-বন্ধনের বিশেষ উৎসবের প্রবর্তন করলেন। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের রচিত, "বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান", "বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক এক হোক হে ভগবান" ছাত্র-যুবকের মুখে মুখে গীত হতে লাগল। এই আন্দোলন এক নতুন মোড় নিল ব্রিটিশ পণ্যের গণ-বয়কট আন্দোলনের ডাকে।

কলকাতার ইডেন হোস্টেলের ছাত্ররা হোস্টেল প্রাঙ্গণে ব্রিটিশ পণ্য ও লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ করার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সূচিত করল। বিশাল ছাত্র সভায় শ্রী হরিন্দ্রনাথ দত্ত বক্তৃতা করলেন। ছাত্ররা ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলনকে আরও এগিযে নিয়ে গেল ইংরাজদের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করার উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ বয়কট করার ডাক দিয়ে। এই ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিল বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। তারা বিভিন্ন পরীক্ষায় বসতে অসম্মতি জানাল। ছাত্রদের পরীক্ষা-স্কুল-কলেজ বযকট আন্দোলন কলকাতা ছাডিয়ে নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন শিক্ষাসচিব কার্লাইল আদেশ জারি করলেন যে—যারাই এই আন্দোলনে যোগদান করবে তাদেরই সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এই সার্কুলার আন্দোলন বন্ধ তো করতে পারলই না, বরং ফল হয় ছাত্ররা সরাসরি এই সার্কুলার মানতে অস্বীকার করল।

স্থাপিত হ'ল সার্কুলার বিরোধী ছাত্র সংস্থা (Anti Circular Societies)

রংপুরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শচীন্দ্রপ্রমাদ বসুর নেতৃত্ব বয়কট আন্দোলন সর্বাত্মক রূপ নিল। উত্তরবঙ্গসহ ঢাকা, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়লেও

বরিশাল জেলায় বয়কট আন্দোলনের ব্যাপকতা সব জেলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর মূলে ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের ছাত্রদের মধ্যে একটানা দেশাত্মবোধক গঠনমূলক কাজ। এই বয়কট আন্দোলন যেমন একদিকে বিলাতী বস্ত্র ও পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে নতুন ও ব্যাপক জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটল; তেমনি তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি জানা দেশের একটা অংশকে ইংরাজভক্ত সেবক তৈরি করার বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য এক নতুন চেতনা সমগ্র দেশব্যাপী প্রবাহিত হল। তার সীমানা বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতেই তার প্রভাব পড়ল। ইংরাজ সরকার পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মারফৎ জাতীয়তাবাদের চরম অবমাননাকর সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিবাদে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য National College এবং University গড়ে উঠল। অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী বসু প্রমুখ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষীরা I.C.S.-এর মত উচ্চরাজপদ পরিত্যাগ করে এই নবীন জাতীয়তাবাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এই পর্যায়ে কংগ্রেসের মধ্যে নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ একটা বিশেষ মাত্রা লাভ করে। নরমপন্থীদের ইংরাজদের কাছ থেকে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কিছু সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টাকে চরমপন্থীরা মেনে নিতে পারেনি। চরমপন্থীদের নেতৃত্বে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন মারফৎ কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও I.C.S. প্রভৃতি পদে উপরতলার ভারতীয়দের কিছু প্রবেশের পথ করে নেবার প্রচেষ্টাকে মোটেই গ্রহণ করতে পারেনি। তারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই সমস্তরকম আন্দোলনের পথেই যুব সমাজকে পরিচালিত করতে চাইছিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থীদের গণআন্দোলন বিমুখতা ও আপোষনীতি দেশের ছাত্র-যুবদের মধ্যে এক হতাশার জন্ম দিল। কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এইসময় গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মানসিকতা ও তার পটভূমিকাকে বিশেষ শক্তিশালী করে তোলে। ছাত্ররাও বেশ বড় সংখ্যায় এইসব আন্দোলনে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে বিশেষ করে লর্ড মিন্টো যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল তখন সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করেছে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তামিলনাড়ু, অন্ধ্র অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশে এর ব্যাপকতা ছিল অনেক তীব্র। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ১৫ বছরের ছাত্র সুশীল সেনকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে। এই অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট মুজাফরপুরে বদলী হলে, সেখানে তাকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২০-এ এপ্রিল হত্যা করার চেষ্টা অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয় এবং তার সহযোগী গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করেন। এই সময় বালগঙ্গাধর তিলক এক প্রবন্ধ লেখেন যে বোমার আঘাতে ইংরাজের সামরিক শক্তিকে গুড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এই প্রবন্ধের জন্য তার ৬ বছর জেল হল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে ইংরাজ সাম্রাজ্যের রাজধানী সরিয়ে দিল্লিতে নেবার ঘোষণা করা হল। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ যে সভায় এই রাজকীয় ঘোষণা করলেন, সেই সভায় তাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলেন রাসবিহারী বসু। তিনি পলাতক হলেন। এইসব ঘটনাই ভারতের ছাত্রমনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত (১৯১৮-১৯৩৯)

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯১৮ সালে জার্মানী ও তার সহযোগী বিশেষভাবে তুর্কিদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হল।

জার্মানী পদানত। তুর্কি সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি পরাধীন জাতিগুলির সামনে কোন আশার আলো জ্বালালো না। বরং সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ আরও প্রবলভাবে তাদের গলায় পরাধীনতার ফাঁসকে অধিকতর দৃঢ় করার চেষ্টা করল এবং এই সময়কার বিশ্বের সম্পর্কে আমাদের কিছু ঘটনা ও ব্যবস্থার উল্লেখ করতেই হবে। কারণ তার প্রভাব আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সেই সঙ্গে ছাত্র সমাজও ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। ইজিপ্ট সহ মধ্য প্রাচ্যের অতীত তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলির প্রতি ঘোষণার মাধ্যমে "ম্যানডেট প্রথার নামে" চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হ'ল। ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে তাদের ভাগ বাটওয়ারা করে দেওয়া হল। জার্মানীর উপর ভার্সাই সন্ধির শর্ত খুশীমত চাপিয়ে তাকে কোনঠাসা করে রাখার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেখানে উগ্রজাতিয়তাবাদের উজ্জীবনের রাস্তা তৈরি করা হল। অবিলম্বে নবজাগ্রত সমরবাদ ও হিটলারের অভ্যুত্থানকে নানাভাবে সাহায্য ও সমর্থনের মধ্য দিয়ে তার আগ্রাসী ক্ষুধাকে আরও উগ্র করে তুলতে সাহায্য করল সাম্রাজ্যবাদীরা। সর্বোপরি নাৎসীবাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী সামরিক শক্তিকে কিভাবে নবগঠিত সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, চলল তার নানা চক্রান্ত। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও আমেরিকার দ্বারা ইতিমধ্যে লুণ্ঠিত চীনের উপর জাপানী সমরবাদী ও সাম্রাজ্যলিপ্সুদের কুৎসিত বর্বরচিত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ২১ দফা দাবি ও অধিকারকে তথাকথিত ওয়াশিংটন সম্মেলনে ১৯২১ সালে সাম্রাজ্যবাদীরা নির্লজ্জভাবে স্বীকৃতি জানাল। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর ইটালি আবিসিনিয়া দখল করে নিল বিনা বাধায়। ইউরোপের নানা দেশে যেমন পোলান্ড, হাঙ্গেরী, ফিনল্যান্ডে ফ্যাসীবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই অবস্থার মধ্যে একমাত্র সদ্যজাত সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের পরাধীন জাতি ও শোষিত মানুষের সামনে মুক্তির এক অম্লান উজ্জ্বল আলোর শিখায় উদ্ভাসিত হল। ১৯১৭ সালের রুশদেশের বিপ্লব, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ; মুষ্টিমেয় মানুষ ও জারতন্ত্রের শোষণ ও পেষণের হাত থেকে সকল মানুষের মুক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কার্যক্রমের সাফল্য স্বাধীনতাকামী দেশগুলির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এই অবস্থার দ্বারা

বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মত ভারতকেও দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি ইংরাজ সরকার দিয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের নামে ১৯১৯-এ এক ভারত শাসন আইন উপস্থিত করা হল। যা আসলে ভারতীয়দের কোন আশাই পূরণ তো করলই না। উপরন্তু, হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী প্রথার প্রবর্তন করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতে কিছু কিছু ভারতীয় পুঁজির শিল্প স্থাপন ও তার বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে বাধ্য হয়েছিল; যেমন টাটার স্টীল কোম্পানীকে Protection, আমেদাবাদে ভারতীয় পুঁজিতে কাপড়ের কল স্থাপন প্রভৃতি। পুনরায় ঐ নীতিকে পরিত্যাগ করে ভারতীয় শিল্প বিকাশের দাবি ও পথকে উপেক্ষা করা হল। স্থাপিত করা হল ইংরাজ পুঁজিতে বেশ কিছু বেনিয়া কোম্পানী যারা ভারতের কাঁচা মাল বিলেতে চালান করবে এবং বিলেতের তৈরি মাল চড়া দরে ভারতের বাজারে বেচবে।

এই পটভূমিকায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারত শাসন আইনকে হতাশাব্যঞ্জক, অসন্তোষজনক ও যথেষ্ট নয় বলে প্রত্যাখ্যান করল। ইংরাজ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে ভারতীয়রা এবং সেই সঙ্গে ছাত্র সমাজ এই প্রবঞ্চনা বিনা বাধায় স্বীকার করে নেবে না। তাই যে কোনো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য ইংরাজ সরকার এক উৎপীড়ক আইন প্রণয়ন ও চালু করলেন। ইতিহাসে এই আইন কুখ্যাত রাউলাট আইন নামে খ্যাত। যে কমিটি এই আইনটি রচনা করে তার সভাপতি ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী রাউলাট সাহেব। আর তার একমাত্র বাঙালি সদস্য হলেন আইনজীবী শ্রী প্রভাস চন্দ্র মিত্র। ১৯১৯ সালেই এই আইন চালু করা হল। এই আইনে সরকার খুশিমত কেবল সন্দেহের বসে গ্রেপ্তার, বিনাবিচারে আটক সহ নানাবিধ উৎপীড়ন ও দমনমূলক ব্যবস্থা চালু করল। ফলে দেশের সর্বস্তরের মানুষই এই আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে লাগল। রাজনৈতিক দমন-পীড়নের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধে ক্ষত নিরাময়ের জন্য অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র করা হল। এই সঙ্গে তুরস্ক, আরব জগতে স্বাধীনতা হরণের জন্য সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় চলছিল বৃটিশ ও ফরাসীসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সশস্ত্র আক্রমণ। এর ফলে ভারতের মুসলিম জনমতও ইংরাজ বিরোধী হয়ে ওঠে। আবুল কালাম আজাদ ঘোষণা করলেন বিদেশি দাসত্বকে কোন মুসলমান মুহূর্তের জন্য মেনে নিতে পারে না। রাউলাট আইনকে ধিক্কার জানালেন সারা ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। এই সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন। গান্ধীজী সহ সর্বভারতীয় নেতারা রাউলাট আইন বিরোধী কমিটি গঠন করে আন্দোলনের ডাক দিলেন। তারা ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালন ও ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানালেন। তারা ডাক দিলেন— রাউলাট আইনকে অকেজো করে দাও।

ইতিমধ্যে গুজরাটের কহবা জেলা ও বিহারের চম্পারনে নীলকর সাহেব ও অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান কৃষক, চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করে এক প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের উৎস মুখ খুলে দিলেন। এতদিন পর্যন্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও বিত্তবান জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল। এই প্রথম গান্ধীজী আন্দোলনকে দেশের অতি সাধারণ মানুষ, গ্রামের কৃষক চাষীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেন। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন হয়ে উঠল গণমুখী, ব্যাপক গণ-ভিত্তি গড়ে উঠল স্বাধীনতা আন্দোলনে। যদিও ১৯২৯ সালের পূর্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেনি, কিন্তু ১৯১৯-এর রাউলাট আইন বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯২০-২১ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য প্রভৃতি দেশের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলনের উৎস মুখ খুলে দেয়। ছাত্র সমাজও এই সময় থেকে হাজারে হাজারে আন্দোলনে সামিল হতে শুরু করল। সেই সঙ্গে গড়ে উঠতে লাগল তাদের নিজস্ব সংগঠন, আন্দোলন ও তাদের নিজস্ব স্বাধীন দাবি দাওয়ার আন্দোলনও এই সময় থেকেই উঠতে থাকে— ছাত্র আন্দোলন ছাত্রদের জন্য ছাত্রদের নিজস্ব, ছাত্রদের দিয়েই এবং জনগণের সেবার জন্য আন্দোলন— "Student movement is the movement for the Students, of the Students, by the Students and is Service to the people."

অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ

ছাত্র সমাজ এই সময় ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ খুঁজছিল। রাউলাট আইন বিরোধী আহ্বানে তারা ফেটে পড়ল। লাহোর অমৃতসর থেকে শুরু করে কন্যাকুমারিকা, বোম্বাই থেকে কলকাতা— সর্বত্রই ৬ই এপ্রিল ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করল। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। ইংরাজের দমননীতি আরও তীব্র হল।

পাঞ্জাব

১৯১৯ এ রাওলাট আইন ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। দেশের সর্বত্র বিশাল বিশাল সভা, শোভাযাত্রা ও ৬ই এপ্রিলের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হল। লাহোরে সেই সময়কার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্ররা কার্যত অহিংস বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ছাত্ররা ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অভূতপূর্ব তৎপরতা দেখাল। কেবলমাত্র ছাত্রদের নিয়েই গড়ে উঠল বিশাল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। শুধু লাহোর নয়, অমৃতসর সহ সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের ছাত্র সমাজ সর্বত্র প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যখন মনে হতে লাগল পাঞ্জাবে ইংরাজ শাসনের অবসান বুঝি আসন্ন। অন্যদিকে পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ার এই গণঅভ্যুত্থান দমনের জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা নিলেন। এমন কি সাধারণ মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য আকাশে সামরিক বিমান ওড়ান হল। কলেজ, স্কুল, ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের ওপর হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি করা হতে লাগল। হিন্দু, শিখ, মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ বিশাল সভা এবং ইংরাজ শাসনের ও মাইকেল ওডায়ারের দমননীতির বিরুদ্ধে সর্বসম্মত প্রস্তাব প্রতিদিনের ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল।

লাহোরের বাদশাহী মসজিদ হয়ে দাঁড়াল বিশাল বিশাল জনসভার স্থান। এই রকম একটি জনসভা থেকে যখন একদল ছাত্র ফিরছিল, তখন হঠাৎ পুলিশ তাদের পথে আটক করে এবং বিনা প্ররোচনায় পেটাতে শুরু করে। খুসীরাম নামে একটি ছাত্রকে সামনে থেকে গুলি করতে

থাকে— ৭ বারের পর ৮ম গুলিতে খুসীরাম রক্তের অঝোরধারায় লুটিয়ে পড়ল। পাঞ্জাব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশ্ব যুব ফেডারেশনের প্রতিনিধি তাদের বিবৃতিতে বলেছেন— খুসীরামের দেহ শ্মশানে নেবার সময় সঙ্গীরা সচক্ষে দেখেছেন, ৮টি গুলির একটি গুলিও খুসীরামের পিঠে লাগেনি, লেগেছে তার বুকে এবং মালা পড়িয়ে দিয়েছে। খুসীরাম সামনে দাঁড়িয়েই জীবন দিলেন, পিছন ফেরেনি। খুসীরাম হলেন পাঞ্জাবের প্রথম ছাত্র শহিদ। এই ধরনের বর্বর ঘটনা এর আগে সারা দেশে কোথাও ঘটেনি। এই ঘটনায় সর্বস্তরের মানুষ, ছাত্র সমাজ ক্ষিপ্ত হলেও গান্ধীজীর অহিংসার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা অহিংস প্রতিবাদেই মুখর হলেন। এরপরই এল ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিলের মর্মান্তিক কালো দিন। অমৃতসরের জালিয়ানাওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। এই প্রসঙ্গে জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাঞ্জাবে জলসেচের জন্য খালের জলের উপর অত্যাধিক করেব বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছিল। শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা তখন প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম সারিতে। সারা পাঞ্জাবে চলেছে ধর্মঘট, সভা, সমিতি। অমৃতসর শহরকে কেন্দ্র করে চলেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যকলাপ। এই অবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা "স্বায়ত্তশাসন" মিলল না। তার পরিবর্তে নেমে এল সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খা পিষে মারার জন্য ভারতরক্ষা আইন, রাউলাট আইনের মত চরম দমনপীড়নের ব্যবস্থা। তারই সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, মুদ্রাস্ফীতি, মহামারী সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে পাঞ্জাবের কৃষক জীবনে নিয়ে এল চরম দুর্দিন। এমনি একটা সময়ে, বৈশাখ মাসের বৈশাখী উৎসব, ঐ উৎসব পাঞ্জাবে ফসল কাটার উৎসব। গম, জোয়ার, সরিষার গন্ধে ভরে ওঠে পাঞ্জাবের আকাশ-বাতাস। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে সামিল হয় এই বৈশাখী উৎসবে। সেই বৈশাখী উৎসবের দিন জালিওয়ানওয়ালা বাগের ইট, কাট, পাথর ভরা মাঠে ২০ হাজার মানুষ সরকারী দমননীতি ও নানাবিধ অন্যায় ও অসুবিধার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদ জানাতে একত্রিত হয়েছিলেন। এই সময় আর দুটি ঘটনা গুরুত্ব পায়। অমৃতসরের কোন একটি রাস্তায় একজন ইংরাজ মহিলা নাকি কয়েকজন ভারতীয় দ্বারা অপমানিত হন— তাই পাঞ্জাবের তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ার আদেশ জারি করেন যে, এই রাস্তায় কোন ভারতীয় পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না। ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে হলে বুকে হেঁটে যেতে হবে। এই সমস্ত বর্বরোচিত কাজ ও আদেশের প্রতিবাদেই যখন সভা চলছিল এবং সভায় তখন পাঞ্জাব কৃষক ও সকলের প্রিয় নেতা হংসরাজ বক্তৃতা করছিলেন। ঠিক তখন ভারতে জন্ম ইংরাজ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ই. এইচ ডায়ারের (E. H. Dyer) নেতৃত্বে একদল সেনা মাঠ ঘিরে কোন রকম হুঁশিয়ারি ছাড়াই বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করল। পরবর্তী সময় হান্টার কমিশনের রিপোর্টে জানা যায় জানোয়ার ডায়ারের জানোয়ার সৈন্যরা ১৬৫০টি গুলি চালিয়ে ১৫১৬ জনকে হত্যা করেছে। এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হল সারা দেশ, শুরু হল সমগ্র ভারতে অভূতপূর্ব বিক্ষোভ। কবি রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভে ইংরাজদের দেওয়া স্যার উপাধি বর্জন করলেন। গান্ধীজী ইয়ং ইন্ডিয়ায় লিখলেন— "এই শয়তান সরকারের সংশোধন অসম্ভব। একে ধ্বংস করতে হবে। শোনা যায় সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে জনসভায় পিস্তল হাতে প্রতিজ্ঞা নিলেন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই ইংরাজদের ভারত ছাড়া করবেন। সরোজিনী

নাইড়ুর কবিতা মানুষের মুখে মুখে চলল। সুদূর সোভিয়েত রাশিয়া থেকে লেনিন অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড একটি ১৯ বছরের যুবক ও ১২ বছরের একটি স্কুল ছাত্রের জীবনে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন। ১৯ বছরের তরুণটি হলেন উধাম সিং। উধাম সিং জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। ওইখানে দাঁড়িয়েই তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন, যারা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের। দীর্ঘ ২১ বছর প্রতিক্ষা ও নিরলস প্রচেষ্টার পর ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে মাইকেল ওয়াডারকে হত্যা ও জেটল্যান্ডকে আহত করে প্রতিশোধ নিলেন। ১৯৪০ এর ৩১শে জুলাই পেন্টভিল কারাগারে ইংরাজরা এই মহান দেশপ্রেমিককে ফাঁসির দড়িতে হত্যা করল।

১২ বছরের স্কুল ছাত্রটি হলেন মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং। তিনি পরের দিন স্কুল না গিয়ে জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তরঞ্জিত মাঠে উপস্থিত হয়ে ঐ মৃত্তিকা স্পর্শ করে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিলেন। সঙ্গে করে বাড়ি ফিরলেন এক মুঠো জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তরঞ্জিত মাটি। গৃহে রক্ষিত ঐ মৃত্তিকা প্রতিদিন তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে অবিশ্বাস্য মানসিকতার সঙ্গে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মরণজয়ী সংগ্রামের।

জালিয়ানওয়ালা বাগেব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবে মিলিটারী শাসন (Martial Law) জারী করা হল। মিলিটারী শাসনে সর্বাগ্রে আক্রান্ত হল পাঞ্জাবের ছাত্র সমাজ ও তাদের শিক্ষায়তনগুলি। ছাত্রদের উপর নেমে এল চূড়ান্ত বর্বর অত্যাচার। অমৃতসরে প্রতিদিন ছাত্রদের মিলিটারী শাসকদের কাছে পায়ে হেঁটে ৪ বার উপস্থিতি জানাতে বাধ্য করা হল। এপ্রিল-মে মাসে পাঞ্জাবে অসহনীয় গরম। ছাত্রদের সাইকেলগুলো সামরিক কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করায় বহু ছাত্রকে ঐ নিদারুণ গরমে ১৫ মাইল পায়ে হেঁটে উপস্থিতি দিতে হত। বাধাবিচারহীন গ্রেপ্তার, কারাগারে বিনাবিচারে আটক, এমন কি বহু ছাত্রকে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। অগণিত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হল। হাজার হাজার ছাত্রকে জরিমানা করাই কেবল হল তাই না, নির্দয়ভাবে তাদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হল। লাহোরে কিছু ছাত্র সামরিক কর্তৃপক্ষের গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পেলেও তাদের কয়েকশ মাইল দূরে বিভিন্ন জেলায় পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। লাহোরে শান্তনা ধর্ম কলেজের ছাত্রাবাস থেকে ২৫০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিছানা বাক্সসহ সমস্ত মালপত্র মাথায় চড়িয়ে ৭ মাইল ঐ গরমে হাটিয়ে লাহোর ফোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এইসময় ছাত্রদের উপর সামরিক শাসনের অত্যাচারের পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে, তা এক মোটা পুস্তকে পরিণত হবে।

মার্শাল আইন প্রত্যাহিত হয়ে স্কুল কলেজ খুললেও সামরিক আইনের কালো দিনগুলি কারও পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিল না। ঐ সময়ই ছাত্ররা যে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশেষ শক্তিশালী অংশ— এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। ছাত্ররাও আন্দোলনের প্রয়োজনে ইতিমধ্যে নিজেদের নিজস্ব সংগঠন ও মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে।

১৯২০ ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে স্বরাজ অর্জনের জন্য অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হল। সৃষ্টি হল এক অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ গণজাগরণ।

এইসময় লালা লাজপত রায় আমেরিকায় তার দীর্ঘ নির্বাসন কাটিয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯২০-তে লাহোরে ফিরে এলেন। এই দিনই সামরিক শাসনের সময়কার অমৃতসরের দুজনের মৃত্যুদন্ডাদেশ মকুবের আবেদন ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করার খবর ঘোষিত হলে, লালা লাজপত রায় তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিলেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করল। লাজপত রায় পাঞ্জাবের ছাত্রদের মধ্যে নাগপুর কংগ্রেসের আহ্বানকে কেন্দ্র করে দেশাত্ববোধে এক নূতন ঝোড়ো হাওয়া সৃষ্টি করলেন।

নাগপুর কংগ্রেসের আগে লালা লাজপত রায় ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ফিরলে তাঁরই সভাপতিত্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়ে গেছে এবং সেখানে বিলাতী পণ্য বর্জনের সপক্ষে জোরালো সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও ছাত্রদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য জোরালো আহ্বান জানানো হয়।

১৯২০-এর নাগপুর কংগ্রেসের আহ্বানে, লালা লাজপত রায় ৫ই নভেম্বরের মধ্যে কলেজের সমস্ত সরকারি অনুদান প্রত্যাহারের দাবি জানালেন, অন্যথায় তাঁরা সকলে একত্রে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। কিন্তু তার পূর্বেই ৩১ অক্টোবর খাসলা কলেজকে সরকারি পরিচালনা মুক্ত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কথা ঘোষিত হল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে ছিল খালসা কলেজসহ অমৃতসরের সর্বস্তরের ছাত্রদের আন্দোলন ও ধর্মঘট।

পাঞ্জাবে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করল। গান্ধীজী ও আলিভ্রাতৃদ্বয় পাঞ্জাবে এলেন, লাহোরে তাঁরা ২০ ও ২১শে অক্টোবর ছাত্রদের সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত হলেন। ছাত্ররা দ্বিধাহীনভাবে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন ঘোষণা করল। তারই পাশাপাশি অমৃতসরের শিখ লিগের বার্ষিক সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হল যে, খালসা পন্থ কোন অংশেই হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে অসহযোগ আন্দোলনে পিছিয়ে থাকবে না। এই ঘোষণা শিখ ছাত্রদের মধ্যে এক বিপুল আলোড়ন নিয়ে এল। লাহোরের লাহোর আঞ্জুমান ইসলামিয়ার পরিচালকদের ৫০ জনের মধ্যে ১৯ জন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়ে আঞ্জুমান পরিচালিত ইসলামিয়া কলেজে সরকারি সাহায্যগ্রহণে অসম্মতি ঘোষণা করলেন। ২৫ অক্টোবর লাহোরে তখন থমথমে অবস্থা। এই অবস্থায় ইসলামিয়া কলেজ ও লাহোর D.A.V. College-এর মুসলিম ও হিন্দু ছাত্ররা কলেজের ক্লাস বর্জন করে বেড়িয়ে এল। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল শহরের প্রায় সব কলেজ ইস্কুলের ছাত্রদল। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান ছাত্রদের অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ শোভাযাত্রা লাহোরের পথ কাঁপিয়ে এগিয়ে চলল। সামনে নেতৃত্ব দিলেন ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলু, শ্রীমতী রামভোগ দত্তা। রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র সমাবেশ, স্কুল কলেজের সর্বত্র ধর্মঘট করে ছাত্ররা অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারে মুখর হয়ে উঠল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে ছাত্রদের কলেজে ধর্মঘট, পিকেটিং প্রভৃতি মোকাবিলা করার কাজে নেমে পড়লেন। ছাত্রদের নৈতিক ঐক্য ও আন্দোলন ভেস্তে দেবার কাজে সরকার, স্কুল-কলেজের প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল সরকার ঘেঁষা অভিভাবক ও একশ্রেণির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ্‌দের প্রচার। বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্ররা স্কুল কলেজ বর্জন করায় তাদের কি লাভ? উপরন্তু তাদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে; সর্বোপরি যারা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে যাচ্ছে যারা শিক্ষালয়ে থাকছে, তাদের থেকে পিছিয়ে তো

পড়বেই। ভবিষ্যতে ঐসব স্কুল-কলেজ ছাড়া ছাত্ররা আর স্কুল-কলেজে ভর্তি হয়ে নতুনভাবে পড়ারও সুযোগ পাবে না।

প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে পাঞ্জাবের ছাত্ররা অভূতপূর্ব উৎসাহে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে দলে দলে যোগ দিতে এগিয়ে এল। ছাত্ররা দলে দলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলন পরিচালনার জন্য জাতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল (জাতীয় সেনাবাহিনী কার্যত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যারা অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া ও কার্যকরী করার দায়িত্ব নিয়েছিল)। স্কুলে-কলেজে চলল পিকেটিং, ধর্মঘট। সরকারি কর্তৃপক্ষের শত চেষ্টাও ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হবার পথ থেকে সরাতে পারল না। ইংরাজদের পরিচালিত সরকারি স্কুল-কলেজ কেবলমাত্র ছাত্ররাই বর্জন করল তাই নয়; বহু বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক এই বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের পাসে এসে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে হিংসা-অহিংসার নামে অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত কেবল পাঞ্জাব নয় সমগ্র দেশেই গণ-আন্দোলনে ভাঁটার সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে লাজপত রায় আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। জেলের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২৪-এ গুরুতর অসুস্থ থাকার পর লালাজী আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ছাত্ররা আবার তাঁকে ঘিরে সংগঠিত হতে শুরু করল। কিন্তু ১৯২০-এর অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা ছাত্রদের নিজস্ব নেতৃত্বে নিজস্ব সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এল। লাহোরে সমস্ত রকম সভা, সমাবেশ রাজবিরোধী অপরাধমূলক কাজ হিসাবে ঘোষণা করা হল। দলে দলে ছাত্র মহা উৎসাহে লাহোর থেকে ৪০ মাইল দূরে গুরজানওয়ালা শহরে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলে, সেখানে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে তাদের এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। এদিকে সরকারি দমননীতির ফলে প্রায় সমস্ত ছাত্রনেতারা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন।

অমৃতসরে ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা শিখ ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ফলে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অমৃতসরেব খালসা কলেজের ছাত্ররা কলেজ কর্তৃপক্ষকে এক চিঠি দিয়ে দাবি করল যে তারা যেন সরকারি সাহায্য নেওয়া বন্ধ করে জাতীয় নেতাদের ডাকে সাড়া দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাবের লেফট্যানান্ট গভর্নরকে একপত্রে ছাত্রদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে নিজেদের মঞ্চ ও স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বাড়ার কথা জানাল। এই সময় লাহোরের কারাগারে আন্দামান প্রত্যাগত বিপ্লবী ধনবন্তী দীর্ঘ কারাভোগ করছিলেন। তারই কয়েকজন সহকর্মী ও লাহোর জেলে যেসব ছাত্র নেতারা ছিলেন, সম্প্রতি ছাড়া পেলে— তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্যে ১৯২৭-এর ৪ঠা নভেম্বর 'লাহোর স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু পাঞ্জাব নয়, ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায় অর্থাৎ ছাত্রদের দ্বারা, ছাত্রদের জন্য ছাত্ররাই আন্দোলন পরিচালনার পথে পা বাড়াল।

[সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও তার উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব, মতাদর্শগত বিরোধ এবং তার প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে একটি ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করব। এই পর্যায়ে কেবলমাত্র ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ের ফসল হিসাবে ছাত্র সংগঠনের সৃষ্টি ও গঠনের ইতিহাসের উল্লেখ করব।]

এইসময় ভারতের জন্য নতুন সংবিধান ও কিছু শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে এক রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হয়, যে কমিশন ভারতে কুখ্যাত সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। শাসন সংস্কারের নামে ভারতবাসীর স্বরাজ ও স্বাধীনতার ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্খাকে বিপথে পরিচালিত করে নস্যাৎ করার কাজেই নিয়োজিত হয়েছিল এই কমিশন।

১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভারতে শাসন সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে সাইমন কমিশন ভারতে এলে, তাকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সাইমন কমিশন ১৯২৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। ঠিক ছিল সাইমন কমিশন ভারতে উপস্থিত হলে তাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে হরতাল, ধর্মঘট পালন করা হবে। ওরা যেখানেই যাবে কালো পতাকা দেখিয়ে ওদের ধিক্কার জানিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে।

ছাত্ররা আবার এই বয়কট আন্দোলনর প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল। সাইমন কমিশনের লাহোরে ৩০শে অক্টোবর ১৯২৮ উপস্থিত হবার কথা। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যাতে কোন রকম বিক্ষোভ সংগঠিত হতে না পারে, তার জন্য সারা দেশে তথাকথিত অপরাধ নিরোধ আইন (code of criminal procedure) সহ ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সভা শোভাযাত্রা সব কিছুর উপরই তখন লাহোরে নিষেধাজ্ঞা।

এই অন্যায় ও অযৌক্তিক সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেবার জন্য লালা লাজপত রায় লক্ষ্ণৌ থেকে লাহোরে পৌঁছেই এক বিশাল শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিলেন। শোভাযাত্রায় অসংখ্য ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে এসে যোগ দেয়। শোভাযাত্রা লাহোর রেল স্টেশনে পৌঁছলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে গতিরোধ করায় অংশগ্রহণকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে সেইখানেই অবস্থান করতে থাকে। শোভাযাত্রার সামনে বিভিন্ন নেতারা বক্তৃতা করছেন, অবস্থা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ— ঠিক এমনই সময় বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে লাঠি চালান আরম্ভ করল, লালাজী ব্যারিকেডের সামনের সারিতে, তাকে পুলিশ নির্দয় ও নৃশংসভাবে লাঠিপেটা করে মারাত্মকভাবে আহত করল— জনতা তখন উত্তাল। অগণিত ছাত্র বিক্ষোভে হিংস্র হয়ে উঠতে চাইছে। কোনরকমে বহু কষ্টে নেতারা অবস্থা আয়ত্বে আনলেন। অগণিত ছাত্রসহ সেই বিশাল সমাবেশে লালাজী আহত অবস্থায় আহ্বান জানালেন, তার জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, আজকের ঘটনা যেন ভারতে ইংরাজ শাসনের কফিনে শেষ পেরেকটির কাজ করে। তিনি ছাত্র যুব সমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন— তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত কর! এই ঘটনার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় লালা লাজপত রায় প্রয়াত হলেন। তার শেষযাত্রার বিশালত্ব— তরুণের সমাবেশ, ছাত্রদের উন্মাদনা, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লালা লাজপত রায়ের উল্লেখ বারবার করতে হল, কারণ তাকে বাদ দিয়ে কেবল পাঞ্জাব নয়, সমগ্র ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জঙ্গী ছাত্র সমাজের বৈপ্লবিক অবদানের সৃষ্টি উৎসের সন্ধান সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। লালা লাজপত রায় হয়েছিলেন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নিজস্ব সংগঠন A.I.T.U.C.-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কংগ্রেসের তৎকালীন চরমপন্থী নেতৃত্ব বলতে যাদের বোঝাত, তিনি ছিলেন তাদের

মধ্যে সর্বাধিক সমাজতান্ত্রিক চেতনার মানুষ ও তখন নতুন জন্মলাভ করা সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থক ও গুণগ্রাহী।

আর একটি জীবন পাঞ্জাবসহ উত্তর ভারতের ছাত্র সমাজকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল। তিনি হলেন লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজের ছাত্র শহিদ ভগৎ সিং। 'সারা ভারত নওজোয়ান সভা'র নেতা ছিলেন ভগৎ সিং। তিনি ও তার বন্ধুরা অত্যাচারী পুলিশ কর্তা স্যান্ডহার্স্টকে হত্যা করে লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলাম বলে ঘোষণা করেন। ভগৎ সিং-এর জীবন এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের আলোচনা এখানে করব না। কিন্তু ১৯২৯-এর ৮ই এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার চলতি অধিবেশনে বোমা নিক্ষেপের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া ১৮জন সহকর্মীসহ ভগৎ সিং-এর বিচার শুরু হল। তখন দেখা গেল ভগৎ সিং-এর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, ধর্মনিরপেক্ষতা কত গভীরভাবে সারা দেশের ছাত্র সমাজ, বিশেষভাবে পাঞ্জাবের ছাত্র সমাজকে প্রভাবিত করেছে। ভগৎ সিং-এর বিচার চলাকালীন সময় প্রতিদিন জেলের প্রাচীরের বাইরে হাজার হাজার ছাত্র সমবেত হত। তাদের প্রত্যেকের বুকে ভগৎ সিং-এর ছবি আটকান। মুখে মুহু-র্মুহু শ্লোগান— ভগৎ সিং দীর্ঘজীবী হোক, 'বিপ্লব জিন্দাবাদ', 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'। পাঞ্জাবের ছাত্র জনতা ক্রমশ গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে দ্রুত আস্থা হারাচ্ছিল। ফলে ছাত্রদের মধ্যে একটা বড় অংশ বৈপ্লবিক আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে নানা ধরনের বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশ নিতে শুরু করে। পাঞ্জাবে অপরাধ দমন আইন আরও জোরের সঙ্গে চালু করা হল। ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতৃস্থানীয় কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। অন্যদিকে ১৯২৯ এর ২৩শে ডিসেম্বর লাহোরে গভর্নর জেনারেলের গাড়িতে বৈদ্যুতিক পন্থায় বোমার আক্রমন সংগঠিত হল— কিন্তু অল্পের জন্য কেউ আহত হল না। ১৯৩০-এর ১৯শে জুন কিছু ছাত্র কর্মী পাঞ্জাবের ৬ জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে দু'জায়গায় দু'জন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু ঘটে।

এই সময় গান্ধীজী ও তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউনের মধ্যে এক শান্তি আলোচনা চলছিল। তাঁদের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়, যে চুক্তি 'গান্ধী-আরউন চুক্তি' নামে খ্যাত। ইতিমধ্যে সুকদেব, রাজগুরু, ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আদেশ হয়। 'গান্ধী-আরউন' চুক্তির ফলে সকলের মনে আশা জেগেছিল হয়ত ভগৎ সিং প্রমুখের ফাঁসির দন্ডাদেশ মকুব হয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের মত কিছু দেওয়া হবে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো অন্য, ১৯৩১-এর ২৩শে মার্চ ভগৎ সিং, সুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়ে গেল। এই সংবাদে সারা দেশের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। সারা পাঞ্জাবের ছাত্ররা এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস বয়কট শুরু করল। বহু ছাত্রীসহ ছাত্রদের ব্যাপক গ্রেপ্তার করা হল এবং তাৎক্ষণিক বিচারের নামে তাদের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে যখন পাঞ্জাবের গভর্নর তার কনভোকেসন্ বক্তৃতা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে বাইরে আসছিলেন তখন একজন ছাত্র তাকে গুলি করল, কিন্তু তার গায় গুলি না লেগে একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু হল। এর ফলে লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল এবং মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হল। পরে অবশ্য হাইকোর্ট তাদের মৃত্যুদন্ড মুকুব করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে।

১৯৩২-এর জানুয়ারি মাসে গান্ধীজী বিলেতে অনুষ্ঠিত রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স থেকে

শূন্য হাতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তার ভারতে পৌঁছবার পূর্বেই জওহরলাল নেহরু সহ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। 'গান্ধী আরউইন চুক্তি' কার্যত বাতিল হয়ে গেল। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে বিফল হলেন। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন নুতন পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করল। পাঞ্জাবে ছাত্র সমাজ দলে দলে সত্যাগ্রহী যোগ দিয়ে কারাবরণ করল। সেই সঙ্গে ছাত্রদের মধ্য বিলাতী পণ্য বর্জনের আন্দোলন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এই সময় পাঞ্জাবের ছাত্ররা নিজেদের অর্থাৎ একেবারেই ছাত্রদের নিজস্ব সমস্যা নিয়েও আন্দোলন করেছে ও দেশের যেখানেই মানুষ বিপন্ন হয়েছে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯৩৭-এ অমৃতসরের খালসা কলেজ ও লাহারের আয়ুর্বেদিক কলেজের ছাত্র ধর্মঘট হল। অমৃতসর খালসা কলেজ ছাত্র ধর্মঘট একদিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ২০ দিন ধরে এই ধর্মঘট চলেছিল। ধর্মঘটের কারণ খালসা কলেজের প্রিন্সিপাল ও কর্তৃপক্ষ কলেজের ছাত্রদের খুবই প্রিয় জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক নিরঞ্জন সিংকে নানাভাবে অপদস্ত ও লোকচোখে হেয় করে তাঁকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করছিল। তারই প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট করল। প্রিন্সিপাল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা ও ইন্ধনে কয়েকজন ছাত্র ও বাইরের লোক অধ্যাপক নিরঞ্জন সিংকে হেয় করার জন্য তার নামে নানা মিথ্যা ও অশালীন অভিযোগ সম্বলিত একটি ইস্তাহার কলেজে ও বাইরে বিলি করা হয়। ছাত্ররা কলেজ অধ্যক্ষকে নিন্দা করার দাবি জানালে অধ্যক্ষ মহাশয় এই দাবি ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতে গররাজি হয়ে ছাত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করলেন না। উপরন্তু তিনি বহু ছাত্রকে নির্বিচারে কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। প্রতিবাদী ছাত্রদের পুলিশ যথারীতি লাঠিপেটা করল। পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি প্রবোধচন্দ্র সহ প্রাদেশিক ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক, লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হন। আরও ৪০ জন ছাত্র নেতাকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হল। খালসা কলেজের ছাত্রদের এই আন্দোলন সারা দেশের ছাত্রদের দৃষ্টি ও সমর্থন লাভ করেছিল। এমনকি আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লি, কপুরতলা, মোগা, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর প্রভৃতি স্থান থেকে ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক দল অমৃতসরে উপস্থিত হয়ে সক্রিয়ভাবে ছাত্র ধর্মঘট ও আন্দোলনে সহায়তা করেছিল। খালসা কলেজের এই আন্দোলন সমগ্র উত্তর ভারতে অভূতপূর্ব এক ছাত্র ঐক্যের নজির স্থাপন করেছিল। এই সময় বাবা খড়্গ সিং এই ধর্মঘট মিটাবার উদ্যোগ নিলে, ছাত্ররা তাঁর মধ্যস্থতার প্রতি পূর্ণ আস্থা জানাল। বাবা খড়্গ সিং-এর এবং ছাত্রদের অবিচল ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সামনে খালসা কলেজের কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকারে বাধ্য হল। ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী নিরঞ্জন সিং-এর চরিত্র হননের প্রচেষ্টার নিন্দা করা হল। সেই সঙ্গে সমস্ত বহিষ্কৃত ছাত্রদেরও কলেজে ফেরৎ নেওয়া হল।

লাহোর আয়ুর্বেদিক কলেজের ছাত্র ধর্মঘট ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে ১৯৩৮-এর এপ্রিল পর্যন্ত চলেছিল।

কলেজ অধ্যক্ষের অকর্মণ্যতা ও দমনপীড়নমূলক স্বভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। বিশেষ করে কারণে-অকারণে ছাত্র ও কলেজ কর্মচারীদের জরিমানা করাটা অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বভাব ও দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছাত্ররা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অভিযোগ জানালেও তার কোন সুরাহা তো হলই না, বরং ছাত্র নেতা

বলে পরিচিত ছাত্রদের উপর বহিষ্কারাদেশ জারি করা হল। এর প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রদের ধর্মঘট শুরু হল। ছমাস ধরে একটানা ধর্মঘট চলল। একটি ছাত্রকেও নানা রকম প্রলোভন ভয়ভীতি দেখিয়েও কলেজে যোগদান করান গেল না। বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ছাত্রদের সমর্থনে, কর্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কলেজ থেকে পদত্যাগ করলেন। এই সময় লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সব দাবি স্বীকার করে নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা বর্তমান অধ্যক্ষকে কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন। বিতাড়িত সমস্ত ছাত্র নেতাদের উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহিত হবে। ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু কার্যত কর্তৃপক্ষ কিছু করলই না, বরং হঠাৎ কলেজ ছুটি ঘোষণা করা হল। ছাত্ররা ৩১শে মার্চ রাত্র থেকে কলেজ গেটে শুয়ে পিকেটিং (Picketing) আরম্ভ করতে বাধ্য হল। লাহোর ছাত্র ইউনিয়ন এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গোড়া থেকে দিয়ে আসছিল। হঠাৎই কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অধ্যক্ষের প্ররোচনায় পাঞ্জাব ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক সহ বেশ কিছু ছাত্র নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। ৪০জন ছাত্রকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার মিথ্যা অভিযোগে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হল। ফলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার নিল। অবশেষে ২০ দিন একটানা ধর্মঘট চলার মাথায় কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হল। তার পিছনেও অবশ্য কারণ ছিল। তারা স্থানীয় সমস্ত দৈনিক কাগজগুলিকে ছাত্রদেব বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে বিফল হলেন। বরং পত্রিকাগুলি ছাত্রদের দাবির সত্যতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে লিখতে লাগল। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কৃত ছাত্রদের উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। অধ্যক্ষকেও সমস্ত রকম পড়ান ও কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ছাত্ররা দীর্ঘ ২ মাস সংগ্রামের পর এই ঐতিহাসিক জয়লাভ করল।

এই সময় পাঞ্জাবের ছাত্র সমাজ জাতীয় বিপর্যয়ে যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোয়েটা, বিহারের ভূমিকম্পে বিপন্ন আর্ত মানুষের সাহায্যে অকাতরে অর্থ সাহায্য ও অর্থ সংগ্রহে এগিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বিপ্লবী যতীন দাসের মামলার সাহায্যে তহবিল, গুজরাতের বারদলৈর কৃষক-আন্দোলনের সমর্থনে অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ভাঁটা পরলে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ও আন্দোলনেও ভাঁটার অবস্থা শুরু হল। পাঞ্জাবের ছাত্র আন্দোলন এই সময়টা সাংগঠনিকভাবে নিজেদের সংগঠিত করা ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। প্রদেশের ছাত্রদের আরও কাছাকাছি আনা ও সংগঠিত করার জন্য লাহোরে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সম্মেলনের প্রচার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রদেশে ছাত্রদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। অভ্যর্থনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন পাঞ্জাব ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি প্রবোধচন্দ্র। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অভ্যর্থনা কমিটির দিবা-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম সম্মেলনকে ঐতিহাসিক সাফল্য এনে দেয়। এই সম্মেলন হল 'পঞ্চম পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলন'। লাহোরের টাউন হলে এই সম্মেলনে পাঞ্জাবের সমস্ত অঞ্চল থেকে

হাজার হাজার ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল। ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাঞ্জাব ছাত্রদের কাছে তিনি অবশ্য ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামেই সে সময় পরিচিত। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, দেওয়ান চমনলাল প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ দিলেন।

সব থেকে আকর্ষণীয় হল সম্মেলন উপলক্ষে কবিতার সিম্পোজিয়াম বা কবি সম্মেলন। যেদিন এই সমাবেশ হল সেদিন টাউন হল ছাপিয়ে গেল। হাজার হাজার ছাত্র মানুষ নেতাদের কথা ও কবিদের কবিতা শোনার জন্য ভেঙে পড়েছিল। এই সমাবেশে সময়োপযোগী নিজেদের কবিতা পাঠ করে শোনালেন বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, জোস মালিয়াবাদী, সাগহীর নিজামী, ইসহান বিন্ দানিশ-এর মত প্রখ্যাত কবিরা। স্থানীয় সংবাদপত্রের হিসাবে ঐ কবি সম্মেলনে ২০ হাজারেরও বেশি ছাত্র ও জনসাধারণ সমবেত হয়েছিলেন।

এই সম্মেলন পাঞ্জাবের ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন গড়ার এক নতুন চেতনার জন্ম দিল। চারিদিকে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জোয়ার দেখা দিল। ছ'মাসের মধ্যে যে জায়গায় প্রায় কোন ছাত্র সংগঠন ছিল না সেসব জায়গায় যেমন মোগা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, গুরজানওয়ালা, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, কপুরতলা, জম্মু সর্বত্র ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হল।

এই সঙ্গে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ছাত্র ইউনিয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সে সম্পর্কে সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে ওঠার আলোচনার সময়ই সে ইতিহাস উল্লিখিত হবে।

১৯৩৬-এ আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে উত্তরপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশন আহূত ছাত্র সম্মেলনে পাঞ্জাব থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করল এবং দ্রুত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন যাতে গঠিত হয় তার জন্য সমস্ত রকম সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিল এবং তা পালনও করেছিল। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রথম মুখপাত্র Student Tribune-পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে প্রবোধচন্দ্রের উপর।

১৯৩৬-এর নভেম্বরে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল লাহোরের টাউন হলে। সভাপতিত্ব করলেন বাংলার শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা। এই সম্মেলনেই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র ও ছাত্রদের এক সর্বভারতীয় দাবি সনদ গৃহীত হয়। পাঞ্জাবের ছাত্র আন্দোলনের গোড়াপত্তন থেকে ৪০-এর দশক পর্যন্ত যেসব ছাত্রনেতা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের সকলের কথা উল্লেখ করতে পারলে ইতিহাসের প্রতি সঠিক মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হল না, কারণ তথ্য সংগ্রহে লেখকের অক্ষমতার জন্য। তবুও যতদূর সম্ভব তাদের নাম উল্লেখ করছি। সর্বশ্রী প্রবোধচন্দ্র, প্রাণনাথ মেহেতা, শেঠ মহেশচন্দ্র, মুলুক রাজ আগরওয়াল, লাহোরের বীরেন্দ্র। রাওয়ালপিন্ডি ছাত্র লীগের ডি. এন চিব্বর। প্রেম নারায়ণ ভার্গব, যিনি পরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন (A.I.S.F., 36-37)। খাইবার ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল হাই। রাওয়ালপিন্ডের ছাত্র লীগের সভাপতি বলবীর সহায়, কপুরতলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জাফর উল্লা, বাবুভাই যশবীর ভাই প্যাটেল। রাওয়ালপিন্ডি ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা জাফরআলি, মোহনলাল বিনায়ক। জলন্ধর ছাত্র ইউনিয়নের ডি. পি.

মহিন্দ্র, দর্শন পাল, যোগেশ্বর সন্যাল। আইধিয়ার প্রকাশ পথিক। মোগা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি বলদেব সিং রণধাওয়া, জগওয়ান্ত রাই, সাধারণ সম্পাদক তীর্থরাম।

কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকা

কাশ্মীরের ছাত্র আন্দোলন সে সময় পাঞ্জাব ছাত্র আন্দোলনের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। কাশ্মীরের ছাত্ররা মূলত ডোগরা রাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও সবসময়ই পাঞ্জাব ছাত্রদের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছে। কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকায় যে ছাত্র সংগঠন সে সময় গড়ে উঠেছিল তারও উৎস ছিল পাঞ্জাব। যেসব ছাত্র নেতা ও কর্মী কাশ্মীর ও জম্মুর ছাত্র আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন তারা হলেন—'সারা কাশ্মীর ছাত্র ফেডারেশনে'র সভাপতি জি.এম.ডি. হামদাশী, জানকীনাথ জুৎসী, কাশীনাথ কাউল, 'শ্রীনগর ছাত্র ইউনিয়নে'র সভাপতি কে.এন. রামজাই প্রমুখ।

প্রবোধচন্দ্র 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৩৭-এ কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকায় ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে আসেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীরে এই প্রচেষ্টা শুরু হলেও এখানে ছাত্রদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকায় এই চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছিল। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টায় ঐ মতপার্থক্য দূর করে কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকার ছাত্ররা আলাদা আলাদা ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ প্রভৃতি ভেঙ্গে দিয়ে 'কাশ্মীর স্টুডেন্স ফেডারেশন' গঠন করল। ডঃ কে.এম. আসরফির সভাপতিত্বে ১৯৩৭-এর নভেম্বরে প্রথম কাশ্মীর ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের ফলাফল কাশ্মীরের কেবলমাত্র আন্দোলনেই নয়, সমগ্র উপত্যকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।

সিন্ধু প্রদেশ

এই সময় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধুপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। যদিও ১৯৩১-এর পূর্বে সিন্ধুপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোন চিত্র চোখে পড়ে না। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে সিন্ধুপ্রদেশের ছাত্রদের উপর 'দ্বিতীয় সর্বভারতীয় ছাত্র কনভেনশন' সংগঠিত করার দায়িত্ব পড়লে তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করছিল। এইসময় সিন্ধুপ্রদেশে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন সর্বশ্রী দৌলত জয়রাম দাস, চৌথরাম গিদওয়ানী, জয় সিংহানী এবং জেঠী সিপাহী মিলানী প্রমুখ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে একসময়কার আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের জীবন্ত প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন মহঃ আমিন খোসো। খোসোর নেতৃত্বেই সেসময় সিন্ধুপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলন এক বৈপ্লবিক রূপ পেয়েছিল। এদের নেতৃত্ব সিন্ধুতে ছাত্র আন্দোলন নবজীবন লাভ করে। করাচী হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শহরে ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠল। ১৯৩৮-এর এপ্রিলে করাচীতে 'সিন্ধু ছাত্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনসভার বিরোধী নেতা ভুলাভাই দেশাই ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। তিনি অবশ্য সেই সঙ্গে ছাত্রদের তৎকালীন ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে নির্বাচিত সিন্ধু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য উপদেশ দিলেন।

দিল্লি

১৯৩০-এর পূর্বে উল্লেখ করার মত কোন ছাত্র আন্দোলন দিল্লিতে ছিল না। কিন্তু ১৯৩১ সালে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলে তখন হাজারে হাজারে নারী-পুরুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণে এগিয়ে এল। দিল্লির ছাত্ররাও এর প্রভাবের বাইরে থাকতে পারেনি। আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা 'দিল্লি ছাত্র ইউনিয়ন' গঠন করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ সরকার ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের গ্রেপ্তার করল, সেই সঙ্গে ইউনিয়নের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ফলে 'দিল্লি ছাত্র ইউনিয়ন' কার্যত অকেজো হয়ে পড়ল।

১৯৩৩-এ গান্ধীজী অস্পৃশ্যতাবিরোধী প্রচার ও আন্দোলন শুরু করলে দিল্লির ছাত্ররা এই আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া দেয়। দিল্লিতে বিশাল সংখ্যায় হরিজনদের বাস, তারা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হত। তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দিল্লি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ এন. ভি. থাডানিকে সভাপতি ও ছাত্রনেতা বি.এস. মনিয়ম আয়ারকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে "Students Harijan Service League" স্থাপিত হল। এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন ঘনশ্যামদাস বিড়লা। এই সংগঠন অতিদ্রুত অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজের জন্য ছাত্র হরিজন সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। হরিজনদের শিক্ষার জন্য বেশ কিছু স্কুল দিনে ও রাতে চালাবার ব্যবস্থা হল। ছাত্ররা প্রতি সপ্তাহে হরিজন বস্তিতে যাওয়া, তাদের সঙ্গে মেলামেশার কাজ শুরু করল। শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্ররা চাদনীচককে ঝাড়ু দিয়ে পবিষ্কার করার কাজ শুরু করে। গান্ধীজী এই সময় দিল্লি এলে ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাকে ১,৫০০ টাকা উপহার দেওয়া হল। রামযশ কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের সহানুভূতি ও সহযোগিতার ফলে ঐ কলেজের সমস্ত ছাত্ররা লীগের সভ্য হল। সভ্যসংখ্যা দাড়াল ২,০০০-এরও বেশি। কিন্তু দিল্লি কর্তৃপক্ষ বেশিদিন লীগকে সহ্য করলেন না। তারা লীগের প্রধান পরিচালক আর. পি. গুপ্তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দিল্লি ত্যাগের আদেশ দিলেন। যদিও আরও কিছুদিন লীগের কাজ চললেও ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই সময় 'দিল্লি ছাত্র ইউনিয়ন' গঠনের একটা চেষ্টা হলেও তা ফলপ্রসূ হল না, কারণ তখনও দিল্লির বিভিন্ন কলেজগুলির মধ্যে একত্রিত হবার অপেক্ষা নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষায় উৎসাহই ছিল প্রবল।

১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ইউনিয়নে'র (Delhi University Law Union Society) সম্পাদক কে. উমাশংকর সেন্ট স্টিফেন কলেজে সমস্ত কলেজগুলির প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়েছে, তারই আদলে 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশন' গঠন করা। সভার সংগঠকরা সেই সময় দিল্লিতে উপস্থিত 'দিল্লি শ্রমিক সম্মেলনে'র প্রস্তাবিত সভাপতি শ্রমিক ও তৎকালীন সময়ে কমিউনিস্ট নেতা বাটলীওয়ালাকে ছাত্রদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। বাটলীওয়ালার বক্তব্য ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ঠিক হল দিল্লির আরবিক কলেজে ছাত্রদের সাধারণ সভা করে ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে। নির্ধারিত দিনে আরবিক কলেজ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশন' গঠনের কথা ঘোষিত হল। শ্রী কানওয়ার লালকে সভাপতি ও কে. পি. শঙ্করাকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন

করা হল। প্রথম দিকে এই সংগঠন ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে তারা নানা ধরনের সমাজ সংস্কার ও শিক্ষামূলক কার্যপরিচালনার মধ্য দিয়ে ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এইসময় এরা নানা ধরনের শিক্ষামূলক কাজ ও বক্তৃতামালার আয়োজন করত। নিয়মিত বক্তাদের মধ্যে থাকতেন কংগ্রেস নেতা আসফ আলি, মিঃ মাটিজোনস্ প্রমুখ। এরা ছাত্রদের খুবই প্রভাবিত করতেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য সঙ্গীত নাটক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার কাজে খুবই সাফল্য এরা লাভ করেছিল। ১৯৩৭-এ আরবিক স্কুল ধর্মঘট ও টিবিয়া কলেজ ধর্মঘট দুটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশন' দিল্লির স্কুল-কলেজের একমাত্র ছাত্র সংগঠন হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আরবিক স্কুলের ৬০-জন শিক্ষকদের বেতন কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কমিয়ে দিলে তারা পদত্যাগ করেন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে শিক্ষকদের বেতন কমানোর বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ ধর্মঘট আরম্ভ করে। আরবিক স্কুলের ছাত্ররা 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশনে'র সাহায্য ও নেতৃত্বের জন্য আহ্বান জানালো— ফেডারেশন তার সম্পাদক কে. পি. শঙ্করাকে এই আন্দোলনের দায়িত্ব দেয়। শঙ্করা 'Old Boys' Association'-এর সাহায্যে ছাত্রদের অনুকূলে ধর্মঘটের মিমাংসা করতে সক্ষম হন। শিক্ষকদের বেতন হ্রাস বন্ধ হল, তাঁরা পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু আরবিক কলেজের কর্তৃপক্ষ যারা গোড়ার দিকে ছাত্র ফেডারেশন গঠনে স্কুল-কলেজ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, তারা ফেডারেশনকে শত্রুতার চোখে দেখতে শুরু করলেন ও সমস্ত রকম সহযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

দিল্লি টিবিয়া কলেজে দীর্ঘ দিন ধরে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। তার কারণ কর্তৃপক্ষের সাম্প্রদায়িক মনোভাব। আয়ুর্বেদিক বিভাগকে উপেক্ষা করে ইউনানী বিভাগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, বাজার থেকে চড়া দামে কলেজের স্টোর থেকে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য করা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। একেবারে অকারণে অযোগ্যতার মিথ্যা অভিযোগে একজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করায় তা বারুদের স্তূপে আগুনের কাজ করল। এই অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিশেষকরে কলেজে যুগ্ম- সম্পাদকের অন্যায় আচরণ ও মনোভাবের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট আরম্ভ করল। দীর্ঘ তিন মাস ছাত্রদের ধর্মঘট চলল। কলেজ কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ভাঙার জন্য আয়ুর্বেদ বিভাগের ২০০ ছাত্রকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। এবং সাম্প্রদায়িক কায়দায় জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন। ছাত্রদের হোস্টেল, তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা, এমনকি জল সরবরাহ বন্ধ করা হল। এই অবস্থায় 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশন' সমস্ত বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হল। আন্দোলন পরিচালনা ও তার সাফল্যকে ত্বরান্বিত করতে একটি সাব-কমিটি গঠিত হল। এই সাব-কমিটির প্রচেষ্টা এবং আসফ আলি, নেকীরাম শর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় ছাত্রদের দাবি স্বীকৃত হল। ছাত্ররা জয়ী হলেন।

'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশন' অমৃতসর খালসা কলেজে ধর্মঘটের সময় সেখানকার ছাত্রদের সমর্থন জানাতে ও সরেজমিনে সব দেখে দিল্লির ছাত্রদের সমর্থন জানাতে এবং ছাত্রদের কর্তব্য নিধারণে সহায়তার জন্য সি.কে.পি শঙ্করা, মীর মুস্তাক আহমেদ, কানওয়ার লাল এই তিনজনকে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অমৃতসর পাঠিয়েছিল।

১৯৩৭-এ 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশনে'র কাজে নতুন জোয়ার দেখা দেয়। নভেম্বর মাসের ৫, ৬ ও ৭ তারিখে দিল্লিতে 'দিল্লি প্রদেশ ছাত্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব

করলেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন করলেন স্যার ওয়াজির হাসান। সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বয়েজ স্কাউট (Boys' scout) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বেডেন পাওয়েল (Baden Powell) ভারতীয়দের সম্পর্কে অবমানাকর উক্তির প্রতিবাদে ছাত্রদের বয়েজ স্কাউট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে উপনিবেশের ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখার জন্য ইংল্যান্ডের বৃটিশ সরকারের নির্দেশ ও সক্রিয় সাহায্যে বেডন পাওয়েল স্কাউট আন্দোলন শুরু করেন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরিয়ে তথাকথিত সমাজসেবা ও গ্রাম উন্নয়নের নামে ইংরেজ সরকার বাঙালি আই. সি. এস গুরুসদয় দত্তকে দিয়ে "ব্রতচারী আন্দোলন" শুরু করায়। অবশ্য এই আন্দোলন দুটি কিছু সংখ্যক ছাত্রকে প্রভাবিত করতে পারলেও সাধারণভাবে ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পারেনি। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি-এর পরিমাণ হ্রাসের দাবিতে এবং আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজনৈতিক বন্দিদের অনশনের সমর্থনে প্রস্তাব ছাত্রদের বিশেষভাবে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এই সম্মেলন থেকেই আবার নুতন উদ্যমে গ্রামের মানুষের মধ্যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা দেবার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রচারক ছাত্রদল গ্রামের মানুষের মধ্যে সাবান বিলান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার জন্য যেমন প্রচার ও শিক্ষা দিত ও তেমনি গ্রামের হরিজনদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া ছাত্রদের গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এছাড়া সামাজিক রাজনৈতিক ও কৃষি সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা সভা সংগঠিত করা 'দিল্লি ছাত্র ফেডারেশনে'র সে সময় নিয়মিত কার্যক্রম হয়ে উঠেছিল।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরপ্রদেশের ছাত্র সমাজ ১৯২০-২১ ও ৩০-এর অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯২০-এর ১২ই অক্টোবর গান্ধীজী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় আলিগড়ে উপস্থিত হলেন। এই সময় ওরা অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে ঘুরছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁদের আলিগড়ে আগমন। এই সময় গান্ধীজী তার অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ, আইনজীবীদের কোর্ট বর্জন করে আন্দোলনে সামিল হবার জন্য বারবার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। সারা প্রদেশে ছাত্রদের মধ্যে তখন তুমুল উত্তেজনা। সমস্ত ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ছাত্রদের স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এবং তৎকালীন স্বরাজের দাবির মর্মার্থ তাদের কাছে পরিষ্কার না থাকলেও ছাত্ররা চাইছিল কিছু করতে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের ছাত্রদের, বাংলা প্রদেশের ছাত্রদের নানা ধরনের আন্দোলনের সংবাদ উত্তরপ্রদেশের ছাত্রদের প্রভাবিত করছিল। ১২ অক্টোবর গান্ধীজী ও আলিভ্রাতৃদ্বয় আলিগড়ে উপস্থিত হলে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইউনিয়ন ক্লাব হলে ছাত্রদের সভার ব্যবস্থা করে। ওদের ঐ সভায় আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। গান্ধীজী ও আলিভ্রাতৃদ্বয় ছাত্রদের সভায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেইদিন থেকে ক্লাস বর্জন করা শুরু করল। শুধু তাই নয় সাধারণ মানুষকে আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত ও উৎসাহিত করার জন্য প্রচার অভিযানে ব্যাপক অংশগ্রহণ করল।

ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমেক্রমে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। স্মরণ রাখা দরকার, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালকদের মধ্যে অধিকাংশই লীগপন্থী ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইংরাজ সরকারের কট্টর সমর্থক। ছাত্রদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল— আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কত দ্রুত সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (National Institution) পরিণত হবে। কলেজের অধ্যক্ষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পুলিশের সাহায্য চেয়ে বসসেন। ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মনোভাব সম্পর্কে জানিয়ে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার কাজে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এর ফলে ছাত্রদের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, আলি ভ্রাতৃদ্বয় সহ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মন্ডলীর নয় জন সদস্য যথা ডঃ আনসারী, হাকিম আজমল খান, মোয়াজ্জেম আলি মুস্তাফা খান, ইসমাইল খান প্রভৃতি কলেজ পরিচালক মন্ডলীকে এই বলে ১২ই অক্টোবর তারিখে এক চরমপত্র দিলেন যে, ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য নেওয়া বন্ধ করা হোক।বন্ধ হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় সবরকম সরকারি হস্তক্ষেপ। এক কথায় ইংরাজ সরকারের সঙ্গে তাঁরা সমস্ত সম্পর্কে ছেদ করতে আহ্বান জানালেন। সেই সঙ্গে ছাত্র অভিভাবকবৃন্দের কাছে তারা আবেদন করলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এইসব প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্ররা আহ্বান জানাল।

ছাত্ররা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে কলেজ ক্যাম্পাস পরিত্যাগ করে বাইরে বেড়িয়ে এল। তারা আশা করছিল এইবার এক জাতীয় ইনস্টিটিউসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাদের সে আশা ফলবতী হল না, পক্ষকাল ছাত্ররা বাইরে থাকার পর আবার তারা কলেজে ফিরে এল। নভেম্বর মাসের ১০ তারিখে আগ্রায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গৌরীশ প্রসাদের সভাপতিত্বে উত্তরপ্রদেশ কলেজ ছাত্রদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চার-শতাধিক ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করল। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হল

> "In view of the present National need of the country this convention call on all the students of the U.P. to respond enthusiastically to the call of the Nation through Mahatma Gandhi, supported by the Indian National Congress and urges upon them to be prepared for all necessary sacrifices including gradual withdrawal from the Govt. aided Institution and other help effectively in the country's first leap for Freedom."

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অশান্ত হয়ে উঠলে, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য ছাত্রদের সভায় তেজস্বিনী ভাষায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন জানিয়ে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ত্যাগ করতে বারণ করলেন। তাঁর মতে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে বেড়িয়ে গিয়ে লেখাপড়া ত্যাগ করলে তাঁদের ভবিষ্যত উন্নতি শুধু ব্যাহত হয় তাই নয়, বিশেষভাবে বিপন্ন হবে। বেনারসের ছাত্ররা পন্ডিত মালব্যজীর উপদেশে সাড়া দিয়ে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকল। তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার ও সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এক ছাত্র কমিটি গঠন করল।

আলিগড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে বন্ধুত্বমূলক প্রতিনিধিত্ব দল আলিগড়ে পাঠাল। তবে এই ছাত্র কমিটি সর্বতোভাবে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দ্বারাই পরিচালিত হত। উত্তরপ্রদেশের এই সময়কার ছাত্রদের আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে তখন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন, সে কি হিন্দু কি মুসলমান, বৃহত্তর ছাত্রগোষ্ঠীকে প্রবাহিত করতে পারেনি। ছাত্রদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রই এই সময়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

১৯২৯-এ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তরপ্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে এতদিন পর্যন্ত ছাত্ররা নিজেদের তেমন কোন সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশে ছাত্ররা এই সময় মূলত যুব আন্দোলন সংগঠনের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত করত। যেমন 'নওজোয়ান ভারত সভা', 'তরুণ সংঘ' প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। তারপর ১৯৩৬-এ 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গঠিত হলে উত্তরপ্রদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে ওঠা ছাত্র সংগঠনগুলি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলিও প্রধানত নানা ধরনের শিক্ষামূলক কাজ, বক্তৃতামালা, বিতর্ক-সভা প্রভৃতি সংগঠিত করার কাজকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। অবশ্য এই শিক্ষামূলক বক্তৃতামালা বিতর্কে দেশাত্মবোধক বিষয়, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যাই প্রাধান্য পেত।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরপ্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চেতনার উন্মেষ ও নানাবিধ আন্দোলন এবং সংগঠনের কাজের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। ছাত্ররা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে তাদের দায়িত্বে নিজেদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আন্দোলনের পথে এগিয়ে এল। ছাত্র ফেডারেশনের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, আলিগড়, বোরিলী, মীরাট, দেরাদুন, খুরজা, বরবাঙ্কি প্রভৃতি স্থানে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হল।

উত্তরপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলনে ১৯৩৬-এ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও সেই সঙ্গে 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন' গঠনের প্রচেষ্টার পরিণতি।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট

এই সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্র নেতাকে অশালীন আচরণের অভিযোগে ১৯৩৬-এর অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ ছিল সর্বৈব মিথ্যা। বহিষ্কার আদেশের কারণ ছিল, এই ছাত্র নেতা ও কর্মীরা অত্যন্ত সাবলীল ও সফলভাবেই ছাত্রদের মধ্যে স্বরাজের জন্য জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা জাগিয়ে তুলছিলেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের একাংশের সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবল মারার অপচেষ্টা এই ছাত্রনেতাদের প্রচেষ্টা ও দৃঢ়তার ফলে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। এই কারণেই ঐ মিথ্যা অভিযোগে বহিষ্কারাদেশ। স্বভাবতই ছাত্ররা তাদের এই প্রিয় প্রগতিশীল ছাত্রনেতাদের উপর অন্যায় বহিষ্কারাদেশ মেনে নেবে না— সেটাই স্বাভাবিক এবং ঘটলও তাই। ছাত্ররা ঐসব ছাত্র নেতা ও কর্মীদের উপর থেকে অবিলম্বে অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারের

দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করল। ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য কর্তৃপক্ষ দশেরার বহুপূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ে দশেরার ছুটি ঘোষণা করলেন। কিন্তু ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে অস্বীকার করল। ছাত্রদের বাড়ি যাওয়া-আসার সমস্ত খরচ কর্তৃপক্ষ দেবার লোভ দেখিয়েও কোন ফল হল না। ফলে যখন আবার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলল, তখন কর্তৃপক্ষ ঐসব বহিষ্কৃত ছাত্রদের উপর থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে তাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। ছাত্রদের এই জয় শুধু আলিগড়ের ছাত্রদের মধ্যেই নয়, সমগ্র উত্তরপ্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিল। তার বড় কারণ আলিগড়ে ছাত্রদের এই প্রতিরোধ আন্দোলন একেবারেই ছিল ছাত্রদের জন্য, ছাত্রদের নিজস্ব নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্রের অংশগ্রহণে এক সফল আন্দোলন।

এই বছরই দ্বিতীয় ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বোধহয় আলিগড় ছাত্রদের আন্দোলন থেকেও বেশি অর্থবহ কারণ, এইসময় উত্তরপ্রদেশের মুসলিম ছাত্ররা আলিগড় ছাত্রদের নেতৃত্বে কিছু মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন' গঠনে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ছাত্র আন্দোলনের আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরে।

লক্ষ্ণৌতে 'প্রথম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন' শেষ হবার পরেই কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিম নেতা ও ছাত্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির কাজে নেমে পড়লেন। এই প্রচেষ্টার পিছনে অবশ্যই মদত জোগাচ্ছিলেন মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নেতারা। এইসব নেতাদের প্ররোচনায় ১৯৩৬-এর নভেম্বরে 'আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নে'র সভায় কয়েকজন এক সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র সংগঠন গড়ার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগ নেবে, এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। এই ঘটনা ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত ঘটনা। আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতাদের প্রচেষ্টা পরাজিত হলেও তাদেব এই বিভেদকামী কার্যকলাপ থেকে তারা নিবৃত্ত হলেন না। তারা সারাদেশে বিশেষকরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে নেমে পড়লেন এবং লক্ষ্ণৌতে 'প্রথম সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র সম্মেলন' আহুত হল। ঠিক ছিল এ. ইউসুফ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলিম ছাত্রদের তীব্র বাধায় তাঁরা এই সম্মেলন করতে ব্যর্থ হলেন। অন্যদিকে সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম ছাত্ররা একত্রিত হয়ে, ভ্রাতৃসম হিন্দু-মুসলমান দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ, বিদ্বেষ সৃষ্টির তীব্র নিন্দা করে, সংকীর্ণ স্বার্থে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন গঠনের চেষ্টার বিরোধিতা করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করল। সেই সঙ্গে তাঁরা সদ্যগঠিত সমগ্র ভারতের সমস্ত ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বমূলক ছাত্র সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

পরবর্তী সময় এই অবস্থা বজায় থাকেনি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেমন দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করেছিল, তেমনি ছাত্র সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর কারণ খুঁজতে হবে দেশের তৎকালীন বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলীর মধ্যে। তার কিছু কিছু উল্লেখ অবশ্যই নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে করতেই হবে।

১৯৩৭-এর নূতন ভারতশাসন আইন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে, উত্তরপ্রদেশের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারের কাজে এগিয়ে

আসে। নির্বাচনের সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই প্রধানত নির্বাচন কেন্দ্রের, পোলিং এজেন্ট, স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব খুবই উৎসাহ ও সাফল্যের সঙ্গে পালন করল।

বিভিন্ন জায়গায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করায় উত্তরপ্রদেশের ছাত্রদের নিজেদের স্বাধিকার অধিকার রক্ষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন করতে হয়। ফৈজাবাদে কলেজ কর্তৃপক্ষ সরোজিনী নাইডুব সভায় যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ছাত্ররা নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ঐ সভায় যোগ দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে ২-টাকা করে জরিমানা করলেন। ছাত্ররা এই আদেশের প্রতিবাদে ফৈজাবাদের সর্বত্র স্কুল-কলেজে ধর্মঘট শুরু করল। যে কারণেই হোক সে ধর্মঘটের ব্যাপকতা অথবা কোন স্তরের কোন উপদেশ বা হস্তক্ষেপের ফলে প্রথম দিন ছাত্র ধর্মঘটের পরেই ছাত্রদের উপর ঐ জরিমানা প্রত্যাহার করে কর্তৃপক্ষ শুভবুদ্ধির পরিচয় দিলেন।

কানপুর ডি.এ.ভি কলেজের হোস্টেলে থাকা ছাত্ররা নির্বাচনে কোনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না বলে এক ফতোয়া জারি করলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু হোস্টেলে থাকা ছাত্ররা ঐ ফতোয়া অগ্রাহ্য করে নির্বাচনী প্রচারে, নির্বাচনী বুথে নিজেদের দায়িত্ব পালন কবল। ক্ষিপ্ত অধ্যক্ষ প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বেশ কিছু ছাত্রর বৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বন্ধ করে দিলেন। ছাত্ররা এই অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, তিনি ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই অন্যায় আদেশ রদ করার ছাত্রদের প্রচেষ্টা উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হলে ছাত্ররা ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হল। অধ্যক্ষের এই প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে, এই ধর্মঘটের সমর্থনে B.Sc. পরীক্ষার্থী সমস্ত ছাত্র (final) চূড়ান্ত পরীক্ষা বর্জন করল। এক সপ্তাহ ধর্মঘট চলার পর অধ্যক্ষ বিনাশর্তে তার আদেশ প্রত্যাহারে বাধ্য হলেন। ছাত্ররাও ধর্মঘট তুলে নিলেন। যে ছাত্র সভায় ছাত্র ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল সেখানে এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হল। এই সময় মীরাট, আলিগড়, এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি স্থানে ছাত্ররা যে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঝাঁসিতে ছাত্ররা প্যালেস্টাইন দিবস পালন করল। সেই উপলক্ষে পুস্তিকা বিতরণের 'অপরাধে' একজন ছাত্রকর্মীকে বেত মেরে শাস্তি দিলে তার প্রতিবাদে ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিলেন যে— যতদিন পর্যন্ত এই অগণতান্ত্রিক ও বর্বরচিত কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ না করবে, ততদিন পর্যন্ত ছাত্ররা একটানা ধর্মঘটে সামিল হবেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ছাত্র ধর্মঘট শুরু হল। কয়েকদিন ধর্মঘট চলার পর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন তাদের এই অন্যায় কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে এবং এই ধর্মঘটের জন্য কোন ছাত্রের উপর কোন প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা করতে।

রাণীক্ষেতের 'ছাত্ররা এই সময় বয়েজ স্কাউট আন্দোলনে'র প্রতিষ্ঠাতা স্যার বেডেল পাওয়েল কর্তৃক ভারতীয় নৈতিকতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবমাননাজনক মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বয়েজ স্কাউটে যোগ না দিতে আহ্বান জানায় ও স্বদেশী সেবা সমিতিতে যোগদানের জন্য আবেদন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে নব গঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র উত্তরপ্রদেশ শাখার নেতৃত্বে। 'উত্তরপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রথম সভাপতি হলেন এম.এন.এম. বদউদ্দিন এবং তিনি বেশ সফলতার সঙ্গেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট এইসময় সংগঠিত হয় লক্ষ্ণৌ খ্রিস্টান কলেজে (Lucknow Christian College)। কলেজের খেলাধূলা বিভাগে প্রায়ই ছাত্রদের অতিমাত্রায় জরিমানা করা হত। তার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছিল মাসে ৬০০ টাকার বেশি। এই জরিমানা করার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে দীর্ঘদিন অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। ১৯৩৭-এর অক্টোবর হঠাৎই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ছাত্ররা এই বেআইনি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাদের দাবি জানাতে খেলাধূলা বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ছাত্রদের দাবির কথা শোনা তো দূরের কথা দেখা করতেও অস্বীকার করলেন। ছাত্ররা এই ঔদ্ধত্য মেনে নিতে রাজি ছিল না। তারা পরের দিন থেকেই ধর্মঘট আরম্ভ করল, ধর্মঘট পরিচালনার জন্য মহম্মদ খুরশেদকে সভাপতি করে 'লক্ষ্ণৌ ছাত্র ফেডারেশনে'র নেতৃত্বে একটি স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হল। ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ খ্রিস্টান স্কুলের ছাত্ররাও ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে ঐ একই কারণে ধর্মঘট করে কলেজ ছাত্রদের সঙ্গী হল। ধর্মঘটের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, একটি ছাত্রও কি কলেজ, কি স্কুলে ক্লাসে যোগ দেয়নি অথবা ধর্মঘটের জন্য স্কুল-কলেজের গেটে কোন পিকেটও করতে হয়নি। এমনি ছিল ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও ঐক্য। অধ্যক্ষ ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। একটানা ৫-দিন অধ্যক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা চলল। সেই সঙ্গে চলল ছাত্র ধর্মঘট। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ঐ জরিমানার নিয়ম বন্ধ করার জন্য ছাত্রদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ঐ নিয়ম রদের প্রতিশ্রুতি দিলে ছাত্র ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল। ছাত্রবা নিজেদের বিশেষ দাবির সংগ্রামে জয়যুক্ত হল।

১৯৩৭-এর আগস্ট মাসে সহসা এলাহাবাদ ও বেনারসের ছাত্র ফেডারেশনের দুই বিশিষ্ট নেতা শ্রী রমেশ সিন্হা (এলাহাবাদ) ও জে. ভট্টাচার্য (বেনারস)-এর কাছে কমিউনিস্ট সাহিত্যের কিছু কাগজপত্র পাওয়ার অপরাধে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করল। তাদের বিরুদ্ধে সংশোধিত অপরাধ দমন আইনের ১৭ (১.২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র ছাত্ররা সভা করে এই দুই ছাত্র নেতাকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার দাবী জানাল। লক্ষণীয়, এই সময় নুতন ভারত শাসন আইনের বলে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার শাসনের দায়িত্বে। ছাত্ররা কংগ্রেস সরকার-এর কাছে আবেদন জানালেন যে কংগ্রেস ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, সংগঠিত হবার স্বাধীন অধিকার স্বীকার ও কার্যকরী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অতএব তাঁরা অবিলম্বে এই দুই ছাত্র নেতাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস তাদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা দেবেন। কিন্তু এই আবেদনে বিশেষ ফল হল না।

এই অক্টোবর মাসেই (১৯৩৭) 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রাক্তন সম্পাদক আনসার হারবানি ও 'নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনে'র তৎকালীন সম্পাদক প্রেমনারায়ণ ভার্গবের নেতৃত্বে ১৫ হাজার ছাত্রের এক মাইল দীর্ঘ এক বিশাল ছাত্র শোভাযাত্রা লক্ষ্ণৌ

শহরের সমস্ত রাস্তা পরিক্রমার পর ছাত্র ফেডারেশনের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত ছাত্রদের দাবি সম্বলিত সনদ পেশ করার জন্য তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের বাড়িতে উপস্থিত হল।

ছাত্রদের নানা অসুবিধা ও ৩৭-দফা দাবি সম্বলিত এই সনদে দাবিগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি এর মধ্যে স্থান পেয়েছিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হওয়ার অপরাধে ৩ জন ছাত্রকে পাশ করার পর পরবর্তী উচ্চশ্রেণিতে ভর্তি করতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করার বিরুদ্ধে ঐ ছাত্রদের অবিলম্বে ভর্তি করার দাবি জানান হয়। এবং এও দাবি করা হয় যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় ঐ ছাত্রদের পুনঃপ্রবেশের অধিকার অস্বীকার করে, তা হলে সরকার যেন বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে। ছাত্রনেতা রমেশ সিনহা ও জে. ভট্টাচার্যকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর অনুসরণ, বছরের দু'বার প্রমোশনের পরীক্ষা, ডিটেনশন সিস্টেমের অবলুপ্তি প্রভৃতি দাবিসমূহ এবং লাহোরে গৃহীত ছাত্রদের দাবি সনদের বিস্তৃত বিবরণ সংগঠন সম্পর্কিত আলোচনার সময় উল্লেখ করব।)

পন্থজী ছাত্রদের সঙ্গে যদিও দেখা করলেন, কিন্তু দাবিগুলি সম্পর্কে বেশ উষ্মা প্রকাশ করলেন। কারণ ছাত্রদের এই দাবি সনদের ভাষায় তিনি আদেশের ভাষা খুঁজে পেলেন। তার মতে কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা ছাত্রদের পিতৃসদৃশ। অতএব পিতা যেমন সন্তানের কিসে মঙ্গল হবে, সন্তান অপেক্ষা বেশি বোঝেন— ঠিক তেমনি ছাত্রদের কিসে প্রকৃত স্বার্থরক্ষা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব পিতৃসদৃশ কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ছাত্রদের কর্তব্য। ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা তুলে সমবেত দেশের অধিকাংশ ছাত্র সমাজের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের দিকে পন্থজীর দৃষ্টি আকর্ষিত হলে তিনি কিছু প্রশংসার কথা বলে অধিকাংশ সময় গান্ধীজীর অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের নীতি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে ছাত্রদের চাকরীর পিছনে না ছুটে গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করতে উপদেশ দিলেন।

ছাত্র প্রতিনিধিদল অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীপন্থজীকে প্রশ্ন করে বসে যে, ছাত্ররা যদি খেতে না পায় তাহলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কর্মক্ষমতার বিকাশ কেমন করে ঘটবে? তাই মন্ত্রীদের একটু ধৈর্য্য ধরে ছাত্রদের সুবিধা, অসুবিধা শোনার প্রয়োনীয়তার দিকে নজর দিতে নির্দেশ দেবার জন্য পন্থজীকে অনুরোধ জানিয়ে ও ধন্যবাদান্তে আলোচনা শেষ হল। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হল না। উপরন্তু অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীরা ছাত্রদের নিজস্ব উদ্যোগে যে কোন ধরনের আন্দোলনের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না— সেটা খুবই পরিষ্কার হল।

অক্টোবরের শেষের দিকে আরও দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উত্তরপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলনের তালিকায় যুক্ত হয়। একটি 'লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজে'র ছাত্র ধর্মঘট, অন্যটি 'উত্তরপ্রদেশ ছাত্র সম্মেলন'। উত্তরপ্রদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে উঠল সভ্যসংখ্যা বাড়ল হাজারে হাজারে। 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ সম্পাদক আনসার হারবানী, প্রেমনারায়ণ ভার্গব উভয়েই মূলত উত্তরপ্রদেশে ছাত্রনেতা। লাহোর ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে' উত্তরপ্রদেশের ছাত্র প্রতিনিধিরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বিহার

তৎকালীন সেন্ট্রাল প্রভিন্স, বিহার প্রভৃতি স্থানে ছাত্র আন্দোলন পাঞ্জাব বা বঙ্গদেশের অনেক পরে গড়ে উঠেছিল। তবে সর্বত্রই অসংগঠিতভাবে ছাত্ররা ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন ও অহিংসা-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৩৪ সালের পূর্বে সেন্ট্রাল প্রভিন্সে সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা ধরনের ৬০টি ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণে ছাত্রদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে, কিছু কিছু সংগঠন সমাজ সেবা ও সংস্কারের কাজে ছাত্রদের সচেতন করার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল।

১৯৩৫-এ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার জুবিলী উৎসব নাগপুরে পালিত হওয়ার সময় নাগপুরের ছাত্ররা সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ছাত্রদের ৪-দিন ব্যাপী এক ছাত্র সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পন্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লার সভাপতিত্বে ৫৭৭ জন ছাত্র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলন থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধাগুলি এবং ছাত্রদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত ও ব্যাপক ও সর্বাত্মক করে তোলার ডাক দিয়ে এক জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। এই সম্মেলন থেকেই লক্ষ্ণৌতে ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য আহুত আসন্ন সম্মেলনে ১৬ জনের এক প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। উত্তরপ্রদেশের বাইরে এই ছাত্র প্রতিনিধি দলই ছিল সর্ববৃহৎ।

এ ছাত্র সম্মেলন থেকে ছাত্র ফেডারেশন গঠনের পরে পরেই সেন্ট্রাল প্রভিন্সের নানা জায়গায় ছাত্র ফেডারেশনের শাখা গড়ে উঠতে লাগল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মালকানুর, ওয়ার্দা, জব্বলপুর, আমরোতির মত জায়গাগুলি। অবশ্য নাগপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় ছাত্র সংগঠন বেশ সক্রিয় ছিল।

'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিহারে উল্লেখ করার মত কোন ছাত্র আন্দোলন বা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গঠিত হবার পরই অন্য প্রদেশের ছাত্র নেতারা বিহারে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বিহারের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলে ১৯৩৭-এর এপ্রিলে গয়া জেলায় ছাত্রদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রান্তে ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। যেমন গয়া, জেহানাবাদ, পাটনা প্রভৃতি জায়গায়।

অবশ্য ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের প্রতিবাদে সারা দেশে এপ্রিলের প্রথমে প্রতিবাদ হরতাল পালিত হয়; বিহারের ছাত্র সমাজও ব্যাপকভাবে সেই হরতালে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অংশ নেয়। ধর্মঘটের পর ছাত্র শোভাযাত্রায় আওয়াজ উঠল 'দাসত্বের এই সংবিধান ধ্বংস হোক'। পুলিশ ছাত্র শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালায়। গয়ায় স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রদের হরতাল ও শোভাযাত্রায় যোগদানের অপরাধে প্রকাশ্যে বেত মারা হয়।

এইসময় 'ছাত্র সংঘ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন সেবামূলক কাজ ও ছাত্রদের সামাজিক চেতনা জাগরণের কাজে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তারা বিতর্ক সভা, খেলাধূলার নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন থেকে শুরু করে, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, জাতপাতের সমস্যা, জাতীয় শিক্ষা; এমনকি নিরামিষ ভোজনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা-সভা বিতর্ক-সভার

আয়োজন করত। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রত্যক্ষভাবে এই সংগঠনকে পরামর্শ, উপদেশ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে শক্তিশালি হয়ে উঠতে খুবই সাহায্য করতেন। তাঁর প্রেরণায় বহু বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিক্ষক, জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মীরাও ছাত্র কর্মীদের নানাভাবে শিক্ষিত করার কাজে এগিয়ে আসেন।

যখন ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনেই বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, তখন বিহারের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে ঐ নির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থনে কাজ করেছে।

অবিভক্ত বাংলা

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধ চলাকালীন সময় ভারতকে দায়িত্বশীল ব্যাপক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি ইংরাজ সরকার দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রয়োজন ইংরাজ সরকারের ছিল না। তারা ১৯১৯-এ মন্টেগু চেমফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত 'ভারত শাসন সংস্কার আইন' নামে যে আইন উপস্থিত কবল, সেটাকে ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কোন নামেই অবহিত করা যায় না। ইংরাজ সরকার ভালই জানত যে তাদের এই ঠগনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তাই সমস্ত প্রকার আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই সময়ই চরম দমনমূলক আইন, যা ইতিহাসে কুখ্যাত 'রাউলাট আইন' প্রণয়ন করে। কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতবিরোধী রাউলাট সাহেবের নেতৃত্ব ও সভাপতিত্বে একটি কমিটি এই আইন প্রণয়ন করায় ঐ আইন 'রাউলাট আইন' নামেই কুখ্যাত হয়। এই কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন বাঙালি ব্যারিস্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্র। তার এই ভারত-বিরোধী কাজের পুরস্কার হিসাবে ভারত সরকার তাকে 'স্যার' উপাধি দেয়। আর বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষ তাকে ঘৃণা ও বিদ্রূপের সঙ্গে বলত 'রাউলাট মিত্র'। এই আইনের বলে বিনা বিচারে আটক, বেপরোয়া অত্যাচার, সবরকম সভা- শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা হল। ফলে সঙ্গতভাবেই দেশের মানুষের ঘৃণা ও ক্রোধ রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত হল। এইসময় যুদ্ধোত্তরকালে ইংরাজ সরকার ভারতের মানুষের ওপর তাদের অর্থনৈতিক শোষণ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে লাগল। যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের সহায়তা হতে পারে ও সরবরাহ অব্যাহত থাকবে এই আশায় সেইসময় কিছু কিছু শিল্প উৎপাদনে যেমন লোহা, স্টীল ভারতীয় শিল্পপতি ও উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল, সে সব বন্ধ করা হল। তার ফলেই অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র হল। এই অবস্থায় স্বভাবতই দেশের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে বাধ্য। এর পাশাপাশি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে চলছিল সাম্রাজ্যবাদীদের অমানবিক হস্তক্ষেপ। ফলে ভারতে মুসলিম জনমতও ইংরাজ-বিরোধী হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময় কারারুদ্ধ সংগ্রামী জননায়ক 'আল হেলাল' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এসেই ঘোষণা করলেন— 'বিদেশী দাসত্বকে কোন মুসলমান মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারে না'। বাংলার জননায়ক চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ 'রাউলাট আইনে'র বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলেন। গান্ধীজীসহ সমস্ত সর্বভারতীয় নেতারা এই আইনকে ধিকৃত করলেন। গঠিত হল 'রাউলাট আইন'কে অকেজো করে দেবার জন্য 'বাউলাট আইন বিরোধী সংগ্রাম কমিটি'। এই কমিটির পক্ষ থেকেই গান্ধীজী ১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত 'রাউলাট আইন বিরোধী জাতীয় সপ্তাহ' পালনের আহ্বান

জানালেন। আহ্বান জানানো হল ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালনের। এই আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া দিল বাংলার ছাত্র-যুবসমাজ। ৬ই এপ্রিল সারা ভারত এক অভূতপূর্ব হরতাল পালন করল। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। দমননীতি তীব্র থেকে তীব্রতর হল। ১০ই এপ্রিল কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি চলল। কয়েকজন নিহত হলেন। কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনায় আহ্বান জানালেন। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ, বিশেষভাবে কলকাতার সমগ্র ছাত্র সমাজ এই নৃশংস দমননীতির বিরুদ্ধে স্কুলে, কলেজে ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানাল।

এই সময় ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ঘটল নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ ক্রোধে ফেটে পড়ল। স্বভাব নম্র গান্ধীজী পর্যন্ত বললেন— 'এই শয়তান সরকারের সংশোধন অসম্ভব, একে খতম করতে হবে।' রবীন্দ্রনাথ ঘৃণায়, ক্ষোভে ইংরাজের দেওয়া 'স্যার' উপাধি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এসে দাঁড়ালেন ক্ষুব্ধ, অপমানিত, অত্যাচারিত দেশবাসীর পাশে।

১৯২০-র সেপ্টেম্বর মাসে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় বললেন যে— 'আমরা একটা বিপ্লবী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছি।' ১৯২০-র ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ঘোষণা করা হল যে— ভারতের লক্ষ্য 'স্বরাজ' এবং সেই স্বরাজ অর্জনের পথ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালেন লালা লাজপত রায়, বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা আলিভ্রাতৃদ্বয় মহম্মদ আলি ও শওকত আলি।

এই আহ্বানে সবার আগে সারা দিল বাংলার ছাত্র সমাজ। এরই সঙ্গে উঠতে লাগল স্বদেশী শিক্ষার দাবি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজের পরিবর্তে চাই জাতীয় স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২০-র ২৫শে ডিসেম্বর নাগপুরে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে 'সর্বভারতীয় কলেজ ছাত্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হল। তিনি তার সভাপতির ভাষণে তৎকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন ও ঐ শিক্ষা কিভাবে ছাত্রদের দেশাত্ববোধহীন জনবিরোধী করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে— আমি তাদের দলে নই, যারা মনে করেন বা বলেন ছাত্ররা, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। আমার মতে এই তত্ত্ব নিতান্ত অবাস্তব ও মূর্খের তত্ত্ব।

লালাজী বিস্তৃতভাবে স্বরাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে মাতৃভূমির জন্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন।

পরের দিনের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন বম্বে ক্রনিক্যালের সম্পাদক মিঃ পিচেল। সভায় অসহযোগ আন্দোলন ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও তাদের পরিচালনাধীন স্কুল, কলেজ বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। যদিও এই প্রস্তাবের সপক্ষে বিপুল সমর্থন থাকলেও বিরোধিতাও একেবারে ছিল না তা নয়।

সম্মেলনের বিবরণে দেখা যায় উপস্থিত ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে মাদ্রাজের ৫০জন পক্ষে, ১জন বিপক্ষে। বোম্বের ৮৭জন পক্ষে, ২২জন বিপক্ষে। বাংলাদেশের ৪২জন পক্ষে, ২৭জন বিপক্ষে। মধ্যভারত, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের প্রতিনিধিরা সকলেই প্রস্তাবের পক্ষে

উল্লেখযোগ্য সাড়া দেন, পাঞ্জাবেরও ২/১জন ছাড়া সকলেই সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ১৩২জন পক্ষে, ৩২জন বিপক্ষে ভোট দেয়।

অবশেষে অসহযোগ ও স্কুল-কলেজ বয়কট সংক্রান্ত প্রস্তাব বিপুল ভোটে গৃহীত হলেও কার্যকালে লক্ষ্য করা গেল এই আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে এবং তারপরই পাঞ্জাবে যে ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করেছিল, তেমন আর কোথাও ঘটেনি।

১৯২৯-এর জানুয়ারিতে কলকাতার কলেজের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হল। আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল বঙ্গবাসী, বিদ্যাসাগর, রিপন (সুরেন্দ্রনাথ), সিটি কলেজের ছাত্ররা। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের শিক্ষায়তনকে জাতীয় শিক্ষায়তন হিসাবে ঘোষণার দাবি জানাতে লাগল।

১৬ই জানুয়ারি দুপুরের মধ্যে কলকাতার প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজ খালি করে ছাত্ররা বেড়িয়ে এসে মির্জাপুর পার্কে (শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) সমবেত হল। সভায় ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ওয়ালিদ হাসান প্রমুখ সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

২০শে জানুয়ারি কলকাতার প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজ খালি করে হাজার হাজার ছাত্র বন্যার স্রোতের মত কলকাতার রাস্তায় নেমে এল। মির্জাপুর পার্কে তিন হাজার ছাত্রের সমাবেশ নেতৃবৃন্দ আবেগকম্পিত কণ্ঠে 'বাংলার ছাত্র সমাজ আমি তোমাদের নমস্কার করি' উক্তির মধ্যে দিয়ে আন্তরিক অভিনন্দন জানালো। ইতিমধ্যে দুটি ঘটনা ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এরপূর্বে দেশবন্ধু ছাত্রদের এক সভায় অতিদ্রুত জাতীয় শিক্ষায়তন খোলার সংকল্প ও প্রস্তুতির কথা বলেন। শান্তিনিকেতন থেকে দীনবন্ধু সি এফ এন্ড্রুজ জাতীয় শিক্ষায়তন খোলা হলে, তিনি সেখানে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে এক তারবার্তা পাঠালেন। সেই সঙ্গে দেশবন্ধুর ব্যারিস্টার পেশা পরিত্যাগ ও নিজের সমস্ত কিছু জাতীয় আন্দোলনের জন্য প্রদান ছাত্র সমাজের মধ্যে স্বাদেশিকতার এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করল।

২৩শে জানুয়ারি গান্ধীজী কলকাতায় এলেন। বাংলার ছাত্র, যুব শক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন 'স্বরাজ প্রথমে তারপর শিক্ষা'। কলকাতার ছাত্রদের আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া দেখে তিনি আরও বললেন, 'ছাত্রদের কাছ থেকে এর কিছু কম আশা করিনি। আমি ভরসা করি তোমরা আরও অনেক বেশী সাড়া দেবে। বাংলার ছাত্র সমাজই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।'

(তেন্ডুলকার, মহাত্মা গান্ধী, দ্বিতীয় খণ্ড)

কলকাতার ছাত্রদের এই উদ্দাম আন্দোলন দ্রুত বাংলার বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ময়মনসিং, ফরিদপুর, বরিশাল, চাঁদপুর, ঢাকা, খুলনা সহ বহু মফঃস্বল শহরে ছাত্রদের ধর্মঘটে কলেজ, স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে রইল। ছাত্ররা স্কুল-কলেজের দরজার সামনে শুয়ে পড়ে পিকেটিং করত। সাধারণভাবে কোন বাঙালি অধ্যাপক শিক্ষক তাদের অতিক্রম করে শিক্ষায়তনে প্রবেশ না করলেও সময় সময় ইংরাজ শিক্ষক ও কর্মকর্তারা ছাত্রদের মারিয়ে শিক্ষায়তনে ঢোকার চেষ্টা করতেন। যাইহোক ছাত্রদের প্রতিরোধের ফলে ঐ বছর B. L. পরীক্ষায় ৫০০জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১৫০জন পরীক্ষায় বসেন।

এইসময় আর একটি উল্লেখযোগ্য অথচ মজারও বটে এমন একটি ঘটনা ঘটল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য (Vice Chancellor) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ধর্মঘটি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, তিনি ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে প্রস্তুত আছেন যদি একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এক কোটি টাকা তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি তার প্রস্তাবটি গুরুত্ব সহকারে বিচারের জন্য অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা কমিটিকে আহ্বান জানালেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাবের উত্তরে তাঁকে লিখলেন যে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যদি হাইকোর্ট বার থেকে অবসর নিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে ওঁর প্রস্তাবিত পরিমাণের টাকার তিনি অর্থাৎ দেশবন্ধু ব্যবস্থা করবেন। যাই হোক দেশবন্ধুর এই পাল্টা প্রস্তাবের কোন প্রতিক্রিয়া আর স্যার আশুতোষের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত— স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে গান্ধীজীর আহ্বানে বাংলার ছাত্র সমাজের সাড়া ও অংশগ্রহণ কত ব্যাপক হয়েছিল তার চেহারা আমরা ১৯২১-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বিবৃতি থেকেই বুঝতে পারি। তিনি তার বিবৃতিতে বলেন যে—'এটা পরিস্কার যে কেবলমাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র যারা কলেজে পড়ার বয়সের নিচে তারা স্কুল ত্যাগ করে বর্তমানে অলস জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। যদি তাদের শিক্ষা জীবন একেবারেই শেষ হয়ে না থাকে অন্তত সাময়িকভাবে অবশ্যই বন্ধ হয়ে আছে।' তিনি আরও বলেন যে, কেবলমাত্র পরীক্ষার ফি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। তিনি জনসাধারণের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তার বিবৃতিতে ধর্মঘটি কলেজ ছাত্রদের সংখ্যার কোন উল্লেখ না থাকলেও, কেবলমাত্র স্কুল-ছাত্রদের সংখ্যার উল্লেখেই অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা বোঝা যায়।

ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শপথ নিয়েছিল, স্বরাজ অর্জন না করে আমরা স্কুল-কলেজে ফিরব না। কিন্তু চৌরীচৌরায় হিংসার অজুহাতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা দেখা দেয় এবং কংগ্রেসের আন্দোলনে তাদের আস্থা বেশ হ্রাস পায়। এরই ফলে ছাত্রদের কিছু অংশ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি আকর্ষিত হয়। সেইসঙ্গে বামপন্থী জঙ্গী আন্দোলনের ঘাঁটিও ছাত্রদের মধ্যে বাড়তে থাকে।

১৯২১ সালে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসেন। তার ভারত আগমনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশে এই বয়কট আন্দোলন সফল করার নেতৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তরুণ জননেতা সুভাষচন্দ্র বসুর উপর। তিনি প্রধানত নির্ভর করেছিলেন শত শত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের উপর। ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ যেদিন কলকাতায় এলেন, সেদিন কলকাতায় হরতাল পালিত হয়। হাটবাজার দোকানপাট সব বন্ধ। সর্বত্র স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালন করে ছাত্ররা কাতারে কাতারে কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য যুবরাজের যাত্রাপথের দু'পাশে পুলিশের দমন পীড়ন উপেক্ষা করে সমবেত হয়। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচালনা করল। কিন্তু ছাত্ররা 'স্বাধীন ভারতের জয়', 'যুবরাজ ফিরে যাও' ধ্বনি দিতেই থাকে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৈমনসিং, ফরিদপুরের মত ১৯২১-২২ মেদিনীপুর জেলাতেও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। মেদিনীপুরে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা

তখন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তিনি গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন, চৌকিদারী ট্যাক্স না দিতে আহ্বান জানালেন। এই আন্দোলনে তার প্রধান সহায় হল স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। তারা ব্যাপকভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তমলুক মহকুমার মহিষাদলের একটি গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এই বিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন সদ্য B. Sc. পাশ করা ছাত্র গুণধর হাজরা। তাকে সাহায্য করার ভার নিলেন বঙ্গবাসী কলেজের B. Sc. ক্লাসের ছাত্র শ্রীপতিচরণ কয়াল ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র সতীশচন্দ্র সামন্ত, '৪২ সালের আন্দোলনে যিনি খুবই অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। সরকারি দমনপীড়নে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। গুণধর হাজরা ও শ্রীপতিচরণ কয়াল কারারুদ্ধ হন। গুণধর হাজরা কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। গুণধর হাজরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে তমলুক মহকুমার প্রথম শহিদ। আসাম থেকে চা-কর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারে হাজার হাজার চা-শ্রমিক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পায়ে হেঁটে চাঁদপুরে উপস্থিত হয়। তারা দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করে। চাঁদপুরেও তাদের উপর চা-কর সাহেবদের প্ররোচনা ও নির্দেশে ইংরাজ ও গুর্খা সৈন্যরা অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রেলশ্রমিক, জাহাজের খালাসীরা ধর্মঘট করে। দেশবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ জননায়করা সেখানে ছুটে যান। ছাত্ররা নিজেরা ধর্মঘট করেছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, চাঁদপুরে, গোয়ালন্দে শ্রমিক ও অন্যদের হরতাল পালনে সংগঠিত করতে সক্রিয় সাহায্য করেছে--- বাংলার ছাত্রসমাজের এই ধরনের কার্যক্রম সম্ভবত এই প্রথম।

অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সত্ত্বেও বিশেষ কোন ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ সহ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গড়ে উঠতে পারল না। ইতিমধ্যে 'স্বরাজ দল' গঠিত হয়েছে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারা আইন সভা, কলকাতা পৌর সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। বিপুল জয়লাভ করেছে স্বরাজপার্টি। কিন্তু ছাত্রদের নবজাগ্রত সংগ্রামী চেতনা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা চাইল আরও ব্যাপক সংগ্রামী কর্মসূচি। ফলে একদল ছুটল বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে, আর একটি অংশ প্রভাবিত হতে লাগল রুশ বিপ্লবের সাফল্যে সাম্যবাদী ভাবধারায়। এর ফলে এই সময় থেকেই ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ত্রিধারায় আদর্শগত পার্থক্য ও বিরোধ দেখা দিতে আরম্ভ করে। সে আলোচনায় আমরা অবশ্যই পরে আসব।

ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার কিছু কিছু চেষ্টা হলেও বিশেষ কোন ফল হল না। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র নেতা বিপ্লবী দলভুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত একটা ছাত্র সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি, তার একটি কারণ ঐ সময়ই নিরঞ্জন সেন 'নিবর্তনমূলক আটক আইনে' গ্রেপ্তার হয়ে যান।

১৯২৪-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতি করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন'। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন তরুণ ছাত্র শ্রী বীরেন দাশগুপ্ত। এর কোন প্রচেষ্টাই তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। এর পিছনে ব্যাপক ছাত্রের সমর্থন গড়ে না ওঠায় অল্পদিনের মধ্যে সংগঠনও লুপ্ত হয়ে যায়। নূতন উদ্যোমে বাংলাদেশে ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজ শুরু হয় সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায়।

এতদিন পর্যন্ত প্রথা ছিল প্রতিবছর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের পাশাপাশি একটি প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এমনি সম্মেলন হয়েছে কলকাতা, সিরাজগঞ্জ,

ফরিদপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বেশ কিছু জায়গায়। তবে প্রায়ই ছাত্রদের আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের জন্য রাজনৈতিক সম্মেলনের নেতাদের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিত। তা হলেও এইসব ছাত্র সম্মেলনের আসল নেতৃত্ব দিতেন রাজনৈতিক সম্মেলনের দেশনেতারা এবং সেখানকার নেতাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিরোধের ছাপ ছাত্রদের মধ্যেও পড়ত। এমনকি স্বরাজের সংজ্ঞা নিয়েও দেশনেতাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

এছাড়া সেই সময় কবি নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকা ছাত্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নজরুলের জ্বালাময়ী লেখা ছাত্রদের খুবই অনুপ্রাণিত করত। তেমনি ছাত্রদের কাছে প্রিয় ছিল নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি কবিতা। ছাত্ররা সভা-শোভাযাত্রায় প্রায়ই নজরুলের গান গাইত।

এই সময় থেকেই ছাত্রদের উপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব বাড়তে থাকে— যাঁরা এই প্রভাব বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন তারা হলেন বিপ্লবী শচীন সান্যাল। ১৯২১-২২ 'শঙ্খ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তার ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেনিন ও সমসাময়িক রাশিয়া। ছাত্র সরোজ আচার্য 'নব্য রাশিয়া' নামে বই লিখলেন, ঢাকার অধ্যাপক অতুল সেন লিখলেন 'বিপ্লবের পথে রাশিয়ার রূপান্তর'। ১৯২২ সালে 'শঙ্খ' পত্রিকায় বার্লিন থেকে লেখা প্রাচীন বিপ্লবী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর একটি চিঠি প্রকাশিত হল। সেই চিঠিতে তিনি ছাত্রদের মার্কসবাদের চর্চা করতে ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন প্রসারিত করার কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। ১৯২৬-এ কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিয়ন পত্রিকায় রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কলেজ ছাত্র প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এক কথায় বলা চলে, ১৯২০-র পর থেকে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে ও তাদের আন্দোলনে কমিউনিস্ট ভাবধারায় ছাপ পড়তে শুরু করে। ১৯২৬-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ছাত্রদের প্রভাবিত করে সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু হয়। সেক্ষেত্রেও কমিউনিস্ট ধারার মধ্যে নানা বিভেদ ও বিরোধ ছাত্রদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে হয়েছে, ট্রটস্কিপন্থীদের নিয়ে হয়েছে, মানবেন্দ্র রায়ের ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। এই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে, সেই সময় স্পেন, ইজিপ্ট, জার্মানী, চীন, সোভিয়েত রাশিয়ার ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ সহ সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রদের এক নতুন দৃষ্টিতে সমাজ ও রাজনীতিকে দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

যাই হোক ভারতের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সে সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য 'সাইমন কমিশন' নামে এক রাজকীয় কমিশন গঠন করা হয়। ঠিক হয় যে এই কমিশন ভারতে সরেজমিনে দেখবে ও আলোচনা করে তাদের সুপারিশ বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে উপস্থিত করবে। 'সাইমন কমিশন' কোন ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ না করায় ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল— স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে যে কমিশন ভারতে তথাকথিত সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য আসছে, তাকে বয়কট করা হবে। সারা দেশে যেখানেই 'সাইমন কমিশন' যাবে হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা মিছিল করে কাল পতাকা দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান হবে।

১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন বোম্বাই-এ উপস্থিত হল। ঐ দিন

কংগ্রেসের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে সমগ্র দেশ হরতাল পালন করে দ্ব্যর্থহীনভাবে 'সাইমন কমিশনে'র বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনোভাব ঘোষণা করল। কলকাতার ছাত্রসমাজ স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হল। কলকাতার এই ধর্মঘটে নতুন মাত্রা যোগ করল প্রেসিডেন্সি কলেজের ধর্মঘট ও ঐ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ঘটনাবলী। প্রেসিডেন্সি কলেজ একদিকে পুরোপুরি সরকারি কলেজ, তদুপরি দেশের সেরা মেধাবী ছাত্ররা ওখানকার ছাত্র। সেই অবস্থায় ঐ কলেজে ধর্মঘটে কর্তৃপক্ষের ক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেয় প্রেসিডেন্সির অন্যতম সেরা ছাত্র প্রমোদ ঘোষাল। প্রমোদ ঘোষাল ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংসদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ও পরে 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি'রও তিনি প্রতিষ্ঠাতা (A.B.S.A)। ১৯২৮-এর ২০শে জানুয়ারি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের ছাত্র সভায় প্রমোদ ঘোষালের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম' গান গাওয়া হয়। বুকে কংগ্রেস ফ্ল্যাগ ধারণ করে ছাত্ররা। ছাত্র নেতাদের বক্তৃতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশংসা করা হয়। এইসব কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। ফলে ৩রা ফেব্রুয়ারি যখন ছাত্র ধর্মঘট চলছে তখন এদেরই প্ররোচনায় পুলিশ প্রমোদ ঘোষাল সহ নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের নির্দয়ভাবে লাঠি পেটা করে আহত করল।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র কলকাতার সমস্ত ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই প্রথম ছাত্রীবাও ধর্মঘট করে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিল। হাজার হাজার ছাত্র কলেজ স্কোয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হল। পুলিশী অত্যাচার ও সাইমন কমিশন বিরোধী ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রীরামপুর, হুগলীতে ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পুলিশ তাণ্ডব চালাল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ স্টেপলটন প্রমোদ ঘোষাল সহ কয়েকজন ছাত্রনেতা ও কর্মীকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করলেন। বহিষ্কৃত হল ঐ একই কারণে স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইডেন হিন্দু হস্টেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। এর প্রতিবাদে স্কটিশচার্চ কলেজে ধর্মঘট চলতে লাগল। প্রেসিডেন্সি কলেজ আগেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের নিজস্ব স্থায়ি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনা বাড়তে থাকে। এই লক্ষ্যে ১৯২৮-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারি জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকেই আরও বৃহত্তর ছাত্র সভার আয়োজন করা হল। ৬ই মার্চ এই সভা অনুষ্ঠিত হল এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য এক আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হল। শচীনচন্দ্র মিত্র, অক্ষয় সরকার, বীরেন দাশগুপ্ত ও রেবতী বর্মনকে নিয়ে। শেষোক্ত দু'জন পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্মী ও নেতা হয়েছিলেন।

ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টাই রূপায়িত হল ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে (মির্জাপুর পার্ক) ৫০০-র বেশি ছাত্র প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ছাত্র সম্মেলনে। জন্ম নিল 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র এসোসিয়েশন'। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে। ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এই প্রচেষ্টা 'ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন যা ছাত্ররাই পরিচালনা করবে'—একটি অত্যন্ত সাফল্যজনক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা অবশ্য চেয়েছিলেন

ছাত্রদের জন্য, ছাত্রদের দ্বারা, ছাত্রদেরই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে। অবশ্য সে আশা ঐ সময়ে বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্রদের এই সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর উদ্বোধনী বক্তৃতা যেমনই তাৎপর্যপূর্ণ ঠিক তেমনি সুদূরপ্রসারি ছিল তার প্রভাব। বিশেষকরে বাংলার ছাত্রদের মধ্যে যারা ছাত্র আন্দোলনের একটা আদর্শগত ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য ভাবতে শুরু করেছিলেন। পণ্ডিতজী তার বক্তৃতায় বললেন : 'বাংলার তরুণ-তরুণীরা তোমরা কি সাহসের সঙ্গে ভাবতে ও এগোতে প্রস্তুত আছো। শুধু উদ্ধত বিদেশীদের দেশ থেকে তাড়ালেই চলবে না। নিজের দেশে ও সারা পৃথিবীতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ... সোভিয়েত রাশিয়াই আজ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা বড় ও দৃঢ় শত্রু। প্রাচ্য জগতে সোভিয়েত রাশিয়া দেখা দিয়েছে বন্ধুর মূর্তি নিয়ে। রাজ্যালোলুপ দেশের চেহারা নিয়ে নয়। তাকে আমরা কেন সাদর অভ্যর্থনা জানাব না?'

এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও বললেন, 'পৃথিবীকে যদি অত্যাচার ও বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি দিতে হয়, তবে সমাজতন্ত্রই আমাদের একমাত্র পথ।'

(ফরওয়ার্ড, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮)

নবগঠিত নিখিল বঙ্গ ছাত্র এসোসিয়েশনের সভাপতি হলেন প্রমোদ ঘোষাল, অন্যতম সহ-সভাপতি শচীনচন্দ্র মিত্র, সম্পাদক নির্বাচিত হলেন বীরেন দাশগুপ্ত।

বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ সংগঠন হাতে নিল। অক্টোবর মাসে সংগঠনের প্রথম কাউন্সিল সভায় নেহরুজী তার মূল্যবান সুপারিশ ও উপদেশে সংগঠনকে নতুন কার্যক্রম গঠনে প্রভূত সাহায্য করেন। কর্মসূচিতে স্থির হয় যে, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হবে। শহর ও গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নৈশবিদ্যালয় চালু করা হবে। ছাত্ররাই হবেন এইসব নৈশ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক। গ্রামের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহও হবে সংগঠনের কর্মীদের অন্যতম কাজ। সংগঠনের এইসব কর্মসূচি কতদূর কার্যকরী হয়েছিল, তার কোন বাস্তব মূল্যায়নের চিত্র আমাদের কাছে নেই। তবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এই সংগঠনের পতাকাতলে বিশাল ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংগঠনও ব্যাপকভাবে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ময়মনসিংহে যখন সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন A.B.S.A-এর সদস্য সংখ্যা ২০,০০০ (বিশ হাজার)-এরও বেশি। সংগঠনের পক্ষ থেকে এইসময় নানা ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজও গ্রহণ করা হয়। ময়মনসিং-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পাঞ্জাবের ডঃ মোহম্মদ আলম। এই সময় A.B.S.A-এর পক্ষ থেকে ইংরাজী ভাষায় একটি মুখপত্র প্রকাশ করা হয়। তার সম্পাদক হলেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। পত্রিকাটি দেশে, বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনাসমৃদ্ধ হয়ে খুবই উচ্চস্তরের পত্রিকার মর্যাদা পেয়েছিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা সংগঠিত করা হত। খুবই উল্লেখযোগ্য যে এদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার প্রবর্তন করার সুপারিশ অন্যতম।

ঠিক এই সময় লাহোরে সাইমন কমিশন বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় লালা লাজপত রায় আহত হয়ে কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লালাজীর মৃত্যুতে কলকাতার

ছাত্ররাও লাহোরের ছাত্রদের মতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রদের বিশাল শোকসভা। সভায় সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল যে, 'সাইমন কমিশন' কলকাতায় এলে তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্ররা সর্বাত্মক প্রতিবাদ হরতাল পালন করে ঐ কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও ধিক্কার জানাবে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী মতাবলম্বী কিছু ছাত্র ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনের সময় কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে তরুণ সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে সমবেত কয়েকশত তরুণের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ছাত্র। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী সাম্যবাদী তাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বক্তা ছিলেন পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু।

'সাইমন কমিশন বিরোধী' দেশব্যাপী হাওয়ার তখন প্রচণ্ড বেগ। বাংলাদেশের ছাত্ররা প্রতিবাদের প্রথম সারিতে। এইরকম যখন অগ্নিগর্ভ অবস্থা তখন ১৯২৯-এর আগস্ট মাসে কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশাত্মবোধক গান ও বক্তৃতা করার অপরাধে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে অনুরূপ কারণে ইডেন হোস্টেল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে বহিস্কার করা হয়। প্রতিবাদে সেন্টজেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাই কেবল ধর্মঘট করল তাই নয় তাদের সমর্থনে ৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতার সমস্ত কলেজ ছাত্ররা ধর্মঘট করে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে (মির্জাপুর পার্ক) জমায়েত হল। এই প্রতিবাদ সভাতেও সভাপতিত্ব করলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ছাত্ররা দাবি জানাল বহিষ্কৃত ছাত্রদের বিনাশর্তে ফেরৎ নিতে হবে। ইংরাজ সরকারের সমর্থনপুষ্ঠ উদ্ধত কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনরকম সম্মানজনক মীমাংসায় রাজি না হওয়ায় বহু ছাত্র ঐ দুই কলেজ পরিত্যাগ করে, জাতীয়তাবাদী কলেজ বলে পরিচিত কলেজগুলি যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, রিপন প্রভৃতি কলেজে ভর্তি হয়। (লিবার্টি পত্রিকা)

এই সময় ১৯২৯-এ শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার ও ব্যাপ্তি অঙ্কুরে বিনাশ করায় ভারত সরকার ২০শে মার্চ সারা ভারত জুড়ে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট বন্ধুভাবাপন্ন শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করল। শ্রমিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে চালু হল কুখ্যাত 'নিরাপত্তা আইন'। বিপ্লবী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য শুরু হল চরম দণ্ডনীতি। এইসময় ভগৎ সিং-এর 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান সোসালিস্ট আর্মি' কর্তৃক আইনসভায় বোমা ফেলার ঘটনা সকলেরই জানা। ভগৎ সিং-এর অন্যতম সহকর্মী ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড অজয় ঘোষ মস্কো থেকে প্রকাশিত তার রচনা সমগ্রে 'ভগৎ সিং ও তার সহকর্মী' অংশে লিখেছেন যে, ১৯২৮ সাল থেকেই সমাজতন্ত্রই ছিল তাদের ধ্রুব ও ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তারা বিশ্বাস করতেন চরকায় নয় বোমায়। ভগৎ সিং ও তার সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হলে শুরু হয় 'দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'। এই মামলার অন্যতম আসামী বাংলার যুব নেতা বিপ্লবী যতীন দাস ৬৩ দিন ব্যাপী অনশনের পর লাহোর জেলে মারা যান। যতীন দাসের মরদেহ কলকাতায় পৌঁছাল ১৫ই সেপ্টেম্বর। পরের দিন যে শোভাযাত্রা বেরুল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর আর অত দীর্ঘ শোভাযাত্রা বেড়োয়নি। এই শোভাযাত্রায় ছিল কলকাতার ছাত্ররা। মফঃস্বল শহরে ছাত্ররা পালন করেছে শোক দিবস। অনশনে যতীন দাশের মৃত্যুতে গান্ধীজী প্রথমে রইলেন একেবারে নীরব। তারপর এক মাস বাদে ১৭ই অক্টোবর ১৯২৯-এ লিখলেন 'এই ধরনের উপবাস সমীচীন নয়।' গান্ধীজীর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

এর কিছুদিন পরেই ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন। এই সংবাদে হাজার হাজার ছাত্রসহ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'জয়তু চট্টগ্রাম'। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অনেকেই কিশোর-কিশোরী, ছাত্র। প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, কল্পনা দত্ত, আনন্দ গুপ্ত ছাত্র সমাজের চোখে হয়ে দাঁড়াল জ্বলন্ত আদর্শ। এইসব ঘটনার নায়কেরা ও দেশের মানুষের সামনে, বিশেষ করে ছাত্র যুব মানসে জ্বলন্ত মশালের প্রতীকচিহ্ন হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে আলোকিত করে তুলল।

ইংরাজ সরকার ভেবেছিল এইসব গ্রেপ্তার, দমন নীতি, ফাঁসি, কারারুদ্ধ করার পথেই এই দেশে তারা শ্রমিক আন্দোলন, সাম্যবাদী ভাবধারা প্রসার, বিপ্লবী কর্মের পথরুদ্ধ করে তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত এ দেশে তাদের রাজত্বও হবে চিরস্থায়ী। কিন্তু ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত। ২৯-৩০ সালের এইসব ঘটনাবলী বাংলাদেশের ছাত্র সমাজকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করেছে সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের দিকে, তেমনি ব্যাপকভাবে শত শত ছাত্রকে আকর্ষণ করেছে বিপ্লবী আন্দোলনে, সংগঠনে। ক্রমান্বয়ে ছাত্র যুব মন তথাকথিত আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহাকুল হতে থাকে। সেই সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পায় ১৯৩০-এর আইন অমান্য, সত্যগ্রহ আন্দোলন যখন জনগণের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করতে ব্যর্থ হল। প্রকৃতপক্ষে ৩০ পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস আন্দোলনের কথা ক্রমান্বয়ে অপ্রসাঙ্গিক হয়ে পড়ছিল। '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' থেকে যুদ্ধোত্তর সময়ে ৪৫-৪৬ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তরাঙ্গা দিনগুলি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক তৎপরতা এই সত্যই প্রমাণ করে। কংগ্রেস ও তার অনুগ্রহলাভে ইচ্ছুক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নেতারা যতই ঢোল পিটিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের কৃতিত্ব গান্ধীজী ও তার অহিংস আন্দোলনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিক না কেন।

সেই সময়কার বাংলার ছাত্র সমাজের মানসিক গঠন ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে এক সময়কার ছাত্রনেতা, পরে কমিউনিস্ট ও '৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচিত সভ্য কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণে বলেছেন 'বাংলার ছাত্র আন্দোলন তখন সাধারণভাবে জাতীয় আন্দোলনের অংশ হলেও পথ হাতড়ে বেড়াতে লাগল। একদিকে গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রতি আকর্ষণ, অপরদিকে ধীরে ধীরে রুশ বিপ্লবের অনুপ্রবেশ— এই দুই-এর মধ্যে চিন্তাশীল যুব-মন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠতে লাগল।' (স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর, ১৯৭৫, তুষার চট্টোপাধ্যায়) তবে ধীরে ধীরে সাম্যবাদী চিন্তা ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছাত্র আন্দোলনেও সংগঠনে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও জাতীয়তাবাদী ধারা মূলত ছাত্রদের প্রভাবিত করেছে।

ছাত্র সংগঠনে দলাদলি

বাংলার ছাত্র সমাজের মধ্যে যখন পথ খোঁজার একটা প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঠিক তখন বাংলাদেশের দুটি বিপ্লবী দল যুগান্তর ও অনুশীলন দলের মধ্যে বিরোধ চরম দলাদলি সৃষ্টি করল। A.B.S.A-এর ছাত্র নেতৃত্ব এই দলাদলির বাইরে থেকে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনকে

সক্রিয় রাখার পরিবর্তে নিজেরাই দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের এই দুই বিপ্লবী দলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। বাংলার দুই কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক হয়ে দাঁড়াল 'যুগান্তর' দল আর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পক্ষে দাঁড়াল 'অনুশীলন' দল। কংগ্রেসের এই দুই নেতার বিরোধ তখন তুঙ্গে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে A.B.S.A - ও ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর ময়মনসিং-এর সম্মেলনে ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। ছাত্র নেতাদের এক অংশ সুভাষ বসু, অন্য অংশ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সমর্থনে দাঁড়াল। দু'টুকরো হয়ে যাওয়া A.B.S.A.-ও স্বভাবতই দুর্বল হতে লাগল।

১৯৩০শে গান্ধীজী আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। ছাত্ররা হাজারে হাজারে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করল। গান্ধীজী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন যে 'আধুনিক কালে সর্বত্র বিপ্লবের প্রথম সারিতে ছাত্রদের দেখা গেছে। আমাদের এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ অহিংস, তার জন্য এই আন্দোলনে ছাত্রদের কাছে কম আকর্ষণীয় হতে পারে না।'

কলকাতার হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে সত্যগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন তাদের প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিলাতী পণ্য বর্জনের জন্য ছাত্রদের প্রচার ইংরাজ ব্যবসাদারদের বিশেষভাবে বিচলিত করে। ছাত্রদের এই প্রচার আন্দোলনকে মারাত্মক আখ্যা দিয়ে ঐ সময়কার ভারতসচিব পার্লামেন্টে তার অর্ধমাসিক রিপোর্টে দু'দুবার উল্লেখ করেন। ভেঙ্গে যাওয়া A.B.S.A.-র এক অংশ A.B.S.A নামে থাকলেও অন্য অংশ যারা সুভাষ বসুকে সমর্থন করে তারা তাদের নামকরণ করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন'। এরা আলাদা আলাদাভাবে মিলিত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের জোয়ারের মুখে এই বিভেদ প্রায়ই ছাত্ররা নিজেরাই মুছে দিত। A.B.S.A.-র আহ্বানে এলবার্ট হলে ৬ই এপ্রিল ১৯৩০ বাংলাদেশ থেকে ৭০০-রও বেশি প্রতিনিধি এক সম্মেলনে মিলিত হয় (তাদের দাবি অনুসারে) এবং 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছাত্র এসোসিয়েশন'কে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানায়। তারা অংশগ্রহণে অসম্মতি জানায় তবে আমন্ত্রিত হিসাবে সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। এই সম্মেলনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।

যাইহোক ১১ই এপ্রিল মিঃ গর্ডনের নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের একটি দল কলেজ স্কোয়ারে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেশে যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র লাঠি চালিয়ে অগণিত মানুষকে আহত করল। ৪০জনের মত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। ১৪ই জুলাই প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পিকেটিং করার সময় ছাত্রদের উপর লাঠি চলল, বহু সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হল। ১৮ই জুলাই বেথুন কলেজের গেটে সত্যাগ্রহ করার সময় ছাত্রী সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে তাদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯শে জুলাই স্কটিশচার্চ কলেজেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

৯ই সেপ্টেম্বর হাওড়া ময়দানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র সহ এক বিশাল জমায়েতের উপর পুলিশ আক্রমণ চালিযে বহু মানুষকে আহত ও গ্রেপ্তার করল।

লবণ আইন ভঙ্গ সহ আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন মফঃস্বল শহরসহ গ্রামেগঞ্জে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। বহু ছাত্রকর্মী গ্রামাঞ্চলে ট্যাক্স বন্ধ করে আইন অমান্য আন্দোলনকে কৃষক সমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্য গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, বরিশাল, ফরিদপুরে

ছাত্রদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখ্য। তবে মেদিনীপুরে এই আন্দোলন খুবই ব্যাপকতা লাভ করেছিল। তার মধ্যে আবার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল খুবই ব্যাপক ও তীব্র। এই দুই মহকুমায় সরকারি প্রচণ্ড চাপ ও দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে সমস্ত হাই স্কুলের ছাত্ররা একটানা ৬/৭ মাস স্কুল বর্জন করেছিল। শত শত ছাত্রকর্মী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। অগণিত ছাত্রকর্মী গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাজটি বাংলাদেশের বহু জেলাতেই ছাত্ররা করেছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন যখন ঝটিকা বেগে সমগ্র ভারতকে বাঁধন ছেড়া করেছে, ঠিক তখন ১৯৩১এ হল 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'। ঘোষিত হল যুদ্ধবিরতি। বাংলার ছাত্র সমাজ সার্বিকভাবে হল ক্ষুণ্ণ, মর্মাহত। তারা মনে করল স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপথগামী করা হচ্ছে। তদুপরি এই সময় ভগৎ সিং ও তার সহকর্মীদের ফাঁসি বাংলার ছাত্র সমাজকে উদ্বেল করে তুলেছিল। সকলেই আশা করেছিল, ভগৎ সিং প্রমুখের ফাঁসি রদ করার জন্য গান্ধীজী চেষ্টা করবেন। কিন্তু অহিংস গান্ধীজী হিংসাশ্রয়ী ভগৎ সিং-এর ফাঁসি রোধের কোনো চেষ্টা না করে নীরব থাকলেন। একটা হতাশা ছাত্র সমাজের মধ্যে বেশ ভালভাবেই পরিলক্ষিত হতে লাগল। ছাত্রদের একটা অংশ আরও বেশী করে ঝুঁকে পড়ল বিপ্লবী আন্দোলনের ও সংগঠনের দিকে। কিছু অংশ গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের পতাকা তলে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে হাত লাগাল, আর একটি ছোট অংশ সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদী আদর্শে ছাত্র সমাজকে অনুপ্রাণিত করার কাজে সচেষ্ট হল।

প্রথম পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ছাত্র-যুবদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস বাড়ল, তারা নানাভাবে বিপ্লবী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন কারণ যার সব কটির সঙ্গেই জড়িত ছাত্র এবং ছাত্রীরা।

১৯৩২-এর ৬ই জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তদানিন্তন বাংলাব গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন যখন বক্তৃতা করছেন, ঠিক সেইসময় তাকে গুলি করতে চেষ্টা করার দায়ে ডায়াসেসন কলেজের ছাত্রী বীণা দাসকে গ্রেপ্তার করা হল। বিচারের সময় বীণা দাস একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতির বক্তব্য সর্বদেশে সর্বকালেই ছাত্র সমাজকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা জাগাবে। তাই বিবৃতিটি নিচে উল্লেখ করা হল—

> 'I fired at the Governor, impelled by the love of my Country, which is being repressed, I thought that the only way to death was be offering myself at the feet of my Country, and thus make an end to all my sufferings. I invite the attention of all, the situation created by the measures of the Government which can unsex even a frail woman like myself, brought up in all the least traditions of Indian woman hood. I can assure all, that I have no short of feelings against Sir Stanly Jackson, the man, who is just as good as my father. But the Governor of Bengal represents a system which has kept enslaved 300 millions of my Countrymen."
>
> **(Court Proceeding of trial of Beena Das)**

১৯৩২ এর ২০শে জুলাই কলেজ স্ট্রিটে এক ছাত্র শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য সায়দা খাতুন

ও তরুলতা নামে এম.এ. ক্লাসের দুজন ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাদের ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। রয়াল এক্সচেঞ্জ-এর সামনে শোভাযাত্রা করার জন্যও ছাত্রীদের গ্রেপ্তার করে ঐ একই দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৫ই আগস্ট স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে গুলি করার অপরাধে যাদবপুর টেকনিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ২০/২২ বছরের যুবক হাবুল কুমার সেনকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ায় সময় পথে বিষ পান করে সে মৃত্যুবরণ করে।

১৯৩৩-এর ৩রা আগস্ট ডায়াসেসন কলেজের এক ছাত্রীকে রিভলবার রাখার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ একই অপরাধে আরও ৩জন ছাত্রীকে ১০ই আগস্ট গ্রেপ্তার করা হল। ২০শে অক্টোবর গ্রেপ্তার হলেন ডায়াসেসন কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী জ্যোতিকণা দত্ত, বিচারের এদের ৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। ইংরাজ সরকারের দমন নীতি চরম আকার ধারণ করল। এই দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে বাংলাদেশের হাজার হাজার ছাত্র আইন অমান্য করে বা বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণ করল।

১৯২৯ - ময়মনসিং-এ অনুষ্ঠিত A.B.S.A.-র সম্মেলনে ছাত্র সংগঠন ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যাওযার পর একটি A.B.S.A. নামেই থাকে, অন্যটি হয় B.P.S.A. (Bengal Presidency Student Association)। শাসকরা এই দুটি সংগঠনকেই বেআইনি ঘোষণা করে। জেলায় জেলায় চলল ছাত্রদের উপর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন বিশেষত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর জেলায়। শাসকরা স্কুল-কলেজকে বন্দি নিবাসে পরিণত করতে চাইল। ১৯৩০-৩৩ সালে বাংলাদেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের চরম হিংস্র নীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> 'যে সব ছেলেমেয়ের বয়স ১২ থেকে ২৫ এর মধ্যে, তাদের প্রত্যেককে সর্বদা সরকার দেওয়া পরিচয়-পত্র বহন করতে হত। হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কার কবা হয়। ছেলেমেয়েরা কি পোষাক পড়বে তাও সরকার স্থির করে দেয়। বহু স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া বা কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সাইকেল চড়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পুলিশের কাছে বহু ছাত্রকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হত। সূর্যাস্তের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হত, বহু ক্ষেত্রে সান্ধ্য আইন জারি ছিল।'

(নেহরু আত্মজীবনী থেকে)

গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতা—এই সময় সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই একটা হতাশার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। ছাত্র আন্দোলনেও তার ব্যতিক্রম হল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ করার জন্য ইংরাজরা সারা ভারতবর্ষকে এক বন্দিশালায় পরিণত করেছে। ছাত্র যুব সহ হাজার হাজার দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা যোদ্ধাকে কারান্তরালে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদের বেশি বিপদজনক মনে হয়েছে তাদের পাঠানো হয়েছে আন্দামানে দ্বীপান্তরে। গড়ে তোলা হয়েছে রাজপুতনার মরুভূমি অঞ্চলে দেউলী, ভুটান-বাংলা সীমান্তে বক্সার, খড়গপুরে হিজলীর মত সব কুখ্যাত বন্দি শিবির। হাজার হাজার ছাত্র-যুবকে গৃহবন্দি বা অন্যত্র অন্তরীণ করা হয়েছে।

বাংলার ছাত্রসমাজে সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনা

একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আপোষকামী কংগ্রেসের নীতি, অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার একটা বিরাট সংখ্যক দেশপ্রেমিক যুবশক্তি, যার মধ্যে ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ স্বাধীনতার জন্য অন্য রাস্তা খুঁজতে আরম্ভ করেছে।

রুশ বিপ্লবের সাফল্য চীন, স্পেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রগতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনের জঙ্গী কর্মীদের কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং অবশেষে তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর প্রভাব বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের উপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চলে ততখানি অনুভূত হয়নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯২৯-এ ৩০শে এপ্রিল ময়মনসিং-এ অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি'র সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছাত্রনেতা রেবতী বর্মনের বক্তৃতা—

> "মার্কসবাদ, লেনিনবাদের আলোকেই আজ সমস্ত বিপ্লবের পথ পল্লবিত। ... শাস্ত্রীয় মন্ত্র বা নেতাদের হুকুম নয়, বিপ্লবের আহ্বানই যৌবনের হাতে জয়পতাকার মত উড়বে, যৌবনের এই জয়যাত্রা কেউ রোধ করতে পারবে না।"

(লিবার্টি— ৫ অক্টোবর, ১৯২৯)

এই সম্মেলনে যখন 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র এসোসিয়েশন' ভেঙ্গে দু'টুকরো হল B.P.S.A.-র নেতৃবৃন্দ রেবতী বর্মনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অন্য অংশের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রভাবিত ও সহমত হয়েছিলেন! পরবর্তীকালে এই অংশই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে ছাত্র আন্দোলন পরিচালনায় অনেক বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট, কলকাতার রক্তাক্ত গাড়োয়ান ধর্মঘট, শোলাপুরে শ্রমিক শ্রেণির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় কমিউনিস্ট বন্দিদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনের সমর্থনে দৃপ্ত ঘোষণা, ছাত্রদের একটা বিরাট অংশকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল মানবেন্দ্র রায়ের ও তার অনুগামী রজনী মুখার্জী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী ছাত্র যুব গোষ্ঠী। সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিপ্লবী চিন্তাশীল যুব ছাত্র কর্মীদের নুতন সংযোগ কেন্দ্রগুলি।

এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে যে সব ছাত্রকর্মীরা ছাত্রদের নুতন চিন্তার পথে নেতৃত্ব দেবার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন মানবেন্দ্র নাথ রায়ের অনুগামী বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা রজনী মুখার্জীকে ঘিরে গড়ে ওঠা ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে ধরিত্রী গাঙ্গুলী, উমাপদ মজুমদার। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংঘের সনৎ রায়চৌধুরী, তরুন বন্দোপাধ্যায়। লেবার পার্টির ছাত্রকর্মী বিশ্বনাথ দুবে, প্রমোদ সেন, নন্দ বসু, বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই সময় সদ্য জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নৃপেন চক্রবর্তী (পরবর্তী সময় বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীও) এবং তার কিছু সহকর্মী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি পরবর্তী সময় বিশিষ্ট কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতা হিসাবে বিখ্যাত হন। ইনিও ১৯৬৯ সালের

পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন।) প্রমুখের চেষ্টায় 'বঙ্গীয় তরুণ ছাত্র' সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে 'All Bengal Student Association' ও 'Bengal Presidency Student Federation' উভয় সংগঠনই কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছিল।

১৯৩৫-এর ২৫শে ডিসেম্বরে কলকাতায় 'বঙ্গীয় ছাত্র লীগ' নামে আর একটি প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠন জন্ম লাভ করে। তার সম্পাদক হলেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য এর পূর্বে একটি 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সংগঠন' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়। তার জন্য ইস্তাহারও বিলি হয়ে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৩৫-এর ৯ই ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ারে অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ছাত্র প্রতিনিধিদের এক সভা থেকে তার ফলশ্রুতি 'বঙ্গীয় ছাত্র লীগ'। ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' জন্ম নিলে কলকাতায় ছাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন'। তার সাধারণ সম্পাদক হলেন কালিপদ মুখোপাধ্যায় (সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, পরে আইএনটিউসি-র কংগ্রেস নেতা), সভাপতি হলেন নির্দল বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মিঃ কে এম আহমেদ। প্রথম দিকে সমস্ত ছাত্রদের দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্বমূলক ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হলেও কেবলমাত্র কমিউনিস্ট প্রভাবিত ও ছাত্র লীগকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা লক্ষণীয়। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক ছাত্র লীগের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয়নি।

এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়—

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফতোয়া জারি করলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের সময় University Training Corps কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী বাহিনীকে ইউনিয়ন জ্যাককে অভিবাদন করতে হবে। মহড়া কুচকাওয়াজের দিন ছাত্রর. এই আদেশের প্রতিবাদ জানায়। কুচকাওয়াজের দিন বিদ্যাসাগর কলেজের একজন ছাত্র ক্যাডেট কুচকাওয়াজের সময় ইউনিয়ন জ্যাক অভিবাদন না করলে তাকে চাবুক মারা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা ধর্মঘট শুরু করলে তাদের নেতা ধরিত্রী গাঙ্গুলী ও উমাপদ মজুমদারকে শ্যামপ্রসাদবাবু বিদ্যাসাগর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে সমগ্র কলকাতার ছাত্ররা ধর্মঘট করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জমায়েত হয়ে সিন্ডিকেট সভার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ও দাবি করে যে, ঐ দুই বহিষ্কৃত ছাত্রদের উপর থেকে অবিলম্বে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে।

অবশেষে ছাত্রদের এই দাবি সিন্ডিকেট স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ছাত্রদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এই জয় অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩৭-৩৮-এ বাংলাদেশের ছাত্রদের দুটি আন্দোলন যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছিল তেমনি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি বন্দিমুক্তির জন্য, দ্বিতীয়টি স্কুলে ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি ও বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ শে ১১টি প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ৬টি প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মিলিত মন্ত্রীসভা। কৃষক প্রজাপার্টি দলের নেতা ছিলেন

জনাব ফজলুল হক, আর মুসলীম লীগের নাজিমুদ্দিন। নির্বাচনের পূর্বেই কংগ্রেস তার নির্বাচনী ইস্তাহারে দমন-পীড়নমূলক আইন রদ সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সেই মত কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি পান। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষক প্রজাপার্টি ও লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বন্দি মুক্তির প্রশ্নে নীরব রইলেন।

এই সময় ১৯৩৭-এর ২৪শে জুলাই আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত দুই শতাধিক বিপ্লবীদের মধ্যে ১৮৭ জন অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তারা দাবি জানালেন অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি ও তাদের দেশের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের এই দাবির সমর্থনে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে ছাত্র সমাজও উদ্বেল হয়ে উঠল তাই নয়, তারা দেশব্যাপী বন্দিমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করল। ২রা আগস্ট কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হল। ছাত্ররা বিরাট মিছিল করে এই সভায় যোগ দিল। সভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি লিখিত ভাষণে বললেন—

> "রাজনৈতিক বন্দিরা দাবি করিয়াছেন তাহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবি ন্যায্য এবং সামান্য।" ... "ভারতবর্ষে যে সকল প্রদেশে গণ প্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দিদিগকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচক সমস্ত বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।
>
> "শুধু বাংলাদেশেই শত শত যুবক এখনও বিনা বিচারে আবদ্ধ আছে; বাংলাদেশের প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে শাসকবর্গ জনমতের কোন তোয়াক্কাই রাখেন না। বাংলায় ব্যক্তি স্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক।
>
> "আমরা জানি, ইতিপূর্বে আর-একবার আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দিরা অনশন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনজন বন্দির মৃত্যু হইয়াছিল। অনশনকারী বন্দিদের বলপূর্বক খাওয়াইবার যে নিষ্ঠুর রীতি তাহাই ঐ তিনজনের মধ্যে দুই জনের মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ। আমরা আবার উহা অপেক্ষা অধিক বন্দিকে ঐরূপ শোচনীয়ভাবে মরিতে দিব কি? বাংলা গভর্ণমেন্ট দিবেন কি?
>
> "বাংলার গভর্ণমেন্টের নিকট আমার অনুরোধ তাহারাও বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্টের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া উদারতা ও সহানুভূতির সহিত রাজবন্দি ও রাজনৈতিক বন্দিদের সম্পর্কে বিবেচনা করুন। ...
>
> "ইউরোপের অন্যান্য দেশের গভর্ণমেন্ট বন্দিদিগকে ডেভিল দ্বীপ, লিপারী দ্বীপ বন্দিনিবাসে, অন্যান্য বিশেষভাবে রচিত নরকপুরীতে প্রেরণ করিয়া মানব পীড়নের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ইংল্যান্ড বন্দিদিগকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে দূরে কোন কুখ্যাত স্থানে প্রেরণ করিয়া তাহাদের দুঃখভার বৃদ্ধি করে না। তাহাদিগকে শুধু পরাধীন জাতিদের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়া আমরা যখন আতঙ্কিত হই, তখন এই বৈষম্যে আমাদের সকলের হৃদয় আহত হয়। আমাদের দেশের নামে আমি ইহারই প্রতিবাদ করিতেছি।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই শ্রাবণ ১৩৪৪, ৩রা আগস্ট ১৯৩৭)

এই সভা থেকেই 'আন্দামান রাজনৈতিক বন্দি সাহায্য সমিতি' গঠিত হয়। তার সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ও সম্পাদক হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমিতি ১৪ই আগস্ট 'আন্দামান বন্দি মুক্তি দিবস' পালনের আহ্বান জানাল। ঐ দিন ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে কলকাতার প্রায় সমস্ত কলেজ ও বহু স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের পরে যখন ছাত্র শোভাযাত্রা বেড়োয় তখন তার উপর পুলিশ লাঠি চালায়, ফলে বহু ছাত্র আহত হয়। কয়েকজন ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তারও করা হয়। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৫ই আগস্ট ১৯৩৭)। এই লাঠি চালনার প্রতিবাদে পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় দশ হাজার ছাত্র মিছিল করে যোগ দেয়, সভায় সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র বসু। (অমৃতবাজারে ১৬ই আগস্ট, ১৯৩৭)। এরপর চলতে থাকে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট। এই ছাত্র ধর্মঘট বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। ১৭ই আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিরাট ছাত্রসভা থেকে ঘোষণা করা হল— আন্দামান বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ছাত্রদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। (অমৃতবাজার ১৮.৮.৩৭)

২৮শে আগস্ট সারা বাংলাদেশে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হল। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্র নেতা নন্দলাল বসুর সভাপতিত্বে ছাত্র সভা থেকে ঘোষণা করা হল— আন্দামান বন্দিদের জীবন রক্ষা ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হলে চাই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুব সমাজের সকলের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির ঐক্য ও আন্দোলন।

(অমৃতবাজার ২৯.৮.৩৭)

এই সময় গান্ধীজী আন্দামানে অনশনরত বন্দিদের অনশন ভঙ্গ করার আবেদন জানিয়ে আশ্বাস দিলেন যে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে তিনি যথাসাধ্য করবেন। বন্দিরা অনশন ভঙ্গ করলেন ও কিছুদিনের মধ্যে তাদের দেশের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হল। যদিও সাধারণভাবে বন্দি মুক্তি সম্ভব হল ১৯৩৮ সালে।

১৯৩৮ এর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে আবার আন্দোলন শুরু করল। ১৪ই মার্চ সারা বাংলা বন্দিমুক্তি দিবস পালিত হল বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র সংগঠনের যৌথ আহ্বানে। কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভা হল যার অধিকাংশই ছিল ছাত্র-যুব। সভায় সভাপতিত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি ঘোষণা করলেন "আমাদের এই বন্দিমুক্তি আন্দোলন ততদিন থামবে না, যতদিন একজনও রাজবন্দি কারাগারে আটক থাকবে।"

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৫.৩.৩৮)

এই সর্বব্যাপক আন্দোলনের ফলে যার মধ্যে ছাত্ররা অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, জুলাই মাসে ফজলুল হক নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা বিনা বিচারে আটক ও অধিকাংশ দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজবন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি দেবার কথা ঘোষণা করলেন।

এই জয় বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রের অবদান ইতিহাসে উল্লেখের দাবি রাখে। এই আন্দোলনই আবার সারা বাংলাদেশে সর্বত্র ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তুলতে সাহায্য করল। অভূতপূর্ব উৎসাহে সর্বত্র গড়ে উঠল ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিট। তবে স্মরণ করা দরকার ১৯৩৭-৩৮ সালের ছাত্র ফেডারেশনে তখন জমায়েত হয়েছিল সব রকম রাজনৈতিক মতামত ও দলের সর্বস্তরের ছাত্রসমাজ। ছাত্রনেতৃত্বে যেমন ছিলেন উমাপদ মজুমদার, কমিউনিস্ট বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ

রায়ের অনুগামী ধরিত্রী গাঙ্গুলী, বলশেভিক পার্টি লেবার পার্টির বিশ্বনাথ দুবে, নন্দলাল বসু সহ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী ছাত্রনেতারা।

এ যুগে একদিকে যেমন সরকারিভাবে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের অজুহাতে চালু ছিল নানা রকমের দমন-পীড়নমূলক আইন; তারই পাশাপাশি স্কুলগুলিতে লেখাপড়া শেখাবার নামে চালু ছিল বেত্রাঘাতসহ নানা ধরণের দৈহিক নির্যাতনের ঢালাও ব্যবস্থা। নিয়মমাফিক লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার নামেই চলত এই সব। এর বিরুদ্ধে ছাত্র ফেডারেশন সারা বাংলাব্যাপী প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশেষে সরকারিভাবেই স্কুলে দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করার দাবি বহুলাংশে বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায়, মেদিনীপুরে ছাত্রদের উপর যে সব বিধিনিষেধ জারি ছিল, যেমন ছাত্রদের নিজ পরিচয়পত্র স্বরূপ নানা রং-এর কার্ড সঙ্গে রাখতে হত। প্রতিদিন বা নিয়মিত নিজেদের কার্যকলাপ ও গতিবিধি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বা থানাকে অবহিত রাখতে হত। ছাত্র আন্দোলনের প্রসারে ক্রমান্বয়ে এই সমস্তই সরকার শিথিল করতে করতে অবশেষে প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।

এই সময় ছাত্রদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ হিসাবে কোথাও ছাত্র সংসদ গঠনের দাবিতে, কোথাও কলেজ বার্ষিক অনুষ্ঠানে নিজেদের পছন্দমত নেতা অতিথি আনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করতে হয়েছে। যেমন স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষচন্দ্র বসুকে ১৯৩৮-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হবার প্রস্তাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে ছাত্রদের বেশ কিছুদিন ধর্মঘট আন্দোলন চালাতে হয়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, খুলনার দৌলতপুর কলেজে ছাত্র সংসদ গঠনের দাবিতেও ছাত্রদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালাতে হয়। এর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছাত্রদের নানাভাবে উৎপীড়িত হতে হয়েছিল। তবে প্রায় সর্বত্রই এইসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্র ফেডারেশন ও স্থানীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ। যেমন স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রশান্ত সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল সেন প্রমুখ ছাত্র নেতারা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের নেতা ছিলেন সুভাষ বসুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ ও কল্যাণ বসু। দৌলতপুরের আন্দোলন পরিচালনাকারী ছাত্রনেতাদের মধ্যে দেবীপদ ভট্টাচার্য (যিনি পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন)। এইসব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ছাত্র ইউনিয়ন গড়তে দেবার আন্দোলন ছড়িয়ে পরে এবং জয়যুক্ত হয়। তবে স্মরণ করা দরকার এই আন্দোলনের বহু পূর্বেই আবার বহু কলেজে ছাত্র সংসদ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৪২-এর পূর্বে গঠন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪২ সালেই কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্র সংসদ গঠিত হল, তার প্রথম সভাপতি হলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ (পরবর্তীকালে ডঃ প্রতাপচন্দ্র কংগ্রেস নেতা ও শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন)। সাধারণ সম্পাদক হন সুনীল সেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউশনের আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন ৪২ থেকে পর পর তিনবার। সুনীল সেন ছাত্র আন্দোলন থেকে এম.এ. পাশ করার পরই কৃষক আন্দোলনে চলে যান এবং '৫২ সালে পর্যন্ত একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কৃষক আন্দোলনে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য '৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন পার্টি লাইন ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে তিনি মূলত অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজেই ব্যস্ত। তবে সম্ভবত কৃষক

আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত কৃষক সভার সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুন্ন আছে।

এ ছাড়া নিরক্ষতার বিরোধী অভিযানে কৃষকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচারের কাজও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা হাতে নিয়েছিলেন। এ কাজেও প্রায়ই তারা পুলিশের কাছ থেকে বাধা পেতেন।

১৯৩৯ সাল থেকে আমাদের দেশে ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসীবাদের বিস্তার ও তার আগ্রাসন ও পীড়নমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্রমেই আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে। ছাত্রদের মধ্যেও ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে। দুঃখের কথা, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে প্রায় গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। এই আন্দোলনে বাংলার ছাত্ররাই প্রধান ও প্রায় একক। এই ক্ষেত্রে বাংলার ছাত্র আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। সেটি হল ১৯৩৯ সালে বাংলার বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে 'ছাত্রী সংঘ' বা 'গার্লস স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হল। এই উদ্যোগের পিছনে ছিল অবশ্যই 'ছাত্র ফেডারেশন'। এখানেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রী কর্মীরাই সংগঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। যাদের নিয়ে প্রথম কমিটি গঠিত হল তারা হলেন কমিউনিস্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জী), শান্তি বসু (সরকার), কল্যাণী মুখার্জী (কুমার মঙ্গলম), চিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ী (ব্যানার্জী), লেবার পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জী (মুখার্জী), কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অণিমা ব্যানার্জী (চক্রবর্তী), মানবেন্দ্র রায়ের মতাবলম্বী পার্টির শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলী)-কে নিয়ে প্রথম কমিটি হল। কনক দাশগুপ্ত হলেন এর প্রথম সম্পাদক। তবে এই সংগঠন কোন দিনই বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি। আর তাছাড়া 'ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রভাব মুক্ত হয়ে কখনই স্বাধীন সংগঠন হয়ে ওঠেনি বা ওঠার কথা ভাবতেও পারেনি, রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভবও ছিল না।

বোম্বাই

১৯২৮ এ বোম্বাই বন্দরে 'সাইমন কমিশনে'র উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই বলা যেতে পারে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ছাত্র সমাজ ও তার আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবেই এক পরিবর্তন ও নতুন চেতনার প্রকাশ ঘটল। বোম্বাই বন্দরে 'সাইমন কমিশনের অবতরণকালে কালো পতাকা হাতে যে হাজার হাজার মানুষ "সাইমন কমিশন ফিরে যাও" স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলেছিল, তার অধিকাংশ ছাত্র। তারা সভা করেছে, বিশাল শোভাযাত্রা করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে সেদিন বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হয়েছিল বিক্ষোভ দেখাতে। অবশ্য কংগ্রেসের আহ্বানেই সাড়া দিয়ে ছাত্ররা এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়। কিন্তু এর ফলে বোম্বাই-এর ছাত্র আন্দোলনের চেহারাই পাল্টাতে শুরু করল।

সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এখানকার ছাত্র আন্দোলন সমাজ সেবামূলক কাজ, বস্তির শিশুদের পড়ান ও সেই সঙ্গে বড়দের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকারীতা ও কেমন করে সেগুলি পালন ও কার্যকরী করবে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এছাড়াও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা, তার সমাধান সম্পর্কে প্রচার, হরিজনদের মধ্যে গান্ধীজী নির্দেশিত পথে বিরামহীন কাজ তারা করেছেন। এখানকার ছাত্র সংগঠনগুলি অন্ধ বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তাদেব খবরের কাগজে দেশ-

বিদেশের খবর পড়ে শোনানোও তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল।

১৯২৮ সালের সাইমন বিরোধী আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করে যে সব ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠতে আরম্ভ করল তারা কেবলমাত্র সমাজসেবামূলক কাজে নিজেদের আবদ্ধ রাখল না। যদিও সমাজসেবামূলক কাজ তারা কখনই বাদ দেননি। বোম্বাই ছাত্রদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ছাত্র সংগঠনের নাম "Bombay Students' Brotherhood." তারা এই সময় দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন, সামাজিক ন্যায়বিচার, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সভা, বক্তৃতামালা প্রভৃতির আয়োজন করতে শুরু করে।

১৯২৯ সালে 'বোম্বাই যুব লীগ' প্রতিষ্ঠিত হল, যার সভ্যদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্র-যুবকরা বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করল। তাদের ভূমিকা আইন অমান্য আন্দোলনে খুবই গুরুত্ব লাভ করল। বৃটিশ সরকার অবিলম্বে এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। এই সংগঠন ঐ সময় বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করা, রাজনৈতিক দিবসগুলিতে ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত করা, শহরে হরতাল কর্মসূচি সার্থক করার জন্য প্রচার আন্দোলন, নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি, ছাত্র কর্মী সেই গ্রেপ্তার হোক না কেন তার প্রতিবাদে রাস্তার মোড়ে সভা করা থেকে শুরু করে হরতাল ছাত্রদের ধর্মঘট সব কিছু সংগঠিত করার কাজে ইউথ লীগ সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নিষিদ্ধ হবার পরও লীগের কাজ থেমে থাকেনি। বিভিন্ন কায়দায় তারা বিদেশী কাপড়ের দোকান, মদ্য বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে সত্যাগ্রহ সংগঠিত করেছে। যাই হোক দীর্ঘ দিন ইউথ লীগকে নিষিদ্ধ করে রাখার পর ১৯৩৬-এর শেষের দিকে এই সংস্থার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় বম্বের ছাত্র আন্দোলনের এই পর্বে এই সবই হয়েছে ছাড়াছাড়া। আলাদাভাবে বিভিন্ন জায়গার ছাত্রদের নিজস্ব উদ্যোগে কোন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

বোম্বাইতে স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় যখন গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে স্বদেশী আন্দোলনের ভাঁটার পর্বে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশীয়ানার প্রচার। এই প্রচেষ্টার প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল নব প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই ছাত্রদের স্বদেশী লীগ (Bombay Student Swadeshi League)। এই লীগের পরিচালনা ও নেতৃত্বে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য বাড়ি বাড়ি প্রচার থেকে শুরু করে স্বদেশী জিনিসের সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। এমন কি কোথায় কি ধরণের প্রয়োজনীয় স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন হয় তার তালিকা প্রণয়ন, লরির উপর ঐসব প্রদর্শনীয় জিনিস নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রয়ের কাজকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে এই সংগঠনে বেশ বিরাট সংখ্যক ছাত্র যোগ দিয়েছিল। তবে সংগঠনের সংগঠক ও উদ্যোক্তাদের পক্ষে সংগঠনটিকে অরাজনৈতিক স্বদেশী মনোভাবাপন্ন ছাত্র সংগঠন বলে ঘোষণা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য ঐতিহাসিক উপবাস শুরু করলে বোম্বের ছাত্ররা 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী ছাত্র কমিটি' তৈরি করে এবং তার মাধ্যমে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে হরিজনদের মধ্যে খুবই প্রশংসাজনক কাজ করেছিল। কিন্তু এরা সব সময়ই নিজেদের রাজনৈতিক আখ্যায় অভিহিত করতে চাইত। সেই সঙ্গে যেসব আন্দোলন সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে পড়তে পারে, তার থেকে দূরে সরে থাকার এদের চেষ্টা লক্ষণীয়। এর কারণ

বোধ হয় এদের পিছনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ কাজ করত তা হল ভারতীয় বণিক সভা (Indian Chamber of Commerce), স্বদেশী লীগ, গান্ধীজীর চালু করা 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী কমিটি' প্রভৃতি। এর মধ্যেই ছাড়া ছাড়াভাবে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিল, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সহ ছাত্ররা নানাভাবেই নিজেদের শিক্ষাগত অন্যান্য অসুবিধাগুলির জন্য ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই সেভাবে ফলবতী হয়নি।

'Bombay Students Brotherhood' নামে সংগঠন কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরীর উদ্দেশ্যে বোম্বাই শহরে ছাত্র সম্মেলন সংগঠিত করল। ঐ সংগঠন থেকে সর্বস্তরের ছাত্রদের নিয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ভিত্তিক ও সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হল। কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে এই লক্ষ্য পূরণও হল। কিন্তু 'Bombay Students' brotherhood' যে সংগঠন বোম্বাই-এর ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও নানাবিধ কার্যক্রমের জনক— সেই সংগঠন কিন্তু উঠে গেল।

যাই হোক 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গড়ে ওঠার পর বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও দ্রুত তার শাখা গড়ে ওঠে। ৩০টি প্রাথমিক ইউনিট ও বোম্বাই শহরের ৩টি ইউনিট নিয়ে প্রেসিডেন্সি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হল। এর মধ্যে দক্ষিণ বোম্বাই-এর ছাত্র ইউনিয়ন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইউনিট হয়ে উঠে। এবং নানা ধরনের সমাজসেবামূলক, শিক্ষা সংস্কারের জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং নানা সময় কখনও স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে, কখনও সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে Bombay Presidency Student Federation, A.I.S.F.-এর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দক্ষিণভারত

১৯৩৬ সালের পূর্বে প্রকৃত অর্থে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে উল্লেখযোগ্য কোন ছাত্র সংগঠন ছিল না। প্রগতিশীল ও মৌলিক চিন্তাশীল ছাত্ররা হয় শ্রমিক সংগঠনে অথবা অন্য কোন শ্রেণি সংগঠনের মধ্যে কাজ করতেন। ১৯৩৬-এ পন্ডিত জহওরলাল নেহরু মাদ্রাজে-এ এলে ছাত্রদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। নেহরুজী ছাত্রদের দেশের মানুষের জন্য, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। প্রায় ২০ হাজার ছাত্রদের পক্ষ থেকে দু-হাজার টাকা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা নেহরুজীর হাতে তুলে দেয়। নেহরুর মাদ্রাজে আসা প্রগতিশীল ছাত্ররা, যারা এতদিন ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার কাজের পরিবর্তে শ্রমিক কৃষক আন্দোলনেই লিপ্ত ছিল, তারা এইবার তাদের থেকে চেতনায় অনগ্রসর হাজার হাজার ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেই কাজে হাত লাগালেন। ফলে 'মাদ্রাজ ছাত্র সংঘ' নামে Madras Students' Organisation কেবলমাত্র মাদ্রাজ শহরের স্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু অতি দ্রুত এই সংগঠন সারা প্রেসিডেন্সিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৭-এর ১০ই জানুয়ারি এই সংগঠনের জন্ম হল।

এর গঠনতন্ত্রের প্রথম থেকেই প্রগতিশীল ভাবধারা রূপ পায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সরকারের সবরকম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচি গৃহীত হল এবং ঐ উদ্দেশ্যে নানা কমিটি গঠিত হল। এই সংগঠন যাতে গণতান্ত্রিকভাবে দ্রুত

সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারে তার জন্য এদের গঠনতন্ত্রে সভাপতির পদ না রেখে প্রধানত নানা সাব-কমিটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই সময় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্রদের প্রতি সৌভাতৃমূলক শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানায়। স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে মাদুরান্তকম উচ্চ বিদ্যালয়ে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। 'মাদ্রাজ ছাত্র সংঘ' ১৯৩৭-এর ১লা আগস্ট এককভাবে যুদ্ধবিরোধী দিবস পালনের ডাক দিল। বিকেল বেলা হাজার হাজার ছাত্র পতাকা হাতে সারা মাদ্রাজ শহর পরিভ্রমণ করে সমুদ্রতীরে এক বিরাট ছাত্র সভায় মিলিত হল। সভা থেকে ঘোষণা করা হল ছাত্ররা যে কোন রকম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধীতা করবে।

এই সময় বাংলাদেশে আন্দামান বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনা ও রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন করছিল। কলকাতার ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি চালনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই 'মাদ্রাজ ছাত্র সংঘে'র নেতৃত্বে প্রতিবাদে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এল। তারা কংগ্রেস ভবনের সামনে এক বিশাল ছাত্র জমায়েত থেকে আন্দামানের অনশনকারী বন্দিদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই ঘটনার কয়েকদিন আগেই বিশাখাপত্তনমের ছাত্ররা তাদের মেডিক্যাল ডিগ্রীকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করেছে। M.S.O. অবিলম্বে বিশাখাপত্তনমের ছাত্রদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করে নেবার জন্য সমস্ত M.L.A.-এর নিকট প্রতিনিধি পাঠায়।

M.S.O.-র নেতৃত্বে ও স্থানীয় কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সহযোগিতায় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে চীনে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'চীন দিবস' পালন করল। জহওর ঘাটে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হল। ত্রিচিনাপল্লীতেও ব্যাপকভাবে 'চীন দিবস' উদযাপিত হয়।

এই সময় তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা বাটলিওয়ালা নিখিল 'মালাবার ছাত্র সম্মেলনে' সভাপতিত্ব করতে তেলিচেরীতে আসেন। কিন্তু নেলোরে একটি বক্তৃতার দায়ে তাকে তেলিচেরীতে গ্রেপ্তার করা হল। এই ঘটনায় ছাত্রদের সম্মেলনে বাধা সৃষ্টি, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ বলে অভিহিত করে ছাত্ররা সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে ঐ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাল। তাঁরা প্রেসিডেন্সির সর্বত্র সরকারের এই গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাল। তারা 'Student' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। ডঃ পট্টভী সিতারামইয়ার সভাপতিত্বে ১৯৩৭-এর অক্টোবরে মদনপল্লীতে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই, M.S.O. মাদ্রাজে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের তৃতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মহীশূর

মহীশূরে ছাত্র সংগঠন প্রথম গড়ে ওঠে ১৯৩৫ সালে। যে সব ছাত্র নেতা এই সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন তারা হলেন সিদ্দা রমন্না, প্রভু দেব, মহম্মদ শরিফ হোসেন, এম, মুনি রেড্ডী প্রমুখ। এরা প্রধানত গঠনমূলক কাজ দিয়েই তাদের কর্মসূচি শুরু করলেও এক বছরের মধ্যেই সংগঠনটির মৃত্যু ঘটে। ১৯৩৮ সালে এটি আবার পূণর্গঠিত হল। শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে 'নিখিল মহিশূর ছাত্র সম্মেলন'ও অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু ১৯৪২

সালের পূর্বে এই সংগঠন স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

তথাপি উল্লেখ্য যে, ১৯৩৭-এর ৪ঠা ও ৫ই জুন বেলগাও জেলার ক্যুদচীতে 'The Deccan States Student Conference' অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করলেন ডঃ ডি. এম. খায়ের। এই সম্মেলনে ৬০, ৭০জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। সভায় মিঃ কে. এফ. ন্যারীম্যান ও শ্রী ভোপৎকার প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

এরপরেই বাঙ্গালোরে ন্যারীম্যান গ্রেপ্তার হলেন, কারণ তিনি এখানে ছাত্র সভায় বক্তৃতা করতে এলে তাকে বাঙ্গালোর ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়, তিনি সেই আদেশ অমান্য করায় এই গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদে ছাত্ররা শোভাযাত্রা বের করলে পুলিশ তার উপর গুলি চালাল। একজন ছাত্রের মৃত্যু হল। বহু ছাত্র হল আহত। এর প্রতিবাদে সারা ভারতে 'বাঙ্গালোর দিবস' পালিত হয়েছিল। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৩৪/৩৫ পর্যন্ত মহীশূরে কোন সুসংবদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছিল না, কিন্তু বাঙ্গালোর ও মহীশূর—এই দুই শহরে ছাত্ররা অনেক ভাল সামাজিক কাজ করায় তাদের যথেষ্ঠ সুনাম ছিল, যা অবশ্যই পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

কেরল

কেরল স্কুল ছাত্রদের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিবাঙ্কুরে কয়েকদিন স্কুল ছাত্র ধর্মঘট, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কিছু ছাত্র শোভাযাত্রা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যে 'নিখিল মালাবার ছাত্র সংঘ' গঠিত হয়েছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

'নিখিল কেরল ছাত্র সম্মেলন' ১৯৩৭-এ অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭০জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছাত্রদের নিজস্ব। সম্মেলনের পর ঐসব দাবি কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হলে তারা ঐসব দাবি মানতে অস্বীকার করল। তার প্রতিবাদে ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলের ছাত্র আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হল।

ব্রহ্মদেশ

আজ ব্রহ্মদেশ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু ইংরাজরা স্বাধীন ব্রহ্মদেশ জয় করে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তার শাসনকার্য চালাতে থাকে। ফলে সব দিক থেকেই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশে খুব নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই অবস্থার প্রথম পরিবর্তন ঘটে 'সাইমন কমিশনে'র রিপোর্টের ভিত্তিতে যখন ব্রহ্মদেশকে ভারত উপমহাদেশ থেকে রাজনৈতিকভাবে আলাদা করে শাসনের প্রক্রিয়া শুরু হল।

যাই হোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলন ভারতের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে গভীর যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করত। তাই সেই সময়কার ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত কিছু সংবাদ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯২০ সাল নাগাদ ব্রহ্মদেশে সংগঠিতভাবে ছাত্র আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে।

এই সময়কার ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্রহ্মদেশকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ইংরাজ সরকার বহু ভারতীয় বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতাদের ব্রহ্মদেশে অন্তরীণ রাখত। বিপ্লবীরাও ব্রহ্মদেশকে তাদের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। তার প্রভাব আমরা এমনকি সাহিত্যেও দেখি, যেমন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র সমগ্র কাহিনীর পটভূমিকাই ব্রহ্মদেশ। এই সময় ব্রহ্মদেশেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার বিশেষ উন্মেষ ঘটে। ব্রহ্মদেশে গড়ে ওঠে জি.মি.বি.এ. নামে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। এই সময়ই রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজ সরকার একটি বিল প্রণনয় করে প্রকাশ করলে, তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের জন্য ব্রহ্মদেশে শিক্ষিত সমাজের মানুষ বিরোধিতা করল। কিন্তু সরকার এই প্রতিবাদে কোনরূপ কর্ণপাত না করে বিলটি আইনে পরিণত করলেন। এর প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বস্তরের ছাত্রদের ব্যাপক ধর্মঘট হল। এমন কি এই আইনের প্রতিবাদে বহু বর্মী রাজকর্মচারী তাদের চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেন।

এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হল একটি জাতীয় কলেজ এবং সারা দেশে স্থাপিত হল অগণিত বিদ্যালয়। কলেজটিকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। স্কুলগুলির অধিকাংশ অর্থাভাবে চলল না, তবে যে সব স্কুল পরবর্তী সময়ে সরকারি অনুদান গ্রহণ করল সেই সব স্কুলই কেবলমাত্র চালু রইল। ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক জীবনে একথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সময় গড়ে ওঠা জাতীয় কলেজ ও স্কুলগুলি কেবলমাত্র ছাত্র নয়, দেশে সর্বস্তরে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা স্পৃহা জাগাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ছাত্র ধর্মঘটের দিনটি পরে দেশের শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বর্মী ছাত্র যুবদের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে মান্দালয়ে G.B.C.A.-এর নাম সম্মেলনে জাতীয় দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯২৩ সালে আমাদের দেশ সহ দুনিয়াব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের সময় ব্রহ্মদেশে জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অসংখ্য বর্মী ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। স্বদেশীয়ানার প্রতি আকর্ষণ ও তার প্রচার প্রসার নতুন গতি পায়, কিন্তু এই জোয়ার বেশি দিন থাকেনি। দেশীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিও একদিকে ইংরেজ ব্যবসাদারদের চাপ, তার পাশাপাশি সরকারি অসহযোগিতার ফলে বেশিদিন নিজেদের স্তিত্ব বজায় রাখতে পারল না।

'সাইমন কমিশনে'র রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত থেকে ব্রহ্মদেশকে আলাদা করা ও তার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বর্মী কাউন্সিল গঠনের ও সেই কাউন্সিলে যোগদানের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সমগ্র ব্রহ্মদেশে এক বিরাট আলোড়ন শুরু হল। ছাত্ররাও বিশেষকরে বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্ররাই এ বিষয়ে সবার অগ্রণী হয়ে এক নতুন শ্লোগান ও প্রচার শুরু করল। সেটি হল 'সব কিছু বর্মা দেশীয় কেন', এবং উৎসাহী ছাত্রদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় 'সারা ব্রহ্মদেশ যুব লীগ' প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় বর্মার যারাওয়াড্ডি সহ কয়েকটি জেলার কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক ও বিশেষ জঙ্গী আকার নিয়েছে। এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে যুবকদের আর একটি সংগঠন গড়ে উঠল 'দোবামা আসিত্তনে'। সাধারণভাবে এই সংগঠনের সভ্যদের 'থাকিন স্' বলা হত। এর জন্মের পিছনেও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রদের একটা অংশ। এর কারণও ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল গঠনতন্ত্রের জন্য ছাত্রদের দৈনন্দিন

আন্দোলন গড়ে তোলা বা পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব, তার জন্য এই যুব সংগঠন দুটি ছাত্র আন্দোলনের স্বার্থেও বিশেষভাবে কাজ করেছে। তবে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্ধত আচরণ, তাদের দমনপীড়নমূলক পরিচালনা পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে। ১৯৩১-এ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ গঠিত হল। এই সংসদের গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চাইলে কর্তৃপক্ষ প্রবল বাধার সৃষ্টি করল। কারণ তারা চাইছিলেন ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই ঠিক করে দেবে। এই অবস্থাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং অবস্থা একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে গেলে কর্তৃপক্ষ ছাত্র-দাবি স্বীকারে বাধ্য হল। কিন্তু ছাত্রদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের কোন পরিবর্তন হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল যে ছাত্ররা রাজনৈতিক মতবাদে প্রভাবিত ও কলুষিত। ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গোড়ার দিকে ইউনিয়ন সভায় প্রিন্সিপালের কিছু কাজের সমালোচনা করে বক্তৃতা করার অভিযোগে সংসদের সভাপতিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হল। ফলে ছাত্র সাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটল। ছাত্র সংসদের মুখপাত্র 'ওয়ে'র (Way—Peacock) সম্পাদক অধ্যক্ষের এই কাজের সমালোচনামূলক একটি পত্র প্রকাশ করায়, তাকে এই চিঠির ভাষা অশালীন এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সেই কৈফিয়ৎ চাওয়া হল। শোনা যেতে লাগল কর্তৃপক্ষ সম্পাদককেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করছে। সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনার জন্য সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারেই রেঙ্গুনের সমস্ত স্কুল-কলেজে এক দীর্ঘস্থায়ি ধর্মঘট শুরু হল। ১৯৩৬-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট শুরু হয়ে চলল ঐ বছর ১০ই মে পর্যন্ত। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ি ধর্মঘটেও কোন মীমাংসা সম্ভব হয়নি।

এই ধর্মঘট চলাকালীন সময়ই ৮ই ও ৯ই মে ১৯৩৬, রেঙ্গুনে 'সারা ব্রহ্মদেশ ছাত্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে ঘোষণা করা হল—এই সংগঠন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ব্রহ্মদেশের সমস্ত স্কুল, কলেজের ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করবে। এই সম্মেলন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদী কোন যুদ্ধে কোন সাহায্য না করার কথা ঘোষণা করা হল। আরো ঘোষিত হল যে, জাতীয় শিক্ষার প্রচার প্রসারের জন্য জাতীয় স্কুল কলেজ খোলা হবে। ছাত্র সাধারণের রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালানো হবে। সর্বোপরি ছাত্রদের স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সংগঠন দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করবে। ১৯৩৮-এ ব্রহ্মদেশের পুরাতন রাজধানী মান্দালয়ে ৯ই ও ১০ই মে 'সারা ব্রহ্মদেশ ছাত্র ইউনিয়নে'র দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু। সম্মেলনে ২৭টি শহর থেকে ৪০০ ছাত্র-প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। এই সম্মেলনকে অভিনন্দন ও তার সাফল্য কামনা করে চীন সহ ইউরোপের বহুদেশ বার্তা পাঠিয়েছিল। এই সম্মেলন থেকে এই সংগঠনকে 'বিশ্ব ছাত্র এসোসিয়েশনে'র অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সম্মেলনের পর ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন আরও ব্যাপকতা লাভ করলে, তাকে দমন করতে Director বা Public Instructor-রা সমস্ত স্কুল কলেজের প্রধানদের কাছে বিশেষ বিশেষ সার্কুলার মারফৎ ছাত্র ইউনিয়নের কাজকর্মের উপর নজর

রাখা ও যাতে তাদের কাজকর্ম বাড়তে বা শক্তিশালী হতে না পারে তার জন্য সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে 'সারা ব্রহ্মদেশ ছাত্র ইউনিয়নে'র চিন্তা ও কর্মসূচির উপর কমিউনিস্টদের মতাদর্শের প্রভাব পড়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকে কমিউনিস্ট কর্মীরা ব্রহ্মদেশে গেছেন ও সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছেন। তাছাড়া ঐ সময় বার্মার ইনসিন জেলে, মান্দালয় জেলেও বহু নির্বাসিত কমিউনিস্ট ছিলেন। যাদের সঙ্গে ছাত্রদের একটি অংশের যোগাযোগ গড়ে ওঠে ঐ সব ছাত্ররাই দেশের শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে ছাত্রদের সমর্থন সহযোগিতার ও চিন্তা নিয়ে আসার কাজটুকু শুরু করেছিলেন।

বিদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষে

ভারতের ছাত্র আন্দোলন জন্মলগ্ন থেকেই ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছে। এই ব্যাপারে অবশ্যই বাংলার ছাত্র সমাজ বিশেষ আগ্রহী ছিল। আমাদের সকলেরই স্মরণে থাকার কথা, ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যকে অভিনন্দিত করার জন্য তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কিভাবে অক্টোরলোনী মনুমেন্টের (শহিদ মিনার) মাথায় ফরাসী বিপ্লবের পতাকা উড্ডিন করেছিলেন। আমরা এখানে অসংগঠিত ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কথায় যাব না, সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের কথাই বলব। বিভিন্ন সময় স্পেন, মিশর, চীনের ঘটনাবলী, সেখানকার ছাত্র আন্দোলন আমাদের দেশের ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশের সেই সময়কার আন্দোলনের কথা বলার সময় বলা হয়েছে। এখানে ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র জন্ম থেকে বিদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতি যে সমর্থন ও সহমর্মিতা ভারতীয় ছাত্ররা প্রকাশ করেছে, তারই ইতিহাস অল্প কথায় উল্লেখ করলাম।

ভারতীয় ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতামুখী করাব দিকে পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু ছাত্রদের প্রতি বিশেষ জোর দেন। ক্রমাগত বিশ্বে নানা ঘটনাবলী ও সমাজতন্ত্রই যে আমাদের কাম্য— এই উদাত্ত আহ্বান ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আর একটি ঘটনা, ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার ফলে তারাও অনবরত ছাত্রদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভাবধারা, যার অন্যতম মূল কথাই হল কেবলমাত্র নিজ দেশের শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব মধ্যবিত্তের ঐক্যই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে চাই সমগ্র দুনিয়ার মেহনতী মানুষের ঐক্য। তবেই সার্থক হবে পরাধীন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মেহনতী মানুষও মুক্তি পাবে নিজ দেশের শোষকদের হাত থেকে। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি প্রধানত বাংলাদেশের ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য পাঞ্জাব সহ অন্যান্য প্রদেশের ছাত্ররাও অল্প বিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গঠিত হবার সময়ই তারা আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পণ্ডিত নেহরু তার উদ্বোধনী ভাষণে বিশেষ জোর দেন, যে সমস্ত ঘটনা ভারতকে প্রভাবিত করে ছাত্রদের সে সব ঘটনা উপলব্ধি করতে। তিনি আরও বললেন— "I will talk for a while about various big

questions which do not perhaps immediately affect you but which, I think have a vital consequence for each one of us. Now tell me, what do you think has the question of Palestine to do with the student of India? Most of them do not know about it except as some thing entirely separate and different from their daily life and activities. For the matter of that question and the great tragedy is taking place in Spain today, what has that to do with the students of India? Has that any consequence? I may tell you that the question of Spain, Europe and the Palestine has so far aroused greater interest in me than all the odd news that newspapers tell me. Why I will tell you, not because I attach less importance to matters which concern India immediately, but because these happenings affect you and India and the whole of the world."

এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল. "This conference views with great appraehension the menacing advance of such forces of cultural destruction as the imperialist wars and calls upon the students of the world to resist these forces and not to participate in any such war."

সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই 'ছাত্র ফেডারেশন' প্যারিসে অবস্থিত 'বিশ্ব ছাত্র সংঘ' (Would Students' Association) ও জেনেভায় 'আন্তর্জাতিক ছাত্র সেবা সংঘ' (International Students Service—Geneva)-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। এই দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠনই নব প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র ব্যাপক প্রচার সারা পৃথিবীতে করে ছাত্র ফেডারেশনকে বিভিন্ন দেশে পরিচিতি দেয়। এই সময় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন প্রভৃতি জায়গার ছাত্র সংগঠনগুলিও 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশনে'র খোঁজ খবর নিতে ও যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ক্রমান্বয়ে ঐ যোগাযোগ স্থাপিত হল।

লাহোরে অনুষ্ঠিত 'ছাত্র ফেডারেশনে'র দ্বিতীয় সম্মেলনের আন্তর্জাতিক ছাত্র সমস্যার বিস্তৃত আলোচনার পর স্পেনে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— "This conference condemns the fascist insurgents who have risen against the lawful and established Spanish Government and places on record its heart felt sympathy for the students of Spain, who are fighting bravely for defending the freedom of their nation." (Students Tribune)

সেই সময় 'ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রথম মুখপত্র ছাত্র ট্রিবিউন (Students' Tribune) পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিশ্বের নানা দেশের ছাত্র আন্দোলনের খবর ছাপা হত। তার ফলে ছাত্রদের মধ্যে বিদেশের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে ইচ্ছা ও তাদের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের সহমর্মিতার উষ্ণবাতাস সারা দেশেই অনুভূত হতে লাগল। 'বিশ্ব ছাত্র সংঘে'র পক্ষ থেকে যেমন ক্লুগম্যানের পাঠানো রিপোর্ট, স্পেনের গণতন্ত্রীদের সংগ্রাম ও তার পাশে দাঁড়ান, বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষের খবর, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অগ্রগতি, তার নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করা এই ছাত্র মুখপত্রের আরও কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে সারা দেশে স্পেন দিবস, চীন দিবস, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ দিবস পালিত হয়। লাহোর ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৩৬-এর

মে মাসে স্পেন সংহতি সপ্তাহ উদযাপিত করে, ঐ সপ্তাহে কলেজে-স্কুলে স্পেনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়। স্পেনের বর্তমান ইতিহাস, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে একাত্ম ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস সহ ঐ সংগ্রামের সাহায্য চেয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করা হল। ঐ পুস্তিকা বিক্রয়ের সমুদয় অর্থ স্পেনের সংগ্রামীদের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য প্রধানত পন্ডিত নেহরুর উদ্যোগে আমাদের দেশ থেকে স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য, বিশেষ করে ঔষধপত্র পাঠানো হয়েছিল। ছাত্ররা এই জাতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসাবেই ঐ কাজ করেছিল। ১৯৩৬-এর আগস্ট মাসে সারা দেশে চীনে জাপানী আক্রমণের প্রতিবাদে 'চীন দিবস' পালিত হল। সারা দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে, পাঞ্জাব, বোম্বাই এ ছাত্রদের বিরাট বিরাট সমাবেশ থেকে জাপানী জিনিস বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। বোম্বাই-এর ছাত্ররা বিরাট শোভাযাত্রা করে জাপ বিরোধী ধিক্কার জানায়। চীনে জাপানী ফ্যাসিস্টদের নগ্ন আক্রমণ ও অত্যাচারের ছবি দিয়ে এক আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারিতে 'মাদ্রাজ ছাত্র ইউনিয়ন' বিরাটভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ দিবস পালন করল। এই উপলক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র ও কেন আমরা এই যুদ্ধ বর্জন করব এবং সর্বোপরি বিশ্ব রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য বর্ণনা করে 'মাদ্রাজ ছাত্র ইউনিয়নে'র পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

১৯৩৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ছাত্র কনফারেন্স', 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' মারফৎ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে বহুল প্রচার পেয়েছিল। ১৯৩৭-এর ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটল, এর ফল হয়েছিল খুবই সুদূর প্রসারী, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রদের মজলিস ইংলন্ডের পদানত সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের এক সম্মেলন লন্ডনে আহ্বান করল ৮ই জানুয়ারি। ঐ সম্মেলনে ইংল্যান্ডের দশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে 'Federation of Indian Students Societies in Great Britain and Ireland' নামে সংস্থা গঠন করলেন। লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ম্যানচেষ্টার, নিউক্যাসেল প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই এই সম্মেলনে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাদের এই প্রথম সম্মেলন থেকে 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশনে'র সঙ্গে সংহতি ও বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করল।

১৯৩৭-এর আগস্টে ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ছাত্রদের ঐ 'Federation of Indian Students' Societies'-এর লন্ডন শাখার সম্পাদক মিঃ মোহন কুমার মঙ্গলম ভারতে আসেন ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ছাত্র আন্দোলনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বক্তৃতাও করেন। ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে 'বিশ্ব ছাত্র সংঘে'র সম্পাদক জেমস ক্লুগম্যান, 'বিশ্ব ছাত্র সংস্থা' কর্তৃক ভারত ও চীনে প্রেরিত এক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে ভারতে আসেন। তিনি ব্যাপকভাবে 'ছাত্র ফেডারেশনে'র কাজকর্ম ও সংগঠনের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন ও চীনে যাবার প্রাক্কালে তার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে-- "All India Students Federations is the greatest organisation in the world, and the student movement in India is the strongest among all the colonial student movement."এই উক্তির মধ্যে কিছুটা অতিশোয়াক্তি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এটা হওয়াও ছিল স্বাভাবিক। কারণ ক্লুগম্যানরা তখনও চীনের ছাত্র

আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হননি। তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে তৎকালীন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র বিশালত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কারণ ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র জন্মের পর থেকে '৪০ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনই ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত রকম রাজনৈতিক মতাবলম্বী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, বামপন্থী বিপ্লবী সহ সমস্ত ছাত্রদের মিলিত সংগঠন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব ছাত্র সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ এ হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্তে অনুষ্ঠিত সংঘের সম্মেলনে A.I.S.F.-এর (নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের) পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের ছাত্র নেতা এবং 'Student Tribune' পত্রিকার সম্পাদক প্রবোধ চন্দ্রকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়। পরবর্তী কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বভাবতই এই সম্পর্কের রূপান্তর ঘটেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের জন্ম

বেশ কয়েকবার চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালের পূর্বে ছাত্রদের কোন সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে ওঠে নি। এই সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশন যেখানেই হত, তার পাশাপাশি একটি সর্বভারতীয় ছাত্র-যুব সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হত। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা এইসব সম্মেলনে একটি করে ছাত্রদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্ররাও মূলত কংগ্রেস আন্দোলনের অনুগামী হিসাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করত। ছাত্রদের আর একটা অংশ কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ বিশ্বাস করতে না পারায় বিভিন্ন বিপ্লবী দলে যোগ দিত। তারা ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কোন যোগ রাখতেন না। সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই অনুভূত হয়, এবং নানা সময় চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু ফলপ্রসূ হয় নি।

'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গড়ে ওঠার পিছনে 'উত্তরপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশনে'র দান সর্বাপেক্ষা বেশি। অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত রকম রাজনৈতিক মতামতকে এক জায়গায় এনে ভারতের সমস্ত প্রদেশের শত সহস্র সংগ্রামী ছাত্রকে স্বাধীনতা, প্রগতির জন্য সংঘবদ্ধ করার কৃতিত্ব লাভ করেছিল নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'। যদিও ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠনের আয়ু হয়েছিল মাত্র ৩ বছর, যদিও 'নিখিল ভাবত ছাত্র-ফেডারেশনে' নামে ছাত্র সংগঠন তারপরও ছিল আজও আছে। এবং আছে অবশ্য নানা নামে। তার প্রত্যেকটিই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত, সম্পূর্ণ পরাধীন ও রাজনৈতিক দলের দ্বারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত। যেমন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (C.P.I), 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (C.P.I(M), ছাত্র পরিষদ (কংগ্রেস), সারা ভারত গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন (S.U.C.I), ছাত্রব্লক (F.B), P.S.U (R.S.P), I.M.S.O (Muslim League), বিদ্যার্থী পরিষদ (B.J.P) প্রভৃতি।

যাই হোক, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠার পিছনের সামান্য ইতিহাস বলা প্রয়োজন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরপ্রদেশের ছাত্র সংগঠনই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা।

এই সময় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্তৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির অনুসারী ছাত্র নেতৃবৃন্দ। যেমন— প্রেমনারায়ণ ভার্গব, বলরাম সিং, মিন্ পুষ্পবতী নরেইন প্রমুখ। আবার সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার ছাত্র নেতারাও ছিলেন। ১৯৩৫ সালে জানুয়ারি মাসে রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যু হয়। প্রায় একই সময় মারা যান বৃটিশ পার্লামেন্টে একমাত্র ভারতীয় সভ্য কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত শাকলাৎওয়ালা। কিছুদিন বাদে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভায় সভার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজা পঞ্চম জর্জ-এর মৃত্যুতে

এক শোক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। কয়েকজন ছাত্রনেতা যেমন সফিক নকভী, এ. জে. কিদওয়াই, জগদীশ রাস্তগী প্রমুখ প্রস্তাব করেন যে পঞ্চম জর্জ-এর মৃত্যুর জন্য শোক প্রস্তাবের পাশাপাশি একজন বিশিষ্ট ভারতীয় হিসাবে শাকলাৎওয়ার মৃত্যুতেও একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উত্থাপন করা হোক। উপাচার্যের চূড়ান্ত বিরোধীতায় শাকলাৎওলার জন্য শোক প্রস্তাব গৃহীত হতে পারল না, ফলে সভা চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভেঙ্গে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ তিনজন ছাত্রনেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করলেন। লক্ষণীয় যে, কংগ্রেস অনুগামী ছাত্রনেতারা কিন্তু শাকলাৎওয়ালার জন্য শোক-প্রস্তাবে সকলেই ঐক্যমত হলেন যে, সমস্ত রকম সরকারি ও আধাসরকারি কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীন ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। অন্যথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত নিজস্ব কোন দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে পূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় সম্মেলন ও ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ডঃ এ. এন ঝা-কে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হ'ল। কিন্তু কয়েকদিন বাদে ডঃ ঝা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন আসন্ন সম্মেলন কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, রাজনৈতিক কোন চরিত্র ঐ সম্মেলনের থাকবে না। কিন্তু ছাত্র নেতারা এই প্রস্তাবে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তারা এই সম্মেলনকে পূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই করতে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। ফলে ডঃ ঝার ইস্তফা। অর্ভ্যথনা কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হলেন ছাত্রনেতা প্রেমনারায়ণ ভার্গব।

এই ছাত্র সম্মেলনে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের দলমতের উর্দ্ধে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার পথে সাহায্য করতে রাজি করাবার কাজে পর্দার অন্তরালে দু'জন ব্যক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী ও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির অন্যতম শীর্ষনেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। তাদেরই প্রচেষ্টায় সম্ভব হল ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন মহম্মদ আলি জিন্না, সম্মেলন উদ্বোধন করবেন পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু।

১৯৩৬-এর ১২ই আগস্ট লক্ষ্ণৌ শহরের গঙ্গাধর মেমোরিয়াল হলে 'সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হল—প্রতিষ্ঠিত হল 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'। উত্তরপ্রদেশ সহ ১১টি প্রদেশ থেকে নয়শত ছিয়াশিজন ছাত্র প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনটি প্রকৃত অর্থেই সম্মেলন ছিল। কোন রকম জাঁকজমক ছিল না। ৪-দিন ধরে চলে গুরুতর আলোচনা। সম্মেলন চলে ৪-দিন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু ও সভাপতির ভাষণে মহম্মদ আলি জিন্না ছাত্রদের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। কিন্তু উভয়ের বক্তৃতার মধ্যেই তাদের ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সমাজ ও রাজনীতির প্রশ্নে, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার গুরুত্বের প্রশ্নে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল বেশ স্পষ্টই। ছাত্রদের মতামতের মধ্যেও ছিল নানাবিধ ও বিপরীতধর্মী চিন্তা। কিন্তু বৈধ ও সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র সর্বসম্মতিক্রমে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য স্থিরীকৃত হল। এই সর্বসম্মত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হল :

1) to encourage cultural and intellectual co-operation on equal terms between the students of various provinces and Indian states, and

between students of India and other parts of the world.

2) to suggest improvements in the present system of education.
3) to safeguard the right of the student communities.
4) to prepare the students for citizenship, in order to take their due share in the struggle for complete national freedom, by arousing their political, social and economic consciousness.[১]

সেই সঙ্গে একটি মুখপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ও তারও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা হল :

i) Ventilate the grievances of students to support their cause and organise them into a powerful organisation.
ii) Seek to solve the problem of unemployment.
iii) Inculcate the spirit of simple living and high thinking.
iv) Agitate against the rotten system of education.[২]

প্রেমনারায়ণ ভার্গবকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি অস্থায়ী ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হল, কারণ সময়াভাবে এখানে গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত হল তিন মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের লাহোরে গঠনতন্ত্র গ্রহণের জন্য 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রবোধ চন্দ্রকে সংগঠনের মুখপত্রের সম্পাদক করে এটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

প্রথম সম্মেলনের সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। ঐ সময় তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা বাটলিওয়ালার লক্ষ্ণৌতে উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস অনুসারী ছাত্র নেতাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শের ছাত্র নেতাদের মধ্যে বেশ ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কংগ্রেস অনুসারী ছাত্রনেতারা ভাবছিলেন হয়ত কমিউনিস্টরা বাটলিওয়ালাকেই ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক করার চেষ্টা করবে। এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। ফলে সর্বসম্মতিক্রমেই প্রেমনারায়ণ ভার্গব অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর কংগ্রেস অনুসারীরাই যে সংগঠনের প্রধান নেতৃত্বে থাকবে সেটা যেমন তখনকার জাতীয় রাজনীতির চরিত্র থেকেই অনুমেয়, তেমনি সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে পর্দার আড়ালে বিভিন্ন আদর্শের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এই ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিলেন সেটা বোঝা যায়। তাহলে কংগ্রেস অনুসারী ছাত্রনেতারা হঠাৎ বাটলীওয়ালাকে 'কমিউনিস্ট পার্টি ঐ সংগঠন দখল করার জন্য নিয়োজিত করেছে' এই রকম উদ্ভট অভিযোগ এনে প্রচার শুরু কেন করেছিলেন? একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বভারতীয় রাজনীতি ও কোন সংগঠনে কমিউনিস্টদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য কংগ্রেসের অনেকের কাছেই মোটেই কাম্য ছিল না। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখ করা দরকার। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত চেহারা ও সর্বভারতীয় রূপ পাওয়ার পর থেকেই কমিউনিস্টরা বিভিন্ন গণসংগঠনে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ অংশ (Fractions) হিসাবে কাজ করবার চেষ্টা করেছে। এই কাজে তাদের সহায়তার জন্য পার্টি নেতাদের কেউ না কেউ সাহায্য করার চেষ্টা করেছে এবং সহায়তার জন্য কেউ না কেউ পার্টির পক্ষ থেকে নিয়োজিত হতেন। এই ব্যবস্থার ভালমন্দ বিচার করার ক্ষেত্র এটি নয়। তবে বলাই বাহুল্য, এই নীতি কখনও ভাল করেছে, আবার কখনও আন্দোলন ও সংগঠনের খুবই ক্ষতিসাধন করেছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায় এই তথ্যের আরও কাছাকাছি চিত্র দেখতে পাব। তবে প্রথমদিকে

অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কর্মীরা আজকের মত গণসংগঠন ভাঙ্গা ও দখল করার একমাত্র কাজে নিজেদের নিয়োজিত করত না। বরং তখন তারা কেমন করে ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটানো যায়, আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও সংগঠনের ঐক্য বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্ট অংশ (Fraction) উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রের সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার গোড়ার দিকের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই এই সত্যটা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই ভারতের সর্বত্র এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে তখনকার সিলোন (আজকের শ্রীলঙ্কা), পশ্চিমে করাচী থেকে পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত দেখতে দেখতে দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার ছাত্রের অতি প্রিয় বিশাল ছাত্র সংগঠনে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' পরিণত হল। প্রথম সম্মেলন সংগঠনে গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার কোন সময় না থাকায় স্থির হল ৩ মাসের মধ্যে কোন দ্বিতীয় ছাত্র সম্মেলন করে গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হবে।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের দ্বিতীয় সম্মেলন

এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই ১৯৩৬-এর ২২শে নভেম্বর থেকে ২৪শে নভেম্বর তৎকালীন পাঞ্জাবের রাজধানী বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত, ভারতের রাজনৈতিক বহু উত্থানপতনের সাক্ষী লাহোরে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। তবে এই সম্মেলনকে সংগঠনের নিয়মিত সাধারণ সম্মেলন না বলে গঠনতন্ত্র গ্রহণের জন্য বিশেষ সম্মেলন বলাই ঠিক।

সম্মেলনে সভাপতি হলেন বাংলাপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ। সম্মেলনে শরৎ বসুর বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ইতিমধ্যে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের অধিকাংশ বড় বড় নেতা ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে মত পাল্টে ফেলেছেন। যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বয়কট করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনি এখানে ছাত্রদের স্কুল-কলেজে শান্তশিষ্ট ছাত্র হিসাবে দেখতে চাইলেন। এই পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র বসুর বক্তৃতা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি তার সভাপতির ভাষণে ছাত্রদের বললেন :

> "It is you who care and create, because courage to destroy all that is evil must necessarily provide the will and the imagination to build. It is again those who care lead, for leadership requires idealistic euthusiam and reckless abandon, of which youth love are capable." He said "I look to the youth of my country to evolve a movement, essentially political and economic, but at the same time social and cultural." He wondered as to "how politics could be left from schools and colleges when it admits no banishment."

While concluding his speech he said

> "Young men and women, I call upon you to take a view in your minds. I will not rest. I will not rest until the freedom of my country has been

achieved. I will not rest untill unempolyment and poverty have become things of the past. I will not rest untill the masses— the peasants and workers have come to their work."[৩]

সম্মেলনে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র গঠনতন্ত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জন্য একটি দাবি সনদও গৃহীত হল। স্থির হল বিভিন্ন রাজ্যে তাদের বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারী সর্বভারতীয় ছাত্র দাবি সনদের সঙ্গে নিজেদের দাবি যুক্ত করে নেবে। সম্মেলন পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় ছাত্রছাত্রী দিবস পালনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ঘটনা হল— এই সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত হিন্দু যুবক সম্মেলনে'র সভাপতি তার বক্তৃতায় তিনি হিন্দু জাতি, হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। 'নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন' সর্বসম্মতিক্রমে এই বক্তৃতার বিষয়বস্তুর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে ঘোষণা করল যে, এই ধরনের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ কোন অংশের ছাত্রদের মত নয়। এই প্রস্তাব ও ঘোষণার মধ্য দিয়ে ছাত্র ফেডারেশন তার অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকেই আর একবার দেশের সামনে তুলে ধরে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করল। প্রেমনারায়ণ ভার্গব এবার আগামী সম্মেলন পর্যন্ত সর্বসম্মত স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারশনের তৃতীয় সম্মেলন

মাদ্রাজে ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র তৃতীয় সম্মেলন নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই গুরুত্বের কারণ একদিকে সেই সময়কার দেশবিদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। অন্যদিকে এ সম্মেলনে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। যদিও শেষ অবধি ছাত্র সংগঠনের ঐক্য এই সম্মেলনে রক্ষিত হয়েছিল। মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে হাজাব হাজার ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে ছাত্র সম্মেলন ১লা জানুয়ারি শুরু হল। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রী সর্বোত্তম শেঠী। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন ঠিক ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু আসতে না পারলে, সরোজিনী নাইডুকে সভাপতি করার জন্য অনুরোধ করা হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল এই সিদ্ধান্তনুসারে ব্যবস্থা করার কোন চেষ্টা সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে না করে সভাপতি করা হল কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী শ্রী মিনু মাসানীকে।

ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ বাংলা, বিহার, আসাম, ওড়িষ্যা, দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন। এই সম্মেলনের কিছু পূর্বেই বাংলাদেশে ঘটেছে আন্দামান বন্দিদের মুক্তিতে অভূতপূর্ব ছাত্রসমাবেশ ও আন্দোলন। বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রসংগ্রামে জয়ী হয়েছে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ, আলীগড়ের ছাত্ররা। বিজয়ী তারুণ্যের দীপ্তিতে মাদ্রাজ শহর নিয়েছে নতুন রূপ।

সম্মেলনের পটভূমিকায় ছিল অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিস্থিতি।

ইউরোপের আকাশে তখন নতুন বিশ্বযুদ্ধের অশুভ ছায়া ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী অক্রেশে

গ্রাস করেছে আবিসিনিয়া। জার্মানী, ইটালীতে ফ্যাসিস্ট শক্তির দানবীয় কার্যকলাপ চলেছে। স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট জার্মানীর প্রত্যক্ষ মদতে চলছে ফ্রাঙ্কোর বর্বরতম অভিযান, চীনে চলছে বর্বর নৃশংস জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মরণজয়ী জনগণের সংগ্রাম। সোভিয়েতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে অগ্রগতি দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীনতা, গণতন্ত্রকামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সর্বস্তরের মানুষের ফ্যাসীবিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। তা রূপ পাচ্ছে আন্দোলনে, সাহিত্যে, গানে, কবিতা, নাটকে, চিত্রশিল্পে। স্বভাবতই এর প্রভাব ছাত্রসমাজের একটা বিরাট অংশকে প্রভাবিত করেছিল। প্রভাবিত করেছিল জাতীয় নেতৃত্বের অনেককেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তার বক্তৃতায় বললেন—

"The idea that the moment they were free from political domination by a foreign country, all their problems would be solved was not a correct one. Something, more vital than that was necessary, and that was the duty of reshaping and rebuilding societies. It was for this reason that students were keenly sensitive to all theories of social and economic order, and that was also a reason why socialism had come to the youthful mind will its powerful magnetism."

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে ছাত্রদের শিক্ষান্তে জীবিকাব জন্য কর্মসংস্থানের অভাবের প্রশ্নটিও উত্থাপিত করে বলেন—

"Students acquired knowledge at a heavy cost and they were disappointed after their studies for not getting a job."

দেশের অভ্যন্তরে কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে চরকা, খাদির প্রচারের মাধ্যমে মুক্তির বাণী প্রচার করছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রোগামের দাবি জানাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু, কমিউনিস্ট সহ অন্যান্য বামপন্থীরা। এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক শক্তিরাও জোটবদ্ধ হচ্ছে। হিন্দু-মহাসভা, মুসলিম লীগ পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক শিবিরও দাবি তুলছে। মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। দেশের বড় বড় শহরে তখন চটকল, সূতাকল, রেল শ্রমিক সহ বহু কলকারখানার শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি চলেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আক্রমণ। আবার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন, সেই সঙ্গে দেশীয় রাজ্যসমূহ সহ সর্বত্র স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের উপর নানা ধরনের হামলা। তখন তথাকথিত অপরাধ দমন আইনে পাঞ্জাব ও অবিভক্ত বাংলাদেশের জেলে বহু রাজবন্দি— যার মধ্যে ছাত্ররাও ছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজ সম্মেলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হল, যার মধ্যে ছিল সমস্ত রকম দমনপীড়নমূলক আইনের প্রত্যাহারের দাবি ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও হিন্দীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবি সংক্রান্ত প্রস্তাব। বিনা বেতনে সকলের জন্য শিক্ষা, ছাত্র সংগঠন, ধর্মঘট ও দেশ গঠনের কাজে অংশ নেবার অধিকারেব ঘোষণা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান হল। গৃহীত হল স্পেন ও চীনের জনগণের স্বাধীনতা ও

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতি অভিনন্দন ও সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব।

এই সম্মেলনেই ছাত্রদের মধ্যে আদর্শগত বিভেদের চেহারাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যখন গুন্টুরের ছাত্র প্রতিনিধি পি. কৃষ্ণমূর্তি সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অগ্রগমনে আনন্দ প্রকাশ ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং সোভিয়েত এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রচেষ্টার বিরোধতা করেন। তিনি সর্বোপরি সোভিয়েত রাষ্ট্রের নুতন সংবিধানের প্রতি সমর্থনসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটির ভাষা ছিল এই রকম—

> "This conference is of emphaitc opinion that Soviet Russia is the one country in the whole world, which is consistently following the policy of peace and progress, while its very existence serves as the beconlight to the oppressed nationalities in general and the International Student Movement in particular. It calls upon all students in the different countries of the world emphatically to condemn any aggression by Fascist or Imperialist countiries on the Soviet Union and help it morally and naturally in the event of any attack. This conference congratulates the Union of the Soviet Socialist Republic as its successful completion of twenty years of Socialistic Construction in Russia and views with great satisfaction the inauguration of the new constitution, the most democratic in the world."[৪]

এই প্রস্তাবকে অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রতিনিধি এ.পি.মুখার্জী সমর্থন জানালেন। বোম্বাই প্রদেশের M.L.Shaw সোভিয়েত রাশিয়ার নির্বাচন পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নয়— এই অভিযোগ এনে প্রস্তাবের শেষ বাক্যটি বাদ দেবার জন্য সংশোধনী আনলেন। লাহোরের রাজবংশ কৃষ্ণ প্রস্তাবটির বিরোধীতা করলেন। সভাপতি মাসানী, প্রেমনারায়ণ ভার্গব রাও প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবশ্যই ছিলেন। উত্তর প্রদেশের আনসার হারবানী প্রস্তাবটি সময়োচিত নয় এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সংগঠনটি কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে এইরকম ধারণা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে দেখা দেবে— এই আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানালেন। বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে প্রস্তাবক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে চাইলে, প্রতিনিধিরা সম্মত না হওয়ার প্রস্তাবটির উপর বেশ উত্তপ্ত আলোচনা হয় এবং এটা যখন বোঝা গেল যে অধিকাংশ সদস্যই প্রস্তাবটির পক্ষে তখন সম্মেলনের সভাপতি মাসানী ও প্রেমনারায়ণ ভার্গবরা সহসা আবিস্কার করলেন যে সম্মেলনে উপস্থিত ১১টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ২টি প্রদেশ প্রতিনিধি ফি পাঠিয়েছে। অতএব ঐ সম্মেলনে যা কিছু কাজ তখন পর্যন্ত হয়েছে তা অবৈধ। তারা বলেন এমনকি সম্মেলনের প্রারম্ভে জেনারেল কাউন্সিলের সভায় গঠিত নুতন ওয়ার্কিং কমিটিও অবৈধ। সম্মেলনের সভাপতি দ্বিতীয় দিনে সম্মেলন আর চলবে না ঘোষণা করলেন। পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনরায় একটি 'সঠিক (?)' সম্মেলন ডাকার ফতোয়া দিয়ে মিনু মাসানী বিদায়ী সম্পাদক প্রেমনারায়ণ ভার্গব ও ডজন খানেক প্রতিনিধিরা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সর্বত্তোম শেঠীকে সভাপতি করে তিনদিন ধরে সম্মেলন কাজ সম্পন্ন করেন। ঐ সম্মেলনেই পূর্বে উল্লিখিত প্রস্তাবিতগুলি গৃহীত হয়। প্রেমনারায়ণ ভার্গব প্রমুখ মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি সম্মেলন পরিত্যাগ করে চলে গেলেও সার্বিক

ঐক্য তখনকার মত বজায় রইল। আনসার হারবানীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ জনের একটি ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হল। তার মধ্যে ৫ জনকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হল। যাই হোক প্রেমনারায়ণ ভার্গব সহ কয়েকজন প্রতিনিধি চলে গেলেও কিন্তু 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র তৎকালীন মৌলিক ঐক্য বজায় থাকল।

এই সময় মাদ্রাজ সম্মেলনের পূর্বে বোম্বাই প্রদেশে আদর্শগত বিরোধের ফলে দুটি আলাদা আলাদা প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উভয় অংশই মাদ্রাজ সম্মেলনে যোগ দেয় ও সম্মেলনের পর আবার তারা ঐক্যবদ্ধ হন। ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সম্মেলন ও সংগঠন বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল, ১৯৩৮-এর ২৯শে অক্টোবর যুক্তপ্রদেশে মুলকরাজ আনন্দের সভাপতিত্বে ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন হয়। শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ১৫ই অক্টোবর মহীশূরে ছাত্র সম্মেলন, ১৯৩৮ সালে সিলেট শহর, খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন। ১৯৩৯-এর ৯ই জানুয়ারি অন্ধ্রে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অধ্যাপক এন.জি.বঙ্গের সভাপতিত্বে। ঐ বছরই অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে জানুয়ারি আসামের সুরমাভ্যালী ছাত্র সম্মেলন। বিহার, উড়িষ্যা সহ যেখানে যত ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার সবকটিই হয়েছে মিলিত ভাবে। কোন বিভেদ সৃষ্টি হয় নি। এই সমস্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি (১) ছাত্র আন্দোলনের উপর দমনপীড়ন ও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে; (২) স্কুল-কলেজের বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় প্রচারের বিরুদ্ধে; (৩) দেশীয় রাজ্যগুলিতে দমনপীড়ন-মূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে। (৪) মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা মুনাফা লাভের ভিত্তিতে পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলি অধিগ্রহণের দাবিতে; (৫) কলেজে সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন বাধ্যতামূলক এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করার দাবি করে।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের চতুর্থ সম্মেলন

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৯-এর ১লা জানুয়ারি কলকাতায়। এই সম্মেলন মোটামুটি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। যদিও উদ্বোধন করতে এসে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের প্রায় সবটুকু ব্যবহার করেন কমিউনিস্ট আদর্শের সমালোচনায়। তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবেও দাবি করেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে যে কেউ দক্ষিণপন্থী অথবা বামপন্থী হন না কেন, কমিউনিস্ট বিরোধীতা তাদের মজ্জায় গাঁথা ছিল। সেটা প্রকাশ পেয়েছিল 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র মাদ্রাজ সম্মেলনের সভাপতি সোসালিস্ট নেতা মিনু মাসানীর বক্তৃতায়, ঠিক তেমনি প্রকাশ পেল কলকাতা সম্মেলনে শরৎ বসুর উদ্বোধনী ভাষণে। মাদ্রাজ সম্মেলনে মিনু মাসানীর বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হয়নি, কারণ ঐ সম্মেলনে সোভিয়েত বিরোধী তাঁর মনোভাব এবং সম্মেলনে 'কমিউনিস্ট প্রভাব' রোধ করার জন্য সম্মেলন ভেঙ্গে দেবার প্রচেষ্টাই তাঁর কমিউনিস্ট বিরোধীতার চেহারা প্রকট করে তুলেছিল। সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উল্লেখ করে সে কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শরৎ বসুর বক্তৃতাটি এখানে উল্লেখ করা হল কারণ তার আদর্শগত মানসিকতার সঙ্গে ছাত্র সমাজ বিশেষ পরিচিত আজও নয়।

শরৎচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বললেন যে : "To my

thinking, sosialism or Communism or whatever you may call it— the label is of life significance of things is such an Idea its fundamental note is nol love, and as has many times been asserted hatrred. The ceaseless instance an class-war does, however, tend to throw the sunnier, the more altruistics and more missianic aspect of Socialism somewhat into shade. This had undoubtly lessoned the moral appeal of socialism, for men and nations who ley tradition and temprament arc not drawn to the intolerant confict. On a recent occasion, I tried to bring out this idea and while declaring myself a Socialist, voiced my disinclination for class conflict. This was naturally proved criticism. The orthodox communist would not more hear of the disintangling or his creed of class-war than the arthodox geometricians would hear of squering of circle. But this is of love of dogma, not of truth. I cannot understand why Marxists of all people should object to any modification and adoptation of their masters' doctrine, when he himself had said that changes in human thought were determined by the material conditions of life taken as a whole. The second doctrine, entitles to reshape socialist docrine, in comformities with the conditions in which it is to be applied. Marx took a similar truth with this matter Hegel's doctrine and reunited it in a manner which the latter would have been first to repudiate. Yet Marx is no less of a Hegelian for that".[৫]

এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য সম্ভবত কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানকারী ছাত্র প্রতিনিধিদের উপর কমিউনিস্ট ছাত্রদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে কমিউনিস্ট ছাত্রদের ব্যাপক প্রভাব।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ কে.এম.আশরফ, যার পরিচয়ও একজন প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরূপে। তিনি তার বক্তৃতায় ছাত্রদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সমাজসেবামূলক কাজে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ইংরাজ সরকার পরিকল্পিত চালু শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে তার পরিবর্তনের জন্যও ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে উপদেশ দেন। তার ভাষণে তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন হতে ও তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের অনলস সংগ্রামের ডাক দেন।

এই সম্মেলনে মাদ্রাজ সম্মেলনের মত বিশেষ কোন আদর্শগত প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়নি। সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেগুলির দিকে নজর দিলে ছাত্র ঐক্যকে বজায় রাখার দিকে ছাত্র নেতাদের প্রচেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাখার চেষ্টাটাই বড় হয়ে চোখে পড়বে। তখন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলনকে, ছাত্র সংগঠনকে বিভক্ত করার প্রবণতা

প্রবল হয়নি। যদিও বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতারা সব সময়ই ছাত্রদের নিজস্ব বা তার সংগঠনের ভাবধারায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির দিকে একটু নজর দিলেই এই মূল্যায়ণের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারা যাবে। সম্মেলন চলেছিল ৩ দিন। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি অনেকটাই দাবি সনদের আকারে রচিত হয়েছিল—

"This conference resolves that immediate steps be taken to realise, as soon as possible the following fundamental demands of the students—

1. That legislation for the compulsory recognition of the only non-communal and non-sectarian Students Union by the Universities and by the educational authorities be enacted, and that representatives of the students from such organisations be authorised to submit their demands and grievances from time to time or as they may arise and that schools and colleges which foster communal or sectarian spirit shall not be recognised and all the Institutions run for commercial ends be derocoguised.
2. That there shall be complete freedom of speech and organisation in the colleges.
3. That free and compulsory education shall be provided for all on the basis of one school for every unit of 500 souls.
4. That compulsory military training in collcges, without any obligation to serve in any Imperialist War be immediately introduced.
5. That productive vocational education based on modern methods of production shall immediately be provided in schools and colleges.
6. That municipalities and other local bodies or other statutory bodies be authorised to take care of such private schools as run for profit only to the proprietors.
7. That secondary education shall be free from unnecessary departmental interference, and that the control and supervision over these Institutions be entrusted to a statutory body organised on a democratic basis and functioning as the responsible authority.
8. That the Constitution of the Universities be remodelled freeing the Univerities from needless government interference, democratising the constitution of their legislative authority, including there in representatives of the University students and providing for elected and reponsible Chancellor, Vice-Chancellor and the Executive.
9. That the Universities be required, if necessary by legislation, immediately to put into practice the following demands :

   a. That the general cost of education and particularly the examination

fees be reduced by at least 50 percent,

b. that the books and other requirements of University education should be so selected, produced and supplied so as to produce National Democratic Ideas, and at low cost;

c. that the instructions shall be provided through the medium of an Indian language, and every encouragement shall be given to development of Indegenous Culture,

d. that foreign Missionary Organisations be completely excluded from any concern with higher education, and that no grant of funds be made to such organisations;

e. no discrimination be made, either on communal or sex basis in any Education Institution.

10. That the department of Public Education be completely in our hand and the administration and control of Educational Institutions be entrusted to this department on National Basis."[৬]

এছাড়া যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশিয় রাজ্যগুলিতে সেখানকার জনসাধারণ ও ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে, ব্রহ্মদেশে ছাত্রদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে 'বিশ্ব ছাত্র সংঘে'র সংগ্রামের প্রতি বিশ্বের সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে সহমর্মিতা ঘোষণা করে।

এই সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও বক্তৃতা করেন ও বক্তৃতায় তিনি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দেওয়ার সময় সাম্প্রদায়িকতার তীব্র সমালোচনা করে ছাত্রদের বললেন—

"You must come to this clear dicision that the student movement must be broad based and must not in any account become sectarian. We have in India various ideologies with their complicities. I would not mind students forming separate organisations for the study of certain Ideologies. If they want to make the Students Federation narrow it would be utterly wrong. For in that way the federation would not prosper but would lead to bitterness, weakness and disintegration. They had in India a number of disintegration factors in the body politic and in public life. And it is for youngmen and women to fight these disruptive and disintegrating factor."[৭]

যদিও পণ্ডিত নেহরুর এই উপদেশ কিন্তু পরবর্তীকালে কোন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছাত্রদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এই সময় ছাত্ররা সবাই আসত উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও কিছু নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোর প্রভৃতি বর্গ থেকে কেউই স্কুলে এমন কি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও আসত না। ফলে ছাত্র আন্দোলন ছিল মূলত তিন স্তরের মধ্যবিত্ত ছাত্রদের

আন্দোলন। উচ্চ অবস্থাসম্পন্নসহ সবস্তরের ছাত্ররা আন্দোলনে আসতেন, মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার আদর্শ থেকে। সেই সঙ্গে বেকারী, ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক অনটনের চাপ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আগত ছাত্রদের আন্দোলনমুখি কিছুটা করেছে।

১৯১৯ পূর্ব ছাত্র আন্দোলনের কোন সংগঠিত রূপ ছিল না। তখন পশ্চিমী শিক্ষাই ছাত্রদের কোন না কোন অংশকে দেশ ও সমাজের অচলাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করত। ১৯১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত দেশে এক অশান্ত অবস্থা চলছিল। কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের দমন-পীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ও সাংবিধানিক শাসন অধিকারের দাবীতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। দেশের মানুষ এই ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিল। ছাত্র সমাজ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, জেলে গেছে, পুলিশী অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছে। তখন তাদের কাছে স্বরাজ, সত্যাগ্রহ এ সবের অর্থ খুব পরিস্কার ছিল না। স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমই তাদের পরিচালিত করেছে। এর বাইরে কোন চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

১৯২৭ থেকে '৩০ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও অবিভক্ত বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন, যা প্রায়ই 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন নামে অবহিত করা হয়— তার বিশেষ ব্যাপ্তি ঘটে। তারই সঙ্গে পাঞ্জাবের নওজোয়ান ভারত সভা, উত্তরপ্রদেশে তরুণ সংঘ, বোম্বাই-এ ইয়ুথ লীগ, অবিভক্ত বাংলাদেশে নানা নামে ক্লাব, যুগান্তর-অনুশীলনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের যুব আন্দোলনের বিপ্লবী চিন্তাধারা যুব সমাজের একটা বড় অংশকে আকর্ষণ করেছিল, যার মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল ছাত্র। পাঞ্জাব, বাংলাদেশ সহ নানা প্রদেশে গড়ে ওঠা বিপ্লবী আন্দোলনের একটা রোমান্টিক আবেদনও ছাত্রদের কাছে অবশ্যই ছিল, যার ফলে বহু ছাত্র গোপনে ঐ সব বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তারা বহু তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী হয়েছে। জীবন দিয়ে তারা তাদের বিশ্বাস, একাগ্রতা ও নির্ভিকতার চরম মূল্যও দিয়েছেন। কিন্তু এই ছাত্ররা কখনও ছাত্র সংগঠনের মঞ্চ থেকে সশস্ত্র হিংসাত্বক আন্দোলন বা বিপ্লবের কথা বলার কোন চেষ্টা করেননি। যখন তারা ঐসব বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছেন, তারা তৎক্ষণাৎ আইনি ছাত্র সংগঠন থেকে সরে গেছেন। এই সময়টা তাদের মধ্যে প্রধানত ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণাই প্রধান চালিকা শক্তির কাজ করেছে। এর পাশাপাশি ১৯১৭ সালে রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের ধারণা ও তার প্রভাব শ্রমিক আন্দোলনে, কৃষক সংগ্রামে অনুভূত হতে শুরু করেছে। স্বভাবত স্বল্প হলেও ছাত্রদের একটা অংশ সাম্যবাদী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে।

১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেস আর একবার আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের ডাক দিল। এই আহ্বানে গ্রামগঞ্জ উদ্বেল হয়ে উঠল। ছাত্ররাও হাজারে হাজারে এই ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দলে দলে, পুলিশী অত্যাচার সহ্য করেছে, কারাবরণ করেছে। নানা প্রদেশে প্রাদেশিক স্তরের ছাত্র সংগঠন বে-আইনি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন থেকে ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে অনেক লাভ করেছে। তারা একদিকে যেমন স্বরাজ্য সত্যাগ্রহের অর্থ বুঝতে পারছিল, তেমনি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহাকুল হয়ে উঠতে থাকে। তাদের মধ্যে একধরণের মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। তারা নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলে একদিকে নিজেদের ধ্যান-ধারণার অনুগামী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও পাশাপাশি ছাত্র জীবনের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও

সজাগ হতে শুরু করে। তারা সব সময়ই তাদের সম্মেলনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জাতীয় স্তরের নানামতের নেতাদের ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানাবার রেওয়াজ বজায় রেখেছিল।

এই সময় একদিকে জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বসু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

এর মধ্যে আবার পণ্ডিত নেহরু ছাত্র সমাজকে আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহী হতে সাহায্য করেছেন। এরই পাশাপাশি কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের একটা ধারা গ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট সাম্যবাদী চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেওয়াতে ১৯৩৯ সালেই কমিউনিস্ট ছাত্রদের প্রভাব ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে— যার চরিত্র নেহরু প্রমুখের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক।

পণ্ডিত নেহরু সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও, সমাজতন্ত্র ভারতের কাম্য বললেও, বুর্জোয়া 'মূল্যবোধ' সম্পর্কে সব সময়ই 'গদগদ' ছিলেন। তদুপরি ঐসব জাতীয় নেতাদের নিচের তলার মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তের জন্য কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। যেটা অর্থাৎ, শ্রেণি সচেতনভাবে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের পরিবর্তনের জন্য কমিউনিস্টরা দায়বদ্ধ ছিল। তাই ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট ছাত্রদের প্রভাব ছাত্রদের শ্রমিক, কৃষকের আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্যমত, একাত্মতার দিকে মুখ ফেরাতে সাহায্য করছিল।

অন্যদিকে বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশ, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ অনেক জায়গায় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী গ্রুপ দানা বাঁধছিল। তা হলেও '৩৯ সাল পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে।

এই সময় ছাত্রদের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ। সংখ্যায় অল্প হলেও এই ছাত্ররা কোন রকম আন্দোলনে যোগ দেবার বিরোধী ছিল। কারণ তারা স্কুল-কলেজে আসত ভবিষ্যতে সরকারি ও রাজকীয় চাকুরীর কাজে যোগদান করার সুযোগ ভেবে। আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের দুরন্ত, অশান্ত জীবন তারা প্রকৃতই ঘৃণা করত। এরা সবাই উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তান।

ছাত্রদের মধ্যে আর একটি অংশ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, কিন্তু একেবারে নগণ্য বা উপক্ষেণীয় নয়, তারা চাইত ছাত্ররা কেবলমাত্র ছাত্রদের শিক্ষাজীবন, শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কেই যা কিছু আন্দোলন করবে। তারা ছাত্র সংগঠনের কোনরকম রাজনৈতিক আন্দোলন সে স্বরাজ বা স্বাধীনতার জন্যই হোক বা বিদেশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক অধিকারের সমর্থনেই হোক, যোগ দেবার বিরোধী ছিল। তারা এমনকি ছাত্রসংগঠনের মঞ্চে রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনারও বিরোধী ছিল। তারা মনে করত ছাত্র থাকাকালীন সময় শিক্ষা-জীবনের সমস্যার বাইরে গেলে ছাত্র জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ছাত্রদের মধ্যে এই সময় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কিন্তু চাইত স্বাধীনতার জন্য নিজেদের কংগ্রেসের আন্দোলনে সংপৃক্ত করতে। তবে ৩০ সালের পর থেকে ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের পক্ষে তাদের মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

সংখ্যায় এদের থেকে কম হলেও ছাত্রদের একটা বড় অংশ, কোন কোন প্রদেশে, যেমন বাংলা প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে প্রগতিশীল চিন্তাধারা, শ্রেণি সচেতনতা দ্বারা গণ আন্দোলনমুখী হচ্ছিল। এরা কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদানে মোটেই

অনাগ্রহী ছিল না। বরং আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চেরই প্রবক্তা ছিল। তবে তারা শ্রমিক শ্রেণিকে স্বাধীনতা ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের নেতা বলে স্বীকার করার পক্ষে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রগতিশীল ভাবধারায়, আবিসিনিয়া-চীন-স্পেনের সংগ্রামের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাড়াবার পক্ষে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে দাঁড়াবার একটা নতুন অথচ তীব্র ধারা তৈরি হয়েছিল।

পরবর্তী সময় এই ধারার সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী ধারার আদর্শগত বিরোধ, আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছাত্র আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, তার অব্যবহিত পূর্বে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামের শুরু ও প্রসারকে কেন্দ্র করে যার বিস্ফোরণ; '৪২ ও তার পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ভারতের বহুদূর প্রসারিত—তাতে এই বিরোধী ভাবধারা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ছাত্র আন্দোলন

১৯৩৯ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ ও সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। সমস্ত বামপন্থীরা (যাদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী নিদর্লীয় বামপন্থী, সোসালিস্ট-কমিউনিস্ট, এম.এন. রায়পন্থীরা) কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্র বসুকেই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করার দাবী জানালেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা গান্ধীজীর সমর্থনপুষ্ট পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি পদের প্রার্থী ঘোষণা করলেন। নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বসু জয়ী হলেন, কিন্তু তিনি দক্ষিণপন্থী সহ গান্ধীজীর বিরোধীতার ফলে পদত্যাগে বাধ্য হন। পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী তার নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করায় নেহরু সহ কংগ্রেসের সব বাঘাবাঘা দক্ষিণপন্থীদের চক্রান্তে ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কোণঠাসা হলেন ও তার কয়েকমাস পরে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এই সময় জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির অনুধাবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একদিকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, অন্যদিকে ১লা সেপ্টেম্বর ফ্যাসিস্ট জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে দিয়েছে। এই দুটি অবস্থার মধ্যেই এই সময়কার ছাত্র আন্দোলন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কখনও একই ধারায়, কখনও ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

এই সময় অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থাকায় ঐসব প্রদেশে ছাত্র আন্দোলনের তীক্ষ্নতা অনেকখানি ভোতা ছিল। কিন্তু অবিভক্ত বাংলাদেশের হক-নাজিমুদ্দিন সরকার একেবারেই ইংরাজ শাসকদের আজ্ঞাবহ হিসাবে কাজ করছিল। তাই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সরকার মানুষের সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারকে আরও খর্ব করার জন্য হুকুম জারি করলেন যে—তাদের অনুমতি ব্যতিত কেউ সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল এমনকি কোনরকম কমিটির সভাও করতে পারবে না। যদিও সকলেই এর মৌখিক প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু কার্যকরি কোন পথ তারা নিলেন না।

এই সময় ১৯৪০ এর ১লা জানুয়ারি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বিরাট

কনভেনশন সংগঠিত হল। তখন সুভাষচন্দ্র ছাত্র সমাজের কাছে অতি প্রিয় বামপন্থী সংগ্রামী নেতা। এতদিন পর্যন্ত ছাত্র সমাজের উপর নেহরুর যে বিরাট প্রভাব ছিল, ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ছাত্রদের মধ্যে তার সেই জনপ্রিয়তার ভাটা দেখা দিয়েছে। ছাত্র ফেডারেশন তাদের দিল্লি কনভেনশনে সুভাষচন্দ্র বসুকেই সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাল। এই কনভেনশনের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কনভেনশনের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতাতেই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যকার সমস্যার চেহারাটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। গান্ধীবাদীবা গান্ধীজীর একক সত্যাগ্রহের কায়দা ও চাপ সৃষ্টি করে ক্ষমতা লাভের পথকেই শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণীয় বলে বলতে চাইলেও বামপন্থীরা কিন্তু এই নীতি পরিত্যাগ করে ব্যাপক ও জঙ্গী গণসংগ্রামের পথকেই তুলে ধরতে চাইছিল। সুভাষচন্দ্র তার বক্তৃতায় ছাত্রদের সামনে সেই কথাই উপস্থাপিত করে তাদের ব্যাপক আন্দোলনের জন্য ডাক দিলেন। সুভাষচন্দ্র তার বক্তৃতায় বললেন যে বামপন্থীদের পরিস্কারভাবে ঘোষণা করতে হবে যে তারা কি উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করবেন। তিনি ছাত্রদের বললেন, "Standing in the midst of a complex situation, it is just possible that you may feel perplexed for a while. The vacillating, zigzag policy of the Congress High Command increases ones bewilderment. The menacing attitude of some Communal Organisations added to ones difficulties. The want of Unity among the Leftists themselves well-nigh unnerves an ordinary mortal. Remember Comrades that the left movement to day is on its trail. Its future will depend on how you and I come out of this ordeal ..."[৮]

একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের জঙ্গী ব্যাপক গণআন্দোলনে অনীহা ও দোদুল্যমানতা, অন্যদিকে বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্য বাইরের আন্দোলন ও সংগ্রামকেই প্রভাবিত করেছিল তাই নয়, ছাত্র আন্দোলনও বিশেষভাবে প্রবাহিত হয়েছিল।

কনভেনশনের প্রতিনিধি সভায় যখন ছাত্রদের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা পালনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়, সরকারীভাবে ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা দিবস পালনেব অঙ্গ হিসাবে গান্ধীজী অনুসৃত সুতা কাটা, চরকায় কাপড় বোনা, খাদির ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছাত্র প্রতিনিধিরা (যাদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন) চরকা, সুতা কাটা, খাদির ব্যবহারের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপের অংশটি বাদ দেবার জন্য সংশোধনী উপস্থাপিত করল। এই সংশোধনীটি কেন্দ্র করে খুবই উত্তপ্ত আলোচনার পর সংশোধনীটি ১৬৭ ও ১৫২ ভোটের প্রত্যাখিত হলেও সারা কনভেনশনের বামপন্থী ছাত্রদের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। এই মতপার্থক্য কিন্তু ছাত্র সংগঠনে কোন ভাঙ্গন সৃষ্টি করেনি। তার প্রধান কারণ স্বাধীনতার জন্য ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষে ছিল সবাই। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সকলেই ঐক্যমত ছিল যে এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পৃথিবীকে নতুনভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ। এই সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হল "The present War between the rival Imperialist powers is directed towards a new partition of the world and is, therefore against the interest of the people."

অতএব ইংরাজ ও ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোন প্রকার সাহায্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্বার্থে ও ছাত্র ফেডারেশনে মুসলিম ছাত্রদের ব্যাপক যোগদানের পথকে সুগম করার উদ্দেশ্যে বন্দেমাতরম গান ছাত্র সম্মেলনসহ ছাত্র সমাবেশের যতদূর সম্ভব না গাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে কিন্তু ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ষষ্ঠ সম্মেলনে এই ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হল না। সে ইতিহাসে আসার পূর্বে এই সময় ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগ্রামের উল্লেখ করা দরকার। এই পর্বের দমননীতির বিরোধী আন্দোলনে বাংলার ছাত্র সমাজই ভারতের অন্য সব প্রদেশের থেকে অনেক বেশি তৎপরতা দেখিয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দিল্লী কনভেনশনেই ২৬শে জানুয়ারি ছাত্ররাও ব্যাপকভাবে ইংরাজের হুকুম অমান্য করে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং-এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করবে।

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ২৫ ও ২৬শে জানুযারি ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট, সভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। তারা ১৪৪ ধারা বাতিলের দাবিসহ ব্যক্তি স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। ছাত্রদের প্রধান ধ্বনি হল অর্ডিন্যান্স-রাজ ধ্বংস হোক। আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। যারা মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি অবশ্য গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেন। বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেন। কিছু ছাত্রনেতা তাদের নিজ নিজ জেলা থেকে বহিস্কৃত বা অন্তরীণ হলেন।

ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের গালভরা কিছু কথাবার্তা হওয়া বা 'লীগ অব নেশনস্' এর প্রতিষ্ঠায় যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার কোন পরিবর্তন হল না, তেমনি বাধা পেল না ফ্যাসীবাদেব উত্থান। প্রকৃতই আমরা প্রথম যুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসের মুখ্য অংশকে ফ্যাসীবাদের উত্থান, পতনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেতে পারি।

ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দানবীয় আদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শন। ইতালী, জার্মানী, জাপানকে কেন্দ্র করে যেভাবে সমগ্র মানব সভ্যতা, তার মূল্যবোধ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিন্তু বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষসহ সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় এবং মহান শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের প্রতিরোধ আন্দোলন ও সশস্ত্র প্রতিরোধ ফ্যাসীবাদকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। এই মহান সংগ্রামের পুরভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া। কোটি কোটি মানুষের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে চরম বিজয়।

পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ফ্যাসীবাদের বিপদ সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিল না, তবে উপলব্ধির তারতম্য অবশ্যই ছিল। যেমন, চীন-ভিয়েতনামের মত জায়গায়

ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। চীন, ভিয়েতনাম জাপানী ফ্যাসীবাদের হিংস্র নখরাঘাতে তখন রক্তাক্ত। কিন্তু ভারত ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে পিষ্ট। তাই আমাদের দেশের ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম একই রকম গতিপথ ধরে অগ্রসর হয়নি। অগ্রসর হয়েছে সর্পিল রেখায়, কখনও স্বাধীনতা আন্দোলনের সহযোগী হিসাবে, কখনও উভয়ের মধ্যে ঘটেছে চরম বিচ্ছেদ, এমনকি শত্রুতা। এইভাবেই ভারতে ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন ধারা ১৯৩৫ থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। ভারতের সব প্রদেশে ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি বা পরিচালিতও হয়নি। প্রধানত বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষরা ফ্যাসীবাদের বিপদ সম্পর্কে যতখানি সচেতন ছিলেন; আমাদের জাতীয় আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ববিদদের বোধ হয় নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ ২/৩ জন ছাড়া ফ্যাসীবাদের স্বরূপ ও তার ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে অনুসন্ধান বা সচেতনতা অর্জনের তেমন চেষ্টা বা বাসনা ছিল না। গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। ফ্যাসীবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটি সম্পর্কে কোন ধারণা ঐসব নেতাদের না থাকায়, সোভিয়েত রাশিয়া হিটলারের জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া ছিল একটু ভিন্নতর। অবশ্য একথাও উল্লেখ করা দরকার কমিউনিস্ট ছাড়া সব বামপন্থীরাও সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি।

ভারতে বেশীরভাগ প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্বে ছিল দক্ষিণপন্থীরা যারা গান্ধীজীর অনুগামী নেতৃত্ব। তারই ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনের তেমন কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। এই সত্যটি কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য বামপন্থীদের সম্পর্কেও মোটামুটি প্রযোজ্য। তবে ১৯৪১ পর্যন্ত এই দুই ধারার মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয় নি। কিন্তু ১৯৪২-এর ২২শে জুন সোভিয়েত আক্রান্ত হলে কমিউনিস্ট পার্টি ঐ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করলে আন্দোলন পরস্পরবিরোধী শিবিরে পরিণত হল। ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার নামে জন্ম নিল উগ্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। তার সঙ্গে জার্মানী, ইটালী, জাপান ইংরাজের শত্রু, অতএব আমাদের বন্ধু—এই মত আত্মঘাতী মারাত্মক ভাবাদর্শের প্রচার ও বিশ্বাস। অন্যদিকে, পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খার সঙ্গে ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনের সুস্থ সমন্বয় ঘটাতে না পারায় ফ্যাসীবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের সমর্থকরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ভূমিকায় চিহ্নিত হয়ে পড়ল।

ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন সারা ভারতেই মূলত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। তবে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও সাংগঠনিক ভিত্তি অন্যপ্রদেশের থেকে অনেক ব্যাপক ও দৃঢ় থাকায় এই প্রদেশেই ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও শক্তিশালী রূপ পেয়েছিল। আন্দোলন অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক, মানবিক ও সামাজিক জীবনকে যে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল এই মানসিক ভাবাদর্শ সৃষ্টির কাজে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন ভগীরথের ভূমিকা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অবিভক্ত বাংলার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রগতিশীল ও অগ্রসর চিন্তা।

তাই ফ্যাসীবাদ ও তার জার্মান চেহারা নাৎসীবাদ ও জাপানের জঙ্গীবাদ যা একই ভাবাদর্শের নামান্তর মাত্র। বিংশ শতাব্দীর ঘৃণ্যতম মানব সভ্যতার চরম শত্রু হিসাবেই ফ্যাসীবাদী ভাবাদর্শের আবির্ভাব ঘটেছিল— যা সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খল আবদ্ধ করে অমাবস্যার নিকষ অন্ধকারে মানব সভ্যতাকে ঢেকে দিতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদের চরম সঙ্কট মুহূর্তে ঐ সঙ্কটের গর্ভেই ফ্যাসীবাদের জন্ম। যদিও একদিকে এটি ছিল পরস্পর বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পৃথিবীর উপনিবেশ— এর পুরাতন অধিকার রক্ষা ও নুতন করে ভাগ করার দ্বন্দ্ব। পাশাপাশি বার বার নবগঠিত সাম্যবাদী দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও সামরিক আঘাত করার জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা ফ্যাসীবাদের উৎস, চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও সমাজ বিজ্ঞানী বৃটেনের কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত তার 'Fascism and Social Revolution' বইয়ে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা বুলগোরিয়ার জর্জ ডিমিট্রভ তার 'United front' থিসিসে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে— যখন ধনতন্ত্র সংকটপন্ন হয়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার শ্রেণি সম্পর্কগুলির স্থায়িত্ব আর থাকে না। সমাজে শ্রেণিহীন মানুষের (অর্থাৎ বেকার) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শহর ও গ্রামে বিবাট সংখ্যক পেটি বুর্জোয়া ক্রমাগত গরিব হতে থাকে। বুদ্ধিজীবীরা হয়ে পড়ে নিঃসম্বল। ধনতন্ত্রের উপর সর্বহারাশ্রেণির সর্বাত্মক আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। তখনই ঐতিহাসিক কারণে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের মধ্যেই ফ্যাসীবাদের জন্ম।

এই ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র তখন তার প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের স্বার্থেই উগ্র জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে ধরে। ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্রের গলা টিপে তার অন্তিম অবস্থা ঘটিয়ে একনায়কত্ব স্থাপন তাদের কলাকৌশলের অন্যতম। এরই অংশ হিসাবে তারা শ্রমিক শ্রেণি সব থেকে পিছিয়ে পড়া অংশকে তাদের অসন্তুষ্টির সুযোগ নিয়ে দলভুক্ত করে, রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টি করে তথাকথিত ধনতন্ত্র বিরোধী ধ্বনির মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ধনতন্ত্রের স্বার্থেই সন্ত্রাসমূলক স্বৈরাচার চালু করে। আসল উদ্দেশ্য হলো যে কোন রকম প্রগতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া বা বিপ্লবকে বাধা দেওয়া। এরা মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, বেকার ও অন্যান্য স্তরের মানুষের বিশেষভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উগ্র জাতি-বিদ্বেষের আশ্রয়সহ নানা ধরনের বাগড়ম্বরের ধোঁয়ার আড়ালে নিজেদের হিংস্ররূপকে প্রাথমিক অবস্থায় গোপন রাখার চেষ্টা করে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এদের নীতি চরম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ১৯৩৫-এর সপ্তম কংগ্রেসে জর্জ ডিমিট্রভ ফ্যাসীবাদের সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেন—

> "ফ্যাসীবাদ হল নিপীড়িত মানুষের উপর লগ্নী পুঁজির (Finance Capital) নগ্ন আক্রমণ। ফ্যাসীবাদ হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও তার দ্বারা প্ররোচিত আগ্রাসী যুদ্ধ। ফ্যাসীবাদ হল সব থেকে রক্ষণশীল সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব। ফ্যাসীবাদ হল শ্রমিক শ্রেণি ও নিপীড়িত সমস্ত মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু।"[১০]

ফ্যাসীবাদ সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও হিংস্র রূপ নিয়েছিল জার্মানীতে। যাকে আমরা নাৎসীবাদ বলে চিহ্নিত করে থাকি। যার অর্থ হল জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)— নামে সমাজতন্ত্র হলেও, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। হিটলারের

নাৎসীবাদ পাশবিক জাতিদম্ভ। এটি একটি দানবিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক যা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পাশবিকতার ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। যার যূপকাষ্ঠে বিভিন্ন জাতির অগণিত মানুষসহ লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিধনে প্ররোচনা যুগিয়েছে। যা হল শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল অংশের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম প্ররোচনা ও নির্যাতনের ব্যবস্থা।

হিটলারের আত্মজীবনী "মাইন ক্যাম্প" (My Struggle) রোজেনবার্গের 'মাইথাস' নামক গ্রন্থে উপস্থাপিত নাৎসী দর্শনে নাৎসীবাদের যে বিভৎস চেহারা তুলে ধরে তা হল—

"খাঁটি আর্য হিসাবে জার্মান জাতিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই পৃথিবী শাসনের একমাত্র অধিকার তাদেরই।"

জনসাধারণ নির্বোধ মেষের পাল। এদের গণতান্ত্রিক অধিকার একটা প্রহসন মাত্র। তাই দেশ ও রাষ্ট্রপরিচালনার অধিকার থাকবে কিছু বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবানদের হাতে। অন্যরা তাদের হুকুমমত চলবে। ফ্যাসীবাদের বৈশিষ্ট্যই হল এমন ধ্বনি সৃষ্টি করা যে ধ্বনির মধ্যে অবক্ষয়িত সমাজের মানুষ মোহগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, দেশের স্বার্থ সবার আগে। দেশের সাধারণ মানুষকেই স্বার্থের বলি হতে হবে, রাষ্ট্রই প্রধান এবং সকলেই সেই রাষ্ট্রের একান্ত অনুগত হতে বাধ্য। যদিও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে বিশেষ বিশেষ বিধি ক্ষমতায় বলীয়ান বিশেষ বিশেষ মানুষের দ্বারা। নারীর স্থান অন্তপুরে। তাদের কাজ সুখী গৃহ সৃষ্টি ও বলিষ্ঠ সন্তানের জন্মদান। মানুষকে মোহগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে কখনও বলা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতির কথা, কখনও সমগ্র বিশ্বকে সভ্য করার মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশ্বের আর সব জাতির স্বাধীনতা, রাষ্ট্র ক্ষমতার বিলোপ ঘটিয়ে তাদের উপর জার্মান জাতির রাষ্ট্র প্রাধান্য স্থাপনের পবিত্র কর্তব্যের আহ্বান— এই কাজের জন্য চাই বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ। জাপানেও ধ্বনি তোলা হয়েছিল দারিদ্রমুক্ত জাপান চাই। তার জন্য চাই যুদ্ধ করে অন্যদের সম্পদ কেড়ে নেবার নিরঙ্কুশ অধিকার। এইসব কিছুকেই দর্শনের মোড়কে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে জার্মান জাতির নাৎসীরা ব্যবহার করেছে হেগেলের উগ্র জাত্যাভিমানের তত্ত্ব— যথা জার্মান জাতি অবিমিশ্র টিউটনিক আর্য, তাই অন্যদের শাসন ও সভ্য করার দায়িত্ব ও অধিকার জার্মান জাতির ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার। ব্যবহার করার হয়েছে সুইডেনের কার্ল ডন লিনিয়াসের চির স্থায়িত্বের তত্ত্ব (Theory of Constancy)। লিনিয়াসের মতে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে, সেটি যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেটি ঠিক সেইভাবেই থাকে। ভদ্রলোক অবশ্যই ভাবতে পারে নি এই তত্ত্বটিকে নাৎসীরা কাজে লাগাবে এই বলে যে জার্মান জাতি জগতে 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়' শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্মেছে, অন্যরা হয়েছে ক্রমপর্য্যায়ে নিম্নমানের। তাই নিম্নমানের মানুষের উচ্চমানের জার্মান জাতি প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। তার সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে দার্শনিক নীৎসের অতিমানব তত্ত্ব (Theory of Superman)। যে তত্ত্বের অনুশাসনে হিটলার, মুসলিনী, তোজোর মত মহান ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন নেতারাই কেবলমাত্র দেশকে পরিচালনার অধিকারী ও ক্ষমতা রাখে। এহেন 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' ক্ষমতার অধিকারী ফ্যাসিস্ট দল গড়ে উঠেছিল সেই দেশের নিকৃষ্টতম অন্ধকারের জীব, অপরাধীর দল, বেকার, বিপথগামী যুবক ও অপরিণামদর্শী আত্মসর্বস্ব ছাত্রদের নিয়ে। এককথায় ফ্যাসীবাদের চেহারা হল উগ্র জাত্যাভিমান প্রসূত উগ্র অন্যজাতি বিদ্বেষ, একনায়কত্ব, অমানবিক মনুষত্বহীন আগ্রাসী, পর রাজ্য সম্পদ লুণ্ঠক।

ইউরোপে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত

হচ্ছিল। রোঁম্যা রোলাঁ, আরি বারবুৎসে প্রমুখ তার নেতৃত্ব দেন। কিন্তু আমাদের দেশে ৩০-এর দশকের পূর্বে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন চেতনা পরিলক্ষিত হয় না। যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন :

> "পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি ও তার গোটা ইতিহাসই হল বিরোধ সংঘাত ও রাজ্যজয়ের ইতিহাস। এরা এমন একদল লুণ্ঠক যে তাদের শিকারের যোগান চাই অব্যাহতভাবে। এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের মৃগয়াক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য নিজেদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।"

তা সত্ত্বেও বলা চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাসীবাদের পত্তন তার চরিত্র-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা আমাদের দেশে দেখা যায়নি। এমনকি, রবীন্দ্রনাথও ১৯২৬ ইতালি ভ্রমণের পর সাময়িকভাব হলেও মুসোলিনীর তঞ্চকতায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন ও সেই বিভ্রান্তি কাটাতে রোঁম্যা রোঁলার প্রচেষ্টার ইতিহাসও আমাদের জানা। ভারতে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এককভাবে রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহরুর অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। কিন্তু ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের গণচরিত্র দেবার কাজে সর্বাপেক্ষা বড় ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার উৎসাহ ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠা নানা ধরনের গণসংগঠনের। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের জন্মের পূর্বেই জাপানেব চীন আক্রমণ, ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ, ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্পেনের নির্বাচিত পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রতিবাদে ছাত্রদের নানা ধরনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কথা পূর্বেই উল্লেখ কবেছি। আমাদের দেশে ধীরে ধীরে নানা সংগঠনের মাধ্যমে ফ্যাসী-বিরোধী আন্দোলন রূপ পেয়েছে--যেমন প্রগতি লেখক সংঘ, ছাত্রদের ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ সহ ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশনের মত সংগঠনগুলির মাধ্যমে। পাশাপাশি ফ্যাসীবাদ সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও পত্র-পত্রিকাও ছিল বেশ কিছু। যথা রবীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে মুসোলিনীর তঞ্চকতার ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে মোহ কাটিয়ে উঠে ফ্যাসীবাদের হিংস্র বিশ্বগ্রাসী চরিত্র ও কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ামাত্র প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যুউ পত্রিকায়, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের কাজের সমালোচনামূলক লেখা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ফ্যাসীবাদের প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। তাদের মধ্যে খুবই বিশিষ্ট ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমথনাথ রায়, বিনয় কুমার সরকার, বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ (রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ— নেপাল মজুমদার)। অবশ্য এর মধ্যে অনেকেই ভ্রান্তি দূর করে ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। যদিও তৎকালীন বেশ কিছু নামী-দামী সংবাদপত্র, সাহিত্য পত্রিকা ফ্যাসিস্ট তোষণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখেছিল। যেমন, ক্যালকাটা রিভিয়ু, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা। এরা একদিকে গেয়ে চলেছিল ফ্যাসিস্ট প্রশস্তি, পাশাপাশি এদের উৎকট কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ছিল খুবই প্রকট। এদের তৎকালীন লেখার কিছু উল্লেখ না করলে আজকের দিনের ছাত্র সমাজ এদের চিরকালীন প্রগতি বিরোধী ভূমিকার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারবে না।

'আনন্দবাজার পত্রিকায়' 'হের হিটলার ও নব্য জার্মানী' এই শিরোনামায় সম্পাদকীয়তে লেখা হল—

"যে শক্তিমান বীর নূতন পতাকা হস্তে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভাগ্যবিধাতারূপে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন তিনি হিটলার, সফলকাম নায়ক মুসোলিনীর শিষ্য, ফরাসীর দুশ্চিন্তার স্থল এবং ইংরাজের উৎকণ্ঠার কারণ। ... জার্মানীকে হীন্যতা মুক্ত করতে যদি তিনি কৃতকার্য হন তাহা হইলে তিনি জার্মানীর ক্ষেত্রে এক মহৎ কার্য করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।" (আনন্দবাজার ২৫শে মার্চ, ১৯৩৩)

দেশ পত্রিকায় লেখা হল "জার্মান জাতি যখন পরাজয়ের গ্লানি লইয়া অবসাদের অন্ধকারে দুঃসহ ব্যথা ভোগ করিতেছিল, সেই সময় আশা ও শক্তির বাণী লইয়া আবির্ভূত হইলেন হিটলার। ...আজ তিনি জার্মানীর সর্বময় প্রভু...সমস্ত জাতির কাছে আজ তিনি ত্রাণকর্তারূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

"জার্মানীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের পরাজয় এবং হিটলারের এই আকস্মিক অভ্যুদয়—একটি সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে। এই সত্যটি হইতেছে যুগে যুগে মানুষের কাছে জন্মভূমির দাবিই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃভূমি অসম্মানের ধূলিতে লুটাইতে থাকে ততক্ষণ মানুষ বিশ্ব বিপ্লব, আন্তর্জাতিক মুক্তি ইত্যাদি বড় বড় কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে ভালবাসে না। হিটলারের কণ্ঠে জাতীয়তার বাণী দেশাত্মবোধের মন্ত্র। কমিউনিস্টদের কাছে স্বজাত্যাভিমান সংকীর্ণতার পরিচয়, তাদের কাছে আন্তর্জাতিক প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। জাতীয়তার বোধকে তাহারা একটু বড় দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। হিটলার জাতির আশু জীবনমরণ সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর। তাই আজ তিনি জার্মানীর মুকুটহীন রাজা। জার্মানীর ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষেরও শিখিবার অনেক কিছু আছে।" (দেশ ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৩)

এমন নয় যে হিটলার জার্মান জাতির জীবনের আশু সমস্যা সমাধানের নামে কি ধরনের পৈশাচিক কার্যকলাপে রত—এরা জানতেন না। তখন হিটলারের পৈশাচিক দমননীতির যূপকাষ্ঠে হাজার হাজার ইহুদি ও কমিউনিস্টদের রক্তে জার্মানীর রাজপথ রক্ত-রঞ্জিত। সমস্ত রকম মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নাৎসীদের দ্বারা পদদলিত। হিটলারের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ইহুদি ও কমিউনিস্টরা। তখন তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ এইসব পত্র-পত্রিকায় ধ্বনিত না হয়ে প্রকাশিত হত হিটলার-মুসোলিনীর প্রশস্তি। তবে ঐ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের নেতৃত্বে বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক, তরুণ কবি-সাহিত্যিক প্রথম থেকেই ফ্যাসীবাদের বিপদ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার কাজে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন।

ভারতের তরুণ ও ছাত্র সমাজকে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার যেমন উজ্জ্বল ভূমিকা আছে, তার পাশাপাশি অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছাত্রদের মধ্যে একটা অংশ বিকৃত-বুদ্ধির প্রচারের শিকার হয়েছিল। এই অবস্থার উপলব্ধিতেই রোঁম্যা রোঁলা ১৯৩৩-এর ২৭শে নভেম্বর ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী আবেদন বাণীতে তাদের সতর্ক করে দিয়ে লিখলেন— ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে "আমি আবার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার উপর এই ফ্যাসিজিম তাহার হিংস্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,

ভারতবর্ষের উপরও করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফ্যাসিজিমের মার্জার সদৃশ সাধুতায় আপনারা কিছুতেই ভুলিবেন না।

"সাবধান হউন ইহাই আমার একান্ত আবেদন। সাবধান হউন, মুখোশ পরা এই ফ্যাসিজিমের হাত হইতে, আরও সাবধান হউন ঐ হিটলার-মুসোলিনীর মত লোকের ভণ্ড স্বাদেশিকতার স্পর্শ হইতে। আমি জানি কিভাবে তাহারা অর্থের দ্বারা, সংবাদপত্র দ্বারা, রাষ্ট্রনীতির কূটচক্রের দ্বারা তাহাদের প্রচারকার্য চালায় এবং কেমন করিয়া তাহারা দেশের যুবশক্তিকে ফ্যাসিজিমের তীব্র সুরায় উন্মত্ত করিয়া তোলে এবং অন্ধ জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। আপনারা ইহা জানেন না, অথবা বুঝিতে পারেন না। আমরা ইউরোপে তাহা জানিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি। হে আমার ভারতীয় তরুণগণ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার চাহিয়া দেখুন এবং আজও যাহারা ঘুমাইতেছেন, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলুন। আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হউন।"

রোঁলার এই মর্মস্পর্শী আবেদন অবশ্যই ভারতের যুব ছাত্র মন থেকে ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে মোহজাল কাটতে সাহায্য করেছে। ১৯৩৭-এর জানুয়ারিতে স্পেনের বুকে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বর্বরতাকে প্রতিহত করার আবেদন জানিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে এক আবেগদীপ্ত আবেদন করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে রোঁলার সেই আবেগদীপ্ত আবেদন প্রকাশিত হল। এই আবেদন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে অভূতপূর্ব নাড়া দিল। রোঁলা তার আবেদনে ঘোষণা করলেন :

" .. মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি। এস স্পেনকে সাহায্য কর। আমাদের সাহায্য কর। কেননা তুমি, আমি আজ সকলেই বিপন্ন।

"এই সকল নরনারী, বালক-বালিকা এবং জগতের ঐশ্বর্যসম্ভার নষ্ট হতে দিও না। আজ যদি তুমি নীরব থাক, কাল তোমার পুত্র কন্যা, তোমার স্ত্রী. তোমার প্রিয়জন, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় ও পবিত্র, তাহাও একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, শিশুদের ক্রীড়া উদ্যান, ঘন জনপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ না কর-- তাহা হইলে হে জগতের অধিবাসীবৃন্দ শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তোমাদের ভাগ্যও অনুরূপ হইবে। এই অগ্নি সূচনায় তোমরা যদি নিভাইয়া না ফেল, তাহা হইলে এই প্রলয়ানলে ধ্বংসের গতি আর কে সংযত করিবে? সমগ্র জগৎ ইহার কবলে পড়িবে।

"সময় নাই অতি দ্রুত প্রস্তুত হও। উঠ, জাগো, কথা বল, চীৎকার কর, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ নাও করিতে পারি, তথাপি যাহাতে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা সকলে সম্মান করিতে বাধ্য হয়— সে ব্যবস্থাও করিতে তো পারি। এস আমরা নির্দোষ ও নিরুপায়কে রক্ষা করি।" [১১]

এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই রোঁলাসহ ইউরোপের ফ্যাসীবিরোধী নেতারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে একই মর্মে এক আবেদন করেন।

এর কিছুকাল পরেই ১৯৩৭-এর মার্চে আন্তর্জাতিক লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম এণ্ড ওয়ার (League against Fascism and War)-এর সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ হন এর সর্বভারতীয় সভাপতি। কার্যকরী সভাপতি হলেন কে.টি. সাহা। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমিটির সদস্যরা হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সরোজিনী নাইড়ু, এম ব্রেশভি (সম্পাদক, বম্বে ক্রনিকল), মাদ্রাজ ডেলি এক্সপ্রেসের সম্পাদক

কে শান্তনম, অমৃতবাজার পত্রিকা ও এডভান্স পত্রিকায় সম্পাদকদ্বয় তুষারকান্তি ঘোষ ও ডঃ ধীরেন সেন। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আর.এস.রূইকর, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ ও বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদকদ্বয় সজ্জাদ জহীর ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, নিখিল ভারত কিষাণ সভার সম্পাদক স্বামী সহজানন্দ। এছাড়া গুজরাটের ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, এন.জি.রঙ্গ, এস.এ.ডাঙ্গে, পি.ওয়াই.দেশপাণ্ডে, ডঃ সুমন্ত মেহেতা, মিঞা ইফ্‌তিকারউদ্দিন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কমলাদেবী, দেবেন সেন, নবকৃষ্ণ চৌধুরি, ডঃ সুরেশ বন্দোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজের নানা অংশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এরা স্পেনের ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে রোঁম্যা রোঁলা, বারব্যুস, রবীন্দ্রনাথের ছবিসহ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন ও সর্বভারতীয় ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনে কার্যকরী নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। কিন্তু '৪১-এ সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পর কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের বক্তব্য উপস্থিত করলে এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে '৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগঠনই শুধু পরিত্যাগ করেন তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে জার্মানী, জাপানের সহযোগিতায়ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন।

এইরকম একটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকাতেই আমরা এই সময় ছাত্রদের আন্দোলনকে দেখব। কারণ জনযুদ্ধপূর্ব-পর্বে ফ্যাসীবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী যে সার্বিক ছাত্র ঐক্য বিশেষ করে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ছিল, জনযুদ্ধ-পরবর্তী আমলে সেই ঐক্য আর রইল না। ছাত্র আন্দোলনও দুই-ধারায় প্রবাহিত হল।

ইতিমধ্যে চীনে জাপ আক্রমণের প্রতিবাদে, স্পেনের গণতন্ত্রিদের সমর্থনে, আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন প্রশ্নে ছাত্ররা বিভিন্ন প্রদেশে উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৩৯-এর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এদের সম্পর্কে 'গণনাট্য সংঘে'র অন্যতম সংগঠক সুধী প্রধান লিখেছেন :

"১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলন ঘটে যাবার পর আমরা দেখতে পাই যে, ছাত্ররা কলকাতার আশেপাশের জেলায় পথনাটিকা ও গান করে বেড়াচ্ছেন। ... প্রকৃতপক্ষে, ওয়াই.সি.আই নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বাংলার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। যার মূল প্রথিত ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ বিরোধীতার মধ্যে। এই কারণেই ওয়াই. সি. আই-কে অনেকেই পরবর্তীকালের ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্য সংঘের 'সুতিকাগার'রূপে চিহ্নিত করেন। ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট'-এর প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিল ছাত্র-যুব মনে ফ্যাসিস্টবিরোধী চেতনার উন্মেষ। এরা নাটক করতেন। আবার এই নাটক এদেরই রচিত। যেমন এই সংগঠনের সম্পাদক জলিমোহন কাউল রচনা করেন ভারতবর্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ইউরোপের দেউলিয়া রাজনীতির তীব্র সমালোচনামূলক 'পলিটিসিয়ানস্ টেক টু বোয়িং' ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটক 'বয় গ্রোজ আপ' নামে নাটক। চীনে জাপ আগ্রানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক ও হিটলারের নাৎসী জার্মানীর দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করে দুটি নাটক লেখেন দেবব্রত বসু 'ইন দ্য হাট অব চায়না' ও 'দি শপকীপার্স'। এ দুটিও ইংরাজিতে লেখা, ইংরাজিতে হওয়ার ফলে

নাটকগুলি তেমন জনপ্রিয় বা প্রচার হতে পারেনি। এছাড়াও শ্রমিকদের জীবন নিয়ে নাটক। ফ্যাসীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, সিম্পোজিয়াম সংগঠিত করার কাজ এরা করেছেন। তার মধ্যে দিয়েই এই সংগঠনের সদস্যরা ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাত। এই সংগঠনের সভাপতি করা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক শহিদ সুরাবর্দি সাহেবকে। সভাপতি হন অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র এ. কে. এম. জাকারিয়া আর সম্পাদক হল জলিমোহন কাল। অন্য যাঁরা এই সংগঠনের আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন জ্যোতি বসু, নিখিল চক্রবর্তী, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুব্রত বন্দোপাধ্যায়, কমল বসু, সুনীল সেন, সমর গুপ্ত, দেবব্রত বসু, সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত, দিলীপ রাহা, হরকুমার চতুর্বেদী, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, নেভিল ক্যাম্বেশ, সমর গুপ্ত, উমা চক্রবর্তী (সেহানবীশ), সুজাতা মুখোপাধ্যায় (ডেভিস), রমা গোস্বামী, দেবব্রত বিশ্বাস, দিলীপ রায়, সাধনা বোস (রায়চৌধুরী), নিবেদিতা বোস (দাস) বিনতা বসু (রায়), নিখিল সেন, দ্বিজেন চৌধুরী প্রমুখ নানাদিকে প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা।

তবে এই সংগঠন বেশিদিন টেকেনি বা তেমন ব্যাপকও হতে পারেনি। এই সংগঠনের সংগঠকদের নিজেদের স্বীকৃতি থেকেই দেখা যায় যে তাদের সংকীর্ণ মনোভাব সংগঠনের প্রসারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংগঠনের প্রসারের দিকে কোন কার্যকরী চেষ্টা না থাকায় তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য যুব-আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটিও ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া সংগঠনের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রয়োজনেও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ায় সংগঠনটিই উঠে যায়।

এই সংগঠনটির অবলুপ্তির অন্যতম কারণ এর জন্মলগ্ন থেকেই। যদিও এর পিছনের চালিকা শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীরাই ছিলেন। তথাপি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা চাপা-বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী ছাত্র নেতৃত্ব মনে করতেন যে ওয়াই. সি. আই-এর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ধনী ঘরের ছেলেদের বিলাসমাত্র। তার বেশী এর কোন মূল্য নেই। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কি ছাত্র আন্দোলনের, কি পরবর্তী সময় পার্টি ও কৃষক সভায় তাঁর অনুগামী একটা গোষ্ঠী সব সময়ই তৈরী করেছেন। অবশ্য অন্যরা যে করতেন না বা করেননি এমন নয়। তবে এইসময় ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিল বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত গোষ্ঠীর প্রাধান্য। তারা ওয়াই. সি. আই-কে পার্টির সাহায্য ও সমর্থনকে মোটেই প্রয়োজনীয় বা উচিত মনে করতেন না। এই বিরোধও ওয়াই. সি. আই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে অনেকেই মনে করেন।

এই ধরনের সংগঠন বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী প্রচারে সহায়তা করলেও, সেগুলি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আর বিবরণ দেওয়ার পূর্বে উল্লেখ করা দরকার, কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন ও সেই সঙ্গে নাগপুর ও পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন। কারণ এই দুই সম্মেলনে আদর্শগত রাজনৈতিক পথ গ্রহণের প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী।

১৯৪০-এর পয়লা জুলাই অ্যালবার্ট হলে কৃষক প্রজা পার্টির আইনসভার সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে এক বিরাট ছাত্র সভা থেকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দোল্লার বিরুদ্ধে অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা অভিযোগ এনে, সেই মিথ্যা হত্যাকান্ডকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভটি অপসারণ করতে হবে— এই দাবি ঘোষণা করা হল। এই আন্দোলনের সূচনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু।

মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগ

ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে ২০শে জুলাই কলকাতার টাউন হলে বিরাট ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় সভাপতিত্ব করলেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা। সভার বক্তারা সকলেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। সভা শেষে ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যৌথ নেতৃত্বে এক বিশাল ছাত্র মিছিল স্মৃতিস্তম্ভটি ভাঙ্গতে অগ্রসর হলে পুলিশ শোভাযাত্রাটির উপর বেপরোয়া লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস চালালে বহু ছাত্র আহত হয়। আহত হলেন ছাত্রশক্তি পত্রিকার সম্পাদক কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মী মারুফ হোসেন ও মুসলীম ছাত্র লীগের সহ-সম্পাদক নুরুল হুদা। এর পূর্বেই সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যৌথ আহ্বানে কলকাতা শহরতলি ও বিভিন্ন জেলায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হল ৬ই জুলাই।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি ফজলুল হক মন্ত্রিসভা মানতে অস্বীকার করলে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আরও জোরদার হল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী অত্যাচারও বাড়ল। ইসলামিয়া কলেজের (Central Calcutta College) সামনে বিশাল ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশ বে-পরোয়া আক্রমণ চালিয়ে অগণিত ছাত্রকে আহত করে। বিশাল ছাত্র মিছিল তদানিন্তন হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার প্রধান ফজলুল হকের বাড়ি ঘেরাও করলে, তিনি ঐ স্মৃতিস্তম্ভ অপসারনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এটা এক উল্লেখযোগ্য জয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস সোসালিস্টসহ আর. এস. পি প্রমুখ ছাত্রনেতারা জার্মানী, ইটালী, জাপানের নাৎসীবাদ ও সাম্যবাদের নিন্দা করতেও ইচ্ছুক ছিল না, কারণ তারা যেহেতু ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আর ইংরাজ আমাদের শত্রু। কমিউনিস্ট ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসীবাদ-নাৎসীবাদেরও বিরোধীতা করতে হবে।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ষষ্ঠ সম্মেলন

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ষষ্ঠ সম্মেলন নাগপুরে ১৯৪০-এর ২৫-এ ডিসেম্বর শুরু হল। এই সম্মেলনেই ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধের ফলে সংগঠনে ফাটল ধরল। গান্ধীজী-অনুসৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পথের সমর্থকরা সংগঠন ত্যাগ করায় ছাত্র ফেডারেশনও দুভাগ হল। মতাদর্শগত বিরোধের বিষয় ছিল গান্ধীজী প্রদর্শিত সীমাবদ্ধ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য না দীর্ঘস্থায়ী জঙ্গী সংগ্রাম দেশের স্বাধীনতা আনতে পারবে। এই

মতপার্থক্যে কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে না আসতে পারার ফলে দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। একদিকে গান্ধীজীর একক সত্যাগ্রহের সমর্থকরা ও কংগ্রেস। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের সমর্থক, সোসালিস্ট অন্যান্য বামপন্থী ছাত্ররা। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত গীতা জয়ন্তী মাঠের প্যান্ডেলেই সভাপতিত্ব করলেন তরুণ মার্কসবাদী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর সম্মেলন উদ্বোধন করলেন ডঃ কে. এম. আসরফ। অন্যটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি মদনমোহন প্রসাদ। শেষোক্ত দলের নেতৃত্ব করেন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বোম্বাই-এর এম. এল. সা।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে কে. এম. আসরফ গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ইংরাজদের চন্ডনীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত দুর্বল প্রতিবাদ বলে বর্ণনা করলেন। হীবেন মুখোপাধ্যায় তার সভাপতির ভাষণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করেন।

অপর সম্মেলনে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকেই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় ও পথ বলে দাবি করা হল।

ইতিমধ্যে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য টি. জে. কেদার উভয়পক্ষের ঐক্যের জন্য আলোচনা করেন কিন্তু সে চেষ্টা কার্যকরী হয় না। ঐক্যের চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় আলাদা দুটি সম্মেলনে আলাদা আলাদাভাবে ছাত্রদের দাবি, যুদ্ধ সম্পর্কে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় কি বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজীর অনুগামীরা সংগঠনে ভাঙ্গনের জন্য কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীদের দায়ী করে। কিভাবে নাগপুব সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে সম্পর্কিত কমিউনিস্ট পার্টির একটি সাকুর্লারের নিম্নলিখিত অংশটিকে পরবর্তী সময়ে তাদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। "The All India fraction itself will elect a small guiding committee which will function the whole time and take urgent decisions when it is not possible to call the whole fraction..."

"If we understand clearly the issues before us if we work at the conference as a united and disciplined body, there can be no doubt that we can gain through success of the whole conference and can nullify the other group."[১২]। অন্যদিকে কমিউনিস্ট ছাত্ররা এই ভাঙ্গনের জন্য কংগ্রেসের অনুগামী ছাত্র নেতাদের উপর কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রভাব ও প্ররোচনাকেই দায়ী করতে থাকে। কারণ, তাদের মতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিপত্তি বৃদ্ধি গান্ধীজী এবং দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। তদুপরি গান্ধীজী কোন সময়ই ফ্যাসীবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন জানাননি। কারণ, তার মতে যে কোন হিংসাই নিন্দনীয়, এমন কি আত্মরক্ষার জন্য যে হিংসা তাও। সেই সঙ্গে তিনিই এই সময় কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শক্তিবৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য তাদের অনুগামী ছাত্র নেতাদের প্রভাবিত করে। যেহেতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানী, ইটালী, জাপান যুদ্ধরত, তাই তাদের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের

মানসিকতার ফলে কংগ্রেস সোসালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী ছাত্ররাও কমিউনিস্ট বিরোধিতার সামিল হয়। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হল এই ভাঙ্গন। যে পক্ষের অভিযোগই সত্য হোক বা উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই হয়ত কিছু সত্য রয়েছে। কিন্তু এই বিভেদের ফলে কার্যত নাগপুর সম্মেলনের পর থেকেই দুটি ছাত্র ফেডারেশন আলাদা আলাদা সংগঠন হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। একটির নেতৃত্বে রইল কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির অনুগামী ছাত্র নেতারা, অন্যটি কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন হয়ে কমিউনিস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে কাজ করতে লাগল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়। ইংরেজ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে ও ছাত্রদের নানা দাবিতে ছাত্র ধর্মঘটের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১-এর ২২শে জুন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়ার উপর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিসেম্বরের ৭ তারিখে জাপান পার্ল হারবারে আক্রমণের শুরু দিয়ে ইংরাজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সেদিনের বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশকে ধ্বংস করার যে চেষ্টা জার্মানী শুরু করল তার ফলে যুদ্ধের চরিত্রে এল আমূল পরিবর্তন। একদিকে জার্মানী, ইতালি ও জার্মানি ফ্যাসীবাদ ও সমরবাদ— অন্যদিকে, সোভিয়েত রাশিয়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা। যদিও মিত্রবলয়ের অন্যতম শরিক ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী দেশ, তথাপি রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবী ও প্রগতিশীল মানুষের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার রক্ষা এবং সাহায্য ও সংহতির হাত প্রসারিত করা প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ ভাগ-বাঁটোয়ার যুদ্ধ সঠিকভাবেই পরিণত হল 'জনযুদ্ধে'।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১৯৪২-এর জানুয়ারির প্রথমে পাটনায় নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের পূর্বেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হিটলারের দস্যু বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী অবস্থায় বিশ্বের কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ঐক্যমতে বিশ্বযুদ্ধকে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ বিরোধী জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করে। তারা মিত্রপক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাল এবং সহায়তা করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা সঠিকভাবেই যুদ্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, এই যুদ্ধকে ভাগ করে দেখা চলে না। এই যুদ্ধে হয় মিত্রপক্ষের জয় অথবা ফ্যাসিস্ট শক্তির জয়। ফ্যাসিস্ট শক্তির জয়ের অর্থ সমগ্র বিশ্বে আসবে ঘোরতর অন্ধকার দিন। আমাদের মত যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত তাদের সেই সংগ্রাম যাবে বহুদিনের জন্য পিছিয়ে। মিত্রশক্তি জয়ের অংশীদার হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ে সাম্রাজ্যবাদ হবে দুর্বল, স্বাধীনতাকামী দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে অনেক শক্তিশালী। কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলনে কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীরা জনযুদ্ধ : তার সমর্থনে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নিয়ে আশার প্রস্তাব উত্থাপনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম ইংরাজদের বিরুদ্ধে। তাই এই মূলশত্রু যখন আজ বিপাকে তখন তার প্রতি কোন নরম ভাব দেখান অনুচিত। কারণ, রাজনৈতিকভাব সেটি হবে ভুল। সেইসঙ্গে এই মতের কারণ তারা মনে করতেন যে ইংরাজ আমাদের বন্ধু। এই মনোভাব '৪২-এর যুগে বামপন্থীদেরও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই দুই বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর

মাঝে ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন শুরু হল। কমিউনিস্ট পার্টি তখন পর্যন্ত তার জনযুদ্ধের লাইন সরকারীভাবে ঘোষণা করেনি। ছাত্র সম্মেলনেই প্রথম এই লাইনের পরীক্ষা ও প্রয়োগ করা হল। এ সম্পর্কে সেই সময় নিখিলবঙ্গ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী সাধন গুপ্ত তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

> "১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার তার সমস্ত শক্তি এবং তার পিছনে পদানত ইউরোপের সমস্ত শিল্পের সম্বল নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইবার যুদ্ধের কি চরিত্র দাঁড়াল, কিন্তু সেদিন এ প্রশ্ন দু'মাসের মধ্যে একেবারেই ওঠেনি। উঠলো নাটকীয়ভাবে, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের পাটনা সম্মেলন মারফৎ।"
>
> "আমরা কমিউনিস্টরা এবং ছাত্র ফেডারেশন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে এসে পড়ায় যুদ্ধের চরিত্রের যে কোন পরিবর্তন হয়েছে সে চেতনা আমাদের মধ্যে ছিল না। কাজেই পাটনা সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা কলকাতায় হল, যতদূর মনে পড়ে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সেখানে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব নেওয়া হলো বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে: দেশে সেই যুদ্ধ প্রচেষ্টা বা তার জন্য তহবিল তোলার চেষ্টার বিরোধিতা করে ইত্যাদি। কিন্তু পাটনা রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগে ঘটে গেল, যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ বিপর্যয়। আমার বাড়িতে সম্মেলনের ডেলিগেটদের এক সভা। হঠাৎ একজন আন্ডারগ্রাউন্ড ছাত্রনেতা এসে জানালেন যে, যুদ্ধ নাকি আব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, পুরো দস্তুর জনযুদ্ধ এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে নাকি আমাদের সমর্থন করতে হবে। কি সর্বনাশ, ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টা আমাদের সমর্থন করতে হবে। কিন্তু কেন? সেই আন্ডারগ্রাউন্ড ছাত্রনেতা একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বড় সুবিধা হলো না। কারণ, কেন এই যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয় জনযুদ্ধ। এই সহজ কথাটি বোঝাবার মত ধারণা সেই আন্ডারগ্রাউন্ড নেতার ছিল না এবং বোঝাবার মত চেতনাও আমাদের ছিল না। তাই সেই নেতার বক্তৃতার পর এল স্তব্ধ বিষয়। ... 'এই বক্তব্য গ্রহণ করতে না পারলেও আলোচনার জন্য সবাই উদগ্রীব।' এই অবস্থায় আমরা ক্যাম্পে (পাটনায়) পৌঁছলাম। ক্যাম্পে এসে দেখি উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম থেকে যত প্রতিনিধি এসেছে তাদের প্রায় এক অবস্থা। সবাই বিভ্রান্ত, কিন্তু সবাই আলোচনার জন্য উদগ্রীব। সম্মেলনের আগে সকাল থেকে পরদিন প্রায় ভোর পর্যন্ত আলোচনা চলল। ৬০০-র উপর প্রতিনিধি ছিল।' ... যে ছাত্রনেতারা আলোচনা চালালেন তারা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, নতুন লাইনের সর্বসম্মত বিরোধিতা ১৫/২০ ঘন্টার আলোচনায় প্রায় সর্বসম্মতিতে রূপান্তরিত হল। আমরা বুঝলাম যে, যুদ্ধকে ভাগ করে দেখা চলে না। এই যুদ্ধে হয় মিত্রশক্তির জয়, কিম্বা ফ্যাসিস্ট শক্তির জয়। "এরপর সম্মেলনে যখন যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব উঠলো-— সেই প্রস্তাব অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে পক্ষে ৫৪৬ এবং বিপক্ষে ৯ ভোটে গৃহীত হলো। অথচ এটা সুনিশ্চিত যে প্রস্তাবটি আগের দিন উঠলে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই অগ্রাহ্য হত।"

যারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী ছাত্র বলে অবহিত করতেন তারা. এই প্রস্তাব মেনে নিতে না পারায় ছাত্র ফেডারেশন আবার দ্বিখণ্ডিত হল। ফলে একদিকে জন্ম নিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত

ছাত্র ফেডারেশন, তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন দিল্লির ছাত্রনেতা ফারুকি। অন্য অংশের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন এ. জে. জাহিদি।

নাগপুরে ছাত্র ফেডারেশন দ্বি-বিভক্ত হওয়ার পরেই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ছাত্র ফেডারেশন বেনারসে এক কনভেনশনে মিলিত হয়। ঐ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন রাজকুমারী অমৃত কাউর। এই কনভেনশনেও চিরাচরিত প্রথানুসারে ছাত্র ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষেই ঐক্যের কোন বাস্তব প্রচেষ্টা ছিল না।

আনমার জারবানী, জাহিদি গোষ্ঠী পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন নিজেদের প্রকৃত ছাত্র ফেডারেশন বলে দাবি করতে থাকে। তাদের সব সভা-সম্মেলনেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছাত্র ঐক্যের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ বর্ষিত হতে থাকে। এরা গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা বারবার ঘোষণা করে। এইসময় এদের নেতৃত্বে বেশ কিছু ছাত্র ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করে। এদের নেতা এ. জে. জাহিদি নাগপুর সম্মেলনের পরই গ্রেপ্তার হলেন।

পাটনা সম্মেলনের সময় কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন পাটনায় বিহার ছাত্রদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাদেরও এই সম্মেলন ডিসেম্বরের ২৭ ও ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হল। তাদের মূল শ্লোগান হল— "প্রথমে ভারতের স্বাধীনতা, তারপর রাশিয়াকে সাহায্য।' কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী হিসাবে প্রায় সব বক্তারাই চিহ্নিত করলেন। সভায় বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন বিহারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ইউসুফ মেহের আলি প্রমুখ। একথা অনস্বীকার্য যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করল যে ইংরেজদের শত্রু আমাদের মিত্র। এই ধারণা দৃঢ় হওয়ার মূলে অবশ্যই তাদের ফ্যাসীবাদী শক্তিদের, বিশেষকরে জাপানী সমরবাদের সহায়তায় ভারতেব স্বাধীনতা লাভের অলীক স্বপ্ন। অন্যদিকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্যে সমন্বয় করতে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকলাপের মধ্যে অবশ্যই প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই সময় অকমিউনিস্ট ছাত্র নেতৃত্বের অনেকেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হল। জাহিদি ছিলেন তাদের অন্যতম। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার ইংরাজভক্ত রাইট অনারেবল শ্রী নিবাশ শাস্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কার্যকলাপেব অভিযোগে কয়েকজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করেন। শ্রী নিবাস শাস্ত্রীর এই কাজের প্রতিবাদে আন্দোলনরত আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থন ও সংহতি জানানোর উদ্দেশ্যে ২রা জানুয়ারি সারা দেশে ছাত্ররা আন্নামালাই দিবস পালন করল।

উত্তরপ্রদেশের কানপুরে ছাত্রদের ধর্মঘট চলাকালীন সময় ইংরাজ পুলিশের ছাত্রদের উপর বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র ছাত্ররা বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্যদিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ শহরে বিরাট ছাত্র সমাবেশ ও ঐ সমাবেশে বহু ছাত্রীর যোগদান উল্লেখযোগ্য। আসামে সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির প্রতিবাদে আন্দোলনকারী গৌহাটি কটন কলেজের ছাত্রদের উপর লাঠি চালনার প্রতিবাদে শুধু আসামে নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষকরে কলকাতার ছাত্ররা সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করল। আমাদের ছাত্রদের সেই সময়কার আন্দোলনের ও ছাত্র ফেডারেশনের গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে কলকাতার ছাত্ররা

অভিনন্দন জানিয়ে আসামের ছাত্রদের সংগ্রামের সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করল। লক্ষণীয় এই সব আন্দোলনেই পৃথক পৃথকভাবে হলেও ছাত্র ফেডারেশনের উভয় গোষ্ঠীই অংশগ্রহণ করে।

১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত আক্রান্ত হলে ও '৪২ জানুয়ারিতে পাটনায় ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে জনযুদ্ধের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন পরিস্থিতি দেখা দিল। একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন; অন্যদিকে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখ দলের প্রভাবিত ও নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের অন্য একটি অংশ। আগস্ট আন্দোলনের প্রাক্কালে এই ভাঙ্গন আরও ব্যাপক ও তীব্র হয়। এই সময় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রমুখ আরও বহু ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়।

ফ্যাসীবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি সে সময় দেশের মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র-যুব সমাজকে বোঝান খুবই দুরূহ ছিল। অবশ্যই এই দায়িত্ব কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মীরা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেছিল। এই কাজ আরও কঠিন হয়েছিল কারণ ইংরাজদের শত্রু জাপান আর জার্মানী। জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুবকদের বিরাট বললে কম বলা হবে অধিকাংশই ভেসে গিয়েছিল, বিশেষকরে দেশের তরুণীদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় অবিশংবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুও এই মতাদর্শে প্রভাবিত থাকায়। যাই হোক নিন্দা, অপবাদ, দৈহিক নির্যাতন কোন কিছুই ছাত্র ফেডারশনের কর্মীদের নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যদিও এই মতাদর্শ ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের যে বিভেদ ও ফাটল ধরে তা কারোও অজান্তে ঘটেনি। ছোট-বড় সব রাজনৈতিক দলের তরফে ছাত্র সংগঠন তৈরি ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজনে ছাত্রদের ব্যবহারের ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা ছাত্রদের সংগঠনগতভাবে বহু-বিভক্ত করেছে তাই নয়, বৃহত্তম অংশকে অরাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন হতেও সাহায্য করেছে। জনযুদ্ধের রাজনীতির যুগে ভারতের নানা স্থানে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তৎকালীন বাংলার ৪-জন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও কর্মী ফণী চক্রবর্তী, ভানু মজুমদার, প্রদ্যোত সরকার, কচি নাগ প্রমুখসহ নিহত হলেন ঢাকার তরুণ সাহিত্যিক ও শ্রমিক নেতা সোমেন চন্দ। এইসব হত্যাকান্ড, দৈহিক নির্যাতন কিন্তু কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের জনযুদ্ধের পক্ষে প্রচার আন্দোলন থেকে বিরত করতে পারেনি। বরং তাদের দেশপ্রেম, সেবা, সাহসিকতা ও সরল জীবন যাত্রার আদর্শ অকমিউনিস্ট বহু মানুষ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার ও ১৯৪৩-এ বাংলার মন্বন্তর ও মহামারী প্রতিরোধে সেবামূলক কর্মসূচি কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন প্রধানত পালন করেছে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশে মন্বন্তর ও মহামারীর সময় ছাত্র সমাজের ভূমিকার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই দুর্ভিক্ষ ছিল একেবারেই ইংরাজ সরকারের জনবিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতির নামে গ্রাম বাংলার কৃষকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণ ও অধিকারের উপর আক্রমণ। আর সেই সঙ্গে মুনাফা শিকারী অমানুষ মজুতদারদের চোরা কারবার। দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ গ্রামীণ মানুষ অনাহারে ও অনাহারজনিত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সরকারি (উডহেড) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি মৃত্যুতে কালোবাজারী মুনাফাখোরদের মাথাপিছু সেদিনকার আর্থিক হিসাবে ১৫০০ টাকা করে লাভ হয়েছিল।

লক্ষণীয় লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ কৃষক দিনের পর দিন অনাহারে অমানুষিক কষ্ট পেয়ে

কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু একটা দোকান বা গোলায় তারা হানা দিল না। একটা সরকারি দপ্তরের সামনে কোন অহিংস বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখাল না— কেন? তার কারণ কিন্তু আজও খোঁজা হয়নি।

কমিউনিস্টরা ছিল কৃষক সমাজ ও তার আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও নেতা। খাদ্যের জন্য কৃষকের জঙ্গী আন্দোলনের ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ-প্রস্তুতি ব্যাহত হতে পারে। তাদের এই মনোভাব ও সেই সঙ্গে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বাধীনতার ধারণা শ্রমিক-কৃষকের অধিকার বর্হিভূত কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই নিহিত— এই দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রামহীন অসহায় মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

যাই হোক ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা শহরে গ্রামে অগণিত লঙ্গরখানা, রিলিফ কিচেন খুলে হাজার হাজার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের 'বাংলাকে বাঁচাও' ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রদের রিলিফ স্কোয়ার্ড অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য, ঔষধ প্রভৃতি ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে কলকাতা আসেন। ত্রাণ-কার্য পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট ছাত্র নেতা সুনীল মুন্সী ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেতা জি. জি. সোয়েলকে যুগ্ম-সম্পাদক করে এক সর্বভারতীয় ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই জি. জি. সোয়েলই পরবর্তীকালে লোকসভার সহ-অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী শঙ্করদয়াল শর্মার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন-জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তরকারী ঘটনা ছাত্র আন্দোলনে তার প্রভাব নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ভারত ছাড় আন্দোলন আগস্ট আন্দোলন বলে সর্মধিক পরিচিত। আদর্শগত ও আন্দোলনের ক্ষেত্র দ্বৈত-চরিত্র লাভ করেছিল। তাই ঐ সময়কার ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিকা উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে '৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের নিজস্ব পটভূমিকা ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের প্রয়োজন।

১৯৪২-এর এপ্রিলে ক্রিপস্ (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্) মিশনের দৌত্য ব্যর্থতা পরিস্কার বোঝা গেল, ইংরাজ সরকার বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই দেশের মধ্যেকার সবরকম আন্দোলন স্তব্ধ করে রাখার জন্য নানাবিধ আইন-ব্যবস্থা অবলম্বনে বৃটিশ সরকারের কোন কার্পণ্য ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস, বিশেষ করে পন্ডিত নেহরু, গান্ধীজী প্রমুখ প্রথমদিকে ফ্যাসীবিরোধী ছিলেন তাই নয়। সেই সময় ইংরাজদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন আন্দোলনের রাশ টেনে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর আন্দোলন প্রসঙ্গে নীরবতার অর্থ ভারতের জনসাধাবনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কা না করে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইংরাজ সরকারের একতরফা অধিকার— জাতীয় কংগ্রেস স্বীকার করে নিচ্ছে। ক্রমবর্দ্ধমান হতাশাগ্রস্থ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা করতে শুরু করেছিল। এই অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেস বিশেষকরে গান্ধীজী নুতন পর্যায়ে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। পন্ডিত নেহরু কিন্তু ১৯৪২ আগস্টের প্রথমদিক পর্যন্ত ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বিশেষকরে রুশ ও চীনা জনগণের ফ্যাসীবাদ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম ব্যাহত হতে পারে এমন কোন পদক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইংরাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হলেও কংগ্রেস দল হিসাবে কি ভূমিকা

নেবে গান্ধীজীর সংশয় থাকায় '৪২-এর জুন মাসে লুই ফিসারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করলেন— "I have become impatient ... I may not be able to convince the congress ... I will go ahead never the less and address myself directly to the people." (C. W. vol. 76 p.p. 422) ঐতিহাসিক এস. গোপাল তার কংগ্রেসের ইতিহাস পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীজী নেহরুকে বলেন যে, "If you won't join me, I shall do it without you." সেইসময় স্বাধীনতা ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে নেহরু, আজাদ প্রমুখের সঙ্গে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ইংরাজ সরকারের অনমনীয় মনোভাব। সেই সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাপক কালোবাজারের বিস্তার সর্বস্তরের ভারতীয়, বিশেষকরে দরিদ্র মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান কষ্ট, তারই পাশাপাশি জাপানীদের বাধা দেওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে আসাম, বাংলা, উড়িষ্যাসহ পূর্বাঞ্চলের কৃষক, জেলে প্রমুখদের নৌকাগুলি বাজেয়াপ্ত করার ফলে সারা ভারতের জনজীবনকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। এর পাশাপাশি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির, বিশেষকরে ইংরাজদের বিপর্যয়, মালয়, সিঙ্গাপুর, বঙ্গদেশে জাপানের হাতে ইংরাজ শাসনের অবসান, ইংরাজ কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান ছেড়ে আসার সময় ভারতীয় ও অন্যান্য এশিয়দের জীবন, সম্পত্তি সম্পর্কে চরম অবহেলা, জনগণের তীব্র ক্ষোভ ইংরাজদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত করার পক্ষে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এদিক থেকে গান্ধীজী মানুষের মনের অনেক কাছাকাছি ছিলেন। গান্ধীজী এটাও অনুধাবন করেছিলেন, এই পর্যায়ে অহিংস, অসহযোগধর্মী আন্দোলন শুরু না করলে মানুষের মনে যে হতাশা দেখা দেবে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে, এমন কি জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করলেও তারা কোন রকম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহী হবে না। বিশেষ করে কমিউনিস্ট ছাড়া কংগ্রেস সোসালিস্ট সহ অন্য সব বামপন্থীরা যখন 'ইংরাজদের শত্রু' জাপান আমাদের বন্ধু, — এই ধারণার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন।

'৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে ছাত্র সংগঠন

ফ্যাসিস্ট শক্তি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে দুনিয়াব্যাপী যে জনযুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল, ভারতের ক্ষেত্রেও সে আহ্বান সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ; যেমন ছিল অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রেও। প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতবর্ষের কত মানুষ এই জনযুদ্ধের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবর্তনের ধারায় কোন চিন্তা, আন্দোলন বা ধারায় ঠিক তখনই কতখানি ব্যাপকতা লাভ করল তার উপরই তার সত্যতা বা সার্থকতা নির্ভর করে না। এ কথা কারও পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, যুদ্ধোত্তর সময়ে ফ্যাসীবাদের পতনের ফলেই পরাধীন দেশের মানুষের স্বাধীনতা, সংগ্রাম, তার মুক্তির লড়াই অদম্য, অপ্রতিরোধ্য চেহারা নিতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে একের পর এক দেশ স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। তারপর সেই স্বাধীনতা বা মুক্তি সে দেশের জনজীবনে কিভাবে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে সেটা অন্য বিষয়।

১৯৪২-এর এপ্রিলে ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর বৃটিশবিরোধী মনোভাব তখন দেশের আকাশে-বাতাসে। ঠিক সেই পটভূমিকায় ১৯৪২-এর ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে নবপর্যায়ে বৃটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেও; স্থির হয় যে আগস্ট মাসে বোম্বাই-এর প্রস্তাবিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আগস্টে বোম্বাই-এর গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কে (Gowalia Tank) ভারত ছাড় আন্দোলনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। যদিও গান্ধীজী সভাস্থলের বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান বিশাল জনতাকে জানালেন যে, সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও এই মুহূর্তে তা শুরু হচ্ছে না। অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ উত্তেজনাহীন শান্তভঙ্গীতে ঘোষণা করলেন যে, আপনারা আমার হাতে সংগ্রামের রূপরেখা স্থির করার চূড়ান্ত ভার দিয়েছেন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে কথা বলে ফল জানতে হয়ত দু'তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। তবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির স্বীকৃতি ছাড়া আর কোন শর্তেই ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হবে না। তিনি ঘোষণা করলেন, আমাদের মন্ত্র হবে, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (Do or Die)। হয় আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করব, অন্যথায় স্বাধীনতা অর্জনের মহৎ চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব। আমাদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী দেখতে আমরা বেঁচে থাকব না। তিনি জনগণের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের কথা ঘোষণা করার সময় ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানালেন যে, "তোমরা যদি স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সংগ্রামে অবিচল থাকতে পারবে বিশ্বাস কর, তাহলে স্কুল-কলেজ বর্জন করে আপাতত তোমাদের লেখাপড়া বন্ধ রেখে এই চূড়ান্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণে প্রস্তুত হও।" '৪২-এর আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের বিস্তৃত চিত্র উপস্থিত করার পূর্বে ভারত ছাড় আন্দোলনের দেশব্যাপী যে ব্যাপ্তি ও সর্বস্তরের মানুষের যে ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটেছিল—সেই বিশাল ব্যাপ্তিময় পটভূমিকাতেই ছাত্র সমাজের গৌরবময় ভূমিকা ছাত্র আন্দোলনের তৎকালীন চরিত্র ও তার অবদান বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

ইংরাজ সরকার সে সময় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে কোন আলোচনাতেই রাজি ছিল না। বরং যুদ্ধের শুরু থেকেই তারা বিপ্লবী আন্দোলন দমন সংক্রান্ত সমস্ত রকম আন্দোলন দমন করার ব্যবস্থাই করেছিল। এই সত্য প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৪২ সালের প্রদেশগুলির গভর্নরদের লেখা তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিংলিথগোর ব্যক্তিগত পত্রে ছত্রে ছত্রে। সমস্ত রকম আন্দোলনের কণ্ঠরোধ, উদগ্র বাসনা ও নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি লিখলেন : "I feel very strongly that the only possible answer to a declaration of a war by any section of congress in the present circumstances must be a declared determination to crush the organisation as a whole."[১৪]

(Francis Hutchins Spontaneous Revolution. The Quit India Movement. New Delhi, 1971. P-191)

৯ই আগস্ট শেষ রাতে (৮ই আগস্ট রাত ১২টার পর থেকে ইংরাজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ৯ই আগস্টের আরম্ভ) একই সঙ্গে কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণির নেতাদের গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। কংগ্রেস ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করতে পারে আশঙ্কা করে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছেও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল।

জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে

দাবানলের মত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও ঘটনাবলী এখানে দেওয়া সম্ভব না হলেও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার প্রথম সপ্তাহেই সরকারি হিসাবে জনতা সারা দেশে ২৫০-এরও বেশি রেলস্টেশন আক্রমণ করে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ১৫০ পুলিশ স্টেশন, ৫০০ পোস্ট অফিস আক্রান্ত হয়েছে। বেশ কিছু সপ্তাহ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে রেল চলাচল সম্ভব হয়নি বা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। একমাত্র কর্ণাটকেই ১৬০০ স্থানে টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়েছে, ২৬টি রেলস্টেশন, ৩২টি পোস্ট অফিস আক্রান্ত হয়। ৫৩৮টি ঘটনায় পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর কেবল গুলি চালনা করেছে তাই নয়, বহুবার নিচু দিয়ে উড়ন্ত উড়োজাহাজ থেকে জনতার উপর মেশিনগান থেকে গুলি করা হয়েছে। দমননীতি সীমাহীন বর্বরতা প্রকাশ পেয়েছে— ঐ কদিনেই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা যৌথ জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তাও আদায় করার নামে গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি লুঠ করা হয়েছে। কারণ, জরিমানা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। জরিমানা আদায়ের জন্য গ্রাম থেকে জামিনস্বরূপ গ্রামের মানুষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষকে প্রথমে চাবুক মারা হয়েছে। গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পুরো গ্রামটাই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বর্গী লুটেরা বাংলাদেশে লুঠ করেছিল। '৪২ সালের শেষ দিকে ইংরাজদের হাতে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০,০০০ (ষাট হাজার) ছাড়িয়ে যায়। ১৮,০০০ মানুষকে ভারত রক্ষা আইনে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হল— বিচারের প্রহসনে শাস্তি প্রাপ্তের সংখ্যা ২৬ হাজার অতিক্রম করে যায়। সরকারিভাবে সামরিক শাসন জারি করা না হলেও কার্যত সবরকম অর্থে সামরিক শাসনই কাজ করেছিল। সামরিক বাহিনী তাদের ইচ্ছামত জেলাশাসক সহ অসামরিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তাদের না জানিয়ে বিনা অনুমতিতে খুশীমত গ্রেপ্তার, তল্লাশী, দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে গেছে। একথা ঠিক যে ৬/৭ সপ্তাহের মধ্যে চরম দমননীতির সাহায্যে আগস্ট আন্দোলন তখনকার মত স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ভারত ছাড় আন্দোলনে ছাত্র সমাজ এক অতি গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে।

৯ই আগস্ট শেষ রাত্রে নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের সর্বত্র দাবানলের মত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। বোম্বাই-এর গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কের কাছে জনতার সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ হল। বোম্বাই-এর মত সংঘর্ষ ঐ দিনই ছড়িয়ে পড়ল আমেদাবাদ ও পুনায়। ১০ই আগস্ট বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ প্রসারিত হল দিল্লিতে। উত্তরপ্রদেশের নানা শহরে বিশেষ করে কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসীতে, বিহারের পাটনা সহ নানা স্থানে, কলকাতাসহ ভারতের সুদূরতম স্থানেও সরকারি আদেশ অমান্য করে সভা-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল, সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল চরম সরকারি দমননীতি। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল— ফলে দেশের এক অংশের আন্দোলনের সংবাদ অন্যত্র পৌঁছতে পারছিল না।

এই সংগ্রামে ছাত্র সমাজ পিছিয়েও থাকেনি বরং সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দিল্লিতে বিশাল জনতা যার অধিকাংশই ছিল ছাত্র, তারা শোভাযাত্রা করে বড়লাটের বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করল। টমির (ইংরাজ সৈন্য) শোভাযাত্রীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালালে ক্রুদ্ধ ছাত্র-জনতা সরকারি অফিস, পোস্ট অফিস আক্রমণ করে তছনছ করল। সারা ভারতের সর্বত্র ছাত্ররা স্কুল-কলেজে একটানা ধর্মঘট, সভা করে শ্রমিক, কৃষকসহ সব অংশের মানুষের এই বিপ্লবী আন্দোলনে অতি সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ করল। সেই সঙ্গে চলতে লাগল বেআইনী পত্র-পত্রিকা লেখা প্রকাশ ও প্রচারের কাজ। শুধু তাই নয়, ছাত্ররা আগস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য স্থাপিত গোপন কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ রাখার কাজে অংশগ্রহণ ও সরকার বিরোধী নানাধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণও ছাত্রদের দৈনন্দিন কাজ হল। সরকার বিরোধী নানাধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ, রেল লাইন অপসারণ করতে গিয়ে সিন্ধুপ্রদেশের সুদূরে ফাঁসির দড়িতে আত্মদান করল ১৭ বছরের কিশোর বীর দেশপ্রেমিক হেমু কালানি। এই ঘটনা অবশ্য ঘটে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে হেমুর সহকর্মীরা যারা 'করেঙ্গ ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি মুখে নিয়ে '৪২-এর বিদ্রোহী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিন্ধুপ্রদেশের সংগ্রামী ছাত্রদের পরিচালিত ও নেতৃত্ব দিয়েছিল সেইসব সংগ্রামী ছাত্রনেতারা—শোভা জ্ঞানচান্দানি, গোবিন্দ মালহি, নারায়ণ ওয়াধবানি, যারা কঠোর সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করে বা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের রণধ্বনিই ছিল থানা জ্বালাও, রেল স্টেশন জ্বালিয়ে দাও— ইংরাজরা ভয় পাচ্ছে। ছাত্ররা এমনকি ট্রেন দখল করে জাতীয় পতাকা শোভিত করে অন্যত্র চালিয়ে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের ইংরাজ শাসন সাময়িকভাবে অচল করে দিয়েছিল।

যে সমস্ত স্থানে ছাত্ররা বিশেষ ও ব্যাপক অংশগ্রহণ করেছিল তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ, বারানসী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে আজমগড়, বালিয়া, গোরখপুর; বিহারের পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, সারণ পুর্নিয়া, মুঙ্গের, সাহাবাদ, মুজফফরপুর, চম্পারণ প্রভৃতি স্থানে।

কলকাতায় ব্যাপক ছাত্রধর্মঘট শুরু হল। ১৩ই আগস্ট কলকাতায় পুলিশ ছাত্রদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাল। ১৫ই আগস্ট ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘটের উপর পুলিশের গুলি চালনায় ৫জন ছাত্র নিহত হল। প্রতিবাদের পরদিন সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হল।

(১৬ই, ১৭ই আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকা)

সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে ১৮ই আগস্ট থেকে ৩০শে আগস্ট বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি নিজেদের প্রকাশ বন্ধ রাখে। আগস্টের শেষে ৩১শে আগস্ট আবার তাদের প্রকাশ শুরু হয়। তখন জানা গেল, এইসময় সারা বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় ভারত ছাড় আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ও সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে ছাত্ররা একটানা ধর্মঘট চালিয়ে গেছে এবং তখনও চলছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবী জনতার সংঘর্ষে নানাবিধ ধ্বংসাত্মক কাজ যেমন রেললাইন তুলে ফেলা, সেতু উড়িয়ে দেওয়া, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন ধ্বংস করার কাজে বিপ্লবী ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আসামে ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন নাদাই বা পাটগিরি, চারু গোস্বামী প্রমুখ।

কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর ভারত ছাড় আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের কেন্দ্র হল মাদ্রাজ শহর। মাদ্রাজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পুলিশের দমননীতি অগ্রাহ্য করে ছাত্রদের ধর্মঘট চলেছে। ছাত্রদের নেতা ছিলেন কে. আর. গণেশ মোহন রেড্ডী।

মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে পুনা, সাতরা, বরোদা, বোম্বাই, গুজরাট, কর্ণাটক সর্বত্র ছাত্ররা স্কুল কলেজ বন্ধ করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রমে অংশ নিয়েছে '৪২-এর শেষ পর্যন্ত। মহারাষ্ট্রের

আহমদনগর তালুকের জঙ্গী সংগ্রামের পুরভাগে ছিল কৃষক সন্তান স্কুল ছাত্ররা। তাদের নেতা ১০ম শ্রেণির ছাত্র ধর্ম পোখারকার। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার করে— তবুও ছাত্রদের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি।

বোম্বাই-এর ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রার প্রথম দিনেই পুলিশের গুলিতে নিহত হন উমাভাই কাদিয়া। পুলিশের লাঠি চালনায় লক্ষ্ণৌতে আহত হন ছাত্রনেতা হরিশ তেওয়ারী, রবী সিনহা, রাম আগ্রে প্রমুখ।

মহীশূরে জেলের মধ্যে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে প্রাণ হারালেন ছাত্রকর্মী শঙ্করাপ্পা।

ভারত ছাড় আন্দোলন দেশীয় রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ২ মাস ধরে স্কুল-কলেজ ধর্মঘট চলেছিল। চিত্তুরে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে বহু ছাত্র যে কেবলমাত্র আহত হল তাই নয়। গ্রেপ্তার করে ব্যাপক চাবুক মারা, জেলে দেওয়া হল। দু'জন ছাত্র কর্মীর ফাঁসি হয়। অন্ধ্রেতে রেললাইন সরাতে গিয়ে দু'জন ছাত্র-যুব রেলে কাটা পড়ল, দু'জন অন্ধ হয়ে যায়। এই সময় গোপন বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য শিক্ষার গোপন কেন্দ্র স্থাপিত হয় মধ্যপ্রদেশের আস্ত এবং চিমুরে। এইসব ছাত্র শিক্ষার্থীদের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন মগনলাল বোগাধি। ছাত্রীরাও বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে বাংলাদেশে ভারত ছাড় আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না। এলাহাবাদে যে শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলিতে ৮জন নিহত হয়, তার মধ্যে দু'জন ছাত্র। শোভাযাত্রায় লক্ষ্যণীয় ছিল ছাত্রীদের উপস্থিতি। লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্ররা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অফিস পুড়িয়ে দেয়, তখন সেখানে ছাত্রীদের অংশ কোনভাবেই ছাত্রদের চেয়ে কম ছিল না।

স্মরণ করা যেতে পারে বোম্বাইয়ে পুলিশের আক্রমণে শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে থাকা ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় ছাত্রী নেতৃ নারগীশ বাটলিওয়ালা।

একটানা বর্বর দমনপীড়নের ৬/৭ সপ্তাহে এই আন্দোলনের বাইরের জনমুখী ব্যাপক অভ্যুত্থানের চেহারায় ভাটা পড়লেও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য গোপন কেন্দ্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি বিহারের বালিয়া, মহারাষ্ট্রের সাতারা, বাংলাদেশের মেদিনীপুরে স্বাধীন অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসেই গান্ধী অনুগামী চিত্তু পান্ডের নেতৃত্বে বালিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল। স্থানীয় ইংরাজ কালেক্টর চিত্তু পান্ডেদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে ও সমস্ত বন্দি কংগ্রেস কর্মীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হল। কিন্তু এই সরকার সৈন্য বাহিনীর আক্রমণে অচিরাৎ ভেঙ্গে পড়ল। মেদিনীপুরের তমলুকে ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীবাদী সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন। ছাত্র-যুব নেতা সুশীল ধারা প্রমুখরা বিদ্যুৎ বাহিনী নাম দিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনীও স্থাপন করেছিলেন। এরা বিরোধী আদালত স্থাপন, দরিদ্রের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত ধান বন্টনের কাজ করেছিলেন। সুদুর গ্রামঞ্চলে এদের কার্যকলাপের স্থান হওয়ায় এরা বেশ কিছুদিন এই জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

মহারাষ্ট্রের সাতাবায় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী জনতা সরকার সম্ভব হয়েছিল। ভারত ছাড় আন্দোলনের একেবারে শুরুতেই এখানে কৃষক, ছাত্র যুব, জনতা হাজারে হাজারে একত্রিত হয়ে করদ, তালগাও, ইসলামপুর প্রভৃতি স্থানীয় সরকারি কেন্দ্রস্থল (Headquarter) আক্রমণ করে

ধ্বংস করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে পোস্ট অফিসের উপর আক্রমণ, ব্যাঙ্ক লুট, টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজ অব্যাহত থেকেছে। এই পর্যায়ে এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন ওয়াই বি. চবন। আগস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত গোপন কেন্দ্র ও আত্মগোপনকারী নেতাদের সঙ্গে এরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেই এইসব নাশকতামূলক কাজ পরিচালিত করত। ১৯৪৩-এর মাঝামাঝি এই বিপ্লবী শক্তি সাতারায় 'পত্রী সরকার' নাম দিয়ে ইংরাজ সরকারি ব্যবস্থার সমান্তরাল ক্ষমতা কেন্দ্র স্থাপন করলেন। এই প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন নানা পাতিল।

এই সরকার গ্রামে, শহরে ইংরাজদের সহযোগিদের উপর আক্রমণ করে তাদের উচ্ছেদ করতে লাগল। গরীবদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে লোকদের বাড়িতে খামার লুট, সাধারণ মানুষের অভিযোগের বিচারের জন্য লোক আদালত স্থাপন, মদ্যপান নিষিদ্ধ। গান্ধীজীর প্রথানুসারী বিবাহ ব্যবস্থা অর্থাৎ বিবাহে কোন আড়ম্বর থাকবে না। হরিজনরা আমন্ত্রিত হয়ে সকলের সঙ্গে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করবে, এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই সঙ্গে শিক্ষায় উৎসাহ দান, গ্রামে গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপনের কার্যক্রম 'পত্রী সরকার' গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত 'পত্রী সরকার' তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্ট দ্বারা পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের বেআইনি ঘোষিত হয়। কমিউনিস্ট ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি প্রভৃতি বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় তাদের প্রভাবিত ছাত্রদের সংগঠনও বেআইনি ঘোষিত হয়।

ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় ছাত্রদের অংশগ্রহণে মূল ও প্রধান নেতৃত্ব অকমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও গান্ধীজীর অনুগামীদের হাতেই ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ভারত ছাড় আন্দোলন বিরোধী যে অবস্থান থাকুক না কেন স্থানীয়ভাবে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের শত শত কর্মী ভারত ছাড় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হেমু কালানী, কাদিয়ার মত বহু ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র জীবন দিয়েছে। পাশাপাশি তারা কিন্তু অকমিউনিস্ট ছাত্র নেতাদের মত ফ্যাসিস্ট শক্তির চরিত্র সম্পর্কে কখনও মোহগ্রস্থ হয়নি। বরং বলা যেতে পারে তারা মনে করেছিলেন যে যথাসম্ভব দ্রুত ইংরাজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করে আগ্রাসী জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে।

বলাই বাহুল্য কংগ্রেস, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি প্রমুখ দলগুলির দ্বারা পরিচালিত ও সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলি সাধারণভাবে ভারত ছাড় আন্দোলন দমিত হলেও আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু সারা ভারতে প্রায় সর্বত্র স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় কোন গণছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এরা ফ্যাসীবাদের বিপদ সম্পর্কে উদাসীন থাকায় কার্যত বহুক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট শক্তির পক্ষেই প্রচার করতে থাকে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির প্রতিবাদ জাপানী ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রতিরোধের কথা ঘোষণা করলেও কার্যত তাদের কার্যকলাপ ভারত ছাত্র আন্দোলনের পরিপন্থীরূপেই জাতীয়তাবাদী শক্তি ও ছাত্র সমাজের কাছে প্রতিভাত হচ্ছিল। ১৯৪২-এর ৫ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর বোম্বাই-এ নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হল—

"বর্তমান সংকট সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি ভারতকে ফ্যাসীবাদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমলাতন্ত্রের এই শেষ বে-পরোয়া চেষ্টা। কিন্তু দমননীতির ফলে আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। সমস্ত দেশে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় ছাত্র সমাজের কর্তব্য দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকারের দাবির পিছনে সমস্ত ছাত্র সমাজকে মিলিত করানো, জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করা, জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামই আজ স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র বিপ্লবী পথ।"

(জনযুদ্ধ, কলকাতা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২)

এই প্রস্তাবের কোথাও কিন্তু ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন বা স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে ছাত্রদের অংশগ্রহণের জন্য তেমন কোন আহ্বান ছিল না। সব মিলিয়ে কমিউনিস্ট পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের কোন স্বাধীন সত্ত্বা ছিল না। ভাল হোক মন্দ হোক কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধ তত্ত্বের নীতিই তাদের কার্যকলাপে প্রকাশিত হয়েছে।

'৪২-এর শেষ দিকে দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপে একটা ভাঁটার লক্ষণ দেখা দিল। যদিও গোপন কেন্দ্র থেকে বে-আইনি ধ্বংসাত্মক আন্দোলন দেশের এখানে ওখানে সংগঠিত হচ্ছিল। এই সময় সরকারী দমননীতি এবং হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীকে বিনা বিচারে বন্দি রাখার প্রতিবাদে গান্ধীজী ১৯৪৩-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ দিনের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। এই সময় '৪২-এর আন্দোলনে গান্ধীজী যে কেবলমাত্র ইংরাজ সরকার বর্ণিত হিংসাত্মক কার্যকলাপকে নিন্দা করতে অস্বীকার করলেন তাই নয়, তিনি ইংরাজ সরকারের পাশবিক অত্যাচারকেই সমস্ত ঘটনাবলীর জন্য সরাসরি দায়ী করলেন।

গান্ধীজীর এই অনশন ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার নিয়ে এল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ছাত্র-যুব সমাজও দেশব্যাপী গান্ধীজীর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে সারা পৃথিবীর নানা স্থান থেকে নানা সংগঠন, বিশিষ্ট মানুষ, নানা সংবাদপত্র তার মুক্তি দাবি করলেন। এমনকি আমেরিকা সরকারসহ তৎকালীন মিত্রপক্ষীয় দেশের কোন কোন সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দেবার জন্য বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও উদ্ধত ইংরাজ সরকার গান্ধীজীর মুক্তির ব্যাপারে এক অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেন। গান্ধীজীর মৃত্যু হলে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সাবধান করে লন্ডন, ম্যানচেস্টারের নাগরিকরা, বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি, ইংল্যান্ডের সমস্ত বৃহৎ দৈনিকপত্র Manchester Guardian, New Statesman, Nation, News Chronicale, Chicago Sun প্রভৃতি গান্ধীজীর অবিলম্বে মুক্তির জন্য দাবি জানালেন। কিন্তু Winston Churchil-এর প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ও নির্দেশে ভারত সরকার পৃথিবীব্যাপী এই আবেদন শুধু অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখান করল তাই নয়; সরাসরি ঘোষণা করলেন গান্ধীজীর অবর্তমানে ভারতের সমস্যা সমাধান খোঁজা হবে। এমনকি গান্ধীজীর মৃত্যু হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ঠিক করা হল। যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। মহানুভবতা দেখাবার জন্য যদি গান্ধীজীর মৃত্যু হয়, তাহলে তার চিতাভস্ম বহনের জন্য উড়োজাহাজের ব্যবস্থা থাকবে। সর্বোপরি অর্ধদিবস জাতীয় শোক দিবস হিসাবে ছুটি পালন করা হবে। (C.W. Vol 77. p. 56. C.W. Vol 77. p. 49-51, Mansergh and Lumby, editors, Transfer of Power— 1942—7. Vol 1-12, London,

1970-1983, Vol. 3 pp. 462-3 and 493. The popular reaction to Gandhis fast is detailed in government of India, Home Political Department, file nos. 19/3/43, 19/4/43, 19/5/43 and 19/6/43. National Archives of India, New Delhi, Linlithgow in a conversation with Louis Phillips Special W.S. representative in New Delhi p. 690).[১৫]

গান্ধীজীর অনশন অবশ্য নিরাপদেই শেষ হল। অর্থাৎ এবারও গান্ধীজী অনশনে মৃত্যুবরণ না করে ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলনের মাঝে নুতন উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করতে সক্ষম হলেন। ছাত্রদের মধ্যেও অবশ্য এর প্রভাব পড়ল।

এই সময়ই ১৯৪৩-এ বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাংলাদেশে ছাত্র ফেডারেশন গ্রামে গঞ্জে, শহরে সর্বত্র অগণিত লঙ্গরখানা খুলে দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি করে স্থাপিত হয় ছাত্র-শিক্ষকযুক্ত রিলিফ কমিটি। এই কমিটির আবেদনে ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত; যেমন বিহার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই সহ অন্যান্য অঞ্চল থেকে অর্থ, ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র নিয়ে ছাত্রদের নিয়ে গড়া রিলিফ স্কোয়াড বাংলাদেশে ছুটে এসেছে। স্থাপন করেছে অসুস্থ মানুষের সেবায় ছাত্র সমাজের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের উজ্জ্বল ইতিহাস।

কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা সারা ভারতে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে ফ্যাসীবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীকে বোঝাবার কঠিন কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে করেছিল। আমাদের শত্রু ইংরাজ— সুতরাং ইংরাজদের শত্রু জাপান আমাদের বন্ধু। সারা ভারতের ছাত্র-যুব সমাজের প্রিয়তম নেতা সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং এই মতের প্রবক্তা থাকায়, দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুব সমাজের বৃহত্তর অংশ এই মতে ভেঙে গেছিল। তাই জনযুদ্ধের নীতির প্রচার করতে গিয়ে সর্বত্রই ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মীদের নানা বাঁধা শুধু নয়, দৈহিক নিপীড়ন সহ জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

এই সময় বৃটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানের মত দেশীয় রাজ্যগুলিতে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠনের প্রসার ঘটতে থাকে। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কাশ্মীর, ইন্দোর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, কোটা, কোল্হাপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে বিশেষ করে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে ভারত ছাড় আন্দোলনের পাশাপাশি দেশীয় রাজাদের অগণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি, বৃটিশ তোষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি শক্তিশালী হয়েছে। পরবর্তীকালে দেশীয় রাজ্যগুলির মুক্তির আন্দোলনে ছাত্ররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিজামের হায়দারবাদ রাজ্যে বিশেষ করে তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনের সময় ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দক্ষিণের প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৪ সালে ৬ই মে শারীরিক কারণে গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। গান্ধীজী মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পর্যায়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হল। কংগ্রেস এই সময় নানা ধরনের গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে নিজ সংগঠন বিশেষভাবে গ্রামে সংগঠিত করতে চাইছিল। এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে একটা সমঝোতায় পৌঁছাবার জন্য তৎকালীন বড়লাট

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব যা সিমলা আলোচনা (Simla Conference) নামে খ্যাত, সেই আলোচনায় যোগদানের জন্য কংগ্রেস নেতারা সকলেই মুক্তি পেলেন। ফলে '৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের যে ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামের যুগ শুরু হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তার শেষ হয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে চলা শুরু হল।

এই নতুন অবস্থা ছাত্র আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কংগ্রেস প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন কংগ্রেসের কায়দায় গঠনমূলক কাজের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকেই প্রধান কার্যক্রম বলে গ্রহণ করে। একদিকে ছাত্রদের মধ্যে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আর তেমন কোন সংগ্রামী ভূমিকা রইল না। তারই পাশাপাশি কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন থেকে নিজেদের বেশি বেশি করে আলাদা প্রমাণ করার চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ক্রমেই অকমিউনিস্ট ছাত্র ফেডারেশন দ্বিধাভক্ত, ত্রিধাভক্ত হয়েছে। এই সময় থেকেই ছাত্র সংগঠনগুলো সংগঠন হিসাবে নিজস্ব স্বাধীনতা স্বকীয়তা হারিয়ে, কোন না কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হল বলা যথেষ্ট হবে না, স্বীকার করা দরকার কার্যত লেজুড়ে পরিণত হল। একথা সমস্ত ছাত্র সংগঠন সম্পর্কেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

লক্ষণীয় যে যুদ্ধোত্তরকালে সারা ভারতে নতুন পর্যায়ে গণ বিক্ষোভ বিস্তার লাভ করে। তখন কমিউনিস্ট পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনই ধীরে ধীরে সেই সব সংগ্রামের প্রধান চালিকাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম সম্মেলন

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে, কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ডঃ রায় তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকার ভূয়সী প্রংশসা করেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তার প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ছাত্র ও যুব সমাজের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের জন্য বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য ছাত্র সমাজকে প্রস্তুত ও সংহত হতে আহ্বান জানালেন।

(সম্মেলনের বিবরণী, ডিসেম্বর ১৯৪৪)

এই সম্মেলনে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন পাঞ্জাবের তরুণ ছাত্রনেতা শ্রী সৎপাল ডাং। সম্মেলনের শেষ দিন প্রকাশ্য সমাবেশে ১০ হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল বলে তৎকালীন ছাত্র নেতৃত্ব ও সংগঠকরা দাবি করেন। এই সম্মেলন সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনকে আরও সংগঠিত ও যুদ্ধোত্তর গণজাগরণের দিকে অনেক বেশি সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছিল।

ছাত্র কংগ্রেস গঠনের পটভূমি

কমিউনিস্ট বিরোধী ছাত্র ফেডারেশনে এই সময় ভাঙ্গন ধরে। সংগঠনের কর্মীরা সাংগঠনিক প্রশ্ন আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকার অনুরোধ জানালে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহিদি এই সভা ডাকতে কোন উৎসাহ দেখালেন না। ফলশ্রুতিতে সংগঠনের নাম ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্র ভার্মা, রামানী মেনন, পি কে কুন্টে, দালাল জগদীশ দীক্ষিত, এম. কে মঙ্গল, ডি. পি. ভার্মা, এ. কে. দাসদরণে সই করে একটি কর্মসূচি (Manifesto) প্রচার করলেন। তারা প্রস্তাব দিলেন ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে, সেখানে বর্তমানে ছাত্র ফেডারেশনের নাম পাল্টে 'ছাত্র কংগ্রেস' করার। কারণ কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন হিসাবে তাদের পৃথকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তারা নাগপুরে মিলিত হয়ে রামানী মেনন ও জগদীশ দীক্ষিতকে যুগ্ম-সম্পাদক করে একটি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করল।

এই উদ্যোগের আসল উদ্দেশ্য ছিল তখন পর্যন্ত ঐ সংগঠনে কংগ্রেস সোসালিস্ট ও অন্য বামপন্থীদের যে প্রভাব ছিল তার থেকে সংগঠনকে পুরোপুরি কংগ্রেসী আওতায় নিয়ে যাওয়া। এই সময় অকমিউনিস্ট ছাত্র ফেডারেশনের বহু নেতা ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির ছাত্র কর্মীরা সংগঠনের নাম পরিবর্তন করার বিরোধী থাকলেও ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে সংগঠনের নাম ছাত্র ফেডারেশনের পরিবর্তে 'ছাত্র কংগ্রেস' রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশেও অকমিউনিস্ট ছাত্র ফেডারশনের পাশাপাশি 'ছাত্র কংগ্রেস' নাম দিয়ে সংগঠন খাড়া করা হয়। যাই হোক একদিকে জাহিদির নেতৃত্বে, অন্যদিকে রবীন্দ্র ভার্মা, বাসুনী মেনন, বোম্বের পি. এম. যোশী প্রমুখের নেতৃত্বে এই সংগঠন ভাঙ্গতেই থাকে। একটা পর্যায়ে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ সরাসরি সংগঠনের একটা অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে সংগঠনের কার্যকারিতা প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। অন্যদিকে প্রায় সমস্ত বামপন্থী দল যে যার নিজস্ব ছাত্র সংগঠন খাড়া করে ছাত্রদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাতে থাকল।

১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হল। পূর্ব রণাঙ্গণে অবশ্য আরও কিছুদিন পরে জাপানের নাগাসাকি, হিরোসিমার উপর আমেরিকার বর্বর এ্যাটম বোমা আক্রমণের পর যুদ্ধের অবসান হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নবপর্যায়ে মুক্তি সংগ্রাম শুরু হল বিশ্বের সর্বত্র। ফ্যাসীবাদের পতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অভূতপূর্ব বিজয়। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ফ্যাসীবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমাজতন্ত্রে পথে যাত্রা করল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দিল। তারই ফলশ্রুতিতে ভারতের মত দেশেও স্বাধীনতা সংগ্রাম নবপর্যায়ে অনেক বেশি প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে নানাভাবে ফেটে পড়তে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত ভারতে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ জনগণের স্বতস্ফূর্ত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গে সারা দেশ আন্দোলিত হয়েছে। ছাত্ররা এই পর্যায়ে আবার নব উদ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা পর্যায়ে নব নব গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে যদিও মানুষে হাফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিদের বিরাট লাভ। অবশ্য সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য কিছু বেশি চাকরীর সংস্থান তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধের খরচের চাপ, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, অভাব, সেই সঙ্গে মজুতদারী, কালোবাজারের ঢালাও শ্রীবৃদ্ধি দেশের শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর করে তুলেছিল। তার ফলে শ্রমিক সংগ্রাম ব্যাপক হয়েছে সাধারণ ধর্মঘটে, সভা-শোভাযাত্রায়। দেশীয় রাজ্যসহ সারা দেশে কৃষকদের মধ্যে গণ অভ্যুত্থান রূপ পেয়েছে, বাংলাদেশে তেভাগা আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে ওয়ার্লি কৃষক বিদ্রোহ, পাঞ্জাবে কিষাণ সোচ্চার অভিযান, ত্রিবাঙ্কুরের জনগণের সংগ্রাম বিশেষকরে পুন্নাপ্পা ভায়লারের গণউত্থান এবং তেলেঙ্গানার দীর্ঘস্থায়ী কৃষক বিদ্রোহের মাঝে এইসব আন্দোলনের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেহারা পরিস্ফুট থাকলেও শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামে, ছাত্রদের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাই না। একমাত্র কলকাতায় যখন ১৯৪৫-এর ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ হাজার ট্রাম শ্রমিক কোম্পানীর ইংরাজ মালিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। তখন কলকাতার ছাত্ররা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ট্রাম শ্রমিকদের সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। ট্রাম শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিক ও ট্রাম যাত্রীদের সহযোগিতা ও ঐক্য গড়ে তোলার কাজে ছাত্ররা পথসভা করে ব্যাপক প্রচারকার্য চালায়। অর্থ সংগ্রহ করে ধর্মঘটি ট্রাম শ্রমিকদের সাহায্য করে। এই আন্দোলনে ট্রাম শ্রমিকদের আংশিক জয় হয়।

বাংলাদেশের ছাত্রদের দুটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে আমরা যুদ্ধোত্তরকালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন

আজাদ হিন্দ ফৌজের (I.N.A.) বিচারকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলন এক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন ও তার কার্যকলাপের ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪২ সালেই মালয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পরিকল্পনা করেন। মালয় থেকে জাপানীদের হাতে পরাজিত ইংরাজ বাহিনী যখন পশ্চাদ অপসারণ করছিল, তখনই মোহন সিং জাপানীদের হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে Indian National Army গঠনের জন্য জাপানী সাহায্য চান। এই বাহিনী জাপানের ভারত আক্রমণে সহায়ক হবে ভেবে জাপান সাহায্যে সম্মত হয়। মোহন সিং ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর একজন পুরাতন উচ্চপদস্থ সেনাপতি নিরঞ্জন সিং গিল-এর সহায়তায় ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসেই ১৬,৩০০ সেনা নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর প্রথম ডিভিশন গঠিত হল। কিন্তু জাপানীরা চেয়েছিল লোক দেখানো মাত্র ২০০০ সৈন্যের ছোট একটা ভারতীয় সেনাবাহিনী। অন্যদিকে মোহন সিং প্রমুখের পরিকল্পনা ছিল ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) সেনার এক শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনী। এই ব্যাপারে মত পার্থক্যের জন্য জাপানীরা মোহন সিং ও নিরঞ্জন সিং গিলকে গ্রেপ্তার করে ও এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু সুভাষচন্দ্র বসু যখন ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন। সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুর থেকে জাপান গেলে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তেজো ভারতে জাপানের কোন সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নেই ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় বিশ্বাস স্থাপন করে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর প্রত্যাবর্তন করলেন ও '৪৩-এর ২১শে অক্টোবর মাসে স্বাধীন ভারতের জন্য এক অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। এই অস্থায়ী সরকার ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কেন্দ্রিয় দপ্তর স্থাপিত হল। কেবলমাত্র জাপানীদের হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যরা মুক্ত হয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিল তাই নয়— ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জায়গায় বসবাসকারী অসামরিক ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য থেকেও সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা হল। এমনকি ঝাঁসিরাণী বাহিনী নাম দিয়ে একটি মহিলা ব্রিগেড স্থাপন করা হয়। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের বেতার কেন্দ্র থেকে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ঘোষণা করলেন—

> "ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমাদের জাতির জনক আপনার কাছে ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামে আপনার আশির্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করছি।"

(Selected speech of Subash Chandra Bose,
New Delhi 1955 p. 218)

কিন্তু জাপানীরা যখন ভারত-ব্রহ্মা রণাঙ্গণে ইম্ফল আক্রমণ করল; তখন তারা ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজ-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি মাত্র ব্যাটেলিয়নকে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুমতি দিল। রণাঙ্গণে আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর সেনাদের সঙ্গে চরম অমানবিক ব্যবহার সহ এমনকি জাপানী সৈন্যবাহিনীর জন্য চাকর-বাকরের কাজে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের বাধ্য করা হয়। এইসব কারণে, ইম্ফল যুদ্ধের ব্যর্থতা, জাপানীদের ক্রমান্বয় পশ্চাদোপসারণ আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত মুক্ত করার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। এর পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৫ সালে চূড়ান্ত পরাজয় ও আত্মসমর্পণে। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের যখন ভারতে আনয়ন করে ইংরাজ সরকার তাদের চরম শাস্তি দেবার চেষ্টা শুরু করল, — তখনই তাদের সমর্থন ও রক্ষায় দেশব্যাপী এক বিশাল দুর্জয় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু করল।

প্রথমে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের জন্য সমস্ত সংবাদপত্রেই নরম মনোভাব প্রদর্শনের জন্য ইংরাজ সরকারের কাছে আবেদন জানানো হলেও; যখনই লাল কেল্লায় তাদের বিচার শুরু হল, সারা দেশ তার প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীরা দেশদ্রোহী নয়, দেশপ্রেমিক— এই শিরোনামায় ইস্তাহার প্রকাশিত হল ও দেশের প্রায় সর্বত্র এই ইস্তাহার বিলির সঙ্গে সঙ্গে গভীর উৎসাহে জনতার সকল অংশে মানুষ ইস্তাহারের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করতে লাগল। দেয়ালে দেয়ালে 'জয় হিন্দ', 'ভারত ছাড়' শ্লোগান লেখা হল। দিল্লির সর্বত্র পোস্টার পড়ল—প্রতিজন শাস্তিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিশোধে ২০ জন ইংরাজ কুকুরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। বেনারসে জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হল, যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলে ইংরাজ শিশুদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। (Transfer of power Vol. 6 p. 507) একমাত্র সেন্ট্রাল প্রদেশ ও বেরারে আজাদ হিন্দ বন্দিদের মুক্তিতে ১৬০টি সভা অনুষ্ঠিত হল। ১৯৪৫ সালের ৫-১১ নভেম্বর I.N.A. সপ্তাহ ও ১২ই নভেম্বর I.N.A. দিবস পালিত হল। প্রতিটি সভায় বিশাল

সংখ্যক মানুষ—সাধারণভাবে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিত হতে লাগল। ত্রাণ কমিটির আহ্বানে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে ৫ থেকে ৭ লক্ষ জনতার বৃহত্তম সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় বক্তৃতা করলেন নেহরু, প্যাটেল ও শরৎ বসু। যদিও দিল্লি, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবের শহরগুলি আন্দোলনের প্রধান স্থান হলেও; নিস্তব্ধ গ্রামেও এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছল। এমন কি উত্থাল হয়ে উঠল থাম্মাম, বেলুচিস্থানের মত সদানিস্তব্ধ সুদূর প্রান্তভূমি।

এই আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি জঙ্গী। তারা উত্তরে পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডি থেকে দক্ষিণে সালেম, পশ্চিমে বালুচিস্থান থেকে পূর্বে বাংলা, আসাম পর্যন্ত ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রায় মুখর হয়ে উঠল। পুলিশের লাঠি, গুলির সামনে প্রাণ দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। স্বীকার করতেই হবে এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন। আর এই আন্দোলন সর্বাপেক্ষা জঙ্গী ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল বাংলাদেশেই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেমিক জনতা ও ছাত্র সমাজের অনুভূতি তখন সর্বোচ্চসুরে বাধা হয়ে গেছে। ১৯৪৫-৪৬-এর শেষ ও প্রথম দিকে অর্থাৎ শীতকালে, ৪৫-এর ২১ নভেম্বর কলকাতায় প্রকৃতপক্ষে গণঅভ্যুত্থান ঘটল। এর প্রথম সারিতেই ছিল ছাত্ররা। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার শুরু হলে, ৪৫-এর ২১ নভেম্বর এই বিচারের প্রতিবাদে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিল। ধর্মঘটে সামিল হল দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্র সংঘঠন ও ছাত্ররা। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ফরওয়ার্ড ব্লক, ছাত্র ফেডারেশনরে প্রভাবিত ছাত্রদের এক বিশাল শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্কোয়ারের (বর্তমান বি.বা.দি.বাগ) দিকে অগ্রসর হলে, পুলিশ ধর্মতলা স্ট্রীটে (বর্তমান লেনিন সরণী) উপর গতিরোধ করে, শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেবার আদেশ জারি করল। ছাত্ররা চলে যেতে অস্বীকার করল। তারা ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর বসে রইল। পুলিশ ছাত্র শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেবার জন্য লাঠি চালালে ছাত্ররা ইট পাটকেল ছুড়ে তার জবাব দিল। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র বসু ছাত্রদের ফিরে যাবার জন্য চিঠি পাঠান। ছাত্ররা শ্রী বসুর সেই নির্দেশ অমান্য করল। সন্ধ্যাবেলা পুলিশ গুলি চালাল, ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রমিক যুবক আবদুল সামাদ নিহত হলেন। ৫২ জন আহত হন। আহতের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী অরুণ সেন।

ছাত্ররা গুলি চালনার পরও স্থান ত্যাগ না করে সারা রাত ঐখানেই অবস্থান করল। আন্দোলনের এই প্রথম ধাপ নতুন প্রেরণা ও শক্তি পেল। পরদিন ২২শে নভেম্বর যখন ইসলামিয়া কলেজের (Central Calcutta College) ধর্মঘটি ছাত্রসহ আরও নানা জায়গায় ছাত্ররা এসে অবস্থানে সামিল হল। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে ছাত্রদের সমর্থনে পুলিশী দমননীতির প্রতিবাদে ও ফৌজী বন্দিদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার সর্বস্তরের শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করল।

গণপ্রতিরোধ উপেক্ষা করে ইংরাজ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নেতা ক্যাপটেন রশিদ আলিকে তথাকথিত বিচারে ৭ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করে। এই দন্ডের

প্রতিবাদে, তার মুক্তির দাবিতে ১১ই ফেব্রুয়ারি '৪৬ কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিল মুসলিম ছাত্রলীগ। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানলো ছাত্র ফেডারেশনসহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। কলকাতা ও শহরতলীতে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হল। এবারও ডালাহৌসী স্কোয়ারের মুখে পুলিশ ছাত্র শোভাযাত্রার গতিরোধ করে আক্রমণ শুরু করল। ছাত্ররা তার প্রতিরোধ করল। তাদের পাশে এসে দাঁড়াল ট্রাম, বাস, রিক্সা শ্রমিকরা। লক্ষ লক্ষ ছাত্র, যুব, শ্রমিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'হিন্দু মুসলমান এক হও', 'ইংরাজ ভারত ছাড়', 'আজাদ হিন্দ বন্দিদের মুক্তি চাই'।

জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ নেতারা ছাত্র ও জনতার এই জঙ্গী আন্দোলন পছন্দ করেননি বলাই বাহুল্য। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর কেসি ভারত সরকারকে গোপন চিঠিতে লেখেন যে— "আমার স্পষ্ট ধারণা যে কংগ্রেস ও লীগ এই প্রধান দুটি দল এই বিক্ষোভ চায় না। কিন্তু তারা নিজের দলেব তরুণ কর্মীদের সামলাতে অপারগ। এই বিক্ষোভকারীদের প্রভাবান্বিত করছে কমিউনিস্টরা। (হোম পলিঃ রিপোর্ট, ফাইল নং ৫/২২/৪৬)

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণায় ১০ লক্ষ শ্রমিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ ধর্মঘট করল। ১২ই ফেব্রুয়ারি '৪৬ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুলিশ, মিলিটারীর বাধা উপেক্ষা করে কলকাতার রাস্তায় লক্ষাধিক মানুষের বিজয় মিছিল বেরল। মিছিলের প্রাণশক্তি ছিল মূলত ছাত্ররা। ১২, ১৩, ১৪ই ফেব্রুয়ারি সারা বাংলাদেশে চলেছে ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল। সাধারণ ধর্মঘট, রাস্তায় ব্যারিকেড তুলে পুলিশের সঙ্গে লড়াই সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা তার ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারির কাগজে লিখল— "গতকাল ও আজ কলকাতার রাজপথে আমরা যা দেখলাম, তারি নাম গণ-অভ্যুত্থান।"

"কলকাতার বড় বড় রাজপথে টহল দিচ্ছে ইংরাজ ফৌজ। তাদের গুলিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১৫০ জন নরনারী। কলকাতার যানবাহন তিনদিন ধরে একবারে অচল। শিয়ালদহ ও হাওড়া কোনও স্টেশন থেকেই ট্রেন ছাড়ছে না, ট্রেন আসছেও না। রেলপথ জনতায় অবরোধে বিপর্যস্ত। শ্রমিক অঞ্চল সমর্থন করছে। সারা কলকাতা জুড়ে মোড়ে মোড়ে রয়েছে ব্যারিকেডের অবরোধ।"

আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবিতে ভারতব্যাপী আন্দোলনে সর্বত্রই ছাত্ররা গণ-অভ্যুত্থানে স্ফুলিঙ্গের কাজটি করেছিল।

ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শান্ত হতে না হতেই বোম্বাই-এ নৌসেনাদের বিদ্রোহ ফেটে পড়ল। এ ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এইচ.এম.আই.এস. তলওয়ার জাহাজের ১,১০০ নাবিক সৈন্য তাদের প্রতি নানা ধরনের অমানবিক ব্যবহার, বর্ণ বৈষম্যমূলক আচরণ, অখাদ্য পরিবেশনের প্রতিবাদে ১৮ই ফেব্রুয়ারি '৪৬ ধর্মঘট করল। 'জাহাজে ভারত ছাড়' শ্লোগান লেখার অপরাধে নাবিক বি.সি.দত্তকে গ্রেপ্তার করা হল। H.M.I.S. তলওয়ারের নাবিকদের উপর গুলিবর্ষণের গুজবে ব্যারাক থেকে নৌসেনারা বোম্বাই-এর পথে নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। স্বভাবতই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল না এবং তখনকার আবহাওয়ায় সেরকম শান্তিপূর্ণ কোন বিক্ষোভ আদৌ সম্ভব ছিল না।

নৌ-বিদ্রোহ

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব জনতার বিভিন্ন অংশের মানুষকে ঐসব নৌ-সেনানীদের সমর্থনে রাস্তায় নিয়ে এল। বোম্বাই ও কলকাতা ধর্মঘটে সভা-শোভাযাত্রায় অচল হয়ে গেল। বোম্বাই শহরে ছাত্র সহ শ্রমিক জনতার রোষে সরকারি হিসাবমত ৩০টি দোকান, ১০টি পোস্ট অফিস, ১০টি পুলিশ চৌকি, ৬৪টি খাদ্যশস্যের দোকান, ২০০ ল্যাম্পপোস্ট ধ্বংস হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাধারণ ধর্মঘটে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, ছাত্র কারখানা, স্কুল-কলেজ ছেড়ে বোম্বাই-এর রাস্তায় নেমে এসেছিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারি করাচীতে নৌ-সেনারা ধর্মঘট করে। ধর্মঘটি নৌ সেনাদের সমর্থনে কেবলমাত্র শ্রমিক ছাত্র শহরবাসীরাই নয়— মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্, কলকাতা, দিল্লি, কোচিন, জামনগর, আন্দামান, বাহারিণ, এডেন প্রভৃতি স্থানে নানা সামরিক প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কর্মীরা ধর্মঘটি নৌসেনাদের সমর্থনে প্রতীক ধর্মঘট করে। ২০টি তীরবর্তী প্রতিষ্ঠান সহ ৭৮টি জাহাজের ২০,০০০ নৌসেনা ও কর্মী এই ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই বিশালতা যেটুকু ছিল সেই অনুপাতে এর সংগঠন ছিল না। তারা কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের সমর্থনের আশা করেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের নিরাশ করেন এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত ও বাধ্য করেন।

নৌ-বিদ্রোহের ফলে ভারতের ইংরাজ শাসনের স্থায়িত্ব আরও শ্লথ হয়ে পড়েছিল। ১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ শুরু, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের কমন-সভায় তৎকালীন শ্রমিকদলের সরকারের প্রধানমন্ত্রী এটলী ভারতকে স্বাধীনতা দেবার বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী-মিশন প্রেরণের কথা ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বরেণ্য কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত সহ বহু কমিউনিস্ট ও বামপন্থী ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ মনে করেন, নৌ-বিদ্রোহ এটলীর ভারতকে স্বাধীনতা দেবার পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও মন্ত্রী মিশন (Cabinet Mission) প্রেরণের ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ তথ্য বোধহয় স্বীকার করা যায় না, কারণ ভারতে Mission পাঠাবার সিদ্ধান্ত ১৯৪৬-এর ২২শে জানুয়ারি বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডলি গ্রহণ করেছিল। আর ১৯ তারিখের ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে আরও এক সপ্তাহ পূর্বেই হবার কথা ছিল, কোন কারণে ঐ ঘোষণা তখন সম্ভব হয়নি।

একথা অনস্বীকার্য যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগ থাকলেও আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান বৈপ্লবিক চরিত্রের প্রতি তাদের অবশ্যই প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য বিরোধিতা ছিল। আজাদ হিন্দু ফৌজকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সমস্ত শহরে ছাত্রসহ সমস্ত শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ময়দানে নেমে এসেছিল। ধর্মঘট, হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা, মিছিলে মিছিলে অশান্ত হয়ে উঠেছিল বহরমপুর, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, বগুড়া, পাবনা, জিয়াগঞ্জ, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং প্রভৃতি সমস্ত জেলা শহর। তেমনি ভারতের অন্যত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়, বীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্ত কর, চল-চল-দিল্লির লালকেল্লা চল, হিন্দু-মুসলমান এক হও— এই রণধ্বনি নিয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্র, যুব, শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট মিছিল। ১৩-১৪ই

ফেব্রুয়ারি পাটনা, নাগপুর, পুনা, বাঙ্গালোর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, মীরাট, আলিগড়, লাহোর, অমৃতসর, করাচি, দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর রাজপথ মুখরিত করে তুলেছিল। (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)

নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে উত্তাল বোম্বাই-এর রাজপথে ৩০০রও বেশি শ্রমিক ছাত্র-যুব শহীদ হলেন। বিদ্রোহী নৌ-সেনারা অবিচল থাকলেও অবশেষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দ্দেশে বিদ্রোহীদের কেন্দ্রিয় কমিটি আত্মসমর্পন করলেন "ভারতীয় নেতাদের কাছে ইংরাজ শাসকদের কাছে নয়"।

(সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দি. আর. আই. এন. স্ট্রাইক ১৯৫৪)[১৮]

১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাসে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের পাশে দাড়াবার জন্য এশিয়ার ছাত্রদের কাছে আবেদন করল।

এই আবেদনে সারা দিয়ে '৪৭-এর ২১শে জানুয়ারি বাংলাদেশের ছাত্ররা স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করল। দাবি তুলল—দমদম বিমানবন্দর দিয়ে ফরাসী বিমান চলাচল বন্ধ করতে হবে। কলকাতায় পুলিশের গুলিতে নিহত হল ছাত্র ধীররঞ্জন ও সুখেন্দুবিকাশ। প্রতিবাদে পরদিন সারাবাংলায় ছাত্র ধর্মঘট হল। মৈয়মনসিং-এ পুলিশের গুলিতে শহিদ হল কিশোর ছাত্র অমলেন্দু। সাময়িকভাবে দমদম বিমানবন্দরে ফরাসী বিমান চলাচল বন্ধ হল। এই আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাব কি ছিল? তার সামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ স্বাধীনোত্তর যুগের ছাত্র আন্দোলনে তার ছাপ খুবই পরিস্কারভাবে পড়েছিল।

১২ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাজপথের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতিতে বললেন, "কলকাতার রাজপথে এখন গুণ্ডারাজ চলছে, আমরা তার নিন্দা করছি।" (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)

শরৎচন্দ্র বসু বল্লেন "গত দু'দিনের ঘটনা দেখেও বোঝা যাচ্ছে যে গুণ্ডারা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকেরা এখন শহরে নেতৃত্ব করছে। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করবে না।"

(অমৃতবাজার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)[১৯]

নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে নেতাদের মনোভাব ছিল আরও প্রকট বিরোধী। সর্দ্দার প্যাটেল প্রকাশ্যে বললেন, "নৌ-বিদ্রোহ হচ্ছে অরাজকতা, একে এখনই বন্ধ করা দরকার।"... "নৌ-বিদ্রোহকে সমর্থন করছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তারা দেশকে ভুলপথে পরিচালিত করতে চাইছে। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আমি একমত যে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে।"

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)[২০]

মুসলিমলীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না বল্লেন, "নৌ-বিদ্রোহ একটি অসময়োচিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড।" (পত্রিকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)

গান্ধীজী ৩রা মার্চ '৪৬ হরিজন পত্রিকায় লিখলেন — "It is a matter of great relief that the ratings have listened to Sardar Patel's advice to surrender. They have not surrendered their honour so far as I can see, interesting to mutiny they were badly advised. If it was for grievance, fancied or real, they should have waited for the guidance and intervention of political leaders of their choice. If they mutinied for the freedom of India,

they were doubty wrong. They could not do so without a call from a prepared revolutionary party. They were thouthtless and ignorant, if they believed by their might alone they would deliver India from foreign domination.

"Lokmanya Tilak has taught us that Home Rule or Swaraj is our birth right. That Swaraj is not to be obtained by what is going on now in Bombay, Calcutta or Karachi."[২১]

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অরুণা আসফ আলি নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থন করে সর্দার প্যাটেলের আত্মসমর্পনের নির্দেশ অমান্য করতে নৌ-সেনাদের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য গান্ধীজী তাকে এই সমর্থন করা থেকে নিবৃত্ত হতে বলে একটি ধমক দিলেন। তিনি লিখেলেন—

"They who incited the mutineers did not know what they were doing. The latter were bouned to submit ultimately. Aruna would 'rather unite Hindus and Muslims at the barricade than call the constitution front" *[২২]

ইতিমধ্যে Cabinet Mission আসার কথা ঘোষিত হওয়ার কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্যই তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে খানিকটা স্থির নিশ্চয় থাকায়; নৌ-বিদ্রোহে সৈন্য বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা সম্পর্কেই হয়ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন।

এই সময় কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রধানত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার প্রকাশ যদিও কৃষক আন্দোলনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি তা নয়, তবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল অনেক গভীর। এর কারণ মার্কসবাদী তত্ত্বানুসারে শ্রমিক শ্রেণিই সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবের নেতা। তাই শ্রমিক শ্রেণির প্রতি আনুগত্য সমস্ত কমিউনিস্ট ও সাম্যবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত সকলেরই অবশ্য কর্তব্য বলেই বিবেচিত হত। আর একটি বাস্তব কারণ, শ্রমিক ও সেই সময়কার ছাত্ররা মূলত শহরের এবং তাদের অবস্থান কাছাকাছি। এর ফলে কলকাতা, বোম্বাই, কানপুর, করাচী প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি তাদের সহমর্মিতার প্রকাশ। ২৯শে জুলাই '৪৬ সারা ভারতে ডাকও তার ধর্মঘটের ডাক দিল সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (A.I.T.U.C.)। বাংলাদেশের ছাত্ররা ঐ ধর্মঘটে যোগ দিল, সমর্থন জানাল বোম্বাই সহ ভারতের বিভিন্ন শহরের ছাত্ররা।

এর ফলে, ছাত্র আন্দোলন থেকে অগণিত ছাত্রনেতা ও কর্মী পরবর্তী সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতা হয়েছেন। কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। অনেক নামের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের যে সব ছাত্রনেতা পরবর্তী কালে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন তাদের কয়েকটি নাম অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার— বাংলাদেশে কমল সরকার, জলি কাউল, কমলাপতি রায়, ভবানী রায়চৌধুরী; বিহারে সুনীল মুখার্জী; উত্তরপ্রদেশের রমেশ সিনহা, রবি সিনহা; নাগপুরের এ. বি. বর্দ্ধন; পাঞ্জাবের ওমপ্রকাশ মালহোত্রা, সত্যপাল ডাং, বিমলা ডাং প্রমুখ।

কৃষক আন্দোলনে গেছেন এমন দু'টি নামই উল্লেখ করতে পারা যায়। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের কৃতি ছাত্র, পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ডঃ সুনীল সেন ও অবনী লাহিড়ী।

'৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি

১৯৪৬-এর ২৪শে জুলাই দশ হাজারেরও বেশি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ছাত্রফেডারেশন, ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বন্দি মুক্তির দাবিতে বাংলার বিধানসভা অভিযান করে— বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দিকে ছাত্র মিছিলে আসতে বাধ্য করল। বন্দিমুক্তির দাবি আদায় হল। তিনি ঘোষণায় বাধ্য হলেন, ৩১শে আগস্টের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে। ঠিক তখনই মন্ত্রী মিশনের আলোচনার অবসরে সাম্প্রদায়িক শক্তির উগ্রতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধাতে সক্ষম হল। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট সেই চরম কলঙ্কজনক অধ্যায় শুরু হ'ল। সে এক দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। সেই দাঙ্গা কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রয়োজনে হৃদয়হীন নারকীয়তার মিশ্রনে সংগঠিত। ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) দিবস সর্বত্র থমথমে ভাব, প্রচণ্ড আলোড়ন হবে আশঙ্কা থাকলেও যা ঘটল তেমন ঘটনার কথা কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল কিনা বলতে পারব না। যে কুকর্ম পশুতে কখনও করে না, মানুষ তাই করল অবলীলাক্রমে, প্ল্যান করে, উল্লাস করে। মানুষকে মানুষ পিটিয়ে খুচিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারছিল। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল কলকাতা সহ বাংলাদেশে, বিহারে, পাঞ্জাবে কোথায় নয়? মনুষত্ব যে কত ঠুনকো হতে পারে তার জঘন্য নির্লজ্জ প্রমাণ মিলল এই দাঙ্গায়। আর এই কাজে কি হিন্দু, কি মুসলমান কেউ কম যায় না, এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়।

একটু ব্যক্তিগত কথা না বলে পারছি না। আমার জন্ম উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায় মিশ্র এলাকায়. দাঙ্গাব সময় অবশ্যই আমার বয়স ১৬ বছর। জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম, নারায়ে তক্‌দীর, আল্লাহো— আকবর এইসব ধ্বনির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই আমার পরিচয়। কিন্তু পরস্পরকে খুন করার জন্য মনোবল চাঙ্গা রাখতে উভয়দিকে দিনরাত্রি মুহুর্মুহু চীৎকার বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ, নারায়ে তকবীর, আল্লাহ হো আকবর— আমার মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, আজও আমি তার হাত থেকে মুক্তি পাইনি। কি জানি কেন আজও এই ধ্বনিগুলি কানে গেলেই আমায় মনে কেমন যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। জানি না সে অনুভূতি, বিরক্তি ঘৃণা, ক্রোধ না ভয়ের, হয়ত সবটা মিলিয়েই।

১৯৪৫-এর নভেম্বর থেকে ৪৬-এর জুলাই পর্যন্ত যে খাতে দেশের রাজনীতি বইছিল, তাতে পড়ল ছেদ। অন্ধকার রাজনৈতিক আকাশে ইংরেজের চালের কাছে আমরা মাৎ হলাম। সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমান এক জায়গায় থাকতে পারে না, পারবে না। অতএব দেশ ভাগ আর সেই খণ্ডিত দেশ মেনে নিয়ে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট (১৪ই আগস্ট রাত ১২টায়) আমরা স্বাধীন হলাম।

দাঙ্গার ধাক্কায় সারা দেশে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে সারা দেশের কোথাও ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য কোন দাঙ্গা-বিরোধী ভূমিকা দেখা গেল না। তবে কলকাতার ছাত্র সমাজ শেষের দিকে অবশ্যই দাঙ্গা-বিরোধী ভূমিকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্ররা বহু সভা করে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচার বজায় রেখেছে। তবে স্বাধীনতা লাভের পক্ষকালের মধ্যে যখন আবার ৩১শে আগস্ট মাঝরাত থেকে

কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল, অবশ্যই ছাত্ররা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ১লা—৩রা সেপ্টেম্বর কলকাতায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিশাল মিছিল 'দাঙ্গাবাজদের শায়েস্তা কর' রণধ্বনি নিয়ে শহর পরিক্রমা করল। গান্ধীজী বেলেঘাটার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বস্তিতে বসে আমরণ অনশন শুরু করলেন। আওয়াজ উঠল গান্ধীজীকে বাঁচাতে হলে কলকাতায় শান্তি চাই। ৭২ ঘন্টার মধ্যে দাঙ্গা থামল। গান্ধীজী অনশন ভাঙ্গলেন। এই পর্যায়ে ছাত্ররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বীকার করতে হবে, কলকাতার মত ভারতের অন্য কোথাও ছাত্রদের সেরকম কোন ভূমিকা ছিল না।

দাঙ্গায় মৃত হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ রক্তস্নাত পথ দিয়ে খণ্ডিত দেশ নিয়ে আমরা স্বাধীন হলাম। শুরু হল নানা প্রান্তে উদ্বাস্তুর অন্তহীন লাইন। বেদনা ছিল, তথাপি, স্বাধীনতার আনন্দে আমরা স্বাভাবিকভাবে উদ্বেল হয়ে উঠলাম। শেষ হল জাতীয় জীবনের এক বিরাট অধ্যায়— আমরা আর পরাধীন জাতি নই। আমরা স্বাধীন, আমারই নতুন করে আমাদের ভবিষ্যত গড়ব। ছাত্র আন্দোলনেরও একটা অধ্যায় শেষ হল। ছাত্র সমাজের সামনে এল নতুন প্রশ্ন, নতুন সম্ভাবনা, নতুন সমস্যা।

তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ
ছাত্র-যুব মানসে প্রতিক্রিয়া

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ভারতের ছাত্র এবং যুব আন্দোলনের গতিমুখে যে সমাজ-সচেতনতা, দেশপ্রেমিকতা, বিদ্রোহী মনের উজ্জ্বল মানসিকতা, নৈরাজ্যবাদী রোমান্টিক-এ্যাডভেনচারিস্ট ভাবপ্রবণতা এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র-যুব মানসকে প্রাণবন্ত এবং উদ্বেলিত করে তুলেছিল, তার অন্যতম কার্যকারণ সম্পর্কের ইতিহাসে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের 'তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ'। 'তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ'-এর গৌরবময় ইতিহাস এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্রষ্টা যে সংগ্রামী মানুষের অংশীদার ছিল ছাত্র-যুব সমাজ এবং বিশেষকরে গ্রামীণ যুবসমাজ। সমাজ-বিপ্লব এবং পুরনো সমাজ-কাঠামোকে পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজের কাছে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এক দীর্ঘস্থায়ী প্রেরণার উৎস। বহু দশক এবং চলমান শতাব্দীর পরেও এই বিদ্রোহের প্রভাব আলোচনার বিষয়বস্তু। তাই, ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনের উত্তরসূরী এবং সমগ্র ছাত্র যুব-সমাজের কাছে এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট ও বিবরণ উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তেলেঙ্গানার পরিচিতি

বর্তমানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত একটি বিশেষ অঞ্চল তেলেঙ্গানা। বর্তমান তেলেঙ্গানা এবং সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের সময়কার তেলেঙ্গানার মধ্যে অবস্থানগত এবং সীমানাগত অনেক পার্থক্য আছে। ভাষায় ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পর বর্তমানে তেলেঙ্গানা এবং আর পূর্বেকার তেলেঙ্গানা এক নয়।

মুঘল সাম্রাজের পতন এবং শেষ বাদশার মৃত্যুর পর নিজাম যে হায়দারাবাদ রাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের আমলে সে হায়দারাবাদ রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত একটি সামন্ত রাজ্যে [Subsidiary Feudatory State] পরিণত হয়। সেই সময় হায়দারাবাদ রাজ্যের মোট আয়তন ছিল ৮৩,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্রের বেরার অঞ্চল. উপকূলবর্তী যেসব জেলা নিজামের আনুগত্য স্বীকার করেছিল সে সব জেলা এবং তেলেঙ্গানা অঞ্চল নিয়ে এই হায়দারাবাদ রাজ্য। হায়দারাবাদ রাজ্যের ৮টি তেলেগুভাষি জেলা নিয়ে গঠিত তেলেঙ্গানা অঞ্চল। নিজামের এই ৮টি তেলেগুভাষি জেলা হল— আদিলাবাদ, করিমনগর. ওরাঙ্গল, খাম্মাম, নালগুপ্তা, মাহবুবনগর, নিজামাবাদ, মেডাক। ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট (জনগণনা রিপোর্ট) অনুসারে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে (প্রধানত) তেলেগুভাষি জনসংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ অর্থাৎ হায়দারাবাদ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ। এই রাজ্যে আরও দুটি অঞ্চল ছিল— মারাঠাওয়াড়া অঞ্চল এবং কান্নাড়া অঞ্চল। তেলেঙ্গানা অঞ্চল (Telengana Area) সহ হায়দারাবাদ রাজ্য তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। নিজামের এই হায়দারাবাদ রাজ্যের মোট আয়তনের ৫১ ভাগ ছিল তেলেঙ্গানা অঞ্চলে, ২৮ ভাগ ছিল মারাঠাওড়া অঞ্চলে এবং বাকি ২২ ভাগ ছিল কান্নাড়া অঞ্চলে। এর মধ্যে বিশেষ করে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে রয়েছে গভীর বনাঞ্চল। গভীর বনাঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষ্ণা বনাঞ্চল এবং গোদাবরী বনাঞ্চল।

জনবিন্যাস

হায়দারাবাদ রাজ্যের জনবিন্যাস ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে অনুমান করা যায়। এই সময় তেলেঙ্গানা অঞ্চলে তেলেগুভাষি জনসংখ্যা ছিল ৯০,০০,০০০ মারাঠাভাষি অঞ্চলে লোকসংখ্যা ছিল ৪৫,০০,০০০, কানাড়া ভাষি অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ২০,০০,০০০, তাছাড়া এই রাজ্যে উর্দুভাষি জনসংখ্যা ছিল ২১,০০,০০০। মোট জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ। হায়দারাবাদ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১২ ভাগ ছিল মুসলমান। নিজাম শাসিত এই মুসলিম সামন্ত রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল কার্যত সংখ্যালঘু। কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রিক কাজে নিয়োজিত কর্মচারী ও আমলার সংখ্যার ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রায় শতকরা ৯০ জন। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদের সাথে রাজ্যের মুসলিম শাসক নিজামের বিরোধ-দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল।

মোট জনসংখ্যার বেশির ভাগই ছিল গরীব মানুষ। বিশেষ করে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের প্রায় সব জেলাতেই গরীব মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। বনাঞ্চলের গিরিজন এবং অন্যান্য উপজাতির মানুষেরা ছিল অত্যন্ত গরীব। হায়দারাবাদ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ছিল গরীব কৃষক, খেতমজুর-দিনমজুর, ভাগচাষী। বাকি ১০ ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগ ছিল সামন্তপ্রভু এবং ধনী কৃষক। বৃহৎ জমির মালিক ভূস্বামীদেব বলা হতো দেশমুখ। এই দেশমুখরা ছিল অত্যন্ত বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী। নিজাম দেশমুখদের জায়গিরদারে মতো সুযোগ-সুবিধাভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার এই দেশমুখরা বেশিরভাগ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-অত্যাচার

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের আর্থ-সামাজিক কারণের মূলে রয়েছে অকল্পনীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং অত্যাচার। একটি সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য হিসাবে হায়দারাবাদ রাজ্যের আবাদযোগ্য জমি এবং অনাবাদি জমিসহ বনাঞ্চলের জমির বেশিরভাগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ভূস্বামী, জায়গিরদার এবং দেশমুখদের হাতে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পি. সুন্দরাইয়া লিখিত পুস্তকের [Telengana People's Struggle and Its Lesson][১] প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে সেই সময় হায়দারাবাদ রাজ্যে মোট জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ একর। এর মধ্যে ৩ কোটি একর জমি (শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ) ছিল সরকারের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার অধীন এবং আর শতকরা ১০ ভাগ জমি ছিল নিজামের নিজস্ব এস্টেটের-এর অধীন। নিজাম তাঁর এস্টেটের কৃষকদের উপর কার্যত লুণ্ঠন চালিয়েছিল। এই লুণ্ঠন চালিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে নিজামের নিজস্ব আয় ছিল বার্ষিক ২ কোটি টাকা। এই ২ কোটি টাকা ব্যয় হত নিজামের পরিবার এবং তাঁর পরিষদবর্গকে ভরণ-পোষণের জন্য। এই ব্যক্তিগত খরচ-খরচা ছাড়া রাজ্য পরিচালনার ব্যয় ছিল স্বতন্ত্র। উপরন্তু হায়দারাবাদ রাজ্যের সরকারি কোষাগার থেকেও নিজাম নবাব বৎসরে ব্যক্তিগতভাবে ৭ কোটি টাকা খরচ করতেন। যে সময় নবাবের ব্যক্তিগত এস্টেটের জমি দেওয়ানী অঞ্চলের জমির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হল, তখন নবাবকে প্রতি বৎসর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো ৫ কোটি টাকা এবং এই ক্ষতিপূরণ ছাড়াও রাজন্য ভাতা (privy purse) হিসাবে দেওয়া হত আরও ৫ কোটি টাকা। বিভিন্ন খাতে নিজামের এই ধরণের ব্যক্তিগত বিশাল অঙ্কের আয় আসত সর্বস্তরের কৃষকদের উপর নানা ধরণের রাজস্ব চাপিয়ে। এক কথায় শোষণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে।

একজন সামন্ততান্ত্রিক নবাব তার প্রজাদের উপর যখন লুণ্ঠন চালিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িয়ে চলেছিলেন, তখন তার অধীনস্ত ছোট বড় বিভিন্নস্তরের সামন্ত প্রভু ও ভূস্বামীরাও প্রজাদের উপর যখন চালিয়েছেন যথোচ্ছাচার। এঁদের এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতনের প্রধান সহায় ছিল নিজামের রাজত্বের জায়গিরদারী প্রথা। হায়দারাবাদ রাজ্যের মোট আয়তনের ত্রিশ শতাংশ অঞ্চল ছিল জায়গির (Jaigir) অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। এই জায়গির অঞ্চলের সামন্ত ভূ-স্বামীদের বলা হতো— পাইগাস (paigas), সামস্থানম (Samsthanam), জায়গিরদার (Jaigirdars), ইজারাদার (Igardars), বানজারদার (Bangardars), মকতেদার (Maktedars), এ্যাগরাহাম Agraharams)। সকলেই ছিল অত্যাচারী সামন্ত প্রভু-ভূস্বামী। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হল— তেলেঙ্গানা অঞ্চলে সব চাইতে অত্যাচারী সামন্ত-ভূস্বামী ছিল দেশমুখ (Deshmuks) পরিবারবর্গ। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে দেশমুখ পরিবারগুলি সাধারণ কৃষক সমাজের উপর চরম অত্যাচার চালিয়েছিল। ১৯৪০ সালের হিসাবে কয়েকজন অত্যাচারী দেশমুখ পরিবারের জমির হিসাবে ছিল নিম্নরুপ :

১। নালগোন্ডা জেলার জানগুন তালুকের (Jangoon taluka) ৪০টি গ্রামের চল্লিশ হাজার একর জমির মালিক ছিল বিষ্ণু দেশমুখ।

২। ঐ একই অঞ্চলে সূর্যপেট দেশমুখ ছিল বিশ হাজার একর জমির মালিক।

৩। মৈর্ঘলাগুডেম তালুকের (Miryalagudem taulka) বাবাসাহেব পেট দেশমুখের জমি ছিল দশহাজার একর।
৪। খাম্মাম জেলার মাধিরা তালুকের (Madhira taluks) - এর কাল্লুরো দেশমুখের ছিল এক লক্ষ একর জমি।

[এই তথ্য পি. সুন্দরাইয়ার বই থেকে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা - ১৫]

তাছাড়া অনেক রেড্ডি পরিবারেরও ছিল হাজার হাজার একর জমি। যেমন— সূর্যপেট তালুকের জান্নারেড্ডির জমি ছিল দেড়লক্ষ একর। এই রকম অসংখ্য সামন্ত ভূস্বামীর মালিকানাধীন জমির রেকর্ড রয়েছে তৎকালীন ভূমি রাজস্ব বিভাগে।

হায়দারাবাদ রাজ্যে, বিশেষ করে এই রাজ্যের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে অকল্পনীয়ভাবে ভূস্বামীদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১৯৫০-৫১ সালের তথ্য অনুসারে নালগুন্ডা, মহাবুবনগর, ঔরাঙ্গল জেলার ৬০ থেকে ৭০ ভাগ আবাদী জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই তিনটি জেলার ভূস্বামীদের (পাট্টাদার Landlord) হাতে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে জায়গির প্রথার দৌলতে মাত্র ১১০ জনের মতো ভূস্বামী কৃষক প্রজাদের উপর বহুপ্রকার কর (taxes) বসিয়ে প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি টাকা আয় করত।

উপরে উল্লিখিত জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার তথ্য এবং বিপুল পরিমাণ কর আদায়ের বিবরণ থেকেই অতি সহজে অনুমান করা যায় নিজাম শাসিত এই সামন্ত রাজ্যে গরীব কৃষক প্রজাদের উপর কি ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত ছিল। অর্থনৈতিক শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য চলেছিল স্বৈরাচারী নির্যাতন ও অত্যাচার। সামন্ত-ভূস্বামীদের এই নির্যাতন অত্যাচার চালাবার প্রধান শক্তি ছিল পুলিশ এবং ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী। ব্রিটিশ আমলের ক্রমবর্ধমান সামন্ত-ভূস্বামীদের শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতন কার্যত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের পটভূমি রচনা করেছিল।

অন্ধ্রমহাসভা এবং আরও কয়েকটি সংগঠন

সামন্ত রাজ্য হায়দারাবাদে গরীব কৃষক এবং বনাঞ্চলের আদিবাসী গিরিজানদের উপর সামন্ত ভূস্বামীদের অত্যাচার ব্যাপক হবার পরিণতিতে এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধির ফলে হায়দারাবাদের প্রধান ৩টি অঞ্চলের [তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র এবং কানাড়া] সাধারণ মানুষ নিজস্ব সংগঠন গড়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে গড়ে ওঠে 'অন্ধ্র মহাসভা', মারাঠা ভাষি অঞ্চলে গড়ে ওঠে 'মহারাষ্ট্র পরিষদ', কানাড়া ভাষি অঞ্চলে গড়ে ওঠে 'কানাড়া পরিষদ'। এর মধ্যে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের 'অন্ধ্রমহাসভা'-ই ছিল উল্লেখযোগ্য সংগঠন। ১৯২৮ সলের মাধপট্টী হনুমন্ত রাও-এর নেতৃত্বে 'অন্ধ্র মহাসভা' গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৩০ সালে এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলনে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হযেছিল. সে কার্যক্রম কোন সংগ্রামের কার্যক্রম ছিল না। ঐ কার্যক্রম ছিল সংস্কারপন্থী কার্যক্রম। কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা, জমি সংক্রান্ত কিছু সুযোগ সুবিধা, কিছু নাগরিক অধিকার আদায় প্রভৃতি দাবি ছিল এই সংগঠনটির বিশেষ লক্ষ্য। কখনো 'অন্ধ্র মহাসভা' নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামী কর্মসূচি গ্রহণ করে নি। কিন্তু এই সংগঠনের প্রভাবে বহু বুদ্ধিজীবী এবং গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ সংগঠিত হয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী চেতনাসম্পন্ন ছাত্র এবং যুব কর্মীদের সমাবেশ ঘটার ফলে 'অন্ধ্র মহাসভার' সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। নিজামের অপশাসনের বিরুদ্ধে এই সংগঠনের নেতৃত্বে সংগ্রামের কর্মসূচিও গৃহীত হতে থাকে। কিন্তু 'অন্ধ্র মহাসভার' অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এই মতবিরোধের প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী চিন্তার অনুগামীদের সাথে সংগ্রামী চিন্তার অনুগামীদেব নিজাম বিরোধী সংগ্রামের কর্মসূচিতে সংঘাত। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালে ১১ তম অধিবেশনে 'অন্ধ্রমহাসভা' ভেঙে যায়। অন্ধ্রের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডির নেতৃত্বে 'অন্ধ্র মহাসভা'ব সংখ্যাগরিষ্ঠ সংগ্রামী অংশ সংগঠিত হয়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শেষ পর্যন্ত তেলেঙ্গানা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪৫ সালে 'অন্ধ্র মহাসভা'র খাম্মামে অনুষ্ঠিত হয় ১২দশ অধিবেশনে (যা ছিল এই সংগঠনের শেষ অধিবেশন)। এই সংগ্রামী অংশ তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জনসাধারণকে নিজামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল। 'অন্ধ্র মহাসভা'-কে কেন্দ্র করেই তেলেঙ্গানা সংগ্রামের ভিত্তিভূমি সূচিত হয়েছিল। শেষ পর্যায়ে সংগঠনে ভাঙন সত্ত্বেও তেলেঙ্গানার সংগ্রামের ইতিহাসে এই 'অন্ধ্র মহাসভা'র অবদান অনস্বীকার্য। শত শত জাতীয়তাবাদী যুবক এই সংগঠনে সংগঠিতভাবে কাজ করেছেন এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। বিভিন্ন মতের একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চরূপে 'অন্ধ্র মহাসভা' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলি সম্পর্কে (Native states) একটি নীতি গ্রহণ করেছিল। এই নীতি ছিল ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন সময়ে দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা (Non-interference policy)। তাই, দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গ এবং নবাবদের শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস ছিল নিরব। হায়দারাবাদ রাজ্যের নবাব নিজামের ক্ষেত্রেও এই নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু কংগ্রেসী নীতির কোন ব্যতিক্রম না ঘটলেও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অংশের অসংখ্য গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষ যোগদান করেছিলেন। বিশেষ করে ১৯৩০-৩২ সালের অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। এই সময় হায়দারাবাদ রাজ্যের, বিশেষ করে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের ছাত্র-যুবসমাজ থেকে শুরু করে জনগণের বিভিন্ন স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষ কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী অনেকেই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কারামুক্তির পর এঁদের অধিকাংশ 'অন্ধ্র মহাসভা'র মঞ্চে সামিল হন। 'অন্ধ্রে মহাসভা'কে এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়। তাই, দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ন্যাক্কারজনক হলেও, হায়দারাবাদ রাজ্যের ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানা সংগ্রামে কংগ্রেসের মঞ্চে সামিল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আসা মানুষদের অবদানও কোন অংশে কম নয়।

অন্ধ্রে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অন্ধ্রপ্রদেশে সরকারিভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন প্রথম গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই ১৯৩৪ সালেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার অন্ধ্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। শ্রমিকদের গ্রামে ও শহরে সংগঠিত করে তাঁদের নিজস্ব সংগ্রামী ঘাঁটি তৈরি করে। ["The Communists, while working in the Congress Organisation, conducted agitation on the demands of agricultural labour and poor peasants in the village and the working class in towns and could build up their independent base among them, to a considerable extent."].[২]

অন্ধ্রের কমিউনিস্টরা অন্ধ্রপ্রদেশের গরীব মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সামাজিক ইস্যুতে বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে চল্লিশের দশক থেকেই গণআন্দোলন সংগঠনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। ছাত্র সমাজের বিভিন্ন দাবিও কমিউনিস্টরা উত্থাপন করেছিল। পঠন-পাঠনের জন্য সাদা কাগজ সরবরাহ, ন্যায্যমূল্যে কেরোসিন তৈল সরবরাহ, প্রতিটি শিক্ষায়তনে বিশ্রামাগার স্থাপন প্রভৃতি দাবিতে ছাত্র সমাজকেও গণ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করার প্রয়াসে এই সময় কমিউনিস্টদের অগ্রগতি ছিল অব্যাহত। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন সারা ভারত কৃষক সভার ১৯৪৪ সালের অন্ধ্রের বেজোয়াদাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রায় একলক্ষ কৃষকের সমাবেশ হয়েছিল। পরের বৎসর তেনালীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলনের প্রকাশ্য সম্মেলনে পঞ্চাশ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

এইভাবে কমিউনিস্টদের অগ্রগতি ঘটতে থাকলে এই প্রদেশের কংগ্রেসী নেতৃত্ব আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্ধ্রের সেই সময়কার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডক্টর পট্টভী সীতারামাইরা এবং এন জি রঙ্গার নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং বিভিন্নস্থানে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আক্রান্ত হয়। কমিউনিস্টদের উপরে চলে দৈহিক আক্রমণও।

কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের উপর কংগ্রেসীদের পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিরোধে এইসময় কমিউনিস্টদেরও প্রস্তুতি নিয়ে হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'পিপলস ভলান্টিয়ার ব্রিগেড' [People's Volunteer Brigade - PVB]। এই PVB কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রেহের সাংগঠনিক বীজ রোপনে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে এবং কমিউনিস্টদের বিপ্লবী শক্তিও সংহত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার অন্ধ্র প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন ঘোষণা করেছিল। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব প্রার্থী ছিল ৩৫ জন। নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থীরা আড়াই লক্ষের মত ভোট পেয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী স্থান ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলেই অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গুন্টুর এবং কৃষ্ণা জেলায় কমিউনিস্টরা প্রদত্ত ভোটের ৩৫ এবং ২৫ শতাংশ ভোট পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সেই সময় ভোটাধিকার ছিল সীমিত, মাত্র ১৩ শতাংশ মানুষের ভোটাধিকার ছিল।

তাই অন্ধ্রপ্রদেশের বিরাট সংখ্যক গরীব মেহনতী মানুষ আইনসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের প্রাপ্ত আড়াই লক্ষ ভোট থেকেই প্রমাণিত হয়েছিল কমিউনিস্টরা অন্ধ্রের জনগণের মধ্যে তাঁদের সংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির এই শক্তিবৃদ্ধির প্রকাশ ঘটে অন্ধ্রের বিভিন্ন স্থানে শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট এবং কৃষি মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে। মুনাগালা (Munagala) এবং চল্লাপল্লী (challapalli)-র কৃষকরা জমিদারের জমি দখল আন্দোলনে এই সময়ে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করে। তামাক শিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ধর্মঘট হয় বস্ত্রশিল্পে এবং প্রদেশব্যাপী প্রায় ২০,০০০ পৌর শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট সামিল হন। কৃষি মজুর এবং শিল্প শ্রমিকদের এইসব সংগ্রাম ও ধর্মঘট পরবর্তী সময়ের তেলেঙ্গানা সংগ্রামের পটভূমিকে সুসংহত ও প্রসারিত করতে সহায়ক ছিল।

শুধু কৃষক-শ্রমিক নয়। যুব-ছাত্র সমাজকেও কমিউনিস্টরা গণসংগ্রামের পরিধির মধ্যে সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে যুব সমাজকে সংগঠিত করে অন্ধ্রে এক নয়া সংস্কৃতি আন্দোলনের (New Culture Movement) সূত্রপাত ঘটায় কমিউনিস্ট পার্টি। হাজার হাজার মানুষ এই নয়া সংস্কৃতি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। 'প্রজাশক্তি প্রকাশন' [Prajasakti Publishing House] বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে মার্কসবাদী শিক্ষায় জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ১৯৪৫-৪৬ সালে, অর্থাৎ তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরুর প্রাক্কালে অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির এবং তার পরিচালিত গণ সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[৩]

কমিউনিস্ট পার্টি = 20,000 জন [প্রায় ২,০০০ গ্রামে এই সভ্যরা ছড়িয়ে ছিলেন]

অন্ধ্র প্রদেশ কৃষকসভা = ১,৭৫,০০০ জন

অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি মজুর ইউনিয়ন= ৬০,০০০ জন

অন্ধ্রপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশন= ১২,০০০ জন

অন্ধ্রপ্রদেশ যুব ফেডারেশন= ৫০,০০০ জন

অন্ধ্রপ্রদেশ মহিলা সভা = ২০,০০০ জন

অন্ধ্র প্রদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস = ৩০,০০০ জন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় ২ বৎসর পূর্বে ১৯৪৫-৪৬ সালের উপরিউক্ত শক্তি নিয়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্র প্রদেশ কমিটি তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম সংগঠনে অগ্রসর হয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২ বৎসর আগেই মূলত তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ছিল নিজামের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্ধ্র মহাসভা যুক্তভাবে এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করে।

তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের প্রতিরোধ সংগ্রামই ১৯৪৮ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। [তেলেঙ্গানার কৃষকদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের নামকরণ (Title) সম্পর্কে ইতিহাস সচেতন মানুষের মধ্যে বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। অনেকের মতে এই সংগ্রাম সশস্ত্র

কৃষক সংগ্রাম (Armed peasants struggle); আবার কারো মতে সশস্ত্র বিপ্লব (Armed Revolution); অন্যদের মতে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ (Armed peasant's revolt)। এই পুস্তকে সর্বত্রই তেলেঙ্গানার এই ঐতিহাসিক সংগ্রামকে 'তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। —লেখক]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ২য় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ২য় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল— "তেলেঙ্গনার পথ আমাদের পথ" ["The Telcngana way is our way."]।[৪] পার্টি কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পর পার্টির অন্ধ্রপ্রদেশ সম্পাদক মন্ডলীর ১৯৪৮ সালের মে মাসে গৃহীত দলিলে বলা হলো— "আমাদের বিপ্লব অনেক বিষয়েই চিরায়ত সোভিয়েত বিপ্লব থেকে পৃথক, কিন্তু আমাদের বিপ্লব চীনের বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিপ্লবের পটভূমি অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের মুক্তি অর্জনে সাধারণ ধর্মঘট এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের হতে পারে না, এটা হবে গণতান্ত্রিক মোর্চার দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য কৃষি বিপ্লবের স্তরে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও গৃহযুদ্ধ।" ["Our revolution in many respects differs from the classical Russian Revolution, but to a great extent is similar to that of the Chinese Revolution. The perspective likely is not that of general strike and armed uprising, leading to the liberation of the rural side, but of a dogged resistance and prolonged civil war in the form of agrarian revolution, culminating in the capture of political power by the Democratic Front."][৫]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ২য় পার্টি কংগ্রেসে এবং অন্ধ্ররাজ্য শাখার এই ধরণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই ছিল তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শগত অনুপ্রেরণা।

জাতীয় কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের যুক্ত আন্দোলন

তেলেঙ্গানা সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাসে ভারতীয় রাজনীতির একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংযুক্ত রয়েছে। তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন যখন ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের দিকে মোড় নিচ্ছিল, সে সময় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একই সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনে সামিল হয়ে তেলেঙ্গানা তথা 'হায়দারাবাদ রাজ্যের' গণ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রখ্যাত নেতা কমরেড পি সুন্দরাইয়ার [১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভাঙনের পর নতুন পার্টি সি পি আই (এম) এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন।] নিজের লেখায়— "চলতো যুক্ত সভা বিক্ষোভ এবং জাতীয় পতাকা ও রক্তপতাকা এক সঙ্গে উড়তো। কংগ্রেস যে কর্মসূচি গ্রহণ করতো, তাতে আমরা অংশ নিয়ে তাকে বিরাট গণ কার্যক্রমে পরিণত করতাম, অংশ গ্রহণ করাতাম হাজার হাজার মানুষকে।"[Joint meetings and demonstrations were held with the National and Red flags fluttering together. Whatever programme of the Congress chalked out, we made it a

huge mass affair, drawing thousands of people to participate in them"][৬]

কংগ্রেস এই যুক্ত আন্দোলনের সময়ে স্কুল-কলেজ, আদালত বয়কটের আহ্বান জানালে কমিউনিস্টরা তার সমর্থনে অসংখ্য ছাত্রকে কমিউনিস্টদের 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে' সামিল করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়েই কমিউনিস্টরা নিজাম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাবার জন্য অস্ত্র ক্রয় করতে বিজয়ওয়াদা শহরে তহবিল সংগ্রহ অভিযান চালায় এবং দু-তিন দিনের গণসংগ্রহে ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করে।

কিন্তু কংগ্রেস তেলেঙ্গানার এই ঐতিহাসিক গণ সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত আন্দোলনে সামিল হলেও তা ছিল সাময়িক। জাতীয় কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ছিল নিজাম শাসিত হায়দারাবাদ রাজ্যকে স্বাধীন ভারতের সাথে যুক্ত করা। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্যের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির কোন পার্থক্য ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিও নিজামের রাজ্যের অবলুপ্তি (dissolution) চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল, তা হলো— কমিউনিস্ট পার্টির মতে হায়দারাবাদ রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে তার বিভিন্ন ভাষাভাষি অঞ্চলকে ভারত ইউনিয়নের ভাষাভাষি অঞ্চলগুলির সাথে যুক্ত করে দিয়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করতে হবে। কংগ্রেসের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দাবিতে সকল মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনগুলি একই প্রবাহে ধাবিত হয়ে নিজাম বিরোধী এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হয়।

কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্ধ্র মহাসভার মিলিত প্রয়াসে হায়দারাবাদ রাজ্যে, বিশেষকরে এই রাজ্যের তেলেঙ্গানার নিজামের বিরুদ্ধে এক গণজাগরণ শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি এই গণজাগরণকে সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক বিদ্রোহে রুপান্তরিত করতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেস এই পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শুরু করে এবং যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সড়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি তার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস এবং অন্ধ্র রাজ্য 'মে-দলিল'-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়।

ভারত সরকার ও নবাব নিজাম

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পূর্ব থেকেই হায়দারাবাদ রাজ্যকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু নবাব নিজাম এই প্রচেষ্টায় সম্মত হতে চায়নি। এতদসত্ত্বেও ভারত ইউনিয়নের সাথে নবাব নিজাম একটি সমঝোতায় পৌছায়। সমঝোতা অনুসারে নবাব নিজামের সামন্ততান্ত্রিক সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধাই বজায় থাকে, এমনকি অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের সুযোগও দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই অবস্থা চলাকালীন সময়ে ভারত ইউনিয়নের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলতে শুরু করেন— কমিউনিস্টরা ইতিমধ্যে হায়দারাবাদ রাজ্যের ২টি জেলার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার করেছে, অন্য জেলাগুলিতেও প্রভাব বিস্তার করছে। তাই অবিলম্বে ভারত ইউনিয়নের সাথে নবাব নিজাম শাসিত হায়দারাবাদ রাজ্যের সংযুক্তি হওয়া দরকার এবং অবিলম্বে কমিউনিস্টদের দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠান উচিত। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই যুক্তিকে ভারতের তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী মেনে নেন এবং সেই মত ভারতীয়

সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপের কথা তিনি ঘোষণাও করেন। ১৯৪৮ সালের ঐ মধ্যবর্ত্তী সময়েই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দারাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করে। নবাব নিজাম ভারত ইউনিয়নের কাছে আত্ম-সমর্থন করেন। ভারত সরকার নবাব নিজামের রাজন্যভাতা সহ প্রায় সবরকম সুযোগ-সুবিধাই বজায় রাখে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী জেনারেল জে.এন.চৌধুরীর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে দমন করার জন্য প্রকৃতপক্ষে এক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দেয়। নালগুন্ডা, খাম্মাম, ঔরাঙ্গল জেলায় চলে ব্যাপক অত্যাচার। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বর্বর আক্রমণ চরমে ওঠে। যুদ্ধ চলতে থাকে সশস্ত্র কৃষক গেরিলা বাহিনীর সাথে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান ঘোষিত হবার পর ঐ দিনই ভারত সরকার নবাব নিজামকে রাজ প্রমুখের পদমর্যাদায় উন্নত করে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যে বর্বর অত্যাচার শুরু হয়েছিল তা ১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কৃষক বিদ্রোহীদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রবেশের পূর্বে নবাব নিজাম তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহকে দমন করার জন্য তার রাজকীয় বাহিনীকে নিয়োগ করেছিল। এই রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষক এবং সাধারণ মানুষ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছেন। সেই একইভাবে 'সশস্ত্র মিলিট্যান্ট স্কোয়াড', 'গেরিলা বাহিনী' এবং 'স্কোয়াড' তেরি করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা হয়েছিল। প্রায় ৩ বৎসর ধরে চলেছিল এই যুদ্ধ বা সংগ্রাম।

গ্রামাঞ্চল এবং বনাঞ্চল মিলে যেসব উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলিতে এই সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধ চলেছিল, তার কয়েকটি হল : নালগোন্ডা জেলার ইল্লামপেটে, গোদাববী বনাঞ্চল, মানুকোটা মালুগো অঞ্চল, জেনডাগাট্টু নরসম পার্টি তালুক, জানজেড্ডু ক্যাম্প, নেলাঞ্চা এবং কাবেরী (নরসেম পোট তালুক), কামারাম ক্যাম্প, মির্যালাপেন্টা মিলিটারী ক্যাম্প, গঙ্গারাম রোড, কেরিপল্লি ক্যাম্প, আল্লাপল্লী, ইলেন্দু কয়লাখনি অঞ্চল, শ্রীরামগিরি ক্যাম্প, খাম্মাম - পেল ভেঙ্গা অঞ্চল, ইব্রাহিম পত্তনম (বেগটু অঞ্চল), ডেভরকুন্ডা, অমরাবাদ অঞ্চল, বিক্রাবাদ অঞ্চল, করিমনগর, জানাগুন অঞ্চল প্রভৃতি। মনুকুট্টা, খাম্মাম মন্দিরা অঞ্চল, হুজুরনগর মির্জালাগুডেম অঞ্চল, ভুঙ্গির-ইব্রাহীম পট্টম অঞ্চলে কৃষক গেরিলারা এই সময়ের মধ্যে ৩২ জন ভূস্বামীকে হত্যা করেছিল। এই ভূস্বামীরা ছিল জনগণের কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং অত্যাচারী।

তেলেঙ্গানার ইতিহাসখ্যাত সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে নবাব নিজাম-এর রাজাকার বাহিনী এবং পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ৪,০০০ কমিউনিস্ট এবং সশস্ত্র কৃষক কর্মী খুন হয়েছিল। ১০,০০০ কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী এবং সংগ্রামী মানুষ ৩ থেকে ৪ বৎসর মেয়াদে জেলে বন্দি ছিলেন, ৫০,০০০ মানুষকে পুলিশ ও মিলিটারী ক্যাম্পে আটক করা হয়েছিল। নারীদের উপর অত্যাচার এবং অন্যান্য জুলুম, দমন-পীড়নের কাহিনী অবর্ণনীয়। এর থেকেই সহজে অনুমেয় তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ ছিল কতখানি ব্যাপক এবং মিলিট্যান্ট।

ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা

হায়দারাবাদ রাজ্যের ছাত্র-যুব সমাজ তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭-এর পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে, মোটামুটি ১৯৪৪ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, জঙ্গী স্কোয়াড (মিলিটারী স্কোয়াড), গেরিলা স্কোয়াড, সাংস্কৃতিক দল (কালচারেল ট্রুপ) এবং অসংখ্য স্তরের গ্রুপ ও স্কোয়াডে ছাত্র ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, অন্ধ্র মহাসভা যুক্তভাবে যখন স্কুল-কলেজ, আদালত বয়কটের কর্মসূচি নিয়েছিল, তখন ছাত্র এবং যুবসমাজ (শহর ও গ্রামাঞ্চলের) দলে দলে অংশ নিয়ে এই কর্মসূচিকে সফল করে।

১৯৫০ সালে ভারত সরকার নবাব নিজামকে রাজপ্রমুখের পদে উন্নত করলে, তার প্রতিবাদে তেলেঙ্গানার বিভিন্ন স্থানে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। কালো পতাকা নিয়ে ঔরাঙ্গলে ২,০০০ ছাত্র বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ করে এবং ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তার করে।

২৬শে জানুয়ারি (১৯৫০) করিমনগরে ৩ শতাধিক ছাত্র ধর্মঘট করে বিক্ষোভে সামিল হলে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। পুলিশ কর্তারা ছাত্রদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে ছাত্ররা পুলিশ কর্তাদের সমুচিত জবাব দেয়।

ঔরাঙ্গলে ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জের প্রতিবাদে ৩১শে জানুয়ারি (১৯৫০) হায়দারাবাদের ছাত্ররা বিক্ষোভ জানায়। এমনকি কচিগোড়া হাইস্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করে মিছিল বার করে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ জানায়।

এই সময়ে ছাত্র ধর্মঘট এবং মিছিলে খাম্মাম, ভনগীর, নালগোন্ডা, সূর্যপেট, জাগিত্যালা, সুলতানাবাদ, পেড্ডাপল্লী এবং পারখালা উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

ছাত্রদের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অনেক সাহসিকতার কাহিনি ছড়িয়ে আছে। কুমার আর্য নামে একজন ছাত্রকর্মীকে পুলিশ নির্যাতন করে তাঁর কাছ থেকে আন্দোলনকারীদের গোপন খবর আদায় করতে চেয়েছিল। এমনকি কুমার আর্যকে গুলি করে মারার ভয় দেখায়। কিন্তু কুমার আর্যের কাছ থেকে তাঁর বাবার নাম ও পদমর্যাদা ছাড়া পুলিশ কোন কথা আদায় করতে পারেনি।

হায়দারাবাদ রজ্যেব ছাত্ররা বন্দিমুক্তির দাবিতেও আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই উদ্দেশ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫০) হায়দারাবাদ শহরে ছাত্রদের উদ্যোগে ছাত্র-শ্রমিক এবং নাগরকিদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট, সোস্যালস্টিসহ প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এই সমাবেশে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ভাষণ দেন।

ছাত্ররা শুধু কৃষক আন্দোলনের সমর্থনেই নয়, ছাত্রসমাজের নিজেদেরও সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। 'নিখিল হায়দারাবাদ ছাত্র ইউনিয়ন' [All Hyderabad Student's Union (AHSU)] এই ধরনের ছাত্র আন্দোলনের ছিল প্রধান সংগঠক। নিখিল হায়দারাবাদ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ৭ই মার্চ থেকে ২০ই মার্চ পর্যন্ত ওমেনস কলেজের ছাত্রীরা নিজেদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে লাগাতার ধর্মঘট চালায়। তখনকার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ছাত্রীদের লাগাতার ধর্মঘট একটি ঐতিহাসিক নজির।

নিজাম শাসিত হায়দারাবাদ রাজ্যে তেলেঙ্গানার ঐতিগাসিক সংগ্রামের সময় যে ছাত্র

আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার মূল চালিকাশক্তি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র কর্মীরা। তাছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত যুব কর্মীরা প্রধানত গেরিলা এবং মিলিটারী স্কোয়াডের কাজকর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যুব কর্মীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে। সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মাধ্যমে, অর্থাৎ গণসঙ্গীত, নাটক, সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা হত। গ্রাম কমিটি, ভিলেজ স্কোয়াড, গেরিলা স্কোয়াডগুলি বিভিন্ন গ্রামীণ সমস্যার উপরে জনসভা সমাবেশ, ডাকত এবং ঐসব জনসভা ও সমাবেশে সাংস্কৃতিক কর্মীদল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করত। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— বুড়া কথা (Bura Katha), মেষপালকের গান— গোজলাসুডোলু [Gojlasuddulu (shepher's sing song)], ভুয্যালা পাতা [Vuyyalapata (cradila songs)] বা দোলনার গান, কুলতাপুপতা (Kolta pupata) অর্থাৎ নৃত্যের সাথে একধরনের সঙ্গীত এবং ভজন গান (Bhajan)। যুব কর্মীরা ছিল এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অগ্রণী।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই অনুমেয়, তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে হায়াদারাবাদ রাজ্যের ছাত্র-যুব সমাজ এবং সক্রিয় ছাত্র-যুব কর্মীরা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তা ভারতের পরবর্তী সংগ্রামী ছাত্র-যুব আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে।

কমিউনিস্ট পার্টিতে মতবিরোধ

নিজামের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তার রাইফেল সঙ্গীন, অস্ত্র ঘুরালো কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে নস্যাৎ করে দেওয়া। এবার নিজামশাসিত হায়দারাবাদ রাজ্যের শাসক হল জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত 'বুর্জোয়া জমিদার সরকার'। অর্থাৎ কংগ্রেস পরিচালিত সরকার এবং তার সৈন্যবাহিনী দায়িত্ব নিল সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম দমনের। তাই, সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের গতিমুখও ঘুরে গেল নিজামশাহীর পরিবর্তে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। সামন্ততান্ত্রিক শাসন এবং সামন্ত ভূ-স্বামীদের শোষণ-অত্যাচার অবসানের জন্য যে সশস্ত্র সংগ্রামের শুরু, সে সশস্ত্র সংগ্রাম হায়দারাবাদ রাজ্যকে সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপের দ্বারা ভারতমুক্তি করানোর পর এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখিন হল।

এই নতুন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মতান্তর দেখা দেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের গৃহীত রণনীতি এবং রণকৌশল অনুসারে তৎকালীন পার্টি নেতৃত্ব তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে 'বুর্জোয়া জমিদার' সরকারের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে প্রকৃতঅর্থে স্বাধীনতা হিসাবে গ্রহণ করেনি। তাই কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিতে ভারতের অর্জিত স্বাধীনতা ছিল— 'এই আজাদী ঝুটা হ্যায়'। অর্থাৎ অর্জিত 'স্বাধীনতা' স্বাধীনতা নয়। এইজন্যই কংগ্রেস পরিচালিত 'বুর্জোয়া-জমিদার' সরকারের উচ্ছেদ সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা করতে হবে— এই অভিমত ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রধান অংশ ক্ষমতা দখলের একটি মডেল হিসাবে খাড়া করেন। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসাবে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম শুধু নয়,

যুক্তি হিসাবে আরও বিবেচ্য ছিল কেরল রাজ্যের ভায়লার-পুন্নাপ্পা সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম এবং পশ্চিম বাংলার ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের। পটভূমির এই ধরনের মূল্যায়ণ কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলকে প্রভাবিত করল, পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে সেই বিখ্যাত শ্লোগান উঠলো— 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ণ এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হায়দারাবাদ রাজ্যে হস্তক্ষেপের পর পার্টির অন্ধ্ররাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। রবিনারায়ণ রেড্ডির নেতৃত্বে পার্টির একাংশ একটি দলিল তৈরি করে। এই দলিলের মৌল বিষয়বস্তু ছিল— ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম (Partisan Armed Resistance) প্রত্যাহার করা হোক। রবিনারায়ণ রেড্ডির দলিলের অনুগামীদের যুক্তি ছিল[১]: ধনী কৃষক এবং উদারনৈতিক ভূস্বামীসহ জনসাধারণের এক বিরাট অংশ, যাঁরা নবাব নিজামের আমলে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিল, তাঁরা আর এখন হায়দারাবাদ রাজ্যের ভারতভুক্তির পর সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করবে না। বরং এই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারণ করবে জনসধারণ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে অত্যাচারী হিসেবে না দেখে মুক্তিদাতা হিসেবে দেখবে; সারা ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু না হলে, তেলেঙ্গানার মতো একটি ক্ষুদ্র এলাকার সশস্ত্র সংগ্রাম নিজেকে বেশিদিন লাগাতারভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে না এবং ভারত জুড়ে এই ধরনের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের সম্ভাবনাও কম;[২] পার্টির সশস্ত্র স্কোয়াডগুলির হাতে খুব সামান্য অস্ত্র আছে, কার্যত স্কোয়াডগুলি নিরস্ত্র, এই স্কোয়াডগুলির পক্ষে ভালভাবে সশস্ত্র বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করা অসম্ভব।

কিন্তু 'বিশাল অন্ধ্র কমিউনিস্ট কমিটি' রবিনারায়ণ রেড্ডির দলিলের ব্যক্ত মতের বিরোধী ছিল। এই কমিটির মতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা উচিত। যাঁরা এই ধরনের মতের প্রবক্তা তাঁদের যুক্তি ছিল— তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামের সাফল্য ব্যাপক, প্রায় দশলক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি ভূস্বামীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হয়েছে, এই বিরাট সাফল্যকে এবং অধিকারকে শ্রেণিশত্রুদের হাতে বিনা প্রতিরোধে বা বিনা সংগ্রামে প্রতার্পণ করা যায় না;[৩] আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতি সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সপক্ষে অনুকূল, কংগ্রেস পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার সরকারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম হল সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের প্রারম্ভ; ভারতীয় বিপ্লবের নৈকট্য যে চিরায়ত সোভিয়েত বিপ্লবের চেয়ে চীন বিপ্লবের সাথে বেশি, তা তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম প্রমাণ করেছে এবং পার্টির অন্ধ্ররাজ্য সম্পাদকমন্ডলির ১৯৪৮-এর মে-দলিলে বিদ্ধৃত;[৪] মে দলিলে দেখান হয়েছে সর্বহারাদের সহযোগী হিসাবে ধনীকৃষক, মাঝারী বুর্জোয়াদের সাথে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কিভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হবে এবং এই বৃহত্তর সশস্ত্র ফ্রন্ট পরিচালনার নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে গ্রহণ করবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি সেদিকেই দ্রুত এগুচ্ছে, এই অনুকূল পরিস্থিতিতে শুরু হবে তেলেঙ্গানার মত এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ঘোষণার প্রাকলগ্নে এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে তীব্র বিতর্ক এবং মতপার্থক্য ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যাঁরা সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম

প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল—এঁরা প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভবিষ্যৎ সংসদীয় পথের অনুসারী। অপরপক্ষে যাঁরা সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার পক্ষে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল—এঁরা অতি বিপ্লবী হটকারী। এই ধরনের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। গেরিলা স্কোয়াড, স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াড, ভিলেজ স্কোয়াড, প্রতিরোধ স্কোয়াডগুলি বিভ্রান্ত হতে থাকে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নির্মম প্রতিশোধাত্মক আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত হতে থাকে।

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র মতবিরোধ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তদানিন্তন মুখপত্র ''ফর এ লাস্টিং পিস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রাসি''-এর ১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারি সংখ্যায় ''ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশসমুহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল অগ্রগতি'' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারতের তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে পরোক্ষে ইঙ্গিত করে ভারতের কমিউনিস্টদের কি করণীয় কর্তব্য, তা বলা হয়েছিল :

> ''চীন ও অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে জরুরী প্রয়োজনীয় কৃষি সংস্কার সাধনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত কৃষকের সাথে শ্রমিকশ্রেণির মৈত্রী দৃঢ় করা এবং মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার সাধারণ সংগ্রামের ভিত্তিতে অত্যাচারী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত নৃপতিদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় আগ্রহী সকল শ্রেণী, দল, গোষ্ঠী ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা।''

'ফর এ লাস্টিং পিস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রাসি'-তে যখন নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা কমরেড স্ট্যালিন। অনেক ঐতিহাসিক ভাষ্যকারের মতে কমরেড স্ট্যালিনের নির্দেশে উপরে উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়েছিল এবং যার মর্মার্থ হল— তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ প্রত্যাহারের নির্দেশ।

এর পরবর্তী ঘটনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (CPSU) নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতীয় এবং তেলেঙ্গানা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মস্কোতে যায়। সি.পি.এস.ইউ-এর একটি কমিশনের সাথে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দলটি খুবই স্বল্প সময়ের জন্য কমরেড স্ট্যালিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং কমরেড স্ট্যালিনের নির্দেশ শোনেন।

সি.পি.এস.ইউ-এর কমিশন এবং কমরেড স্ট্যালিনের মত ছিল— হায়দারাবাদ রাজ্যের ভারতভুক্তির পর এই ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদী ভুল (Sectarian and incorrect)। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম কর্ণধার কমরেড পি. সুন্দরাইয়া তাঁর লিখিত পুস্তকে উক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৭]

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপত্রের নির্দেশ, সি পি.এস.ইউ-এর কমিশন এবং কমরেড স্ট্যালিনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তেলেঙ্গনার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ প্রত্যাহার (withdraw) করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৫১

সালের ২১শে অক্টোবর প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় এবং বেতারে তা সম্প্রচারিত হয়।

১৯৪৪ সালে সামন্ত রাজ্য হায়দারাবাদের তেলেঙ্গানার কৃষক-সাধারণ মানুষ সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রতিরোধাত্মক সংগ্রাম (Armed partisan struggle) শুরু করেছিল এবং ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত (প্রায় ৩ বৎসর) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে যে ঐতিহাসিক সশস্ত্র সংগ্রাম মোট ৭ বৎসরের উপর চালিয়েছিল— তার অবসান ঘটল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তক্রমে। শেষ হল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গৌরবের উজ্জ্বল অধ্যায় ।

আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, সহস্র সহস্র বিদ্রোহী বিপ্লবী শহিদের রক্ত, হাজার হাজার মানুষের নির্যাতন সহ্যের কঠোর সহিষ্ণুতার অসংখ্য ছোট-বড় কাহিনী নিয়ে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। তাই, সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন মোড়ে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি ও গাঁথাগুলি এবং গোটা সংগ্রামের সামগ্রিকতা (Limtation) ছড়িয়ে এক অতীত সংগ্রামের গরিমায় উজ্জীবত হয়ে ওঠে। ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনের ইতিহাসে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের 'অতীত সংগ্রামী গরিমা' তাই এতো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্র-যুব সমাজের কাছে ইতিহাসগত শিক্ষার বিষয়।

প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষ :

"আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিমন্ডলির সুযোগ হয়েছিল সি.পি.এস.ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে এবং কমরেড স্ট্যালিনের সাথে আলোচনার। এই আলোচনার মূল বিষয় ছিল তেলেঙ্গানা প্রসঙ্গ। যে কৃষক সংগ্রাম প্রধানত কিছু আংশিক অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে শুরু হয়ে শেষ পর্যায়ে হায়দারাবাদ রাজ্যের নিজামের শাসনের অবসানের জন্য সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল— সেই তেলেঙ্গানার সশস্ত্র প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরোধ সংগ্রামকে সি.পি.এস.ইউ-এর কমিশন তারিফ করেছিল। এই সংগ্রামে তেলেঙ্গানার কৃষক এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল এক গৌরবের বিষয়।"

"কিন্তু, ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নিজামের শাসনের অবসান এবং হায়দারাবাদ রাজ্যের ভারতভুক্তির পর এই সংগ্রামকে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অর্থ হল সংকীর্ণতাবাদ ও ভুল। শ্রেণিভুক্তগুলির পারস্পরিক বিন্যাস এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনই এই ধরনের পক্ষে অনুকূল নয়।"

তথ্যসূত্র :

১। Telengana People's Struggle And its Lessons— P.Sundarayya, পৃষ্ঠা ৯।
২। ঐ পুস্তক; পৃষ্ঠা ১৩৯-৪০; Chapter V. The Communist Movement In Andhra : Terror Regime - 1948-51.
৩। ঐ; পৃষ্ঠা ১৪৫।
৪। ঐ পুস্তক; Chapter XI. Withdrawal of Telengana Armed Partisan Resistance : পৃষ্ঠা ৩৯৪।

৫। ঐ পুস্তক; ঐ Chapter : পৃষ্ঠা ৩৯৩।
৬। ঐ পুস্তক; Chapter III. Armed Resistant Movement Against Nizam and Razzakars : পৃষ্ঠা ৫৬।
৭। ঐ পুস্তক; Chapter XI, Withdrawal of Telangana Armed Partisan Resistance : পৃষ্ঠা ৪১৪-১৫।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের ছাত্র আন্দোলন

স্বাধীনতার আনন্দ আছে, কিন্তু পাশাপাশি থাকল দাঙ্গা। খণ্ডিত স্বাধীনতার শুরুতেই কিন্তু দেশের জনশক্তি ইতিহাসের নব অধ্যায় রচনার কাজে মূহ্যমান হৃতবীর্য। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টর স্বাধীনতার এই স্ববিরোধিতার চরিত্র আজও খণ্ডিত ভারতে মানুষকে ভাবাচ্ছে। ঐতিহাসিকরা আজও গুরুগম্ভীর আলোচনায় মত্ত-- দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ কি অবশ্যম্ভাবী ছিল! না কি এটা এড়ানো যেত, এর জন্য কে কতটা দায়ী। ইংরাজরা শেষ পর্যন্ত কেন ভারত ছাড়ল, কংগ্রেস কেন দেশ বিভাগ মেনে নিল— এইসব প্রশ্নের প্রভাব থেকে ছাত্ররা মুক্ত নয়। তাই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রভাব দেখতে পাব। বিশেষ করে তরুণ ছাত্র সমাজ স্বভাবতই আবেগপ্রবণ এবং দেশের বৃহত্তর ভবিষ্যত বর্ত্তমান যেখানে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় বা তার জন্য জনশক্তির মধ্যে টানা পোড়েন চলে, তার দ্বারা ছাত্র সমাজ প্রভাবিত হবেই।

আমাদের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী বক্তব্য ও ব্যাখ্যা খুবই সরল। তাদের মতে, আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ইংরাজরা স্বইচ্ছায় আমাদের স্বশাসিত হবার উপযুক্ত করে তোলায় যে দায়িত্ব নিয়েছিল, তারই সঙ্গত পরিণতি দেশ বিভাগ। ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিবাদ ও বৈরিতা আর সেই সঙ্গে কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, সেই প্রশ্নে কংগ্রেস লীগ কোন মতেই ঐক্যমতে পৌছতে না পারার এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ সম্পর্কে ইংরাজ সরকারের করণীয় কিছু ছিল না। যদিও এই সরল ব্যাখ্যা অবশ্যই ঐতিহাসিক ও গ্রহণযোগ্য নয়।

বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের বিচারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫, ৪৬-৪৭-এর ক্রমবর্দ্ধমান গণজাগরণে ভীত বুর্জুয়া প্রতিনিধি ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে আর জাতি তার মূল্য দিয়েছে দেশ বিভাগ স্বীকার করে নিয়ে। এই সরলীকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন।

কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাদের নীতি কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িক ভেদকে বাড়তে সাহায্য করেছে। খিলাফৎ আন্দোলনের মত ইসলামিক মৌলবাদী আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা কতখানি যুক্তি সঙ্গত হয়েছিল, ঐ প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষে কতখানি কার্যকরী হয়েছিল, না অলক্ষ্যে মুসলিম মৌলবাদের বিষবৃক্ষের মূলে বারি সিঞ্চনের কাজটি করেছিল, প্রশ্নটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

কংগ্রেসে নেতৃত্বের মানসিকতা ও রাজনৈতিক অবস্থান অবশ্য দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার 'তরী হতে তীর' পুস্তকে যে বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের কাছে তার বেশিটাই

যথার্থ মনে হওয়ায়, তুলে দিয়ে অনেক কথা লেখার দায় থেকে অব্যাহতি নিলাম— "জাতীয় নেতৃত্বে জওহরলাল তখন অগ্রণী, কিন্তু অন্তবর্তী সরকারের মুখপাত্র হয়ে তার ভূমিকা তখন বদলে গেছে, শান্ত চিত্তে খণ্ডিত স্বাধীনতাতেই তুষ্ট হতে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ভারতবর্ষে যে Soft State প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় Gunner Myrdal-এর মত পর্যবেক্ষকের বিবেচনায় এদেশের জট-পাকানো হাজার সমস্যার সমাধান আজও হল না, সেই 'Soft State'-এর প্রারম্ভে তখন দেখলাম, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কালোবাজারী আর চোরাকারবারীদের সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ নেহরু লেখেন, তাদের পাকরাও করে ল্যাম্পপোস্টে লটকে দেওয়া হবে—আজও এই শাসানি এদেশে হাসির খোরাক হয়ে রয়েছে। বিহারে দাঙ্গার সময় নেহরু ধমক দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি চলতে থাকলে অপরাধীদের শায়েস্তা করা হবে চূড়ান্তভাবে, দরকার হলে বোমা মারা হবে—আজও সাম্প্রাদায়িক অপরাধে লিপ্ত দুর্বৃত্তদের শাস্তি বিধান সম্ভব হয়নি, বোমা না হয় নাই ব্যবহার করা হল। মহাত্মা গান্ধী তখন ক্রমশ বুঝেছিলেন, তার অবসর নেওয়ার সময় এসেছে। উপাসনা সভা মারফৎ নৈতিক প্রভাব অবশ্য ছিল। দেশবাসীর চিত্তে তার আসন ছিল অটল। কিন্তু দেশ বিভাগে সম্মত হতে না পেরে তাঁর এল এক অদ্ভুত মানসিক সংকট, যা থেকে নিস্তার পেলেন না, সাম্প্রদায়িক হিন্দু আততায়ীর হাতে নিধন এল যেন মুক্তির মতো। তখনকার কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরল প্রতিভামণ্ডিত মানুষটি দ্রুত পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে সংগতি খুঁজে পাচ্ছেন না। দেশ বিভাগে সম্মত নন একেবারে। কিন্তু সেই দুর্ঘটনা নিবারণে প্রকৃত বিচক্ষণ প্রচেষ্টার অভাবে মর্মাহত। লৌহমানব বলে বর্ণিত সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কড়া হাতে দেশ শাসনের শিক্ষানবিশিতে তখন মগ্ন। অপর নেতাদের চেয়ে তার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। দেশ ভাগ হলে অতিরিক্ত মনোবেদনার কোন কারণ তিনি দেখেননি, বরং ভাবতেন জগৎ জুড়ে আগুয়ান বামপন্থীদের আওতা থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে দেশবিভাগেরও হয়ত প্রয়োজন। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তার নীতি ছিল স্পষ্ট। হুকুম দিলেন, খাস সরকারি সূত্র থেকেই জেনেছিলাম-- যে, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে সব কমিউনিস্টদের সরিয়ে রাখতে হবে। '৪১-'৪৬ সাল বহু রেডিও বক্তৃতার পর আবিষ্কার করতে হলো যে বেতারের দরজা আমাদের কাছে বন্ধ। মজা লাগল সম্প্রতি প্রকাশিত তার চিঠিপত্র দেখে যে, এন. এস. জোশীর মতো মানুষ সম্পর্কেও তার কমিউনিস্ট সন্দেহ জানিয়ে বলেছেন যে, কমিউনিস্টরা অনেক কাজের লোক হতে পারে কিন্তু সোনার ছুরি হলেও সেটা তো ছুরি।"

(Sardar Patel's Correspondence Vol III ed Durga Das)

দিল্লি-সিমলা-লণ্ডনে জওহরলাল এবং জিন্নাকে নিয়ে বড়লাট মাউন্টব্যাটন 'বাহাদুরী কা খেল' দেখালেন বিলাতের পার্লামেন্টে স্ট্যাফর্ড ক্রিপসের ঘোষণা (মার্চ ১৯৪৬)— যে বিপুল সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে ভারতবর্ষকে খাস দখলে রাখা আর সম্ভব নয়। তাই অন্য পথ নেই, ক্ষমতা হস্তান্তর (ভারত ও পাকিস্থানের হাতে) হল একমাত্র সমীচীন ব্যবস্থা। স্বয়ং গান্ধীজী সেদিনের পরিস্থিতিতে 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন যে, 'ফরাসী, কিম্বা সোভিয়েট, এমন কি ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবের মতো কাণ্ড ঘটিয়ে রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয় করার কথা যারা ভাবে তারা খোলাখুলি এবং সৎভাবে সে কাজ তো আরম্ভ করতে পারেনি।"

(তরী থেকে তীর, পৃঃ ৪২৩, ৪২৪) *

এই পরোক্ষ অভিযোগে যে কমিউনিস্টরাই প্রধানত অভিযুক্ত। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে জন্ম নিল খণ্ডিত এক Soft State— যার দারিদ্র, বেকারী, অশিক্ষা, পশ্চাৎপদ কৃষি শিল্প তো

ছিলই; সঙ্গে যুক্ত হল উদ্বাস্তুর প্রবাহ। সেই যুদ্ধের অবদান হিসাবে দেশের ধনবানদের সীমাহীন মুনাফার লোভ, আর আপাদমস্তক দুর্নীতি। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পূর্বে যারা কি জাতীয় স্তরে, কি ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব করছিল, স্বাধীনতার পরে কিছুদিন পর্যন্ত তারাই নেতৃত্বে থাকায় একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে।

জুলিও কুরী

১৯৫০ সালের শেষদিকে বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা, বিশ্ববরেণ্য ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জুলিও কুরী ও তার পত্নী আইরিন কুরী ভারতে আসেন। উল্লেখ্য যে আইরিন কুরী বিখ্যাত মাদাম ও পিয়েরী কুরীর কন্যা। আবার জুলিও এবং আইরিন উভয়েই আইরিনের মাতা-পিতার মত পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

জুলিও কুরী দম্পতিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন সিনেট হলে (বর্তমানে যেখানে সিনেট হল ভেঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবন প্রতিষ্ঠিত) ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি থাকায় অধিকাংশ ছাত্রনেতা উপস্থিত হতে না পারলেও যে সব ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার এড়িয়ে প্রকাশ্যে কাজ করছিলেন তাদের পরিচালনায় তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। সিনেট হল সেদিন ছাত্রদের উপস্থিতিতে উপচে পড়েছিল।

অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক কুরী বলেন যে একজন বৈজ্ঞানিক কখনই সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্যমুক্ত হতে পারে না। কারণ, তিনি বলেন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন যারা মনে করেন তাঁদের দায়িত্ব বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা। তাঁর জন্য তাঁর প্রাপ্য যশ, মান, অর্থ পেলেই তাঁরা তৃপ্ত। গবেষণার লব্ধ ফল কিভাবে ব্যবহৃত হবে, তার দায়িত্ব তাঁদের নয়। সেটি ঠিক করবেন রাষ্ট্রনায়করা। অধ্যাপক জুলিও কুরী এই দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, একজন সমাজ সচেতন প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব হল তাঁর আবিষ্কার কিভাবে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন থাকা। যদি তার আবিষ্কার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই গবেষণা না করার অধিকার ও দায়িত্ব ঐ বৈজ্ঞানিকের উপর বর্তায়। এই মন্তব্য তিনি করেন হিরোসিমা নাগাসাকিতে মার্কিনীদের বর্বর আণবিক বোমার আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ পরমাণু বিভাজনের প্রাথমিক কার্যটি করেছিলেন এই কুরী দম্পতি। যেমন রেডিয়াম আবিষ্কারের কাজটি করেছিলেন এদেরই পূর্বসূরী পিয়েরী ও মাদাম কুরী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ফরাসী দেশে নাৎসী অধিকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার অন্যতম নায়ক ছিলেন। তিনি যে কেবল ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন তাই নয়, ফ্রান্স নাৎসী কবলিত হলে, ফ্রান্সে নাৎসী দখলদারী বাহিনী ও নাৎসী তাঁবেদার পেঁত্যা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। তিনি এই দায়িত্বপালন করেন, প্রথমে গেরিলা বাহিনী ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের বিস্ফোরক তৈরির গোপন কেন্দ্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে।

তারপর দায়িত্ব নিয়েছেন যাতে নাৎসীদের হাতে না পড়ে তার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ

ভারী জল, যা পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহৃত হয়— সেই ভারী জল গোপনে ইংলিশ চ্যানেল পার করে ফ্রান্সের পরবর্তী ক্যালে বন্দর থেকে ইংল্যাণ্ডের ডোভার বন্দরে পৌঁছে দেবার কাজ।

তারপর দায়িত্ব নিয়েছেন ফ্রান্সের নাৎসী বন্দি শিবির থেকে বন্দিদের পালাতে সাহায্য করার কাজের।

এই মহান মানব প্রেমিক সাম্যবাদী বৈজ্ঞানিকের কথা আজ আমাদের ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এইরকম আর একজন বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি অধ্যাপক জে. ডি. বার্নল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি ছিলেন মিত্র বাহিনীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। তাঁরই গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে ফ্রান্সের নরমাণ্ডি সাগরসৈকতে মহীসোপানের সাগর জলে যুদ্ধের ভারী ট্যাঙ্ক নামানো সম্ভব হয়। জুলিও কুরীর মৃত্যুর পর তিনি বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি হন। তিনি ভারতে আসেন দিল্লিতে শান্তি সংসদের অধিবেশনে। তখন চীন-ভারত সীমান্ত-যুদ্ধের ফলে এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি। সম্মেলনের স্থান দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে— বাইরে জনসংঘের উন্মত্ত বিক্ষোভ, ভিতরে নানা ধরনের মতপার্থক্য। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন-এর এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী ডঃ বার্নলকে ছাত্রদের পক্ষ থেকে সে ধরনের কোন অভ্যর্থনা জানানো সম্ভব হয়নি, যেমন সম্ভব হয়েছিল কুরী দম্পতির ক্ষেত্রে।

রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

১৯৫৭ সালে আমেরিকায় তৎকালীন সোভিয়েৎ রাশিয়াকে আণবিক অস্ত্র তৈরির গোপন বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করার মিথ্যা অভিযোগে, সোভিয়েৎ গুপ্তচর এই মিথ্যা অপবাদে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোজেনবার্গ দম্পতিকে এক বিচারের প্রহসন করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রোজেনবার্গ দম্পতির 'অপরাধ' তারা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার যুদ্ধবাজ নীতির তীব্র সমালোচনা ও সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন।

রোজেনবার্গ দম্পতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও তার ভিত্তিতে বিচারের প্রহসন শুরু হলে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও নানাভাবে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। দিল্লি, অমৃতসর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, কলকাতা, ত্রিবান্দম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন শহরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে। বিচার বন্ধ করে তাদের মুক্তির দাবি জানিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব ও দাবিপত্র প্রেরণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রোজেনবার্গ দম্পতিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে হত্যা করা হলে এখানকার ছাত্র সমাজ নানাভাবে বিক্ষোভ দেখায়। দিল্লি, কলকাতাসহ যেখানেই আমেরিকান দূতাবাস, কনসুলেট বা আমেরিকান তথ্যকেন্দ্র (Information Centre U.S.I.S.) অবস্থিত সেখানেই ছাত্ররা বিক্ষোভ জানিয়েছে। বিক্ষোভের অঙ্গ হিসেবে আমেরিকান রাষ্ট্রপতির কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। রোজেনবার্গ দম্পতিকে ২১শে জুলাই হত্যা করা হলে ওই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে লিখিত নাটক পশ্চিমবাংলা ও বাইরে তার হিন্দীরূপ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইসব আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল অবশ্যই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন। পশ্চিমবাংলা, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব-ছাত্র সম্মেলন

স্বাধীনতা লাভের পরের বছর ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাত্র-যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার এশিয় দেশ সহ ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে চীন, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করে এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়নের জন্য এশিয়া ব্যাপী ছাত্র-যুবদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দিলে সম্মেলনের অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র কংগ্রেস নেতা শ্রীঅরবিন্দ বসু তার অনুগামীদের নিয়ে সম্মেলন পরিত্যাগ করে চলে যান। এর পরের ঘটনা খুবই মারাত্মক ও দুঃখবহ। সম্মেলনের শেষে যখন শিয়ালদহ অঞ্চলে ডিক্সন্ লেনের একটি বাড়িতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাত্র-যুব সম্মেলনে আগত কয়েকজন প্রতিনিধিকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, তখন হঠাৎ কয়েকজন সশস্ত্র যুবক সহসা ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের উপর স্টেনগান থেকে গুলি চালালে তারা রক্ষা পেলেও রক্ষা পেলেন না গৃহস্বামী নিজে। এর পূর্বে এই ধরণের ঘটনা ছাত্র আন্দোলনে অজানা ছিল। অধুনা অবশ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা সারা দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

এই ১৯৪৮ সালেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ) ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্দাদার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কায়েদে আজম জিন্না পূর্ব-পাকিস্তান পরিদর্শনে এলে, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা হাতে কালো রুমাল বেধে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি তুলে বিক্ষোভ জানাল। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের উপর বর্বর দমননীতি চালাল। কিন্তু বলা যেতে পারে এই ভাষা আন্দোলনই বহু কষ্ট, ত্যাগ ও শহিদের রক্তস্নাত পথে পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৭২এ স্বাধীন বাংলার জন্ম দিল।

স্বাধীনতার পর পরই কংগ্রেস ঘোষণা করল ছাত্রদের আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। নেই কোন আন্দোলনের প্রয়োজন, এখন দেশগঠনের জন্য চাই লেখাপড়া। অতএব ছাত্র সংগঠনেরও আর কোন প্রয়োজন নেই। কংগ্রেস তাদের ছাত্র সংগঠন তখনকার মত ভেঙ্গে দিল। কিন্তু কংগ্রেসের এই মতের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন অবশ্যই একমত হতে পারল না। ছাত্র সংগঠন তুলে দেবার কোন প্রশ্নই ঘটল না। স্বাধীনতা-পূর্ব ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে এ যুব-ছাত্র আন্দোলনের কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য প্রথম থেকেই খুব প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত কোন ছাত্র সংগঠনেরই কোনও স্বাধীন সত্ত্বা থাকল না। এমনকি আর প্রভাবিতও বলা চলল না। পরিপূর্ণভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠনে পরিণত হল। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ছাড়া অন্য কোন সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে রইল না। কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলায় অবশ্য প্রাদেশিক স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দলই একটি করে ছাত্র সংগঠনের পত্তন করল। যেমন Foroword Block-এর ছাত্র ব্লক, R. S. P.-এর P. S. U (Progressive Students' Union), S. U. C.-র D. S. O., Socialist Party.-র

Students Association। ১৯৪৯-এ কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে আসা নেতারা যেমন প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখর প্রতিষ্ঠিত প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির Students Association। এমনকি কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় ছাত্র পরিষদ নাম দিয়ে ছাত্র সংগঠন সংগঠন খাড়া করে। এইসব সংগঠনের মধ্যে ছাত্র ব্লক, P. S. U., ছাত্র পরিষদ ছাড়া আর কোন সংগঠনের বিশেষ কোন প্রভাব ছাত্রদের মধ্যে ছিল না। ছাত্র ফেডারেশনই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পশ্চিমবাংলার সমস্ত College-এ তার প্রভাব ছিল। অন্যদের প্রভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দাবি-দাওয়ার আন্দোলনের প্রসারে ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নগুলির প্রভাব ও গুরুত্বের প্রসার। পশ্চিমবাংলার বাইরে কার্যত ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রদের নিজস্ব জীবনের যে দাবিই হোক বা সাংস্কৃতিক খেলাধূলার উন্নতির জন্য সব কিছুই ছাত্র ইউনিয়ন ভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি পশ্চিমবাংলার বাইরে ছাত্র ফেডারেশনকেও ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমেই কাজ করতে হয়েছে।

ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের বিরাট অংশ অরাজনৈতিক ও সংগঠনের বিমুখ হওয়ার প্রবণতা, সর্বোপরি রাজনীতি সম্পর্কে ছাত্রদের অনীহার বৃদ্ধি। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেকার মতাদর্শগত বিরোধ ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে মতাদর্শগত বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে এবং অবশেষে ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়।

সর্বোপরি এই সময় মুসলিম লীগ প্রভাবিত সম্প্রদায়িক ছাত্র লীগের অবলুপ্তি ঘটলেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সহ নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ছাত্র সংগঠনের ছাত্রদের উপর প্রভাব বৃদ্ধি ছাত্র আন্দোলনের সামনে বিরাট বিপদ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। যেমন জনসংঘের বিদ্যার্থী পরিষদ, তামিলনাড়ুতে D. M. K. পরিচালিত ছাত্র সংগঠনে, কেরলে Christian Students' Association, পাঞ্জাবে নিখিল ভারত শিখ ছাত্র ফেডারেশন, ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে আসামে অঃ ছাত্র ইউনিয়ন, বোড়ো ছাত্র ইউনিয়ন, কাছাড় ছাত্র ইউনিয়ন, নাগা, মিজো, খাসি সব গোষ্ঠীরই ছাত্র সংগঠন জন্ম নিয়েছে। এবং রাজ্য রাজনীতিতে এদের প্রভাব সন্দেহাতীত। এর সব কিছুই কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা, বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অক্ষমতা। সর্বোপরি Soft State হিসাবে জনসাধারণের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান না হওয়ারই ফলশ্রুতি। এই পটভূমিকাতেই ১৯৪৭-এর পর থেকে ছাত্র আন্দোলনে ও ছাত্র সংগঠনের ঘোরাফেরা।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি পূর্ববঙ্গের ছিলেন, তাছাড়া স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের কংগ্রেসে গান্ধীবাদী ও দক্ষিণপন্থী হিসাবেই তার পরিচয়। তবে তিনি সামান্য দিনই মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন। অবিভক্ত বাংলাদেশের কংগ্রেসের তৎকালীন পদাধীকারী কংগ্রেস নেতাদের একটা বড় অংশ পূর্ব বাংলার মানুষ যেমন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে 'সুধিকা' নামে তাঁরই পরিচিত। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, আরও অনেকে। বাংলা ভাগ হওয়ার পর কংগ্রেসের মধ্যে দাবি উঠল বর্তমান কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস, অতএব এর নেতারা হবে পশ্চিম বাংলার। এরই ফলে অল্প দিনের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীত্ব হাবালেন। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হারালেন মন্ত্রীত্ব, মুখ্যমন্ত্রী

হলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এল অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, হংসধ্বজ ধাড়া, কালীপদ মুখার্জী, দেবেন সেন প্রমুখ এপার বাংলার কংগ্রেসী নেতা বলে যাদের পরিচিতি।

স্বাধীনতার সময় সকলেই স্বাধীনতাকে স্বাগত জানালেও স্বল্পকালের মধ্যেই এ সম্পর্কে রাজনৈতিক মূল্যায়নে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। বিশেষভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতার চরিত্র ও রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন রাজনৈতিক আন্দোলনে যে পরিবর্তন আনল, তার প্রচণ্ড প্রভাব ছাত্র আন্দোলনের উপর পড়ল।

কমিউনিস্ট পার্টি আর দ্বিতীয় কংগ্রেসের যে তথাকথিত বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করবার প্রস্তুতি শুরু করেছিল, তার পরীক্ষা ছাত্র ফেডারেশনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে যায়। লক্ষণীয় অতীতেও জনযুদ্ধের রাজনৈতিক লাইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রয়োগের পূর্বে ছাত্রদের মধ্যেই প্রথম পরীক্ষা করা হয়।

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পূর্বে বোম্বাই-এ ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল সভার শেষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা ও বোম্বাই-এর ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাবিত ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়। ফলে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী পুলিশের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসে আহত হয়। কলকাতায় ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের কাছে বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিধানসভায় উপস্থিত হলে পুলিশ ছাত্র শোভাযাত্রা বিধানসভায় প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে চলে যেতে আদেশ জারি করলে, ছাত্ররা ঐ আদেশ অমান্য করে বিধানসভায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। পুলিশ লাঠি, কাঁদানে গ্যাস চালিয়ে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে না পারলে গুলি চালায়। কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। পরদিন ছাত্ররা তুমুল বিক্ষোভ জানায়।

কংগ্রেস মনে করে, স্বাধীনতার পর লেখাপড়া করা ছাড়া অন্য দেশের সমস্যা, রাজনীতি নিয়ে ছাত্রদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তাই তারা তাদের ছাত্র সংগঠন তখনকার মত তুলে দিল, যদিও ঘোষণা করে নয়। এর ফলে দেশের কিছু কিছু অঞ্চল বাদ দিলে প্রায় অন্য সর্বত্র ছাত্র আন্দোলনে সাময়িক ভাঁটা লক্ষ্য করা গেল। এর মধ্যে ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির চক্রান্তে বিনায়ক গডসে, গোপাল গডসে প্রমুখের হাতে দিল্লিতে প্রার্থনা সভার মধ্যেই গান্ধীজী নিহত হলেন।

গান্ধীজীর এই নৃশংস হত্যার কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত শোকাঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার পাশাপাশি পরদিন সর্বশ্রেণির মানুষ ক্রোধে, প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। সারা ভারতে সর্বত্র আবার একবার দলমত নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাদের স্কুল-কলেজের গণ্ডী ছেড়ে রাস্তায় এসে জমায়েত হল— ভারত ইতিহাসের এই অনন্য মহৎ ব্যক্তিত্বের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এই জঘন্য কাজকে ধিক্কার জানাতে।

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি এক তথাকথিত বিপ্লবী লাইন গ্রহণ করল। এই তথাকথিত সংগ্রামী লাইনের মূলতত্ত্ব দু-এককথায় উল্লেখ না করলে এই বিপ্লবীপনার দাপট ও ফল কিভাবে ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল বোঝা যাবে না।

'৪৮ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেস গৃহীত থিসিসে বলা হল যে, ইংরাজদের সঙ্গে সমঝোতার ফলে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই স্বাধীনতা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি কংগ্রেস পার্টির জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফল। তাই এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। তাই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। যার লক্ষ্য হবে ভারতের বৃটিশ সামাজ্যবাদপুষ্ট বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণির বিরুদ্ধে, আর উদ্দেশ্য হবে ভারতে জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুঘটন। এই লক্ষ্যের সাফল্যের জন্য গ্রামাঞ্চলে হবে কৃষকদের মুক্তিযুদ্ধ আর শহরে হবে শ্রমিকশ্রেণির অভুত্থান, যার সহযোগী হিসাবে ছাত্র, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ নেবে।

এই রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে সমস্ত রকম আন্দোলন সহ ছাত্র আন্দোলনকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি এই নতুন লাইনের জন্য পশ্চিমবাংলায় সম্পূর্ণ এবং কার্যত সারা ভারতবর্ষেই বে-আইনি ঘোষিত হল। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষেও আর আইনিভাবে কাজ করা সম্ভব না হওয়ার, তৎকালীন ছাত্রনেতারা আত্মগোপন করে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সৎপাল ডাং, সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, নাগপুরের এ. বি. বর্ধন, পাঞ্জাবের বলরাজ মেহেতা, উত্তরপ্রদেশের রাম আদ্রে, পশ্চিমবাংলার গীতা মুখোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ইতিমধ্যে 'দি স্টুডেন্ট পত্রিকা'র সম্পাদক সুনীল মুন্সী, বিদ্যা কানুন, বিমলা চাকায়া, সুশীলা ম্যাডিবেন, কমলাপতি রায়, ভবানী রায়চৌধুরী প্রমুখ ছাত্র নেতারা শ্রমিক আন্দোলনে চলে গেলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অরুণ বসু ছিলেন ছাত্র আন্দোলন পরিচালনাব দায়িত্বে। পশ্চিমবাংলা সহ নানা রাজ্যে যারা সামনে থেকে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বে ছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশের মুলতান নিয়াজী, অন্ধ্রে, থিম্মা রেড্ডি, তলাপত রাও, হায়দ্রাবাদের নরসিং রাও, বিহারের চন্দ্রপ্রকাশ, কিষেণচন্দ্র, গণেশ বিদ্যার্থী, পশ্চিমবাংলার সুখেন্দু মজুমদার, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ হাজরা, কমল চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার গুপ্ত। মেডিক্যাল ছাত্রদের নেতা হারাধন সন্ন্যাসী, নৃপেন সেন, কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এদের অনেকেই পরে গ্রেপ্তার হয়ে গেলে যাদের হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তারা হলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, জগৎপতি রায়, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, শঙ্কর রায়, বীরেশ্বর ঘোষ, বীরেন দাসগুপ্ত প্রমুখদের উপর।

লক্ষ্যণীয়, ১৯৪৮ সালের অনুসৃত পার্টি লাইন প্রধানত পশ্চিমবাংলাতেই ছাত্রদের মধ্যে কার্যকরী করার সব থেকে বেশি চেষ্টা হয়েছিল। বেশ কিছু ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কৃষক বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির এই অতিবাম বিপ্লবী লাইনের ফলে নানা ধরণের মর্মান্তিক ঘটনা ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটেছে, তার সবটুকু উল্লেখ সম্ভব নয়, বোধ হয় সমীচীনও নয়। তবে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ এসে পড়বেই, উপায় নেই। ছাত্র আন্দোলনকে 'শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে' বিপ্লবী লাইনে সংগঠিত করার জন্য ছাত্র ফ্রন্টের আত্ম সমালোচনা ("Self criticism of the student front")— এই শিরোনামায় একটি দলিল পার্টির তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়। এই দলিলে বলা হল — ছাত্র আন্দোলনে কিভাবে তার নেতারা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের মধ্যেই শ্রমিকবিরোধী শ্রেণিচরিত্র প্রকট। আর ছাত্র ঐক্যের একমাত্র মঞ্চ হল ছাত্র ফেডারেশন।

এই তথাকথিত আত্মসমালোচনার হাস্যকর পরিণতি হল, ছোট-বড়-মাঝারি সব ধরনের নেতাদের ধরে ধরে কার মধ্যে কি কি, কতখানি শ্রমিক নেতৃত্ব বিরোধী শ্রেণি চরিত্র বর্ত্তমান ও কিভাবে তার প্রতিফলন, কার মধ্যে কত বেশি শ্রমিক বিরোধী মানসিকতার প্রকোপ প্রমাণ করার জন্য যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি মজার মজার আত্মদর্শন। একজন তখনকার বিশিষ্ট ছাত্রী নেত্রী এখন খুবই বড় নেত্রী, তিনি তার আত্মসমালোচনায় লিখলেন— তার মধ্যে শ্রমিক বিরোধী মানসিকতা কতখানি প্রকট ও অকমিউনিস্ট সুলভ যে "আমি প্রায়ই বলে থাকি যে আমি মারা গেলে আমার মৃতদেহ শ্রমিকশ্রেণির লালপতাকায় আবৃত না করে স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি লেখা ছাত্র ফেডারেশনের পতাকায় যেন আবৃত করা হয়।" ১৯৪৮ থেকে ৫২-র প্রথম পর্যন্ত ভারতের ছাত্র আন্দোলনে পশ্চিমবাংলা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল, সেকথা নিঃসন্দেহ স্বীকার করতে হবে। পশ্চিম বাংলার কথাতেই আগে আসা যাক। তার পূর্বে আর একটি প্রশ্ন ও ঘটনার কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কংগ্রেস সরকার আর কোন ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন নিঃপ্রয়োজন ঘোষণা করলেও নানা জায়গায় নানা দাবিতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সামিল হচ্ছিল। বিশেষ করে অন্য কোন কার্যকরী ছাত্র সংগঠন না থাকায় ছাত্রদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে কোন আন্দোলনের জন্য ইউনিয়নকে ব্যবহার করছে, ব্যবহার করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আরও গণতন্ত্রীকরণ ও ক্ষমতা দাবি করেছে। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলা, আসাম, অন্ধ্র, কেরল, পাঞ্জাব, বিহারের মত স্থানে ছাত্ররা ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি সমর্থনশীল হওয়ায় সরকার বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিল। সেই সঙ্গে এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোবিয়েত রাশিয়ার জয়লাভ, চীনের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি, ভিয়েতনামের সংগ্রামের ফলে বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগমনের যুগ চলছিল। ছাত্ররাও এই প্রভাবের বাইরে নয়, বরং তরুণ মন স্বাভাবিকভাবেই সাম্য, মৈত্রী, শান্তির স্বপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকর্ষিত হবে সেটা ছিল তখনকার বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থাকে আটকাবার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের পক্ষ থেকে ছাত্রদের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ও দৈহিক উন্নতির জন্য নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একটি নুতন ধরনের সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা পেশ করা হল। তারা প্রস্তাব করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্র ইউনিয়নগুলি নিয়ে একটি জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত করা হবে। এই সংগঠনের সঙ্গে রাজনীতি বা কোন রাজনৈতিক দলের কোন সংশ্রব থাকবে না। অর্থাৎ এটি হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি ছাত্র সংগঠন। সর্বোপরি এই সংগঠনের কর্মকর্তা ছাত্ররা নির্বাচিত করবে না। এর সমস্ত কর্মকর্তাই হবে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনোনীত। এই N.U.S সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়নের মনোনিত সভাপতি ডঃ শেলাটকে। সঙ্গত কারণেই ছাত্র ফেডারেশন এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে "জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন না ছাত্র ধর্মঘট ভাঙ্গার দালাল" শিরোনামায় একটি ইংরাজি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ করেন তৎকালীন ছাত্র নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়। ১০ হাজার কপি ঐ পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রায় সমস্ত পুস্তিকাই অবিক্রীত থাকে। এটি '৫০ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। ছাত্র ফেডারেশনের অতি বিপ্লবী কার্যকলাপে ইতিমধ্যে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করছে না। এই পুস্তিকাটি বিক্রয় করা নিয়ে বেশ মজার ব্যাপার ঘটে। ছাত্র নেতাদের একটি সভায় এই পুস্তিকাটির

বিক্রয়-রিপোর্ট চাওয়া হলে একে একে সবাই জানাল যে ছাত্ররা পুস্তিকাটি সম্পর্কে মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কেউ পুস্তিকাটি কিনছে না। একজন মাত্র বলল, তার কাছ থেকে একটি ছাত্র নিজেই স্ব-ইচ্ছায় আগ্রহ দেখিয়ে একখানা পুস্তক ক্রয় করেছে। এই রিপোর্ট শোনামাত্র পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলির সভ্য ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বে থাকা কমরেড বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন— এই কর্মীটির Report হচ্ছে আসল। কারণ, ছাত্রদের মধ্যে এটাই Growing Trend, ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, আর অন্যদের Report প্রমাণ করে ঐ ছাত্র কমরেডরা নিজেরা বিপ্লববিমুখ ভিরু সংস্কারবাদী। (Reformist কথাটা খুব চালু ছিল। যেমন '৬০-এর দশকের শেষ থেকে চালু হয়েছিল "সংশোধনবাদী Revistionist" কথাটি, অবশ্য এইগুলি গালাগাল হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।) এই ধরনের অবিবেচক সঙ্কীর্ণ মনোভাব ছাত্র ফেডারেশনের কাজকর্মকে '৫০-'৫২ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে।

দেশ ভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমদিকে পাঞ্জাবে, পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলা, আসামে আসতে থাকে। পাঞ্জাবের পশ্চিম ও পূর্বের হিন্দু মুসলমান শিখের সামগ্রিক অপসারণের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিল্লির কংগ্রেস সরকার যে মানবিক ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, পশ্চিমবাংলায় তা ঘটল না। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্বাস্তুদের কোন দায়িত্ব নিতেই সরকার যেন বেশি অপারগ। কার্যত বাস্তবক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের পুণর্বাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থায় সেই অমানবিক অনিচ্ছুক মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছিল।

এর মধ্যে '৪৮ সালে ভারত উপমহাদেশের উভয় অংশেই আবার ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হলে পূর্ব-পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু আসার সংখ্যা বেড়ে গেল। '৪৯-এর ১১ই জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উদ্বাস্তুরা তাদের দাবি জানাতে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের উপর লাঠি, টিয়ার গ্যাস যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে অমানুষিক অত্যাচার করে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ১২ জানুয়ারি ধর্মঘট করে উদ্বাস্তুদের দাবির সমর্থন ও তাদের উপর পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাল। উদ্বাস্তুরাও তখন মরীয়া হয়ে বাঁচার তাগিদে কলকাতার রাজপথে লড়াই শুরু করেছে। প্রতিদিন কলকাতার রাস্তায় ঘটেছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। ১৮ই জানুয়ারি ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘটের পর ছাত্র-ফেডারেশনের ডাকে কয়েক হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় লনে জমায়েত হল। সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্র শোভাযাত্রা রাস্তায় বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ লাঠি-গুলি চালালে ছাত্ররাও ইট পাটকেল বোমা দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। সরকারি ট্রাম-বাস জ্বালিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড করে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। এই সমাবেশে পুলিশের গুলিতে ৪ জন ছাত্র সহ ৬ জনের মৃত্যু হয়। এর পূর্বে দিল্লীতে উদ্বাস্তুরা মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাতে গেলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হয়। কলকাতা ও দিল্লির ঘটনার প্রতিবাদেই ছাত্র ধর্মঘট ও সভা শোভাযাত্রা। পরের দিন মর্গে ঐ মৃত ছাত্রদের দেহের দাবি জানালে মেডিক্যাল কলেজের মধ্যেই ছাত্রদের উপর গুলি চলল। এই ঘটনায় ৫ জন নিহত হল, অগণিত ছাত্র আহত হল কাঁধে বুলেট বিদ্ধ হল। এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্রনেতা শ্রী দিলীপ বসুর নাম উল্লেখ করতে হয়। ১৮ই জানুয়ারি ও তার পরদিন যখন পুলিশের গুলিতে বহু ছাত্রকর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়, তখন তাদের জন্য রক্তের দরকার হলে, সে কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ছাত্র Medical College Blood Bank-এ রক্ত দিল, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। তবে অতি বামপন্থী কার্যকলাপ অবস্থাটা ধীরে ধীরে পাল্টে দিয়েছিল। ৪ দিন কলকাতার রাস্তায়

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন তখনকার মত থামল। উদ্বাস্তুদের আংশিক লাভ হলেও বড় কোন জয় হয় নি। উদ্বাস্তুরা সমস্যা সমাধানের পথে অনেকখানি সাফল্য নিয়ে আনতে পেরেছে, যখন বে-আইনি বিপ্লবী আন্দোলনের তাৎক্ষনিক কার্যক্রম পরিত্যাগ করে আইনি আন্দোলনের সংগঠন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (U. C. R. C) গঠন করে উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন তখন তারা উদ্বাস্তুদের পুণর্বাসনের জন্য সত্যসত্যই কিছু সাফল্য অর্জন করছে পেরেছেন। এই উদ্বাস্তু আন্দোলনের যারা নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন, তারা হলেন — চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তী, বিপ্লবী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, আবদুল হালিম (ছোট হালিম সাহেব), অনিল সিংহ, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা দাসগুপ্ত (গুহঠাকুরতা) প্রমুখ।

যেসব ছাত্র নেতৃত্ব এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তারা হলেন নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ হাজরা, কমল চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু মজুমদার প্রমুখ। এর কিছু দিনের মধ্যেই এদের কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে যান। বলা দরকার তখন এই সমস্ত সংগ্রামের বা ছাত্রদের ধর্মঘট শোভাযাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিল পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধান। এই ঘটনার পর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি গোপন দলিলে বলা হল : আমাদের লক্ষ্য হবে রাস্তার এইসব লড়াইকে ক্রমশ ব্যারিকেড লড়াই-এ পরিণত করা। যার ফলে শহরে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যুত্থানের বাতাবরণ প্রস্তুত হয়। মূলত এই লক্ষ্য সামনে রেখেই পশ্চিমবাংলায় ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে।

উদ্বাস্তুদের সমর্থনে ছাত্রদের ব্যাপক জমায়েত, জঙ্গী আন্দোলন যেমন মূলত কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন পরিণত হয়েছিল; কংগ্রেস সরকারও ততোধিক অমানবিক দমননীতির আশ্রয় নিতে থাকে৷ নির্বিচারে Meeting মিছিলের উপর গুলি চালনার সমর্থনে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ''সব সময় যে কোন গোলমালের শুরুতেই একশজনের প্রাণ বাঁচানোর জন্য একজনকে মেরে ফেলা ভাল।'' একদিকে যে কোন আন্দোলনকে পুলিশী সংঘর্ষে পরিণত করার তত্ত্ব, অন্যদিকে যে কোন আন্দোলনকে গলাটিপে মারার জন্য বর্বর অত্যাচারের কংগ্রেসী নীতির মধ্যে পড়ে কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনে ব্যাপক ছাত্রদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না।

এই সময় ফেব্রুয়ারি মাসে শহিদ মিনারের (সে সময় অক্টোরলনী মনুমেন্ট বলেই ওটি পরিচিত ছিল) পাদদেশে স্কুল ছাত্রদের এক জমায়েত ডাকা হয়। এতে স্থির ছিল ঐখানে নামমাত্র সভা করে ছাত্রদের নিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে (তখনও বি.বা.দী. বাগ নামকরণ হয় নি) যেতে হবে এবং সেখানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। সভায় মোট হাজার দুই স্কুল ছাত্র জমা হয়েছিল। বড় বয়স্ক কলেজ ছাত্রদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য— জনা ২০-র মত এবং এরা সকলেই ছিল এতে এই জমায়েতের সংগঠক হিসাবেই। কিন্তু ঐ সমস্ত স্কুল ছাত্রদের ডালহৌসী স্কোয়ারে নিয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য করার পরিণতি ঐ সব ৮/১০ থেকে ১৪/১৫ বছরের শিশুদের পক্ষে মারাত্মক হত। তাই শোভাযাত্রাব প্রধান সংগঠকরা নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ হাজড়া, কমল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ডালহৌসী স্কোয়ারে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। যেদিকে ১৪৪ ধারা নেই সেইদিকে শোভাযাত্রা পরিচালনা করে খানিকটা দূরে যেয়েই শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করে সুবুদ্ধি ও মানবিকতার পরিচয় দিলেন। সেদিনকার মত একটা মারাত্মক অবস্থার পরিস্থিতি এড়ানো গেলেও রাতেরবেলো

আত্মগোপনকারী দুজন ছাত্র নেতা ও নেত্রীর উপস্থিতিতে সেদিনকার স্কুল ছাত্রদের জমায়েত ও প্রস্তাবিত শোভাযাত্রার ১৪৪ ধারা অমান্য করার কার্যক্রম কেন পরিত্যক্ত হল — তার কোন ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ তাদের মনঃপূত হল না। স্কুল ছাত্রদের শোভাযাত্রা নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধার এমন একটি বিপ্লবী কর্মসূচি কার্যকরী না করার জন্য ঐ সব সংগঠকদের তীব্র ভাষায় ভীরু ও বিপ্লব সম্পর্কে গভীর আস্থার অভাব বলে তাঁরা নিন্দিত হলেন। এমনকি ঐ দুজন নেতা ও নেত্রী একথাও বলেন যে— সংগঠকরা নিজেরা ঐ শোভাযাত্রা পরিচালনার অক্ষমতার সংবাদ তাদের গোপন ডেরায় পৌঁছে দিলে, তারা স্কুল ছাত্রদের শোভাযাত্রা নিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। আজ সেদিনের সেই কথা স্মরণ করে হাসির উদ্রেক হয়। মনে সেদিনকার বালখিল্যসুলভ মানসিকতার জন্য লজ্জা ও বিরক্তি অনুভব করলেও সেদিন সেই মুহূর্তে মনে হয়েছে, বিপ্লবের প্রতি সত্যই কি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা আর ঐ আত্মগোপনকারী নেতাদের বিপ্লবের প্রতি কি অবিচল নিষ্ঠা ও সাহস।

১৯৪৯-এর ৯ই মার্চ সারা ভারত রেল ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। ঐ রেল ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতি চলতে লাগল। ঐ দিন অর্থাৎ ৯ই মার্চ রেল ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। যারা রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন, তাদের আশা ছিল রেল ধর্মঘট সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট চূড়ান্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য করবে। ছাত্র ধর্মঘট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। ঐদিন রেল ধর্মঘটের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘটের যে ডাক দেওয়া হয়েছিল তাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। ছাত্র কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন স্কোয়াড তৈরি হয়েছিল যারা প্রয়োজনানুগভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে রেল ধর্মঘটকে সফল হতে সাহায্য করবে। আর কিছু স্কোয়ার্ড কলকাতা অঞ্চলে প্রচার ও সাধারণ ধর্মঘট পালনে ধর্মঘটিদের সাহায্য করবে। ধ্বংসাত্মকমূলক কাজের জন্য গঠিত ছাত্র স্কোয়াডের দায়িত্ব ছিল কমরেড সুকুমার গুপ্তের উপর (সম্প্রতি এক পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে।) ছাত্র স্কোয়াডকে গোপন কেন্দ্রের নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া ও এই নির্দেশ কার্যকরী করার কাজে সাহায্য দেবার দায়িত্বে ছিলেন তখনকার অন্যতম প্রাদেশিক ছাত্রনেতা সুখেন্দু মজুমদার। পরবর্তীকালে সুখেন্দু মজুমদার সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন ও দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সংঘে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কাজ করেছেন।

রেল ধর্মঘটে-এর সময়কার বহু ঘটনার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, কারণ ঘটনাটি খুবই ইঙ্গিতবহ।

প্রায় সারারাত জেগে পরদিন কিভাবে আমরা প্রয়োজন মত action করব তার শিক্ষা নিয়ে ভোররাতে বালিগঞ্জ ময়দান-এর মিলিটারি ক্যাম্প-এর একটি বাড়ি থেকে ঐ স্কোয়াড বউবাজারে একটি চশমার দোকানে উপস্থিতি দেবার জন্য রওনা হল। তখনও তাদের ধারণা ট্রাম চলবে না। কিন্তু ভোর চারটের সময় ট্রাম চলল, বাস-ও চলল, বাজার খুলল। শহর একেবারেই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজের Gate-এ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা ধর্মঘটের জন্য উপস্থিত হলে, এরা তাদের উপেক্ষা করেই ক্লাসে ঢুকল। কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা ধস্তাধস্তি হলেও বড় কিছু ঘটেনি, কারণ সরকার ঐ রেল ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য জরুরীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি নামানো হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও স্থির হল, রেল বন্ধ করার জন্য কিছু করা হবে। সারাদিন নানা জায়গায় নানা ধরনের action-এর জল্পনা

কল্পনা চলল। কিন্তু প্রচণ্ড পুলিশী পাহারার জন্য কিছু করা সম্ভব হল না। শেষকালে বৈকালবেলা সুকুমার গুপ্ত নির্দেশ দিলেন সন্ধ্যাবেলার দার্জিলিং মেলের উপর আক্রমণ চালিয়ে Train-খানি বেলেঘাটার কাছে লাইনচ্যুত করা হবে। সেইমত সিটি কলেজের ছাত্রনেতা অরুণ দাশগুপ্ত, মেডিকেল ছাত্র নুরুদ্দিন ও হীরেন দাশগুপ্তকে নিয়ে গঠিত এই ৩ জনের দলটিকে ঐ কাজে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধে disposal-র গ্রেনেড্, নিজেদের তৈরি মলটভ কক্‌টেল নিয়ে দলটিকে বেলেঘাটায় শ্রী সুখেন্দু মজুমদার পৌঁছে দিল। আরও নির্দেশ ছিল দার্জিলিং মেলের উপর আমাদের action-এর যাই ফলাফল হোক, রাত দশটায় কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটিতে উপস্থিত হবো। সেইমত কাজ হল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ গ্রেনেড কার্যকরী না হওয়ায় কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। চারিদিকে পুলিশ প্রহরা থাকা সত্ত্বেও দলটি নিরাপদে রাত ১০টায় কার্জন পার্কে পৌঁছে দেখল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মেডিকেল ছাত্রনেতা কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত এবং তার কাছ থেকেই জানা গেল আমাদের action-এ রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই Polit Bureau থেকে সমস্ত রকম action বন্ধ করার জন্য নির্দেশ আসে। সুকুমারবাবুর কাছেও সেই নির্দেশ যথাসময়ে পৌঁছলেও দলটিকে অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যে কাজে পাঠালেন তার থেকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টা না করে তিনি বাড়ি চলে গেলেন। অথচ যা অনায়াসে করা যেত, কারণ কোথায় কখন কিভাবে ঐ action করা হবে সবই তার জানা ছিল। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন, অন্যদের জীবন সম্পর্কে চরম উদাসীন ব্যক্তিরা নানা স্থানে নানা স্তরে ছোট বড় নেতায় পরিণত হওয়ায় বোধহয় আজকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হতে পারে।

এই সময় ছাত্র ফেডারেশন থেকে চলে যাওয়া অন্য রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্ররা এবং বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রভাবিত ছাত্ররা সর্বত্র ছাত্র ফেডারেশনের বিরোধীতা আরম্ভ করেছে। রেল ধর্মঘটের সময় এই বিরোধীতা বেশ প্রকট হয়।

৯ই আগস্ট ১৯৪৯, ঐ দিনটি অন্য সব ছাত্র সংগঠন 'ভারত ছাড়' দিন হিসাবে পালনের ডাক দিল। ছাত্র ফেডারেশন ভারত ছাড আন্দোলনের সঙ্গে ঝুটা অজাদী (ভুয়া স্বাধীনতা) দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিল। উভয়পক্ষই বিশ্ববিদ্যালয় লনে সমাবেশের ডাক দিলে লনের দুই অংশে দুটি সভা শুরু হল এবং সভায় অন্য কথার থেকে উভয়পক্ষই উপয়পক্ষকে তাদের বক্তৃতায় আক্রমণ শুরু করল। অচিরাৎ কথার লড়াই লাঠি, বোমার লড়াইয়ে পরিণতি হল। মারামারিতে বেশকিছু ছাত্র আহত হল। বিশেষভাবে আহত হয়েছিল আর. এস. পির ছাত্র নেতা বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, ফরওয়ার্ড ব্লকের ধীরেণ ভৌমিক প্রমুখ। ছাত্র ফেডারেশনের জমায়েত অনেক বড় থাকায় তাদের কেউ বিশেষ আহত হয়নি। উভয়পক্ষ উভয় পক্ষের পতাকা পুড়িয়ে, মারামারি অন্তে একদল লনের তখনকার সিনেট হলের পাশ দিয়ে পূর্ব দিকের গেট দিয়ে, অন্যদল সিনেটের পিছন দিকে উত্তর দিকের গেট দিয়ে দুটি ছাত্র শোভাযাত্রা নানা রকমের ধ্বনি দিতে দিতে রাস্তায় নামল। সব slogan ছাপিয়ে যেটি সব থেকে উচ্চগ্রামে বলা হচ্ছিল সেটা হল 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ' — আমাদের দেশে আমরা যত ঐক্য ভাঙ্গি তত বেশি ঐক্যের জিগির তুলি। আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসের বিশেষ বিয়োগান্ত কর্মকাণ্ডের দিক এটাই।

ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে দুটি আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য বিভাগে এম. কম. ক্লাস খোলার দাবি, অন্যটি তদানিন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পরীক্ষার ফল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ। ছাত্ররা এম. কম. ক্লাশ খোলার দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট করে। ২১ দিন ধর্মঘট চলার পর ছাত্রদের দাবি স্বীকৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যবিভাগে এম. কম. ক্লাশ খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে দুনীর্তির অভিযোগের তদন্তের জন্য কমিশন বসে। কিন্তু তার রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বিশ্বের দরবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা হানি হবে অজুহাতে চেপে দেওয়া হয়।

৫০-এর গোড়ায় কলকাতায় ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে ছাত্ররা নানাভাবে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। একটি কথা বলা দরকার, এইসব আন্দোলন কিন্তু জেলায় বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও তখন ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ্য ছিল সমস্ত আন্দোলনকে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করার। তাই এম. কম. খোলার দাবিরও পরিণতিতে আওয়াজ ওঠে 'কংগ্রেস সরকার গদি ছাড়।'

কিন্তু ছাত্রদের জীবন, ভবিষ্যৎ জীবিকা ও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। যেমন— শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ, রাজ্য বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় করা। শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান খরচার দায় থেকে ছাত্র ও তার অভিভাবকদের অব্যাহতি দেওয়া, নিঃশুল্ক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ছাত্র ভর্তি করার ক্ষেত্রে দুনীর্তি বন্ধের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্ত্রী আমলাদের ভর্তি কোটা প্রথার অবলুপ্তি, মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা, ছাত্র সংসদ গঠনের অধিকাব, তার গণতন্ত্রীকরণ, শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার, উপনিবেশিক প্রভাব মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্মত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সস্তা দরে পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা প্রভৃতি।এছাড়া কমনওয়েলথ থেকে ভারতের নাম প্রত্যাহার, বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন, এশিয়ার দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সৌহার্দ্যসূচক আন্দোলন ইত্যাদি — ১৯৪৮-৪৯ সালে নানা দাবিতে ১০ লক্ষ ছাত্র ধর্মঘট করেছে তার মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বাংলায় (দি স্টুডেন্ট)।

এইসব দাবির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে খুব বেশি না হলেও বেশ কিছু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। যেমন তেলেঙ্গানা কৃষক সংগ্রামে নিজাম শাহীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণির সমর্থন জ্ঞাপনের সঙ্গে ছাত্ররাও সমর্থন জানায় ও ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসের স্বীকার হয়। স্বাধীনতার পর বৎসর '৪৮-এর আগস্ট থেকে '৪৯ সালে ১৫ই আগস্টের মধ্যে তেলেঙ্গানার সমর্থনে আন্দোলনের উপর পুলিশ ৫০বার গুলি চালায়। ফলে বহু মানুষের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হল। অন্ধ্রে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ছিল, সেই সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের কাজকর্মের উপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। (The Student, 1948 Aug.)

এই সময় পৃথক রাজ্য হিসাবে অন্ধ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের একটা বিরাট অংশ ছিল হায়দ্রাবাদ নিজামশাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আর বাকি অংশ ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অংশ। বিশাল অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের দাবি এই সময় ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও ব্যাপক হতে শুরু করে। অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনে তেলেগু ভাষাভাষি অঞ্চলের ছাত্ররা ছাত্র ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রা মারফৎ এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি বারবার প্রদীপ্ত করেছে। ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্ররাজ্য গঠনের দাবি ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা লাভ করে দলমত নির্বিশেষে তেলেগু জনগণের

আন্দোলনে পরিণত হয়। পট্টভি রামালুর আমরণ অনশন ধর্মঘট ও তার মৃত্যুতে সমগ্র অন্ধ্র অঞ্চল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলে ছাত্ররা সেই আন্দোলনের পুরোভাগে পুলিশী অত্যাচার নির্যাতন উপেক্ষা করে দিনের পর দিন সাধারণ ধর্মঘট করে আন্দোলনকে আরও সজীব করেছে। অবশেষে '৫২ সালেই অন্ধ্রপ্রদেশে গঠনের দাবি স্বীকৃত হল। আর সেই সময় নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ হিসাবে হায়দ্রাবাদ অন্তর্ভুক্ত হলে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। অবশ্য ইতিমধ্যে এর মধ্যে একদিকে কোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকারি আদেশ বে-আইনী বলে ঘোষিত হওয়ায় পার্টি আইনী হল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞাও অপসারিত হল। এই সময় আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা, অন্য দিকে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিপ্লবী লাইন ভুল বলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ঘোষণা। এক কথায় বলা যেতে পারে এই সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাহু মুক্তি ঘটল। নবপর্যায়ে গণআন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতে লাগল।

'৫২ সালের পরবর্তী পর্যায় আসার পূর্বে ঐ সময়কার আন্দোলন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য উপস্থিত করা যেতে পারে। ১৯৪৯ সালের জুলাই সালে কলকাতায় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের উদাত্ত আহ্বান জানানো হল। এই সম্মেলনে সত্যপাল ডাংকে পুনরায় সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হল। সুশীলা মেডিরেন হলেন সভাপতি। এর পূর্বে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে কোন সভাপতির পদ ছিল না। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব ও আন্দোলনের রূপরেখা অনুযায়ী '৫২ সাল পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালিত করার চেষ্টা ছাত্র ফেডারেশন করেছে।

এই সময় পাঞ্জাবের অন্তর্গত পেপসুদেশীয় রাজ্যকে পাঞ্জাবের সঙ্গে সংযুক্তি করণের আন্দোলনে পেপসু ছাত্র ফেডারেশন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময় বাংলাদেশে L.M.F. ডিগ্রীর ৩ বছরের Medical Course পড়ান হত। এই Course কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ. বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ এবং অবিভক্ত বাংলার ঢাকায় পড়ান হত। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকার এই Course তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্ররা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালো। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে ছাত্র প্রতিনিধি দল দেখা করতে যায় ও তাকে বলে যে এই Course-এর ডাক্তার দীর্ঘকাল সাফল্য ও সুনামের সঙ্গে চিকিৎসা করে আসছে। গরীব ঘরের ছেলেরা এই Course-এর দৌলতে ডাক্তারী পড়তে পারে। এই কথার উত্তরে ডাঃ রায় বলেছিলেন, "গরীবের ছেলেদের ডাক্তারী পড়ার দরকার নেই, তাদের কম্পাউন্ডারী পড়তে বল গিয়ে।" এই উক্তি থেকেই আমরা অনায়াসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও কংগ্রেস সরকারের গরীব ঘরের ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে মনোভাব অনায়াসে বোঝাতে পারি।

এই সময়ই মাস্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে অকালী শিখরা সংগঠিত হতে থাকে এবং শিখদের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির সূত্রপাত করলে শিখ ছাত্রদের মধ্যে তার প্রভাব পড়তে থাকে।

১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, কেরল, উত্তরপ্রদেশে ও মাদ্রাজ

প্রেসিডেন্সির অন্ধ্র অঞ্চলে সরকারের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তারের পথে নানা ধরনের বাধানিষেধ, বিশেষ করে '৫০ সালের পশ্চিমবাংলা সরকার ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কিছু অগণতান্ত্রিক, শিক্ষা সংকোচনে সহায়ক কিছু বাধানিষেধ আরোপে সর্বত্র ছাত্র বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। পশ্চিমবাংলা সহ সর্বত্র বেতন বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি-র বিরুদ্ধে, শিক্ষা সংক্রান্ত বাধানিষেধের প্রতিবাদে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। এই সময় অগণিত ছাত্রছাত্রী কারাবন্দি হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় দমদম জেলের মধ্যে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজের তরুণ ছাত্র মুকুল চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সিতে সুমথ।

১৯৫২ সালে এল পরিবর্তিত অবস্থা। ১৯৪৮ সালে আরোপিত সংকীর্ণ রাজনীতি জোর করে চাপানোর বালসুলভ বিপ্লবী লাইন। এর হাত থেকে ছাত্র আন্দোলনও মুক্তি পেল না। নতুনভাবে এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য চেষ্টা শুরু হল। আন্দোলনের চেহারাও পাল্টাতে লাগল। ছাত্র ফেডারেশন আইনীভাবে কাজ শুরু করলে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবের ছাত্রনেতা ওমপ্রকাশ সারবওয়াল সংগঠনের কার্যকরী সম্পাদক হিসাবে কাজ চালাচ্ছিল। এর পূর্বে সেই সময়কার বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্র যুদ্ধের পর পুনঃস্থাপিত কমিনফর্ম থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত লাইন ভুল বলে ঘোষিত হলে ভারতে পার্টির মধ্যে বিরাট আলোড়ন শুরু হল। ছাত্র ফেডারেশনেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হল। দিল্লিতে সর্বভারতীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু বিশেষ কোন লাভ হল না। কেবলমাত্র পুরাতন নেতৃত্ব অপসারিত হল। বোম্বাই থেকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তর কলকাতায় প্রথমে ৩২ জি. ইলিয়ট রোডে, তারপর ১৮৬নং বহুবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হল।

হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে গ্রহণের জন্য মাদ্রাজে ওয়ার্কিং কমিটির বকলমে সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ছাত্র পার্টি সভ্যরা একটি Policy Statement অর্থাৎ কর্মসূচি রচনা করলেন।

হায়দ্রাবাদের সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচনা ও উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ হায়দ্রাবাদ সম্মেলনের পর সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ছাত্র আন্দোলনে অনেক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হল অন্ধ্রের ছাত্রনেতা এন আর দাশরী ও সভাপতিপদে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হরিশচন্দ্র। কর্মসূচিতে স্বীকার করা হল ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে ছাত্র ফেডারেশন ছাড়াও অন্য সমস্ত ছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে একই মঞ্চে আনতে হবে। ছাত্র ইউনিয়নগুলির গণতান্ত্রিকরণের আন্দোলন যেমন করতে হবে ঠিক তেমনি যেহেতু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ইউনিয়নের অপরিসীম গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে ও তাদের সাধারণ দাবিদাওয়া, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও উন্নতির জন্য এগুলির যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বসাহায্য (self help) আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হল। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা ও এশিয়া আফ্রিকার দেশসমূহের মুক্তি সংগ্রাম ও বিশ্বশান্তির সংগ্রামে ভারতীয় ছাত্র সমাজ যাতে তাদের ঐতিহ্যানুসারী যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য ছাত্র ফেডারেশন কাজ করবে।

পশ্চিমবাংলায় নবপর্যায়ে আন্দোলনের কথা বলতে গেলেই উল্লেখ করতে হবে '৫২ সালের স্কুল কোড বিরোধী আন্দোলনের। '৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হল এবং সমস্ত মাধ্যমিক স্কুল তার পরিচালনাধীন হল। এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক

স্কুলগুলিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত স্কুল হিসাবে পরিচালিত হত।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ স্কুল পরিচালনার জন্য একটি স্কুল কোড প্রস্তুত করল। এই কোড যেমন ছিল অগণতান্ত্রিক, তেমনি ছিল শিক্ষক সমাজের পক্ষে অসম্মানের। এই কোডের প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলায় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার ৬টি ছাত্র সংগঠন নিয়ে একটি কোড বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি যৌথ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হল। দক্ষিণ কলকাতায় কমিটি গঠিত হয় নাম হল 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি'। এই কমিটি দক্ষিণ কলকাতার প্রায় সমস্ত স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। আশুতোষ কলেজ হলে ছাত্র ইউনিয়নগুলির এই ঐক্যবদ্ধ কমিটির নেতৃত্বে বিশাল ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। ১৬ই জুন মাধ্যমিক বোর্ড অফিস লক্ষাধিক ছাত্র ঘেরাও করল এবং সেই দিনই বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐ কোড বাতিল ঘোষণায় বাধ্য হল।

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন

এরপর এল কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন। কলকাতার ট্রাম কোম্পানী ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া ১ পয়সা বাড়িয়ে বিদেশী কোম্পানীর বাৎসরিক আড়াই কোটি টাকা লাভের উপর বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকার বাড়তি মুনাফার ব্যবস্থা করলে কলকাতার জনতা ক্রোধে ফেটে গড়ে তুলল এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ। এখানেও ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হল তাদের বিভিন্ন সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ কমিটির নেতৃত্বে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে শুধু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে তাই নয়, তারা এই আন্দোলনের একটা বিশেষ স্তরে শীর্ষবিন্দু হিসাবে কাজ করেছে। ৪ঠা জুলাই ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলায় সফল হরতালের পর যখন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেমন যেন একটা শিথিলতা দেখা দিয়েছে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যখন নতুন পথ খুঁজছে, ছাত্ররা তখন কয়েকদিন লাগাতার স্কুলে-কলেজে ধর্মঘট চালিয়ে আন্দোলনে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল। হাজার হাজার ছাত্র মিশন রো-এ অবস্থিত ট্রাম কোম্পানীর কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এই ধরনের জোরালো বিক্ষোভ মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে গিয়ে দাবি তুলেছে 'ভাড়া কমাও না হয় ক্ষমতা ছাড়'। পুলিশ এই মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস চালালো। বহু ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হল। গ্রেপ্তার করা হল বহু ছাত্র নেতা ও কর্মীদের। এমনকি পুলিশের এই তাণ্ডবের হাত থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও নিস্তার পায়নি। আতঙ্কে পুলিশ পাগলের মত আচরণ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে পুলিশ কোন পরোয়া করেনি। কলেজে প্রবেশ করে যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই মেরেছে, আশুতোষ কলেজের মধ্যে পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হল প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র এসোসিয়েশনের নেতা পরিমল মুখার্জী। এমনকি কলেজের অধ্যক্ষ পুলিশের লাঠি পেটার হাত থেকে রেহাই পাননি। যাদবপুব রেলস্টেশনে অবস্থানরত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শোভাযাত্রার উপর পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালালে একজন শ্রমিক নিহত হলেন। ছাত্র ফেডারেশনের দুজন কিশোর কর্মীসহ বহু ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হল। (The Student seventeen days that shook Calcutta)

তথাপি ছাত্র জনতার পাশে পাশে থেকেছে এবং তাদের সঙ্গে একত্র এই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে ছাত্র আন্দোলনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত করল। এই আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমস্ত ছাত্র সংগঠনের যৌথ আন্দোলনেব পথকে আরও প্রশস্ত করেছিল। জনতার প্রতিরোধ সেদিন ট্রাম কোম্পানীর বিদেশী মালিক ১ পয়সা দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটা ট্রাইবুনালের মাধ্যমে স্থির হবে— এই সিদ্ধান্ত সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হল। বাধ্য হল ছাত্র বন্দি সহ সমস্ত গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিক কর্মচারী ও প্রতিরোধে সামিল মানুষকে মুক্তি দিতে। শহর থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নিয়ে সভা-সমিতি, মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞাও অপসারিত হল।

অন্যান্য রাজ্যের আন্দোলন

এই সময় '৫৩ সালেই নবগঠিত অন্ধ্ররাজ্যে ছাত্ররা বন্দিমুক্তির দাবিতে সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যার রূপ নিয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে '৫২-'৫৩ সালের মধ্যে সর্বত্র ছাত্র বেতন ২৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, পশ্চিমবাংলার ছাত্ররা এই বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ছাত্ররা লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়, গুন্টুরে ছাত্রদের উপর গুলি চললে ১ জন ছাত্র নিহত ও বহু ছাত্র আহত হন। অন্ধ্রে আর একটি আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে খুবই ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। সেটি হল Capitation fees, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষকরে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে গেলে একটা বড় অঙ্কের টাকা, ৫-১০ হাজার, কখনও আরও বেশি দিতে হত। অবশ্য এই ব্যবস্থা এখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চালু আছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করলেও কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় নি। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই ব্যবস্থার প্রভাব সামাজিকভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে পণ-প্রথা মারাত্মক এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। কেরলেও ফি বৃদ্ধি ও খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত স্কুল-কলেজে নানা ধরনের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকার বিরুদ্ধে ছাত্রবা আন্দোলন করেছে। কেরলে সমুদ্রের উপকুলবর্ত্তী বহু অঞ্চলেই ছাত্রদের লেগুন (Back-Water) পার হয়ে স্কুলে যেতে হয়। এই পারাবারে সুস্থ ও সুলভ ব্যবস্থার দাবিতে ছাত্রদের ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রা মারফৎ বেশ বড় ধরনের আন্দোলন করতে হয়েছে। কেরলেও Capitation fees-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দি-ভাষা বিরোধী আন্দোলন

এই সময় দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি দক্ষিণী রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এই অভিযোগে হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যাপকতা লাভ করে। এক্ষেত্রেও ছাত্ররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা ধর্মঘট, সভা-

শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ-মিছিল করেছে। মাঝেমাঝেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্ররা গ্রেপ্তার বরণ করেছে। লক্ষণীয় এই আন্দোলনের পিছনে প্রতিক্রিয়াশীল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বিরাটভাবে কাজ করেছে, বিশেষকরে তামিলনাড়ু রাজ্যে। D. M. K (দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগম)-এর নেতৃত্বে স্বতন্ত্র পবিত্র দ্রাবিড় স্থান গঠনের আন্দোলন জোড় কদমে চলেছে। দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগমের ছাত্র শাখাই সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে ছাত্রদের মধ্যে প্রধান শক্তি। তাদেরি দখলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ইউনিয়নগুলি। এদের প্রচারের কায়দাও ছিল অন্যরকম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষকরে রামায়ণকে কেন্দ্র করে, কিভাবে আর্যরা অন্যায়ভাবে অনার্য দক্ষিণ ভারত গ্রাস করেছে। তাদের জাতীয় বীর রাবণ, মেঘনাদকে ছলনার দ্বারা পরাজিত ও হত্যা করেছে। এই বিষয়কেই কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র দ্রাবিড় স্থানের দাবির প্রচার, হিন্দি বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে আন্নাদুরাই-এর নেতৃত্বে দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগম তামিলনাড়ুতে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগমের ছাত্র শাখার প্রকাশ্য কার্যকলাপের ভাঁটা পড়েছে।

Self-Help আন্দোলন

'৫২ সালের পর থেকে আন্দোলনে একটি নব-অধ্যায়ের সূচনা হয় Self-Help আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এমন নয় যে এর পূর্বে নিজের চেষ্টায় ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু তা ছিল খুবই সীমিত ও স্থানীয় ভিত্তিতে। কিন্তু '৫২ সালের পর থেকে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে। এই আন্দোলনের পথিকৃত হিসাবে ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকাই ছিল প্রথম ও প্রধান।

এই Self-Help আন্দোলনের মধ্যে ছিল কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বড় পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার (Text-Book Library), সস্তার ক্যান্টিন canteen (cheap canteen), ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গরীব ছাত্রদের আর্থিক ও বইপত্র দিয়ে সাহায্য, সমবায় ভিত্তিতে লেখাপড়া ও প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গসহ ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অল্প মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা। এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সফল প্রচেষ্টার প্রতীক কলকাতা ছাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Calcutta Student Health Home)। এ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া বোধ হয় বাহুল্য হবে না।

১৯৫১ সালের শেষের দিকে বা ১৯৫২ সালের গোড়ার কোন একটি সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনকেই তিনটি X-Ray যন্ত্র ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপহার দেয়। অবশ্য এই উপহার আসে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ছাত্র সংঘের (International Union of Students) অনুরোধ ও নির্দেশে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে হায়দ্রাবাদের অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে Self-Help আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত সম্বলিত প্রস্তাবানুযায়ী এরই একটি X-Ray যন্ত্র নিয়ে কলকাতায় ছাত্রদের জন্য একটি পরীক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই পরিপেক্ষিতে কলকাতার কয়েকজন সদ্য পাশ করা ও ছাত্র আন্দোলনে নেতৃস্থানীয়

ডাক্তার ছাত্র নেতা নিয়ে কমিটি গঠন করা হল হেলথ হোম গড়ে তোলার জন্য। প্রথম থেকেই স্থির হল যে, যেহেতু হেলথ হোম হবে একেবারেই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রের জন্য। তাই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন বা প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন প্রত্যক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। সমস্ত ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নগুলিই এই প্রতিষ্ঠন পরিচালনার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। তা যখনকার ছাত্র ইউনিয়ন, যে দল বা মতের ছাত্র ইউনিয়নের প্রভাবাধীন বা কর্তৃত্বাধীন থাকুক না কেন। ছাত্র ফেডারেশন সাহায্য করবে পরোক্ষভাবে, বিশেষকরে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে। হেলথ হোম সংগঠিতভাবে গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব যারা নিলেন তারা হলেন ডঃ অরুণ সেন, ডঃ মনোরঞ্জন রক্ষিত (কিছুদিন আগে বিলেতে প্রয়াত হয়েছেন), ডঃ কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুবীর দাসগুপ্ত, ডঃ মৃণাল পুরকায়স্থ প্রমুখ। এই কাজের জন্য সেই সময়কার বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও এগিয়ে আসেন। প্রথম যে কমিটি তৈরি হল তার সভাপতি হলেন বিখ্যাত ডঃ অমিয় কুমার বসু (প্রয়াত) ও সহ সভাপতি হলেন স্বনামধন্য চক্ষু চিকিৎসা ডঃ নীহার মুন্সী (প্রয়াত)। ৬৪ নং ক্রীক রোডে হেলথ হোম আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হল। এই মহৎ প্রচেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করল বহু গণ্যমান্য মানুষ ও সংগঠন, এমনকি তৎকালীন পঃবঙ্গ সরকার। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে সেই সময়কার কলকাতার মেয়র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন। বর্ত্তমান হেলথ হোমের কার্যালয়ের জমিটি ডঃ সেনই কলকাতার মেয়র থাকাকালীন সময় হেলথ হোমকে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য দেন। এই কমিটির দখল নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা ও কৌতূককর ঘটনাও ঘটেছিল। এই জায়গাটার একধারে একটি পাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিলের গায় ছিল বিরাট গাঁজার আড্ডা। তখনও আজকের কুলীন নেশা হেরোইন প্রভৃতি ড্রাগের প্রসার কলকাতায় হয়নি। এই গাঁজার আড্ডার মালিক ও মধ্যমণি ছিল এক সাধুবাবা, যে ব্যবস্থা সার্বজনীন। ঐ দেওয়ালের গায় শিবের মূর্তি এঁকে তার নাম দেওয়া হয়েছিল—বাবা প্রাচীরেশ্বরের মন্দির। সেই সঙ্গে পয়সা আদায়ের, জুয়া, গাঁজা, মদের ঢালাও ব্যবসা। জায়গার দখল নিতে গিয়ে বারকয়েক স্থানীয় গুণ্ডা-বদমাইশদের হাতে হেলথ হোম কর্মীদের নিগৃহীত হয়ে ফিরতে হয়েছে। অবশেষে একদিন রাতে বঙ্গবাসী ও সুরেন্দ্রনাথ রাত্রি কলেজের ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে কলেজ শেষে শোভাযাত্রা করে জায়গার দখল নিল। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল আজকের হেলথ হোম। ডঃ অরুণ সেনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নেতৃত্বে একদল ছাত্র কর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই হেলথ হোম গড়ে ওঠার পিছনে যেমন অবদান কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে ছাত্র সমাজের, তেমনি ছাত্রদরদী বহু মানুষের, সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক ছাত্র সংহতির সাহায্য। আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের ও বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব সংঘের আবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ; বিশেষকরে সোভিয়েত, চীন সহ পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির ছাত্র-যুব সংগঠন অকৃপণ সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সংঘের কাছ থেকে এসেছে বিপুল সাহায্য। অর্থে সম্পদে, নানা দেশের ছাত্র যুবদের কাছ থেকে এসেছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, ওষুধসহ নানা সাহায্য। তারই স্বীকৃতিতে গড়ে ওঠা হেলথ হোমের প্রথম তলার হলটি আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশ্বগণতান্ত্রিক যুবসঙ্ঘের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। জানিনা কোন বিকৃত বুদ্ধি, নিচতা ঐ

হল থেকে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সংঘের নাম অপসারণের কাজটি করেছে। ঐ অকৃতজ্ঞদের ধিক্কার দেবার ভাষা সম্ভবত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

এই সময়েই Self-Help আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পশ্চিমবাংলার বহু কলেজে সস্তা Canteen, Book Bank, Text Book Library গড়ে উঠেছিল। যার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নগুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় '৭২-এর পর থেকে রাজনীতি থেকে যত বেশি বেশি দলবাজী, পেশীশক্তির প্রদর্শনী সাধারণ রাজনীতি অঞ্চল থেকে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে চালান-ফেরৎ হয়েছে, ততই এইসব ছাত্র কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বহু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হয় তা উঠে গেছে, আর নয়ত ব্যবসাদারদের কবলে চলে গেছে।

শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, এই আন্দোলনের ঢেউ সারা ভারতের প্রতিটি রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। হয় ছাত্ররা, নতুবা ছাত্রদের আন্দোলনের চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের জন্য ঐসব ধরনের সুযোগের ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিশেষকরে, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রে, কেরলে এই আন্দোলন বেশ বড় ধরনের গণ-চেহারা পেয়েছিল। প্রায় প্রতিবছর নানা বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে, মহামারী যেমন কলেরা দেখা দিলে ব্যাপক ত্রাণকার্যে নামত। আজকাল আর তেমন চোখে পড়ে না। অবশ্য একথা স্বীকার করা দরকার, স্বাধীনতার পর এমনকি '৬০-এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বন্যা, দুর্ভিক্ষের যে প্রকোপ লক্ষ্য করা যেত, বন্যার খরার প্রকোপ প্রবলমাত্রায় এখনও থাকলেও দুর্ভিক্ষের সে ধরনের ব্যাপকতা আজ আর নেই। এটা দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে। এই বক্তব্য থেকে কেউ যেন সিদ্ধান্ত করবেন না যে আমরা বলছি, দেশের গরীবি শেষ হয়েছে। তা মোটেই নয়। দারিদ্র বেকারী অশিক্ষা, এখনও ভয়াবহ চেহারা নিয়েই আমাদের দেশের ৭০ ভাগ মানুষের জীবনে অপ্রতিহত রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অনুদানে পরিচালিত গবেষণার গবেষকরা যতই জাতীয় আয়ের ক্রমবর্দ্ধমান গ্রাফ উঁচুর দিকে দেখান না কেন।

শিক্ষক আন্দোলনে সমর্থন

বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকরা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষকদের বাঁচার মত বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করে চলেছিলেন। আবেদন, নিবেদন, সভা, শোভাযাত্রায় কোন ফল না হওয়ায় ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তখন দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি ও অতিপ্রিয় সংগঠন। এর নেতৃত্বে রয়েছেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় রায়, হীরেন রায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, অজিত দাস, বামনদাস মণ্ডল, অনিলা দেবী, বীণা চৌধুরী প্রমুখ। মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই দাবীর সমর্থনে ছাত্ররা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করে। এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে ছাত্র ফেডারেশন সহ ছাত্র ব্লক, পি. এস. ইউ প্রভৃতি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকে। বিভিন্ন জেলায় বিরাট বিরাট

ছাত্র জমায়েত সংগঠিত হয়। এমনকি শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা শান্তিনিকেতন এলাকায় সভা করতে না পারলেও বোলপুরের মাঠে বিশাল ছাত্র শিক্ষক সম্মিলিত জমায়েতে যোগ দেয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্র-জীবনীকার ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের গ্রন্থগারিক প্রয়াত শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা ছিলেন, প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত। এই ধরনের অসংখ্যা ছাত্র সভা, কলকাতার নানা অঞ্চলে, রাজ্যের সমস্ত জেলায় অনুষ্ঠিত হল।

১০ই ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রস্তাবিত কর্মবিরতি ও রাজভবনের সামনে বিকেল বেলা থেকে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরু হল। ছাত্ররা প্রথম দিন থেকে ধর্মঘট করে শিক্ষক সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এল। মাধ্যমিক শিক্ষক মহাশয়দের এই সংগ্রামে ঐতিহাসিক জনসমর্থনের বিশালত্ব সমস্ত কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও প্রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন, অবস্থান মাস্টার মশাইদের পাহাড়ায় নিযুক্ত পুলিশ কর্মী, অফিসারদের অনেকেই এগিয়ে এসে তাদের বৃদ্ধ মাস্টার মশাইদের পায়ের ধূলা নিচ্ছে। বিকেল বেলা হাজারে হাজারে শ্রমিক কর্মচারী তাদের সমর্থন জানাতে প্রবল স্রোতের মত উপস্থিত হচ্ছেন রাজভবনের পাশে, সঙ্গে খাবার, ফুলের গুচ্ছ। মাস্টার মশাইদের ঘিরে রাতে পাহারারত কয়েক শত ছাত্র কর্মী। শিক্ষক মহাশয়দের দাবির সমর্থনে আন্দোলনের তৃতীয় দিনে সারা পশ্চিমবাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হল। শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে একদিকে যেমন গঠিত হয়েছিল ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ কমিটি। তেমনি গঠিত হয় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির যুক্ত কমিটি।

ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তার মন্ত্রীসভা এই আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য নামিয়ে আনলেন পুলিশী দমননীতি। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভোররাতে একই সময় একদিকে নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারের গ্রেপ্তার শুরু হল ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে। অন্যদিকে বে-পরোয়া লাঠিপেটা করে শিক্ষক মহাশয়দের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। অবস্থানস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হল সহস্রাধিক শিক্ষক মহাশয়দের। ১৬ই ভোররাতে বাড়ি থেকে যাদের বিনা বিচারে আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হল, তারা হলেন— প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত, দি স্টুডেন্ট পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে রথীন মিত্র, ম্যানেজার শ্যামল রায়কে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন সুধাময় দাশগুপ্ত, এস.ইউ.সির সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষ, বালিগঞ্জের কাউন্সিলার শচীন সেন, বেলেঘাটার শিবপ্রসাদ দাস, সাংবাদিক মোহিত মৈত্র ও সৈয়দ বদরুদ্দুজা প্রমুখ। তারপর একে একে অনেকেই গ্রেপ্তার হলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূপাল বসু, বিভূতি ঘোষ (নানুদা), মঃ ইসমাইল, নরেন সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সুবোধ ব্যানার্জী, সমর গুহ, সুহৃদ মল্লিক সহ ছাত্রনেতা সুধাংশু চৌধুরী, নিতাই বসু প্রমুখ আরও অনেকে। সভার শেষে বিধানসভা থেকে বাইরে বেড়নোমাত্র জ্যোতি বসু।

১৭ তারিখ কলকাতায় ছাত্ররা ধর্মঘট করে বিধানসভা অভিযান করলে তাদের উপর গুলি চলল। ১ জন স্কুলছাত্র গুলিতে নিহত হল। কলকাতায় শুরু হল সর্বস্তরের প্রতিরোধ। রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি নামানো হল। নানা জায়গায় বিক্ষোভের উপর পুলিশের গুলিতে ৫ জন প্রাণ দিল। অবশেষে আন্দোলনের তীব্রতার মুখে শিক্ষক মহাশয়দের দাবির কিছু অংশ সরকার মানতে বাধ্য হল। বাকি দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক

সমিতি তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতেরবেলা নিবর্তনমূলক আটক আইনে বিনাবিচারে গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত বন্দিদের দমদম জেল থেকে মুক্তি দিল।

এই সময় সারা ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই বিশেষকরে উত্তরপ্রদেশে, পশ্চিমবাংলায়, দিল্লিতে ছাত্রদের মধ্যে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বিতর্ক, নকল পার্লামেন্ট প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে ইংরাজি ভাষায় বিতর্কের দাপটই ছিল লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান (বাংলাদেশে) বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ করছিল। তার ঢেউ পশ্চিমবাংলাতেও লাগে। এখানেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দাবিতে ছাত্ররা সোচ্চার হতে থাকে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থানে হিন্দির দাবিও তীব্র হয়। এই সঙ্গে কলকাতায় বাংলা ভাষায় বির্তক প্রভৃতিকে জনপ্রিয় করার কাজে 'বাংলা ভাষা বিতর্ক সংঘ' নামে সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনে যেসব ছাত্র কর্মীরা প্রশংসনীয় কাজ করে শুধু বাংলায় বিতর্ক করাটাই জনপ্রিয় করেছিল তাই নয়, বাংলার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দাবিকে শক্তিশালী করেছিল তারা হলেন কমলেন্দু ঘোষ, বিপ্লব দাশগুপ্ত, [বিপ্লব দাশগুপ্ত স্বল্পকালের জন্য কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক হয়েছিল], জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ। এরা প্রধানত বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিল।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল

১৯৫৪-৫৬ সালে বেশ কিছু জাতীয়. আন্তর্জাতিক এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের নিজস্ব দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে ভারতের নানা স্থানে ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

কেরলে ছাত্রদের ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ত্রিবান্দ্রম, কৈলন, ত্রিচুর প্রভৃতি জায়গায় ছাত্র ধর্মঘট সভা, শোভাযাত্রায় মুখর হয়ে উঠেছিল। পুলিশী দমননীতি সর্বক্ষেত্রেই এইসব আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কেরলের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিকায় বেশ বৈচিত্র্য বর্তমান। কেরলে খ্রিস্টান মিশনারীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় অংশ স্কুল-কলেজের মালিক। তেমনি নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, এই প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় শক্তি শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের খেয়াল খুশি মতই চালাত এবং ছাত্র শিক্ষকদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার তারা মানতে কখনই প্রস্তুত ছিল না। উপরন্তু নানা ধরনের বে-আইনি ফি সহ উচ্চহারে ছাত্র বেতন আদায়, শিক্ষকদের নিম্নতম বেতনে কাজে বাধ্য করা, সর্বোপরি ছাত্র শিক্ষক কোন অংশের সংগঠন করা, কোন গণতান্ত্রিক অধিকার তারা কখনই স্বীকার করত না। কারণ তারা ধর্মীয় ও সামাজিক স্বতন্ত্র অধিকারের নামে সরকারিভাবেই এইসব অনাচারের অধিকারী ছিল। বরং ১৯৫৭ সালে কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট সরকার স্থাপিত হওয়ার পূর্ববর্তি সব ধরনের সরকার এইসব প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে মদত দিয়ে ছিলেন। কেরল ছাত্রদের একটি আন্দোলন বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটি হল, সমুদ্র তীরবর্তি অঞ্চল লেগুন ও নানা নদী পার হয়ে ছাত্রদের গ্রাম থেকে স্কুল-কলেজে আসতে হয়। এইসব নদী পার হওয়ার জন্য দেয় ভাড়ার প্রশ্ন নিয়ে

[যেমন পশ্চিমবাংলায় কেরোসিন তেলের অভাবে ৫৩-৫৪ সালে গ্রামের ছাত্রদের পড়ার জন্য রেশনে কেরোসিনের বিশেষ ব্যবস্থার দাবি প্রায় সমস্ত জেলায় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল, বিশেষকরে হাওড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ-এর নাম উল্লেখযোগ্য] কেরলে নৌকাভাড়া সংক্রান্ত আন্দোলন এক ভিন্ন রূপ নেয় ১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট সরকারের শাসনের আমলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের উদ্যোগ ও চক্রান্তে। এ সম্পর্কে পরে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ও তাদের আন্দোলনের ব্যাপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে তাদের জন্য আলাদা কেরোসিন তেল বন্টনের ব্যবস্থা করতে সরকার সম্মত হয়। ছাত্রদের নিজস্ব দাবিতে নানা ধরনের আন্দোলন তখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠিত হয়েছিল। যেমন রাজস্থানের ঝুনঝুন। উদয়পুরে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে, জয়পুরে বিশ্ববিদ্যালয় ও জয়পুরের আইন কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক করণের দাবিতে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

বিহারের গয়া জেলার নওধা কলেজে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ও ইউনিয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে ছাত্রদের উপর গুলি চালনায় ২ জন ছাত্র নিহত হয়। ছাত্রদের প্রতি আক্রমণে একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু হল। ছাত্র নেতা সুরেশ ভাট সহ কয়েকজনকে কেবল গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আনা হয়। দীর্ঘদিন তাদের জেলে বন্দি রেখে বিচার চালানো হয়। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ সংগঠিত করার ডাক দেওয়া হয়। ঐ ছাত্র নেতা ও কর্মীদের বিচারে সাহায্য করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সাহায্য করা হয়। অবশেষে প্রায় দেড় বছর জেলে বন্দি থাকার পর তারা আদালতের আদেশে মুক্তি পায়। ছাত্রদের দাবি সম্পূর্ণ না হলেও অংশত পূরণ করতে বিহার সরকার রাজি হয়। ইতিমধ্যে অনুরূপ কারণে বেগু-সরাই, পাটনা, গয়া প্রভৃতি স্থানে আন্দোলন প্রসার লাভ করছিল। কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ও ইংরাজির নাম করে ব্যাপকহারে ছাত্র ফেল করাবার প্রতিবাদে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করে, 'সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা চাই' দাবিতে '৫৩ সাল থেকে '৫৫ সাল পর্যন্ত ছাত্রদের নানা ধরনের আন্দোলন হয়েছে। এমনকি ছাত্রদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সিণ্ডিকেটের দুই সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসুকে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দায়িত্ব দেয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সুনীল সেন, সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত, ছাত্র ব্লকের সাধারণ সম্পাদক রসজয় রায়, পি.এস.ইউ-র বানীন রায়, ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল ভট্টাচার্য। উল্লেখ করা দরকার, এই সময় ছাত্রদের সমস্ত রকম আন্দোলন পশ্চিমবাংলার সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছিল। পশ্চিমবাংলার বাইরে অবশ্য অবস্থা একটু অন্যরকম ছিল। যেমন বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশসহ দক্ষিণ ভারতের কেরল, অন্ধ্র, কর্ণাটক ছাড়া সর্বত্র আন্দোলন হয়েছে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে। যদিও সর্বত্র ছাত্র ফেডারেশন সব সময়ই আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে অন্যদের তুলনায় বড় সংগঠন হিসাবে বড় ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য পশ্চিমবাংলায় ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বৃহত্তম আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। স্কুল-কলেজে বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত ও ব্যাপক চেহারা

আন্দোলনের সংগঠকদের সমস্ত হিসাব ছাপিয়ে যায়— একটানা ১১ দিন ছাত্র ধর্মঘট চলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আজকের সিধো কানহু ডহরে (Esplanade East) আইন অমান্য করে ছাত্ররা শয়ে শয়ে গ্রেপ্তার বরণের মধ্যদিয়ে দাবির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন চালিয়ে গেছে। ২,০০০ হাজারেরও বেশি ছাত্র সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিল। এই আন্দোলনে যে সব ছাত্রনেতা ও কর্মী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারা হল— সে সময়ের প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায়চৌধুরী [যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Library Science বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও লাইব্রেরী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা, বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের কখনও সাধারণ সম্পাদক, কখনও সভাপতি (বর্তমানে প্রয়াত)], সুনীল সেন [পরবর্তীকালে হাসবেগু বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মানী) থেকে ভাষাতত্ত্বে উচ্চ সম্মানপ্রাপ্ত D.Sc., প্রয়াত], রাজ্যসভার সদস্য গুরুদাস দাশগুপ্ত, দীনেশ মজুমদার, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, পল্টু দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ছাত্রনেতারা।

বঙ্গ-বিহার একীকরণের বিরুদ্ধে

১৯৫৪ সালে যখন একদিকে আন্দোলন চলছিল, অন্যদিকে চলছিল মানভূম, সিংভূম অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তি আন্দোলন যার নেতৃত্ব ছিল মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলের লোকসেবক সঙ্ঘ। ঠিক তখন ডঃ রায় তৎকালীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলা, বিহার একীকরণেব প্রস্তাব দিয়ে তার রূপায়নের জন্য কাজ শুরু করে দিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। ছাত্ররা পরপর ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের ব্যাপকতাকে প্রচণ্ড বাড়াল, আন্দোলন শক্তিশালী হল। এই একীকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার জনমত কতদূর তীব্র হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উত্তর-পূর্ব কলকাতার লোকসভা কেন্দ্র প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের একচেটিয়া, সেইখানে ঐ কেন্দ্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামপন্থীদের মনোনীত প্রার্থী প্রয়াত শ্রদ্ধেয় মোহিত মৈত্র কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের একটি প্রশ্ন ছিল বাংলা-বিহার একত্রীকরণ আমরা চাই কিনা। বাংলা-বিহার একত্রীকরণের প্রস্তাব বাতিল হল। '৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থী মোহিত মৈত্রকেই লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত করে কংগ্রেস প্রার্থী আবার আসনটি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হল।

১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন

১৯৫৯ সালে সারা দেশে খাদ্য পরিস্থিতি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে। প্রতি বছরই বর্ষার পর কৃষকদের ঘরে অভাব দেখা দিত, কৃষকরাও তাদের নানা দাবি নিয়ে সরকারের কাছে জেলা সদর দপ্তর, কলকাতায় মন্ত্রীদের কাছে সভা করে বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে উপস্থিত হত। কিন্তু ৫৯ সালে অবস্থা প্রায় দুর্ভিক্ষের আকার নিলে, গ্রামের কৃষক ও শহরাঞ্চলের মানুষ একত্রে সস্তা দরে খাদ্যের দাবিতে এক বিরাট গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

আন্দোলন সংগঠিত হলো সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বে গঠিত 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র নেতৃত্বে। খাদ্য ও খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ৩১শে আগস্ট এক

বিশাল মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করে। এই মিছিলের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ছিল গ্রামের প্রায় অভুক্ত কৃষক, পশ্চিমবাংলার দূর-প্রান্তর থেকে কলকাতায় এসেছে সস্তা দরে গ্রামে যাতে খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, নতুন দুর্ভিক্ষে যেন তাদের মরতে না হয়। মিছিল যখন রাইটার্স বিল্ডিং-এর পরে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন হঠাৎই কোন প্ররোচনা ছাড়াই পুলিশ মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা নিরীহ কৃষক নরনারীর উপর এমন বর্বর আক্রমণ কখনও দেখিনি। বৃদ্ধ, মহিলা, আত্মরক্ষার জন্য ধাবমান উলঙ্গ পুরুষ-নারী এই বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। লাঠি, টিয়ারগ্যাস, গুলি সবই চলল। এই আক্রমণে ৬০ জন নিরীহ মানুষ সস্তায় খাদ্যের দাবি করায় প্রাণ দিল। পরের দিন ১লা সেপ্টেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্ররা সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিবাদ মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হলে তাদের উপরও পুলিশ গুলি চালায়। ৪ জন ছাত্র নিহত হল। 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র ডাকে সারা রাজ্যে হরতাল ধর্মঘট পালিত হল। ৪ দিন ধরে নানা জায়গায় বিক্ষোভ কেন্দ্র করে পুলিশ-জনতায় সংঘর্ষ হয়। এর ফলে ৩১শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪ জন ছাত্রসহ ৮০ জন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এই সময় খাদ্য মিছিলের নদীয়ার ছাত্র ফেডারেশনের নেতা হরিনারায়ণ অধিকারীকে পুলিশ নির্দয়ভাবে প্রহার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় কাশীপুর খাদ্য গোডাউনে তাঁকে পার্টি কমরেডরা লুকিয়ে রেখেছিল ৩ দিন। কিন্তু নিরুদ্দেশের তালিকায় সংবাদপত্রে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে এই কলঙ্কজনক দিনটির স্মরণে প্রতি বছর ৩১শে আগস্ট শহিদ দিবস পালন করা হয়। আর ১লা সেপ্টেম্বর ছাত্র শহিদ দিবস উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্যই এই স্মরণ বিষয়টি বর্তমানে একেবারেই আনুষ্ঠানিক. দলের নেতারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে দিবসটি স্মরণ করেন। ছাত্রদের ব্যাপারটি ছাত্ররা মোটামুটি ভুলে গেছে বলাই সঠিক। তবে খাদ্য আন্দোলন চলাকালীন সময় সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে সব ছাত্র নেতারা গ্রেপ্তার, এমন কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য কাজ করেছেন তারা হলেন গুরুদাস দাশগুপ্ত, বীরভূমের তেজারত হোসেন, অরবিন্দ ঘোষ, সুনীল সেন, প্রতুল লাহিড়ী প্রমুখ।

ছাত্র আন্দোলনে এই সময় দুটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন। এই প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃপক্ষের পেটোয়া কিছু শিক্ষক ছাত্রদের প্রবল বাধা দেন। তারা বোঝাবার চেষ্টা করেন ইউনিয়ন গঠন করা হলে বিশ্বভারতীতে রাজনীতি আসবে, শান্তিনিকেতনের পবিত্রতা নষ্ট হবে। তবে অবশেষে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ইউনিয়ন গঠনের দাবি মেনে নিলেও প্রাথমিক অবস্থায় নানা ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন। ধীরে ধীরে দিন যেমন এগিয়েছে, ক্রমেই সেইসব বাধা অপসারিত হয়েছে। তবে স্মরণ করা দরকার, ঐ '৫৫ সালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঁধা কেবল অভ্যন্তরীণ ছিল না, বাইরেরও বাধা ছিল প্রবল। এই আন্দোলনকে অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবার প্রায় সবটুকু কৃতিত্বের পাওনা সুনীল সেন-এর। সুনীল তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভবনের ছাত্র।

এই সময় ১৯৫৬ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলেও সবকিছু হল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের

কর্মসূচির বাইরে ছাত্ররা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শাখা কলেজগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হল। এই কমিটি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মাঠে বিশাল Pandel করে ৭ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত হল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উদ্যোগকে খুবই স্বাগত জানালেন ও মোটামুটি প্রায় সমস্ত রকমের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গনে বিশাল Pandel-এ কয়েক সহস্র ছাত্রের উপস্থিতিতে উৎসবের উদ্বোধন করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। কলেজ মাঠে বিশাল বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রদর্শনী তৈরি হল। প্রদর্শনীতে আধুনিক পৃথিবী কেমন হতে চলেছে থেকে শুরু করে নানা ধরনের কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এমন সব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। শিক্ষা সম্পর্কে ভাষা সমস্যা নিয়ে, আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে আলোচনা সভা, বিতর্কসহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসব পালিত হল। দুরদুরান্ত জেলা থেকে প্রতিদিন অগণিত ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ উৎসব প্রাঙ্গনকে করত মুখরিত। বিপুল সাফল্যের মধ্যে উৎসব পরিসমাপ্ত হল।

প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র নেতৃত্ব হীরেন দাশগুপ্ত, সুনীল সেন, প্রতুল লাহিড়ী প্রমুখরা উৎসবের কাজে নানাভাবে সাহায্য করছিল। আজকাল যেমন রাজনৈতিক দল ও ঐসব দলের কোন সংগঠনের অর্থের কোন অভাব হয় না। তখন কিন্তু তেমন ছিল না। ফলে ছাত্র কমিটির যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করার কথা ছিল, তারা তা করে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও তাদের প্রতিশ্রুত দেও টাকা দেয়নি। ফলে নানা লোকের কাছে, যেমন Pandel করেছিল মহম্মদ ইয়াসিন কোম্পানী, প্রদর্শনীর জিনিষপত্র যারা জোগান দিয়েছিল তাদের কাছে বেশ কিছু টাকা দেনা পড়ে থাকে।

এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে রটনা করা হল হীরেন দাশগুপ্ত, সুনীল সেন, প্রতুল লাহিড়ী বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী কমিটির টাকা তছরুপ করেছে। এই প্রচারের পিছনে পার্টির কিছু নেতা ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। ডঃ নির্মল সিদ্ধান্তের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি এই নিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফৎ জানালেন—এই প্রচার অসত্য, কারণ ঐসব টাকা পরিশোধ করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমরাই এখনও ছাত্রকমিটিকে আমাদের দেয় টাকা দিতে পারিনি। দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মনে হল ঘটনাটিতে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। এবার এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। এইসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি শতবার্ষিকী উৎসবের ছাত্র কমিটির হিসাব পরীক্ষা করে অভিযোগ করার মত কিছু পায়নি। এই ঘটনা ১৯৫৬ সালে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে যখন দিল্লিতে 'নিখিল ভারত যুব সংঘ' প্রতিষ্ঠা সম্মেলন শুরু হয়েছে এবং 'সারা ভারত যুব সংঘ' গঠনের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে সংগঠনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনের কাজটুকু করছিল। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনেব সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সেই সময় হঠাৎ কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির টাকা তছরুপ করার অপরাধে হীরেন দাশগুপ্ত ও সুনীল সেনকে ১৫ দিনের জন্য Party থেকে Suspend করা হয়েছে এই মর্মে একটি সার্কুলার শ্রী সুনীল মুন্সী দিল্লিতে শ্রীরণদিভে মারফৎ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পৌঁছে দেন। ফলে ঐ দুজন অপরাধীকে কার্যত সম্মেলনে অচ্ছুত হয়ে পড়তে হল। এই ব্যবস্থাটি শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগে করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, ঐ দুজনকে

নবগঠিত যুব সংঘের বাইরে যেভাবেই হোক রাখতে হবে।

এই ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তি সময়ে পার্টিনেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ঐ প্রস্তাব যখন গ্রহণ করা হয় তখন তিনি প্রাদেশিক কমিটির সভায় কোন কাজে বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে তিনি নাকি বলেছিলেন, যে এ কেমন ব্যাপার। যদি তারা টাকা তছরুপ করেই থাকে তা হলে তো তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হবে। তা না করে ১৫ দিনের জন্য suspend করা কি রকম। এবং প্রস্তাবটি তখনই প্রত্যাহৃত হয়। তা সত্ত্বেও কেন এবং কেমন করে ঐ অভিযুক্তদের হেয় করা হল, তা তিনি বলতে পারেন না।

ছাত্র ফেডারেশনে মতপার্থক্যের শুরু

এই সমস্ত ঘটনার উৎস ও কারণ ও তার পটভূমিকা বুঝতে হলে ১৯৫৪ সাল থেকে ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে তীব্র মত পার্থক্য এবং দুটি ভিন্নমতের একটির প্রতি পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্বের বিশেষ বিশেষ কয়েক ভাগের প্রতি অন্ধ সমর্থনের ফলশ্রুতি ছিল ঐ ঘটনার উৎস।

ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন ক্রমশই রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ক্রমশ মুষ্টিমেয় ছাত্র অংশগ্রহণে পরিচালিত হওয়ার ফলে ছাত্র ফেডারেশন ক্রমান্বয়ে তার গণচরিত্র হারাতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রশ্ন জাগে কিভাবে ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক অংশকে টেনে আনা যায় এবং সে কাজ করতে হলে কি ধরনের সংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োজন।

এই প্রশ্নে সরাসরি দুটি বিরোধী মতামতের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হয়। একটি মতামত ছিল স্বাধীনতার পর ছাত্রদের নিজস্ব সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। একদিকে যেমন দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্র, ছাত্র ইউনিয়নের সভ্য। তেমনি ছাত্রদের উপর এদের প্রভাবও সার্বিক বলা চলে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তার শাখা কলেজগুলির প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন ফেডারেশনের চেহারা পেয়েছে। অন্যদিকে ছাত্র ফেডারেশনের মত তথাকথিত গণসংগঠন তার গণচরিত্র হারিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য ছাত্র ইউনিয়নকেই প্রাথমিক ইউনিট ধরে তার ফেডারেশন রূপকেই জাতীয় স্তরে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগই হবে আজকের কর্ত্তব্য। অন্যদিকে অন্যতম হল ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রগামী চেতনার আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারবে না। তাছাড়া ছাত্র ফেডারেশন তুলে দেওয়া হলে কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অতএব ছাত্র ফেডারেশনই ছাত্রদের আন্দোলনের একমাত্র উপযোগী সংগঠন। এখানে এই আদর্শগত ভিন্নমতের সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তবে এই ভিন্নমত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তীব্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত রাজ্যেই এই প্রশ্ন ছাত্রকর্মী ও পার্টির ছাত্র কর্মীদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হতে থাকে। পার্টি নেতৃত্ব, কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক তাঁরাও এই প্রশ্ন নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেও পারছিলেন না।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আলোচনা চললেও এই মত পার্থক্য সর্বাপেক্ষা তীব্রতা পায় পশ্চিম বাংলায়। ১৯৫৪ সালে ছাত্র পার্টি কনভেনসনে দুটি দলিল উপস্থাপিত হয়। জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার পক্ষে বক্তব্য ও দলিলের প্রবক্তা ছিল হীরেন দাশগুপ্ত, সুনীল সেন, প্রতুল লাহিড়ী, হুগলী জেলার ছাত্রনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেশ হোমচৌধুরী, দীনেশ মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। অন্যদিকের মতামতের পিছনে ছিল প্রবীর রায়চৌধুরী, গুরুদাস দাশগুপ্ত, গৌরী বসু প্রমুখ। বলাই বাহুল্য প্রথম মতটি পশ্চিমবাংলার পার্টির কোন স্তরের নেতাদের সমর্থন পায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মতামতটিই ছিল আসলে প্রাদেশিক পার্টির শক্তিশালী অংশের মত এবং বহু প্রশ্নে ও সাংগঠনিকভাবে পরস্পরের প্রচণ্ড বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্ত, জনাব মুজাফ্ফর আহমদ প্রমুখরা এই প্রশ্নে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গঠন ও ছাত্র ফেডারেশনের অবলুপ্তির চূড়ান্ত বিরোধী। এবং তাদের উদ্যোগেই দ্বিতীয় দলিলটি প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সরাসরি সমর্থন ও হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও কনভেনশনে হীরেন দাশগুপ্তদের প্রস্তাবের পক্ষে ৯০ জন ও অন্য প্রস্তাবটি পক্ষে ৭ জন সমর্থন জানাল। বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র ও পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় ও পশ্চিমবাংলায় পার্টির তীব্র বিরোধতার ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী অজয় ঘোষ সহ একটা বড় অংশ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের ও ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন চেহারা পরিবর্তন করে ছাত্র কমিউনিস্ট লীগকে জাতীয় সংগঠনে পরিণত করার পক্ষে থাকলেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। যেমন ছিল তেমনি চলবে, সেই রকমের একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করল। এই মতপার্থক্য থেকে যারা ছাত্র ফেডারেশন বিরোধী বলে পশ্চিমবাংলার পার্টি নেতৃত্বের কাছে চিহ্নিত হল তাঁরা হলেন শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্ত, জনাব মুজাফ্‌র আহমদ প্রমুখ নেতাদের নেওয়া নানা ব্যবস্থার মধ্যে ১৯৫৮ সালের এটাও একটি ঘটনা।

সম্প্রতিকালে সি.পি.আই., সি.পি.এম-এর কোন কোন নেতা যাদের সেই সময়কার এই মতবিরোধে কোন ভূমিকা ছিল না, তারা নানা কথা লিখছেন। তারা যারা N.U.S পন্থী বলে পরিচিত ছিলেন, তারা সংস্কারবাদী ও ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে তারা বিপ্লবী ও পার্টি বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেন যারা C.P. M. পন্থী তারা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে! যারা C.P.I. পন্থী তারা N.U.S. এর পক্ষে। এ সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কষ্টকল্পিত। লেখা অজ্ঞতা প্রসূত না অন্ধ বিদ্বেষ প্রসূত বলা কঠিন।

উত্তরপ্রদেশে সরকারি আইনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন

১৯৫৬ সালে উত্তরপ্রদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নগুলিব গণতান্ত্রিক কাঠামো পাল্টে কর্তৃপক্ষের মনোনীত ও কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় চালিত হবে, এই মর্মে তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী C.B.Gupta এক নূতন আইন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় পেশ করেন। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে সমগ্র উত্তরপ্রদেশের ছাত্ররা বিভিন্ন ছাত্র ইউনিয়নেব নেতৃত্বে এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দিল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন। সারা উত্তরপ্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট শুরু হলে C.B.Gupta-র সরকার ছাত্রদের উপর পুলিশী আক্রমণ শুরু করলেন। ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা

হল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রবীন মিত্র, সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ আনন্দ প্রমুখের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হল। অসংখ্য ছাত্র কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশের বেপরোয়া লাঠি ও গুলিতে ছাত্রীসহ বহু ছাত্র লক্ষ্ণৌ, কানপুর, গোরক্ষপুরে আহত হল। কিন্তু C.B.Gupta (চন্দ্রভান গুপ্তা) সরকার ছাত্রদের উপর চরম দমননীতি প্রয়োগ করেও যখন ছাত্রদের মনোবল বা আন্দোলন ভাঙ্গতে পারল না, তখন উত্তরপ্রদেশ সরকার ছাত্রদের ছাত্র ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার বিলটি প্রত্যাহারে বাধ্য হল। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম জয়যুক্ত হল।

কিন্তু ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে নতুনভাবে আক্রমণ এল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রদের উপর। বেশ কিছু দিন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের নানা দাবি, যথা — ভর্তি, হোস্টেল-এর সমস্যা, নানা ধরনের বর্ধিত ফির বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ছাত্র ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছিল। এই সময় ছাত্র ইউনিয়নর নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাই ছিলেন। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালির বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর নানাবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেন। স্বভাবতই ছাত্ররা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বিরাট আকার ধারণ করল। ছাত্ররা ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রা মারফৎ প্রতিবাদ জানালে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালালে ২ জন ছাত্র নিহত হল। আহত হল অসংখ্য ছাত্র। ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ বহু ছাত্র কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। সারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে কার্যত পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত করা হল। ছাত্রদের প্রিয় নেতা ও ছাত্র জীবনেই গারওয়ালী লেখক ও কবি হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত বিদ্যাসাগর নটিয়াল (যিনি ১৯৬০ সালে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের উদয়পুর সম্মেলন থেকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হল।) সহ ২০০ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও একমাত্র প্রবেশপথে স্থায়ীভাবে পুলিশ বসানো হল এবং শতাধিক ছাত্রনেতা ও কর্মীদের ছবি বোর্ডে টানিয়ে রাখা হল যাতে তারা কোনপ্রকারে পুলিশের নজর এড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে। সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হল। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থনে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রদের কাছে আহ্বান জানাল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ছাত্ররা আবার ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করার চেষ্টা করলেও তা ফলবতী হল না। কারণ ইতিমধ্যে জনসংঘের ছাত্রশাখা অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ, ছাত্রদের মধ্যে ছাত্রফেডারেশন, কমিউনিস্ট প্রভাব প্রভৃতি ধুয়া তুলে বেশ বড় ধরনের অনৈক্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় গেটে স্থায়ী পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করল তাই নয়, সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমস্ত রকম ছাত্র সভা নিষিদ্ধ করলেন, ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হল। এককথায়, ছাত্রদের আন্দোলন ব্যর্থ করে দিতে কর্তৃপক্ষ সফল হলেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পাল্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব আনলেন; তখন বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে করেনি এমন কোন উৎপাত বাকি ছিল না। এই হুল্লোড় ও গুণ্ডাবাজী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

খোলাখুলি সমর্থনেই ঘটেছে। এককথায় '৫৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার পর থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মস্ত ঘাঁটি হয়েই আছে। তার পরিবর্তনের চেষ্টার কোন খবর আমাদের চোখে পড়ে না।

গোয়ার মুক্তি আন্দোলন

গোয়ার পর্তুগীজ শাসনের অবসানের জন্য ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ক্রমান্বয়ে আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করছিল। ভারতে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন তখন থেকেই শুরু হলেও '৫৬ সালে গোয়ার অভ্যন্তরে ও ভারতে সর্বত্র আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। এইসময় একদিকে ভারত সরকার গোয়ার পুলিশী অভিযান চালানের সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে গোয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে গোয়ার অভ্যন্তরে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণে সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্ররা স্বাভাবিক নিয়ম ও প্রবণতানুযায়ী পর্তুগালের সালাজার শাহীর বিরুদ্ধে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে এই আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে সর্বাত্মক ব্যাপকতা লাভ করেছিল মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিম বাংলায় ছাত্ররা সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালন করে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে ১৫ হাজারের বেশি এক বিশাল ছাত্র শোভাযাত্রা ওয়েলেসলী স্ট্রিটে পর্তুগাল কনসুলেট ঘেরাও করল। পশ্চিমবাংলা থেকে শতাধিক ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক গোয়ায় প্রবেশের জন্য মহারাষ্ট্র গেল। মহারাষ্ট্রে একটানা ছাত্র ধর্মঘট, বিশেষকরে বোম্বাই শহরের রাজপথ প্রতিদিন মুখরিত হতে লাগল। হাজার হাজার ছাত্র গোয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষায় গোয়া সীমান্তে সমবেত হল। একই সঙ্গে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক যার মধ্যে একটি বিরাট অংশই ছিল ছাত্র, যারা গোয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করল। পর্তুগীজদের সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। গোয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে স্বাধীন হল, তারপর ক্রমপর্যায়ে গোয়ার ভারতভূক্তি ঘটল।

আন্তর্জাতিক ছাত্র সংগঠন

আন্তর্জাতিক ছাত্র-যুব সংগঠন ও ভারতে তার প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। যুদ্ধের শেষে বিশ্বশান্তি রক্ষা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে বিশ্বের ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা ও সংগ্রামে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালেই প্যারিসে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (I.U.S.) ও বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (W.F.D.Y) গঠিত হয়। ভারতে যুব সংগঠন না থাকায় ও এই সংগঠন দুটি প্রথম থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র-যুব আন্দোলন, বিশেষকরে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম সারিতে থাকায় তাদের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে এই ছাত্র-যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র-যুব সংগঠন ছাড়াও ইউরোপের কিছু কিছু দেশের সোস্যালিস্ট পার্টির প্রভাবিত ছাত্র-যুব সংগঠন এই সংগঠনের প্রস্তুতিপর্বে ছিল। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ইতালির পিয়েত্রো নেশীর নেতৃত্বাধীন সোস্যালিস্ট পার্টির ছাত্র-যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সব সবয়ই I.U.S., WFDY-র সভ্য ছিল। এবং প্রথাই হয়ে গেছিল যে এদের মধ্য থেকেই ঐ দুই ছাত্র-যুব সংগঠনের একজন

সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবে। এছাড়াও ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম-রত জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

এই আন্তর্জাতিক সংগঠন দুটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় যুদ্ধের মধ্যে গড়ে ওঠা ফ্যাসীবাদ বিরোধী সমস্ত ছাত্র-যুব সংগঠন সমবেত হয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই I.U.S ও W.F.D.Y. উভয় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে ছিল নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন। কারণ ভারতে তখন কোন যুব সংগঠন ছিল না। প্রথমাবস্থায় ভারতের যারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বর্তমানে স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসকারী শ্রী রণজিত গুহ, কিটি বিমলা (রামদাস), বিদ্যা কানুগা (মুন্সী), গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তারপর ভারত সরকারের প্রতিবন্ধকতায় ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কোন প্রতিনিধি ভারত থেকে পাঠানো সম্ভব হয়নি। যে সব ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে বিশেষকরে ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করত এবং সেখানে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ভারতীয় ছাত্র সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারাই I.U.S., W.F.D.Y.-র সভা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনকে (A I.S.F.) প্রতিনিধিত্ব করত। ১৯৫৫ সালে আবার দক্ষিণ কলকাতার যুব পার্টি কর্মী সারদাপ্রসাদ মিত্র (সাধারণভাবে সারদা মিত্র নামেই পরিচিত) হঠাৎ পাশপোর্ট পেয়ে যাওয়ায় তাকেই W.F.D.Y.-তে ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়। তারপর অবশ্য যুব সংগঠন গঠিত হলে উভয় সংগঠনে আলাদা আলাদা প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। যেমন I.U.S.-এ পাঠানো হয় A.I.S.F-এর প্রাক্তন সভাপতি হরিশচন্দ্র আগরওয়াল, সুখেন্দু মজুমদার, সুধাংশু চৌধুরী, গোবিন্দ পিল্লাই প্রমুখ ছাত্র নেতাদের। ১৯৪৫ সালে যে ঐক্যবদ্ধ I.U.S. ও W.F.D.Y. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যুদ্ধশেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল— তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ্বে বিশেষ করে ইউরোপের কমিউনিস্ট বিরোধী দেশগুলির জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন ও যুব সংগঠন নিয়ে গড়ে উঠলো কো-অর্ডিনেটিং কমিটি অব স্টুডেন্স ইউনিয়ন (C.O.S.E.C.), ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব ইউথ (W.A.Y.)। আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ দুটি কমিউনিস্ট বিরোধী ছাত্র-যুব সংগঠন গড়ে ওঠার পূর্বে I.U.S., W.F.D.Y.-র কেন্দ্রীয় দপ্তর Paris-এ স্থাপিত হলেও ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবশ্যম্ভাবী কারণে সেখান থেকে I.U.S., W.F.D.Y.-র কেন্দ্রীয় দপ্তর সরিয়ে আনতে হল। I.U.S. দপ্তর হল চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে, W.F.D.Y.-র হাঙ্গেরীর বুদাপেস্তে। C.O.S.E.C. ও W.A.Y.-র কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পর্কে ওরা সিদ্ধান্ত নিল, যখন যে দেশ থেকে ঐ সংগঠনের সম্পাদক নির্বাচিত হবে তার দেশেই থাকবে তখনকার মত কেন্দ্রীয় দপ্তর। ইতিমধ্যে ভারতে কংগ্রেস তার ছাত্র সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটালেও নতুন করে ছাত্র-যুব সেল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ছাত্র সংগঠন না করলেও যুব সংগঠনের রূপ দিতে শুরু করেছে। এই ছাত্র-যুব সেলের দায়িত্বে ছিল রামলাল পারিখ। পরে ছাত্র সেলের আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয় সভাপতি হিসাবে পাঞ্জাবের পুরণ সিং আজাদ, আর সম্পাদক হিসাবে অন্ধ্রের রবি রেড্ডীকে। এরা নিজেদের C.O.S.E.C. ও W.A.Y.-র অন্তর্ভূক্ত করে। অবশ্য এরা সব সময়েই বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসবে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আলাদাভাবে। আফ্রো-এশিয়া সংহতি সমিতির সঙ্গে কংগ্রেসের একটা বড় অংশ সবসময় সহযোগিতা করেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে আফ্রো-এশিয়া সংহতি সমিতির

সভাপতি ছিলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৫৯ আফ্রো-এশিয়া ছাত্র-যুব সংহতি কমিটি গঠিত হলে তার সভাপতি হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যুগ্মসম্পাদক হলেন কংগ্রেসের যুব সেলের সভাপতি রামলাল পারিখ ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত।

ভারতের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে I.U.S., W.F.D.Y. যে সহযোগিতা ও সাহায্য দিয়েছে সেইরকম কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা C.O.S.E.C. বা W.A.Y.-র নেই বললেই চলে। তবে হায়দ্রাবাদ ও তামিলনাড়ুর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এদের বেশ কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়।

I U.S., W.F.D.Y.-র ডাকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্ররা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নানা সংগ্রামে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। যেমন জাতিসংঘের ব-কলমে উত্তর কোরিয়ার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, ১৯৫১ সালে কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ আক্রমণ ও পরিশেষে আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে বাধ্য হলে তার ফলাফল বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত দেশ ও সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভারতের পক্ষে তো বটেই। এতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য চেহারা ইতিমধ্যে ভাঙ্গতে শুরু করেছে। ইউরোপে ফ্যাসীবাদের পরাজয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার মূখ্যভূমিকা, আমেরিকার প্রত্যক্ষ বিপুল সামরিক সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং কাইসেকের পতন, সাম্রাজ্যবাদের অজেয় শক্তির কল্পিত চেহারায় ফাটল ধরিয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকা আত্মরক্ষামূলক (defensive) সন্ধিতে বাধ্য হল। এইসময় এশিয়ার সামরিক ভারসাম্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আমেরিকা নিজ দখলে রাখার উদ্দেশ্যেই সদ্যগঠিত পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত করল। এই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির উদ্দেশ্যই হল ভারতের উপর ক্রমাগত সামরিক চাপ সৃষ্টি করে ভারতের আভ্যন্তরীণ নীতিকে প্রভাবিত করা। এই চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা, শোভাযাত্রা সংগঠিত করেছে। বিশেষকরে পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, অন্ধ্রের গুন্টুরে। বিশেষকরে দিল্লিতে ছাত্ররা বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছে। এইসময় ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে তার জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করলে, সর্বত্র ছাত্ররা এই নীতির সমর্থনে সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা ও প্রচার কার্য চালিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের আহ্বানে ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ছাত্রদের ভূমিকা খুবই ব্যাপকতা লাভ করে। অবশ্য স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে '৪৬ সাল থেকেই ভিয়েতনাম মুক্তি সংগ্রামে কলকাতার ছাত্রদের ঐতিহাসিক সমর্থন ও সংগ্রামের কথা সর্বজনবিদিত। স্বাধীনতার পর ও ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনের প্রশ্নে পশ্চিমবাংলার ছাত্ররা দেশের ছাত্র আন্দোলনে সবসময়ই প্রথম সারিতে থেকেছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনেই সম্ভবত সারা দেশে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনোত্তর যুগের বৃহত্তম ঐক্য বোধ ও ঐক্যবদ্ধ কার্যসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষকরে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাবে ছাত্ররা সর্বত্র সভা-শোভাযাত্রা মারফৎ নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। তেমনি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে ছাত্র-যুব সম্মেলনে ভারত থেকে যে ছাত্র প্রতিনিধি যায়, তার

মধ্যে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ছাড়াও অকমিউনিস্ট জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

১৯৫৩ সাল থেকেই বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (W.F.D.Y.) ও আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের (I.U.S.) যুগ্ম-প্রচেষ্টায় বিশ্বের সমস্ত যুব-ছাত্রকে বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, বিশ্বকে আণবিক অস্ত্রের বিপদমুক্ত করার অভিযান ও সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-যুব উৎসবের আয়োজন করা। প্রতি ২ বছর অন্তর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ভারতে এই উৎসব বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। প্রায় সব প্রদেশেই বিশ্ব যুব উৎসবের প্রাক্কালে যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হত। অবশ্য পশ্চিমবাংলার যুব উৎসবের আসর বসত ইডেন উদ্যানের মাঠে ও স্টেডিয়ামে। এটিই হত সর্বাপেক্ষা বড় ও বর্ণাঢ্য উৎসব। বহু সাংস্কৃতিক প্রতিভাকে শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষের সামনে নয়, সারা বিশ্বেও পরিচিত হতে সাহায্য করেছে। তবে এমন কোন রাজ্য ছিল না যেখানে যুব-ছাত্র উৎসব ছাত্রদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা বৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেনি।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ১৯৬২ সালের দুর্ভাগ্যজনক চীন-ভারত সীমানা বিরোধজনিত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নিয়মিত তাদের ছাত্র-যুব প্রতিনিধি ভারতে এসেছে, এখানকার ছাত্র-যুব আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হতে ও সহমর্মিতা জানাতে। যাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাদের নাম উল্লেখ করছি। যেমন জ্যাক ভার্গিস I.U.S. ছাত্রদের সাহায্য ও Self Help আন্দোলন গড়ে তোলার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অন্যতম সেক্রেটারী, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জ্যাক দানি, আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জিরি পেলি ক্যান, আর্থার পাইক এই অস্ট্রেলীয় ছাত্র নেতা আসেন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল সভায় যেগে দিতে। আর্থার পাইক শান্তিনিকেতনে গেলে তখনকার কিছু ছাত্র অধ্যাপক আর্থার পাইককে ছাত্রদের সঙ্গে সভা করতে দিতে বাধা দেন। কারণ আর্থার পাইক নাকি কমিউনিস্ট। আর্থার পাইকের সঙ্গে ছিল তৎকালীন প্রদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল সেন। সুনীল নিজে শান্তিনিকেতনের দীর্ঘদিনের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রদের সামনে যখন প্রশ্ন রাখা হল সে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভৌগোলিক সীমানার গণ্ডী অতিক্রম করে সকলের মিলনক্ষেত্র রূপে, সেইখানে একজন বিদেশী ছাত্রকে কমিউনিস্ট বলে বর্জন করতে উস্কানী দেওয়া হচ্ছে, এ কেমন কথা। রবীন্দ্রনাথের কমিউনিস্ট বিরোধী বিকার ছিল বলে তো জানা যায় না। যাই হোক ছাত্রদের শুভবুদ্ধির কাছে ঐ বাধা কার্যকরী হল না। ছাত্রছাত্রীরা বিরাট সভায় আর্থার পাইককে সম্বর্দ্ধনা জানাল। শুনল আই.ইউ.এস.-এর কথা, অস্ট্রেলিয়ার ছাত্রদের কথা। যারা বাধা দিয়েছিলেন, তারা আজ আর কেউই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িত নয়। কেউ মৃত, কেউ কেউ হয়ত ঐখানে অবসরপ্রাপ্ত জীবনযাপন করছেন। তাই সেই নামের উল্লেখ করে অতীতের সেই তিক্ততা স্মরণ না করাই ভাল। এসেছিলেন বুলগেরিয়ার ছাত্রনেতা আলেকজাণ্ডার ইয়াকভ, নাইজেরিয়ার আদিমোলো টমাস, জাপানের তানাকা, ইলিকাটা (জাপানের সোসালিস্ট ছাত্র নেতা), ইরানের সাদাতি বাবাক, ইরাকের নূরী ও অন্যজনের নাম পাওয়া যায় নি, কানাডার স্ট্রীভ এণ্ডিকট, বিশ্ব

গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সভাপতি বুনো বার্নেনী প্রমুখ। এরা সকলেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গেছেন। সেখানে কেবল ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী বা ডাকা সভায় উপস্থিত হননি, তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। মতামতের আদান প্রদান করেছেন। একত্রে কাজ করার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি সর্বত্র ছাত্রদের নিজ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা স্বাবলম্বী আন্দোলনকে যার মধ্যে কলকাতার Students Health Home প্রধান—আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভে প্রভৃত সাহায্য করেছেন। ভারতের ছাত্র আন্দোলন কখনই আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও তার প্রেরিত প্রতিনিধিদের অকুন্ঠ সমর্থন, সাহায্য কখনও অস্বীকার করতে পারে না। করার চেষ্টা ছাত্র আন্দোলনের মর্যাদা বর্দ্ধিত করছে না, বরং সে চেষ্টা অসুস্থতারই লক্ষণ বলাই বাহুল্য।

সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের ক্রমবৃদ্ধি

দেশের দারিদ্র বেকারী, অশিক্ষা দূরীকরণে সরকারের অসাফল্য ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক দুর্নীতি ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, সেই সঙ্গে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির চরম সংকীর্ণতা সংগঠনের স্বাধীন গণতান্ত্রিক বিকাশে চরম বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবার ফলে নানা রাজ্যে ও সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন শক্তিশালী হতে শুরু করে।

জনসংঘের ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এরা বিশেষ ভূমিকা নেয়। কিন্তু এদের প্রচার ও লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর। এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তো নয়ই, এমন কি পাকিস্তানের শাসকদের অপেক্ষা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই তাদের আক্রমণ ছিল প্রধান। আসল লক্ষ্য হয়েছিল ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিরুদ্ধে জেহাদ। তারপর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনে ওদের ভূমিকা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৫৯ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ এক বিশেষ দিকে মোড় নেয়। কঙ্কা গিরিপথে (Kanka Pass) ৯ জন ভারতীয় জোয়ান চীনা সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ হারায়। তারপর ১৯৬২তে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, ১৯৬৫তে পাক ভারত যুদ্ধ।এই সমস্ত জাতীয় সমস্যার সময় এরা একটি ভূমিকাই গ্রহণ করেছে— তার দুটি দিক চূড়ান্ত কমিউনিস্ট বিদ্বেষের প্রচার, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ছাড়া আর কোন কথা ছিল না। এদের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল কারিয়াপ্পা। জেনারেল কারিয়াপ্পা সাহেব দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে যুবকদের মধ্যে 'দেশপ্রেম' জাগানোর মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ১৯৫৯ সালে জেনারেল এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের সভা করতে চীন-ভারত বিরোধের পটভূমিকায়। তার বক্তৃতায় তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের 'প্রকৃত দেশপ্রেমের' অম্লান প্রদর্শনীর জন্য কমিউনিস্টদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে এনে চরম শিক্ষা অর্থাৎ হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কায়দায় কমিউনিস্ট নিধনের ব্যবস্থা করে প্রকৃত দেশপ্রেম দেখবার আহ্বান জানালেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ কিন্তু এই 'মহার্ঘ উপদেশে' সায় দিয়ে কারিয়াপ্পাজীকে বাধিত করেনি। তার এই অমানবিক অসুস্থ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকলে ওকে সভা শেষ না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ

করে চলে যেতে হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সেদিনকার সত্যকারের দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনায় ছাত্র ফেডারেশনের যে সব কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের নাম স্মরণে নেই। একটি নাম মনে আছে, তার নাম সুমিত চক্রবর্তী, Main Stream পত্রিকায় তারই পিতা শ্রী নিখিল চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পাদনায় কর্মরত ছিলেন।

কেরলে কমিউনিস্ট সরকারের নতুন শিক্ষানীতি

১৯৫৭ সালে ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ভারতের দক্ষিণতম রাজ্য কেরলে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করল। ৫ই এপ্রিল কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রথমেই শিক্ষা সংস্কারের কাজে হাত লাগাল। কারণ খ্রিস্টান মিশনারী, নায়ার সার্ভিস সোসাইটির দাপটে শিক্ষা যে কেবল তাদের কুক্ষিগত তাই নয়, একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার, তারই সঙ্গে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে কোন কিছুই নেই। ঠিক যেমন ছাত্রদের দিতে হত মাত্রাধিক বেতন, তেমনি ছিল শিক্ষকদের মাত্রাহীন নিম্ন বেতন।

ক্ষমতাসীন কেরল সরকার প্রথমেই শিক্ষা সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। তাদের প্রথম বাজেটেই (ক) রাজ্যের ৬৫,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, (খ) শিক্ষকদের জন্য পেনসন প্রথা চালু করা, (গ) সমগ্র রাজ্যে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা, (ঘ) স্কুলের দবিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা (tiffin), (ঙ) শিক্ষকদের জন্য গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে দু'লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

এছাড়াও ঐ বছরের ৫ই আগস্ট রাজ্যের বে-সরকারি কলেজ সমূহে অধ্যাপক, লেকচারার এবং সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের বেতনের হার নির্দিষ্ট করে কলেজগুলিতে নির্দেশনামা পাঠাল। এর ফলে কলেজগুলিতে যে ঘাটতি হবে তার দুই-তৃতীয়াংশ বহন করার দায়িত্ব কেরল সরকার গ্রহণ করল। নির্দেশনামায় অধ্যাপকদের বেতনের হার ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, লেকচারারদের ও সরকারি অধ্যাপকদের বেতনের হার ১৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা এবং ভাষা সংক্রান্ত বিভাগের লেকচারারদের বেতন ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। এই সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য হারে অধ্যাপকদের মহার্ঘভাতা দেবার ব্যবস্থা করা।

নুতন শিক্ষাবর্ষে ১১,০০০ স্কুলে স্থানাভাব দেখা দিলে সরকার নিজে ২৭টি স্কুল চালু করার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ জারি করলেন যে কোন অজুহাতেই ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রকে ফেরান চলবে না। তার জন্য স্কুলগুলিকে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান করার জন্য অস্থায়ী আচ্ছাদিত কাঠামো তুলে ক্লাস চালাবার নির্দেশ ও অনুমোদন দেওয়া হলো।

সরকার কেরলে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন ও বন্টনের কাজকে সরকারি আওতায় এনে পাঠ্যপুস্তকের দাম কমালো। সর্বশেষে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, মিশনারী ও নায়ার সার্ভিস সোসাইটির দুর্নীতিপূর্ণ একচেটিয়া স্কুল, কলেজের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য সমস্ত স্কুল-কলেজকে একটা সুনির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম ও কর্তৃত্বের আওতায় আনার জন্য বিল আনলেন।

কেরল রাজ্য গঠনের পর থেকেই ছাত্র ফেডারেশন ও অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলি এইসব দাবির ভিত্তিতে বহু আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, নানাভাবে সরকারি দমননীতির শিকার হয়েছেন। লাঠি-গুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। অগণিত ছাত্র কর্মী ও

নেতা কারাবরণ করেছেন। স্কুল-কলেজ থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছেন। সবশেষে কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের নতুন শিক্ষা নীতিতে তাদের জয় সূচিত হল। ফলে ছাত্র ফেডারেশন সহ ছাত্রদের প্রগতিশীল অংশ ঐ সরকারকে সমর্থন জানল। কিন্তু শিক্ষা জগতের কায়েমী স্বার্থ তাদের ব্যবসা ও কর্তৃত্ব নষ্ট হতে বসেছে দেখে মরীয়া হয়ে উঠল আরো। তারা সরকার বিরোধী জিগির তোলার জন্য প্রথমে একটি অতি তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করল।

কেরলের কমিউনিস্ট সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরে জলপথ চলাচল ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৌকায় যাতায়াতকারি ছাত্রদের তাদের চলতি ভাড়ার অর্ধেক দিতে হবে। এর ফলে সাধারণভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়ার ভাড়া পড়বে মাত্র এক আনা। সামান্য সংখ্যক ছাত্ররা বহু দূর থেকে আসবে তাদের দেও ভাড়া পড়বে ছয় পয়সার মত। এই অবস্থায় একটি মিশনারী স্কুলের ৪০০ ছাত্রর আরও সুবিধার দাবি করা হল এই দাবির পিছনে যারা সমর্থন ও তথাকথিত ছাত্র বিক্ষোভ তৈরি করতে সাহায্য দিলেন তারা কোন দায়িত্বশীল ছাত্র সংগঠন নয় — প্রধানত ক্যাথলিক মিশনারীরা ও তাদের প্রভাবিত ও পরিচালিত খ্রিস্টান ছাত্র সংগঠন।

ছাত্রদের এই আন্দোলন সম্পর্কে কেরলের বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সর্বোদয় নেতা ও ভূতপূর্ব কংগ্রেস নেতা শ্রীকে কেলাপ্পনের তৎকালীন বিবৃতি উদ্ধৃত করলেই এই আন্দোলনের আসল চেহারা ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি তার বিবৃতিতে বললেন— "সরকার সমগ্র রাজ্যের ছাত্রদের জন্য নৌকার ভাড়া অর্ধেক দেবার সুবিধা দান করেছেন। সেক্ষেত্রে একমাত্র পুল্লিকুপ্পুর স্কুলের ছাত্ররা পূর্বের বোট মালিকদের কাছ থেকে বিশেষ কারণে যে সুবিধা লাভ করত তা বজায় রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাদের (ছাত্রদের) দাবি এমন কোন বিশেষ সঙ্গত দাবি নয় যা রাজ্যের সমস্ত ছাত্রের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।" তিনি প্রশ্ন করেন, "এই দাবির জন্য রাজ্যব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভ সৃষ্টির কি কোন আবশ্যকতা আছে? আরও লক্ষণীয় যে সমস্ত মিশনারী কর্তৃপক্ষ সব সময়ই ছাত্রদের যে কোন প্রকার আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন তারাই এখন ছাত্রদের উত্তেজিত করছেন।"

এই দাবিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানো হল, কিন্তু বড় কিছু করা সম্ভব হল না। কারণ দাবি যতই তুচ্ছ ও অসঙ্গত হোক না কেন কেরল সরকার প্রথম থেকেই সুবিবেচনার আশ্বাস দেন ও সর্বোপরি মাত্র ৪০০ ছাত্রের দাবি হলেও, সমস্ত ঘটনা, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করলেন ও তদন্ত চলাকালীন সময়ে ঐ ছাত্রদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিলেন। সাময়িকভাবে হলেও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র একটু অসুবিধা ও বিপদে পড়লেন। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য—যে কোন প্রকারে কেরলের এই প্রগতিশীল জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটানোটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তা ধরা পড়ল যখন তারা সরকারের প্রগতিশীল শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সরকারের পতনের জন্য তথাকথিত বিমোচন আন্দোলনের ডাক দিলেন। ক্যাথলিক মিশনারীদের সঙ্গে যোগ দিল পদ্মনাভনের নেতৃত্বে নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, ধর্ম ও নায়ার জাতের নামে এরা ছাত্রদের উত্তেজিত করল। খ্রিস্টান ছাত্র-যুবদের নিয়ে গঠিত হল আধা-সামরিক খ্রিস্টান বাহিনী। এদেরই নেতৃত্বে যতরকম ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটানো হল। এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে দিল্লি থেকে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধী পরোক্ষ সমর্থন জানাতে লাগলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহরুকে ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনা জানাতে

প্রতিনিধিদল দিল্লিতে দেখা করে স্মারকলিপি দিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্মারকলিপি নিলেন ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে লাগলেন ও আলোচনার মধ্যেই বিদ্রূপবাত্মক মন্তব্য করলেন 'তা হলে ছাত্র ফেডারেশন বলছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করা উচিত নয়।' যাই হোক কোন ফল হল না। কেরলে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার অজুহাতে কেরল সরকার বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হল। প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ও তাদের আন্দোলন একটা বড় রকমের জয়লাভ করল।

কেরল প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন এই ধাক্কা সামলে পরবর্তী সময় আবার নিজেদের অনেকখানি সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে পেরেছে। যা কিন্তু সম্ভব হয়নি আসামসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে, সম্ভব হয়নি পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির কোথাও।

প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা

আসামের কোন কোন অঞ্চলে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ছাত্র ফেডারেশন বেশ শক্তিশালী থাকলেও স্বাধীনতার পর আসামে একদিকে প্রগতিশীল আন্দোলনের দুর্বল বিকাশ এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসামের অনগ্রসরতা 'আসামীদের জন্য আসাম' এই প্রতিক্রিয়াশীল Slogan ক্রমান্বয়ে অসমীয়াদের প্রভাবিত করেছে। এর সঙ্গে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে দেশ বিভাগের ফলে আসাম সংলগ্ন পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তুদের আগমনে। '৫৪ সালের বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনে ছাত্রদের ন্যক্কারজনক ভূমিকা সকলেই জানে। তথাপি তখন পর্যন্ত এরা কোন সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে আসাম ছাত্র ইউনিয়নের (আসু) জন্ম ও শক্তিশালী হওয়া এবং তার বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ আমাদের অজানা নয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে 'আবাসু' আসামের বাঙ্গালি ছাত্র ইউনিয়ন, বরাক উপত্যকায় বোড়ো ছাত্র ইউনিয়ন, নাগাল্যাণ্ডে নাগা ছাত্র ইউনিয়ন, মিজোরামে মিজো ছাত্রদের আলাদা আলাদা বহু সংগঠন। যাদের পিছনে নানাধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সংস্থা, সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা কাজ করছে, সেটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। মহারাষ্ট্রে R.S.S., শিবসেনার প্রভাব মহারাষ্ট্রের ছাত্রদের উপর বলা চলে সর্বগ্রাসী ও সর্বাত্মক। এরা হিন্দু রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তির ধারক ও বাহক। পাঞ্জাবের অখিল ভারত শিখ ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত। মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, উত্তরপ্রদেশে বিদ্যার্থী পরিষদের দাপট কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সর্বোপরি ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে কার কতখানি দায়িত্ব, তার বিচার না করেও বলা যায় হিমালয়ের ওপার থেকে সমাজতন্ত্রের যে জোরালো বাতাস ভারতে প্রবাহিত হচ্ছিল, সেই প্রবাহে ছেদ পড়ল। কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করার হাতিয়ার পেল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এরই পাশাপাশি কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনে ভাঙ্গন ও বিভেদ প্রগতিশীল ছাত্রদের মধ্যে অনৈক্য তীব্র করেছে। ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি-বিমুখতা বেড়েছে। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক চেতনা ও বাতাবরণে ছাত্রদের স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ার পরিবর্তে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একটি করে ছাত্র সংগঠনের পকেট সংস্করণ চাওয়ার ফলে রাজনৈতিক দলের

সংকীর্ণ স্বার্থে তাদের ইঙ্গিতে পুতুল নাচের ভূমিকা ছাড়া তার আর কোন ভূমিকা প্রায় অবলুপ্ত। ৬০ এর দশকের শুরু থেকেই এটা আরও প্রকট হতে শুরু করে। ৬২ সালেই এই পরিণতির দিকে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের যাত্রা শুরু বলা যায়।

বিভিন্ন প্রদেশের তৎকালীন ছাত্রনেতৃবৃন্দ

স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে ও স্বাধীনতার পরে পরেই এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র নেতারা ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছে তাদের উল্লেখ এখানে পূর্বেই করে রাখছি। কারণ ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলী উপস্থাপিত করার সময় তাদের নাম সবসময় করা সম্ভব হবে না।

১৯৩৯, ৪০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে যারা ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে স্বাধীনতা লাভ করা ও তার অব্যবহতি পর পর্যন্ত যেসব ছাত্র নেতারা এবং ৬২ সাল পর্যন্ত যারা নেতৃত্বে ছিলেন— তাদের সব না হলেও কিছু নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন।

১৯৩৬ সালে যখন সারা ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার **প্রথম** সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হল প্রেমনারায়ণ ভার্গব ও **দ্বিতীয়** সম্মেলনে আনসার হারভানী। **তৃতীয়** সাধারণ সম্পাদক হল এম. এল. সাহা। তারপর সংগঠন ভাঙ্গলে একদিকে জাহিদি, অন্যদিকে এম. এ. ফারুক্কী। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য সাধারণ সম্পাদক আনসার হারভানীকে বাদ দিলে যারা কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা আবার নিজেদেব প্রদেশের নেতা ছিলেন (দ্বিতীয় সম্মেলন থেকে নির্বাচিত)।

যুগ্ম-সম্পাদক যাঁরা নির্বাচিত হন :

যোগ্যদত্ত শর্মা — দিল্লি (কমিউনিস্ট)
ললিতশঙ্কর — C. P. (সেন্টাল প্রভিন্স — মধ্যভারত)
অনন্ত পট্টনায়ক — উড়িষ্যা
এম বাসব পুন্নাইয়া — অন্ধ্র (কমিউনিস্ট)

ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরা :

মিস শান্তা গান্ধী — বোম্বাই (কমিউনিস্ট সমর্থক)
প্রবোধচন্দ্র — পাঞ্জাব (কমিউনিস্ট সমর্থক)
ভগওয়ান্ত রাই — পাঞ্জাব (কমিউনিস্ট সমর্থক)
এম. এল. সাহা — বোম্বাই
প্রেমনারায়ণ ভার্গব — উত্তরপ্রদেশ
এম. এ. হামিদবেগ — মাদ্রাজ
ওয়াই. আর. কে. প্রসাদ — মাদ্রাজ
বৈদ্যনাথ রথ — উড়িষ্যা (কমিউনিস্ট সমর্থক)
দীনেশ চৌধুরী — আসাম
ইনসাই মাধা — দিল্লি
আমীর চাঁদ — পাঞ্জাব

প্রমোদ সেন — বাংলা
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় — বাংলা (কমিউনিস্ট সমর্থক)
বিশ্বনাথ দুবে — বাংলা (কমিউনিস্ট সমর্থক)
এম. কে. গুপ্ত — উত্তরপ্রদেশ
দেওনন্দন সাহী — (C. P.)

প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় স্তরে '৪০ সাল ও পরবর্তী সময়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন— বাংলাদেশে : অবনী লাহিড়ী, শঙ্কর রায়চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুধীর ভট্টাচার্য, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই গাঙ্গুলী, নন্দ বসু, সাধন গুপ্ত, অমিয় দাশগুপ্ত, কমলাপতি রায়। মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে অরুণ সেন, অমলেন্দু বসু (স্বরাজ বসু), নৃপেন সেন, কৌস্তভ মুখার্জী, আবীরলাল মুখার্জী, গৌরী দত্ত, দীপক চন্দ, সুবীর দাশগুপ্ত, হৈমী বসু, ভবানী রায়চৌধুরী প্রমুখ।

ছাত্রীদের মধ্যে গীতা মুখার্জী, কনক মুখোপাধ্যায়, অলকা মজুমদার (চট্টোপাধ্যায়), মুকুল রায়চৌধুরী, স্নিগ্ধা দত্ত, অংশুলা দত্ত, আরতী পাকড়াসী, আরতী দাশগুপ্ত, আরতী রায়, ছায়া সরকার, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা মুখোপাধ্যায় (বসু), খেলা রায়, সুজাতা সেন, কিটি বিমলা, বিমলা ভাকেয়া।

পঞ্চাশের দশকে যাঁরা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে নেতৃত্বে ছিলেন

নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, সরোজ হাজরা, কমল চ্যাটার্জী, সুখেন্দু মজুমদার, হীরেন দাশগুপ্ত, সুধাংশু চৌধুরী, সুনীল ঘোষ, সুনীল সেন (বীরভূম), কুমকুম মুখার্জী, অশোক মুখার্জী, বেণী বরাট, প্রভাত রায়চৌধুরী, চিত্ত গুহ, প্রবোধ রায়, দীনেশ মজুমদার, হরিনারায়ণ অধিকারী, প্রবীর রায়চৌধুরী, ভবতোষ রায়, গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, নিতাই বসু, বীরেশ্বর ঘোষ, গোবিন্দ ব্যানার্জী, পশুপতি চ্যাটার্জী, জগৎপতি রায়, শঙ্কর রায়, নুরুল হুদা, মতি সরকার, ইমাম হোসেন, অশোক মুখোপাধ্যায়, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ ঘোষদস্তিদার, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রঞ্জন বিশ্বাস, উষা গাঙ্গুলী, অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষ চক্রবর্তী, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান বসু, শ্যামল চক্রবর্তী, বিপ্লব দাশগুপ্ত, কমলেন্দু ঘোষ, প্রতুল লাহিড়ী, সোমেশ হোমচৌধুরী, অজিত লাহিড়ী, বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, বানীন রায়, রনজয় রায়, চিত্ত বসু, নির্মল বসু, শ্যামল গাঙ্গুলী, প্রবীর স্যাণ্ডেল, শ্যামল ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সেন, কল্যাণ দাশগুপ্ত, সুবোধ সেন, সুনীল সেন, আরতী দাশগুপ্ত, অঞ্জলি রায়, রীতা রায়, অশোক ধর, ইলা বসু, রুদ্রপ্রসাদ সেন, স্বপ্না দেব, পার্থ সেনগুপ্ত, দেবু ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, জ্ঞান মৈত্র, দিলীপ ঘোষাল, পল্টু দাশগুপ্ত, কমল গাঙ্গুলী, কমলেশ্বর গুপ্ত, ব্যোমকেশ রায়, তেজারত হোসেন, হাবিব, সমর সেন, রেখা, জয়া মুখার্জী, সুনন্দা, শ্যামল রায়, নিরঞ্জন মুখার্জী, তুষার চ্যাটার্জী, পল্লব সেনগুপ্ত, ওঙ্কার চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, অরুণ গুহ, বিমল মুখার্জী, ধ্রুব বসু, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি ব্যানার্জী, দিলীপ বসু, অমল সেন, পঞ্চানন চ্যাটার্জী, প্রিয়ব্রত, সুখেন্দু, জ্যোতি চ্যাটার্জী, রণদেব মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন দেওয়ান, হরিকিঙ্কর মুখার্জী, অরুণোদয় গুহ, পার্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা ভট্টাচার্য প্রমুখেরা।

পঞ্চাশের দশকে অন্যান্য রাজ্যের নেতৃত্ব

পাঞ্জাব — সত্যপাল ডাং, বলরাজ মেহতা, ওমপ্রকাশ সবরওয়াল, প্রেম সিং, জোগিন্দর সিং, জোগিন্দর সিং (টাইগার)।

উত্তরপ্রদেশ — রমেশ সিনহা, কালিপ্রসাদ শুক্লা, রবি সিনহা, রাম আগ্রে, রুস্তম সাটিন, ইকবাল নিয়াজী, সুলতান নিয়াজী, আবতার নিয়াজী, কৈলাস আনন্দ, রবীন, আতিয়া বানু, নফিজ বানু, কৃষ্ণচন্দ্র দুবে, ও. পি. মালহোত্রা, ইরফান হাবিব, ইকতেদার আলম, জাভেদ আসরফ, ভি. এস. নটিয়াল।

রাজস্থান — এই. কে. ব্যাস, মোহন পুনামিয়া, সুমের সিং।

সেন্ট্রাল প্রভিন্স — এ. বি. বর্ধন।

বোম্বাই — এন. বাটলিওয়ালা, ঘানেকার, সুশীলা মেডিমেন।

মাদ্রাজ — কুপ্পুস্বামী

কেরল — চন্দ্রাপ্পান, এ. কে. এন্টনী।

অন্ধ্র — এস. আর. রামানী, নারান রাও, নরসিং রাও, বসির আহম্মদ, সুধাকর রেড্ডী, তলপদ রাও।

উড়িষ্যা — শিবাজী পট্টনায়েক, প্রবীর পালিত, দময়ন্তি পানী, শৈলদেবী, বসন্ত, ভারতী মিশ্র।

তথ্যসূত্র :

১। সংগৃহীত দলিল থেকে
২। ঐ
৩। ঐ
৪। ঐ
৫। ঐ
৬। ঐ
৭। ঐ
৮। ঐ
৯। ঐ
১০। ১৯৩৫ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসে ডিমিট্রভের ভাষণ থেকে
১১। ১৯৩০ ও ২৭শে নভেম্বর রোঁম্যা রোঁলার আবেদন থেকে
১২। সংগৃহীত দলিল থেকে
১৩। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দলিল
১৪। সূত্র ব্রাকেটে উল্লেখ আছে
১৫। ঐ
১৬। ১৯৪৫-এর ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকার সংখ্যায়
১৭। সূত্র দেওয়া আছে
১৮। ঐ
১৯। ঐ
২০। ঐ
২১। ঐ
২২। সরকারি দলিল দ্রষ্টব্য
২৩। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট M.P. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "তরী হতে তীর" পুস্তক থেকে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপমহাদেশের অন্যান্য ছাত্র আন্দোলন

ভারতের ১৯৬০-উত্তরকালের ছাত্র-যুব আন্দোলনের পটভূমি

ভারতের ষাটের দশক কিংবা, ১৯৬০-উত্তর ছাত্র-যুব আন্দোলনের পটভূমি ঘটনাবহুল। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে এই পটভূমি আবর্তিত ও রচিত। পূর্ব-পশ্চিমের এবং উত্তর-দক্ষিণের গোলার্ধ চতুষ্টয়ের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিগত প্রভাব উক্ত পটভূমির সাথে যুক্ত। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম বিশাল আয়তন যুক্ত দেশ ভারত। ভৌগোলিক এবং ইতিহাসগত বিচারে উপমহাদেশ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের বিভক্তি পরবর্তী ভারতের আয়তন আকৃতি এ উপমহাদেশগত বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি। বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছাত্র-যুব সমাজ এবং যাঁদের জীবন-যৌবন-তারুণ্য দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

ভারতের ছাত্র-যুব সমাজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল, তার উত্তরাধিকার দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত। ষাটের দশক কিংবা ১৯৬০-উত্তরকালে এই প্রতিফলন আরও ব্যাপক প্রলম্বিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতের ছাত্র-যুব সমাজের আন্দোলনের একটি স্বকীয়তা ছিল। স্বাধীন ভারতে সে স্বকীয়তা বজায় থাকে। উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিন্যাসকেন্দ্রিক ভারতের ছাত্র যুব আন্দোলনও হলো বহুমুখী। ১৯৬০ সাল থেকে তা ব্যাপক, প্রবল ও প্রকট। নিজস্ব আন্দোলনগত স্বাতন্ত্রতা নিয়েই বহুমুখে বিকশিত। কখনো দুর্বার গতিবেগ সম্পন্ন, কখনো স্তব্ধ-গতিরুদ্ধ কিংবা সর্পিল। বিষয়গত এবং বস্তুগতভাবে বক্র, ডানে ও বাঁয়ে আন্দোলিত। সংক্ষেপে যার অন্বেষা ইতিহাসের দায়বদ্ধতা।

ভারতের ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগত চরিত্র সাধারণভাবে তিন প্রকৃতির। বামপন্থার [Left wing] অনুগামী, দক্ষিণপন্থার অনুগামী [Right wing] এবং সংস্কার পন্থার [Radical] অনুগামী।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময থেকেই ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলন, বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলন বামপন্থার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে রয়েছে। কমিউনিস্ট, স্যোস্যালিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাটিকদের প্রাধান্য বামপন্থার অনুগামীদের মধ্যে বেশি। দক্ষিণপন্থার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বাদীদের প্রাধান্য। উগ্রজাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী এবং শ্রেণী সমন্বয়বাদী আপোশকামীদের সমন্বয়ে সংস্কার পন্থার অনুগামীদের জোট। কিন্তু সংস্কার পন্থা অথবা Radicalism-এর অস্তিত্ব সব ধারার অনুগামীদের মধ্যে কমবেশি বিদ্যমান।

ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্যগত চরিত্র অনুসারে ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের এক গতানুগতিকতা চলে এসেছিল ছাত্র আন্দোলনে।

শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সংস্কারমূলক দাবি এবং সমস্যাকে কেন্দ্র করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশের সমস্যাসংকুল রাজনৈতিক আবর্ত থেকে ছাত্রসমাজের আন্দোলনের দূরত্ব বাড়ছিল। যুব সমাজের আন্দোলন তার চলার পথে হারিয়ে সংকুচিত হয়ে আসছিল।

এমনই এক গতানুগতিক স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশের ছাত্র-যুব আন্দোলনে ১৯৬০-উত্তরকালে এক পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে এবং পরে সারা দেশ জুড়ে এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।

দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে গতানুগতিক পদ্ধতি ভঙ্গকারি পরিবর্তিত এই ছাত্র-যুব আন্দোলন জড়িত হয়। কোন কোন অঞ্চলে রাজ্য সরকার পরিবর্তনে, কোয়ালিশন সরকার গঠনে পরিবর্তিত ছাত্র-যুব আন্দোলনের প্রভাব ও ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ১৯৬০-উত্তরকালের ছাত্র-যুব আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে ভারতের বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিসমূহ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত, আন্দোলিত হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বামপন্থা অনুগামী ছাত্র-যুব আন্দোলনের তরঙ্গসংকুল আঘাত এবং ছাপ ছিল প্রচণ্ড।

এই প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন ছাত্র-যুব আন্দোলন কখনো নিয়মতান্ত্রিক, কখনো বিপ্লবী ভাবাবেগে টৈটম্বুর, কখনো অতি উগ্র-চরমপন্থী [extremist], কখনো প্রতিক্রিয়ার গর্ভে নিক্ষিপ্ত, কখনো অনৈক্যের চোরাবালিতে আত্মগোপন ও বিলুপ্তির পথে, কখনো বিপথগামী।

১৯৬০ সালের পরবর্তী ছাত্র-যুব আন্দোলনে এই পরিবর্তনগুলি কেন সূচিত হল? পরিবর্তনের উপাদানগত বৈশিষ্ট্য কি ছিল? ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্কগুলি কি? কি কি প্রভাব এবং মানসিকতা ছাত্র-যুব মানসে কার্যকরী ছিল? এইসব প্রশ্ন এবং বিষয়গুলির গুরুত্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক মূল্যবহ। ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে হলে এই প্রশ্ন ও বিষয়গুলির অন্বেষা বাঞ্ছনীয়—

(১) পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন; (২) পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ছাত্র-যুব আন্দোলন; (৩) ভারতের তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ; (৪) পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের ষাটের দশকের ছাত্র বিদ্রোহ-এর ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলেখ্য—ভারতের ১৯৬০ পরবর্তী ছাত্র-যুব আন্দোলনের ইতিহাস উত্থাপনায় সহায়ক। কারণ, সংশ্লিষ্ট বিবরণ-লক্ষ্যে এমন সব ঘটনা ও উপাদানের সমাবেশ আছে, যা ভারতের প্রধান প্রধান ধারার ছাত্র আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সম্পৃক্ত ও প্রভাবযুক্ত। স্বৈরাচারী শাসন এবং কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানো, সরকারের [Government] পরিবর্তন সাধন, রাজনৈতিক দলের ভাঙা-গড়ায় যুক্ত হওয়া. কোয়ালিশন রাজনীতি বা ফ্রন্ট-মোর্চা ও কোয়ালিশন সরকার গঠনে চাপ সৃষ্টি ও প্রভাব বিস্তার, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামে সংগ্রামীর সহায়ক ভূমিকা পালন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, বিপ্লবী-সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রেরণা, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ, চরমপন্থার অনুসরণ প্রভৃতি অনেক বিষয় পূর্ব-পাকিস্তান, (বাংলাদেশ), ভারতের প্রতিবেশী দেশ সমূহের এবং পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশের ছাত্র-যুব আন্দোলনে এবং তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ লক্ষ্যে পাওয়া যাবে। যা আবার ভারতের ১৯৬০-উত্তরকালে কিংবা ষাটের দশকের ছাত্র-যুব আন্দোলনের পটভূমিও বটে।

তাই, অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে পূর্ব-পাকিস্তান, বাংলাদেশের ভাষা ও ছাত্র-যুব

আন্দোলন, পাকিস্তান-ব্রহ্মদেশ-সিংহলের ছাত্র আন্দোলন, তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ, পশ্চিমী দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ছাত্র বিদ্রোহের ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ বিবৃত করা হল।

পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন

স্বাধীন ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তে ১৯৭১-এর সময়ের পূর্ব-পাকিস্তান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের-ই একটি অংশ ছিল। ১৯৭১-এ পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ দুনিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতি এবং বিজয় অর্জন পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রী সামরিক স্বৈরশাসন থেকে পূর্ব -পাকিস্তানের জনগণকে মুক্ত করেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রূপান্তরের অতিক্রান্তিকালীন সময় এবং ঘটনাবলী ঐতিহাসিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পটভূমিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান ছিল, তার মধ্যে তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কৃতির আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন বিশেষ করে এককভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলন অর্থে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা এবং আরও নতুন নতুন অধিকার অর্জনের আন্দোলনকেই বোঝায়। পূর্ব-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এই শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের-ই অঙ্গ। এই শিক্ষা সংস্কৃতির আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের ঐ পূর্ব-অংশের ছাত্র-যুব তথা ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা ভাষা আন্দোলন এবং ছাত্র-যুব আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব ও আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারতের ছাত্র আন্দোলনের পটভূমির অন্তরালে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলীর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করার জন্য যতরকম ষড়যন্ত্র করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'বঙ্গভঙ্গ'-এর সিদ্ধান্ত। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ শাসকরা বঙ্গভঙ্গ করেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রবল আন্দোলনের চাপে যা কার্যকরী করতে পারেনি। তা কার্যকরী হল ভারতবর্ষ দ্বি-খণ্ডিত করার রেডক্লিফ রোয়েদাদে। স্বাধীনতা অর্জনের নামে ভারতবর্ষ দ্বি-খণ্ডিত। একই ভাষায় যে মানুষেরা কথা বলেন, যে মানুষজনের শিক্ষা-সংস্কৃতি একই পারিপার্শ্বিক ছত্রছায়ায় কয়েকশত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে, সেই মানুষজনের ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল দেশভাগের সময়। ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির দ্বারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একই ভাষাভাষি মানুষের প্রদেশ বাংলা প্রদেশ [Bengal Province] এবং পাঞ্জাব প্রদেশকে [Punjab Province] ভাগ করেছিল, এবং সন্তুষ্টি বিধান করেছিল দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাজদের। এইভাবে জাতীয়

মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় থেকে চলে আসা স্বাধীনতা সংগ্রাম ৯০ বৎসরের মাথায় লাভ করলো একটি উপমহাদেশ সদৃশ বিশাল প্রাচীন দেশকে ভাগ করে দুটি খণ্ডিত রাষ্ট্র-ভারত এবং পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দুইটি অংশ, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল প্রায় ১,০০০ মাইলের উপর, আকাশপথ এবং জলপথ ছাড়া সরাসরি স্থলপথে পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। ভৌগোলিক দিক থেকে এরকম এক অসুবিধাজনক অবস্থানে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সত্ত্বেও জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তান সবদিক থেকে ছিল অবহেলিত। পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের বাস। পুস্তু, বেলুচ, পাঞ্জা, সিন্ধি প্রভৃতি ভাষার জনগোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী প্রায় সকল মানুষই বাংলা ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। পূর্ব অংশের মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সকল মানুষই বাঙালি বলে পরিচিত। পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-পাকিস্তানকে চাপের মুখে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামগ্রিকভাবে বাঙালি শিক্ষা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক শক্তির উপর আঘাত হানার চক্রান্ত করেছিলেন পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার প্রজন্মের ছাত্র-যুবদের ভাষা-শিক্ষাগত চিন্তা-চেতনার গতিমুখকে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রানুগ করার প্রচেষ্টা ছিল এই চক্রান্তের অঙ্গ। সেইজন্যই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তের আড়ালে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সুকৌশলে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু এই কৌশলী চক্রান্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রবল প্রতিরোধে বানচাল হয়ে যায়। এই প্রবল জনপ্রতিরোধ-ই হলো পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ এবং তাঁদের ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব শুধু আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গেই নয়, দেশে-বিদেশেও ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই, এই সম্পর্কিত ইতিহাসের অঙ্গীভূত কিছু বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলাভ এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৪ মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরের প্রথমদিকে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে সরকারি ও শিক্ষার ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সরব হতে শুরু করে। ১৯৪৭-এর ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রতিবাদ সভাকে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'সাতচল্লিশের ডিসেম্বর' থেকে 'আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারি' পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভাষা

আন্দোলনের এই স্তরে আন্দোলনের ফরম বা কর্মসূচি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, আইনসভা-সরকারি দপ্তর ঘেরাও, সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি। আন্দোলন দমনের জন্য সরকারি দমননীতিও ছিল ব্যাপক, আন্দোলনের বহুসংখ্যক কর্মী ও সমর্থকদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের চাপে সরকার কিছুটা নতিস্বীকার করল। ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন প্রদেশের ভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চার বৎসরের ব্যবধানে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ভাষার প্রশ্নে আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। এইবার পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন স্বয়ং। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগ সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজ গর্জে ওঠে। ছাত্রসমাজ বিভিন্নস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের দিকে পা বাড়ায়। ছাত্রসমাজের সোচ্চার প্রতিবাদের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীগুলিও এগিয়ে আসে। গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ। ইতিমধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন সাফল্য লাভ করে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালিন আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সভা-সমিতি, বিক্ষোভ-মিছিল প্রভৃতি কর্মসূচি অনুষ্ঠানের মারফৎ "বাংলাভাষা দিবস" (কোন কোন লেখকের মতে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস') পালনের আহ্বান জানায়। এই আহ্বান ঘোষণার পরই পূর্ব পাকিস্তান সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় এক সরকারি ঘোষণা মারফৎ ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং পরের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি

১৯৫২-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি এবং পরের দিন সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণের সরকারি ঘোষণার পর ছাত্রসমাজ এবং রাজনৈতিক মহলে পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রশ্ন ওঠে। ঠিক এই সময় মওলানা ভাসানী তখন ঢাকায় ছিলেন না, তিনি তখন তাঁর গ্রামের বাড়ি সন্তোষে। আওয়ামী লীগের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান কারগারে বন্দি। এই পরিস্থিতিতে-ই ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার নবাবপুর রোডে অবস্থিত আওয়ামী লীগের কার্য্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন 'খেলাফতে রব্বানী' পার্টির প্রধান জনাব আবুল হাশিম। বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। "১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষের দল ভোটে জয়লাভ করে।" ফলাফল ছিল ১১-৪ ভোট এবং একজন ভোটদানে বিরত। অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদে সিদ্ধান্ত হল পরের দিন ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভোটদানে যিনি বিরত ছিলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের একজন পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা। "শহীদ মিনারের ইতিকথা" শীর্ষক এক নিবন্ধে এম আর

আখতার মুকুল[১] এই কমিউনিস্ট নেতা সম্পর্কে লিখেছেন —

> "এই একজন হচ্ছেন তৎকালীন বামপন্থী নেতা কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, বাংলা ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ সরকার এই অছিলায় প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিতে পারে। অতএব ১৪৪ ধারা ভাঙা বাঞ্ছনীয় হবে না। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত ছিলেন।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দুর্দমনীয়, তাঁরা সরকারের রাষ্ট্র ভাষানীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অটল। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে রাজনৈতিক নেতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা মানতে অস্বীকার করলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে এক গোপন বৈঠকে ছাত্রনেতারা মিলিত হলেন। ১১ জন ছাত্রনেতা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গোপন বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ফজলুলহক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুরপাড়ে। ১১ জন ছাত্রনেতার গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে এবং কিভাবে ভাঙা হবে তারও একটা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি অনুসারে ১০ জন করে ছাত্র ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে রাস্তায় বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে এবং গ্রেপ্তারবরণ করবে।

এম আর আখতার মুকুল[২]-এর প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ যথাক্রমে — "এই ১১ জন ছাত্রনেতা হচ্ছেন সর্বজনাব গাজীউল হক (বর্তমানে প্রখ্যাত আইনজীবী), হাবিবুর রহমান শেলী (বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি), কমরেড মোহম্মদ সুলতান (মরহুম, বামপন্থী নেতা), এস এ বারি এটি (মরহুম, প্রাক্তন বি এন পি সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী), আনোয়ারুল হক খান (মরহুম, মুজিবনগর সরকারের তথ্যসচিব), মঞ্জুর হোসেন (মরহুম, চিকিৎসক), এম আর আখতার মুকুল (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের লেখক ও কথক), জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক), আব্দুল মোমিন (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী), কমরুদ্দীন শহিদ (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) এবং আনোয়ার হোসেন (পরিচয় অজ্ঞাত)"।

২০শে ফেব্রুয়ারির গভীর রাতের গোপন সিদ্ধান্ত অনুসারে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে শুরু হল ছাত্রদের সভা সমাবেশ বিক্ষোভ এবং 'দশজনি মিছিল' করে ১৪৪ ধারা ভাঙা। এই দিনই ছিল প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাক হোস্টেলের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়েই মন্ত্রীদের প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনে যাবার রাস্তা। মন্ত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ রাখার জন্য পুলিশ তখন আরও মারমুখো। সংগ্রামী ছাত্রদের উপর চলছে দফায় দফায় লাঠি চার্জ এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ। ছাত্ররাও পুলিশকে মোকাবিলায় বেপরোয়া। একদল সশস্ত্র পুলিশ তখন আরও মারমুখো হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ১০ মিনিটের সময় মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাক হোস্টেলের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে অসংখ্য ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ হতাহত

হন। নিহতের ঠিক সংখ্যা আজও অজ্ঞাত। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির সংগ্রামে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে অগণিত শহিদের রক্তস্রোতে রঞ্জিত হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ পৃথিবীর ষোল কোটি মানুষের মাতৃভাষা এবং ভাষার ইতিহাসে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী বাংলা ভাষার মর্যাদাকে উর্দ্ধে তুলেছিল সেদিন। পূর্ব পাকিস্তানের এই ভাষা আন্দোলন একটি জাতিসত্তাগত কয়েক কোটি মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মর্যাদা দান করেছে ২১শে ফেব্রুয়ারি।

২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদ

পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নিহতদের অনেকগুলি লাশ ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। এই লাশের হদিশ কোনদিন মেলেনি এবং এঁদের সনাক্তকরণের কোন প্রয়োজনও পুলিশ মনে করেনি। হোস্টেল প্রাঙ্গনে যে মৃতদেহগুলো সংগ্রামী ছাত্ররা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই দু'জন ছাত্র-শহিদ হলেন আব্দুল জব্বার এবং রফিকউদ্দীন। এরপর ঐ রাতেই শহিদ হলেন (পুলিশের গুলিতে) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আবুল বরকত।এম আর আখতার মুকুলের মতে আরেকজন শহিদেরও পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন বাদামতলীর একটি ছাপাখানার কর্মী সালাম।

উপরে উল্লিখিত শহিদদের পরিচয় সম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। '২১শে পরিষদ'-এর সেক্রেটারি মোঃ আলী আসগর-এর মতে—

> "আমাদের হোস্টেল প্রাঙ্গনে নিহত আবদুল জব্বার বা রফিকউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না — যেমন লেখা হয়েছে ঐ প্রবন্ধে[৩]। আবদুল জব্বার ময়মনসিংহ (গফর গাঁ) থেকে আগত একজন অছাত্র কৃষক সন্তান; হাসপাতালে ভর্তি আত্মীয়ার দেখাশুনা করতে এসেছিলেন ঢাকায়। উঠেছিলেন গ্রামসুবাদে পরিচিত আমাদের হোস্টেলবাসী এক ছাত্রের কক্ষে। শহিদ রফিকউদ্দিনের মাথায় গুলি লাগে, উনি বাদামতলীর কমার্শিয়াল আর্ট প্রেসের মালিকের ছেলে ও মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র। দ্বিতীয়ত, শহিদ সালাম ছাপাখানার কর্মচারী নন, যতদূর জানা যায় তিনি একজন পিয়ন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহিদ হননি; আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে পরে মারা যান।"[৪]

২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের পরিচয় সম্পর্কে যে বিতর্কই থাকুক না কেন, বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা, প্রবন্ধ, নিবন্ধের তথ্য অনুসারে ৪ জন শহিদের নাম ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে উল্লিখিত হয়ে এসেছে। এক সঙ্গে এই চারজন শহিদের নাম যথাক্রমে — আব্দুল জব্বার, রফিকউদ্দীন, আবুল বরকত এবং সালাম।

দানবীয় স্বৈরাচার

২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণে আহতের সংখ্যা ছিল ৯৬ জন। ২১শের পর ২২শে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মিলে ঢাকার বহুস্থানে গুলিবর্ষণ করে। এমনকি গায়েবানা জানাজার মিছিলেও গুলিবর্ষণ করা হয়। এর ফলে হতাহতের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শহিদ মিনার

পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য ছাত্র সমাজের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মাণ করা হয় শহিদ মিনার। এই শহিদ মিনার কোন ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ নয়। এ এক গৌরবমণ্ডিত রক্ত-রঞ্জিত সংগ্রামী ধারার প্রতীক। ভবিষ্যৎ গণজাগরণ, গণঅভ্যুত্থানের গণবিপ্লবী শক্তির দিশা, দিক চিহ্ন। ছাত্র সমাজের তৈরি এই শহিদ মিনার বিভক্ত দুই বাংলা পূর্ব ও পশ্চিম অংশের জনগণের অন্তরপ্রবাহী সংগ্রামী ঐক্যের মিলনক্ষেত্র। উভয় বাংলার ছাত্র যুব সমাজ তথা সংগ্রামী জনগণের ভাবাবেগের ফল্গুধারা এসে মিশেছে এই শহিদ মিনারের বেদীমূলে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পর ২২শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে যে শহিদ মিনার ঐক্যবদ্ধ শ্রমের দ্বারা স্বল্প সময়ে নির্মাণ হয়েছিল তার বিবরণ ইতিহাসে মূল্যবাহী।

দুই বাংলার ১৬ কোটি মানুষের ভাববেগ পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা বা বাংলাভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত শহিদ মিনার-এর সাথে জড়িত বলেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দুটি বিবরণের অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। (এই বিবরণ দুটি ১৯৯০ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর ১৯৯০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "বিদেশের চিঠি : শহিদ মিনারের ইতিকথা" শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। একটি বিবরণের লেখক এম আর আকতার মুকুল (পাদটীকায় পরিচয় দ্রষ্টব্য)। অপর বিবরণটি অধ্যাপক ডাঃ সালাম-এর।)

এম আর আকতার মুকুলের বিবরণের অংশবিশেষ :

"ঢাকার মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গনের যে জায়গায় প্রথম গুলি ছোড়া হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় নির্মিত হল ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। এর সার্বিক তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেছিলেন শরিয়তপুর জেলার (প্রাক্তন মাদারিপুর মহকুমার অংশ) কৃষক সন্তান ও মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের তৎকালীন ভি. পি. ডাঃ গোলাম মওলানা (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ টিকিটে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত)। এছাড়া সহযোগিতায় ছিলেন ডাঃ মঞ্জুর, ডাঃ আলিম চৌধুরী (একাত্তরে শহিদ), ডাঃ এস ডি আহমেদ এবং বদরুল আলম প্রমুখ। ২২শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত থেকে শুরু করে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভোর রাত পর্যন্ত অক্রান্ত পরিশ্রমের পর এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে, মিনারটির চারদিকে দড়ি টাঙ্গিয়ে ঘের দেওয়া হয়। শহিদ মিনারের নিচের অংশ লাল শালু কাপড় দিয়ে জড়িয়ে উপরের অংশে হাতে লেখা ২টি চমৎকার পোস্টার ঝোলানো হয়।

একটি পোস্টারে লেখা, "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" এবং আর একটিতে, "শহিদ স্মৃতি অমর হোক"। ১০ ফুট × ৬ ফুট মাপের এই ঐতিহাসিক প্রথম শহিদ মিনারের ডিজাইন করেছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন মেধাবী ছাত্র বদরুল আলম (পরবর্তীকালে শিশু বিশেষজ্ঞ, মৃত্যু ১০-৯-১৯৮০)। আলোচ্য ডিজাইন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সেদিন মেডিক্যাল ছাত্ররা নির্মীয়মান নার্সেস কোয়ার্টারের ইট এবং কাছেই হোসেনী দালান এলাকার কন্ট্রাক্টর মোহাম্মদ পিয়ার সরদার-এর গুদাম থেকে সিমেন্ট, বালি, সুড়কি কাঁধে করে এনে

তৈরি করেছিল এই প্রথম শহিদ মিনার। শহিদ মিনারের সামনে দড়ি দিয়ে ঘেরা অংশে একটা বড় কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দিনকয়েক ধরে লাইন করে দাঁড়িয়ে শহিদদের প্রতি জানাল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। এঁরা সেই বিছিয়ে রাখা কাপড়ে সাধ্যমত টাকা পয়সা দান করেছিলেন। এমনকি অনেক গৃহবধূ তাঁদের গায়ের গহনা পর্যন্ত।

"বাহান্নর বাংলাভাষা আন্দোলনের এই প্রথম শহিদ মিনার মোট দু'বার উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রথমবার ২৪শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেছিলেন শহিদ শফিউর রহমানের (২২শে ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে সৈন্যবাহিনীর গুলিতে নিহত) পিতা ঢাকার লক্ষ্মীবাজার নিবাসী মৌলভী মাহবুবুর রহমান (এ জি অফিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার)। দ্বিতীয়বার মাত্র দুদিনের ব্যবধানে ২৬ ফেব্রুয়ারি আলোচ্য শহিদ মিনার উদ্বোধন করেছিলেন 'দৈনিক আজাদ'-এর তৎকালীন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

"রাজনৈতিক মহলের মতে এ সময় মুসলিমলীগের অভ্যন্তরীন কোন্দলের জের হিসেবে 'আজাদ' পত্রিকার মালিক মওলানা আকরম খাঁর নির্দেশে জনাব শামসুদ্দীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। ফলে বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে ছাত্রসমাজ দারুণ উৎসাহিতবোধ করে এবং জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাঁর হাতে দ্বিতীয়বার শহিদ মিনার উদ্বোধনের আয়োজন করে। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের বাস্তব তথ্য।

১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি সৈন্যবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে একদল সশস্ত্র পুলিশ এই ঐতিহাসিক প্রথম শহিদ মিনার ধুলিসাৎ করে দেয়। এবার আমাদের বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে জনাকয়েক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ।"

[এম আর আখতার মুকুল-এর উপরে উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে 'দেশ'-এর আলোচ্য সংখ্যায় একই শীর্ষক নিবন্ধে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে কর্ণেল (অবঃ) এম ডি আহমেদ, অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল বাসেত, অধ্যাপক ডাঃ সালাম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম-এর স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়। এই চারজনের স্মৃতিচারণে প্রায় একই বিবরণের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। তাই, এঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ সালাম-এর স্মৃতিচারণ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হল— লেখক]

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে অধ্যাপক ডাঃ সালাম

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্। অধ্যাপক ডাঃ সালাম ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসাবে সেই ঐতিহাসিক ব্যারাক মেডিক্যাল হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গনে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদমিনার নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অধ্যাপক সালাম সম্প্রতি স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে : "এ দেশের প্রথম শহিদমিনার নির্মাণের কৃতিত্ব মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের। কারা শহিদমিনার নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে — ব্যক্তিবিশেষ এখানে গৌণ ব্যাপার। নক্শাটি কার করা ছিল, এ নিয়ে ইদানীং, কিঞ্চিৎ বিতর্ক হচ্ছে। মরহুম ডাঃ বদরুল আলম অসুস্থ অবস্থায় (ঢাকা পি. জি. হাসপাতালে) আমাকে বলেছিলেন, রাতে সাঈদ হায়দার এসে বদরুল আলমকে শহিদ

মিনারের একটি নকশা এঁকে দিতে বলেন। বদরুল আলম ভিক্টোরিয়া পার্কের স্মৃতিস্তম্ভের (১৮৫৭ সালে ঢাকার বিদ্রোহী সিপাহীদের এই জায়গায় সারিবদ্ধভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তখনকার নাম হচ্ছে আন্টাঘরের ময়দান। বর্তমান নাম, বাহাদুর শাহ পার্ক) অনুকরণে চৌকো স্তম্ভবিশিষ্ট শহিদ মিনারের নক্‌শা এঁকে দেন।

"সাঈদ হায়দার এসে নক্‌শা নিয়ে যায় এবং সেই মোতাবেক শহিদ মিনার নির্মিত হয়। ঘটনাটি সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞাত নই; ফলে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে বদরুল আলমের আঁকার হাত ছিল ভাল— একথা সবাই স্বীকার করবে।"

এই প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখিত 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৩৭০ থেকে ৩৭১ পৃষ্ঠার বিবরণও প্রাসঙ্গিক।

তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের এই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের উপর অনেক গবেষণামূলক বই-পুস্তক, রচনা, নিবন্ধ-প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। দেশ বিদেশে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। সব আলোচনা, সব লেখার মর্মবস্তু কিন্তু এক। পূর্ব বাংলার সব সম্প্রদায় সব ধর্মের মানুষকে এবং কয়েক কোটি মানুষের জাতিসত্ত্বাকে এই ভাষা আন্দোলন অভূতপূর্বভাবে নাড়া দিয়েছিল। যা ছিল এই দেশের সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতায় অভিনব। তাইতো ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার রূপান্তরিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সমগ্র বাঙালি জাতির 'তীর্থক্ষেত্রে'; এক কথায় সংগ্রামের সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ মানুষের মিলনক্ষেত্রে। দুই বাংলার রাজনৈতিক বিভেদের বেড়ার বাঁধা ভুলে গিয়েছিল সংগ্রামী মানুষ। বাংলার সংস্কৃতি-ই হয়ে উঠেছিল তাঁদের কাছে সেই মুহূর্তে প্রধান। তাই মিনার নির্মাণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার নির্বাচিত অংশের পঙ্‌ক্তি দিয়ে লেখা অসংখ্য পোস্টার লাগানো হয়েছিল। এমনকি ২৬শে ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র পুলিশ শহিদ মিনার ধ্বংস করে দিলেও কিন্তু অবশিষ্ট রইল রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা পোস্টার। ১২নং ব্লকের বেড়ার গায়ে এইরূপ একটি পোস্টরে লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত অমর উচ্চারণ :

"বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধূলায় হবে হারা?"

এইভাবেই ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর এই সম্পর্কে লিখেছেন, "বাংলাদেশের বাংলাভাষার এই সংকটময় দুর্দিনে একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যান্য অনেক দিক থাকলেও এর মুখ্য পরিচয় বাঙালিদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম হিসাবে।"[৫]

পূর্ববাংলার সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এই ভাষা আন্দোলন তীব্র আবেগ, তীব্র জ্বালার অনুভূতির সঞ্চার করে। চট্টগ্রামের কবি মাহবুব-উল আলম চৌধুরী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণের খবর শুনেই এক আবেগদীপ্ত ভাষায় একটি দীর্ঘ

কবিতা লিখেছিলেন। এই দীর্ঘ কবিতার শিরোনাম ছিল "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি"। লেখার সঙ্গে সঙ্গে-ই পুস্তিকা আকারে কবিতাটি প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারও সঙ্গে সঙ্গে এই পুস্তিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরে কবির স্মৃতি থেকে এই কবিতার ১৮টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা গেছে।[৮] তার কয়েকটি এইরূপ :

(আরও দুটি প্রাসঙ্গিক কবিতা এই পরিচ্ছেদের ৮নং পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।)

"এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার নিচে।
সেখানে আগুনের ফুলকীর মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে রক্তের
আলপনা,
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই,
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই,
আজ আমি রক্তের গৌরবে
অভিষিক্ত। ...
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
হত্যা করেছে,
যারা আমার হাজার বছরের
ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্থ
মাতৃ সম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে
আমার এইসব ভাইবোনদের হত্যা
করেছে
আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে
এসেছি। ..."

১৯৫২ সালের পরবর্তী সময়ে এই ভাষা আন্দোলনের সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই অনুচ্ছেদটি হল : 214-(1) The state languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali ... আয়ুব খানের আমলেও সামরিক শাসন বাংলাভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। "১৯৬২ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান 'The Constitution of Republic of Pakistan' চালু করেন। এই সংবিধানে জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ : 215-(1) "The National languages of Pakistan are Bengali and Urdu."[৯] অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলাভাষা তার জাতীয় মর্যাদা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করে। তাই, পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা, অধুনা বাংলাদেশ-এর ইতিহাসখ্যাত ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত, কোন কোন স্তরে উচ্চবিত্ত মানুষ এবং ছাত্র-যুব সমাজকে উদ্বেলিত করেছে। সংগ্রামের অতিক্রান্তিকালীন উত্তরণের

দিকে, মুক্তির সংগ্রামের দিকে এগুতে উৎসাহিত করেছে। বিশেষত ছাত্রসমাজকে ভাসিয়েছে সংগ্রামের প্রাণবন্যায়। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এদেশের ছাত্রসমাজ অগ্রসর হয়েছে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের দিকে।

তথ্যসূত্র :

১। নিতাই দাস লিখিত "বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" পুস্তিকার ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস'। এই পুস্তিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত; এর ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

২। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকার ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় "বিদেশের চিঠি শহীদ মিনারের ইতিকথা" শীর্ষক মূল নিবন্ধের এম আর আখতার মুকুল-এর লেখা অংশে 'বাংলাভাষা দিবস' লেখা হয়েছে। এম আর আখতার মুকুল বাংলাভাষা আন্দোলনে একজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রনেতা ছিলেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র অনুষ্ঠানের লেখক ও কথক ছিলেন।

৩। "দেশ" পত্রিকার উপরে উল্লিখিত সংখ্যাটি দ্রষ্টব্য।

৪। "দেশ"-এর ঐ সংখ্যায় এম আর আখতার মুকুল লিখিত প্রবন্ধ।

৫। "দেশ" পত্রিকার ৭ই এপ্রিল ১৯৯০ সংখ্যায় "চিঠিপত্র" বিভাগে "শহীদ মিনারের ইতিকথা" শীর্ষক মোঃ আলী আসগর (সেক্রেটারি, একুশে পরিষদ, ঢাকা ১০০০)-এর চিঠি থেকে সংগৃহীত।

৬। "পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট" মূল রচনা বদরুদ্দীন উমর; সম্পাদনা জিয়াদ আলি। (প্রথম প্রকাশ ১০ই জুন ১৯৭১)-এর ১১৮ পৃষ্ঠা থেকে।

৭। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ "দেশ"-এ প্রকাশিত নিবন্ধ 'শহীদ মিনারের ইতিকথা'-এর শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খণ্ড) : মোহাম্মদ হাননান, পৃষ্ঠা ২ দ্রষ্টব্য।

৯। "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।"— শুধুমাত্র এই কবিতাটি-ই নয়, আরও অনেকের লেখা কবিতায় পূর্ব বাংলার ছাত্র ও যুব সমাজের দেশাত্মবোধের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটিও দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। অনেকের মতে এই 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতা ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম কবিতা। কিন্তু সবচাইতে জনপ্রিয় হয়েছে। "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি কবিতাটি।"

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতা প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' বইতে লেখক মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন—১৯৮৩ সালে 'সচিত্র স্বদেশ' তাঁদের ১৭ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এ বিষয়ে আরেকটি নতুন তথ্য দিয়েছেন। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ঐ দিনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঢাকা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবদুল গাফ্ফর চৌধুরী (বর্তমানে সাংবাদিক) বুলেট বিদ্ধ জনৈক তরুণের শিয়রে বসে একটি কবিতা লেখেন—'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি'। বর্তমানে তা গান হিসাবেই প্রধানভাবে প্রচারিত এবং মুখে মুখে সর্বত্রই গীত। এটি বাঙলাদেশের সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান যা আপামর মানুষের প্রিয়।" (পৃষ্ঠা ১৩৬)

কবিতাটি নিম্নরূপ :

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রুগড়া ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবৈশাখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তিলগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।।

সে দিন এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে,
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।।
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো ২১শে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমদের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মোর ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।।"

'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ হাননান রচিত 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৩৪) লেখা হয়েছে —" ২৪শে ফেব্রুয়ারি যখন পুলিশবাহিনী ছাত্রজনতার নির্মিত শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দেয় তখন তা দেখে ভাবে আবেগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আলাউদ্দিন আল আজাদ (বর্তমানে ডক্টর, এবং যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) 'স্মৃতিস্তম্ভ' শিরোনামে কবিতাটি লেখেন।"

'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি নিম্নরূপ :

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু,
আমরা এখনো চার কোটি পরিবার।
খাড়া রয়েছি তো। যে ভিৎ কখনো কোন রাজ্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝাটিকা ধুলায় চুর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণটানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।

ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার।।
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং :
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং;
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল?
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক! একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণ লেখায়।
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহিদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের,
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

প্রাসঙ্গিক নোট : সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদ

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি যে 'সবদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল, তার সভ্যদের তালিকা নিম্নরূপ :

১. কাজী গোলাম মাহবুব, (আহ্বায়ক), সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ
২. মাওলানা আবদুল হামিদ খান, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৩. শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৪. আতাউর রহমান খান, আওয়ামী মুসলিম লীগ
৫. আলমাস আলী, নারায়ণগঞ্জ, আওয়ামী মুসলিম লীগ
৬. আবদুল আওয়াল, নারায়ণগঞ্জ, আওয়ামী মুসলিম লীগ
৭. আবুল হাশিম, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি
৮. আবদুল গফুর, সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক
৯. আবুল কাসেম, তমুদ্দুন মজলিস
১০. কামরুদ্দিন আহমেদ
১১. মোহাম্মদ তোয়াহা, সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১২. অলি আহাদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৩. শামসুল হক চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৪. খালেক নেওয়াজ খান, সাধারণ সম্পাদক মুসলিম ছাত্রলীগ
১৫. সৈয়দ নূরুল আলম, মুসলিমলীগ

১৬. খয়রাত হোসেন, সদস্য পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
১৭. আনোয়ারা খাতুন, সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
১৮. সৈয়দ আবদুল রহিম, সভাপতি রিকসা ইউনিয়ন
১৯. মীর্জা গোলাম হাফিজ, সিভিল লিবার্টি কমিটি
২০. মজিবুল হক, সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ হক ছাত্র সংসদ
২১. হেদায়ত হোসেন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
২২. শামসুল আলম, সভাপতি, ফজলুল হক হল, ছাত্র সংসদ
২৩. আনোয়ারুল হক খান, সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ
২৪. গোলাম মাওলা, সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ
২৫. নুরুল হুদা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
২৬. শওকত আলী, পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবির
২৭. আখতার উদ্দিন আহমদ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
২৮. আবদুল মতিন, আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

['সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ভাষা কর্ম পরিষদ'-এর এই সদস্য তালিকাটি মোহাম্মদ হাননান লিখিত 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' পুস্তকে প্রথম খণ্ডের ১০০-১০১, ১০২ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত। উক্ত পুস্তকের লেখকের বর্ণনানুসারে 'অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এই কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল চল্লিশের অধিক।']

ভাষা আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি

দেশভাগজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান অংশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমান্বয়েই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়। পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হলেও কার্যত পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলন চলতে থাকে। পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব উভয় অংশের কমিউনিস্ট পার্টি ইউনিট এবং তার সদস্য কমরেডরা রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেই অনুসরণ করত। শুধু তাই নয়, রণনীতি ও রণকৌশলের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির কমরেডরা ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী। [ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ২য় কংগ্রেসের পর পাকিস্তান অংশের কমিউনিস্টদের নিয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ছিলেন সাজ্জাদ জাহির।] পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল নিষিদ্ধ বা বে-আইনী। দীর্ঘকাল পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের আত্মগোপন করে এবং গোপন সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে হয়েছে এবং এখনো বর্তমান পরিবর্তিত পাকিস্তান অংশে একই অবস্থা বিদ্যমান।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইউনিট এবং পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান ইউনিটের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়ে একটি গোপন সংযোগ রক্ষাকারী কমিটি বা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[১] এই গোপন কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরামর্শেই পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ চলেছিল দীর্ঘদিন। ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের গৃহীত লাইনকেও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার গণসংগঠন কৃষক সমিতি প্রভৃতি অনুসরণ করেছিল। এই লাইন অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার হাজং অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে কৃষকরা আওয়াজ তোলে — 'জান দিব তবু ধান দিব না', 'লোভির জুলুম বন্ধ কর', 'টঙ্ক ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর'। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ফ্যাসিবাদী দমননীতির দ্বারা হাজং-এর কৃষক বিদ্রোহকে দমন করা হলেও এবং পার্টির লাইন ভুল বলে পার্টির অভ্যন্তরে সমালোচিত হলেও কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামের ইতিহাসে জনগণের মানসিকতায় এই কৃষক বিদ্রোহ এক ফলপ্রসূ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। হাজং বিদ্রোহের পরবর্তী সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মনির্ভরশীল হতে থাকে।

১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন [AISF = All India Student Federation] তৈরি হবার পর এই সংগঠনের শাখা অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশভাগের অনেক আগে থেকেই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন হিসাবে পরিচিত হতে থাকে। বাস্তব সত্য হল, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে কমিউনিস্ট ছাত্রদেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। দেশভাগের পর পাকিস্তান অংশের নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিটগুলি 'পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি-ই ছিল পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বদানকারী চালিকাশক্তি। বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির গণসংগঠনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার দরুণ, ছাত্র যুব সংগঠনের মাধ্যমেই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে হয়েছে। পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ও যুবলীগ পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র-যুব সংগঠনরূপে পরিচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলন এবং অতিক্রান্তিকালীন স্তরে মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুব সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৪৮-এ ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপগ্রহণের পর্যায় পর্যন্ত এবং বিশেষ এক স্তরে ছাত্র ফেডারেশনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের পরবর্তী অধ্যায় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল ভাষা ও ছাত্র আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ছিল অন্তরালবর্তী একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। এমনকি ষাটের দশকে মতাদর্শগত কারণে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকার গুরুত্ব কমেনি। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখক, গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে রয়েছে অনেক বিরুদ্ধমত। এই বিরুদ্ধমত এবং কমিউনিস্টদের স্বপক্ষীয় মত ক্ষতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দের অন্যতম একজন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা ছিলেন এম আর আখতার মুকুল। তিনি বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই প্রাক্তন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা তাঁর লিখিত এক নিবন্ধে[১]

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। (যদিও উক্ত নিবন্ধের এই প্রাসঙ্গিক অংশটি এই পুস্তকের অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে, তবু পুনরায় এই পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে ঐ অংশটুকু আবার উল্লেখ করা হল।) এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন — '১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষের দল ভোটে জয়লাভ করে। ফলাফল ১১-৪ ভোট এবং একজন ভোটদানে বিরত। এই একজন হচ্ছেন তৎকালীন বামপন্থী নেতা কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, বাংলাভাষা আন্দোলন উপলক্ষে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার এই অছিলায় প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন নির্বাচনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিতে পারে। অতএব ১৪৪ ধারা ভাঙা বাঞ্ছনীয় হবে না। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত ছিলেন।"

বিরুদ্ধ মত

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ইতিহাস লেখক মোহাম্মদ হাননান তাঁর বই-এর '১৪৪ ধারা ভাঙার প্রশ্নে তীব্র বিতর্ক', উপশিরোনামে লিখেছেন — "ইতোমধ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে বৈঠকে মিলিত হন। সভায় তুমুল বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন যে, 'আমরা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি তাহলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সরকার জরুরী অবস্থার অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা সরকারকে সে সুযোগ দিতে চাই না।' কিন্তু '২০শে ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বাস্তব অবস্থা ১৪৪ ধারা ভাঙার অনুকূলে।' সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের যুবলীগের সদস্যরা তাঁদের পার্টির (কমিউনিস্ট পার্টি— লেখক) মতামত জানতে চাইলে তাদের জানানো হয় পার্টি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে এবং এটা সময়োচিত মনে করে।'

"কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত তাঁদের ছাত্র শাখার সম্পাদক কমরেড শহীদুল্লাহ কায়সার, তাকিউল্লাহর মাধ্যমে মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী ও আবদুস সামাদকে জানিয়ে দেন। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য সংগ্রাম পরিষদকে চাপ দিতে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্যরা যখন এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না তখন কমিউনিস্ট পার্টি নতুন এক সিদ্ধান্ত পার্টি কর্মীদের জন্য পাঠান। সেখানে বলা হয়, কোনরকম চাপাচাপির ফলে সংগ্রাম পরিষদ যেন ভেঙ্গে না যায়। এই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানার জন্য সংগ্রাম পরিষদের সদ্য যুবলীগ নামধারী পার্টি সভ্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

"কিন্তু অলি আহাদ সবেমাত্র পার্টিতে ঢুকেছিল এবং পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা তেমন কিছু বুঝতো না। অলি আহাদ ভোটা-ভুটির কথা তুললেন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, ভোটাভুটি হলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মতাবলম্বীরা হেরে যাবে এবং ভোট হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটাই মেনে নিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে বাধ্য থাকবে। মোহাম্মদ তোয়াহা তাই ভোট না করে Consensus-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। ভোট হলে তোয়াহা সেইজন্য শেষ পর্যন্ত ভোট দানে বিরতও ছিলেন। কিন্তু তবু অলি

আহাদ, আবদুল মাতন ভোটাভুটি করার জন্য চাপ দিতে থাকেন।

"ফলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যুবলীগের সদস্যরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। অলি আহাদ, আবদুল মতিন যুক্তি দিতে থাকেন যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারি দমননীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা হবে ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এর মধ্যে সলিমুল্লাহ ছাত্রাবাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল এসে সর্বদলীয় পরিষদকে জানিয়ে দেয় যে, ছাত্ররা আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। একথায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হন।

"তাঁরা ছাত্রদের এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করেন। এমন এক পরিস্থিতিতে আবুল হাসিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ শেষপর্যন্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য ভোট দেন। মাত্র ৩ জন বাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকল সদস্য ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দিলেন। সংগ্রাম পরিষদ আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, কমিটির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সামসুল হক ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার যৌক্তিকতা বুঝাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু ছাত্ররা যদি তা মেনে না নেয় তবে এই সর্বদলীয় কমিটি তখন থেকেই বিলুপ্ত হবে।

"এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের প্রকাশ্যে কর্মরত কমরেডদের উদ্দেশ্যে নতুন করে নির্দেশ পাঠায় যে, 'পার্টি সিদ্ধান্ত বিবেচনায় রেখে তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ছাত্রজনতাকে তাদের বক্তব্য বুঝাতে চেষ্টা করবে এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে জনতার মনোভাব লক্ষ্য করে তাঁরাই (অর্থাৎ উপস্থিত কমরেডরা — লেখক) কর্মস্থলে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

[বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : মোহাম্মদ হাননান; প্রথম খণ্ড, ২য় বর্দ্ধিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭-১০৮। মোহাম্মদ হাননান ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে তীব্র বিতর্ক, বর্ণনায় যেসব তথ্য বিবরণের উপর নির্ভর করেছেন, তা হল : একুশে ফেব্রুয়ারি : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক একতা : ২১শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা '৭৯; অনিল মুখার্জি : স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি, দ্বিতীয় বাংলাদেশী সংস্করণ, ১৯৮০, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৮; বদরুদ্দীন উমরকৃত শহীদুল্লাহ কায়সারের সাক্ষাৎকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮; সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ তোয়াহা; সাপ্তাহিক গণশক্তি ২১শে'র ১৯৮১ সংখ্যা; সাপ্তাহিক একতা, ২১শে বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৯]

পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একের পর এক বিজয় অভিযান। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করলে ভাষা আন্দোলন ঐ ধরনের প্রচণ্ড সংগ্রামী গতিবেগ পেত না — এ মূল্যায়নেও কোন সন্দেহ নেই। অথচ রাজনৈতিক দলগুলি ১৪৪ ধারা ভাঙার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে, এটাই তথ্যভিত্তিক ইতিহাসসিদ্ধ বাস্তব সত্য। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল, এই বিতর্কের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করা যায় না। উক্ত বিতর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে বিরুদ্ধ এবং স্বপক্ষীয় যুক্তির বর্ণনা উপরের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার অবস্থানকে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব।

ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলন সম্পর্কে কি পর্যালোচনা বা মূল্যায়ণ করেছিল, সে প্রসঙ্গও আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি একটি গোপন দলিলে ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনা করেছিল। ১৯৮৪ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত "ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল" পুস্তকে এই গোপন দলিলের হদীশ আছে; এবং এই দলিলটি শহীদুল্লাহ্ কায়সার থেকে বদরুদ্দীন উমর সংগ্রহ করেছিলেন। মোহাম্মদ হাননান তাঁর "বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস" পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৫, ৬, ৭ পৃষ্ঠায় উক্ত দলিলের অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ করেছেন। সে অংশবিশেষ নিম্নরূপ : *কমিউনিস্ট পার্টির পর্যালোচনার অংশবিশেষ*—

"এবার আন্দোলনে একটানা যেরূপ চারদিন হরতাল চলিয়াছিল এবং যেরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল সেরূপ ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গে আর কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ব্যাপক গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে।

"গণ আন্দোলনের আঘাতে সরকার তখন পিছু হটিতে বাধ্য হয় এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি সরকার আইনসভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। ... গণশক্তির সামনে পূর্ববঙ্গ সরকারের এই পশ্চাদপসরণ ও এই প্রস্তাবকে আন্দোলনের প্রাথমিক জয় বলিয়াই গণ্য হইবে— ইহাই আন্দোলনের প্রাথমিক লাভ।

"দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের তীব্রতার মধ্য দিয়া জনগণের চেতনাতেও এক নতুন পরিবর্তন আসিয়াছে। এর আগে পূর্ববঙ্গের জনগণের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বিশিষ্ট শ্রেণির বিশিষ্ট অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিতর। ... এই আন্দোলনের এক আঘাতেই জনগণের চেতনা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং মুসলিম লীগ সরকার জনমানস হইতে বহুল পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা এই আন্দোলনের দ্বিতীয় লাভ। ...

"ভাষা আন্দোলনের উপরোক্ত মূল শিক্ষাগুলি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের ভিতর যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও পর্যালোচনা করা দরকার।

"প্রথমত ইহা বলা দরকার যে আন্দোলনের প্রথম দিকে নেতৃত্বের ভিতর বাঙ্গালি জাত্যাভিমানের ভাবধারা দেখা যায়। ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সভায় আন্দোলনের মূল দাবি সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্পষ্টভাবে উঠান হয় এবং উর্দু ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে বলা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগনের মতামত লইয়া অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক। সংগ্রাম পরিষদের ভিতর আওয়ামী লীগের নেতাগণ (তাহারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ) ভাষার আন্দোলনকে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গবাসীদের লড়াই বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য তাহারা অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কিছু বলিতে বা পাকিস্তানের ভিতরে এই ভাবধারা চলিতে থাকিলে শোষকগোষ্ঠী ইহাকে উর্দু বিরোধী বা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন বলিয়া কুৎসা প্রচার বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভেদ আনবার সুযোগ পাইত।

"দ্বিতীয়ত সংগ্রামের পরিষদের ভিতরে আওয়ামী লীগের বহু নেতাই আন্দোলনের সময়ে বহু দোদুল্যমানতা দেখাইয়াছেন। ২১ তারিখের পূর্বে তাহারা ২১শের সাধারণ হরতালের প্রস্তুতির কাজে বহু গাফিলতি করিয়াছেন, বহু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে ছাত্র শোভাযাত্রারও তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করিলে তাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়া সংগ্রাম পরিষদের ভিতর ভোটের জোরে ২১ তারিখে সভা শোভাযাত্রা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের সেই নেতাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারবাদী দোষে দুষ্ট এবং গণসংগ্রাম বিমুখী।

" .....২১শে তারিখের পরবর্তী দুই দিন ঢাকা নগরীতে গৌরবময় ঘটনাবলীর সময়ে পরিষদের ভিতরকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইহা হইতে দুরে সরিয়া থাকেন। তবে গণ আন্দোলনের জোয়ারে আবার তাহারা ২৩শে তারিখ হইতে সংগ্রাম পরিষদের কাজে যোগ দেন। তখন দেখা গেল যে তাহারা অতিমাত্রায় বামপন্থী হইয়া পরিষদের ৯ দফা দাবী মানিবার জন্য ৯৬ ঘন্টার চরমপত্র দেওয়া হয় এবং ৫ই মার্চ শহিদ দিবসকে আবার সাধারণ হরতাল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আমাদের কমরেডরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

"এভাবে চরমপত্র প্রদান ও ৫ই মার্চ হরতাল ঘোষণা করা ভুল ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ একটানা চারদিন হরতালের মাথায় ২৫ তারিখে তা ঢাকা নগরীতে সুউচ্চ শিখরে পৌছিয়াছিল। এরপর স্বভাবতই আন্দোলনে কিছুটা ভাটা আসার সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে সরকারও নানাপ্রকার বিভেদমূলক প্রচার চালাইয়াছিল ও রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী নামাইয়া দিয়াছে। অপরদিকে আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তিও ছিল দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে বোঝা উচিত ছিল যে তখন সরকার দাবি না মানিলে আর একটি সংগ্রাম দ্বারা চরমপত্রের সম্মান রক্ষা করা যাবে না এবং ৫ই মার্চ সাধারণ হরতাল করাও কঠিন। কাজেই আমাদের মনে হয় আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব হিসাবে সংগ্রাম পরিষদের কার্য ছিল সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া প্রাথমিক জয় হইয়াছে এই ঘোষণা করিয়া এখন সভা, শোভাযাত্রা, জমায়েত ও সাংগঠনিক কাজের দিকে আন্দোলনকে প্রবাহিত করা। তাহা হইলে আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে গুটাইয়া নেওয়া যাইত এবং আন্দোলনের লাভগুলিকেও আরো সংহত করা যাইত।"

"আন্দোলনের দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল সাংগঠনিক। ঢাকা নগরীতে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় আন্দোলনের সংগঠন ছিল না বলিলেও চলে। আন্দোলনের মূল সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল ছাত্রদের হোস্টেলগুলি এবং সরকার যখন সেগুলি বন্ধ করিয়াছিল তখন আন্দোলনের জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং পরে সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির সামনে আন্দোলনকে আগাইয়া নেওয়া গেল না।"

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পার্টির এই পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কি মূল্যায়ন ছিল, সে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। ১৯৬২ সাল একটি দিকস্তম্ভ (মাইল স্টোন)। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে (ভারত, পাকিস্তান সহ) ১৯৬২-তে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের প্রাক্কাল। আবার এই সময়েই

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তুঙ্গে উঠেছিল। ১৯৬২-তে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন-ই বা কি ছিল? এই মূল্যায়ন পাওয়া যাবে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে সম্পাদক কর্তৃক উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—

১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন : পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন

"১৯৬১ সালের শেষে গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার যে পরিকল্পনা আমরা করিয়াছিলাম, ১৯৬২ সালের প্রারম্ভে তাহা বাস্তবায়িত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে নিম্নতম কর্মসূচি ও আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়া অন্য গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের একটা সাধারণ সমঝোতা হইয়াছিল। ইহার ফলশ্রুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের ভিতর একটা একতা হইয়াছিল। ... এবং ১৯৬২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হইতে ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হইবে বলিয়াও স্থির হইয়াছিল।

"কিন্তু শহিদ দিবসের পূর্বেই ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি করাচীতে সোহারাওয়ার্দী সাহেবের গ্রেপ্তার উপলক্ষ করিয়া সে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের যুক্ত উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ সোহারাওয়ার্দী ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১লা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট করিয়া সংগ্রাম শুরু করিয়াছিলেন। সামরিক শাসনের পর ইহাই ছিল পূর্ববঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম। ঢাকার ছাত্রদের সংগ্রাম শুরু হওয়ার পব বরিশাল এবং আরও কয়েকটি শহরে উহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

"...তিন বৎসরের সামরিক সন্ত্রাস ও জুলুমের ফলে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধও এত চরমে পৌঁছাইয়াছিল যে, ঐ দিন ঢাকা নগরীতে আইয়ুব খানের উপস্থিতির সময়েই ছাত্ররা আয়ুব খানের ফটোকে জুতা ও ঝাঁটার মালায় সজ্জিত করিয়া উহা হাতে নিয়া ঢাকা নগরীর রাস্তাসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন দোকান হইতে আয়ুব খানের ফটোসমূহ সংগ্রহ করিয়া উহার দ্বারা রাজপথে বহ্ন্যুৎসব করিয়াছিলেন।...

"ঢাকা নগরীতে ছাত্রদের ঐ সংগ্রামের পর ছাত্র আন্দোলন সারা পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবির সঙ্গে সঙ্গে 'সামরিক শাসন ও আয়ুর শাহীর অবসান', 'গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা', 'পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা' ও 'পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্বশাসন' প্রভৃতি জাতীয় রাজনৈতিক দাবিগুলি ঐ আন্দোলনের মৌল আওয়াজ হইয়াছিল। ...

"কিন্তু সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দাবিসমূহের জন্য এরূপ একটা গৌরবময় সংগ্রামের সময়েও বিভিন্ন বিরোধীদলের যেসব নেতা জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল চুপ করিয়াছিলেন। আড়াইমাস যাবৎ আন্দোলন চলার পর তাঁহারা আন্দোলনের সমর্থনে একটা বিবৃতি (১৪ই এপ্রিল) দিয়া তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন।

"যদিও ছাত্রদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক শক্তির চাইতে

ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ অনেক বেশি প্রবল ছিল, তথাপি উহার গুরুত্ব ছিল যে, সামরিক শাসনের পর পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল; ঐ আন্দোলন তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া গণআন্দোলনের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এবং লণ্ডনে অবস্থানরত পাকিস্তানী ছাত্রদের ভিতরেও ঐ আন্দোলন সাড়া জাগাইয়াছিল।

"দ্বিতীয়ত ঐ আন্দোলনে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠিত হইলে এবং নেতৃত্বের দৃঢ়তা থাকিলে সামরিক শাসনের অধীনেও বিক্ষুব্ধ জনগণের আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব।

"তৃতীয়ত যেহেতু আন্দোলনের মৌল দাবি ছিল কতগুলি জাতীয় রাজনৈতিক দাবি। সেহেতু ঐ আন্দোলন প্রধানত শহরগুলির ছাত্রদের ভিতর সীমিত থাকিলেও, রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐ আন্দোলন একটা জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাই, সাধারণ জনগণ ঐ সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।"

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রতিবেদনে বলা হয় :

"সামরিক সরকার প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি চালু করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা কমিশনের যে রিপোর্ট কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ঐ সংগ্রাম ছিল উহারই প্রতিবাদে। জুলাই মাস হইতে স্বতস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ সম্মিলিতভাবে দাবি করিয়াছিল যে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করিতে হইবে। এই দাবীতে আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য তাহারা সমস্ত ছাত্র সমাজের নিকট আহ্বান জানাইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের গোটা ছাত্রসমাজ ইহাতে সাড়া দিয়াছিল এবং এই আন্দোলন ঢাকা নগরী হইতে সুদূর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছাত্রসমাজের এক ঐক্যবদ্ধ ব্যাপকতম গণসংগ্রামের রূপ ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন শহরেও এই আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলনের দাবিগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক। কাজেই, সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিল সাধারণত ছাত্রসমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশ। পক্ষান্তরে, সেপ্টেম্বরের আন্দোলন ছিল ছাত্রদের নিজস্ব শিক্ষাগত দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে। তাই এই আন্দোলনে সাধারণ ছাত্ররাও স্বতস্ফূর্তভাবে আগাইয়া আসিয়াছিল, ছাত্রীদের ব্যাপক অংশ ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিভাবকরাও ইহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। ফলে, এই আন্দোলন ফেব্রুয়ারি আন্দোলন হইতে অনেক ব্যাপক হইয়াছিল।"[৩]

মতবিরোধের পূর্বাভাষ

ভাষা ও ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার জনগণের 'গণ সংগ্রামের লাইন' কি হবে, এবং বৈধ সংগ্রাম না সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাওয়া হবে— এই নিয়ে ১৯৬৩-৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতবিরোধের লক্ষণ দেখা দেয়। বেআইনী ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা'। 'শিখা' গোপনে প্রকাশিত

হতো। 'শিখা'ও ১৯৬২ সালের অগ্নিগর্ভ ছাত্র আন্দোলনের একটি মূল্যায়ন করেছিল। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে 'শিখা'-র ষষ্ঠপর্ব প্রথম সংখ্যায় "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা" শিরোনামে মূল্যায়নটি প্রকাশিত হয়। উক্ত মূল্যায়নের লেখক ছিলেন আবদুল কাদির ছদ্মনামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড খোকা রায়। 'শিখা'-তে প্রকাশিত এই মূল্যায়নের উপসংহার অংশে বলা হয়েছে :

"মূল কথা হইল, নিপীড়িত জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা ও সংঘবদ্ধ করা। এই কাজই পিছনে রহিয়া গিয়াছে। এখানেই আগে হাত দেওয়া দরকার। এবং বর্তমান অবস্থাতে এখানে বৈধ আন্দোলনের সুযোগ নিতে হইবে। 'সশস্ত্র বিপ্লব' বা 'রক্তাক্ত সংগ্রামের' কথা বলিয়া এখন শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার জন্য বৈধ কাজের সুযোগ ব্যবহার না করিলে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসরই হওয়া যাইবে না, 'সশস্ত্র সংগ্রাম' তো দূরের কথা।"[৪]

উপরের উদ্ধৃতি থেকেই গণসংগ্রামের লাইন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতবিরোধের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র এবং যুবসমাজে এই মতবিরোধের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। জাতীয় এবং আন্তর্জার্তিক কারণে শুধু কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন নয়, ভাঙন আসে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র-যুব সংগঠনের মধ্যেও।

১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন কমরেড নেপাল নাগ। এই ৮১ পার্টির সম্মেলনের পরবর্তী সময় থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি [CPSU] এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির [CPC] দ্বন্দ্ব বিরোধ প্রকাশ্যে শুরু হতে থাকে। জগতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিতে দ্বন্দ্ব বিরোধ ঘনীভূত হয়। প্রায় প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টিই সোভিয়েত পন্থী এবং চীনপন্থী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কমরেড নেপাল নাগ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৮১ পার্টি সম্মেলনের রিপোর্ট উপস্থিত করেছিলেন। এরপর দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা দুই মতে বিভক্ত। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদার। কমরেড মণি সিংহ, নেপাল নাগ প্রমুখরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লাইনকে অনুসরণ করেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফ্রন্টের এই বিরোধ প্রতিফলিত হল। ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৬৩ সালের সম্মেলনে এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্রফ্রন্টের দুই শিবিরের নেতা ছিলেন একদিকে কমরেড কাজী জাফর আহমদ এবং অন্য শিবিরের নেতা ছিলেন কমরেড মোহম্মাদ ফরহাদ। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট দেখাশুনার সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য সোভিয়েতপন্থী হওয়াতে, এই সোভিয়েতপন্থী নেতৃত্বের সমর্থন ছিল কমরেড ফরহাদ-এর দিকে। অপরদিকে কমরেড কাজী জাফর চীন লাইনের অনুসারী বলে পরিচিত হতে থাকেন। কিন্তু কার্যত পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে না ভাঙার ফলে পার্টির চীনপন্থী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কমরেড কাজী জাফরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখত না। বিভিন্ন মহলের রিপোর্ট অনুসারে চীনপন্থী পার্টি নেতা কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা কমরেড কাজী জাফর প্রমুখদের সাথে গোপন যোগাযোগ রাখতেন।

এইভাবে চলতে চলতে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের চূড়ান্ত ভাঙন আসে ১৯৬৫ সালে। এইসময় 'ছাত্র ইউনিয়ন' ছাত্রদের গণসংগঠন হিসাবে ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত এবং নেতৃত্বাধীন। ১৯৬৫ সালের ১,২,৩, এপ্রিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট্-এ অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনের কমিউনিস্ট ছাত্র নেতৃত্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন কার্যত ভেঙে যায়। ভেঙে যাওয়া দুটি অংশ সোভিয়েতপন্থী ও চীনপন্থী [অনেক সময় মাওপন্থী বলা হত] রূপে পরিচিতি লাভ করে। সোভিয়েতপন্থী ছাত্র নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন কমরেড মতিয়া চৌধুরী এবং সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক। চীনপন্থী ছাত্র নেতৃত্বে আসীন হল কমরেড রাশেদ খান মেনন এবং কাজী জাফর আহ্মেদ। কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন দুই টুকরো হয়ে যাওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী অংশকে বলা হত ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়াপন্থী) এবং চীনপন্থী অংশকে বলা হতো ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন পন্থী)।

কিন্তু ১৯৬৫ সালের পর আবার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। চীনপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপে ফাটল ধরে। অনেকগুলি উপদল ও গোষ্ঠীতে মেননপন্থী কমিউনিস্ট ছাত্ররা এবং তাঁদের অনুগামীরা বিভক্ত হতে থাকে। ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলি পর্যন্ত এই উপদল গোষ্ঠীগঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। পশ্চিম বাংলার (ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত) নকশালবাড়ি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রভাবও পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের চীনপন্থী কমিউনিস্ট ছাত্র কমরেড ও ছাত্রসমাজের উপর। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির চীনপন্থী অংশ পৃথক পার্টি কেন্দ্র গঠন করলেও মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রশ্নে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের চীনপন্থী কমিউনিস্টরাও ছিলেন কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এঁদের মধ্যে একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, মোহম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক এবং অপর একটি প্রধান অংশের নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড আব্দুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমেদ ও দেবেন শিকদার। এই শেষোক্ত অংশ প্রকাশ্যে 'মেঘনা সংঘ' নামে কাজ চালাতেন, কিন্তু এঁদের পরিচালিত পার্টির নাম ছিল 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'। মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের এই দুই অংশেরই অস্তিত্ব ছিল। তাছাড়া মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে সামিল হয়েছিল কমরেড সিরাজ শিকদার, মাহবুব উল্লাহ ও আবুল কাসেম, ফজজুল হকের নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ। এই ধরণের উপদল, গোষ্ঠী, গ্রুপ ইত্যাদির সমাবেশে চীনপন্থী কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। উপরন্তু, সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট প্রভাবিত পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে এবং অনৈক্যে মদত দিতে থাকে স্বার্থপরায়ণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রগুলি।

কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এবং ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সোভিয়েতপন্থী এবং চীনপন্থী পারস্পরিক দ্বন্দ্বে একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছে অথবা প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে একে অপরকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে। এই সময় সোভিয়েতপন্থীদের বিরুদ্ধে চীনাপন্থীদের অভিযোগ ছিল : সোভিয়েত পন্থী কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের সংহতিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। এরা — "ভারতের দালাল"।[৫]

অপরদিকে চীনপন্থীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতপন্থীদের অভিযোগ ছিল : ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধে "মাওবাদীরা এই যুদ্ধে আয়ুবকে সমর্থন করেছিল"।[৬]

চীনপন্থীদের মতামত সম্পর্কে অপর একটি বিশ্লেষণ দেখা যায় -- "তত্ত্বগত দিক থেকে হক তোয়াহা মনে করতেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো রেখেই পূর্ব-পাকিস্তানে শোষণ মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আবদুল মতিনের অংশ পূর্ব বাংলার আলাদা সত্ত্বার পক্ষে ছিলেন।"[৭]

এইভাবে বহুবিধ তথ্য, ঘটনাবলী পর্যালোচনা বিশ্লেষণে দেখা যাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনও সর্বশেষে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রাক্কালে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের ভূমিকার সাথে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্টদের ভূমিকার (তাঁদের নিজ দেশের ক্ষেত্রে) তুলনামূলক আলোচনা করলে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র-যুব আন্দোলনের উত্তরকালের ক্ষেত্রে যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র :

১। সরোজ মুখার্জি, অমৃতেন্দু মুখার্জি, মহম্মদ ইসমাইল (এরা সব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির) এবং নেপাল নাগ, গোপাল বসাক, ওমরআলী (এরা সব পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি)-কে নিয়ে এই কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
২। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত "দেশ"।
৩। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : মোহাম্মদ হান্নান, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০ (২য় খণ্ড)।
৪। ঐ পৃষ্ঠা ৮২
৫। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : নিতাই দাস, পৃষ্ঠা ৩৫।
৬। ঐ পৃষ্ঠা ৩৫
৭। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : মোহাম্মদ হান্নান, পৃষ্ঠা ১৬৯ (২য় খণ্ড)

পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন

পটভূমি

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা প্রদেশ হলেও দীর্ঘ বৃটিশ শাসনের উত্তরাধিকারের কোন গুণগত পরিবর্তন কোন শাসক গোষ্ঠীই পাকিস্তানের এই প্রদেশে ঘটায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি রাজনৈতিক দলের দলীয় শাসনের আমলে, অনেকগুলি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট বা কোয়ালিশন সরকারের আমলে, কিংবা সামরিক শাসনের আমলে ক্রমান্বয়েই অবনতির দিকে এগিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং ব্রিটিশ শাসকদেব সৃষ্ট মধ্যসত্ত্বভোগিদের অত্যাচারের কোন হেরফের পাকিস্তান গঠনের পরে পরিলক্ষিত হয়নি। উপরন্তু এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সাথে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক একচেটিয়া পুঁজি ও শিল্প মালিকদের লাগামহীন শোষণ। এই দুই স্তরের শোষণের অন্তরালে নয়া উপনিবেশবাদী মার্কিন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণও ছিল অব্যাহত। ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভারতবর্ষ বিভক্তজনিত কারণে স্বাধীনতা পেলেও ১৯৪৭ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক কোন স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জীবনধারণের অধিকারগুলি শুধু নয়,

জাতি হিসাবে বাঙ্গালি জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতিও হয়েছে অবহেলিত।

পূর্ব পাকিস্তানের এইরূপ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলেই এই অঞ্চলের জনগণের ক্ষোভ পরিণত হয়েছে গণ আন্দোলনে, গণরোষে, গণবিদ্রোহে। এই গণ আন্দোলন, গণরোষ, গণবিদ্রোহের পটভূমিতে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক দল এবং গণ সংগঠনগুলির প্রসার, উত্থান-পতন ছিল নির্ভরশীল।

বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠনগুলির অস্তিত্ব, প্রসার, উত্থান, পতন এবং অবলুপ্তি নির্ভর করেছে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। যদিও ছাত্র আন্দোলন সূচনা ও ব্যাপ্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সাধারণভাবে হয়ে থাকে এবং ছাত্র আন্দোলন সাধারণভাবে শিক্ষামূলক দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তবুও, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন ছিল এই প্রদেশের রাজনীতির সাথে বেশি করে সম্পৃক্ত। কোন কোন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন শিক্ষামূলক দাবি-দাওয়া আদায়ে সংগ্রামমুখী হয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫০ সালের ২৩ নভেম্বর 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৬·৮। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি। উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,২৬৬টি। মহাবিদ্যালয় ছিল ৫৬টি। কিন্তু আরেকটি পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্বপাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি, কিন্তু ১৯৫৪-৫৫-তে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৬,০০০টিতে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠনেই ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের সংখ্যার হার (Drop-out) ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। অপরদিকে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৬ বছরে প্রদেশের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। এই সময়ে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে হয়েছে ৪টি অর্থাৎ ৩টি বেড়েছে। ১,২৬৬টি বিদ্যালয় ক্ষেত্রে হয়েছে ১৯২৪টি (পুরুষ - ১৮০৫টি + মহিলা - ১১৯টি)। অর্থাৎ বেড়েছে ৬৫৮টি। মহাবিদ্যালয় ৫৬টির ক্ষেত্রে ৯১টি (পুরুষ - ৮০টি + মহিলা - ১১টি) অর্থাৎ ৩৫টি বেড়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান সহ সমগ্র পাকিস্তানে শিক্ষা সংস্কারের জন্য ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৪ সালে হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নুর খান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। তাছাড়া এইসব শিক্ষা কমিশনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানেও শিক্ষা কমিশন ধাঁচের দুটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালে গঠন করা হয়েছিল 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা কমিটি' এবং ১৯৫৭ সালে গঠন করা হলো 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন'। এই সমস্ত শিক্ষা কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের শিক্ষার বাস্তব চাহিদাকে মেটাতে পারেনি। উপরন্তু অনেক সমালোচকের মতে ব্রিটিশ আমলের সেই ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশনের (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন) মতই গতানুগতিক। বরং পাকিস্তানের এইসব শিক্ষা কমিশনগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির এবং ভাষাগত বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাজগতের উল্লিখিত পরিস্থিতি ছিল ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথমে এবং পরে ছাত্র আন্দোলনের সনওয়ারী সাল-তামামি এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন :

ভারত উপমহাদেশের প্রধান ছাত্র সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' (A.I.S.F)-এর শাখা সংগঠন পূর্ববাংলাতেও ছিল। দেশভাগের পর এই শাখা সংগঠনের নামকরণ করা হলো 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন'। পূর্ব পাকিস্তানেও 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন' কমিউনিস্টদের সংগঠনরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ফলে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির মতোই এই ছাত্র সংগঠনের কাজ ক্রমান্বয়ে অচল হয়ে পড়ে। ছাত্র ফেডারেশনের কিছু সাহসী ছাত্রনেতা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনকে অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী সংগ্রামের উপাদানে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ছাত্রনেতাদের এই উদ্দীপনাময় প্রচেষ্টাকে বেশিদিন অব্যাহত রাখা যায়নি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ময়মনসিংহে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন'-এর শেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ময়মনসিংহ সম্মেলনে উক্ত সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে জনাব আকলাকুর রহমান ও শহীদুল্লাহ কায়সার। এর পরেই 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন' অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায় এবং অবলুপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ফেডারেশনের স্বল্পকালিন অস্তিত্বের সময়ে এই সংগঠনের উল্লেখযো্যে নেতা ও কর্মী ছিলেন—সরদার ফজলুল কারিম, আকলাকুর রহমান, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান, এনায়েত কারিম, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম বাদশা, সৈয়দ আফজাল হোসেন, মৃণাল কান্তি বারুরি, ইকবাল আনসারী, তকিউল্লাহ প্রমুখ।

মুসলিম ছাত্রলীগ :

এই ছাত্র সংগঠনটির নামের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও আছে। ১৯০৬ সালে মুসলিমলীগ তৈরি হয়েছিল। এরপরে মুসলিমলীগের প্রভাবে ১৯৩৭ সালে খুলনার আবদুল মজিদ এবং যশোরের শামসুর রহমানকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হলো 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন'। তারপরে কলকাতার মোহাম্মদ আলি পার্কে ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত ভারতের মুসলমান ছাত্রদের এক মহাসম্মেলন থেকে গঠিত হয়েছিল 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস অরগানাইজেশনস'। কিন্তু এই সর্বভারতীয় সম্মেলনের মঞ্চেই 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রফেডারেশনে'র নাম পরিবর্তন করে গঠন করা হল 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ'। কিন্তু কায়েদে আজম জিন্নাহ এবং ফজলুল হকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে এই ছাত্র সংগঠন ও প্রধানত দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ছিল আরও অনেক গোষ্ঠী এবং শিবির। 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি প্রগতিপন্থী শিবিরও ছিল। 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠিত হবার পর কলকাতাকে কেন্দ্র করে এই সংগঠনের কাজকর্ম চলতে থাকে। কলকাতা কেন্দ্রে সমবেত হয়েছিলেন যাঁরা, ওঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফরিদপুরের শেখ মুজিবর রহমান (পরে বঙ্গবন্ধু)', বরিশালের আবদুর রহমান, কুমিল্লার খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, ঢাকার তাজউদ্দিন আহমেদ

এবং কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। ১৯৪৪ সালে অবিভক্ত বাংলার 'নিখিলবঙ্গ মুসলমলীগ'-এর শেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪-এর পর ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে এই সংগঠনের তখনকার নাম হয় 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই এই সংগঠনে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফলে একটি গোষ্ঠী 'নিখিল' শব্দটি বাদ দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে আরেকটি সংগঠন দাঁড় করায়।

বাস্তবে 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' দেশভাগের পূর্বে গঠিত 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ'-এর-ই উত্তরসূরী। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয়, ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন উন্নততর পর্যায়ে বিভিন্ন পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু 'ছাত্র লীগ' উল্লেখ করা আছে। এই 'ছাত্র লীগ' ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের উত্তরসূরী। নাম পরিবর্তনে এই ক্রমায়াত জটিলতা শেষ পর্যন্ত ছাত্র সমাজের উপর খুব বেশি প্রভাব সৃষ্টি করল না। বরং পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে এই সংগঠনকেন্দ্রিক সব গোষ্ঠীগুলিই 'মুসলিম ছাত্র লীগ' নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দীর্ণ এই 'মুসলিম ছাত্র লীগ' এর উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতারা হলেন—জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান, নইমুদ্দিন আহমেদ, হবিরুল ইসলাম, খালেক নেওয়াজ খান, মাহবুর রহমান খান, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুস সামাদ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুর, শামসুল হক চৌধুরী। বিভিন্ন দলিলে, তথ্যে 'ছাত্র লীগ' নামে যে ছাত্র সংগঠনের নাম উল্লেখ আছে সেই 'ছাত্র লীগ' নেতৃবৃন্দদের অন্যতম হলেন শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, মাহবুব, শাহ মোয়াজ্জেম, আবদুল্লাহ, ওরারেস ইমাম, কে. এম. ওবায়দুর রহমান, আসমত আলী, আবদুর রউফ, খালেদ মেহাম্মদ আলী।

পাকিস্তান ছাত্র সংঘ :

ছাত্র ফেডারেশন-এর অবলুপ্তির মুখে ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে 'পাকিস্তান ছাত্র সংঘ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। চরিত্রের দিক থেকে এই সংগঠনটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। তাছাড়া এই সংগঠনটি তার কর্মনীতি অনুসারে সমাজতন্ত্রের কথা যেমন প্রচার করত, তেমনি প্রচার করত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের কথা। কিন্তু এই সংগঠনটির লক্ষ্যে অস্বচ্ছতা থাকায়, এর প্রসার ঘটেনি। 'পাকিস্তান ছাত্র সংঘ'-এর প্রধান নেতা ছিলেন মোহাম্মদ কিবরিয়া।

ছাত্র এ্যাসোশিয়েশন :

সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' পত্রিকার ১৯৫০ সালের ২৩ নভেম্বরের সংখ্যায় 'ছাত্র এ্যাসোশিয়েশন' নামে একটি ছাত্র সংগঠনের উল্লেখ আছে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনে এই নামের কোন ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা কিন্তু কখনো উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন :

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 'মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন' নামে একটি সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের তৎপরতা ছিল মূলত সিলেট কেন্দ্রিক। এর প্রধান নেতা ছিলেন সিলেটেরই ছাত্রনেতা আবদুল সামাদ।

ছাত্র ইউনিয়ন :

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ফেডরেশনের অবলুপ্তি ঘটার প্রক্রিয়া শুরু হলে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রসমাজ এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চেতনা সম্পন্ন ছাত্রসমাজ মূলত যুব লীগ-এর নির্দেশ ও কার্যক্রমকে অনুসরণ করে। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় একটি অসাম্প্রদায়িক বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় ছাত্র সংগঠন গড়ার প্রশ্ন ওঠে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে ২৬ এপ্রিল ঢাকার বার লাইব্রেরির হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন গড়া হল। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলনে নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে নাম রাখা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। শেষ পর্যন্ত 'ছাত্র ইউনিয়ন' নামেই এই সংগঠনের সর্বাধিক পরিচিতি ঘটে। 'ছাত্র ইউনিয়ন' কমিউনিস্টদের সংগঠন বলেও পরিচিতি লাভ করে।

ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে 'ছাত্র ইউনিয়ন' এবং 'ছাত্র লীগ'-এর মিলন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই উদ্যোগ ফলপ্রসু হয়নি।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতদর্শগত অনৈকের কালোছায়া পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং প্রগতিপন্থী ছাত্র সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬২ থেকে '৬৪ ছিল এই মতাদর্শগত অনৈকের কালোছায়া প্রসারের সময়কাল। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'-এর উপরেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনৈক্য-বিভেদের প্রভাব পড়ে। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে' শুরু হয় বিভেদ ও গোষ্ঠী বিরোধ। সোভিয়েতপন্থী এবং 'চীনপন্থী' — এই দুই গোষ্ঠীতে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৫ সালে ১,২,৩ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'-এর ভাঙন চূড়ান্ত রূপ নেয়। 'চীনপন্থী' বা 'মাওবাদী' বলে পরিচিতরা এই সম্মেলন ত্যাগ করে পৃথক সংগঠন গড়ে। পৃথক সংগঠন গড়া হলেও সংগঠনের নামের পরিবর্তন সাধন করা হয় না। 'সোভিয়েতপন্থী' বলে পরিচিত গোষ্ঠীর নেত্রী ছিলেন মতিয়া চৌধুরী এবং 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন রাশেদ খান মেনন। শেষ পর্যন্ত এই দুই গোষ্ঠীর পরিচিতি গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)— এই দুই নামে মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্যায় এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়ন এই পরিচিতিই বজায় রেখেছিল। এক পর্যায়ে উভয় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পাকিস্তান ভাঙার প্রশ্নে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৭ সাল থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কার্যক্রম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ১৯৬৭ সালেই ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গোষ্ঠী এবং ছাত্র লীগ শহিদ মিনারে ২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান যৌথভাবে পালন করে। পরবর্তী সময়ে মুক্তি সংগ্রামের প্রাক্কালে ছাত্র আন্দোলনের বিশেষ পর্যায়ে 'মতিয়া' ও 'মেনন' গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল ছিল।

'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' ঐক্যবদ্ধ থাকাকালীন এবং ভাঙনের পরবর্তী সময়ে উভয় গোষ্ঠীর যাঁরা নেতা ও কর্মী ছিলেন— মোহাম্মদ ফরহাদ, বদরুল হক, জয়নাল আবেদিন, হায়দার আকবর খান রনো, রহিম আজাদ, আহমেদ জামাল, কাজী ফারুক আহমদ, মতিয়া চৌধুরী, নাজমা বেগম, রাশেদ খান মেনন, আবদুল হালিম, আবদুল হামিদ, গিয়াস কামাল, এ. কে. বদরুল হক, শওগাত আলম, সাদেকুর রহমান, শাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, শামসুদ্দোহা, নুরুল হাসান, নুরমোহম্মদ খান, কাজী আনোয়ারুল আজিম, সৈয়দ আবদুর

সাত্তার, মোহম্মদ সুলতান, মোহাম্মদ ইলিয়াস, আবদুল মতিন, গোলাম আরিফ টিপু, জাহির রায়হানের, এস. এ. বারী, এ. টি, কাজী জাফর আহমেদ।

ছাত্র কংগ্রেস :
পূর্ব পাকিস্তানে 'ছাত্র কংগ্রেস' নামেও একটি ছাত্র সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন লুৎফর রহমান, প্রণতি কুমার রায় প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)
পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-ই ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম একটি কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। তাহলেও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতপুষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলির ছাত্র নেতা ও কর্মীদের সমাবেশ ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতেও এই অধিকার অব্যাহত থাকে। ছাত্র ইউনিয়ন কোন অর্থেই কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন বা গণসংগঠন নয়। বিভিন্ন দল-মতের কিংবা নির্দল ছাত্র প্রতিনিধিরা ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে ছাত্র সমাজের মিলিত সংস্থা বা মঞ্চ রূপে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করে। পাকিস্তান গঠিত হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মিলিত মঞ্চ রূপে কাজ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের নাম ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ' সংক্ষেপে 'ডাকসু'।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত 'ডাকসু' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোন ছাত্র সংগঠনের (গণসংগঠন হিসেবে) চেয়ে এই 'ডাকসু'-এর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। 'ডাকসু'কে বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা অসম্ভব। ডাকসু-র নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং নির্দল ছাত্রনেতা এবং কর্মীরা। পঞ্চাশের দশক থেকে পরবর্তী সময়ের ডাকসু-র ছাত্রনেতা ও কর্মীদের সংগৃহীত নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

রফিকুল হক, এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার বাসু, মহিউদ্দিন আহমদ, আয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী, গিয়াসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মনসুরউদ্দীন আহমদ, জাকির আহমদ, আবদুল করিম, সৈয়দ মতিউর রহমান, আবফুর রাজ্জাক, কাজী মোজাম্মেল ইসলাম, আরিফুর রহমান, জাহানারা বেগম, অমূল্য চক্রবর্তী, নুরুল ইসলাম, সুলতান মাহমুদ খান, আবদুর রশিদ, হুমায়ুন কবির, আহসান আলী, শাহ্ সালাউদ্দিন, হায়াৎ হোসেন, আনোয়ারুল হক চৌধুরী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ার আলী, হায়দার খান, শহীদুল হক, কামাল উদ্দিন শিকদার, তোফায়েল আহমেদ, নাজিম কামরান চৌধুরী, নুরুল আরেফিন খান. উমাপতি মিত্র, অরবিন্দ বসু, নাদেরা বেগম, খালেক নেওয়াজ খান, হাবিবুর রহমান শেলী, বদিউর রহমান, মহম্মদ আলী, আবদুল মতিন, সিদ্দিক আহমদ, মুখলেসুর রহমান, মতিউর রহমান তালুকদার,

মজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, শামসুল আলম, নুরুল হুদা, সেরাজুদ্দিন খান (২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে আহত), আবদুস সালাম (২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে আহত), সালাউদ্দীন (ভাষা আন্দোলনের শহিদ), আবদুর জব্বার (ভাষা আন্দোলনের শহিদ)।

ধর্মভিত্তিক ছাত্র সংগঠন

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল দেশী-বিদেশী শক্তি থেকে শুরু করে দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল এবং শাসকগোষ্ঠী ধর্মভিত্তিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। এই ধরনের ছাত্র সংগঠনের পরিচয় যথাক্রমে :

ইসলামী ছাত্র সংঘ :

১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতের লাহোরে মাওলানা মওদুদী-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের মৌলবাদী সংগঠন জামায়াতে ইসলামী। পরবর্তী সময়ে জামায়াতে ইসলামী-র ছাত্র সংগঠন "ইসলামী জামায়াতে তালাবা" গঠন করা হয়। পাকিস্তান গঠনের পর ১৯৪৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানেও আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ লাহোরেই জামায়াতে ইসলামী এবং তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী জামায়াতে তালাবা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জামায়াতে তালাবা গঠিত হয়নি। ১৯৫৫ সালে এই সংগঠনের শাখা পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। জামায়াতে শব্দের অর্থ সংঘ এবং তালাবা শব্দের অর্থ ছাত্র। এই শব্দগত অর্থে 'ইসলামী জামায়াতে তালাবা'-এর বাংলা নামকরণ হল 'ইসলামী ছাত্র সংঘ'। ইসলামী ছাত্র সংঘ" ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকভিত্তিক ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এই সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার প্রথম সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ আলী।

পাকিস্তান ছাত্রশক্তি :

পূর্ব পাকিস্তানে খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সাংস্কৃতিক এবং ছাত্র সংগঠন দুই-ই ছিল। সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম ছিল 'তমুদ্দুন মজলিশ' এবং ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল 'পাকিস্তান ছাত্রশক্তি'। ভাষা আন্দোলনের সময়ে 'তমুদ্দুন মজলিশ'-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনে 'পাকিস্তান ছাত্রশক্তি' ফেলাফতে রাব্বানী পার্টির রাজনীতি অনুসারে তার ভূমিকা পালন করেছে। ফরমানউল্লাহ খান ছিলেন 'পাকিস্তান ছাত্রশক্তি'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পূর্ব পাকিস্তানে এই সংগঠনের আরেকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রনেতার নাম মওদুদ আহমদ। প্রথমে ১৯৫৫-৫৬ সালে এবং পরে ষাটের দশকে এই সংগঠনে ভাঙন শুরু হয়। ষাটের দশকের (১৯৬৫-৬৬) ভাঙন ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে এই সংগঠন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ইসলামপন্থী এবং আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীপন্থী নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এন.এস.এফ. (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন) :

১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তান ছাত্রশক্তি সাংগঠনিক সংকটে বিভক্ত হয়েই একটি অংশ গঠন করেছিল 'জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন' (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন)। 'জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন'-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব এ. আর. ইউসুফ। পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের ধিক্কৃত রাজনৈতিক নেতা মোনায়েম খান তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থে 'জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন'-কে ব্যবহার করেন। মোনায়েম খানের আমলে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন এন. এস. এফ. নামে পরিচিতি লাভ করে। এন. এস. এফ. মূলত শাসক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠন রূপেই বেশি করে পরিচিত ছিল। এই সংগঠন সামরিক শাসক আয়ুব খানেরও সমর্থক ছিল।

এন. এস. এফ.-এর উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন— আবুল হাসমত, সাইদুর রহমান (পাচপাত্তু), মাহবুল হক দোলন, জাহাঙ্গীর ফয়েজ আবুসুফিরান।

তালাবায়ে আরাবিয়া :

পূর্ব পাকিস্তানে মাদ্রাসা ছাত্রদেরও একটি সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের নাম 'তালাবায়ে আরাবিয়া' অর্থাৎ আরবী ভাষার ছাত্রদের সংগঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই এই সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল এবং মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। পাকিস্তান আন্দোলনে মাদ্রাসা ছাত্রদের এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল বিরাট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'তালাবের আরাবিয়া' কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী ছিল না। কিন্তু বাস্তবে এই সংগঠনের সম্মেলনগুলিতে মুসলিম লীগ এবং নেজামে ইসলাম দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল লক্ষ্যণীয়। এই সংগঠনটি ছিল মুসলিম মৌলবাদের সমর্থক। ১৯৬৩ সালে এই সংগঠন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল।

বিভিন্ন জেলায় উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন এই প্রদেশের অধিকাংশ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। জেলাগুলির স্কুল, কলেজসহ প্রায় সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্র আন্দোলনের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনগুলির জেলা শাখার সদস্য-সমর্থকরাই ছিলেন জেলার ছাত্র আন্দোলনের নেতা ও কর্মী। তাছাড়া সংগঠন বহির্ভূত কিছু নির্দল ছাত্রছাত্রীও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন জেলার ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা ও কর্মীদের নাম (বিভিন্ন তথ্য দলিল পুস্তক থেকে যা সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে) জেলা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল—

ঢাকা : তুলাবাম কলেজের আজিজ বাগমার।

পাবনা : এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র মাহবুবুর রহমান খান এবং জি.সি.আই. স্কুলের ছাত্র আমিনুল ইসলাম বাদশা।

যশোর : মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্রী হাসি রহমান, এম. এস. কলেজের আশরার সিদ্দিকী, তাছাড়া নাজিমুদ্দিন, হায়রতুল্লা জোয়ারদার, সুধীর রায়, হামিদা রহমান, রঞ্জিত মিত্র প্রমুখ।

রাজশাহী : রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্র একরামুল হক এবং অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নবিউদ্দিন, সামিরুদ্দিন, গোলাম রহমান, আবুল কাসেম চৌধুরী।

বগুরা : ছাত্রী নেত্রী রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন (পরে সালেহা চক্রবর্তী), আবদুল হামিদ, আমজাদ হোসেন, বলয় দাশ, মনসুর আলী, জগদীশ বসু।
বরিশাল : আখতারুদ্দিন আহমদ, এম ডাব্লিউ লকিতুল্লা, অনিল দাস চৌধুরী।
কুমিল্লা : এই জেলার ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মতিউর রহমান।

অস্বীকৃত ছাত্র সংগঠন

হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন :
বিচারপতি হামদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে অস্বীকৃত ছাত্র সংগঠনের একটি তালিকা সংযুক্ত ছিল। এই তালিকা অনুসারে পাকিস্তানের দুই অংশের ছাত্র সংগঠনগুলি হলো—
পশ্চিম পাকিস্তানে : ১। গণতান্ত্রিক ছাত্র ফেডারেশন (D.S.F.), ২। আন্তঃ কলেজ পরিষদ (I.C.B.), ৩। নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা (A.P.S.O.), ৪। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (N.S.F.), ৫। করাচী ছাত্র ফেডারেশন (K.S.F.), ৬। ইসলামী জামায়াতে তালেবা, ৭। ছাত্রী কংগ্রেস, ৮। জাতীয় ছাত্র সংস্থা (N.S.O.) [কেবলমাত্র লাহোরে এর অস্তিত্ব], ৯। পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্র লীগ।
পূর্ব পাকিস্তান : ১। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (E.P.S.U.), ২। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ (E.P.S.L.), ৩। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (N.S.F.), ৪। ছাত্রশক্তি (S.F.), ৫। ইসলামী ছাত্র সংঘ।

[নোট : হামদুর রহমানের মতে পূর্ব পাকিস্তানে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' হচ্ছে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টির, 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ' হচ্ছে আওয়ামী লীগের, 'ইসলামী ছাত্র সংঘ' হচ্ছে নেজামে ইসলাম বা জামায়াতে ইসলামের, এন. এস. এফ. হচ্ছে 'মুসলিম লীগে'র এবং 'ছাত্রশক্তি' হচ্ছে কাউন্সিল মুসলিম লীগ অথবা কৃষক শ্রমিক পার্টির অঙ্গ সংগঠন।

উপরে উল্লিখিত হামদুর কমিশন প্রদত্ত তথ্যসমূহ মোহাম্মদ হাননান-এর লিখিত বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বই-এর ২য় খণ্ডের ৯৬-৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত। — লেখক]

পূর্ব-পাকিস্তান : ছাত্র আন্দোলনের সালতামামি

১৯৪৭
উর্দুকে পাকিস্তানের সরকারি ও শিক্ষার ভাষা করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা এবং এই সভায় ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ, ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত।
১৯৪৮
২৩শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি সদস্যরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার খবর পূর্ব বাংলায় পৌঁছলে দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঢাকার ছাত্রসমাজ

উত্তাল হয়ে উঠে। মুসলিম লীগ সদস্যদের এই আচরণের বিরুদ্ধে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা এবং স্কুলের ছাত্ররা মিলিতভাবে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয় এবং ঐ দিন বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আহুত পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, ছাত্র ফেডারেশন-এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। ১১ই মার্চ ছাত্রদের গ্রেপ্তার ও সরকারি দমননীতি শুরু হলে এর প্রতিবাদে ১২ই মার্চ ছাত্র সমাজ সোচ্চার হয়, ১৩ই মার্চ পালন করা হয় ছাত্র ধর্মঘট। ৭ দফা দাবিতে ছাত্র আন্দোলন তীব্ররূপ নেয়। বন্দিমুক্তি, তদন্ত অনুষ্ঠান, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে এবং বিক্ষোভ আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকার করে নেয়। ঐ দিন প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে সরকার ভাষা আন্দোলনে ধৃত বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১শে মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ভাষা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে আবার বিক্ষোভ দানা বাধে এবং "কোথাও কোথাও জিন্নার সম্মানে নির্মিত তোরণ ভেঙে, কোথাও তার ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নাহর সম্মানে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ তাঁর ভাষণে "উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে" ঘোষণা করলে জিন্নাহর সামনেই উপস্থিত ছাত্রদের বেশ কিছু অংশ 'না' 'না' করে প্রতিবাদ জানান। ২৪শে মার্চই জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছাত্রদের সম্পাদিত ৮ দফা চুক্তি অস্বীকার করেন এবং তিনি ব্যাখ্যা দেন ঐ চুক্তি ছাত্ররা জোরপূর্বক করেছে। এই বছর পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বরিশালে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয় এবং এই কমিটির আহ্বানে জুন ম্যসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও করা হয়েছিল। ১৪ জুলাই ঢাকায় পুলিশ ধর্মঘট (বেতন না পাওয়ার জন্য) ও বিক্ষোভ, পুলিশের সাথে সৈন্যবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ ও ২ জন পুলিশ নিহত। ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। পুলিশ ধর্মঘটের কিছুদিন পরেই ইডেন ও কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের একত্রিকরণের প্রতিবাদে ঢাকায় ব্যাপক ছাত্রী বিক্ষোভ। সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী সরকারি কলেজে বৃটেনের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের কন্যা এলিজাবেথের পুত্র সন্তান-প্রসব উপলক্ষে বৃটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' উত্তোলন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ছাত্রছাত্রীরা 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' 'কমনওয়েলথ ছাড়তে হবে' স্লোগান দিয়ে 'ইউনিয়ন জ্যাক'-এ আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৫ নভেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর ঢাকায় ছাত্রী ধর্মঘট এবং ছাত্রী বিক্ষোভ। ২১শে নভেম্বর রাজশাহীতে ছাত্রদের উপর সরকারি গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ। ছাত্রনেতা গোলাম রহমানকে রাজশাহী শহর থেকে বহিষ্কার। ২৭শে নভেম্বর ঢাকায় সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট। ৬ ডিসেম্বর ঢাকার ইডেন ও কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দাবি শিক্ষামন্ত্রী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৯

৮ জানুয়ারি পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছাত্রদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হয়। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের নিম্ন কর্মচারী আন্দোলনের সমর্থনে ৩ মার্চ, ৫ মার্চ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ডাকে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বর্জন। ৪ঠা মার্চ একটি

সেমিনারে আরবী হরফে বাংলা চালুর নিন্দা করা হয়। ১০ মার্চ ছাত্র ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে যুক্তসভা। এর পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের ছাত্র কর্মচারী যৌথ আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি, চাপ দিয়ে কর্মচারী আন্দোলন প্রত্যাহার এবং ২৭ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে বহিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৭ এপ্রিল ছাত্র নেতাদের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ। পুনরায় ২০শে এপ্রিল এবং ২১শে এপ্রিল ছাত্র ধর্মঘট। ২১শে এপ্রিল ছাত্রদের উদ্যোগে জনসভা থেকে ছাত্র কর্মপরিষদ ২৫শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ২৫শে এপ্রিল ১৪৪ ধারা জারি করা সত্ত্বেও এবং গ্রেপ্তার ও পুলিশী দমনপীড়ন সত্ত্বেও ছাত্রদের আহূত সাধারণ হরতাল ও ধর্মঘট ঢাকা নগরীতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ২৫শে এপ্রিল রাজশাহী জেলে রাজবন্দিদের উপর গুলিবর্ষণ-এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজও সোচ্চার হয়ে ওঠে। ২৭শে অক্টোবর নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে সরকারের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির (পাকিস্তান সংবিধান) প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। ১২ই নভেম্বর থেকে গোটা নভেম্বর মাস মূলনীতি কমিটির সুপারিশ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভে ছাত্র সমাজও সামিল হয়।

১৯৫০

বছর শুরুতেই বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়, এই দাঙ্গা প্রতিরোধে ছাত্রসমাজের একাংশ সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসে। ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দাঙ্গাবিরোধী শান্তি সমাবেশ এবং ১২ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষক ছাত্রদের যৌথ সভার অনুষ্ঠান। ডঃ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পূনর্বসতি কমিটি' গঠন। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের উদ্যোগে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি' গঠন করে ২ মার্চ শান্তি দিবস ঘোষণা করা হয়। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন' নিজস্ব নামে দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। ১১ মার্চ একটি 'সাদা-মাটা অনুষ্ঠানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।' ১৪ই মার্চ সরকার শান্তি কমিটির কার্যালয় বন্ধ করে দেয় এবং এর প্রতিবাদে ছাত্ররা সোচ্চার হয়, বিশেষ করে সিলেট শহরে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ছাত্র এ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এবং পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে দেশের শিক্ষা সংকট সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন' অনুষ্ঠান।

১৯৫১

সংক্ষিপ্ত এম. বি. বি. এস. কোর্স প্রবর্তন ও মেডিক্যাল স্কুলগুলির উন্নতির দাবিতে ২৫ জানুয়ারি থেকে মেডিক্যাল ছাত্র এসোসিয়েশনের ডাকে মেডিক্যাল ছাত্রদের ধর্মঘট। ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারি ৫ জন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার প্রতিবাদে ১৩, ১৯, ২৬ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল ছাত্রদের বিক্ষোভ ধর্মঘট।

অন্যবারের মত ১১ই মার্চ ঢাকাও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১১ মার্চ ও প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্র ভাষা দিবস উপলক্ষে এই দিন ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। এই ১১ মার্চ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের পৃথক সমাবেশও ছিল আকর্ষণীয়। ১৮ই মার্চ মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দাবিতে দেশব্যাপী পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট। ১১ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সিদ্ধান্ত মত

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্যাদের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ। এদিকে সারা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ এবং লবণ সংকট দেখা দিলে এই সংকট প্রতিরোধে আন্দোলনে ছাত্র সমাজ এগিয়ে আসে, ২৭শে অক্টোবর ছাত্ররা ঢাকায় সভা, মিছিল করেন।

১৯৫২

২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকায় মুসলিম লীগের সমাবেশে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের ডাকে খাজা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘট করেন। ৩১ জানুয়ারি এক সর্বদলীয় সমাবেশে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন) 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিল এবং ছাত্র সমাবেশের পরেই বিকালে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় ২১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের আহ্বান। ১১ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় পতাকা দিবস। ২০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র হরতাল, সভা, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার বিষয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ঐদিন গভীর রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল সালিমুল্লাহ ছাত্রাবাস থেকে এসে ''সর্বদলীয় পরিষদকে জানিয়ে দেয় যে, ছাত্ররা আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে''। ছাত্রদের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতের ঐ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিকে নিয়ে যায় এবং ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকারের সবরকম স্বৈরাচারী দমনপীড়ন অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী গ্রেপ্তারবরণ করেন। পুলিশ গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই ৪ জন (দ্বিমত আছে) শহিদ হন এবং ৯৬ জন আহত হন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে 'গায়েবানা জানাজার' মিছিল এবং মিছিলে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণ। গুলিবর্ষণের খবর শুনে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান রেডিও-র ঢাকা কেন্দ্র সাময়িক অচল। ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদের রক্তস্নাত নির্দিষ্ট স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ। ২৪ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি দুবার শহিদ মিনারে উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ২৬ ফেব্রুয়ারি সৈন্যবাহিনী সশস্ত্র পুলিশ কর্তৃক প্রথম শহিদ মিনার-এর ধুলিসাৎ। ২১ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঘটনায় গোটা পূর্ব বাংলা অগ্নিগর্ভ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্তব্ধ, শাসকদল মুসলিম লীগ বিচ্ছিন্ন মরিয়া শাসক গোষ্ঠী, ব্যাপক সন্ত্রাস প্রদেশব্যাপী শত শত ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার। ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদের বলপূর্বক বের করে দেয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ ৫ মার্চ সারা দেশে 'শহিদ দিবস' পালন, ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু চরম নির্যাতনের ফলে সারা প্রদেশে শহিদ দিবস এবং ধর্মঘট মোটামুটি হলেও ঢাকায় তা সফল হয়নি। ১২ এপ্রিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, ২৭ এপ্রিল ঢাকায় সারাদেশের ভাষা সৈনিকদের একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করে। ইতিমধ্যে ৯ জন প্রধান আন্দোলনী নেতার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয় এবং সকল সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই নির্যাতনের ফলে

ভাষা আন্দোলন এক অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়। ভাষা আন্দোলনকে স্তিমিত করার লক্ষ্যে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ এক শ্রেণির রাজনৈতিক "বিভিন্ন রাজনৈতিক কূটকৌশল চালাতে শুরু করেন। কিন্তু আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে এলেও পূর্ব বাংলার জনমতের চাপে এই হাসান শহিদ সোহারওয়ার্দী পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং ১৯৫২ সালেরই ২৯ জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে তা প্রকাশিত হয়েছিল।" ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক পর্বে ঢাকা মহানগরী ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের চাটগাঁ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, সিলেট, রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, বরিশাল, কুষ্টিয়া, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, খুলনা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহর-নগর-গঞ্জে শত শত ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন উত্তাল আন্দোলনের পুরোভাগে। এই উত্তাল আন্দোলনকে বিভেদের গর্ভে নিমজ্জিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা স্বার্থান্বেষী মহল থেকে উস্কে দেবার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের উপরও এই বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িকতার কালোছায়া দেখা দেয়। অনুভূত হয় বলিষ্ঠ সংগঠিত ছাত্র সংগঠনের। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও সংগঠিত ছাত্র সংগঠনের উপলব্ধি থেকে এই বছরের ২৬ এপ্রিল গঠিত হয়েছিল 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামে একটি ছাত্র সংগঠনের। ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই বছরের ডিসেম্বর মাসে। "ছাত্র ইউনিয়নের ডিসেম্বর সম্মেলনই ৫২ সালের ছাত্র আন্দোলনের শেষ খবর।"

(বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: মোহাম্মদ হাননান: ২য় খণ্ড)

১৯৫৩

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' পালনের আহ্বান; বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি শহিদ স্মরণে রোজা রাখার আহ্বান জানায়; এই উভয় কর্মসূচিই নির্দিষ্ট দিনে পালিত হয়। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে এবং ছাত্রবেতন হ্রাসের দাবিতে মার্চ মাস থেকে প্রদেশ জুড়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন চলতে থাকে। এইসময় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করলে তার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ১৪ এপ্রিল ১০ জন ছাত্রনেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্র-ধর্মঘট ১৮ই এপ্রিল থেকে ৩রা জুলাই চলতে থাকে। কর্তৃপক্ষ ঐ বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়, অন্যান্য দাবিও কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়। ১৯৫৩ সালের ছাত্র আন্দোলন সাফল্য লাভ করে এবং জুলাই-এর পর থেকে ছাত্র সংগঠনগুলি তাদের সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত করতে শুরু করে ইতিমধ্যে ঠিক ঐ সময়ে (১৮ এপ্রিল ১৯৫৩) খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত হলে বগুড়ার মোহম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীত্বে নিয়োগ করা হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে পালাবদল লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। ডাকসু-র নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট'। ছাত্রদের নেতৃত্বে গঠিত এই 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট'-ই পূর্ব পাকিস্তান রাজনীতিতে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির পূর্বসুরী।

১৯৫৪

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের আইনসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্র সমাজের গড়া যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করে বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বৎসর ঐতিহাসিক

যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে। এইরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে ছাত্র সংগঠনগুলি ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে আরেক নতুন প্রচেষ্টা শুরু করে। এই প্রচেষ্টা একদিকে সাম্প্রদায়িকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, অপরদিকে বৃহত্তর ছাত্র সংগঠনগুলির একত্রীকরণের প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যেই এই বছরের ১৬ জানুয়ারি ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের যুক্ত বৈঠকে 'নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা' [All Pakistan Students Organisation (APSO)] গঠন করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান প্রথমে জানিয়েছিল। ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ, পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখরা বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে এই একই আওয়াজ তোলেন। যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বিভেদ ছিল। মাওলানা আশরাফউদ্দিন চৌধুরী এই আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু মাওলানা ভাসানী প্রমুখেরা কমিউনিস্ট পার্টিকে ফ্রণ্টে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আত্ম-গোপনকারী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত করে মুসলিম লীগের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করতে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্টকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে। ৮ থেকে ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংসদের ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট ২২৮ টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন। এরপরই ৩রা এপ্রিল ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সংসদীয় দলের সভায় উর্দুর সঙ্গে বাঙলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ১ মাস ২৭ দিন না যেতেই ৩০ মে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে গভর্ণরের শাসন কায়েম করেন। ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনের প্রস্তুতির আড়ালে গভর্নরের শাসনে বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনের কাজ শুরু করে।

১৯৫৫

২১ ফেব্রুয়ারি ভোর হওয়ার পূর্বেই ছাত্রাবাসগুলি পুলিশ ঘেরাও করে এবং ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে, জেলখানাগুলি ভরে যায়। অপরদিকে শাহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারে আইনমন্ত্রীরূপে যোগদান করে। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন ক্রীড়নকের মত এক ইউনিট প্রথায় [পূর্বপাকিস্তান ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন আইনসভা সদস্য] নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলে এই সময়ে ছাত্র ও গণবিক্ষোভ পূর্ব বাংলায় আরও চরমে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দাবি তোলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইনসভার প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করতে হবে। ইতিমধ্যে ৭ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার সময় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরগরম হয়ে উঠেছিল। ব্যাপক আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়। এই কর্ম পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদ যোগদান করে।

১৯৫৬

পূর্ব বাংলার সংসদ অধিবেশন আহ্বানের দাবিতে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ-এর ডাকে সারা প্রদেশে 'প্রতিরোধ দিবস' এবং ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সংবিধানের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ সপ্তাহ' পালন। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর নগ্ন-পদযাত্রায় অংশগ্রহণ। ঐদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রবাসের ১২ নং শেডের কাছে বরকতের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থানে পূর্ববাংলা সরকারের উদ্যোগে শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ৩০ আগস্ট আবুহোসেন সরকার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ। ৪ সেপ্টেম্বর ভূখা মিছিলে পুলিশের গুলিতে ৪ জন নিহত এবং আতাউর রহমান খানকে সরকার গঠনের আহ্বান। ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে আবার কোয়ালিশন মন্ত্রী গঠন। ১২ সেপ্টেম্বর শাহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সারা পাকিস্তানের রাজনীতি টালমাটাল হতে শুরু করে। ছাত্ররাও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হতে থাকে।

১৯৫৭

গত বছর অর্থাৎ ১৯৫৬-এর প্রেক্ষাপটে বামপন্থী ছাত্র-যুব সমাজকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। রংপুর শহরে ৪ থেকে ৭ জানুয়ারি ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৭-৮ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে বিতর্কে আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরে এবং দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২৫-২৬ জুলাই মাওলানা ভাসানী, পশ্চিম পাকিস্থানের গাফফর খান, মাহমুদল হক ওসমানী প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ১১ অক্টোবর শাহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অপসারণ করে পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় মুসলিম লীগ নেতা আই, আই, চুন্দ্রীগড়-কে। এই বৎসর দুই অংশে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছিল অত্যন্ত অস্থির এবং সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনও ছিল অনেকটা স্তিমিত।

১৯৫৮

এই সালটি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থানপতনের ইতিহাস। রাজনৈতিক বিভেদ-দলাদলি তুঙ্গে। রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপে জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ। ছাত্র রাজনীতিও বিভ্রান্তির কবলে। ৩০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তনের তদানিন্তন গভর্নর ফজজুল হক অধিকাংশ সদস্যের অভিযোগের অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানকে পদচ্যুত করেন এবং আবুহোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসান। ১ এপ্রিল একজন চীফ সেক্রেটারি গভর্নরের দায়িত্ব পেয়েই এক ঘন্টার মধ্যে আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রীসভাকে উৎখাত করে, পুনরায় আতাউর রহমানের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৮ জুন পূর্ব পাকিস্তান সংসদের অধিবেশনে আতাউর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার ফলে তাঁর মন্ত্রীসভা পতন ঘটে এবং ১৯শে জুন আবুহোসেন সরকারকে আবার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ২২ জুন আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সমঝোতা হলে আবার আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রীসভার পতন হয়। ২২ জুলাই আতাউর রহমানকে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। এই উত্থান-পতনের রাজনৈতিক নাটক চলতে চলতে সেপ্টেম্বরে মাঝে পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনে স্পীকারের বিরুদ্ধে দুটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। এর একটি প্রস্তাবের বয়ানে ছিল "স্পীকার আবদুল হাকিম পাগল"।[৫] কৌতুকের বিষয় এই বয়ানসহ দুটো প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়ে যায়। ২৩ সেপ্টেম্বর সদস্যদের হাতাহাতিতে সংসদ রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং

আহত সাংসদদের সাথে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী হাসপাতালে নীত হলে হাসপাতালেই তাঁর জীবনাবসান হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। সৈন্যবাহিনী রাজপথে নেমে পড়ল। ২৪ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসাবে সেনাধ্যক্ষ আয়ুব খানকে নিয়োগ করেন। কিন্তু ২৭ অক্টোবর আয়ুব খান শপথ নিয়েই ইস্কান্দার মীর্জাকে পদচ্যুত করে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেন। পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় আয়ুব খানের দীর্ঘ একটানা সামরিক শাসন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আয়ুব খানকে মদত দিতে থাকে, পোক্ত হতে থাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত। আয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সাড়া দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে থাকেন। শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের জেলে বন্দি করেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কাজকর্মও নিষিদ্ধ হতে থাকল। ছাত্র সংগঠনগুলিও নতুন কৌশলে ছাত্র সংগঠন চলতে লাগল। যেমন— "সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ফলে ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই নয় শুধু , নির্বাচনেও তারা সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আসরে নামল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ছিল সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্রলীগের শিল্প সাহিত্য সংঘ, ছাত্রশক্তির সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ছাত্র মজলিস, জামিয়ে মিল্লাত নামে ইসলামী ছাত্র সংঘ কাজ করে। এমন নাম সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেই ছড়িয়ে পড়ল; যেমন, অগ্রদূত, প্রগতি, অগ্রগামী, যাত্রিক, দিশারী ইত্যাদি নামের মধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো আত্মগোপন করলো।"[৬]

১৯৫৯

এই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলি অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ডাকসু-র একটি অংশের উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি এক সভায় এই পরিস্থিতি নিয়ে অলোচনা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ফজলী হোসেন এক বিবৃতিতে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের আহ্বান জানান। কর্তৃপক্ষের বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে ছাত্ররা ২১শে ভোরে ডাকসু অফিসের সামনে জড়ো হয় এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ কালো-পতাকা উত্তোলন করেন। এবং ছাত্ররা নগ্ন-পায়ে শহিদ মিনার পর্যন্ত মিছিল করে যায়। এই কর্মসূচিই প্রথমত আয়ুর খানের আমলে ছাত্রসমাজ সাহসের সঙ্গে পালন করে। তাছাড়া ঐদিন শহিদ জব্বারের মায়ের (তিনি ভারত থেকে গোপনে গিয়েছিলেন) উপস্থিতিতে কার্জন হলে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই সময়ে আয়ুব শাসনের নির্দেশে বাংলা কবিতা ইত্যাদির বিকৃতি সাধন শুরু হয় এবং শুরু হয় বাংলা উর্দু মিলিয়ে এক খিচুরি ভাষা তৈরির এবং রোমান হরফ তৈরির প্রচেষ্টা। এই বিকৃতির বিরুদ্ধে ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগঠনগুলির এক মিলিত অনুষ্ঠানে ডঃ শহীদুল্লাহ সভাপতির ভাষণে এই বিকৃতি প্রচেষ্টা প্রত্যাখান করেন। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সরকারি এন. এস. এফ. এবং ছাত্রশক্তির উদ্যোগে সামরিক শাসনের মধ্যে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ'-এর (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনের ফলাফল আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধেই যায়। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন ক্রমান্বয়ে চাঙ্গা হতে থাকে।

১৯৬০

এই সালটি ছিল সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের উপর সরকারি মদতপুষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলির হামলার বছর। যেমন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত 'অগ্রগামী'র অনুষ্ঠানে এন. এস. এফ. ও ইসলামী ছাত্র সংঘ-এর মিলিত হামলা। এই ধরনের হামলাবাজী চললেও পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজ বিভিন্ন ছদ্মনামী সংগঠনের মাধ্যমে আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদরা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষ্যমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এদের মধ্যে ডাঃ মাহমুদ হোসেন, রেহমান সোবহান উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে অর্থনৈতিক ফাঁকির কবলে পড়েছে তা তুলে ধরার ফলে জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তি আন্দোলনের '৬ দফা' এঁদের চিন্তা-ভাবনার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল।

১৯৬১

আয়ুবের সামরিক শাসনের দমন-পীড়নে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনগুলির তরফে কোন আন্দোলন সংগঠন সম্ভব ছিল না। তাই, আগের পরিকল্পনা মত-ই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতির গতিধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানসূচিও ঐ একই পদ্ধতিতে এই বছরও পালন করা হয়। কিন্তু এই বছরটি ছিল রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বৎসর। ছাত্র সংগঠনগুলি তাদের সংস্কৃতি সংগঠনে-এর নামে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭] পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ছাত্র সমাজের এই সিদ্ধান্তে রুষ্ট হন এবং সরকারের মদতে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক কুৎসা প্রচারে এগিয়ে আসে। 'আজাদ' পত্রিকা এতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। 'আজাদ' তার ১২ বৈশাখ তারিখের সম্পাদকীয়তে 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক রচনায় বলে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে (কাফেরদের) ডাকের সমান এবং 'এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু'। এতদ্সত্ত্বেও ছাত্রসমাজ রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পিছিয়ে আসেনি। পূর্ববাংলার ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ডাকসুর উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয়। কার্জন হলে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। ছাত্র ইউনিয়নের জাহানারা বেগম, অমূল্য চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের নেতৃত্ব দেন। অনুষ্ঠান বন্ধে কর্তৃপক্ষ অপারগ হলে পরে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠার উপক্রম হলেই পাকিস্তান সামরিক সরকার বিচারপতি আসির নেতৃত্বে ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্রনেতৃবৃন্দ সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল অঙ্কুরেই ছাত্র আন্দোলন দমন করা এবং উক্ত কমিশন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেবার জন্য সুপারিশ করেছিল। এই বছরের মাঝামাঝি আয়ুব মন্ত্রীসভার সদস্য কে এম শেখ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিতে এলে ছাত্র নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত দেশের অর্থনীতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রশ্নে সদুত্তর দিতে অপারগ ও ব্যর্থ হলে ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এই ১৯৬১ সালের শেষার্দ্ধে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠকের পর আয়ুব শাহীর অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলনের ৮ দফা কর্মসূচি ও রূপরেখা ঠিক হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্যাম্পাস থেকে প্রথমে ছাত্রদের দিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো হবে এবং পরে আওয়ামী লীগসহ বামপন্থীরা সে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই বৈঠকেই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান কর্মসূচিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবিকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব তুলেছিলেন।) ৩০শে ডিসেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের প্রায় ৩০-৩৫ জন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীর উপস্থিতিতে ঢাকায় ইস্কাটনের একটি বাড়িতে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়— 'যে কোন কিছুর বিনিময়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) থেকেই তা শুরু করা হবে।' এই বছর ছাত্রদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতার অভাবে ছাত্রদের সরকার বিরোধী মনোভাব সংগ্রামে রূপান্তরিত হতে কোন গতিমুখ খুঁজে পায় না।

১৯৬২

৩০ জানুয়ারি শাহিদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার হলেন। সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে[৮] ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রশক্তি এবং এন.এস.এফ -এর ছাত্র প্রতিনিধিরা পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এক সভায় মিলিত হন। পরের দিন ছাত্র ধর্মঘট পালন সম্পর্কে বিতর্ক হলে ছাত্র শক্তি এবং এন.এস.এফ.-এর প্রতিনিধিদের আপত্তিতে তা গ্রহণ করা যাচ্ছিল না। পরে এই দুই সংগঠনকে কিছুটা আড়াল করেই (অর্থাৎ এদের না জানিয়ে) ১ ফেব্রুয়ারি শাহিদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের ১ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল চলতে থাকে। এটাই ছিল দীর্ঘ ৪ বৎসর পর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জেহাদ এবং সংগ্রাম। ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে হঠাৎ ঘোষণা করা হয়, আগামীকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকার আমতলায় বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এবং এই দিন রাত থেকেই সারা ঢাকা শহরে প্রথম আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে রং দিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এই দেওয়াল লিখনকে বলা হত 'চিকামারা'। এই প্রথম দেওয়াল লিখনে বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যে ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'Down Ayub', 'পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা চলবে না'। ৭ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খানকে ঘেরাও-এর কর্মসূচি নিয়েছিল ছাত্র সমাজ, কিন্তু পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধেই এই ঘেরাও কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করা হয়। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর সবরকম প্রচেষ্টাকে কৌশলে ফাঁকি দিয়ে ছাত্রদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত লাঠি চার্জ করে ছাত্র মিছিল ছত্রভঙ্গ করে, ছাত্রদের আন্দোলন সেদিন থেকে পরিণত হয় গণআন্দোলনে। ৭ ফেব্রুয়ারির পর সামরিক সরকার ছাত্রাবাসগুলি থেকে ছাত্রছাত্রীদের তাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৭ দিন ধরে একটানা জুলুম চালিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই পর্বে ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২২৯জন ছাত্রকে ঢাকাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এতেও ছাত্র আন্দোলন দমন করা সম্ভব হল না। বরং ঢাকার বাইরে বরিশাল, পিরোজপুর, সিলেট, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে ছাত্র আন্দোলন প্রবল রূপ নেয়। মার্চ মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুললে ছাত্র আন্দোলন আবার ব্যাপক রূপ নেয়। ১৫ মার্চ থেকে একটানা ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের বিধান অনুসারে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক

পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। ছাত্ররা এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে এপ্রিলের মাঝামাঝি 'শপথ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত করে। ৩১ মে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর-ই পর আয়ুবের শাসনতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন করে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করে ২৪ জুন ৯ জন নেতা এক বিবৃতি দেন। ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কোন দলকে পুনরুজ্জীবিত না করে গঠন করা হয় ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট। ছাত্ররাও 'শরীফ কমিশনের' শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ আগস্ট ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে ছাত্রদের এক সমাবেশ থেকে ১৫ আগস্ট সারাদেশে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত সফল হবার পর ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সারা প্রদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিলে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেওয়া হয়। সেদিন সংগ্রামী ছাত্রদের বিক্ষোভ পিকেটিং-এ মেজাজ ছিল অন্যরকম। পুলিশের সাথে ছাত্রদের প্রকাশ্য লড়াই, সাধারণ মানুষও এই লড়াইতে সামিল। শেষপর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে নিহত হন গোলাম মোস্তাফা, বাবু, ওয়াজিউল্লাহ। পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ১৮, ১৯, ২০ সেপ্টেম্বর পালিত হয় শোক দিবস। যশোরে এই কর্মসূচি পালনের সময় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৪৩ জন আহত হন। ২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সরকার হাটের স্কুল-ছাত্ররা একই কর্মসূচি পালনে মিছিল করে অগ্রসর হলে পুলিশ গুলি চালায় এবং একজন স্কুল-ছাত্র নিহত হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা পল্টন ময়দানে এক ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠতে থাকে তখন এক পর্বে ছাত্র ও বাঙালি অফিসারদের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সামরিক অফিসারদের বক্তব্যে ছাত্রনেতৃবৃন্দ আরও উৎসাহিত হয় (পাদটিকা দ্রষ্টব্য)[৯]। 'সমগ্র দেশে '৬২-র আন্দোলন তাই অসামান্য প্রাণের জোয়ার বয়ে আনে'। এক হিসাব অনুসারে ১৯৬২ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২৭ দিন ক্লাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৬৩

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন জনগণের বিভিন্ন অংশকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই পটভুমিতেই ১৯৬৩ সালে 'ডাকসু' এবং হল সংসদকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। এই নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বমোট ৯৩টি আসনের মধ্যে ৮০টি আসনে জয়লাভ করেছিল। এর পরের ঘটনা আরও উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল মাসে প্রগতিশীল ছাত্ররা একদিন সলিমুল্লাহ হল থেকে জাতির পিতা মহম্মদ আলী জিন্নার ছবি অপসারণ করে। এর পরিণতিতে সামরিক সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের অনুগামীদের সাথে সরকার বিরোধী ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয় এবং কায়েদের আজম কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বছর এই ধরনের কিছু ঘটনা ছাড়া সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি মূলত নিজেদের সংগঠনকে মজবুত এবং সংগঠিত করার জন্য সাংগঠনিক সম্মেলন, কনভেনশন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন। এই বছর পাকিস্তান ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে 'সমাজতন্ত্র' প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতেই মতপার্থক্য দেখা দেয়। তবু এই সম্মেলন ছাত্র সমাজকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অপরদিকে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রেলওয়ে মিলনায়তনে ১৭, ১৮, ১৯ অক্টোবর। ছাত্র ইউনিয়নের এই সম্মেলনেও

সংগঠনকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে মজবুত করে আন্দোলন অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এইভাবে ১৯৬৩ ছিল কার্যত ছাত্র সংগঠনগুলির সাংগঠনিক প্রস্তুতির বছর।

১৯৬৪

আলোচ্য বছরটি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত বৎসর। ছাত্র আন্দোলনসহ গণআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান গতিবেগকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সামরিক সরকারের ষড়যন্ত্রে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রথমে হিন্দু-মুসলমান, পরে বাঙালি-বিহারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান হয়। ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ আনার জন্য সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ.-কে কাজে লাগানো হয়। ভারতেও এই সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হবার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনাতে প্রথমে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং পরে তা ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ৭ জানুয়ারি ঢাকা, আদমজী এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলে আরম্ভ হয় বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা। ১০ জানুয়ারী এই দাঙ্গা ব্যাপকরূপ নেয়। ১৫ জানুয়ারি দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাতে গিয়ে ঢাকার নবাবপুর রেলক্রসিং-এর সামনে নিহত হলেন প্রখ্যাত কবি আমির হোসেন চৌধুরী। বিহারী দাঙ্গাবাজদের হাতে খুন হলেন নটর ডাম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক। মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের ছাত্রী-আবাসেও বিহারি দাঙ্গাবাজরা হামলা করে এবং ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করে। আয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হলেন। তাঁরাও দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করলেন। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়ার (তফাজ্জল হোসেন) সভাপতিত্বে এক সভায় এই প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৭ জানুয়ারি এই প্রতিরোধ কমিটির প্রচারিত এক ইশতেহার 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর ফলে দাঙ্গা প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে উঠতে থাকে। দাঙ্গার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগঠনগুলি দিশেহারা অবস্থার মধ্যে পড়ে। চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত বিরোধের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র ইউনিয়নেও মতবিরোধ চলল তখন। ছাত্রলীগও দিশেহারা অবস্থায় কর্তব্যহীন। এই পরিস্থিতি যদিও ছিল সাময়িক। বামপন্থী গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবীরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তিমিছিল সংগঠিত করেন। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে আওয়াজ ওঠে— 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও'। এর মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপও চলতে থাকে। ১৯ মার্চ হরতাল পালন করে পালিত হয় ভোটাধিকার দিবস, ছাত্রসমাজ তাতে অংশগ্রহণ করে। ১৯ মার্চ থেকে দাঙ্গার ক্ষত মুছতে থাকে, গণআন্দোলন মাথা তোলার প্রয়াস পায়। এই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পূর্ব বাংলার গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মোনায়েম খাঁ ছাত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। অনুরূপ ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ২২ মার্চ। 'ডাকসু'র অফিসে ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্তমত সমাবর্তন উৎসব বর্জনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পুলিশ, গুণ্ডাবাহিনী নিয়োগ করেও গভর্নর মোনায়েম খাঁ সেদিন সমাবর্তন উৎসব চালাতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাতের অন্ধকারে ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ৩০ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে আত্মসমর্পণের হুকুম দেয়। কিন্তু ছাত্রনেতৃবৃন্দ তা

অগ্রাহ্য করে। এর ফলে সারা প্রদেশে ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র তেজে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার সারা প্রদেশের ৭৪টি কলেজ, ১,৪০০টি উচ্চ-বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এবং প্রায় ১,২০০ জন ছাত্রকে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে। সামরিক সরকার এতে ক্ষান্ত হয় না। ছাত্রনেতা ও কর্মীদের উপর বিভিন্ন পর্যায়ের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ শুরু করে। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জনের ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সহ ২২ জনকে রাসটিকেট করা হয় ও ২৪ জনের উপর ১ বছরের জন্য মুচলেকা সইয়ের আদেশ জারী করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়। ঢাকা কলেজ থেকে ১০ জন ও আর্ট কলেজ থেকে ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।"[১১] গভর্নর মোনায়েম খাঁর সরকার ৩০ এপ্রিল ঢাকা (দক্ষিণ) মহকুমা শাসকের এজলাসে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দাঙ্গাবিরোধী ইশতেহার প্রকাশের (যা ১৭ জানুয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল) অভিযোগে এক মামলা দায়ের করেছিল (এই মামলাটি দীর্ঘ ৫ বৎসর চলার পর ১৯৬৯-এর ৫ এপ্রিল সরকার প্রত্যাহার করে)। ২৮ মে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাত্র নির্যাতনের ৩০ দিনের এক খতিয়ান প্রকাশিত হয়। ৮ জুলাই হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের এক ঐতিহাসিক রায়ে ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং মামলায় জয়লাভ করে ছাত্ররা ঢাকা নগরীতে বিজয় মিছিল বের করে। কিন্তু পুলিশ এই মিছিলের উপর লাঠি চার্জ করে।

১৮ জুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহ) ছাত্ররা এবং ঢাকা কৃষি কলেজের ছাত্ররা নিজেদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে ৪৮ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করে। এইভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নির্যাতন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাত্র ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতি ৪২ ঘন্টায় ১ জন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে।

১৯ আগস্ট থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবার ছাত্র ধর্মঘট শুরু হল। ২৯ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ১৬ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পরিচিত মধুর ক্যান্টিনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক মিলিত সভায় ২২ দফা দাবির ভিত্তিতে আয়ুব বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ)। ২৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রবন্দি এবং রাজনৈতিক দলের বন্দিদের মুক্তির দাবিতে পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস। এইদিন ছাত্র সংগঠনগুলির অনুরোধে রাজনৈতিক দলগুলির আহ্বানে পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। ছাত্র আন্দোলনের এইরূপ পটভূমিতে পাকিস্তান সরকার ১৫ ডিসেম্বর 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করে। এই কমিশন কাগজে কলমে শিক্ষা কমিশন হলেও বাস্তবে এই কমিশন ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনের অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। এই শিক্ষা কমিশন নিয়োগ এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কেও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৬৪ সালের প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ বছরটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এক সংঘাতপূর্ণ ঘাত-প্রতিঘাতের বৎসর।

১৯৬৫

২রা জানুয়ারি আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র অনুসারে ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল ভোটার। স্বয়ং আয়ুব খাঁন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী ছিলেন কায়েদে আজম জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ছাত্রশক্তি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত করে মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের বিরাট অংশ উৎসাহিত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে। এই নির্বাচনে আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে আড়াই হাজারের মত বেশি ভোট (আয়ুব খাঁন ২১,০১২ ভোট এবং মিস ফতেমা জিন্নাহ ১৮,৪৩৪ ভোট) পেয়েছিলেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন চুকে যাবার পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নে ভাঙন ধরে। এপ্রিল মাসে ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া চৌধুরী এবং রাশেদ খান মেননের দুই বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ৬ই সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ (১৭ দিন চলেছিল) শুরু হয়ে যায়। ফলে হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও বড় ধরনের কোন আন্দোলন সংগঠিত করা যায়নি। পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান যে ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেছিলেন তা ছাত্র ইউনিয়নের চীনপন্থী মেনন গোষ্ঠী সি.আই.এ. প্রণীত বলে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের রুশপন্থী মতিয়া গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের প্রশ্নে শেখ মুজিবর রহমানের কর্মসূচিকে একটি ভাল কর্মসূচিরূপে গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে "বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস" গ্রন্থে মোহাম্মদ হাননান-এর আরও কিছু বিবরণ উল্লেখ করা যাক।

"ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে আয়ুব খানের ভাল সম্পর্ক থাকায় মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নও এই সময় আয়ুব খাঁন সম্পর্কে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে।"

"চীন এই সময় জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি। ফলে জাতিসংঘ বিরোধী একটা মনোভাব তাদের মধ্যে কাজ করত। মেননপন্থীরা তখন জাতিসংঘ বর্জনের কথা প্রচার শুরু করে। অপরদিকে মতিয়াপন্থীরা জাতিসংঘের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করে।"

"এভাবে ক্রমাগতভাবে ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া ও মেনন গ্রুপ পরস্পর পরস্পরের থেকে অনেক দূরে চলে যেতে থাকে।" (উল্লিখিত গ্রন্থের ২য় খন্ডের ১১৭ পৃষ্ঠা)

ছাত্রলীগ-এর অভ্যন্তরেও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে মতানৈক্য-বিরোধ ছিল। প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনে মতবিরোধ প্রকট হওয়াতে ১৯৬৪ সাল ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের অনৈক্যের বছর।

১৯৬৬

ছাত্রলীগের আহ্বানে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' পালন করা হয়। ফলে সারা প্রদেশে দোকান-পাটের নামফলক, গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখার উৎসাহ জাগ্রত হয়। সংসদের আইন পাশ করে যানবাহনের নম্বর প্লেট বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা নববর্ষ সংগঠিতভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়। দলে দলে ছাত্ররা নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মুজিবর

রহমানের উত্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সমাবেশ মিছিল হতে থাকে। এইসব সমাবেশে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ৭ জুন ৬ দফার ভিত্তিতে আহুত হরতালকে ছাত্র সংগঠন সমর্থন জানায়। এই হরতালের দিন শ্রমিক মনু মিয়া সহ অনেকে শহিদ হন। শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচিতে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জনগণ আলোড়িত হয় এবং এই ছয় দফা উত্তরকালের স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত রচনা করেছিল। ["বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে '৬ দফা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ৬ দফা কোথা থেকে এসেছিল, কে তার রচয়িতা,— এ নিয়ে বিতর্ক আজো শেষ হয়নি। ... ভিন্ন একটি সূত্রের ধারণা, ৬ দফা ভারতের একদল বামপন্থীদের রচনা। তাঁরা তা তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায়ের কাছে তুলে দেন। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে এটা যায় জনাব খায়রুল কবীরের (কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন মহা ব্যবস্থাপক) হাতে। জনাব কবীর এটা শেখ মুজিবের কাছে পৌঁছে দেন।"— বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, মোহাম্মদ হাননান, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১২০, পাদটীকা -১৩০] এই বছর স্বায়ত্বশাসন, গণতন্ত্র, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকদের নিজস্ব দাবি, জাতীয়করণ, জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রসমাজ তথা জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হয়।

১৯৬৭

একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এই তিনটি ছাত্র সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ৯ দফা কর্মসূচি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যাশনাল এসেম্বলী অফ পাকিস্তান, ডিবেটস, অফিসিয়াল রিপোর্ট (পৃষ্ঠা ১৮০১-২) অনুসারে দেখা যায় ২০শে জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনে সরকারি দলের নেতা খান আবদুর সবুর খান তাঁর বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকে অশুভ তৎপরতা বলে বর্ণনা করেন এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনকে বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বলে অভিযুক্ত করেন। তিনি এই পর্যায়েই ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রকে চক্রান্তকারী বলে অভিহিত করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে "ডঃ রবীন্দ্রনাথ" অভিহিত করে বলেন, তাঁর পক্ষে যারা আন্দোলন করছেন তাঁরা howling idiot— তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনও একই সুরে সুর মিলিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি হাস্যরসের বর্ণনা উল্লেখ্য। অর্থাৎ "এই সময় সবচেয়ে মজার ঘটনার অবতারণা করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব আবদুল মোনায়েম খান। তিনি ঢাকার গভর্নর হাউসে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানবাদী কবি, সাহিত্যিকদের ডেকে রাগতস্বরে বলেন, 'কি করেন আপনারা? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না।' কাণ্ডজ্ঞানের সীমাহীনতা দেখে 'ভাড়াটে' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সেদিন এই সংলাপে হাস্যরসের সৃষ্টি না করে পারেনি।"

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এই বিরূপ মনোভাবের প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে তীব্রভাবে দেখা দেয়। ছাত্র বুদ্ধিজীবীসহ জনগণের বিভিন্ন অংশ শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে

ওঠে। ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা মিলিতভাবে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশে সামিল হন। আন্দোলনের চাপে সরকার আত্মসমর্পণ করে। ৪ জুলাই তথ্যমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। আগস্ট মাসে ছাত্র সংগঠনগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। ডাকসুর-র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং ছাত্রলীগের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও ঐক্য আলোচনা চলতে থাকে। আওয়ামীলীগ এবং ন্যাপ মিলে সংযুক্ত বিরোধী দল গঠন করে। ফলে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয় এবং ছাত্র আন্দোলন আরও গতিবেগ পায়।

১৯৬৮

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান সরকারের তরফে কয়েক দফা ঘোষণায় জানান হয়, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার এক প্রচেষ্টাকে সরকার ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং কয়েকজন বাঙালি সামরিক অফিসার, সাধারণ সৈনিক এবং সি.এম.পি. অফিসার সহ ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 'রাষ্ট্রদ্রোহী' অভিযোগে বন্দি শেখ মুজিবর রহমানকে ১৭ জানুয়ারি মুক্তির আদেশ দিয়েই ১৮ জানুয়ারি জেল গেটে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হল। তারপর এক সাজান মামলা (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত) দায়ের করে ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনা নিবাসের অভ্যন্তরে মুজিবর রহমানের বিচারের প্রহসন আরম্ভ হলে চারদিকে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে রাস্তায় মিছিল করেন এবং বন্দি মুন্দির দাবিতে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হতে থাকে। ১৪৪ ধারা, গুলি, নির্যাতন, গ্রেপ্তার কোনকিছুই ছাত্রদের বাগ মানাতে পারে না। এই দিনটি ছিল এক ঐতিহাসিক বিক্ষোভের দিন। ডঃ শহীদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত ভাষা সংস্কার কমিটির সুপারিশ ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হলে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ডাকসু এই সুপারিশের প্রতিবাদ করে, ১২ আগস্ট সভা মিছিলে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার নজরুল একাডেমিতে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ আবারও একটি নতুন জাতীয় পাকিস্তানী ভাষা সৃষ্টির কথা বললে, ছাত্র সংগঠনগুলি আয়ুবের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। ২২ অক্টোবর 'দুর্বৃত্ত', 'কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী' বলে পরিচিত এন.এস.এফ.-এর দপ্তর সম্পাদক সাইদুর রহমান (পাচ পাত্তু) হাসপাতালে মারা যান। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সরকার সমর্থনপুষ্ট এন.এস.এফ. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনের দাবিকে অনুসরণ করে এন.এস.এফ. ২৩ অক্টোবর উপাচার্য ডঃ গণির পদত্যাগ দাবি করে (১৯৬৪ থেকে এন.এস.এফ. এই দাবির বিরোধিতা করে আসছিল)। ২৭ অক্টোবর আয়ুব শাহীর দশ বৎসর পূর্তি হলে সরকারি প্রচারমাধ্যমগুলি আয়ুব শাহীর গুণকীর্ত্তনে জমকালো প্রচার শুরু করে। কিন্তু ছাত্রসংগঠন এবং সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল আয়ুবের এই 'উন্নয়নের দশক'-কে 'স্বৈরাচারের কালো দশক' বলে চিহ্নিত করে।

পশ্চিম পাকিস্তান : ছাত্র আন্দোলনের সালতামামি

দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন ছিল না বললেই চলে। ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তারই

ফলে পশ্চিম পাকিস্তানেও ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ৬ নভেম্বর লান্ডিকোটালে, ৭ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডির পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ৯ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডির ছাত্র বিক্ষোভ দমনের সময় বিনা কারণে দু'জন পথচারি নিহত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শহরে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১০ নভেম্বর স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান পেশোয়ার সফরে গেলে রাস্তাতেই ছাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং সংহতি জানানোর জন্য ১৯ নভেম্বর ঢাকার রায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবার খুললে ২৬ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে আবার ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় এবং এবারও পুলিশের গুলিতে একজন পথচারি নিহত হন। এই হত্যার প্রতিবাদে ২৯শে নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। পেশোয়ারে ছাত্ররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের তথ্যকেন্দ্র তছনছ করে দেয়। এ সময় ছাত্ররা পেসিডেন্টের গ্রীষ্মকালীন বাসভবন ও মুসলিম লীগ (কনভেনশন) অফিসেও আগুন লাগায় ও তছনছ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেনি। সরকারি দমননীতির ফলে ছাত্র আন্দেলন পশ্চিম পাকিস্তানে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

এই বছরের নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমান্বয়েই আন্দোলন অভিমুখী হতে থাকে। এই সময়কার কতগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল: ১৭ ও ২৪ নভেম্বর ওয়ালী ন্যাপ (পূর্ব পাকিস্তান শাখা)-র জনসভা; ২৬ নভেম্বর ন্যাপ প্রধান মাওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর যুব বৈঠক; ২৯ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তান রাজনৈতিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের রাজপথে মিছিল; এই দিন আয়ুব খান কর্তৃক ছাত্রদের কিছু কিছু দাবির ন্যায্যতা স্বীকার; ৬ ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপ-ডাকে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালন এবং এই হরতালে ৩ জন নিহত হন; ৭ ডিসেম্বর গুলি করে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে ৮ ডিসেম্বর পুণরায় হরতাল পালন; ৯ ডিসেম্বর বায়তুল কোকাররমে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানে ২০০ জনকে গ্রেপ্তার; সকল বিরোধী দলের আহ্বানে ১৩ ডিসেম্বর সারা প্রদেশে হরতাল পালন এবং ঐ দিন পুলিশের গুলিতে চট্টগ্রামে ২৬ জন আহত ১৫৭ জন বন্দি, রাজশাহীতে বন্দি ১৭ জন, ঢাকায় বন্দি এক হাজারেরও অধিক। ২৯ ডিসেম্বর ভাসানীর নেতৃত্বে পাবনার জেলা প্রশাসনের অফিস ঘেরাও। এইভাবে ১৯৬৮ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তনে রাজনৈতিক আন্দোলন উত্তুঙ্গে উঠতে শুরু করে এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সামরিক শাসন ও বুনিয়াদী শাসনতন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজও তাঁদের নিজ নিজ সংগঠনের নিজস্ব কর্মসূচি অথবা কখনো কখনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে।

১৯৬৯

উনিশশো উনসত্তর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরেকটি রক্তে লেখা বছর। আটষট্টি শেষ হবার সময়েই আগত উনসত্তরের রুদ্র ভয়ঙ্কর রূপকে আঁচ করা গিয়েছিল। ঢাকা সহ পূর্ব পকিস্তানের জেলায় জেলায় আয়ুব শাহী বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বে প্রায় গোটা ছাত্রসমাজ প্রচন্ড রুদ্ররোষে রাজপথে সামিল। দিকে দিকে ছাত্রদের কণ্ঠে সংগ্রামের রণধ্বনি। এমনকি সরকারের সমর্থক ছাত্র সংগঠন এন,এস,এফ-এর একাংশ সরকারের

পক্ষপুট ছেড়ে সংগ্রামের ময়দানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আয়ুব শাহী বিরোধী সংগ্রামকে করেছে আরও জোরদার। ছাত্র আন্দোলনের প্রচন্ডতা গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বাভাষ। ছাত্র আন্দোলনের গনগনে উত্তাপে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি উত্তপ্ত।

এইরূপ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বিরাট ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে ছাত্র সংগঠনগুলি যে ৯ দফা কর্মসূচি তৈরি করেছিল, সে আদলেই ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া ও মেনন দুই গোষ্ঠী মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে ১১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচিতে তিন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও ডাকসু-র প্রতিনিধিও স্বাক্ষর করে। এই চারটি সংগঠন মিলেই গঠিত হয়েছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি প্রকাশের তিন দিন পরে ৮ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়েত ইসলাম পাকিস্তান, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে উলেমা-ই-ইসলাম, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পি,ডি,এল), জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) সহ এই মোট আটটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ" (Democratic Action Committee) বা সংক্ষেপে 'ডাক। এই আট দলীয় জোটের পক্ষ থেকে ৮ দফা কর্মসূচি ওই ৮ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরেকটি ঘটনা হলো মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং পিপলস পার্টি-কে এই জোটভুক্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান হলে এই দুই দল তাতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। রাজনৈতিক দলগুলির ৮ দলীয় জোট 'ডাক' এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যথাক্রমে ৮ ও ১১ দফায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদান, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয় ছিল। তাছাড়া ছাত্রদের ১১ দফায় ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক দাবিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। [এই ৮ এবং ১১ দফা পরবর্তী সময়ে মুক্তি সংগ্রামের মৌল দাবিতে পরিণত হয়েছিল।] এই দুই কর্মসূচির ভিত্তিতে শুরু হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সমাজ এবং কৃষক শ্রমিক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

১৭ জানুয়ারি থেকে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে, জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই ছাত্ররা মিছিল বের করে। কিন্তু পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করেছিল। ১৮ জানুয়ারি এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘটের সময় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সাথে ছাত্রদের খন্ড যুদ্ধ লেগে যায় এবং ৩৪ জন ছাত্র নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯ জানুয়ারিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সংগ্রামের এই পর্বেই সরকার পক্ষীয় এন.এস.এফ-এর একটি গোষ্ঠী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়। ২০ জানুয়ারি একটি রক্তাক্ত দিন। ঐ দিন ঢাকায় বিরাট ছাত্র মিছিলে পুলিশ সশস্ত্র আক্রমণ করলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন(মেনন) গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। ছাত্রনেতাকে খুনের ঘটনায় ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কালোপতাকা নিয়ে বিশাল বিশাল শোক মিছিল বের হয়। ২১ জানুয়ারি ঢাকা শহরে পালিত হয় হরতাল, ২২ জানুয়ারি বের হয় শোক মিছিল, ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় লক্ষাধিক মানুষের মশাল মিছিলে ছাত্র সংগ্রাম আরও

দৃঢ়তার দিকে বাঁক নেয়। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে আবার পালিত হয় হরতাল। পরপর কয়েকদিন ধরে ছাত্র সংগ্রামের কর্মসূচি অব্যাহত থাকলেও ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে এই সময়ে ছোটখাট মতান্তর দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাতে সংগ্রামের রুদ্র ভয়ঙ্কর গতি ব্যাহত হয়নি।

২৪ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরীতে প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল এক গণঅভ্যুত্থান। এ দিন হরতালের দিন। একদিকে কয়েক লক্ষ ছাত্র ও সংগ্রামী মানুষ রাজপথে, অপরদিকে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী। ছাত্র ও জনতার ঢল সরকারি সচিবালয়ের দিকে ক্ষিপ্তভাবে ছুটেছে। যেন বাঁধাবন্ধন হারা ও যে যেভাবে পারে সচিবালয়কে যেন উড়িতে দিতে চায়। ছাত্র-কিশোররা বৈদ্যুতিক তার বেয়েই সচিবালয়ের এয়ারকন্ডিশনের বাক্স ভাঙতে যাচ্ছে, বেপরোয়া তাঁরা, পুলিশ গুলি চালাল, গুলিতে একজন ছিটকে পড়ল, আরেকজন এগিয়ে গেল। এইভাবে পুলিশের গুলিতে নিহত হল ছাত্রকর্মী রুস্তম আলী এবং স্কুল ছাত্র (নবকুমার ইনস্টিটিউটের) কিশোর মতিয়ুর রহমান। এই দুই শহিদ ছাত্রের লাশ নিয়ে প্রতিশোধ দীপ্ত লক্ষ লক্ষ লড়াকু মানুষ পল্টন ময়দানে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। আর গভর্নর হাউসের দিক থেকে সৈন্যবাহিনী কামান-মেশিনগান তাক করে প্রস্তুত। ঐ সময়টি ছিল এক প্রলয়ঙ্করী বিদ্রোহী যুদ্ধের সন্ধিক্ষণ। ছাত্র নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ছাত্রনেতদের উপস্থিত বুদ্ধিতে শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দরুদ পাঠের ঘোষণা করে উত্তেজিত মানুষকে প্রশমিত করা হল। শহিদদের জানাজা শেষে দরুদ পড়তে পড়তে মিছিল করে মানুষ সমবেত হল ইকবাল হল ও তার চারদিকে। এখানে এক সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শহিদ মতিয়ুরের পিতাও ভাষণ দেন। এই সমাবেশ থেকে ছাত্রদের চাপে আবার ২৫ জানুয়ারি হরতাল পালনের ঘোষণা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে। ২৫ জানুয়ারি হরতালের দিন সৈন্যবাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গুলি ছোড়ে; 'তেজগাঁও-এর নাখাল পাড়ায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় একজন মা আনোয়ারা বেগম এমনি একগুলিতে নিহত হন। খুলনার দৌলতপুর ও খালিশপুরে এদিন পুলিশের গুলিবর্ষণে ৩ জন নিহত এবং বহু সংখ্যক আহত হয়।

১ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খাঁন কিছুটা নরম হয়ে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাজবন্দিদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনপ্রকার আলোচনায় রাজি হয় না। ৬ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খানের শেষবারের মত ঢাকায় আগমন। ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থানে "আয়ুব ফিরে যাও" পোস্টার লাগাল হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ঐ একই দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র সমাবেশ। 'শপথ দিবস' পালন করা হয় ৯ ফেব্রুয়ারি। এইদিন রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে লক্ষাধিক মানুষ ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ঘেরাও করে। এক সমাবেশ প্রস্তাব করা হয়— আয়ুব নগরের নাম পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগর, আয়ুব গেটের নাম আসাদ গেট, আয়ুব চিলড্রেন্স পার্কের নাম মতিউর শিশু পার্ক রাখতে হবে। ১২ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করেন। সম্মিলিত রাজনৈতিক জোট 'ডাক'-এর আহ্বানে হরতাল পালিত হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হল। পল্টন ময়দানে এক সমাবেশে ১৬ ফেব্রুয়ারি মাওলানা ভাসানী জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্ত করে আনার ঘোষণা করলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক ডঃ

শামসুজ্জোহাকে পুলিশ বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বর্বরভাবে হত্যা করে। ডঃ শামসুজ্জোহার অপরাধ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী ছাত্র-জনতাকে পুলিশ যখন গুলি করে খুন করতে উদ্যত, তখন তিনি ছাত্রদের রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং অনিবার্য ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এই খবর ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সৈন্যবাহিনী বিক্ষুব্ধ মানুষের উপর রাতের অন্ধকারে গুলি চালায়, কিন্তু ঐ দিন সৈন্যবাহিনীর গুলিতে কত জনের মৃত্যু হয়েছিল, তার প্রকৃত সংখ্যা আজো জানা যায়নি।

২০ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির কথা গুজব আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারও আন্দোলনের চাপে কিছু দাবি মানার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকায় বের হয় মশাল মিছিল। অনেক বছর পরে সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হল এবং শেখ মুজিবর রহমান সহ অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়া হল। মুক্তি পেয়েই শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন— ছাত্রদের ১১ দফা দাবির প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সদ্যমুক্ত রাজনৈতিক বন্দিদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বৈঠকে বসল, কিন্তু দেখা দিল দ্বিমত। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ কমিউনিস্ট নেতা মনি সিংহকে সম্বর্ধনা জানাতে আপত্তি তোলে। ফলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল দুই স্থানে পৃথক পৃথকভাবে দুটো সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত মতো ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের সমাবেশে শেখ মুজিবর রহমানকে এবং পল্টন ময়দানের সমাবেশে মনি সিংহ, অমল সেন এবং কে এম ওবায়েদুর রহমান সহ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য নেতাদের সংবর্ধনা জানান হয়। এই ২৩ ফেব্রুয়ারিই রেসকোর্সের সমাবেশে "উপস্থিত ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসু'র সহ- সভাপতি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজবির রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন"। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তরফে এই সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগ করার দাবিও করা হয়েছিল।

এর পরবর্তী ঘটনাও আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং ১০ থেকে ১৩ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুই দফায় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হল। প্রাদেশিক সায়ত্বশাসন সহ ৬ দফা এবং ১১ দফার মূল মূল বিষয়ে কোন ফয়সালা হল না। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই গোলটেবিল বৈঠক শেষ হল। ১৯ মার্চ এক বিবৃতিতে ছাত্রশক্তি ২৫ মার্চ গভর্নর মোনায়েম খানের অপসারণের দাবিতে সারা দেশে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতা চেয়ে হরতাল আহ্বান করে। হরতালের আগেই রাতের অন্ধকারে কাউকে না জানিয়ে গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা থেকে পালিয়ে যান। ২১ মার্চ নতুন গভর্নর হলেন অর্থমন্ত্রী ডঃ এম.এন.হুদা। ২৫ মার্চ থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল পুলিশ এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছাত্রনেতাদের সাথে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। আবার এই আলোচনা চলাকালীনই সারা দেশে নতুন করে সামরিক আইন চালুর কথা বেতারে সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কাছে তাঁদের করণীয় কি জানতে চান। বঙ্গবন্ধু ছাত্রনেতাদের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখতে এবং অপেক্ষা করতে [wait and see] বলেন। ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আয়ুব খান পদত্যাগ করলে পাকিস্তানের নয়া সামরিক শাসনের নায়ক হলেন ইয়াহিয়া খান।

সংক্ষেপে বলা যায় ১৯৬৯ সালের প্রথমার্ধের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারীর গণ-অভ্যুত্থান পাকিস্তনের জবরদস্ত সামরিক শাসনকেও ওলট-পালট করে দিল।

আয়ুব খান নিয়োজিত মার্শাল নুরখানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব সমূহ প্রকাশিত হয় এই বছরের (১৯৬৯) জুলাই মাসে। এই শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার শিক্ষাবিষয়ক কোন বিষয়েই কোন প্রতিফলন ঘটেনি। উপরন্তু প্রতিফলন ঘটেছে শিক্ষা সংকোচন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের। ফলে ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ মিলিতভাবে নুরখানের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবসমূহের সমালোচনা মূলক আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে ১২ আগস্ট ডাকসুর উদ্যোগে শিক্ষা-বিষয়ক এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সভায় সরকারি শিক্ষানীতির সমর্থক ইসলামী ছাত্র সংঘ হামলা চালায়। সমবেত ছাত্ররা ঐ হামলা প্রতিরোধ করে এবং এই ঘটনার পর থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।

২৮ নভেম্বর পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণ দেন। এই বেতার ভাষণে ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি চালু করা হবে বলে ঘোষণা করেন। আরও ঘোষণা করেন 'এক লোক এক ভোট' এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৭০-এর ৫ অক্টোবর পাকিস্তানে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের গন অভ্যুত্থানের সাফল্যের একটি ধাপ বলে চিহ্নিত হল। এতদসত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ১১ দফা কর্মসূচিতে অটল থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, নির্বাচনের সাথে সাথে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দাবিতে আগামী বছর আরও তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে।

১৯৭০

২৮ মার্চ দেশের সাধারণ নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ গঠন ইত্যাদি সম্পর্কীয় আইনগত কাঠামো আদেশ (L.F.O.) প্রকাশ করা হল। এই আইনগত কাঠামো আদেশে বিশেষ করে ছাত্র সমাজ সন্তুষ্ট হল না। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ চলতে থাকল। এই প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে চলতেই অনুষ্ঠিত হল সাধারণ নির্বাচন। ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ২ টি আসন ছাড়া সবকটি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। এর ফলে আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের অধিকার পায়। আওয়ামী লীগের এই বিরাট সাফল্যে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠন এবং সামগ্রিকভাবে ছাত্র সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯৭১

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তালবাহানা শুরু করেন। ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারি অবস্থানের সময় শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকালে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীরূপে শেখ মুজিবর রহমানকে ঘোষণা করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে-ইয়াহিয়া ভুট্টো, মুজিব-ভুট্টো বৈঠকের পর ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক ঢাকায় বসবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এর পরই জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদে বৈঠকে থেকে যোগদান করবে না বলে ঘোষণা করলে রাজনৈতিক মহল ষড়যন্ত্রের আভাষ পায়। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ সংগ্রামের পথে পা

বাড়াল। ২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারের সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন ঘোষণা করে—৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে, "নইলে বাংলা স্বাধীন হবে"। ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন এবং ন্যাপের যুক্ত জনসভায় অনুরূপ ঘোষণা করা হয় । ১ মার্চ বেতার ঘোষণায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ৩ মার্চ-এর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেওয়া হয়। এই ঘোষণায় সারা প্রদেশের ছাত্র এবং জনসাধারণ গর্জে ওঠে। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা প্রদেশে সরকারি ঘোষণার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হল। ২ মার্চ পল্টন ময়দানে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ জনসভায় এবার চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান হয়। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায় বললেন— "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"। আসন্ন যুদ্ধের ঘোষণা। জনজাগরণের পূর্বমুহূর্ত। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সহ সর্বত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের পদধ্বনি সুস্পষ্ট। ৮ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ প্রতিদিন শহিদ মিনারে জনসভার অনুষ্ঠান এবং জনগণকে তাঁদেব কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ-দান। কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে কোন ছাত্র সংগঠনের ঐক্য নেই, মিল নেই তা সে মুহূর্তে বিবেচ্যবিষয় ছিল না, ছাত্র সমাজ দলে দলে স্বাধীনতার সংগ্রামে সামিল। ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্র সমাজের মধ্যে শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সংগ্রামের প্রশিক্ষণ। ২৩ মার্চ ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হল ছাত্রদের হাতে রাইফেলসহ রুট মার্চ। লক্ষ লক্ষ. মানুষ রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে এই সশস্ত্র রুট মার্চকে অভিনন্দিত করে, উৎসাহিত করে।

২৩ মার্চ এবং ২৪ মার্চ-এর ঘটনার পর সামরিক সরকার ছাত্রদের উপর সংগঠিত আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে সৈন্যবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ঢুকে ছাত্রদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এই বর্বর আক্রমণে শহিদ হন; শহিদ হন ছাত্র ইউনিয়নের সুশীল, গণপতি, লুৎফুল, আজীম প্রমুখ। মনে রাখতে হবে এই অসম যুদ্ধেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সৈন্যবাহিনীর উদ্যত রাইফেলের মোকাবিলা করেছিল। এই ২৫ মার্চের ঘটনা সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা করে। শ্রমিক কৃষক, ছাত্র-যুব-সৈনিক-পুলিশ সহ সর্বস্তরের মানুষ এই প্রতিরোধ সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন।

এর পরবর্তী ঘটনা ভিন্ন ইতিতাস। যা হল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। (স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু, স্বতন্ত্র ইতিহাস বিষয়।) মুক্তি আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তিতে সেই ইতিহাসের সাথে ছাত্র আন্দোলনের ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র আন্দোলনের সালতামামিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরবতী ঘটনাবলীর কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ্য।

১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার এক প্রান্তদেশে গঠন করা হল 'স্বাধীন বাংলা সরকার', চালু হল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র,' শপথ নিলেন স্বাধীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী-পরিষদ। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবর রহমান (বঙ্গবন্ধু)-সহ অনেক শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কর্মী পাকিস্তান সরকারের কারাগারে বন্দি। ২২ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে স্বাগত জানালেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে গঠিত হল নিয়মিত মুক্তি বাহিনী এবং তার গেরিলা ইউনিট। সব জেলায় শুরু হয়ে যায় মুক্তি যুদ্ধ। ছাত্র-যুব সমাজের বড় অংশই যোগদান করে মুক্তি বাহিনীতে। ভারত সহ বিভিন্ন দেশ

পূর্বপাকিস্তানের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আর্ন্তজাতিক সমর্থনের জন্য প্রচার আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ছাত্র ইউনিয়ন দেশের প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির কাছে সহযোগিতার জন্য আবেদন করে। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়টি প্রান্তে পাক-সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর তীব্র লড়াই চলে। এই সময় ছাত্ররাও যে কত বড় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নজির সৃষ্টি করেছেন তার একটি উদাহরণ 'ছাত্র ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' থেকে জানা যায়। যথা— "কুমিল্লার বেতিয়ারার ১১ নভেম্বর (১৯৭১) এক সম্মুখ সমরে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নিজামুদ্দিন আজান, দিরাচুম মুনীর সহ ৯ জন শহিদ হন"। মুক্তি সংগ্রামী মানুষের চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময়ে সাহায্যে এগিয়ে আসে ভারতের সৈন্য বাহিনী। "... লাখ মুক্তি যোদ্ধার আত্মাহুতি, লাখ লাখ মা-বোন ও দেশবাসীর উপর নির্যাতন -এর বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে।"

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো রাজধানী ঢাকা সহ প্রদেশের সর্বত্র।

বহু শহিদের রক্তে অর্জিত এই স্বাধীনতা। মুক্তি যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি মুক্তি যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের মৃত্যুবরণও ঐতিহাসিক ঘটনা। একমাত্র আয়ুব খাঁনের শাসনেই পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত শহিদ হয়েছেন ৬১ জন ['বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ অনুসারে ৬১ জন শহিদের মধ্যে আছেন— শ্রমিক : ২৯ জন, ছাত্র : ২১ জন, কৃষক : ৩ জন, শিক্ষক : ২ জন, চাকুরীজীবী : ৩ জন, সৈনিক : ১ জন, গৃহবধূ : ১ জন, অজ্ঞাত : ১ জন = মোট ৬১ জন]।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী-মধ্যবিত্ত মানুষ বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বাধীকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেই সংগ্রাম ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে একটি জাতিসত্ত্বার মুক্তি সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম বিজয়অর্জন করল। প্রতিষ্ঠিত হল সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। পূর্ব পকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন এই ঐতিহাসিক পর্বের সব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের সালতামামি সেই ঐতিহাসিক পর্বের সারসংক্ষেপকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

ছাত্রীদের ভূমিকা

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র অন্দোলনের ইতিহাসে ছাত্রদের ভূমিকার সাথে ছাত্রীদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ছাত্রীদের কোন উল্লেখযোগ্য নিজস্ব সংগঠন ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই ছিল ছাত্রসমাজের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার আগে ১৯৪০ সালে লক্ষ্ণৌতে ছাত্রীনেত্রী রেনু চক্রবর্তীর সভানেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে

প্রথম ছাত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন সরোজিনী নাইডু। ছাত্রীদের এই প্রথম সম্মেলন থেকে 'ছাত্রী সংঘ' নামে ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন গড়া হয়। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে 'ছাত্রী সংঘ' -এর অস্তিত্ব ছিল স্বল্পকাল। আস্তে আস্তে পূর্ব পাকিস্তনে ছাত্র ফেডারেশনের মতই 'ছাত্রী সংঘ' নিষ্ক্রিয় হয়ে নিজের বিলুপ্তি ঘটায় এবং ছাত্রী সংঘের নেতৃত্বাধীন বেশিরভাগ ছাত্রী সদস্যরা ছাত্র ইউনিয়নের পতাকাতলে সমবেত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা রক্ষণশীলতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে ছাত্রদের মতই ভাষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এগিয়ে এসেছিল প্রদেশের বিভিন্ন গণ আন্দোলনে। ১৯৪৮ সালে 'ছাত্রী সংঘ' -এর নেতৃত্বে ইডেন কলেজ ও কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়কে একত্রীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা বিরাট বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। এই আটচল্লিশ সালেরই ভাষা আন্দোলনে মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্রী এবং ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন এক বিবৃতিতে বলেন— "আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের ধর্মঘটের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। তরুণ মুসলিম ছাত্রীদের রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড করিয়া বেড়ান অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং অশোভন। ইহা মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপন্থী।" প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতিকে ছাত্রীরা উপেক্ষা করেন এবং তাঁরা সব সময়ই ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন সমাবেশ মিছিলে প্রথম সারিতেই অংশগ্রহণ করেছে।

রাজশাহী জেলার নাচোলোর কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্রের উপর যে বর্বর পাশবিক নির্যাতন মুসলিম লীগ সরকার চালিয়েছিল এবং সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে যখন প্রায় সব সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চুপ, তখন সেই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের বেআইনী যুগে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা গোপনে প্রচার আন্দোলন সংগঠন করে। এই প্রসঙ্গে ইলা মিত্রের উপর বর্বর অত্যাচারের বিবরণ প্রাসঙ্গিক। এই প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে মোহম্মদ হাননান লিখিত বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঐ বিবরণের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল—

"রাজশাহী জেলার নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ দমনে সরকারি নির্যাতনের পাশবিকতা অন্য সব ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায়। ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রমেন মিত্র এবং তার স্ত্রী ইলা মিত্র। ইলা মিত্রকে সাঁওতালরা ভালবাসাস্বরূপ 'রাণীমা' বলতো। বিদ্রোহ দমন করতে এসে এখানে পাঁচজন পুলিশ ও একজন দারোগা মারা যায়। খবর শুনে সরকার প্রায় হাজার দু'য়েক সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ করে। তাদের বলা হয়েছিল এখানকার সকল মেয়ে-পুরুষ তাদের শত্রু। কাজেই তার যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। ইলা মিত্রকেও তারা নির্মমভাবে অত্যাচার করল। সে অত্যাচার কৌশল ভয়ঙ্কর, অমানুষিক ও বর্বর। তাঁর উপর যে পৈশাচিকও বীভৎস অত্যাচার করা হয়েছিল তা একমাত্র নাৎসী ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের সাথে তুলনা করা যায়। তাকে কেবল মারপিট করে শয্যাশায়িত করা হয়নি, তাঁর যৌনাঙ্গে গরম ডিম ও লোহার ডান্ডা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছিল যার তুলনা সভ্যজগতে বিরল।" [এই বিবরণ লেখক হাননান পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ

লিখিত "জীবন সংগ্রাম" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া ইলা মিত্রও আদালতে তাঁর জবানবন্দিতে এইসব বিবরণ দিয়েছিলেন।]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রীদেব প্রথম যে দলটি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, রক্তশান আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার প্রমুখ। ১৯৫৯ সালে সরকারের তরফ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুসলমানী ভাবধারা আনার চেষ্টা করা হলে ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেই কপালে টিপ পরিধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করতে যেত। ফলে বহু ছাত্রীকেই বহিষ্কারের মতো শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। ছাত্রীরা 'ছাত্র সংগঠনের' নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করেছেন। উদাহরণ হিসাবে মতিয়া চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ছাত্রী ইউনিয়ন (মতিয়া) গোষ্ঠী পরিচিত ছিল। এইভাবেই ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রীরা ছাত্র আন্দোলন তথা বিভিন্ন আন্দোলনের এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেন।

বদরুদ্দীন উমর 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডের ২৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা ইলা মিত্রের ভাষায় দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ :

"এইভাবে ইলা মিত্রকে সদল বলে গ্রেপ্তার করার পর তাঁদেরকে নাচোল থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাঁদের ওপর কী নির্যাতন করেছিলেন ইলা মিত্র নিমোক্ত ভাষায় তার বর্ণনা দান করেন :

"ওরা প্রথম থেকেই নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করল। শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে এলো নাচোলে। আমি মারপিটের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম; আমার সর্বাঙ্গে বেদনা। ওরা আমাকে একটা ঘরের বারান্দায় বসিয়ে রাখল। আমাদেব সঙ্গে যে সকল সাঁওতাল কর্মীরা ছিল, আমার চোখের সামনে তাদের সবাইকে জড়ো করে তাদের উপর বর্বরের মত মারপিট করে চলল। আমি যাতে নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখতে পাই, সেইজন্যই আমাকে তাদের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

ওরা তাদের মারতে মারতে একটা কথাই বারবার বলছিল, আমরা তোদেব মুখ থেকে এই একটা কথা শুনতে চাই, বল, ইলা মিত্র নিজেই পুলিশদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এই কথাটুকু বললেই তোদের ছেড়ে দেব। কিন্তু যতক্ষণ না বলবি, এই মার চলতেই থাকবে। মারতে মারতে মেরে ফেলব, তার আগে আমরা আসব না। কথাটা তারা যে শুধু ভয় দেখাবার জন্য বলছিল, তা নয়, তারা মুখে যা বলছিল, কাজেও তাই করছিল। ও সে কি দৃশ্য! আর সেই দৃশ্য আমাকে চোখ থেকে দেখতে হচ্ছিল। এ কি শাস্তি! কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই হিংস্র পশুর দল আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। রক্তে ওদের গা ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কারো মুখে কোন শব্দ নাই, একটু কাতরোক্তি পর্যন্ত না। ওরা নিঃশব্দ হয়েছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে কেঁদে ফেললাম আমি। এই দৃশ্য আমি আর সইতে পারছিলাম না। মনে মনে কামনা করছিলাম, আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু তা হল না, আমাকে সজ্ঞান অবস্থাতেই সব কিছু দেখতে হচ্ছিল। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, এত দুঃখের মধ্যেও আমাদের এই বীর কমরেডদের জন্য গর্বে ও গৌরবে আমার বুক ভরে উঠেছিল। একজন নয়, দুজন নয়, প্রতিটি মানুষ মুখ বুজে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এত মার মেরেও ওরা তাদের মুখ খোলাতে পারছে না। এমন কি করে হয়। এমন যে হতে পারতো এতো আমি কল্পনাও করতে পারিনি।...

"প্রচন্ড তর্জন গর্জনের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি, হয়েককে দলের মধ্য থেকে

মারতে মারতে বার করে নিয়ে আসছে। ওদের মুখে সেই একই প্রশ্ন, বল, ইলা মিত্র পুলিশদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। না বললে মেরে ফেলব, একদম মেরে ফেলব। আমি চেয়ে আছি হয়েকের মুখের দিকে। অদ্ভুত ভাববিকারহীন একখানি মুখ। অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকিয়ে আছে। ওদের এত সব কথা যে তার কানেই যাচ্ছে না। ক্ষেপে উঠল ওরা। কয়েকজন মিলে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তাঁরপর ওরা ওদের মিলিটারী বুট দিয়ে তার পেটে বুকে সজোরে লাথি মেরে চলল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, হয়েকের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তারপর তার উপর ওরা আরও কতক্ষণ দাপাদাপি করল। একটু বাদেই এক খন্ড কাঠের মত স্থির হয়ে পড়ে রইল হরেক। ওদের মধ্যে একজন তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, ছেড়ে দাও ওর হয়ে গেছে। এই বলে ওরা আর একজনকে নিয়ে পড়ল।"

তথ্যসূত্র :

১। বদরুদ্দীন উমর লিখিত 'পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' পুস্তকে প্রথম খন্ডের ১৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় "পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আবেদন" শীর্ষক সার্কুলারটি দ্রষ্টব্য। এই সার্কুলারে কোথাও 'ছাত্রলীগ' কোথাও 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলিগ' উল্লেখ আছে।

২। "ডাকসু" = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ।

৩। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসঃ মোহম্মদ হাননান; ২য় খন্ড পৃ. ২৪-২৫

৪। পূর্ব বাংলার সংসদ অধিবেশন অর্থে পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভা বা লেজিসলেটিভ এসেম্বলী।

৫। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দেলনের ইতিহাস : মোহম্মদ হাননান; ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩ থেকে এই তথ্য সংগৃহীত।

৬। ঐ পুস্তক থেকে, পৃ. ৪৫

৭। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি ছিল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও দলের। যেমন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সংসদ ছিল ছাত্র ইউনিয়নের; শিল্প সাহিত্য সংঘ ছিল ছাত্রলীগের; সাংস্কৃতিক পরিষদ ছিল খেলাফতে রব্বানী পার্টির; প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে 'ময়ুখ' ছিল ছাত্র ইউনিয়নের; ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে 'অগ্রগামী'ও ছিল ছাত্র ইউনিয়নের; চট্টগ্রামের ইউ.এস.পি.পি. ছিল ছাত্রলীগের [এই তথ্য বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' ২য় খন্ড থেকে সংগৃহীত]।

৮। মধুর ক্যান্টিন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় খাবারের দোকান। মধুর ক্যান্টিনও ইতিহাসের অঙ্গ। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছাত্র অন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এই মধুর ক্যান্টিনের ভেতরে বসে কোন না কোন বৈঠক সভা অথবা আড্ডায় অংশগ্রহণ করতেন। এইজন্যই ছাত্র আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মধুর ক্যান্টিন বিখ্যাত হয়ে আছে।

৯। ছাত্র ও বাঙালি সামরিক অফিসারদের গোপন বৈঠক : "আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকজন বাঙালি অফিসার ছাত্রনেতাদের সাথে একটি গোপন সাক্ষাৎ করে মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মাজেদ কাদেরের মধ্যস্থতায় তাঁরই বাসায় এই গোপন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এই আলোচনায় যোগদান করেন। সেনাবাহিনী থেকে এসেছিলেন বেলুচ রেজিমেন্টের তরুণ অফিসার ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের U.O.T.C ক্যাডেটদের দায়িত্ব পালন করতেন। ছাত্রদের উদ্দেশে মিলিটারী কায়দায় তিনি বলেন, 'তোমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা হয়, তাহলে আমরা বাঙালি অফিসারদের রাইফেল

তোমাদের পক্ষ হয়ে ওদের দিকে ঘুরিয়ে দেব। কিন্তু তোমরা কি সেজন্য মানসিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত আছ।'

স্বাভাবিকভাবেই সামরিক অফিসারের এই তেজোদীপ্ত বক্তব্য তার চেয়েও তেজী ছাত্রনেতাদের হতচকিত করে দিয়েছিল। এর উত্তর দেওয়ার জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।''

১০। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ২য় খন্ড মোহাম্মদ হাননান, পৃ. ৭৭

১১। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— নিতাই দাস, পৃ ৩৩ থেকে এই তথ্য সংগৃহীত।

১২। ঐ পুস্তক : পৃ. ৪৮

১৩। ঐ পুস্তক: পৃ. ৫৩

পূর্ব পাকিস্তানের যুব সংগঠন

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংগঠনের অনুপাতে যুব সংগঠনের সংখ্যা ছিল খুবই কম। প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে সেভাবে যুব সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এর মূল কারণ হয়তো অবিভক্ত ভারতের সংগঠিত যুব আন্দোলনের সামগ্রিক দুর্বলতা। অবিভক্ত ভারতে কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের পূর্বে যে যুব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তাও ছিল দুর্বল, গোটা ভারতে তা শিকড় প্রবিষ্ট করাতে পারেনি। যে সকল প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তানে রাষ্ট্র গঠন করা হল, সে সব প্রদেশে যুব সংগঠন বা যুব আন্দোলনের প্রসার হয়নি বল্লেই বলে।

পাকিস্তানে যুব আন্দোলনের এই দুবল পটভূমিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই সদ্য গঠিত পাকিস্তানের কমিউনিস্টরা যুব সংগঠন গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই সময় শাসকদল মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে উদারপন্থী এবং প্রতিক্রিয়া পন্থীদের দ্বন্দ্ব ছিল। মুসলিম লীগের অনুগামী যুব সমাজও দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উদারপন্থী যুবকর্মীরা ছিলেন আবুল হাশিমের নেতৃত্বে এবং গোড়া প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রভাবাধীন। কমিউনিস্টরা যুব সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিলে আবুল হাসিমপন্থীরা তাতে সহযোগিতা করে গড়ে তোলা হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ''গণতান্ত্রিক যুব লীগ'' নামে একটি সংগঠন। এই বছরের ৬ই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এক কর্মী সম্মেলন থেকে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল! কিন্তু এই ''গণতান্ত্রিক যুব লীগ'' কোন দিনই সক্রিয় হতে পারেনি। এই সংগঠনের সদস্যরা শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে।

১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট আদর্শে প্রভাবিত যুবকরা নতুন করে সংগঠিত যুব আন্দোলন ও যুব সংগঠন গড়ার গ্রহণ করে। লক্ষ্য ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন যুব সম্প্রদায়কে একটি সংগঠনে সংগঠিত করা। এই সময় এই ধরনের একটি সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক সুযোগ এসেছিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সাথে মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং আরো কিছু রাজনীতিকের মতবিরোধ চলছিল। মিস ফাতেমা জিন্নাহ প্রমুখেরা চাইছিলেন সরকার বিরোধী রাজনীতি কিছুটা অগ্রসর হোক। এই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে যুব সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টাকে মিস ফাতেমা জিন্নাহ সহ

অনেক রাজনীতিক প্রথমদিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের ২৭ শে মার্চ এই উদ্যোগের পরিণতিতে গড়ে উঠল "যুব লীগ"। "যুব লীগ" গড়ার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন—মাহমুদ নুরুল হুদা, আনোয়ার হোসেন, আবদুল রউক, মোহম্মদ তোয়াহা, আলি আহাদ প্রমুখ। ১৯৫১ সালের ২৭শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় "যুব লীগ"-এর প্রথম সাংগঠনিক সম্মেলন আহ্বান করা হলে সরকার এই সম্মেলনকে বন্ধ করার জন্য সারা ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। এই অবস্থায় বুড়িগঙ্গা নদীর অপরপারে জিঞ্জিরায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হলে সেখানেও পুলিশ হামলা করতে যায়। শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তারা পুলিশ ও সরকারকে বোকা বানিয়ে নদীর উপরে নৌকায় সম্মেলন করেন। চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ- উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। নৌকায় মাইক যোগে বক্তৃতা চলে এবং সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। যুব লীগের এই সাংগঠনিক সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু ছিল শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত এবং সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র বিরোধী রাজনীতির পরিচায়ক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল লেখক বদরুদ্দীন উমর "যুব আন্দোলনের প্রথম পর্যায়" শীর্ষক নিবন্ধে [বিচিত্রা, ঈদ, সংখ্যা, ১৯৮৩-তে প্রকাশিত] এই ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বদরুদ্দীন উমরের সংগৃহীত এই ঘোষণা দলিল থেকে মোহাম্মদ হাননান প্রমুখ অনেক লেখক-ই তাদের গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংগঠিত যুব আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য যুব লীগের ঐ ঘোষণা-পত্রের কিছু অংশ বদরুদ্দীন উমরের নিবন্ধ থেকে উল্লেখ করা হল যথা— "আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক। ... আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর চাকুরী ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারি ভাতা। ... আমরা চাই শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী। দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ। ... আমরা চাই যুব সমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্রবহন করবার অধিকার।"

যুবলীগ গঠিত হবার পর বিশেষকরে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে এই সংগঠন 'মুসলিম লীগের লেজুর', কারো মতে 'আওয়ামী লীগের শাখা' এবং আবার অধিকাংশের মতে কমিউনিস্টদের প্লাটফর্ম। ছাত্ররা ভাবলেন এই যুব সংগঠন ছাত্র সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাস্তবে সব কল্পনা ছিল অর্থহীন। ১৯৫১ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক আলী আহাদ তাঁর প্রতিবেদনে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটান। যুবলীগকে যুব সমাজের নিজস্ব সংগঠন রূপেই গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন পাকিস্তান অবজার ভারের সম্পাদক আবদুস সামাদ।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী তখন বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা কঠিন ছিল। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনও তখন অবলুপ্তপ্রায়। অথচ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিও তখন তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের যুব সমাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকা পালনে নবগঠিত এই যুব

লীগ এগিয়ে আসে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের তথ্য দলিল ইত্যাদি অনুসারে দেখা যায় যুব লীগের শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল। এমনকি ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি যে সর্বদলীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে যুব লীগের প্রতিনিধিত্ব ছিল। "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ" -এ যুব লীগ-এর পক্ষে কমিটি সদস্য ছিলেন অলি আহাদ।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে যুব লীগ অন্যতম সংগঠন হিসাবে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে প্রদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন, গণ আন্দোলন, আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানে যুব লীগের ভূমিকা ছিল সহযোগীর ভূমিকা এবং অগ্রণী সংগ্রামী সহগঠনের ভূমিকা। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় যুব লীগের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম যুব উৎসাহের সূচনাও করেছিল যুব লীগ। ১৯৫৭ সালের ৪ থেকে ৭ই জানুয়ারি রংপুর শহরে ছাত্র ও যুবসমাজের সহযোগিতায় এই যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মোহাম্মদ হাননানের "বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস" বইয়ের প্রথম খন্ডের ১০০ পৃষ্ঠায় ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিতে সর্বদলীয় সভার বিবরণে "যুব সংঘ" নামে একটি সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য কোথাও "যুব সংঘ"-এর ভূমিকার বিস্তৃত বিবরণ নেই। এই 'যুব সংঘ' পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ'-এর আদলে কোন যুব সংগঠন কিনা তা ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান সাপেক্ষ। যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি সংগ্রামের বিজয় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের যুব সমাজের মধ্যে সংগঠিত যুব আন্দোলন ও সংগঠনের যেটুকু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তা মুখ্যত ছিল যুব লীগের, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলন

ভারতের ষাট উত্তরকালের ছাত্র আন্দোলনে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার এবং ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন রয়েছে। তাই এই প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের ছাত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাঞ্ছনীয় মনে করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

শ্রীলঙ্কা

সিংহল বা শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থিতি ভারত উপমহাদেশের পরিমণ্ডলে। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিগত কয়েক দশক ধরে অত্যন্ত জটিল। বিশেষ করে বৃটিশ উপনিবেশ থাকাকালীন সময়ে এই দ্বীপময় ভূখণ্ডটি ভারতের মানচিত্র থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অস্থির ও জটিল এবং ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। ভাষা এবং জাতিগত সমস্যা শ্রীলঙ্কায় আরও জটিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ রয়েছে এখানে। এঁদের মধ্যে তামিল ভাষীদের প্রাধান্য বেশি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে শ্রীলঙ্কা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও এই রাষ্ট্রটিকে নয়া

উপনিবেশবাদের বিভিন্ন ধরণের শৃঙ্খল ঘিরে ধরে আছে। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও ষাটের দশকের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কায় ''জনতা ভি মুক্তি পেরুমানা' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

'জনতা ভি মুক্তি পেরুমানা'-র ঘোষিত লক্ষ্য ছিল—শোষণ অত্যাচার এবং 'সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবেদারদের' হটিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল। এই ধরণের লক্ষ্য ঘোষণার সাথে সাথে এই রাজনৈতিক সংগঠন ছাত্র-যুবকসহ দেশের মানুষকে তখনকার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আহ্বান দিয়েছিল। পৃথিবী জোড়া ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমনিতেই ক্ষোভ বর্তমান ছিল। কলম্বোর ছাত্ররা ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের উত্তাপে উত্তেজিত। 'জনতা ভি মুক্তি পেরুমানা'র আহ্বান পেয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষি ছাত্ররা ১৯৭০-৭১ সালে সিংহলী জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় সামিল হল। ব্যারিকেড ও সশস্ত্র লড়াইয়ে ছাত্র-যুবকরা হাতে অস্ত্র তুলে নিল। অংশ নিল সরকারবিরোধী বিদ্রোহে।

শ্রীলঙ্কায় তদানীন্তন সোভিয়েতপন্থী এবং চীনপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না বল্লেই চলে। ৪র্থ ইন্টার ন্যাশান্যাল ভুক্ত ট্রট্স্কিপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। Left wing commiunist youth movement শ্রীলঙ্কায় ১৯৭০-৭১ সালে শক্তিশালী ছিল। ফ্রান্সের ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে যেমন ট্রট্স্কাইট ছাত্র-যুবকদের সংগঠন 'JCR' শক্তিশালী ছিল, তেমনি শ্রীলঙ্কায়ও ট্রটস্কাইটপন্থী ছাত্র-যুবকরা ছিল সিংহলের ১৯৭০-৭১-এর সিংহলী বিদ্রোহের অন্যতম শক্তি। এই সময় ছাত্র আন্দোলনের আঘাতে শ্রীলঙ্কা সরকার টলটলায়মান অবস্থায় ছিল।

ব্যাপক সামরিক অভিযানের প্রচণ্ড দমন-পীড়নে 'জনতা ভি মুক্তি পেরুমানা'-র নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ স্তিমিত হলেও এই রাজনৈতিক সংগঠনকে কেন্দ্র করেই (যদিও এর ভাঙনের ফলে) বিভিন্ন ধরণের সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক সংগঠন জন্মলাভ করে। তামিল ভাষীদের 'এল. টি. টি.' প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে ওঠার মূলেও রয়েছে 'সিংহলী বিদ্রোহের' এই পটভূমি। অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুসারে এল. টি. টি. নেতা প্রভাকরণের রাজনৈতিক জীবনের শুরুও কলম্বোর ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের সময়কালে। তখনকার ছাত্র আন্দোলনের অনেক জঙ্গী নেতা ও কর্মী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিতে যুক্ত হয়েছেন এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। ষাট-সত্তরের দশকের শ্রীলঙ্কার ছাত্র আন্দোলন ও ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবেই বিবেচিত হবে।

ব্রহ্মদেশ

ভৌগোলিক দিক থেকে ব্রহ্মদেশ বা বার্মা ভারত উপমহাদেশের অংশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্ররূপ নিয়েছিল। এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরব উজ্জ্বল। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয়তাবাদী নেতা উনুর সরকারকে হটিয়ে দিয়ে ষাটের দশকের শুরুতে শাসন ক্ষমতা দখল করে সমরনায়ক নে উইন। নে উইন সরকার সারা ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ব্রহ্মদেশের জনসংখ্যার ৮১ শতাংশ সাক্ষরতা সম্পন্ন। তাই এই দেশে সচেতন জনসংখ্যাও কম নয়। সচেতন মানুষ সমরনায়ক নে উইনের শাসন মেনে নিতে পারছিলেন না।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়েই জটিল হতে থাকলে ১৯৬২ সালে ছাত্র বিক্ষোভ দানা বাধতে শুরু করে। ব্রহ্মদেশে প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলের হলো— 'অল বার্মা স্টুডেন্টস ডেমোক্রেসি লীগ, রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রভৃতি। ১৯৬২ সালে রেঙ্গুন বিশ্ব বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠলে সরকারি দমনপীড়ন নেমে আসে, ২২জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়। এতে ব্রহ্মদেশের সমতল অংশ জুড়ে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে। ১৯৭৪ সালে নে উইনের ক্রীড়নক সেইন লুইনের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র পুলিশকে দিয়ে প্রায় দু'শত ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছিল।

বার্মাতে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ-অনৈক্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে চলতে থাকার ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী রূপ নিতে পারেনি। কিন্তু ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বহুধা বিভক্ত কমিউনিস্টদের গোষ্ঠীগুলির প্রভাব ছিল এবং আছে। প্রায় সব কয়টি কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর-ই সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী রয়েছে এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রোগ্রাম অনুসারে 'মুক্তির জন্য সংগ্রামরত'। পার্বত্য অঞ্চলে কোচিন, কারেণ উপজাতিরাও তাঁদের স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। পার্বত্য অঞ্চলের এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমতলের ছাত্র বিক্ষোভের সংযোগ স্থাপন হয়।

১৯৮৭-র সেপ্টেম্বর ব্রহ্মদেশে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। সমর নায়কের নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের চালু মুদ্রার ৬৩ শতাংশ বাতিল করে দিলেন। ফল হলো মারাত্মক। সাড়া দেশ গণ-বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুললো। রেঙ্গুন, মান্দালয়, পেগু শহরে ছাত্রদের প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্ররূপ নিয়েছে। এবার নে উইনের পিছু হটার পালা। নিজে পদত্যাগ করে তারই অনুগত সেইন লুইন-কে শাসন ক্ষমতায় বসালেন। কিন্তু প্রচণ্ড বিক্ষোভের চাপে এই সরকারও দু'সপ্তাহের বেশি টিকলো না। সেইন লুইন পদত্যাগ করলো। শাসন ক্ষমতায় এলো সামরিক বাহিনীর ক্রীড়নক মাউং মাউং। মাউং-এর সরকার প্রকৃতপক্ষে সামরিক বাহিনীর পুতুল সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশের ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রবর্তনের দাবিতে আবার শুরু হলো গণবিক্ষোভ। শ্রমিক মেহনতি মানুষের বৃহৎ অংশ এবং এমনকি নীচুতলার সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ এই গণবিক্ষোভে সামিল হলো। কিন্তু এই গণবিক্ষোভ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ১৯৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আবার ব্রহ্মদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করলো। এই দিন প্রায় শতাধিক ছাত্র সামরিক বাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ দিল। ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হলো এক নতুন অধ্যায়। ষাটের দশক থেকে ৯০-এর দশক শুরু পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের ছাত্র আন্দোলনের এই সংগ্রামী ইতিহাসে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের ইঙ্গিতও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে— "...অস্ত্র শিক্ষার জন্য দেড় হাজার ছাত্র করেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভারত প্রভৃতি দেশেও নির্বাসন নিয়েছে কিছু সংগ্রামী ছাত্র।"[১]

তথ্যসূত্র :

১। 'নিশান' ছাত্র সংগ্রামের মুখপত্র : দশবছর পূর্তি (১৯৭৯-৮৯) বিশেষ সংকলন, পৃষ্ঠা ৭৮।

ষাটের দশকে পশ্চিম-দুনিয়ায় ছাত্র বিদ্রোহ

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল সর্বাত্মক। ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আছড়ে পড়েছিল— এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকার প্রায় সব উল্লেখযোগ্য দেশের প্রান্তে প্রান্তে এই ষাটের দশকে রচিত হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের এক বিশাল ইতিহাস, সংগ্রামের বীরগাথা, ঘটনায় কাহিনিতে পরিপূর্ণ এক মহাকাব্য। ছাত্র সমাজের জীবন-যৌবনের তারুণ্য বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জনের মতো ছিল উদ্বেল, চঞ্চল। ছাত্রসমাজের যৌবন তারুণ্যের বিক্ষুব্ধ প্রকাশে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তিমূল হয়েছিল প্রকম্পিত।

ষাটের দশকের প্রথমদিক থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগঠিত এবং স্বতস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলনের সূচনা। ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে এক বৎসর শেষে এই ছাত্র আন্দোলন ক্রমবর্ধমান হারে ছড়াতে থাকে এবং ১৯৬৮ সালে ব্যাপক রূপ ধারণ করে ও চরম পর্যায়ে ওঠে। একই সঙ্গে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন চলার ফলেই এই আন্দোলন কার্যত এক আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। আন্দোলনের ইস্যু বা বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী জোড়া প্রচার মাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনায় প্রধান সংবাদই ছিল ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলী। একদেশের আন্দোলনের ঘটনার প্রভাবে অন্যদেশের আন্দোলন প্রভাবিত হতে থাকে। তাই, কোন কেন্দ্র (centre) না থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালে বিশেষকরে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ছাত্র আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) লক্ষ্যণীয়। এই প্রাসঙ্গিকতার তথ্য সংকলন করলে দেখা যাবে, ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে রোমের ভেলিগুইলিয়াতে (Valle Giulia) হাজার হাজার ছাত্র সারাদিন ধরে পুলিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ চালায়। এপ্রিল মাসে পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন স্থানে অগণিত ছাত্র সংবাদপত্রের প্রকাশনা প্ল্যান্টগুলি ব্যারিকেড করে রাখে এবং রাস্তায় রাস্তায় সংবাদপত্র জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। ঐ একই মাসে উত্তর আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা দখল করে রাখলে পুলিশ তিন ঘন্টাব্যাপী এক খন্ডযুদ্ধ চালিয়ে ছাত্রদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত করে। মে দিবস উপলক্ষে বার্লিন শহরে চল্লিশ হাজার ছাত্র-শ্রমিকের মিলিত বিক্ষোভ তিন দশকেও দেখা যায়নি। মে মাসেই ফ্রান্সের প্যারিস শহর সহ বিভিন্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায় দিনে রাতে ছাত্র বিক্ষোভ, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিনের পর দিন ছাত্র ধর্মঘটে গোটা ফ্রান্স উত্তাল হয়ে ওঠে। আবার পশ্চিম জার্মানীর ছাত্ররা এপ্রিলের মে মাসে সরকারের জারি করা নতুন জরুরী আইনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে। জুন মাসে প্রবল ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতার চাপে ব্রুসেলস, স্টকহোম, আমস্টারডাম, টোকিও এবং লন্ডন শহরের স্কুলগুলি ছাত্রদের দখলে চলে যায়, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে। সেপ্টেম্বর মাসে মেক্সিকোর আন্দোলনকারী ছাত্রদের সাথে পুলিশের লড়াই শুরু হয়। প্রাসঙ্গিক এই সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবরণী থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, এশিয়া— এই তিনটি মহাদেশ জুড়ে ১৯৬৮ সালের বসন্তকালে ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটেছিল। তিনটি মহাদেশেরই, "মুক্ত দুনিয়া"র [Free World][১] প্রধান প্রধান শহরে আন্দোলন ছড়িয়ে পরে আন্তর্জাতিকতার রূপ নেয়। শুধু ১৯৬৮ সালের বসন্তকাল নয়, গোটা ১৯৬৮ সালটা-ই ছিল বিপ্লবী ছাত্রদের বিদ্রোহের বছর।

বিদ্রোহ : বিপ্লব : না আন্দোলন!

মুক্ত দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী এবং শহর, নগরে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনকে পশ্চিমীদেশের লেখক, গবেষক এবং ঐতিহাসিকেরা তাঁদের লেখা পুস্তকে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে কোথাও 'ছাত্র বিদ্রোহ'[Student Revolt], কোথাওবা 'ছাত্র বিপ্লব'[২] [Student Revolution] বলে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতা অনুসারে 'বিদ্রোহ' এবং 'বিপ্লব' শব্দ প্রয়োগে অনেক পার্থক্য বা তারতম্য আছে। এই দুটি শব্দের প্রয়োগগত অভিধা, যুক্তি ও অন্বেষা ভিন্নতর। 'ছাত্র বিদ্রোহ' -এর প্রয়োগ যুক্তিগ্রাহ্য, অমিলের চেয়ে মিল বেশি, মতান্তরের চেয়ে নৈকট্য অনেক, আভিধানিক শুধু নয়, অনেকটা বাস্তবসম্মত। কিন্তু 'ছাত্র বিপ্লব'-এর প্রয়োগ যুক্তিতর্ক সাপেক্ষ এবং পরস্পরবিরোধী চিন্তার দ্বন্দ্বে দীর্ণ। এই প্রসঙ্গে অনেকে কমরেড মাও সেতুং-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ছাত্র আন্দোলনকে সমগ্র জনগণের আন্দোলনের অংশ হিসাবেই বিবেচনা করেন। প্রাসঙ্গিক উদ্ধিতিটি এইরূপ— "The student movement is part of the whole people's movement. The upsurge of the student movement will inevitably promote an upsurge of the whole people's movement." –Mao Tse-tung. ["Long march, short spring : the Student uprising at Home and Abroad" পৃষ্ঠা-১৫৯]। পাশ্চাত্যের বা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিজীবী এবং পণ্ডিতরা যখন ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র বিদ্রোহকে 'ছাত্র বিপ্লব' পর্যায়ে উন্নত করে দেখান বা বিশ্লেষণ করেন, তখন তাকে ভাবাবেগের বা রোমাঞ্চকর রোমান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ বলেই অনেক যুক্তিবাদী মনে করেন। উল্লিখিত দুই শব্দ প্রয়োগে মতপার্থক্য যা-ই হোক না কেন, মুক্ত দুনিয়ার দেশে-দেশে ছাত্র বিক্ষোভ বা আন্দোলন 'ছাত্র বিপ্লব' নয়— 'ছাত্র বিদ্রোহে' উন্নীত হয়েছিল।

মুক্ত দুনিয়ার দেশে দেশে

মুক্ত দুনিয়ার সব দেশে একইরকম কারণের জন্য ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্রবিদ্রোহ ঘটেনি। পশ্চিম জার্মানীর সাথে ইতালির, ইতালির সাথে ফ্রান্সের, ফ্রান্সের সাথে ইংল্যান্ডের, ইংল্যান্ডের সাথে ব্রুসেলেস্‌রে, ব্রুসেলেস্‌র সাথে স্টকহোমের, কলোম্বিয়ার সাথে নিউইয়র্ক বা চিকাগোর এবং ইউরোপ ও আমেরিকা মহদেশের দেশগুলির সাথে এশিয়া মহাদেশের জাপানের টোকিও শহরের ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি, পারিপার্শ্বিকতা, ইস্যু ও কারণের ভিন্নতা ও পার্থক্য অনেক। কিন্তু কারণের বিভিন্নতা, পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কতগুলি মৌলিক বিষয়ে মিল ছিল অনেক বেশি। প্রায় সব দেশের ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র বিদ্রোহে এই মৌলিক বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করেছিল। মিল থাকা মৌলিক বিষয়গুলির মধ্যে ছিল :

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা। ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোতে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আন্দোলন সংগঠন। ছাত্র আন্দোলনের গতানুগতিকতার উপর অবিশ্বাস এবং নতুন কর্মধারা সম্পর্কে

ভাবনা চিন্তা ও নতুন পদ্ধতির (Form) সন্ধান। সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা (Totalitarian)-র বিরুদ্ধে এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক কাজকর্মের (Functional) বিরুদ্ধে জেহাদ ও বিক্ষোভ। শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত গণ সংগ্রামের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ষাটের দশকের এই ছাত্র বিদ্রোহে যেসব রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিষয়বস্তুর প্রভাব কার্যকরি ছিল, তা হল :

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন এবং তার ফলাফলজনিত প্রতিক্রিয়া। বিভিন্নদেশের বামপন্থার মধ্যে সংঘাত। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমূল সংস্কারকামী পুরানো মতবাদ (Old radicalism)-এর সাথে নতুন সংস্কারকামী মতবাদ (New radicalism)-এর দ্বন্দ্ব-বিরোধ।

সর্বোপরি দুনিয়া কাঁপানো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল বিভিন্ন দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংকট। তাছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর কোন প্রান্তের ছাত্রসমাজের যৌবনোচিত চেতনায় পুরানো রক্ষণশীলতা কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই পরিবর্তনশীলতার যুগ সন্ধিক্ষণে নতুনের সন্ধানে ছাত্রমানসের চেতনার অভিব্যক্তি ছিল লড়াকু, বিদ্রোহী। দ্রুত পরিবর্তনের চাহিদায় ভরপুর। বিষয়বস্তুর এইসব মৌলিকত্ব এবং কারণগুলি-ই ছিল ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন ও বিদ্রোহের পটভূমি।

বিভিন্ন দেশের ছাত্র আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি

ষাটের দশকের পূর্বেকার সময়ে পশ্চিমের দেশগুলির ছাত্র আন্দোলনের গতানুগতিক কর্মপদ্ধতি ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করা (polition করা), আলাপ-আলোচনা করা (Consultation), ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যগুলি নিয়ে সভা-সমিতি, সিম্পোজিয়াম, সেমিনারের অনুষ্ঠান প্রভৃতি। অর্থাৎ ঐ সময়কার পশ্চিমদেশীয় ছাত্র আন্দোলনের খুব একটা সংগ্রামী মেজাজ বা জঙ্গীরূপ (militancy) ছিল না। সাদামাঠা গণতান্ত্রিক রূপের মধ্যেই ছিল ছাত্র আন্দোলন গন্ডীবদ্ধ। কিন্তু ষাটের দশকের সূচনায় পশ্চিমী দেশগুলির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তার পটভূমিতেই ঐ সকল দেশের ছাত্র আন্দোলনের গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তন হতে থাকে। ছাত্র-যুব সমাজের সংগ্রামমুখীনতা শানিত হতে শুরু করে। দরখাস্ত, আবেদন-নিবেদন, আলাপ-আলোচনার পথ পরিহার করে সংগ্রাম ও বিক্ষোভের মোজাজকে আপোসহীন কড়া মেজাজে বেঁধে দেওয়া হয়।

সব দেশে একই রকম না হলেও মোটামুটিভাবে যে ধরনের আন্দোলনগত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল তা হল :

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, বিভাগগুলির বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ফ্যাকালটির বাইরে অবস্থান ধর্মঘট (sit-in out side)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে অথবা শহরের প্রধান প্রধান রাজপথে ব্যারিকেড রচনা করে অবস্থান। শহরের রাজপথে এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষের দপ্তরের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ মিছিল, বিক্ষোভ সমাবেশ। প্রতীক ছাত্র ধর্মঘট দিয়ে শুরু করে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট। ছাত্র বিদ্রোহের বিরুদ্ধে

অপপ্রচার ও কুৎসা রটনাকারী বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সরকারি বেসরকারি প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে অবরোধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমানে সমানে মোকাবিলা। কোন কোন পর্যায়ে ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অনুসরণ। শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবকদের মিলিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মেলবন্ধন। সর্বশেষে ছাত্র-যুব সমাজের বিদ্রোহী সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মোহে অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন, বেপরোয়া সন্ত্রাসবাদী ঝোঁকে আচ্ছন্ন কার্যকলাপ।

তাছাড়া আন্দোলনকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে উন্নত করার স্বপ্নে কোন কোন দেশের সংগ্রামী ছাত্ররা সোভিয়েত রাশিয়ার এবং চীনের বিপ্লবের সময়কার পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে " সোভিয়েত" এবং "কমিউন" গঠন করেছিল।[৩]

ছাত্ররা প্রকৃত অর্থে কি চেয়েছিল

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশের তীব্র ছাত্র বিদ্রোহের দিনগুলিতে ছাত্র সমাজ প্রকৃতঅর্থে কি চেয়েছিল— এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ছাত্র সমাজের মধ্যে বিশেষ করে যাঁরা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ছিলেন— তাঁদের মানসিক ইচ্ছাটা অনুসন্ধান করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই বিষয়ে বহু মত এবং মতান্তর থাকা স্বাভাবিক।

নিউইয়র্ক এবং লন্ডন থেকে মডার্ন রিডার পেপারব্যাক কর্তৃক প্রকাশিত এবং বারবারা ও জন এ্যারেনরিক [Barbara and Jhon Ehrenreich] কর্তৃক লিখিত 'লঙ মার্চ সর্ট স্প্রিং : দ্যা স্টুডেন্ট আপরাইজিং এ্যাট হোম এ্যান্ড এ্যাবরড" [Long March, Short Spring : The student uprising at Home and Abroad] শীর্ষক পুস্তকে এই প্রসঙ্গে একটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়েছে। এক পৃষ্ঠার এই পরিচ্ছেদের শিরোনামও হল— "ছাত্ররা প্রকৃতপক্ষে কি চাই" [What the Student really want"]. পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তু আসলে একটি প্রচারপত্র। উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের একটি সংস্কারবাদী গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী (a radical group in New York city) এই প্রচারপত্রটি কিছুটা গদ্যাংশে ও পদ্যাংশে প্রচার করেছিল। বারবারা এবং জন এ্যারেনরিক তাঁদের পুস্তকের ২য় পরিচ্ছেদে এই প্রচারপত্রটিই ছেপে দিয়েছেন। উক্ত প্রচারপত্রে ছাত্রবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মানসিক ইচ্ছার একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

তাই ষাট দশকের মুক্ত দুনিয়ার ছাত্র সমাজ কি চেয়েছিল তা বুঝার জন্য প্রচার পত্রটির ভাষ্য নিচে দেওয়া হল—

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কল্পনীয় (Fantasy) দাবিগুলি অধিকাংশ পূরণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। সমাজ আমাদের কল্পনাকে দমন করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু কল্পনাগুলি বারবারই ঘুরে ফিরে আসবে; যুবসমাজকে প্রভাবিত করবে, ইতস্ততভাবে শহরকেন্দ্রীক গেরিলা যুদ্ধকৌশল শুরু হবে, আমলাতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মকে ব্যাহত করবে, টাইপিস্টের কর্মস্থলে যাওয়ার পথে তাঁকে আটকান হবে, বাড়ি ও

অফিসে যাতায়াতের মধ্যস্থলে কর্তাব্যক্তিকে অপহরণ করা হবে, চুপিসারে ভদ্রপরিবারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করা হবে, বড় বড় অফিসের পিছনের দিকে লুকিয়ে থাকা হবে, ক্রমান্বয়ে এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। এইসব ঘটনাবলী প্রকাশ্য রাস্তায় শুরু হবে, আরম্ভ হয়ে যাবে সুপরিকল্পিত সংগ্রাম এবং সম্ভব হবে বিজয়লাভ (যা অনিবার্য)।"

আমরা কল্পনার অগ্রবাহিনী
আমরা সেই মুক্ত ভূখন্ডে বাস করি— যেখানে কল্পনা
যা দিনের প্রতি ঘন্টায় মুক্তভাবে ঘুরে ফিরে আরও উন্নতকামী।
এর আক্রমণ ভূখন্ড দখলের।
প্রতিদিনই আমরা নতুন অঞ্চল মুক্ত করবো
প্রতিদিন নতুন জয়ের খবর আসবে
প্রতিদিন আমাদের কল্পনা আবিস্কার করবে
সংগঠন গড়ার নতুন পদ্ধতি
প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণকে করা হবে আরও সংহত
ভয়, আত্মসমীক্ষায় আরও সময় দেবে...
এমন কি যুদ্ধের মাঝখানেই ভবিষ্যৎ শহর নগরের
পরিকল্পনা করা হবে।
আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী
আমরাই ভবিষ্যৎ।"

সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় জগতে দীর্ঘকালব্যাপী চালু গতানুগতিকতার বন্ধনমুক্তি ছাত্রযুব-মানসের অভিব্যক্তি। তারুণ্য চায় আরও মুক্তি, আরও স্বাধীনতা, নতুন আবিষ্কার, নতুন বিজয়, নতুন সৃষ্টি এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে সাফল্য ও বিজয় অর্জনের উল্লাস। তাই, কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনে আপোষহীন ছাত্র-যুব সমাজ সহজে থামতে চায় না কোথাও। কল্পনা বা ফ্যানটাসি (Fantasy) প্রবল মনবিদ্রোহ ও রোমাঞ্চকে সম্বল করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। পাশ্চাত্য বা পশ্চিম (Western Countries) আধুনিক সভ্যতাকে দিয়েছে অনেক। এই অনেক দেওয়ার মধ্যে ঘাটতি, অসংগতি, অসাম্যজনিত ক্ষোভ ধনী দেশেও বিদ্রোহর আগুন জ্বালে। ষাটের দশকের পশ্চিম-দেশীয় ছাত্র বিদ্রোহ সামগ্রিক সামাজিক বিদ্রোহের-ই এক বহ্নিশিখা। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত উপরে উল্লিখিত প্রচারপত্রটি তার-ই নিদর্শন। নিদর্শন ছাত্রবিদ্রোহ যা ঘটাতে চেয়েছিল, সেই বীক্ষণ প্রকল্পের। এর-ই প্রতিফলন পশ্চিমীদেশের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনার বিবরণে।

কয়েকটি দেশের ঘটনাপ্রবাহ

ধনী দেশে [Capitalist countries] ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন বা বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল যেসব দেশে, সে দেশগুলি যথাক্রমে— পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, উত্তর আমেরিকার কলম্বিয়া। এই দেশগুলির ছাত্র বিদ্রোহের ক্রমানুগ বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ (পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল) :

পশ্চিম জার্মানী

ষাটের দশকের শেষ দিকে, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে পশ্চিম জার্মানীতে ছাত্র আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু, ১৯৬৮-র ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যায়ে এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। পশ্চিম জার্মানীতে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা পর্বের পটভূমিতে রয়েছে ঐ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সময় মিত্রশক্তির অভ্যন্তরীণ চুক্তির পরিণতিতে জার্মানীকে বিভক্ত করে দুই জার্মানী সৃষ্টি করার পর পশ্চিম জার্মানীতে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল। এই দল দুটি হল খ্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি [Christian Democrtic Party] এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি [Social Democratic parrty]। এই দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি-ই ছিল সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের [Social tradition] উত্তরাধিকারী এবং শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল। কিন্তু, রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল খ্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটদের হাতে। মার্কিন, ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব এবং চাপ ছিল পশ্চিম জার্মানীর শাসকগোষ্ঠীর উপরে অত্যাধিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও পশ্চিমী জার্মানী কার্যত সাম্রাজ্যবাদী ধনী দেশরূপেই পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ফলে দুই জার্মানীতে সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সমর্থন পুষ্ট সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি অবস্থিতি দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে। একই দেশ দ্বিখন্ডিত হয়ে দুটি সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন হবার ফলে একে অপরকে প্রভাবিত করার একটা পরোক্ষ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শুরু হয় উভয়ক্ষেত্রের ভাল দিকগুলির পাবস্পরিক আকর্ষণ। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক আকর্ষণের একটা চোরাস্রোত বা ফল্গুধারা ক্রমান্বয়েই প্রসার লাভ করে। বার্লিন প্রাচীর দাঁড় করিয়েও শিক্ষা-সংস্কৃতির মনোগত আকর্ষণকে ঠেকান যায়নি।

এইরূপ একটি পরিপ্রেক্ষিতের মাঝখানেই পশ্চিম জার্মানীতে ষাটের দশকের শুরুতে আরেকটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পশ্চিম জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রে-সুসজ্জিত করে তুলতে থাকে এবং এরই সুযোগে ফ্যাসীবাদী নাজিরা (former Nazis) ক্ষমতা (power) এবং সম্পদের (wealth) প্রথম সারিতে এসে যায়। পশ্চিম জার্মানীর গণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষয় ও সংঘাত এই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শক্তিকে করে তোলে টলায়মান। আসে অস্থিরতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারার পর পশ্চিম জার্মানীতে মূলত শিক্ষার কোন সংস্কার হয়নি। অব্যাহত ছিল পুরনো শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা পুরনো মডেলকেই অনুসরণ করে। ফলে ১৯৬০-এর শুরুতে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ভয়ানক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। পঠন-পাঠনের সূচিগুলি [Curriculum] আধুনিক যুগোপযোগী ছিল না, এগুলি অচল [Obsolete] হয়ে পড়েছিল। ছিল না কোন গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপকগণই ছিলেন সব রকম ক্ষমতার অধিকারী, সর্বেসর্বা। এই সর্বেসর্বা অধ্যাপকরা তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে যে কোন স্তরের আধুনিকীকরণের [Modernization] ছিল বিরোধী। শুধু তাই নয়। প্রতিটি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমস্যা ছিল তীব্র। ছাত্রদের ভিড় উপচে পড়ত [Over crowded]। কর্তৃপক্ষ এবং সরকার ছাত্রভর্তি সমস্যার কোন বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান না করে, উপরন্তু ছাত্রদের পড়ার সুযোগকে সংকোচিত করার উদ্যোগ নিল। প্রথমেই ভর্তির দক্ষিণা [entrance fees] বাড়িয়ে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের নামভুক্তকরণ [enrollment] সীমিত করে দেওয়া হল। সেমিস্টারের [semesters] ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ (limit) আরোপ করল। অর্থনৈতিক এবং মানসিক কারণ দেখিয়ে বহু ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাটাই করে তাঁদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হল। সামগ্রিকভাবে পশ্চিম জার্মানীতে শিক্ষা জগতে দেখা দিল এক চরম সংকট। সংকটের আবর্তে ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ।

অপরদিকে পূর্ব জার্মানীতে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার এবং গণতান্ত্রিকরণের কাজ শুরু হয়। খেলা-ধূলা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরে। উচ্চশিক্ষা সহ অন্যান্য সবরম শিক্ষার সুযোগ হয় প্রসারিত।

পূর্ব জার্মানীর প্রভাব পশ্চিম জার্মানীকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ বার্লিনের শিক্ষা ব্যবস্থার ঢেউ বন (Bon)-কে উদ্বেল করে। পশ্চিম জার্মানীর বন-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'বার্লিন মডেল' [Berlin model] চালুর দাবিতে তখন ক্রমান্বয়ে সোচ্চার। তাছাড়া জার্মানীর এই অংশের ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রত্যাশা ছিল অনেক। এই প্রত্যাশার কোন কিছুই পূরণ হয়নি। বরং ১৯৬০ সালে পশ্চিম জার্মানীকে পুনরাস্ত্রিকরণের মধ্য দিয়ে ও পুরান ফ্যাসিবাদী নাজিদের ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী হবার ফলে ছাত্র-যুব সমাজ তথা নতুন প্রজন্মের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রত্যাশা ধূলিসাৎ হতে থাকে। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ববাদীদের দ্বারা আরও বেশি করে শৃঙ্খলিত হয়। ছাত্ররা কর্তৃত্ববাদের [authoritarianism] বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

সামগ্রিক পরিস্থিতির এই পরিমণ্ডলে আরও নতুন ঘটনার সংযোজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে ১৯৬৩ সালে ঠাণ্ডা যুদ্ধের [cold war] হাওয়া কিছুটা স্তিমিত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে থাকা গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে আরও ব্যাপক এবং তাদের শোষনের কব্জী আক্রমণাত্মক। ১৯৫৮-৬২ সালে ফ্রান্স আলজিরিয়াতে, ১৯৬০ সালে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স-বেলজিয়াম মিলে কঙ্গোতে, ১৯৬০-৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাতে তাদের শোষণের হিংস্র থাবা প্রসারিত করেছিল। ১৯৬৪ সালে ভিয়েতনামের জনগণের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ হয়েছিল তীব্র।

এই পটভূমিতেই পশ্চিম জার্মানীর শিক্ষা জগতে একটি নতুন ঘটনা ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের [Student Parliament] নির্বাচনগুলিতে নরমপন্থী এবং বামপন্থী [Liberal & Leftist] ছাত্ররা সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে পশ্চিমী দেশগুলিকে অবাক করে দেয়। ছাত্ররা এই নির্বাচনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শোষণ-নির্যাতন, ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তীব্র আক্রমণ, নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম সংকট এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রচারকে প্রধান ইস্যু করে-এর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

ছাত্র সংসদে নরমপন্থী এবং বামপন্থী ছাত্রদের নির্বাচনী সাফল্য শ্রমিক-কৃষক এবং মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষোভকে নাড়া দেয়। উল্লসিত করে বাম-গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক শক্তিকে। ১৯৬৪ সালের এই উৎসাহজনক ঘটনার পর দেশের রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসের

পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির একচ্ছত্র শাসনেরও অবসান ঘটে। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে খ্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং স্যোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টির 'মহাজোট' গঠিত হয়।[৫] পরিস্থিতির এই রাজনৈতিক পরিবর্তন বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন নতুন করে প্রাণসঞ্চার করে। অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে ছাত্র পার্লামেন্টে নরম ও বামপন্থী ছাত্রদের জয় এবং ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে 'মহাজোট' গঠনের ঘটনায় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের সূচনা পর্বে দুটি উত্তেজক ঘটনা ঘটেছিল। বার্লিনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে (বার্লিন এখানে পশ্চিম জার্মানীর অংশকে বলা হচ্ছে) বাম-গণতন্ত্রী ছাত্ররা ১৯৬৫ সালের মে মাসে এ্যারিক কুবাই [Erich Kuby] নামে একজন বাম গণতন্ত্রী সাংবাদিককে একটি সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ্যারিক কুবাইকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বক্তৃতা করার অনুমতি দেয়নি। ফলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে অন্যত্র সমাবেশ করে। ঐ বৎসরই গ্রীষ্মকালে আরো একটি ঘটনা। দার্শনিক কার্ল জেসপার-কে বক্তৃতা করতে না দেওয়ার প্রতিবাদ করে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারি কর্মী এ্যাক্কিহার্ট ক্রিপেনড্রপ [Ekkeheart Krippendrop] একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এই নিবন্ধ লেখার অপরাধে এ্যাক্কিহার্ট ক্রিপেনড্রপের চাকুরি চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্রিপেনড্রপকে চাকুরীতে পুনর্বহাল দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয় এবং এই সমাবেশে প্রায় সাত শতাধিক ছাত্র যোগ দিয়েছিল! এই দুটি ঘটনা ভবিষ্যতের ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিল। ছাত্রদের গতানুগতিকতার নিষ্ক্রিয়তা এবং ঔদাসীন্য থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

ছাত্র বিক্ষোভের সম্ভাব্য পরিস্থিতি বন-সরকারের সুহৃদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শঙ্কিত করে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সচিব এবং সি.আই.এ. [C.I.A.]-এর প্রাক্তন ডাইরেকটর জন ফস্টার ডালেসের ভগ্নী এ্যালিনোর ডালেস-র ভাষায়— "বার্লিনের ছাত্ররা অস্থির। তারা সব বাধা ভেঙ্গে দিতে চায়, নিজেদের অভিজ্ঞতাকে করতে চায় প্রসারিত, তাঁরা চায় পূর্বাংশে যেতে, আমদানী করতে চায় সেখানকার ধারণাকে এবং বুঝতে চায় কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে।"[৬]

পশ্চিম জার্মানীতে ছাত্রদের অনেক গোষ্ঠী ছিল। ছাত্র ইউনিয়গুলি সাধারণত পরিচালিত হত প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান যুবকদের গঠিত ঐক্যমঞ্চের দ্বারা। এই ছাত্র ইউনিয়নগুলি [ASTA] বিগত কয়েক বছর ধরে বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পরে। ছাত্রসংগঠন অর্থে যা বুঝায়— তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ছাত্র সংগঠনের নাম এস. ডি. এস. [SDS-জার্মান ভাষায় Sozialistischer Deustscher Studentenbund] কিন্তু মজার ব্যাপার হল ষাটের দশকে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি যত দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকতে থাকে, ততই এই পার্টির ছাত্র সংগঠন SDS বামপন্থার দিকে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে পার্টির সাথে SDS-এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানীর ছাত্র আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় SDS। পশ্চিম বার্লিনের ছাত্র সংসদগুলিও SDS নিয়ন্ত্রণ করত। এদের পক্ষ থেকে "একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়" ["The University in ,a Democratic Society"] নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার নিবন্ধ-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল মার্কসবাদী তত্ত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত বিষয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রচার করতেন মাক্স হকাইমার [Max Heimer], থিউডোব এ্যাডরনো [Theodore Adorno], জার্গেন হ্যাবারমাক্স [Jurgen Habermas] প্রমুখ। এরা ছাত্রদের

কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত আরেকজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন হার্বার্ট মারকিউস [Herbert Marcuse]। হার্বার্ট মারকিউস-এর মতে ছাত্ররা একটি প্রান্তিক গোষ্ঠী [merginal group]। এই প্রান্তিক গোষ্ঠী-ই পারে সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। কারণ, প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসাবে ছাত্র সমাজের একমাত্র শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ এবং গবেষণা ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অন্য কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং ছাত্র সমাজকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের সংগঠিত করতে হবে— হার্বার্ট মারকিউসো এই তত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ছাত্র সমাজ সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। SDS বামপন্থা অনুসরণ করে ছাত্র সংগ্রামের নেতৃত্বের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়।

ছাত্ররা এবং ছাত্র সংগঠন ছাত্র সমাজের সমস্যা সমাধানের দাবি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবির আন্দোলন সংগঠনের পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে আন্দোলন সংঘটিত করে।

১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে সরকার ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি সেমিস্টারে পর্যন্ত থাকার উপর সীমা (limit) আরোপ করলে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের SDS ছাত্ররা পরিচালিত ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়। কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ বা দরখাস্ত পেশের পদ্ধতিগত গতানুগতিক আন্দোলনের ধারাকে বাতিল করে দেয়। আন্দোলনের পদ্ধতি হিসাবে অবস্থান ['Sit in'] অবরোধের পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। এই থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছাত্র আন্দোলন তথা গণআন্দোলনে এই অবস্থান-অবরোধের পদ্ধতি চালু হতে থাকে।

পশ্চিম জার্মানীর ছাত্রদের অবস্থান আন্দোলনের জঙ্গীরূপ ক্রমান্বয়ে প্রকট হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলে ছড়িয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের শান্তিপূর্ণরূপ ব্যাহত হয়। SDS-এর নেতৃত্বের একাংশ সংঘর্ষের পথে [Violence] আন্দোলন পরিচালনার নীতিতে বিশ্বাস করত। সাধারণ ছাত্রদের এক বিরাট অংশ এই সংঘর্ষের নীতিতে বিশ্বাস করতো। সাধারণ ছাত্রদের এক বিরাট অংশ এই সংঘর্ষের নীতিতে প্রভাবিত হয়। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম বার্লিনে দুই সহস্রাধিক ছাত্রদের এক শান্তিমিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পুলিশ ছাত্রদের শান্তি মিছিল রাজপথে থামানো মাত্র পুলিশের সাথে ছাত্রদের তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়, চলে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্ররা তাঁদের আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'কমিউন' নামে এক ধরণের সংগঠন গড়ে ছিল। 'কমিউন'গুলি প্রকৃতপক্ষে ছাত্র আন্দোলনের এক-একটি ইউনিট। পশ্চিম বার্লিনের ছাত্রদের এইরূপ একটি ইউনিটের নাম ছিল 'কমিউন-১'। 'কমিউন-১'-এর অন্তর্ভুক্ত ছাত্ররা সংঘর্ষের প্রস্তুতির এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপ্রধান হুবার্ট হামফ্রে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম বার্লিন সফরের সিদ্ধান্ত নেয়। 'কমিউন-১'-এর ছাত্ররা ঠিক করে হুবার্ট হামফ্রের সফরকে এক সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে বানচাল করে দেওয়া হবে। তাই ছাত্ররা দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে ছাত্রদের এই প্রস্তুতির খবর পুলিশও জেনে যায়। পুলিশ ছাত্রদের কমিউনে তল্লাসি অভিযান চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে এবং বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ বলে এটা হুবার্ট হামফ্রেকে হত্যার ষড়যন্ত্র। সংবাদপত্রগুলি বড় বড় "হামফ্রের জীবন বিপন্ন ["Humphrey's Life Threatened"] শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। দেশ জুড়ে দেখা দেয়

এক চাঞ্চল্য। পুলিশ, সরকারি প্রচার যন্ত্র, এবং সংবাদপত্রগুলি এই ঘটনার সুযোগে সমগ্র ছাত্র আন্দোলনকে কুৎসার বন্যায় ডুবিয়ে দেবার লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করে। প্রকৃতপক্ষে যা আদৌ ঘটনা নয়— তা প্রচার হবাব ফলে ছাত্র আন্দোলনের জঙ্গী প্রবণতা আরো ব্যাপক রূপ নেয়।

১৯৬৭ সালের ২রা জুন ইরানের শাহের বার্লিন অপেরা দর্শনের সময় ছাত্ররা ডিম-টমেটো নিক্ষেপ করে, ইরানের শাহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। ইরানের গরীব মানুষদের উপর শাহের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই ছিল এই বিক্ষোভ। ভাড়া করা দুর্বৃত্ত এবং পুলিশ দিয়ে ছাত্রদের এই শাহ বিরোধী বিক্ষোভকে দমন করা হয়। পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষের সময় বেন্নো অনিসর্গ [Benno ohnesorg] নামে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। বেন্নো অনিসর্গ-ই ষাটের দশকে পশ্চিম জার্মানীর ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহিদ।

ছাত্র কর্মী বেন্নোর শহিদ হবার ঘটনায় পশ্চিম জার্মানীর অধিকাংশ শহরের রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। হ্যানুভারে সারা পশ্চিম জার্মানী থেকে আগত প্রতিনিধিস্থানীয় দশ হাজার ছাত্রের এক জাতীয় স্তরের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে সারা পশ্চিম জার্মানী জুড়ে ছাত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত হয়। ৩রা জুন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বেন্নোর হত্যার প্রতিবাদে সমাবেশ হয় ছয় সহস্রাধিক ছাত্রের। এই সমাবেশ থেকে ছাত্রদের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত হয় এবং সপ্তাহব্যাপী ক্লাস বর্জন চলে। এইভাবে শুধু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছাত্র বিক্ষোভে অচল হয়ে পড়ে।

এই সময় ছাত্র আন্দোলনের আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল। ছাত্রদের বিক্ষোভ আন্দোলন চলাকালীন সময়েই ছাত্রদের এক অগ্রণী অংশ ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজ চালাতে থাকে এবং বিভিন্ন তথ্যাদি দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলে। পশ্চিম জার্মানীর শাসক গোষ্ঠীর সমর্থক একচেটিয়া সংবাদপত্র মালিকরা ছাত্রদের এইসব কাজকর্মকে ভাল চোখে দেখেনি। একচেটিয়া সংবাদপত্র মালিকদের প্রধান ছিল এক্সেল স্প্রিঙ্গার ভারলাগ [Axel Springer Verlag]। স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠী পশ্চিম জার্মানীর দৈনিক সংবাদপত্রগুলির শতকরা ৭৮% ভাগ, ম্যাগাজিনগুলির ৪৩% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। এই গোষ্ঠীর বাইরের সংবাদপত্রগুলি ছিল স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠীর-ই ঐক্যতানকারী [bandwagon]। স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠী সহ সব সংবাদপত্রগুলি প্রচার শুরু করল— আন্দোলনকারী ছাত্ররা "কমিউনিস্ট" অথবা "প্রো-চাইনিজ"।

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিম বার্লিনে SDS সহ বিভিন্ন ছাত্র গোষ্ঠীর উদ্যোগে ভিয়েতনামের ঘটনাবলীর উপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য নগর সরকার এবং স্প্রিঙ্গার সংবাদপত্রগোষ্ঠী উদ্যোগ নিয়েছিল। তারা প্রথমেই এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই নিষিদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্ররা আদালতে আবেদন করল। সবাইকে অবাক করে আদালত ছাত্রদের পক্ষে রায় দিয়ে সম্মেলন নিষিদ্ধ করার আদেশকে বেআইনি বলে ঘোষণা করল। বার্লিন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির রেক্টর ছাত্রদের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। তিনি সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি ঘর ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। ভিয়েতনামের উপর এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনের শেষদিনে বিশ সহস্রাধিক ছাত্রের এক দীপ্ত মিছিলে পশ্চিম বার্লিন কেঁপে

ওঠে। মিছিলকারী ছাত্রদের হাতে ছিল ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পতাকা। এতে আতঙ্কিত হলো স্প্রিঙ্গার সংবাদপত্রগোষ্ঠী এবং নগর সরকার। তারা সংবাদপত্র মারফৎ অবিরাম ছাত্রদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে পরের সপ্তাহেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ সহস্রাধিক বার্লিনবাসীর এক পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল [Counter Demonstration] বের করে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়।

একচেটিয়া সংবাদপত্রগোষ্ঠীর ছাত্র আন্দোলন বিরোধী ভূমিকায় ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে সংবাদপত্রের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার একমাস ধরে বিভিন্ন শহরে রাস্তায় চালিয়েছিল। এতে সংবাদপত্রগোষ্ঠী ও সরকারের দালালদের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। ১৯৬৮ সালের ১১ই এপ্রিল SDS তথা পশ্চিম জার্মানির ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য নেতা রোডি ডোসেকে [Rudi Dutschke] -কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর মাথায় গুলি করা হয়। এর পরিণতি হল ভয়ানক। প্রায় সমস্ত ছাত্রগোষ্ঠী এবং যুবগোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রনেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১১ই এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এক অভূতপূর্ব জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলে। স্প্রিঙ্গার গ্রুপের সংবাদপত্র প্ল্যান্ট ঘেরাও করা হয়। রাস্তায় রাস্তায় সংবাদপত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে। সংবাদপত্রের সরবরাহ ভ্যানগুলিকে উল্টে দেওয়া হয় এবং রাস্তায় সংবাদপত্র বিলি-বন্টনের ব্যবস্থাগুলিকে অবরোধ করে বানচাল করে দেওয়া হয়। সরকারকে বলা হয় সংবাদপত্রের অপপ্রচার এবং ছাত্র আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা বন্ধ না করলে ছাত্ররাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এইভাবে স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠীর সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গোটা পশ্চিম জার্মানীতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হবার ফলে, সরকার স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠীকে রক্ষায় এগিয়ে আসে এবং সর্বত্র ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এর পরবর্তী ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। সংগ্রামরত ছাত্রদের সমর্থনে কল-কারখানার এবং বিভিন্ন সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকরা এগিয়ে এলেন। পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন্ন শহরের রাজপথে বেরল সত্তর হাজার শ্রমিক এবং ছাত্রদের মিলিত মিছিল। রূঢ় প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের সংগ্রামের সমর্থনে ছাত্ররাও লাল পতাকা হাতে রাস্তায় বিক্ষোভে সামিল হল। শ্রমিক ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশী দমননীতি শুরু হওয়া মাত্র শ্রমিক ও ছাত্ররা মিলিতভাবে প্রতিরোধ করল পুলিশী দমননীতি। ছাত্ররা এগিয়ে গেল তারও অনেকদূর। তাঁরা প্রায় সব শহরের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি-ঘর, হল ইত্যাদি দখল করে নিল।

ছাত্র আন্দোলন যখন বিদ্রোহ পর্যায়ে তুঙ্গে উঠেছে তখন ১৯৬৮ সালের ২৫শে মে নিউইয়র্ক টাইমস্ লিখল— "ছাত্ররা লেকচার বয়কট করে পড়বার হল ও প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করার প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিম জার্মানীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে এক গোলমেলে পরিস্থিতি।"

পশ্চিম জার্মানির ছাত্র আন্দোলনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। স্কুল ছাত্রদের সমস্যাগুলিও এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে নেওয়া হয়। ফলে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্রদেরই মিলিত আন্দোলন ছিল এই ছাত্র আন্দোলন। বিভিন্ন সামাজিক ক্লাব এবং রিপাবলিকান ক্লাবগুলিও ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় ছাত্ররা বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনেও সাফল্য লাভ করে। বাসভাড়া বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বাস গুমটি-টারমিনাস অবরোধ করে ছাত্ররা এক সপ্তাহ ধরে শহর অচল করে দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের কাছে নতিস্বীকার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাসভাড়া বৃদ্ধিজনিত

সমস্যার সমাধান করে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছাত্র আন্দোলনের চাপে ছাত্রদের অনেক দাবিও আদায় হয়েছিল।

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮, পশ্চিম জার্মানীতে ছাত্র আন্দোলন বিদ্রোহের পর্যায়ে উন্নত হলে ছাত্র সংগঠন এবং ছাত্র সমাজের মানসিকতায় একটি কল্পবিলাসী ধারণার সৃষ্টি হয়। তাঁদের আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে তাঁরা বিকল্প সমাজব্যবস্থা [the possibility of alternative forms of society] গঠনের সম্ভাবনা দেখতে পায়। এই ভাবনা চিন্তা থেকে আসে বিপ্লবী কার্যক্রম গ্রহণের [revolution action] চিন্তা ভাবনা। ১৯৬৮ সালের শেষ পর্যায়ে তারা এক 'লঙ মার্চের' কথাও ভেবেছিল।

কিন্তু ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে ছাত্রদের এই রাজনৈতিক সংগ্রামের বৈপ্লবিক কল্পনা সত্তরের দশকের শুরুর আগেই স্তিমিত হয়ে যায়। পশ্চিমী দুনিয়ার বিশ্লেষকদের মতে : পশ্চিম জার্মানীর ছাত্ররা 'লঙ-মার্চ'-এর কথা ভেবেছিল ঠিকই, কিন্তু নেতৃত্ব দানের পর্যায়ে তারা উন্নীত হয়নি।[৮]

ষাটের দশকে পশ্চিম জার্মানীর ছাত্র আন্দোলনে ১৯৬৮ সালেই ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ বৎসর এবং তার পরই আস্তে আস্তে তার পরিসমাপ্তি।

ইতালী

ইউরোপের দেশ ইতালী ষাটের দশকের মুক্ত দুনিয়ার [Free world] ছাত্র আন্দোলনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল। ইতালীতে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠার মত উপাদান পঞ্চাশের দশকের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্যাসিস্ত মুসোলিনীর শাসনের অবসান ঘটলেও প্রশাসনের কোন আমূল সংস্কার কিংবা পরিবর্তন করা হয় নি। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পুরানো কাঠামো এবং পঠন-পাঠন পদ্ধতি বজায় ছিল অনেকটা পশ্চিম জার্মানীরই মতো। কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপকের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কোন গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা শিক্ষার শীর্ষকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছিল না। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরণের কর্তৃত্বকামী স্বেচ্ছাচারিতার [authoritarianism]।

পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকের প্রথম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের সমস্যাগুলি সবসময় ছিল অবহেলিত। পাঠ্যসূচির কোন সংস্কার নেই। এর চেয়েও প্রকট ছিল ছাত্র ভর্তি সমস্যা। ১৯৬৬-৬৭-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় তুরিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয় সাহিত্য বিভাগে আসন সংখ্যা ছিল ২০০, অথচ ভর্তি করতে হয়েছিল ৯০০ জন ছাত্রকে। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও ছিল না কোন নিয়ন্ত্রণ। শুধু পরীক্ষা দিতে হবে বলেই ছাত্ররা পরীক্ষায় এসে বসত। ঐ তুরিণেই বিশ হাজার ছাত্র বিভিন্ন শ্রেণিতে নাম নথিভুক্ত করেছিল, কিন্তু ক্লাসে হাজির হত মাত্র সাত হাজার জন। ছাত্রদের ক্লাসে হাজির না হবার কারণ ছিল আসলে ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে আসন সংখ্যার অভাব। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রদের স্কলারশীপ ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। তুরিণের হাইস্কুল এবং গ্রেড স্কুলগুলিতেও একই ধরণের সমস্যা। তুরিণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অবস্থা, সে একই অবস্থা রোম সহ ইতালীর সর্বত্র।

ইতালীর ষাটের দশকের ছাত্ররা বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মের। সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাথলিন খ্রিস্টান পরিবারের। ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি হয় মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত কিংবা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত পরিবারভুক্ত। তাই এদের জীবনে আধুনিক যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষা কাঠামো ষাটের দশকেও গড়ে তুলতে পারেনি সরকার বা রাষ্ট্র। তাই ইতালীর ছাত্র সমাজের সমস্যার কোন সমাধান না হয়ে বরং সমস্যাগুলি ছিল ক্রমবর্ধমান। ফলে ছাত্রমানসে ক্ষোভ হয় পুঞ্জিভূত।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইতালীর জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন [UNURI] ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ জানাবার একমাত্র সংগঠন বা মঞ্চ। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ছাত্র বিক্ষোভের সাথে তাল রেখে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জাতীয় ইউনিয়নের প্রতি ছাত্রদের সমর্থন হ্রাস পেতে থাকে। বেশিরভাগ ছাত্রদের মতে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের উপরতলায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে ছাত্রদের শিক্ষা জীবনের সমস্যাগুলি ইউনিয়ন পাশ কাটিয়ে যেত। জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থের সাথে যুক্ত ছিলেন বলেই ছাত্রদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে উদাসীনতা অবলম্বন করে বলে অনেকের ধারণা।

ইতালীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রসমাজের মধ্যে বামপন্থীর অনুগামী অনেক ছাত্র ছিল। ইতালীতে তখন বামপন্থী রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচিত ছিল— কমিউনিস্ট পার্টি [PCI], সোস্যালিস্ট পার্টি [PSI] এবং সোস্যালিস্ট পার্টি অব প্রোলিটারিয়ান ইউনিটি [PSIUP]। এই বামপন্থী রাজনৈতিক পার্টিগুলির অনুগামী ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নে [UNURI] যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাতো। ১৯৬৫-৬৬-৬৭ সালে বামপন্থী দলগুলির আমলাতান্ত্রিক কাজকর্ম এবং সংসদীয় নির্বাচনে কৌশলগ্রহণে ব্যস্থতা ও আসক্তি দেখে বামপন্থার অনুগামী ছাত্রসমাজ হতাশ হয়ে পড়ে। বামপন্থার অনুগামী ছাত্ররা আরো হতাশ হয় কমিউনিস্ট প্রভাবিত দেশের সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন 'ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন'-এর আপোসমুখী কার্যকলাপ দেখে। ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে এই সময় বামপন্থী ছাত্রদের ধারণা হয়েছিল— এই পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী।

তুরিণ, রোম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থার অনুগামী ছাত্ররা এই সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা মাও সেতুং, ম্যালকম [Malcolm], চে গুয়েভারার তত্ত্ব সম্পর্কিত বই-পত্র পড়াশুনা শুরু করে। আলোচনা করে পশ্চিম জার্ম্মানির ছাত্রনেতা হার্বার্ট মারাকিউজের 'প্রান্তিক গোষ্ঠী' [Marginal Group]-তত্ত্ব নিয়ে। ইতিমধ্যে পশ্চিম জার্মানীর SDS পরিচালিত ছাত্র-বিদ্রোহের খবরাখবর ইতালীতে পৌঁছায়। ইতালীর বামপন্থার অনুগামী ছাত্ররা পশ্চিম জার্ম্মানির ছাত্র আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। কিন্তু ইতালীর বামপন্থার অনুগামী ছাত্ররা হার্বার্ট-এর 'Marginal Group' এর তত্ত্ব গ্রহণ করল না। তাঁরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা মত আন্দোলনের বিষয়বস্তু বা ইস্যু এবং পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করল। একেই পরে বলা হল ছাত্র আন্দোলনের ইতালীয়ান 'স্টাইল'।

ইতালীর ছাত্র আন্দোলনের ইস্যু ছিল— ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন; তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিবাদ;

ইতালীর শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্তৃত্ববাদের সমস্যার সমাধান; যৌন স্বাধীনতা দান। শেষোক্ত ইস্যুটি অর্থাৎ 'যৌন স্বাধীনতা' [Sexual liberation]-এর বিষয়টি তত্ত্বগত পর্যায়ে আলোচনার বিষয় ছিল এবং পশ্চিম জার্মানীর ছাত্র আন্দোলনেও এই বিষয়টি খুবই সাধারণভাবে উত্থাপিত হয়েছিল।

ইতালীর ছাত্র আন্দোলনের ইস্যুগুলির সাথে ইউরোপের অন্যদেশগুলির ছাত্র আন্দোলনের ইস্যুগুলির সামঞ্জস্য থাকলেও, আন্দোলনের সাংগঠনিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। বাম র‍্যাডিক্যাল লিবারেল ছাত্ররা তাঁদের জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের [UNURI] সংশ্রব ছেড়ে দিলেও নিজেদের কোন ছাত্র সংগঠন গড়ল না। তাঁরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য পাঠচক্র [Study Group] গড়ে তুলল। এই পাঠচক্রগুলিই কার্যত আন্দোলনের নেতৃত্বের সম্মুখসারিতে এলো। সাংগঠনিক পদ্ধতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বে আন্দোলনের পদ্ধতি প্রায় একইরকম ছিল। ইতালীতেও বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধ, সমাবেশ অবস্থান এবং পুলিশী সংঘর্ষের প্রতিরোধ ছিল আন্দোলনের পদ্ধতি [Form of Stuggle]।

ছাত্র আন্দোলনের ইস্যু এবং পদ্ধতির ভিত্তিতে ইতালীতে ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, এবার তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

১৯৬৬-৬৭ সালে ইতালীর বামপন্থী ছাত্রদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা থাকা সত্ত্বে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালীর সমগ্র ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা যায়নি। কিন্তু, ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে তুরিণ শহরকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তুরিণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলে ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে শত শত ছাত্র-ছাত্রী দলে দলে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। পুলিশের বাঁধাকে উপেক্ষা করেই ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। ইতালীতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের সাথে তুরিণ শহরে এই সংঘর্ষই ছিল ছাত্রদের প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম। ১৯৬৭ সালের শেষের দিকের এই ঘটনা তুরিণ থেকে রোমসহ ইতালীর প্রায় সব শহর ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ হল ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পাশাপাশি শুরু হল ছাত্রদের নিজেদের সমস্যা সমাধান ও দাবি আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৬৭ সালের শেষ দিকে তুরিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শহরের সীমানার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ফ্যাকাল্টি ভবনগুলি নির্মাণের সিদ্ধান্তে নিয়েছিল। ছাত্ররা নিজেদের শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি ছিল না। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করল প্রশাসন পরিষদের কাছে। প্রশাসন পরিষদের সভায় ছাত্রদের আবেদনপত্র নাকচ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা ঐ সভাস্থলেই অবস্থান শুরু করে। পুলিশ এসে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট ভেঙে দেয়। এর তিন দিন পরেই ২৭শে নভেম্বর প্রায় আটশত ছাত্র সংগঠিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিলিপি, আইন, শিক্ষা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন বিভাগ (faculties) দখল করে নিল। চালু করে দিল পাল্টা পাঠ্যসূচি (Counter Courses), বিভিন্ন সেমিনার ইত্যাদি। এসবের মধ্যে সংযুক্ত হলো ভিয়েতনামের এবং লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা এবং নিজেদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়। ছাত্রদের 'স্টাডি গ্রুপ'-গুলিই এই পাল্টা পাঠ্যসূচি এবং সেমিনার পরিচালনার দায়িত্বে এগিয়ে এল। শিক্ষাবর্ষের বাকি সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিকে ছাত্রদের দখলমুক্ত

করতে পারল না। পরে পুলিশের সাহায্যে তুরিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই দখল মুক্ত করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় দু-হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই দখল বা অবরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। জুন মাস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তুরিণের হাইস্কুলে, টেকনিক্যাল স্কুলে ছাত্র ধর্মঘটের ঘটনা পর পর ঘটতে থাকে।

তুরিণের পরই রোমের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল রাজনৈতিকভাবে অনেকটা অগ্রসর। কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্রদের আকর্ষণ ছিল চে গুয়েভারার প্রতি। এই ছাত্রদের মধ্যে গুয়েভারা পন্থীসহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্ররা ভিয়েতনাম ইস্যু ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আন্দোলন সংগঠনে তেমন আগ্রহী ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্লোরেন্সে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের এক সমাবেশের উপর পুলিশ বর্বর অত্যাচার চালায়। পুলিশী বর্বরতার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোমের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রসমাজ এক বৃহৎ ছাত্র জমায়েতে তাঁদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করে এবং রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিগুলি দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দখলের সিদ্ধান্ত কার্যকারি করার সময় ফ্যাসিস্টদের আটকে রাখার উদ্দেশ্যে ফ্যাকাল্টিগুলির বহু ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে অনেক সাধারণ ছাত্রও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেই ছাত্ররা বিভিন্ন গণ কার্যক্রম [mass-action] চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যায়ে পুলিশবাহিনী দখলকারী ছাত্রদের হটিয়ে দেয়। ছাত্ররা কৌশলগত কারণেই পুলিশের বিরুদ্ধে খুব একটা সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে সামান্য প্রতিরোধ দিয়েই পিছু হটে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে।

তারপরের ঘটনা আরও জঙ্গী আন্দোলনের পদ্ধতি গ্রহণ। ছাত্ররা ঠিক করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্থাপত্য বিভাগের [Faculty of Architecture] বন্ধ-ঘর খুলে ছাত্রসমাবেশ করবে। ছাত্ররা তাঁদের সিদ্ধান্ত মত এই কাজে অগ্রসর হওয়ামাত্র কর্তৃপক্ষের গুণ্ডাবাহিনী এসে ঘটনাস্থলে ছাত্রদের মারধোর করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরের দিন এই ঘটনার সূত্র ধরে ভেলি জিওলিয়া পার্কে [Valle Giolia Park] ক্রুদ্ধ ছাত্ররা পুলিশের সাথে এক খণ্ড যুদ্ধে পুলিশের বহু গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং নতুন বাহিনী এসে পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত পুলিশরা বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিশ, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ অনেকে আহত হয়। দুই দিন ধরে পুলিশের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে ছাত্ররা পুনরায় ফ্যাকাল্টিগুলি দখল করে নেয়। দাবি অনুসারে এই সময়ে বিশ্ববিদ্যায়ের সংস্কার কাজ চালানো ছিল অসম্ভব। যে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দখল করে নিয়েছিল, তাঁরা 'বিকল্প পাঠ্যসূচি' চালু করল। ভিয়েতনাম, কালো মানুষের ক্ষমতা অর্জন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম— এইসব বিষয়গুলি ছিল 'বিকল্প পাঠ্যসূচি'-র অন্তর্ভুক্ত। দুই সপ্তাহ ছাত্রদের দখলে ফ্যাকাল্টি গুলি থাকার পর আবার বহিরাগত ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাবাহিনীকে দিয়ে উৎখাতের চেষ্টা করা হল। ছাত্ররা ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে চালাল বীরত্বপূর্ণ লড়াই। ছাত্রদের এইবারের প্রতিরোধ খুবই দৃঢ় এবং জয়লাভের প্রত্যয়ে অটল। সামগ্রিকভাবে ছাত্রসমাজের মনোভাব বামপন্থার দিকে। রোম এবং তার চারপাশ ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল। শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের এক বিরাট অংশ সংগ্রামী ছাত্রদের পক্ষে। জনসমর্থনের চাপে ছাত্র আন্দোলনের উপর ইতালী সরকারের দমননীতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

জনসমর্থনের গুরুত্বকে বুঝে সংগ্রামরত ছাত্রসমাজ ছাত্র আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে রোমের ছাত্ররা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত হেনেছিল। ছাত্রদেব গোচরে এল সাম্রাজ্যবাদী নেটো (NATO) যুদ্ধ। জোটের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের মধ্যে 'এ্যাটোমিক, ব্যাকটরিয়োলজিকাল এবং কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট' (ABC)-এর নামের আড়ালে ভয়ঙ্কর জীবাণুযুদ্ধের গবেষণার কাজ চালান হচ্ছে। ছাত্ররা এই ইনস্টিটিউটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে এবং মানবতাবিরোধী কাজের প্রতিবাদ জানায়। এতে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

ABC ইনস্টিটিউটের সামনে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ বানচালে পুলিশ এবং গুণ্ডাবাহিনীর দমননীতি বর্বরতার সীমাকে অতিক্রম করেছিল। ছাত্ররা পুলিশ ও গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হল, বহু ছাত্র গ্রেপ্তার হল। এই বর্বর দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বিচার ভবনের সামনে [Place of Justice] ছাত্রদের বিশাল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল রোমনগরীর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি ছিল নকল বিচার সভা। এই সময় পুলিশ ১৯০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে এবং অসংখ্য ছাত্রকে মারধোর করে।

ছাত্র আন্দোলনের উপর দমন-পীড়নের প্রতিবাদে জন-জীবনের বিভিন্ন অংশ সামিল হল। বিশেষ করে শ্রমিকরা ছিল বেশি সোচ্চার। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল ছাত্র-শ্রমিক সংহতি। রোমের ছাত্রসমাজে ছাত্র-শ্রমিক সংহতিকে আরও ব্যাপক করেছিল ঐতিহাসিক মে-দিবসে। কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আয়োজিত মে-দিবসের সমাবেশ মিছিলে ছাত্ররা সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

ইতালীর ছাত্র আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র রোমের ছাত্রসমাজ অন্যদেশে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি জানাতেও ছিল অগ্রণী। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে রোমের ছাত্ররা ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে এলে পুলিশের সাথে ছাত্রদের দাঙ্গা বেঁধে যায়। কিন্তু ছাত্ররা কখনো রাস্তায়, কখনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের অভ্যন্তরে পুলিশ এবং গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলায় পিছু হটেনি।

ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে ইতালীর রোম এবং তুরিন, নেপলস প্রভৃতি শহর-নগরে ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে ওঠলেও রাষ্ট্রশক্তির দমন-পীড়নে বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে ছাত্র আন্দোলন স্তিমিত হতে শুরু করে। এতদ্‌সত্ত্বেও ইতালীর ছাত্র আন্দোলন ইউরোপের ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের প্রতীক রূপেই বিবেচিত। অনেক বিশ্লেষকের মতে ইতালীর ছাত্ররা অনেক সচেতন এবং নিয়মতান্ত্রিক [radicalized]।

ফ্রান্স

মানব জাতির ইতিহাসের মোড় ঘটানো ঐতিহাসিক ঘটনা 'ফরাসী বিপ্লবের' পীঠস্থান ফ্রান্স। প্রায় ১৮০ বৎসরের মাথায় আবার বিদ্রোহী ফ্রান্স বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় বিশ্ববিখ্যাত। এবার বিপ্লব না ঘটলেও বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছাত্র সমাজের। যৌবন তারুণ্যের প্রাণবন্ত শক্তি, ক্রোধে, আক্রোশে, ক্ষোভে-বিক্ষোভে উদ্দাম হয়ে নতুন প্রাপ্তির নতুন কিছু গড়ার অন্বেষায় বিদ্রোহে পরিণত। দুর্দান্ত রাষ্ট্রশক্তি এবং তার কাঠামো অকস্মাৎ ছাত্রবিদ্রোহের ভূমিকম্পে

কম্পিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল পতন ও ভাঙনের মুখে। ফরাসী বিপ্লবে পতন হয়েছিল বাস্তিল দুর্গের। ঐ ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্যবাহী ফ্রান্সের ছাত্রসমাজের বিদ্রোহে ১৯৬৮ সালের শেষদিকে পতন হতে যাচ্ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধখ্যাত অন্যতম সেনাপতি জেনারেল দ্যগল পরিচালিত ফরাসী সরকার বা ফ্রান্স গভর্নমেন্টের।

এই ফরাসী বা ফ্রান্স-এর ছাত্রবিদ্রোহ-ই মূলত ষাটের দশকের ছাত্রবিদ্রোহ বলে চিহ্নিত। ষাটের দশকের ছাত্র-বিদ্রোহের অথবা ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ফ্রান্স। ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্রবিদ্রোহের প্রধান উপাদান এবং কারণগুলির অস্তিত্ব ছিল ফ্রান্সের উন্নত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা. রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে। ফ্রান্স পৃথিবীর সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি আধুনিক 'ধনতন্ত্র-গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র [Capitaltist Democratic State]। অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার অংশীদার হিসেবে ফ্রান্স একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও বটে। অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় 'ধনতন্ত্রী-গণতান্ত্রিকক' কাঠামোর উপরে নির্ভরশীল বলে ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ ভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। এই রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ আদর্শ অনুসারী। ফলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং যার প্রতিফলন সমাজের সব স্তরেই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবিত কিংবা পরিচালিত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক প্রভৃতি গণসংগঠনগুলি [mass-organisation or mass-front] এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে মুক্ত ছিল না। এই রকম একটি পটভূমিতেই দ্যগল পরিচালিত ফরাসী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ভূমিকা প্রকটরূপ ধারণ করে। আফ্রিকার আলজেরিয়াতে নিজের ফরাসী উননিবেশ [France Colony] টিকিয়ে রাখার জন্য আলজেরিয়ার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী জঘন্য এক যুদ্ধ চালিয়েছিল দ্যগল সরকার। তাছাড়া এশিয়া তথা সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানবতাবিরোধী যুদ্ধেরও সমর্থক-পৃষ্ঠপোষক ছিল দ্যগল পরিচালিত ফরাসী সরকার। ফরাসী সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা ফ্রান্সের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এবং প্রগতিশীল শান্তিকামী মানুষের মনে প্রতিবাদী বিক্ষোভের সঞ্চার করে। তাছাড়া আলজেরিয়াতে মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়ে। শ্রমিকদের সমস্যা এবং অর্থনৈতিক দাবি ইত্যাদি সমাধানের দিকে সরকারের নজর দেবার সময় ছিল না। শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের বহুবিধ সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সরকার উদাসীন। শিক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিক পদ্ধতি সংস্কার করে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচি চালুর প্রতিও সরকার তার কর্তব্যপালন করতে পারেনি। আধুনিক জগতের দ্রুত—পরিবর্তনশীল মুক্ত মানসিকতার পরিমণ্ডলে যৌন বিজ্ঞানের [Sexual Science] শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম চালু এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা ও 'ব্যারিকেড' বা 'স্যাগরিগেশান' প্রথার বিলোপ প্রভৃতি উদ্ভট বিষয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নীরবতাকেই শ্রেয় মনে করেছিল। ইউরোপের অন্যান্য ধনবাদী 'মুক্ত দুনিয়ার' দেশগুলির মত ফ্রান্সের শিক্ষা কর্তৃপক্ষও ছিল স্বৈরতন্ত্রী [Totalitarian]। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক জীবন-যাপনের সমস্যাগুলির প্রতিও তারা নজর দিতেন না।

ফ্রান্সের ছাত্র বিদ্রোহের উপাদানগত উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরেকটি বিষয় সম্পৃক্ত। ফ্রান্সের বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসে

ফ্রান্সের কমিউনিস্টরা ছিল উল্লেখযোগ্য শক্তি। ফ্রান্সের কমিউনিস্টরা আবার অনেক আগে থেকেই বহু দল ও উপদলে বিভক্ত। কিন্তু ১৯৫৬ সালের পরবর্তী সময়ের চীন-সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক মতাদর্শের বিরোধের প্রতিফলন ফ্রান্সের কমিউনিস্টদের উপরে তীব্রভাবেই পড়েছিল। কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত মতবিরোধের প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্সের বামপন্থা অনুগামী ছাত্র-যুবকদের স্পর্শ করে এবং তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সংগ্রামমুখীন এবং সংগ্রামবিমুখীন এই প্রশ্ন ছাত্র সমাজকে আলোড়িত করে। তাই ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিত অন্যান্য পশ্চিমী দেশের তুলনায় অবশ্যই স্বতন্ত্র-বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ।

ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহের ঘটনাবলী-ই এই স্বতন্ত্রতাকে যুক্তিসিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। কিন্তু, ঘটনাবলীর বিবরণে প্রবেশের পূর্বে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের প্রভাবিত গণফ্রন্টগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন[১০]

রাজনৈতিক দল :

১। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি। ইংরাজিতে সংক্ষেপে C P F বলা হয়। আবার P C F [Parti Communiste Francais] বলা হয়ে থাকে।

২। দ্যগলের নেতৃত্বে দুটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের নির্বাচনের সময় দ্যগলপন্থী রাজনৈতিক দলের নাম ছিল— U D R [Union Pourla defense de la Republique] এবং ১৯৬৮ সালের নির্বাচনের পূর্বেকার দ্যগলপন্থী রাজনৈতিক দলের নাম ছিল— U D C R [Union Democratique bour la Cinquieme Republique].

৩। IR-[Independent Republicans; ভ্যালেরী গ্রীচকার্ড-এর নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টারী গ্রুপ]।

তিনটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এস. ফ্রাঙ্ককুউস সিটারেগু-এর নেতৃত্বাধীন সোস্যালিস্ট এ্যালায়েন্স (F G D S)-এর তিনটি গোষ্ঠী যথাক্রমে— Guy Mollets-এর S F I O [Section Francaise de I' internationale Ouvriere]; পরিবর্তনবাদী the Radicals; বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লাব সংগঠনের সমন্বয় [The Convention des republicaines : a gathering of political clubs]।

৪। M. Jacques Duhamel-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি বামপন্থী গ্রুপ— P D M [Progress et Democratic Moderne]।

৫। সোস্যাল ডেমোক্রাটিকদের একটি দলত্যাগী চরমপন্থী গোষ্ঠী P S U [Parti Socialiste Unitie]।

চরমপন্থী রাজনৈতিক দল :

১। ট্রটস্কিপন্থী— PCI [Parti Communist Internationaliste : French branch of the Fourth International Trotskyist.]

২। ট্রটস্কিপন্থীদের অপর বিরোধীগোষ্ঠী— OCI [Organisation Communiste Internationaliste : rival Trotskyist faction, not affiliated to the Fourth International.]
৩। চীনপন্থী— PCMLF [Parti Commuiniste Marxiste– Leniniste de France].

রাজনৈতিক যুব সংগঠন :

১। ট্রটস্কিপন্থী Pierre Frank-এর অনুগামী JCR [Jeunesse Communiste Revelutionnaire]। ট্রটস্কিপন্থী pierre Lambert-এর অনুগামীদের FER [Federation des etudiants revolution naires (Used to be CLER comite deleaiseon des etudiants revolutionnaires)]।
১। চীনপন্থী UJC (M-L)– [Union des jeunesses communistes]।
১। দক্ষিণপন্থী সশস্ত্র যুবকদের সংগঠন— Occident।

ছাত্র এবং শিক্ষকদের ইউনিয়ন :

১। UNEF [Union National des Etudiants de France]। এই সংগঠনটি বামপন্থার অনুগামীদের দ্বারা পরিচালিত এবং ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখপাত্র ও সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করত।
২। FNEF [Federation National des Etudiants de France]। এটি দক্ষিণপন্থীদের rival organisaion।
৩। SNES up [Syndicat National de Penseignement Superieur] ছাত্র বিদ্রোহে একটি সক্রিয় সংগঠন। এই সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী অনুগামী শিক্ষকদের ইউনিয়ন।
৪। FEN [Federation de I' Education National। শিক্ষকদের প্রধান সংগঠন [Principal federation of Teacher's Unions)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সংগঠন :

১। CAL [Comite d'action Lyceen]। এই নামের সংগঠনটিতে স্কুলের চরম বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়েছিল। ছাত্রবিদ্রোহের সময় এই সংগঠনটিই অল্প বয়স্কদের [teenagers) নেতৃত্ব দেয়। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে গঠিত CLVs [comites tycees Vietnam]-এর শাখা সংগঠন হিসাবেই এই CAL-এর জন্ম।
২। MJC [Mouvement de la Jeunesse Communiste] সংগঠন।

(ট্রেড ইউনিয়ন) শ্রমিক সংগঠন :

১। CGT [confederation general du travail]। এই সংগঠন কমিউনিস্টদের পরিচালিত দেশের প্রধান ক্ষমতাশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন (communist lled; most powerful trade Union federation)। CEDT [confederation francaise et democratique du travail]। এটি ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন। ক্যাথলিক গির্জার সাথে এই সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

২। FO [Force ouvriere]। ফ্রান্সের তৃতীয় বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। কমিউনিস্টদের প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। CGT থেকে একাংশ বেরিয়ে এই সংগঠন তৈরি করে।
৩। CFC [Confederation francaise des cadres]। এটি হল মধ্যবিত্ত অফিসারদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন (White collar and junior executive federation)।

কৃষক সংগঠন [Peasant Organisations] :

১। FNSEA. [Federation nationale des syndicats d' exploitants agricoles.]
২। CNJA [Centre national des jeunes agriculteurs.]

একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়— ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণির একটি বিশেষ ঐতিহ্য (tradition) ছিল। এই ঐতিহ্যকে ইংরাজিতে বলা হয় 'anarcho– syndicalist tradition'। যার অর্থ নৈরাজ্যবাদী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকাঙ্খীদের ঐতিহ্য। এক সময় ফ্রান্সের শ্রমিকরা শিল্পের উৎপাদনের যাবতীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণের জন্য সংগ্রাম করেছিল। এই ক্ষমতালাভের লড়াইকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়। এ থেকেই anarcho-syndicalist কথাটি চালু হয়ে যায়। ফ্রান্সের ছাত্ররা ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণির 'anarcho-syndicalist tradition'-এর প্রভাবে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রধান কেন্দ্রস্থল :

ষাটের দশকের ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র ছিল সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় (Sorbonne University), টৌলিউস্ বিশ্ববিদ্যালয় (Toulouse University), নানটেরী বিশ্ববিদ্যালয় (Nanterre বিশ্ববিদ্যালয়), স্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (Strasbourg Univeristy)। তাছাড়া নানটেস (Nantes)-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র। এই কেন্দ্রস্থলগুলির মধ্যে 'সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়-ই ছিল প্রধান ঘাঁটি। সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক কর্মচারি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ৬,০০০ মানুষ বাস করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ হাজার মানুষকে গাদাগাদি অবস্থায় বাস করতে হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হলেও ফ্রান্সের প্রায় সব অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— একজন প্রভিন্স (Aixen-province), বোরাডিয়াক্স (Bordeaxx), কেন (Cean), কার্লমন্টফেরাণ্ড (Clermont-Ferrend), ডিজন (Dijon), গ্রেনোবল (Grenoble), মন্ট পেলিয়ার (Mont pellier), রোখেন (Rouen) প্রভৃতি।

নেতৃত্বে ছিল কোন সংগঠন?

ফ্রান্সের ষাটের দশকের যে ছাত্র আন্দোলন ছাত্রবিদ্রোহে পরিণত হল— তার নেতৃত্বে ছিল— ট্রট্স্কিপন্থী কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠনগুলি, চীনপন্থী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন, রক্ষণশীল কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন, কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট প্রভাবিত বামপন্থা [left-wing and radicals] অনুসারী ছাত্রদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গ্রুপ।

ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহের পরিচালনায় উপরে উল্লিখিত ছাত্র সংগঠনগুলি থাকলেও, এদের

মধ্যে পারস্পরিক কোন ঐক্য-সমঝোতা ছিল না। ছিল না কোন ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। অথচ, আন্দোলন বা বিদ্রোহের কারণ এবং ইস্যুগুলি ছিল একই প্রকৃতির। 'যুবকদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ছিল ঐক্য থেকে বহুদূরে'।[১১]

সম্ভবত ছাত্র সংগঠনগুলির উপর রাজনৈতিক প্রভাব বেশি ছিল এবং রাজনৈতিক দলগুলি ছিল পরস্পর বিরোধী অবস্থানে। সেজন্য ছাত্র সংগঠনের ঐক্যও ছিল সুদুর পরাহত।

ছাত্র সংগঠনগুলির চিন্তাভাবনা :

ফ্রান্সের শ্রমিক সংগঠনগুলির মতো ছাত্র সমাজ এবং ছাত্র সংগঠনের মানসিকতায়ও ছিল 'ক্ষমতা' (power)-র দাবি। ১৯৬৮ সালের মে মাসের শেষ দিকে প্যারিসের রাজপথে হাজার হাজার শ্রমিক এবং ছাত্রদের মিলিত মিছিলের দাবি ছিল— চাই শ্রমিকদের ক্ষমতা, কৃষকদের ক্ষমতা, ছাত্রদের ক্ষমতা [...demanding "workers' power, peasants power and students' power"]।[১২] পশ্চিম জার্মানির ছাত্রনেতা হার্বাট মারকোসের 'Marginal group' তত্ত্বের প্রভাবে ফ্রান্সের ছাত্রসমাজের এক বিরাট অংশ প্রভাবিত। 'Marginal group' হিসাবে ছাত্ররা বিপ্লব সংগঠিত করতে সক্ষম এবং রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন সাধনেও সক্ষম— এই চিন্তাভাবনা ফ্রান্সের সংগ্রামরত ছাত্রসমাজের একাংশের মানসিকতাকে আলোড়িত করে। ফ্রান্সের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের একাংশ নৈরাজ্যবাদী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ফ্রান্সের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করেছিল। তাই, তাঁদের মানসিকতায় ছাত্র আন্দোলন ছিল শুধুমাত্র বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবের সামিল। ছাত্রজীবনের এবং জনজীবনের বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং তা ধাপে ধাপে উন্নতি হয় বিপ্লবের চরম পর্যায়ে। ফ্রান্সের ছাত্র সংগঠনগুলি এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে এবং রাজনৈতিক স্তরে আলজেরিয়া. ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মতো ঘটনাগুলিকে ইস্যু করে।

আন্দোলনের ধরণ :

সাধারণভাবে মূল্যায়নে ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের ধরণ বা ফ্রম ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো প্রায় একই প্রকারের। কিন্তু চরিত্র ও গুণগত দিক থেকে এর পার্থক্য অনেক। ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক জঙ্গী, অনেক মিলিট্যান্ট, অংশগ্রহণকারীরা অনেক বেপরোয়া, আঘাতের পাল্টা আঘাতে সক্রিয়, আন্দোলনেব পর্যায়ে পর্যায়ে জনসংযোগ ব্যাপক, বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত এবং পরস্পরের সহযোগী। আরও এক বিশেষ পার্থক্য হল—চরম বামপন্থার অনুসারী ছাত্র সমাজের অংশ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিশ্বাসী।

প্রথমেই আন্দোলন শুরুর স্থান নির্বাচন হয়েছিল প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের (চৌহদ্দী) মধ্যে শত শত ছাত্র একসঙ্গে বসবাস করে। একসঙ্গে এত ছাত্রছাত্রীর বসবাস আন্দোলনে গতিবেগ সৃষ্টি ও আন্দোলন ছড়াতে সহায়ক।

আন্দোলন সংগঠকরা স্থান নির্বাচনের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করেছিল— প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সোভিয়েত', 'কমিউন' 'এ্যাকসান কমিটি' গঠনের। ১৭৮৯-৯০ সালের

ফরাসী বিপ্লব, ১৯১৭ সালের সোভিয়েতে অক্টোবর বিপ্লব, ১৯১৮ সালে জার্মানীর বৈপ্লবিক ঘটনা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, কিউবার বিপ্লব-এর অভিজ্ঞতা থেকে আন্দোলনের সংগঠিত রূপের জন্য 'সোভিয়েত', 'কমিউন', এবং 'এ্যাকসান কমিটি' গঠনের উপলব্ধি এসেছিল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য পাঠচক্র বা 'study group' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

ট্রট্স্কিপন্থী ছাত্ররা 'এ্যাকসান কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্তকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ট্রট্স্কির মতে— 'এ্যাকসান কমিটিগুলি সংগ্রামের হাতিয়ার' [The Action Committee is the instrument of struggle—Leon Trotsky]। ফ্রান্সের এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র এই মতকে সঠিক মনে করত। যার ফলস্বরূপ ১৯৬৮-র মে মাসের ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৪৫০-টি 'এ্যাকসান কমিটি' গঠন করা হয়। 'এ্যাকসান কমিটি'গুলি আন্দোলন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। 'সোভিয়েত' এবং 'কমিউন'-গুলির কাজ ছিল ভিন্ন পর্যায়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের হাত থেকে বিভিন্ন বিভাগ বা ফ্যাকাল্টি মুক্ত করে ছাত্ররা যখন এগুলির পরিচালনার দায়িত্ব নিত, তখন ঐ মুক্ত বিভাগ এবং ফ্যাকাল্টি পরিচালনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এই 'সোভিয়েত' বা 'কমিউন'গুলি।

আন্দোলনের সপক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল—প্রচারপত্র বিলি, গবেষণামুলক পুস্তিকা (tracts) প্রকাশ, রাস্তায় রাস্তায় পোস্টারিং এবং বিপ্লবী মুখপত্র (revolutionary journals) প্রকাশ, সভা-সমাবেশ-সংগঠন, বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চক্রের আয়োজন ইত্যাদি।

পরবর্তী ধাপ ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়েব অভ্যন্তরে ছাত্র এবং ছাত্রীদের হোস্টেলের মধ্যকার 'সেগ্রিগেশন' প্রথার অবলুপ্তি ঘটানো, কর্তৃপক্ষকে ব্যারিকেড বা ঘেরাও করে পাঠ্য-সূচি, পাঠ্যক্রম, নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি গঠন, ছাত্র ভর্তি সমস্যার সমাধান, হোস্টেল-আবাসন বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবি সমূহ আদায়-করা। দাবি আদায় সম্ভব না হলে ফ্যাকাল্টি গুলির দখল নেওয়া। সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি রাজনৈতিক ইস্যুতে রাজপথে রাজপথে বিরাট বিরাট 'লঙ্ মার্চ' সংগঠন ও পথ অবরোধ এবং প্রয়োজনে পুলিশী অবরোধ যে কোনভাবে লঙ্ঘন। প্রতীকি বা লাগাতার অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান। এইভাবে আন্দোলনকে 'বিদ্রোহ' বা 'বিপ্লব'-এর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং 'ক্ষমতার দখল' করা। ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহের এক উন্নত পর্যায়ে 'সরকারি রেডিও স্টেশান' দখলের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনের অভাবে এবং আপত্তিতে তা কার্যকরি হয়নি।

ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

ফ্রান্সে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন অর্থে ১৯৬৮ সালের ছাত্র আন্দোলনকে বুঝায়। ১৯৬৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পরিচয়-এর পূর্বে এই আন্দোলনের উৎসমুখের অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই উৎসমুখের সময়কাল ১৯৬০-৬১ সাল। ষাটের দশকের সূচনাপর্ব।

ফ্রান্সের ছাত্রসমাজের মুখপাত্র হিসাবে যে সংগঠন কাজ করতো, তা— UNEF, [Union national des etudiants de France (Left-wing controlled); acted as spokesmau and coordinator of student protest.]। এই সংগঠন ছাত্র-শিক্ষকদের

মিলিত সংগঠন বলা যায় এবং এর প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল Sorbonne University. Sorbonne University-তে বেশিরভাগ বাছাই করা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর [Elite-Marxists] সমাবেশ ঘটেছিল। এই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ছাত্রদের উপর ছিল। ১৯৬৫ সালে UNEF সংগঠনের প্রথম ভাঙন আসে। এই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিক দক্ষিণপন্থীদের সাথে সংখ্যালঘিষ্ঠ বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ক্যাথলিকদের প্রচণ্ড বিরোধ হয়। বিরোধের পরিণতিতে সংগঠন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি নামে পরিচিত হতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের বলা হতো 'Majo' এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বলা হত 'Mino'। ঐ ১৯৫৬ সালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'Majo'-রা সংখ্যালঘিষ্ঠ 'Mino' দের হাতে সংগঠনের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। 'Mino'-দের মধ্যে ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মার্কসবাদী।

' Mino'-দের মধ্যে বেশি সংখ্যক মার্কসবাদী থাকার ফলে মূল সংগঠন UNEF-কে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি (CPF) নিয়ন্ত্রণ করতো। ষাটের দশকের শুরুতেই ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে UNEF-এর জঙ্গী মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের (The students militants) বিরোধ দেখা দিল। জঙ্গী ছাত্ররা চাইছিলেন সংগঠনকে বেশি বেশি করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত করতে। কিন্তু বাধা আসে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত গতানুগতিকতা পন্থীদের (traditionalist) কাছ থেকে, এই বাধাদানকারীরাই ছিল সে সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে UNEF-এর সম্মেলনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠ বামপন্থীরা (left-wing 'Minos') সংগঠনের দায়িত্ব কেড়ে নিল। দায়িত্ব নিয়েই 'left-wing Mino'-রা Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of letters-এ তাঁদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় (Head-quarters) খুলে দেয়। ১৯৬৩ সাল থেকে এই Head quarters-ই ফ্রান্সের ১৯৬৮ সালের ছাত্রবিদ্রোহের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন কর্মী এবং নেতৃত্ব তৈরি করতে শুরু করে। এই বিপ্লবী সচেতন কর্মী ও নেতৃত্ব তৈরিতে অন্তরালে থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরা হলেন—Antoine Griset, Jean Louis peninou, Mare Kravetz। এঁদের সুকৌশলী নেতৃত্ব সংগঠনের অভ্যন্তরে 'Traditionalist'-দেরও পরাভূত করে।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ সাল। এই পাঁচ বৎসরের মাথায় নতুন আলোড়নকারী নেতৃত্বের আর্বিভাব। সকলের শীর্ষে ইতিহাসে যাঁর নাম খ্যাত হল, তিনি Daniel chon-Bendit। Daniel chon-Bendit তখন ২৩ বৎসর বয়স্ক একজন ছাত্র। Nanterre বিশ্ববিদ্যালয়ের Sociology বিভাগে ২য় বর্ষে পড়ত। ৬২ বৎসর বয়স্ক মার্কসবাদী দার্শনিক অধ্যাপক Henrilefebvre-এর মতে ছাত্র হিসাবে Daniel chon-Bendit ছিল অসাধারণ মেধাবী। Daniel chon-Bendit-এর চেহারা, চরিত্র, পোশাক-আশাক, চলাফেরা সবই ছিল সকলের কাছে আকর্ষণীয়। Nanterre ছড়িয়ে সারা ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্রান্স পুলিশ তাঁকে ফ্রান্স থেকে জার্মানীতে বহিষ্কারের চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। পশ্চিম জার্মানীর ছাত্র সংগঠন SDS-এর সভাপতি ২৫ বৎসর বয়স্ক Karl Deetrich wolff-এর প্রভাবও Daniel Chon-Bendit-কে উদ্বুদ্ধ করে। Nanterre-র ছাত্রসমাজ Daniel Chon-Bendit-এর নেতৃত্বে গ্রহণ করল— যা ছিল ফ্রান্সের ছাত্র বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য। Daniel Chon-Bendit-এর নেতৃত্ব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী (Unchallenged)।

বিদ্রোহের ঘটনাবলী :

১৯৬০-৬১ থেকে ফ্রান্সের ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে নিয়মতান্ত্রিক তথা গতানুগতিক ধারায় ছাত্র আন্দোলন চলছিল। ১৯৬৭ থেকে ছাত্রদের আন্দোলন নতুন দিকে মোড় নিতে শুরু করে। গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে ছাত্র আন্দোলন জঙ্গীরূপ (militant) গ্রহণ করে। ১৯৬৮-এর এই জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন-ই ফ্রান্সের ষাটের দশকের ছাত্র বিদ্রোহ রূপে চিহ্নিত। সংক্ষেপে তার কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হল—

১৯৬৮-১৪ই ফেব্রুয়ারি Nanterre-তে ছাত্র ইউনিয়ন 'UNEF'-এর নেতৃত্বে ছাত্ররা দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লঙ্ঘন করে ছাত্রী ব্লকে ঢুকে পড়ে। এইভাবে ঢুকে পড়ার পদ্ধতি ছিল ছাত্র এবং ছাত্রীদের ব্যারাক বন্ধ করে রাখার (seggregation) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি ছিল অবাধ মেলামেশার। এই ঘটনা ছাত্র-ছাত্রীদের একই মঞ্চে দাঁড় করাল। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপে ঘটনা ঘটতে থাকল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনঠাসা হয়ে পড়ল। ছাত্র-ছাত্রীরা অবাধ মেলামেশার দাবিতে এবং ব্যারাক বন্দি জীবনের অবসানের দাবিতে সোচ্চার।

১৮ই মার্চ সোমবার, সকাল হবার ২ ঘন্টা পরেই বামপন্থার অনুগামী একদল ছাত্র কমাণ্ডো [Student Commando] সীন নদীর [seine] দক্ষিণ তীরে [Right Bank] উপস্থিত হল। এই Right Bank প্যারিস শহরের অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু এবং কেতাদুরস্ত [fashionable] এলাকা। এখানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় বড় দপ্তর অবস্থিত। ছাত্র কমাণ্ডোরা ঐ সকালে এই এলাকায় উপস্থিত হয়েই chase Manhattan Bank, The Bank of America এবং Trans World Airlines-এর প্যারিস দপ্তরের জানালার কাঁচে ছোট ছোট বিস্ফোরক পদার্থ নিক্ষেপ করে। সারা অঞ্চল জুড়ে দেখা দেয় উত্তেজনা। ছাত্র কমাণ্ডোর এই বিস্ফোরক নিক্ষেপের ঘটনা ছিল আসলে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ। ফরাসী পুলিশ খুব দ্রুত ছাত্র কমাণ্ডোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দুজন যুবক এবং ৩ জন স্কুল ছাত্রকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২২শে মার্চ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Nanterre annes-এ ছাত্র-ছাত্রীরা এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয় এবং এরপর প্রতিদিন প্রতি রাত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন কৌশলে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। Nanterre-র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভ। ২২শে মার্চের আন্দোলনে এবং তার পরবর্ত্তী ঘটনায় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইতিমধ্যে চারদিকে গুজব, ছাত্রনেতা Cohn-Bendit-কে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। কারণ, Cohn-Bendit-এর পরিবার ছিল জার্মান উদ্বাস্তু। Cohn-Bendit-এর পিতা-মাতা ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছিল এবং Cohn-Bendit জন্মগ্রহণ করে ফ্রান্সের মাটিতে। কিন্তু ছোট বয়সে জার্মানীতে ফিরে গিয়ে এক জার্মান স্কুলে পড়াশুনা করে। ১৮ বৎসর বয়েসে সে জার্মান নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিল এবং এরপরেই Cohn Bendit ভিসা [a renewable visa] নিয়ে ফ্রান্সে চলে আসে। এই জটিলতার সুযোগ নিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ Cohn Bendit-কে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ষড়যন্ত্র বাস্তবরূপ নেবার আগেই বহিষ্কারের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। Nanterre, Sorbonne সহ বিভিন্ন প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ায় ছাত্র বিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরগুলিতে ভয়ঙ্কর উত্তাল রূপ নেয়। Cohn-Bendit-কে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। সাফল্য

অর্জন করে ২২শে মার্চ খ্যাত ছাত্র আন্দোলন। ফ্রান্সের প্রায় সব সংবাদপত্রে Cohn-Bendit পরিচালিত ছাত্র আন্দোলন ছিল প্রধান শিরোনাম [Head line]।

২রা এপ্রিল প্যারিস অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়স্থ আমেরিকান প্যাভিলিয়ানে 'segregation' বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়, ছাত্ররা আমেরিকান প্যাভিলিয়ান দখল করে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েও কোন সাহায্য পেল না। ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শেষ দুর্গটিরও পতন ঘটল।

ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের প্রতিবাদে ফ্রান্সের ছাত্র সমাজ ১৯৬৮ সালের মে মাস জুড়ে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন সামিল হয়। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ব্রুসেলস্ শহরে ইউরোপের একডজন কট্টরপন্থী যুব গোষ্ঠী মিলিত হয়ে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে ইউরোপের দেশে প্রচার আন্দোলন এবং জনমত সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে একটি ইউরোপীয় সম্পাদকমণ্ডলী এবং গভর্নিং বডি [European Secretariat and governing body] গঠন করা হয়েছিল। এই ইউরোপীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে জনমত সংগঠন এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তাই, ফ্রান্সে এই উদ্দেশ্যে 'CVN' [Comite' Vietnam National] নামে সংগঠনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে ১৯৬৮ সালের মে মাসে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনকে বলা হত 'প্যারিসের মে বিপ্লব' [Paris May Revolution]।

এই 'মে বিপ্লবকে' পরিচালনার জন্য ছাত্র শিক্ষক নেতৃবৃন্দদের নিয়ে একটি গোপন 'High command' গঠন করা হয়েছিল। এই High Command-এর সদস্য ছিল— Daniel Cohn Bendit এবং Alain Krivine (JCR); Marckravetz এবং Jean-Louis peeninon (MAU); Michel Recanati (CAL); Jean Pierre Vigier (CVN); Jecques Sauvageot (UNEF); Alain Geismar (SnEsup)।

ষাটের দশকের সূচনায় ফ্রান্সের ছাত্রসমাজ এক ঐতিহাসিক ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল। আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ফরাসী সরকার এক জঘন্য ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ চালিয়েছিল। ফরাসী সরকারের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে 'FUA' [Front Universitaire anti-fasciste] নামে ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন। ফরাসী সরকারও 'FUA'-র বিরুদ্ধে 'OAS' [Secret Army organisation] নামে এক ফ্যাসিবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। 'OAS' হিংস্র কার্যকলাপ চালাত 'FUA' এবং 'UNEF'-এর বিরুদ্ধে। ১৯৬২ সালের ১৯শে মার্চ 'Evain-Agreement' অনুসারে আলজেরিয়াতে যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু 'OAS'-এর ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ('directaction') শুরু করে এবং ১৯৬৮ সাল নাগাদ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে 'OAS'-কে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়।

২৯শে মার্চ Sorbonne University-তে ছাত্র বিদ্রোহের ঘটনার সূত্রপাত। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Richelien Amphitheatre-এ জঙ্গী ছাত্রদের নবগঠিত সংগঠন MAU [Mouvement d'action Universitaire]-এর নেতৃত্বে ছাত্রদের বিরাট বিক্ষোভ জমায়েত অনুষ্ঠিত হল। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই ধরনের

জমায়েতের অনুষ্ঠান Sorboune বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম। ছাত্ররা এই ঘটনাকে তাঁদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সবে শুরু বলে মনে করেছিল।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিকল্পনা মত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষকরে UJC (M-L), JCR প্রভৃতি ছাত্র সংগঠনে কমাণ্ডোদের নেতৃত্বে ছোটখাট গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে উভয়পক্ষে কিছু আহতের ঘটনা ঘটে। ২৩শে এপ্রিল Cohn-Bendit-কে Nanterre-র পুলিশ থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় এবং পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে।

প্রায় ৩০ বৎসর পরে Toulouse বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ১৯৬৮-র ২৫শে এপ্রিল প্রবেশ করে ছাত্রদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে। এই সময়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সপক্ষে St. Germain-des-pres-এ এক প্রদর্শনী চলছিল। CVN-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্ররা হেলমেট পড়ে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী তাঁবেদারের পক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীকে ভেঙেচুড়ে তচনচ করে দেয়। ডিন বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এই Faculty-টি বন্ধ করে দেয়।

২রা মে Nanterre-তে lecture theatre-তে ইতিহাসের একজন অধ্যাপক বক্তৃতা করছিলেন। এই সময় অতি উৎসাহী প্রায় ৩০০ ছাত্র Lecture Theatre দখল করে Che Guevara-র জীবন আলেখ্য-র উপর সংগৃহীত এক চলচিত্র দেখাতে শুরু করে দেয়। এই ক্ষেত্রেও ডিন Faculty বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন! ৬ই মে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পরিষদ Cohn-Bendit-কে সমন জারি করে ডেকে পাঠায়। এর ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একে একে Faculty গুলি বন্ধ করার কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আন্দোলন চলতে থাকে। ফরাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বিভাগীয় মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান প্রমুখদের নির্দেশ, আহ্বান, অনুরোধ-উপরোধ কোন কিছুতেই ছাত্র-ছাত্রীরা কর্ণপাত করে না। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একই অবস্থা। ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠন, দল-গোষ্ঠীর দখলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এই ক্ষেত্রে 'extremist', 'radical', নরম বা চরমপন্থী কোন ভেদাভেদ নেই। ১৯৬৮ সালের মে মাসের প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘন্টা, প্রতিটি রাত উদ্বেগে-উত্তেজনায়, সংঘর্ষ, আক্রমণে-প্রতি আক্রমণে কারাগারে নিক্ষেপ, বিচারের প্রহসনে পরিপূর্ণ। ১৯৬৮ সালের ৩রা মে প্যারিসে ভিয়েতনামে শান্তি আলোচনার তারিখ ঠিক হয়েছিল! এইদিন ছিল সোমবার। এই সোমবারে প্যারিস অঞ্চলের ১,৬০,০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কাছে UNEF আহ্বান জানাল ছাত্র বিক্ষোভের। SENSup ডাকলো শিক্ষক ধর্মঘট। চারদিকে মুখে মুখে একই কথা— 'এটা যুদ্ধ', 'আজ বিপ্লবের শুরু'।

সরকার নিরব থাকলো না। প্রেসিডেন্ট দ্যগলের নির্দেশে 'CRS' নামীয় পুলিশ বাহিনীকে দশটি সামরিক জেলায় [ten military districts] ছাত্র আন্দোলন দমনের জন্য নামান হল। এই 'CRS' বাহিনীর পুলিশ সংখ্যা ছিল ১৪,০০০। এর পরের পরিস্থিতি আরও জটিল। রাস্তায় রাস্তায় এই পুলিশ বাহিনীর সাথে ছাত্র-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এক কথায় 'Riot' শুরু হয়ে গেল। ৬ই মে গোটা প্যারিস যেন ছাত্রদের দখলে। কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ চিন্তিত। ঘটনার গতি ক্রমান্বয়েই ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু তখনও ইরানে শাহ-র সাথে আলোচনারত। প্রেসিডেন্ট দ্যগল নিরব। প্রতিটি মুহূর্ত এক-একটি Cross-road, সুকৌশলপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। ছাত্রনেতা Cohn-Bendit জনসমর্থনের দিকে লক্ষ্য রেখে সাবধানতার সাথে এগুতে ছাত্রদের নির্দেশ

দিলেন। ৮ই মে ফ্রান্সের জনমত যাচাই [Public opinion poll] করা হল। জনমত যাচাই-এর বিবরণ জানাল প্যারিসবাসীর ৪/৫ অংশ ছাত্রদের আন্দোলনের সপক্ষে।

জার্মানির ছাত্র সংগঠন SDS ফ্রান্সের ছাত্রআন্দোলনকে সংহতিমূলক সমর্থন জানায় এবং SDS এই সংহতি জানাবার জন্য তাঁদের একটি ছোট স্কোয়াডকে জার্মান-ফ্রান্স সীমান্ত পর্যন্ত পাঠিয়েছিল।

১১ই মে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ পঁাপিদু ইরান ও আফগানিস্তান সফর শেষে ফিরে আসেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের লাতিল কোয়ার্টারে গত রাতের ব্যারিকেডের পরিণতিতে গাড়িতে যে আগুন লাগান হয়েছিল, সে আগুন তখনও নেভেনি। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে আসার তিন ঘন্টা পরেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। এই ভাষণ থেকে অনুমান করা হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং বন্দি ছাত্রদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

১১ই মে শনিবারের পঁাপিদুর বেতার ভাষণে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয় ছিল না। বরং প্রধানমন্ত্রী ছাত্র এবং শ্রমিকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অনেক দেরিতে যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন তাও ব্যর্থ। উপরন্তু ঐ শনিবার দিনই ফ্রান্সের সবচাইতে ক্ষমতাশালী দু-টি শ্রমিক সংগঠন CGT এবং CFDT, শিক্ষক সংগঠন Fen-এর সাথে মিলিতভাবে দ্যগলের ক্ষমতালাভের দশম বার্ষিকীর দিন ১৩ই মে ধর্মঘট পালনের এবং বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হবার আহ্বান জানাল। এই আহ্বানে সাড়া দিলো বিভিন্নমতের ছাত্র সংগঠনগুলি। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন জনমত সম্পূর্ণরূপে সরকারের বিরুদ্ধে। শ্রমিক-শিক্ষক-ছাত্রদের মিলিত ধর্মঘট-বিক্ষোভ আসলে সরকারের বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। পঁাপিদু আরও বুঝেছিলেন, ছাত্রদের দাবিগুলি সম্পর্কে তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা যথেষ্ট নয়। ১৩ই মে-র বিক্ষোভ প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীনগরীকে কাঁপিয়ে তোলে। শ্রমিক শিক্ষক নেতারা যথাক্রমে Seguy, Engene Descamps, Geismar, Sauvagest, Cohn-Bendit হাতে হাত ধরে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ৮ লক্ষ মানুষের বিশাল লঙ মার্চ-এর পুরোভাগে ছিলেন। লঙ মার্চের বিশালত্ব এবং তার চাপে সরকার বিচলিত। প্রধানমন্ত্রী পঁাপিদু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ছাত্রবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হল। লতিন কোয়ার্টার থেকে পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হল, খুলে দেওয়া হল Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাগুলি। ছাত্ররা বিজয়ের আনন্দে ঐ দিনই মিছিল বার করল এবং অনুভব করল 'ছাত্র সোভিয়েত'-এর শক্তি ও ক্ষমতা। যদিও ১৩ই মে-র এই বিজয়লাভে সব কিছু শেষ হল না, ৩৪ দিন বাদে ১৬ই জুন পর্যন্ত আরও অনেক কিছু ঘটনা অপেক্ষামান হয়ে রইল।

জেনারাল দ্যগলের এক দশকের শাসনে ফ্রান্সের সব স্তরের মানুষ খুশি ছিলেন না। পশ্চিমী দেশগুলির ব্রিটেন, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী-র মতো ফ্রান্সের দ্যগলের শাসনব্যবস্থাও ছিল আমলাতন্ত্র নির্ভর। আমলাতন্ত্র নির্ভর শাসনে গণবিক্ষোভ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। এর-ই পরিণতি ১৩ই মে-র গণ বিক্ষোভ। ১৩ই মে-র পর দ্যগলের ধারণা হয়েছিল সবকিছু মিটে গেল। প্রধনমন্ত্রী জর্জ পঁাপিদু সব সামলে নেবেন। তাই দ্যগল নিশ্চিত মনে ১৪ই মে রোমানিয়া সফরে রওনা হলেন।

জেনারেল দ্যগলের এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। প্রথমে Sorbonue বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তী সময়ে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং তাঁদের

সংগঠনগুলি ১৩ই মে-র ঘটনা পর্যলোচনা করে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী বা 'extrimist', তাঁদের মূল্যায়নে 'মে বিপ্লবের' শিক্ষা হল— 'ক্ষমতা রাস্তায়, ক্ষমতা সংসদে নয়', ['Power in the street, not in Parliament.]।'[১৩] বিশেষ করে হাজার হাজার স্কুল ছাত্ররা এই শ্লোগান দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা '১৩ই মে-র বিপ্লব' মূল্যায়নে দ্বিধাবিভক্ত। 'সংস্কারবাদী' এবং 'বিপ্লবী'['reformists' and 'revolutionaries']—এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। সংস্কারবাদীরা চাইল সরকারের উপরে চাপ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আমূল সংস্কার সাধন। বিপ্লবী অংশের অভিমত— ব্যরিকেড ইত্যাদি ধরনের আন্দোলন চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমাজের সবস্তরে লালপতাকা, এমনকি দ্যগল পরিচালিত রাজত্বের শীর্ষেও লালপতাকা উড্ডীন করতে হবে। অর্থাৎ যার মূল কথা ক্ষমতা দখল করতে হবে। ট্রটস্কিপন্থী, মাও সেতুং চিন্তাধারাপন্থী, এবং চে গুয়েভারাপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই চিন্তার প্রভাব-ই ছিল বেশি। ফলে ১৩ই মে-র পর ছাত্র আন্দোলনে আবার নতুন মোড় নিল।

Sorbonne বিশ্ববিদালয়ের দখল ফিরে পাবার দুদিন বাদেই শতাধিক ছাত্রের একটি দল ১৫ই মে Odeon-এর 'Theater de Frence'-এর সামনে মিছিল করে যায় এবং এটি দখল করে নেয়। এই প্রথম ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এসে একটি প্রতিষ্ঠান দখল করল। গুজব ছড়াতে শুরু হল— সরকারি-বেসরকারি প্রচার মাধ্যম নিজেদের দখলে আনার জন্য ছাত্ররা এবার রেডিও স্টেশন দখল করবে। চারদিক সন্ত্রস্ত। এরই মধ্যে Sorbonne-এর ভেতরে এক যুবক ছুড়িকাহত হলে উত্তেজনা বাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ আবার আসে। ছাত্ররা ইতিমধ্যে লাল এবং কালো পতাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়িয়ে দেয়। পুলিশ এসে লাল এবং কালো পতাকা নামিয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ত্রিরাঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে। ছাত্রদের অনেকে আত্মগোপন করে তাঁদের পরিকল্পিত আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'CAL' গঠনের পরিপ্রেক্ষিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আন্দোলন, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ প্রথমে সরকার এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। টনক নড়ল ১৩ই মে-র 'বিপ্লব'-এরপর। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা 'Power in the street, not in the perliament' এই আওয়াজ তোলামাত্র সরকার এবং রাজনৈতিক দল সকলে বিচলিত। সবচাইতে বেশি বিচলিত দ্যগলপন্থীরা এবং কমিউনিস্টরা (অবশ্যই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী কমিউনিস্টরা)। 'CAL'-এর প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে দ্যগলপন্থীরা স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'National Union of French Lycees and colleges' নামে একটি পাল্টা সংগঠন গড়ল। কমিউনিস্টরা 'CAL'-এর জাতীয় সম্মেলন থেকেই নিজেদের ইচ্ছামত গঠন করল 'National Union of School Action Committees'। উভয়ক্ষেত্রে নতুন সংগঠনের লক্ষ্য 'CAL'-এর রাজনৈতিক প্রভাবকে 'অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড' এবং 'সংস্কারবাদ'-এর দ্বারা ঘিরে ধরা। কোন লক্ষ্য-ই পুরণ হলো না। বাস্তবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা 'CAL'-এর নেতৃত্বে ছাত্র বিদ্রোহের মূলধারার সাথে ১৩ই মে-র ঘটনার পর সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করল। বিশেষ করে ব্যর্থ হল দ্যগলপন্থীদের প্রচেষ্টা।

ছাত্র বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গে সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, লেখকরাও আপ্লুত। উপন্যাসিক Michel Butor এবং Nathaline Sarraute সহ প্রায় এক ডজন লেখক 'Literary

commando'-র নেতৃত্বে ২১শে মে প্যারিসের একটি সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান "Society of Men Letters"-এর প্রধান কার্যালয় দখল করে নিল। ঘোষণা করল— বর্তমান 'বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার' সাথে যাঁরা যুক্ত হতে ইচ্ছুক তাঁদের সকলের জন্য গঠন করা হচ্ছে 'লেখকদের ইউনিয়ন' [Union of writers]। এই ঘোষণার এক সপ্তাহ বাদে নতুন এই ইউনিয়নের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্যিক, অনুবাদক, ছাত্রদের এক উল্লেখযোগ্য সাধারণ সমাবেশ। এই সমাবেশের ৩ ঘন্টার বিতর্কমূলক আলোচনার বিষয়বস্তু—মার্কস, লেনিন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে লেখকদের মর্যাদা।

লেখকদের মত—আইনজীবী, স্থপতি, পরিসংখ্যানবিদ, সাংবাদিক, গ্রন্থাগারিক এবং ফুটবল খেলোয়াড় সকলেই যেন 'বিদ্রোহের' জ্বরে আক্রান্ত। ছাত্রবিদ্রোহের একই পথে সকলে হাঁটছে। এই উদ্বেলিত শতাধিক মানুষ ২২শে মে 'French Football Federation.' দখল করে রক্ত পতাকা উড়িয়ে দিল।

ফ্রান্সের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর এবং ক্রমান্বয়ে আরও তুঙ্গে। ২৪শে মে রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল টেলিভিশন কেন্দ্রে এলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে গণভোট [referandum] গ্রহণের প্রস্তাব করলেন। এই ভাষণের প্রাক্কালে TV-Studio-তে TV-journalist-দের উদ্যোগে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর তাৎক্ষণিক মতামত দেবার জন্য দ্যগলপন্থী এবং দ্যগল বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ এসে যথাস্থানে Studio-তে বসেও ছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ঐ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কোন মন্তব্য তখন করতে দেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণকারী TV সাংবাদিকরা এতে অপমান বোধ করেন এবং TV সাংবাদিকরা এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘটে সামিল হন। এতে উত্তেজনা চরমে ওঠে। জনসাধারণ রাষ্ট্রপতি দ্যগলের গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাবকে আদৌ আমল দিলেন না। ৩১শে মে প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করলেন। ধর্মঘটি TV-সাংবাদিকদের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়েও প্রধানমন্ত্রী সফল হলেন না। ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হলেও সরকারের দমননীতির চাপে TV সাংবাদিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও TV সাংবাদিকদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট বিদ্রোহী ছাত্রদের সর্বতোভাবে উৎসাহিত করে।

ছাত্র বিদ্রোহ তুঙ্গে। শ্রমিকশ্রেণি সংগ্রামের ময়দানে ছাত্রসমাজের সহযোগী। ছাত্রসমাজ শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামে মিত্রের ভূমিকায়। ১৩ই মের পরবর্তী দিনগুলিতে পরিস্থিতি যখন এই রকম, তখন প্রতিদিনের সংগ্রামী ঘটনাবলীর সমান্তরাল এমন কিছু ঘটনা ঘটছিল, যা ভবিষ্যতে ব্যর্থতার দ্যোতক। এই সমান্তরাল ঘটনাগুলির উল্লেখ প্রয়োজন।

১৩ই মে-র পর ১৪ই মে দাগল রোমানিয়া রওনা হবার সময় পরিস্থিতি অনুকূল হচ্ছে—এই ভাবনা নিয়ে সফরে বেরিয়েছিলেন। এই ভাবনা কল্পিত। বাস্তবের সাথে সঙ্গতিহীন। দাগলের রোমানিয়ায় অবস্থিতির সময় থেকেই ফ্রান্স তার ইতিহাসের দীর্ঘতম শ্রমিক ধর্মঘটের ('great strike') কবলে পড়ল।

রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে দ্যগলের পৌঁছার কয়েক ঘন্টার মধ্যে Nanterre-এ অবস্থিত একটি ছোট aircraft plant-এর দখল নিল শ্রমিকরা এবং প্ল্যান্টের ম্যানেজারকে তাঁর অফিসে বন্দি করে রাখল। ঐ ১৪ই মে আরেকটি ঘটনা। শিল্পাঞ্চল Rouen-এর নিকটস্থ cleon-এ অবস্থিত Renualt plant manufacturing gear-boxes কারখানার ওয়ার্কশপ-

গুলির শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয় (tool-down strike)। এদিন ছিল মঙ্গলবার। বুধবার ১৫ই মে রাতের শিফ্‌টে প্রায় ২০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদানের চেষ্টা করলে দেখতে পায়, তারা নিজেরা কারখানার মধ্যে আটক হয়ে পড়েছে এবং পরের দিন ১৬ই মে বৃহস্পতিবার সকালের শিফ্‌ট শুরু হতেই দেখে কারখানার দরজা বন্ধ, ম্যানেজার বন্দি, কারখানা শ্রমিকদের দখলে, কারখানায় রক্তপতাকা উড়ছে। প্যারিসের পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলিতে কারখানা দখলের স্বতস্ফূর্ত ঘটনা ঘটে চলেছে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন CGT এবং স্যোসাল ডেমোক্রাটদের প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন CFDT-র কেন্দ্রীয় দপ্তরে দখলের খবর জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার দাবি করে টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে। কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নে CGT-র নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করলেন। CGT তাদের hard-core-commando বাহিনীকে শ্রমিকদের এই স্বতস্ফূর্ত কার্যক্রমে সাহায্যের জন্য পাঠায়। এইরূপ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল সরকার পরিচালিত car-industry-এর Billan court কারখানায়। এই কারখানায় ২৫ হাজার শ্রমিকদের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ CGT-র অনুগামী। বুধবার অর্থাৎ ১৫ই মে রাতে এই কারখানার প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক রাত জেগে কারখানা দখলের কাজে অবস্থান শুরু করে। শ্রমিকদের স্ত্রী-পরিজন শ্রমিকদের সাহায্য করতে খাদ্য ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে আসে। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ফ্রান্সের সর্বত্র এই শ্রমিক সংগ্রামের কাহিনি ছড়িয়ে পড়ছে। পরপর শ্রমিক-ধর্মঘট এবং কারখানার দখলের ঘটনায় সারা ফ্রান্সের শিল্প-কারখানা অচল হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল এবং শ্রমিকদের কারখানা দখলের ঘটনায় CGT এবং CFDT-এর মতপার্থক্য দেখা দেয়। এই মতপার্থক্য আসলে কমিউনিস্ট এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটদের দৃষ্টিভঙ্গীর মতপার্থক্য। দুই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ফ্রান্সের উদ্ভুত পরিস্থিতিকে দু'ভাবে বিশ্লেষণ করল এবং নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়নের মারফৎ তার প্রকাশ ঘটাল। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন CGT শ্রমিকদের কারখানা দখলে এবং ধর্মঘটে সামিল থাকা সত্ত্বেও, এই CGT-র মতে এই উদ্ভুত সংকট বামহঠকারীদের কার্যকলাপের পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়।[১৪] সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠকদের মতে ছাত্রদেব পক্ষে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি অসহনীয়, একটি সমাজ প্রকৃত গণতন্ত্র ব্যতিরেকে একটি ব্যারাক।[১৫] এই দুই মত থেকে পরিস্কার, ফ্রান্সের কমিউনিস্টদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল এবং কারখানা দখলের ঘটনাকে প্রকাশ্যে সমর্থন না করার দিকে ঝুঁকেছে এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সরাসরি সমর্থন না জানিয়ে পরোক্ষ সমর্থন করছে।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতেও এবার পার্থক্য লক্ষণীয়। ১৩ই মে বিশাল লঙ-মার্চ-এর পর প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু সরকারের তরফে ছাত্রদের অনেক দাবি মেনে নিয়েছিলেন। পরে দ্যগল সরকার মনে করল, এতে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই ১৪ই মে থেকে ১৬ই মে পর্যন্ত ফ্রান্সের শিল্প-কলকারখানা অচলের ঘটনায় এবং আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের ঘটনায় সরকার এইবার কঠোর ও দৃঢ় হতে চাইল।

ফরাসী সরকার কঠোর ও দৃঢ় হতে চাইলেও প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরা উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে ছাত্রদের দ্বারা Odeo'n Theater দখলের ঘটনায় সরকার বিশেষ বিচলিত, বিচলিত রেডিও স্টেশন দখলের পরিকল্পনার কথা শুনে। সরকারের ধারণা, ছাত্ররা আরও অনেক প্রতিষ্ঠান দখলের দিকে এগুবে। প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু ফ্রান্সের সমগ্র পরিস্থিতি

জেনারেল দ্যগলকে জানাচ্ছেন এবং বুখারেস্টে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মনে করে এক 'যুদ্ধ পরিষদ' [a council of war]-এর সাথে পরামর্শে বসলেন ১৬ই মে। ঠিক হল ১৬ই মে রাতে প্রধানমন্ত্রী আবার বেতার ভাষণ দেবেন। বেতার ভাষণের বিষয়বস্তু হবে ছাত্র এবং শ্রমিকদের মধ্যে ফাটল ধরান, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে দেশবাসীর মনে ঘৃণার উদ্রেগ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের দৃঢ় ও কঠোর মনোভাব প্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে এক চাতুর্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের এক ঘন্টা পূর্বে ঐ দিন ১৬ই মে সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটে টেলিভিশনের পর্দায় ছাত্র-যুব নেতা Deniel Cohn Bendit, Jacques Sauvageot, Alain Geismar-কে বলার জন্য উপস্থিত করা হল। উদ্দেশ্য ছিল ৩ জন অভিজ্ঞ ঝানু সাংবাদিককে দিয়ে ঐ তিনজন ছাত্র-যুব নেতাকে চোখা চোখা প্রশ্নে জর্জরিত করে দেশবাসীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি। কিন্তু, বাস্তবে যা ঘটল তা বিপরীত। ঐ তিন ছাত্র-যুব নেতা তাঁদের যুক্তিজালে ঐ তিন ঝানু সাংবাদিকের সব প্রশ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, বরং সাংবাদিকদের বিহুল করলেন। এর-ই এক ঘন্টা পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছিল অত্যন্ত একজন বিষণ্ণ মানুষের ভাষণ। তিনি নাগরিকদের বুঝাতে চাইলেন—দেশের নাগরিকরা নৈরাজ্য প্রত্যাখ্যান করবে কিনা, তা নাগরিকরা ঠিক করুন। ভাষণ দিয়েই প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে জেনারেল দ্যগলকে সব অবহিত করলেন। দ্যগল ঠিক করলেন, তিনি তাঁর সফর সংক্ষেপ করে দেশে ফিরে আসবেন। ১৮ই মে দ্যগল ফ্রান্সে ফিরে এলেন। ফিরে এসেই ফ্রান্সের সৈন্য-আরক্ষীবাহিনী [gendarmerie]-কে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন।

ফরাসী সরকারের পক্ষে হঠাৎ পরিস্থিতি মোড় নিল। বৃহস্পতিবার ১৬ই মে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এক বিবৃতিতে রেডিও স্টেশনে অভিযানের পরিকল্পনাকে নিন্দা করে বলল, এই কাজ প্ররোচনামূলক।[১৬] কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রদত্ত বিবৃতিতে গভর্নমেন্ট সুবিধাজনক অবস্থানের সন্ধান পেল। কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতিতে ছাত্ররা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে রেডিও-স্টেশন অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে। রেডিও স্টেশন অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করেই ঐ রাতেই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করে সীন নদীর তীরবর্ত্তী Boulogone-Billan court শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগ্রামে সংহতি জানাতে যায়। ছাত্রদের এই বিশাল অভিযানের সামনের ব্যানারে লেখা ছিল—"আমাদের রোগা-ভঙ্গুর হাত থেকে সংগ্রামের এই পতাকাটি শ্রমিকদের হাতে তুলে দেব" [This Flag of struggle will pass to the workers from our fragile hands]।[১৭]

ছাত্রসমাজ কর্ণপাত করল না কারো নির্দেশ, অনুরোধ, উপরোধে। শ্রমিকরাও তাই। সংগ্রাম অব্যাহত। ধর্মঘট, দখল অভিযান চলছে। এক পরিসংখ্যান মতে-১৪ই মে ধর্মঘটিদের সংখ্যা ছিল ২০০ জন, ১৯শে মে তা দাঁড়ালো ২০ লক্ষে, ২২শে মে সংখ্যা সংখ্যা ৯০ লক্ষের উপরে। ১৬ই জুন পর্যন্ত তা ক্রমবর্ধমান। প্রকৃতপক্ষে শিল্পাঞ্চলের বড় বড় কলকারখানাগুলি পরিণত হয়েছিল সংগ্রামের দুর্গে। আর Sorbonne University পরিণত হয়েছিল ছাত্রদের কেন্দ্রীয় দুর্গে ["For just over a month, from 13 May to 16 June 1968, the Sorbonne was the Central fortress of the Student Soviet]।[১৮]

Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ছাত্ররা এই slogan-টি লিখে রেখেছিল :

"We will claim nothing.
We will ask for nothing.
We will take.
We will occupy."[১৯]

[মর্মার্থ— আমরা কিছু চাইব না, আমরা কিছু বলবো না, আমরা নেব, আমরা দখল করব।]

১৯৬৮ সালের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট দ্যগল জাতির উদ্দেশ্যে আবার বেতার ভাষণ দিলেন। ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাবলিক-কে রক্ষার আবেদন প্রেসিডেন্টের ভাষণে। তিনি আবার জনগণের আস্থা যাচাইয়ের জন্য ১৬ই জুন গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। প্রধানমন্ত্রী পঁপিদুর মতে : দ্যগলের 'গণভোট''-এর প্রস্তাব অবান্তর, এটা দ্যগলের 'Bonapartism'-এর পরিচায়ক।

দ্যগলের এই বেতার ভাষণ ও জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে পাড়ল না। পরন্তু চারদিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলল, শুরু হল পুলিশের সাথে সংঘর্ষ।

দেশব্যাপী এবার এক প্রশ্ন—'দ্যগলের রাজত্ব টিকবে কি? পরিস্থিতি অনুসারে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল ব্যক্তি সকলের ভাবনা—দ্যগলের বিকল্প এই মুহূর্তে সরকারীভাবে 'বামপন্থী' বিরোধীরা। অর্থাৎ কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্টদের যে কোন ধরনের মঞ্চ বা combination। কিন্তু সেই মুহূর্তে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের ভূমিকা কি ছিল?

কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্টদের ভূমিকা :

ছাত্র বিদ্রোহ, শ্রমিক বিদ্রোহের প্রচণ্ড চাপে দ্যগলের শাসন পতনের মুখে। জনসাধারণের মনেও এই ধরনের ভাবনা চিন্তা চলছে। কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্ট মিলিতভাবে দ্যগলের বিকল্প হতে পারে—জনগনের মনে এই ভাবনাও বদ্ধমূল।

কিন্তু কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা আদৌ বিকল্প কিনা— তার বাস্তবতা অনুসন্ধানে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। দ্যগলের চতুথ রিপাবলিকের সময়েও সোস্যালিস্ট নেতা Francois Mıtterrand এবং কমিউনিস্ট নেতা Waldeck Rochet দ্যগলকে পরাজিত করার লক্ষ্যে জোট বেধে ছিল। ১৯৬৫-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল বামপন্থীদের প্রার্থীরূপে Francois Mitterand জেনারেল দ্যগলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। খুব জোড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর দ্যগল ২য় পর্বের (Second round) ভোট গণনায় জয়লাভ করেন। দ্যগল পেয়েছিলেন শতকরা ৫৪ ৫ ভাগ ভোট এবং Mitterand পেয়েছিলেন শতকরা ৪৫·৪ ভাগ ভোট। ১৯৬৮ সালে দ্যগলের পতনের মুখে কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্টদের এই ১৯৬৫ সালের অভিজ্ঞতা ছিল।

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ অনুসারে ফ্রান্সে প্রকৃতপক্ষে তখনও 'বিপ্লবী পরিস্থিতি'-র উদ্ভব হয়নি, দ্যগল তাঁর সিংহাসনে বহাল তবিয়তে রয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি এই বিশ্লেষণের দ্বারা বোঝাতে চাইল—দ্যগলকে অপসারিত করতে হলে নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি দ্যগল এবং প্রধানমন্ত্রী পঁপিদুর মতান্তরের সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্ট-সোস্যালিস্টরা মিলিতভাবে সংখ্যাধিক্যের বলে প্রধানমন্ত্রী পঁপিদুর সরকারের বিকল্প সরকার গঠনের উদ্যোগ সক্রিয় হল। কমিউনিস্ট পার্টি Mitterrand-এর উপর চাপ দিল একটি সর্বসম্মত কর্মসূচিতে [Common programme] স্বাক্ষর করার জন্য এবং যদি

বামপন্থীদের দ্বারা বিকল্প সরকার গঠিত হয়, তাহলে সে সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তাদানের জন্য। Mitterrand এবং তাঁর নেতৃত্বধীন 'সোস্যালিস্ট ফেডারেশন' কমিউনিস্টদের প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। সোস্যালিস্টরা দাবি করল সরকারের পদত্যাগ এবং সাধারণ নির্বাচনের। বামপন্থী দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্র-শ্রমিক বিদ্রোহের উত্তুঙ্গ পর্যায়ে সৃষ্টি করল নতুন পরিস্থিতি।

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আরও কঠিন, আরও দৃঢ়। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করল—পার্টিকে দুটি ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে হবে। একটি ফ্রন্ট দ্যগলের রাজত্বের বিরুদ্ধে এবং আরেকটি ফ্রন্ট রাজনৈতিক গেরিলা—ট্রট্স্কিপন্থী, মাওবাদী, গুয়েভারাপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট পার্টি শুরু করে দিল দল থেকে চীনপন্থীদের বিতাড়ন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির এই কার্যকলাপ বহুলাংশেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সোভিয়েত অনুগামী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতো। ফ্রান্সের এই কমিউনিস্ট পার্টির আরেক ধরনের আশঙ্কা ছিল, যদি চরমপন্থী যুব-শ্রমিকরা এইভাবে কারখানা 'দখল অভিযান' চালিয়ে যায়, তাহলে শ্রমিক-মালিক বা মালিক পক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়নের পারস্পরিক চুক্তিগুলি বাতিল হয়ে যাবে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। কমিউনিস্ট পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণতিতে ফ্রান্সের বহুধরণের পরস্পর বিরোধী কমিউনিস্ট দল ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনৈক্য তীব্র হতে থাকে।

সোস্যালিস্টরাও নিজেদের মধ্যে প্রায় কমিউনিস্টদের মতো একই ধরণের বিতর্কে এবং আশঙ্কায় জড়িয়ে পড়েছিল।

শেষ অঙ্ক

১৯৬৮ সালের ২৯শে মে এক নাটকের সূচনা। ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট দ্যগলের বেতার ভাষণের আগের দিন। পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। এই বৈঠক ছিল রুটিন-মাফিক বৈঠক। প্রতি বুধবারে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসতো। ২৯শে মে ছিল বুধবার। কিন্তু দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী সহ কোন মন্ত্রীই ক্যাবিনেট বৈঠকে এল না। অনেকে আবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের স্থান Elysee-র দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে গেল। প্রেসিডেন্ট দ্যগল স্বচোখে এই পরিস্থিতি দেখে প্যারিস ত্যাগের সিদ্ধান্ত করলেন। বেলা ১১টায় দ্যগল তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে একটি গাড়িতে রাজপ্রসাদ ছেড়ে তাঁর গ্রামের বাড়ি Colomby-les-deux-eglises-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। (প্রকৃতপক্ষে দ্যগল কিভাবে কোথায় যাচ্ছিলেন, তা নিয়ে পরে অনেক গল্প কাহিনীর রটনা হয়েছিল)। এই খবর রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ামাত্র সকলের ধারণা আরও বদ্ধমূল হল যে সরকারের পতন আসন্ন।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দ্যগল দেশত্যাগ করে বা দেশের বিমানঘাঁটি ছেড়ে কোথাও পলায়ন করেননি। তিনি বরং গোপনে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এই গোপন সামরিক বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা অগোচর থেকে যায়, তা আর কখনো জানা যায়নি।

দ্যগল একজন সামরিক ব্যক্তি। দেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের সাথে আলোচনা করে সৈন্যবাহিনীর মন-মেজাজ বুঝে নিলেন। দ্যগলের ধারণা ছিল, সাংসদদের চেয়ে ট্যাঙ্ক অনেক

বেশি কার্যকরী কথা বলতে পারে "As a soldier-stateman, he never forgot that tanks can speak a language more persuasive than parliamentarians।"[২০]

দ্যগলের এই পরিস্থিতি দেখে সোস্যালিস্টরা ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনায় সক্রিয়। Mendes-France এবং Mitterrand যৌথভাবে ক্ষমতা নিতে সোস্যালিস্টরা প্রস্তুত বলে ঘোষণা করলেন ২৯শে সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়। অপরদিকে দ্যগল তাঁর গ্রামের বাড়ি কোলোম্‌বে-তে ফিরে ২৯শে মে রাতে আগামী দিন ৩০শে মে-র প্রদত্ত বেতার ভাষণের খসড়া রচনা করলেন। তিনি বেতার ভাষণে কি বলবেন তা তিনি কাউকে জানালেন না। প্রধানমন্ত্রী পঁপিদুও অন্ধকারে। সে মুহূর্তে তাঁর নিজের কাছে প্রশ্ন ছিল প্রেসিডেন্ট কি গণভোট-এর পরিবর্তে সাধারণ নির্বাচনের কথা বলবেন?

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দ্যগল ৩০শে সকালে রাজধানী প্যারিসে ফিরে এলেন। ঐ দিন ৪-৩১ মিনিটে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে দ্যগল ঘোষণা করলেন : বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি পদত্যাগ করব না। আমি জনগণের রায় নেব। আমি তা পরিপূর্ণ করব। তাছাড়া দ্যগল আরো বললেন— তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে বদল করবেন না, কিন্তু মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করা হবে। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হবে এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবিত গণভোট (referendum) স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে। দেশবাসিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানালেন— দেশে কমিউনিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।[২১]

দ্যগলের এই ঘোষণার পর প্যারিস নগরীর চারদিকে সৈন্যবাহিনী টহল দিতে শুরু করে। প্যারা-মিলিটারী স্কোয়াডগুলি দেশের সবত্র নেমে পড়ে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন অফিস এবং কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরের নিকটবর্তী অঞ্চলে গুলিগোলার ফাঁকা আওয়াজ চলতে থাকে। ৩১শে মে Rouen-এ অবস্থিত কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিসে সশস্ত্র পুলিশ ঢুকে পুনর্দখল নেয় এবং অবস্থানকারী শ্রমিক কর্মচারীদের হটিয়ে দেয় এবং এটাই ছিল সরকারি তরফে বলপ্রয়োগ করে ধর্মঘট ভাঙার প্রথম ঘটনা। ৩১শে থেকে সরকার খুবই কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছিল। ছাত্র-শ্রমিক সহ্‌ অনেককে গ্রেপ্তার করে বন্দি করা হয়েছিল।

১৬ই জুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪দিন আগে ১২ই জুন সরকার এক ঘোষণা বলে সাধারণ নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবরকম বিক্ষোভ সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। সরকারের তালিকা অনুসারে সারা দেশে এক ডজন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে [extremist organisations] বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। এই বে-আইনী ঘোষিত সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল JCR, FER, PCI, OCI, UJc(M-L), PcMLF প্রভৃতি। ছাত্রবিদ্রোহ এবং শ্রমিক বিদ্রোহের তরঙ্গশীর্ষে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার প্রাক্কালে দ্যগল ব্যাপক দমননীতি ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করে এবং বিদ্রোহী ছাত্রদের সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে নিজের অনুকূলে নির্বাচনী ফলাফলের জন্য নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার সবরকম ব্যবস্থাই করেছিলেন।

এই সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ২,৮৪,০০,০০০ জন। ৪৭৮টি আসনে প্রার্থী ছিল ২,২৬৭ জন। ২৩শে জুনের প্রথম রাউণ্ডে এবং ৩০শে জুনের প্রথম রাউণ্ডে ভোট গণনায় দ্যগলেব দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বামপন্থীরা শুধু পরাজিত নয়, উৎখাত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্যগলের দল UDR ২৯৫টি আসনে (আগের পার্লামেন্ট নির্বাচনে পেয়েছিল ১৯৭টি) জয়লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রয়োজনীয় আসনের

চেয়েও ৫১টি আসন দ্যগল পন্থীরা বেশি পেল। কমিউনিস্ট পার্টি পেল ৩৪টি (গত পার্লামেন্টে ছিল ৭৩টি) আসন। বামপন্থীদের চরম বিপর্যয়।

২৯শে মে পর্যন্ত দ্যগলের পতন অনিবার্য ছিল। সে ক্ষেত্রে দ্যগলের এই নির্বাচনী সাফল্য বিস্ময়কর। দ্যগলের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের ঐ ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তা নিম্নরূপ :

সোস্যালিস্ট নেতা Fpancos Mitterrand বলেন : এই ফলাফল হল রাজনৈতিক ও মানসিক ছলনার ফল।

কমিউনিস্ট নেতা Waldeck Rochet বলেন : এই ফল ফ্যাসিবাদের দিকে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কমিউনিস্ট পার্টির ২ নম্বর নেতা Waldeck Rochet বল্লেন : এটার সবটাই Cohn Bendit-এর ত্রুটির ফল ['It's all cohn-Bendit's fault.][২২]

ইউরোপের ইতিহাসখ্যাত ষাটের দশকের ফ্রান্সের ছাত্র বিদ্রোহ কেন তার লক্ষ্যের চরম সাফল্য অর্জন করতে পারলো না, সে সম্পর্কে অনেক লেখক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক পণ্ডিত মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি করেছেন। তার মধ্যে প্রধান কারণগুলি এইরূপ :

রাজনৈতিক সংকট থেকে এই বিদ্রোহের উদ্ভব হয়নি; এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা কল্পনাপ্রসূত ভাবপ্রবণতা কেন্দ্রিক; বিদ্রোহ বুদ্ধিজীবীদের বাক্-সর্বস্বতায় পূর্ণ; বিদ্রোহী ছাত্রদের শৃঙ্খলার বন্ধন শিথিল ছিল; ছাত্র আন্দোলন বা বিদ্রোহের প্রধান শক্তি কমিউনিস্টরা কোন স্তরেই ছিল না ঐক্যবদ্ধ।[২৩]

১৯৬৮ সালের জুন মাসে দ্যগল সাধারণ-নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় পুনর্নির্বাচিত হবার পর ফ্রান্সের ষাটের দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলন বা বিদ্রোহ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সমাপ্তি ঘটল পশ্চিমীদেশের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের।

ইংল্যাণ্ড

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজত্বের নাম ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য [U.K. বা United Kingdom]। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী ইংল্যাণ্ড আবার পশ্চিমীদেশের ঐতিহাসিক শিক্ষাকেন্দ্র বা শিক্ষার রাজধানী [Educational Capital of the West]। পৃথিবীর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাগ্রহণের আকর্ষণীয় কেন্দ্র ইংল্যাণ্ড। এই ইংল্যাণ্ডে ছাত্র আন্দোলনের একটি নিজস্বতা আছে। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেসব দেশের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে, ছাত্র সংগঠন গড়তে ইংল্যাণ্ডের ছাত্র সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। তাই, ইংল্যাণ্ড-কে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনের একটি ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় ছিল। এই ধারাবাহিকতা বামপন্থীকেন্দ্রিক।

ইংল্যাণ্ডের ছাত্র আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমী দুনিয়াব অন্যতম একটি প্রধান উন্নত দেশ হিসাবে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের দোলা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য তথা ইংল্যাণ্ডেও লেগেছিল। সুয়েজখাল সংকট এবং আণবিক অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ ইস্যুতে ইংল্যাণ্ডের ছাত্র আন্দোলন আরও বেশি করে বামপন্থার দিকে ঝোঁকে।

১৯৬৭ সালে 'লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স'—এ একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইংল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বামপন্থা অনুসারী ছাত্রদের, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের বিদেশি ছাত্রদের ভীড় সব সবয়ে 'লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স'-এ লেগে থাকত। হঠাৎ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রোডেশিয়ার 'University College'-এর অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াল্টার এ্যাডামস-কে 'লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স'-এর নতুন ডাইরেক্টর নির্বাচন করল। ডক্টর ওয়াল্টার এ্যাডামস্ ছিলেন রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী শাসকদের সংযোগরক্ষাকারী। ডক্টর ওয়ল্টার এ্যাডামস-এর নিয়োগের প্রতিবাদে 'লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স'-এর ছাত্ররা প্রচণ্ড বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ শতাধিক ছাত্র অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতাবাদ তথা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধেই ছিল ছাত্রদের এই জেহাদ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ইংল্যাণ্ডের ছাত্ররা ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এক সুশৃঙ্খল বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলন সংগঠনের প্রধান ভূমিকায় ছিল ইংল্যাণ্ডের তখনকার প্রখ্যাত ছাত্রনেতা তারিক আলির নেতৃত্বাধীন Vietnam Solidarity Committee বা সংক্ষেপে VSC। এই VSC-র শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল। অনেক সক্রিয় ছাত্রকর্মী এই VSC-র সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস ধরে প্রায়দিনই ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ইংল্যাণ্ডে এবং অন্যান্য শহরে VSC-র নেতৃত্বে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে Governor Square-এ অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সামনে এক বিরাট বিক্ষোভ জমায়েতে VSC-র নেতৃত্বে সামিল হয়েছিল অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। এই জমায়েতে কিছু সংখ্যক হতাশাগ্রস্থ নৈরাজ্যবাদী ছাত্র প্ররোচনা দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন [BBC] ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রচার মাধ্যম। ইংল্যাণ্ডে পশ্চিমী দুনিয়ার ছাত্রবিদ্রোহের বসন্তকালীন বাতাসের ঝড় তোলার লক্ষ্যে BBC এক 'television net work'-এর আয়োজন করল। টেলিভিসন কার্যক্রমে জার্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, রোম প্রভৃতি দেশের ছাত্রনেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করে আনাল BBC। ইংরেজ ছাত্ররা এই কার্যক্রম দেখল। ছাত্র নেতাদের বক্তব্য শুনল, উপভোগ করল। ইংল্যাণ্ডের ছাত্রনেতা তারিক আলি, ফ্রান্সের ছাত্রনেতা Cohn-Bendit-কে প্রশ্ন করল— "উত্তম, ডানি, আমরা এই পরিস্থিতিতে কিভাবে বিপ্লব শুরু করব?" ইংরেজ সহিষ্ণুতার উপর ঈষদুষ্ণ চা-ছিটিয়ে বিদ্রোহের আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া হল। BBC-র পরিকল্পনা এভাবে মিইয়ে গেল। ১৯৬৮ সালের ছাত্রবিদ্রোহর বসন্তের বাতাস ইংল্যাণ্ডে তুলতে পারলো না।

ইংল্যাণ্ডে অন্যদেশগুলির মতো ছাত্র বিদ্রোহ না ঘটার অনেক তাৎপর্যবাহী আছে। ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থা বহুকাল থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এবং কিছু ক্ষেত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হল খুবই সম্ভ্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান [Elite Institution]। এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত স্তরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সমস্যাগুলি সাধারণত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা হয়। তাই শিক্ষা জগতের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে খুব বড় ধরণের ছাত্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠেনি। ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের যেটুকু বাতাস ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছিল, তা সীমাবদ্ধ থাকল অনেকটা মানবিক

কারণের মধ্যে। যেমন— ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে মিছিল সমাবেশ, ভিয়েতনামের জীবাণু-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়।

ইংল্যাণ্ডে ছাত্রভর্তি সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২য় মহাযুদ্ধের পূর্বে সারাদেশে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭০,০০০ জন, ২য় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৬২ পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়াল ২,১৬,০০০ জন। ১৯৬৫ সালে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়ে হল ৩,০০,০০০ জন। ক্রমবর্ধমান এই ছাত্রসংখ্যার চাপে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। দাবি ওঠে শিক্ষা সংস্কারের।

শিক্ষা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭-৬৮ সালে ছাত্রবিদ্রোহের যেটুকু ব্যাপ্তি হয়েছিল, তা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ছাত্র বিদ্রোহের এই কেন্দ্রস্থল ছিল Guildford, Croydon, Hornsey-এর Art Collegeগুলি। বিশেষকরে Hornsey-তে ছাত্র বিদ্রোহীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে নিয়েও, তাঁরা কখনো জনমতকে অগ্রাহ্য করে কোন হটকারী আচরণ করেনি। Hornsey বিদ্রোহী ছাত্রদের একাংশের মধ্যে ট্রট্স্কিপন্থী এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক রক্ষণশীল সংগঠনগুলির যেমন কিছুটা প্রভাব ছিল, তেমনি কমিউনিস্ট ছাত্রসংগঠনের প্রভাবও ছিল।

Fabian Society-র ছত্রছায়া ইংল্যাণ্ডের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বামপন্থী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্যুগুলি নিয়ে বিশেষ নাক গলাত না। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে বামপন্থী ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আমেরিকায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-এর প্রচেষ্টায় এক আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে American National Students' Association নামে একটি সংগঠন গড়া হয়। এই সংগঠন আদলে ইংল্যাণ্ডেও National Union of Students (NUS) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে খর্ব করার আশায় নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। গড়ে ওঠে Radical Student Alliance (RSA)। কিন্তু এই RSA খুব একটা সক্রিয়তা দেখাতে পারেনি।

এর পরবর্তী ঘটনার কেন্দ্রস্থল London School of Economics [LSE]। LSE-র র‍্যাডিক্যাল ছাত্ররা ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালীর ছাত্রবিদ্রোহের ঘটনায় উৎসাহিত বোধ করে। ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করে ইংল্যাণ্ডেও বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের [a mass left-wing student movement] প্রয়োজন। তাই LSE-র র‍্যাডিক্যাল ছাত্ররা এই মর্মে এক আবেদন প্রচার করে। এই আন্দোলনের ইংরাজি ভাষ্যটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :

"British Students this year have watched their counterparts aboard make history ... what are the prospects for militant students in Britain ? So far the beginnings of student struggle have been encouraging but scattered ... The LSE Socialist society has recently taken an important initiative by calling for revolutioary student movement. Such an organisation answers an urgent need।"[২৪]

এই আহ্বানের পরিপেক্ষিতেই ১৯৬৮ সালে ১৪ থেকে ১৬ই জুন প্রায় এক সহস্রাধিক ছাত্র LSE-তে এক কনভেনশনে সমবেত হয়ে Revolutionary Socialist Students Federation [RSSF] গড়ে তোলে। এই সমাবেশে Sociatist Society-র সভ্য ছাত্ররাই মূলত

অংশগ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্রদের কোন কথার উল্লেখ এই সময় ছিল না।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এক বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ১৯৬৮ সালে মধ্য সময়ে যখন শুরু হল, তখন ফ্রান্স সহ অন্যান্য দেশের ছাত্র বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ষাটের দশকের পশ্চিমদেশীয় ছাত্র বিদ্রোহের তখন শেষ পর্যায়। ইংল্যাণ্ডের নবগঠিত RSSF-এর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে 'বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন' গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশ এবং শক্তিশালী দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র [USA]। এই দেশটি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পীঠস্থান। এই খোদ সাম্রাজ্যবাদের দেশেও ১৯৬৮ সালে ছাত্র বিদ্রোহ উত্তাল রূপ নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রস্থল নিউইয়র্ক শহরের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান ছাত্র সংগঠনের নাম—'Students for a Democratic Society' (SDS)। তখন নিউইয়র্কে ১৯৬৮ সালের বসন্তকাল। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডিক্যাল ছাত্ররা SDS-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাংশ দখল করে এক সপ্তাহ ধরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় বাকি সেমিস্টার পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। ১৯৬৫ সাল থেকেই কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিরোধ চলে এসেছিল। সেই বিরোধের পরিণতি ১৯৬৮-র বসন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দখল।

শুধু কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ভিয়েতনামের মার্কিন বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে র‍্যাডিক্যাল মনোভাবাপন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চরম বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রথমে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৫ সালে Independent Committee on Vietnam (ICV) নামে সংগঠন গড়ে ওঠে। ICV-এর নেতৃত্বে নিউইর্য়ক শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় কলোম্বিয়া ছাত্ররা যুদ্ধবিরোধী এবং বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী বিক্ষোভ দেখে উদ্দীপ্ত হয়। ১৯৬৫-র এপ্রিলে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হল যুদ্ধবিরোধী বিশাল বিক্ষোভ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিশাল বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ICV-র ভূমিকা ছিল সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ছাত্র সংগ্রহের (recruiting) যে কাজ চালাচ্ছিল— তার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ছাত্ররা সোচ্চার। ICV সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সাল থেকে যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের সংগঠিত করেছিল, সেই সংগঠিত ছাত্রদের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে এল নবগঠিত SDS।

SDS প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক ভয়ঙ্কর গোপন ব্যবস্থাকে আবিস্কার করে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মার্কিন সরকারের Secretary of Defence-এর প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালে Institute of Defence Analysis [IDA] নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলিকে এই সংগঠনের সদস্যভুক্ত করা হয়। IDA-এর প্রধান কাজ ছিল নতুন নতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য মিলিটারী গবেষণার কাজ চালান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এবং গবেষক ছাত্রদের গোপনে IDA-এর এই কাজে নিয়োগ করা হত। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই গোপন বিষয় জানতে পেরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই বিক্ষোভ চরম পর্যায়ে ওঠে। SDS-এর নেতৃত্বে ছাত্রদের দাবি—IDA-এর সাথে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না, IDA থেকে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে। IDA বিরোধী আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পত্রিকা 'Spectator' এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। IDA বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং মার্কিন সরকার খুবই বিপর্যস্ত হয়।

SDA-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ— CIA-এর আরেক চক্রান্ত উদঘ্াটন। School of International Affairs নামে একটি শিক্ষামূলক সংগঠনের সাথে CIA-এর গোপন যোগাযোগ রক্ষা করা হত। SDA এই গোপন যোগাযোগ জনসমক্ষে উদঘাটন করে CIA-এর বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তোলে। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নতুন এক মল্লক্রিড়া স্থল (gym) নির্মাণ করে সাদা-লাল এবং কালো চামড়ার মানুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থার বিধানের এক বর্ণবিদ্বেষী পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। কর্তৃপক্ষের এই বর্ণবিদ্বেষী কার্যকলাপ প্রতিরোধে SDA-এর নেতৃত্বে ছাত্ররা এগিয়ে আসে, দীর্ঘ দিন ধরে চলে তুমুল বিক্ষোভ।

১৯৬৮ সালের ২৭শে মার্চ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৫০ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ মিছিল বের করল এবং IDA-এর ১,৭০০ জন ছাত্র ও ফ্যাকাল্টি মেম্বারের স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত জমা দিতে যায়। তাছাড়া এই সময়ে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যবস্থাই ছিল সাদা-লাল-কালো চামরা ঘিরে বর্ণ-বৈষম্যমূলক। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৬৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ছাত্র ধর্মঘট, অবস্থান, বিক্ষোভ মিছিল, ফ্যাকাল্টি দখল ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন তীব্ররূপ নেয়। SDS-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্র বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী ছাত্র সংগঠনকে কর্তৃপক্ষ লেলিয়ে দিয়েছিল। এর পরিণতিতে ঘটল সংঘর্ষ, পুলিশী তাণ্ডব এবং গ্রেপ্তার ইত্যাদি। এইরূপ একটি ঘটনায় ৭২০ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারপর ১৭ই মে, ১৯৬৮ নিম্নবর্গের মানুষেরা কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বাড়ি দখল করে। এই দখলের সমর্থনে সহস্রাধিক ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ জমায়েত হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ১৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে। এপ্রিলের শেষের দিকে Strike Co-ordination Committee-এর ডাকে যে কোন ধর্মঘটে শত শত ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করত। শুধু ছাত্র নয়, ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক-অশিক্ষক কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ছিল আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামগ্রিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র সমাজের চেতনা বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ এবং বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন সংগঠন। দাবি ছিল—মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গঠন, মুক্ত সমাজ গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে মার্কসবাদী অর্থনীতি পঠন-পাঠন চালু করা ইত্যাদি। কলোম্বিয়ার ছাত্ররা অন্যদেশের ছাত্র আন্দোলনে সংহতি জ্ঞাপনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

কলোম্বিয়ার ছাত্র আন্দোলনকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে 'কলোম্বিয়া স্ট্রাইক কমিটি' তাই আহ্বান জানিয়েছিল— 'দুটি, তিনটি, অনেক কলোম্বিয়া তৈরি কর' ['Create two, three, many columbias!'— Columbia strike committee']।[২৫] কিন্তু এই আহ্বান গতিবেগ পাবার মুহূর্তে ১৯৬৮ সালের জুলাই মাস থেকে পশ্চিমীদেশের ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের ভাটার টান শুরু হয়ে যায়।

ষাটের দশকে জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র বিদ্রোহের প্রভাব পড়েছিল লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতেও। তাছাড়া যেসব দেশগুলিতে ঐ সময় উল্লেখযোগ্য ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে— স্পেনে গোপন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে (underground organisation) ছাত্র আন্দোলন; সুইডেন, মেক্সিকো এবং উরুগুয়েতে ছাত্র আন্দোলন। পশ্চিমী দুনিয়ার এইসব দেশ ছাড়াও প্রাচ্যের ধনী দেশ জাপানকেও ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন কিছুটা দোলা দিয়েছিল।

পশ্চিমী দুনিয়ার ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র বিদ্রোহের ঐ এক দশকব্যাপী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির ছাত্র আন্দোলনের অপ্রত্যক্ষ একটি যোগসূত্র কিংবা একটি যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে নিঃসন্দেহে।

তথ্যসূত্র :

১। মুক্তি দুনিয়া [Free world] অর্থে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্লকভুক্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে বুঝায়। যেমন ১৯৯০ সালের ২রা অক্টোবরের পূর্বেকার পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

২। Barbara and John Ehrenreich লিখিত "Long March, Short spring : The Student uprising at Home and Abroad" বইতে Patrick seale and Maureen Meconville-এর লিখিত "French Revolution 1968" বইতে এবং Charles posner-এর "Reflections on the Revolution's in France : 1968" শীর্ষক বইতে পশ্চিম দেশগুলির ছাত্র আন্দোলনের বিবরণ বহু ক্ষেত্রেই 'বিপ্লব' (Revolution) এবং 'বিদ্রোহ' (Revolt) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩। "French Revolution 1968"-এর পৃষ্ঠা-১০৫ এবং "Reflection on the Revolution in France : 1968" বই-এর পৃষ্ঠা-১১১ দ্রষ্টব্য।

৪। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পর জার্মানী বিভক্ত হয় এবং পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী হয় 'বন'।

৫। "Long March, Short spring ..." পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায়।

৬। ঐ পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায়।

৭। ঐ পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায়।

৮। ঐ পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায়।

৯। ঐ পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায়।

১০। "French Revolution 1968" পুস্তকের ১৫, ১৬, ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১১। ঐ পুস্তকের ১৯৮ পৃষ্ঠায়।

১২। "Long March, short spring ..." পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায়।

১৩। "French Revolution 1968" পুস্তকের ১২৫ পৃষ্ঠায়।

১৪। ঐ পুস্তকের ১৫০ পৃষ্ঠায়।

১৫। ঐ পুস্তকের ১৫০ পৃষ্ঠায়।

১৬। ঐ পুস্তকের ১৫২ পৃষ্ঠায়।
১৭। ঐ পুস্তকের ১৫২ পৃষ্ঠায়।
১৮। ঐ পুস্তকের ১০১ পৃষ্ঠায়।
১৯। ঐ পুস্তকের ১৬৩ পৃষ্ঠায়।
২০। ঐ পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায়।
২১। ঐ পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠায়।
২২। ঐ পুস্তকের ২২২ পৃষ্ঠায়।
২৩। ঐ পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠা থেকে ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে "French Revolution 1968" পুস্তকের লেখক Patrick Seale এবং Maureen Mcconville যে মূল্যায়ন তাঁদের পুস্তকে উল্লেখ করেছেন তার কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় মূল ইংরাজি ভাষায় নিম্নে দেওয়া হল :

1) "Perhaps one of the first and simplest things to say is that the Revolution was not a political crisis in the classical sense. It was not until its very final stages — and then almost by accident — a bid for political power." পৃষ্ঠা ২২৫।

2) "They rebelled against the humbug of French intellectual life, the pump of officialdom, the social pressures of a bougreois society. They wanted to throw everything over and think it all out a new... It was compared to the utopian rebellions against the first industrial revolution." পৃষ্ঠা ২২৬।

(3) "Hounded by the young revolutionaries, the undisciplined students, the rebellions professioonal men, and the sullen strikers, the regime faltered." পৃষ্ঠা ২২৭।

4) "The crisis threw an equally bright light on the opposition. The communist party did not attempt to seize power, because it was no longer in its nature to be a revolutionary. It mouthed slogans about class struggle but no longer believed them. Over the passage of years it has become a sober worker's party, mesmerized with cars and television sets, the French equivalent of the British Lobour Party. May 1968 revealed to public gaze that he destalinization of the CPF, obscured by the countinuity of the leadership and the central committee's tradition secreacy, had in fact taken place. The party was however still strong : it controlled news papers, municipalities, trading companies and a score of cultural, sports and youth organisations. Thousand of men depended directly on it for their livelihood. But it was no longer a fighting party. In seeking to adjust to a modern, increasingly classless and affluent society, its revolutionary past was more a liability than an asset." পৃষ্ঠা ২২৮।

5) "But the suffocating intellectuals, disgruntled professional men, over crowded students, and striking workers had, for the most part, quite other, wholly reformist ambitions." পৃষ্ঠা ২২৯।

6) "but there was a more hopeful side to the May Revolution. A torrent of critical energy was released which for a moment made officialdom cringe and left every emperor naked. It carried the germ of hope, the intellect, the spirit and the imagination, if given free range and scope, could really change the world." পৃষ্ঠা ২২৯!

২৪। "Long March, Short spring ..." পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠায়।
২৫। ঐ পুস্তকের ১৫০ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের ১৯৬০ পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনের নয়া মাত্রা

সূচনা

দেশ ভাগের পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬০-এর পরবর্তী দশকগুলি বিভিন্ন কারণেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ষাট-সত্তর-আশির দশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্তরে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যা ইতিহাসের মানদণ্ডে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। ভারতের ১৯৬০ পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের খণ্ড অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই খণ্ড অংশটি এক রকম গতিধারায় বিকশিত হয়নি। এর বিকাশ বিভিন্ন মুখী। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের ছাত্র আন্দোলনের গতিমুখের একটি শান্ত সমাহিত রূপ পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত স্থিতাবস্থা রক্ষা করেছে। কিন্তু, এই শান্ত সমাহিত স্থিতাবস্থা ও তার গতিমুখ ষাটের দশকের শুরুতে তরঙ্গ ক্ষুব্ধ। পেল এক নতুন মাত্রা। এই নতুন মাত্রার পটভূমি আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন; তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ; পশ্চিম দুনিয়ার ছাত্র বিদ্রোহ-এর জঙ্গী সাহসিক মানসিকতা-জনিত প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া—ভারতের ১৯৬০ উত্তরকালের ছাত্র আন্দোলনে প্রতিফলিত হলেও-এর সূচনাপর্বে ছিল বিভিন্ন কারণ। এই কারণগুলি ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং সংকটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত। পটভূমিতে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে সূচনাপর্বের কারণগুলি যুক্ত হবার ফলেই ১৯৬০ সালের পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনে নতুন গতিবেগ আসে এবং সূচিত হয় নয়া মাত্রার।

সূচনাপর্বের কারণগুলিকে সাধারণভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) শিক্ষা জগতের বিভিন্ন সমস্যা, (২) রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাত, (৩) পঞ্চাশের দশকের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা, (৪) বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র বিক্ষোভ এবং (৫) দেশের সামগ্রিক সংকটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

(১) শিক্ষা-জগতের বিভিন্ন সমস্যা :

স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হবার পর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে রচিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কাঠামোর উপরে কিছু প্রলেপ সাধনের নামমাত্র প্রচেষ্টা ছাড়া কোন গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠেনি। চল্লিশের দশকের শেষে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো। যে কোন দেশের সামাজিক এবং প্রশাসনিক ও দেশের উন্নয়ন কার্যের প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবেই

প্রত্যাশা ছিল পঞ্চাশ দশক জুড়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্জন করে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা অনুসারে বৈজ্ঞানানুগ শিক্ষা ব্যবস্থা [Scientific Educational System] দেশের সর্বত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কার্যকরী হবে। কিন্তু গোটা পঞ্চাশের দশকে সে প্রত্যাশা বিফল হয়েছে।

দেশের নতুন সংবিধান রচয়িতারা ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে [Directive Principles] ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তা সংবিধানে গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পঞ্চাশ দশক শুধু নয় ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের সব রাজ্যে সংবিধানের এই নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকরী করা যায়নি। দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াসও ছিল সীমাবদ্ধ।

১৯৪৯ সালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে 'রাধাকৃষ্ণান কমিশন' গঠন করা হয়েছিল এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে গঠন করা হয়েছিল 'মুদালিয়র কমিশন'। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন, পাঠ্যসূচি, শিক্ষার পরিবেশ, পেশাগত শিক্ষা, ভর্তি সমস্যা, আবাসন বা থাকার সমস্যা, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, শিক্ষকদের জীবিকা অসংখ্য বিষয়ে এই দুইটি শিক্ষা কমিশন বিচার-বিবেচনা করে এব সরকারের কাছে অসংখ্য সুপারিশ করে। শিক্ষা জগতের বাস্তব পরিস্থিতির চিত্রও কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে 'রাধাকৃষ্ণান কমিশনে'র রিপোর্টের ৩৭৪-৩৭৫ পৃষ্ঠার উল্লিখিত বিবরণের কিছু অংশ পড়লে ভারতের ছাত্র সমাজ কি ভয়ানক অসুবিধা এবং অব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে সে সময় বাধ্য হয়েছে, তার একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা ভাবানুবাদ নিম্নরূপ :

> "বসবাসের ব্যবস্থা শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক যুক্ত। পরিমাপে কম এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য শুধু অপুষ্টিরই এবং রোগের জন্ম দেয় না, বরং উত্তেজনা অসন্তুষ্টির কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলিতে যে পরিবেশে ছাত্ররা বসবাস করে তার চেয়েও অনেক বিষয় রয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির নৈতিকতা ও পরিবেশের উপরে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পড়াশুনা এবং ঘুমোনোর জন্য সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক বাসস্থান এবং কমদামে স্বাস্থ্যকর খাদ্য ভাল কর্মশক্তির জন্য প্রয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে অগ্রগতি ঘটাতে প্রয়োজন। ভারতের বেশিরভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের বাসস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা নেই খাওয়াদাওয়ার সুবিধার। সাধারণভাবে ছাত্রদের এক ক্ষুদ্র অংশ হোস্টেলগুলিতে থাকার সুযোগ সুবিধা পায়।"
>
> "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগ ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বসবাস করে। এটা কিন্তু এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি, অনভিপ্রেত পরিবেশের জন্য বিশেষ করে ছাত্ররা যে ঘনবসতি অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য হয়—তার জন্য তীব্রতর হয়েছে। জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে অনেকেই এই পরিবেশের শিকারে পরিণত হয়। বাইরে বসবাসকারী ছাত্ররা হোস্টেল, খেলার মাঠ এবং কমনরুমের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সংঘবদ্ধ জীবন থেকে বঞ্চিত হয়।"[১]

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের এই রিপোর্ট থেকেই প্রতীয়মান হয়, ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ পঞ্চাশের দশকে কি অবস্থায় ছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রের পরিবেশ থেকে সহজে অনুমেয়—প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ কিরূপ হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার পূর্ববর্তী নিচু ধাপগুলিতে আরো অমর্যাদা, আরো অবহেলা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যহীনতা দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার ঔপনিবেশিক স্তর অপসারিত না হবার ফলে অথবা বর্জন না করার পরিণতিতে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা প্রতি বছর ক্রমানুপাতিক হারে বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকারত্বের চিত্র দেখে পঠন-পাঠনরত দেশের ছাত্রসমাজের মানসিকতায় সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। ছাত্রসমাজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মময় জীবনের প্রতিষ্ঠা সকলের কাছে মনে হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। চাকুরী প্রাপ্তি, পেশায় নিয়োগের ব্যবস্থার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যবিধান না হওয়ার পরিণতিতে ঐ পঞ্চাশের দশক থেকেই জাতীয় স্তরে এক সংকট সৃষ্টি হতে থাকে। যার একটি অন্যতম কারণ শিক্ষিত বেকার সমস্যা।

ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশের দাবি সত্ত্বেও কর্মভিত্তিক [Job oriented] শিক্ষাব্যবস্থা চালু না করার পরিণতিতে সমস্যার গভীরতা শিক্ষা ও জাতীয় জীবনে হয়েছে সর্বব্যাপক।

১৯৬২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের [Planning Commission] পক্ষ থেকে এক তথ্যানুসন্ধান [Survey] চালানো হয়। এই তথ্যানুসন্ধানের রিপোর্টের একাংশে বলা হয়েছে—প্রতি বছরই কর্মসংস্থান এবং কর্মপ্রার্থীর মধ্যে এক বিরাট 'গ্যাপ'-এর সৃষ্টি হচ্ছে।[২]

১৯৬৩ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত "University Employment Information and Guidance Bureau"-এর সেমিনার পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডক্টর ভি.কে.আর.ভি.রাও তাঁর ভাষণে জানান— ভারতের কর্মবিনিয়োগ কর্মকেন্দ্রগুলিতে [Employment Exchange] নথিভুক্ত স্নাতক [graduates] বেকারের সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ জন। প্রতি বৎসর ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ জন স্নাতক বেকার তাঁদের নাম কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত করাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরের তদানীন্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী জে. হাতীর মতে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর মধ্যে ঐ সময় ৮ লক্ষ ছিল প্রবেশিকা এবং উচ্চ পরীক্ষা উত্তীর্ণ এবং ৭০,০০০ জন ছিল স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাশ।[৩]

১৯৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে ডক্টর সি.পি.রামস্বামী আয়ার বলেছিলেন : ১৯৪৭ সালে ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৮৭,০০০ জন, কিন্তু ১৯৬৩ সালে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৭,৮০,০০০ জন। ১৯৫৭ সালের হিসাব মত ভারতে প্রতি ১২ জনে একজন স্নাতক বেকার। গত ৫ বৎসরের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার প্রতি বৎসরের বৃদ্ধিহার ছিল শতকরা ৩০%।[৪]

শিক্ষিত বেকার সমস্যা শিক্ষা জগতে সংকটের সাথে জড়িত। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে উদ্বেগের বিষয়। এইজন্য ভারতের শিক্ষা জগতের সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ—শিক্ষিত বেকার সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার সংকোচন নীতি প্রয়োগের পঞ্চাশের দশকেই উদ্যোগ নিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ

বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রথম চেয়ার ম্যান ডঃ সি. ডি. দেশমুখ ১৯৫৭ সালে লক্ষ্ণৌতে এক ছাত্র সভায় প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন— শিক্ষিত বেকার সংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই ।[৫]

পঞ্চাশের দশক থেকে ষাট দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল অতি সামান্য। তখন প্রায় ৫০ কোটি মানুষের দেশ ভারত। এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষাসহ্ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিখ্যাত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৭০ কোটি টাকা, ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩০৭ কোটি টাকা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অর্থাৎ এই সময়ে ভারতে বার্ষিক জনসংখ্যা পিছু গড়ে ব্যয় হয় ৬.৪ টাকা। অথচ সিংহলে তখন উক্ত ব্যয় ছিল ১৯ টাকা, আফগানিস্তানে ৮ টাকা, সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬৫০ টাকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫০ টাকা। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যথাক্রমে মোট ব্যয় বরাদ্দের মাত্র ৭.০ ভাগ, ৬ .০ ভাগ এবং ৪.৮ভাগ শিক্ষাখাতে ধার্য্য করা হয়েছিল।[৬]

উপরে বর্ণিত তথ্য অনুসারে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের কাছে সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি। শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বাধীন দেশের জনগণের মনে এবং সমাজ কাঠামোতে বিক্ষোভের বীজ বপনের পক্ষে ছিল সহায়ক।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও এই সময় গতানুগতিক পথ পরিহার করা হয়নি। ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদন অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম স্তর—বুনিয়াদী তথা প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় স্তরে—- মাধ্যমিক শিক্ষা, তৃতীয় স্তর—কলেজীয় শিক্ষা। প্রতিবেদনের রিপোর্টে এই তিন স্তরের শিক্ষার নেতিবাচক দিকটিই প্রকট হয়েছিল।

'খের কমিটি'-র অভিমত অনুসারে ১৯৫৭ সালের মধ্যেই ১৪ বৎসর বয়স্ক সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার কথা । কিন্তু তদানীন্তন সরকারি হিসাব অনুসারে সে সময় দেশে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদেয় শতকরা ২৫ জন বিদ্যালয়ে গিয়ে আক্ষরিক জ্ঞান লাভে বঞ্চিত ছিল।

নিম্ন, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তব পরিস্থিতি ছিল আরো জটিল। এইক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের কোন নীতি ছিল না এবং "পাঠ্যসূচি" নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল অসংখ্য মতান্তর। "মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা সমাধান কল্পে 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন', 'মুদালিয়র কমিশন' বহু সুপারিশ করেছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সকল কমিশনের সুপারিশের কিছু অংশ কার্যকরী করার সময়ে আরও অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এক জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান।"

কলেজীয় শিক্ষার আরেকটা সমস্যাকীর্ণ চিত্র : "কলেজে ভর্ত্তিব সমস্যা প্রতি বৎসরই তীব্র আকারে দেখা দেয়। কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলেজের প্রাঙ্গনে বিরাট 'কিউ'। আজ ৭/৮ বৎসর যাবৎ সেস্ন শুরু হইবার প্রাক্ মুহূর্তের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা একটি স্থায়ী সমস্যা। কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সমাধানে উদাসীন। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দ্দেশমত কলেজের ছাত্র সংখ্যা পর্য্যয়ক্রমে হ্রাস করিবার ফলে ভর্ত্তি সমস্যা

আরো সংকটজনক হইয়াছে। বিশেষত বিজ্ঞান বিভাগে এই সমস্যা তীব্রতর।[৭]

১৯৫৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে উচ্চশিক্ষার বাস্তব চিত্রের সারমর্ম নিম্নরূপ :

"বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করে তাহাদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভের পথ আরও দুরূহ। মাধ্যমিক শিক্ষা অতিক্রম করিবার পর যাহারা অনেক আশা-আকাঙ্খা লইয়া কলেজে ভর্ত্তি হয়— তাহারাও কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া হতোদ্যম হইয়া পড়ে। আর্থিক অভাব অনটনের চাপে উচ্চশিক্ষার মধ্যপথ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অভিলাষী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততি। এই সমস্ত পরিবারের মাসিক মাথা পিছু ব্যয় ৩০ হইতে ৫০ এবং ৫০ হইতে ৭৫ টাকার মধ্যে। এইসব পরিবারের যাহারা কলেজে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়, তাহাদের অনেকেই ১৫/১৬ বৎসর বয়সকাল হইতে পূর্ণ বা আংশিক সময়ের কাজ করিয়া দিবা বা নৈশ কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে। তাছাড়া যে সমস্ত পরিবারের মাসিক ব্যয় মাথা পিছু ৩০ টাকা সেই সমস্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষারত ছাত্রছাত্রীরা শতকরা হার ৩১% ভাগের কাছাকাছি। মাথা পিছু ৩০ টাকা ব্যয়সম্পন্ন পরিবারের স্বাভাবিক জীবন ধারণের মান অত্যন্ত নিম্ন।[৮]

উপরের এই বর্ণনার দ্বারা শুধু কলকাতা বা পশ্চিম বাংলাই নয় সারা ভারতের উচ্চশিক্ষা লাভে আর্থিক দুরাবস্থা অনুমেয়।

ভারতের পরীক্ষা পদ্ধতিও উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণের এবং বাস্তব জ্ঞান বিকাশের পরিপন্থী। ফলে, শিক্ষক-ছাত্র সকলের মানসিকতাই এক সুবিধাবাদের জন্ম দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তার এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে : জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ভারতের পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষক ও ছাত্রকে সর্টকাট পথে এগোতে প্ররোচিত করে। অনেক ছাত্রই পড়াশুনার বর্ষ শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েকমাস পূর্বে 'টিউটোরিয়াল' ক্লাসের সুযোগ পায় এবং বৎসরের বেশিরভাগ সময় একবারও বই না খুলে ছাত্ররা নিজেদের পঠন-পাঠন চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অনেক ছাত্র উৎসাহ বোধ করে না এবং পরিণতিতে পরিস্থিতি খুবই অসন্তোষজনক।[৯]

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বরং শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিভাষার সূত্র গৃহীত হলেও সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে সবিশেষ গুরুত্ব তখনও দেয়নি। জ্ঞান ও শিক্ষার বিকাশের স্বার্থে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে শিক্ষা কোনমতেই সহজ ও সাবলীল ছিল না। এইক্ষেত্রে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ ইংরাজি ভাষার উপর-ই সব সময় গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ক্রমবর্ধমান হারে প্রাধান্যের স্তরে এনে বিপরীত ইংরাজি ভাষার প্রাধান্যের গুরুত্বকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার উদ্যোগে সরকার এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ছিল চরম অবহেলা। মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ অবহেলা শিক্ষা সংকটের অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম বিষয়।

পঞ্চাশের দশক থেকে-ই কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের অবহেলা ছিল চরম। ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কারিগরি প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যয়বহুল। গরিব, মধ্যবিত্ত এবং আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ঘরের সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে এই ব্যয়বহুল শিক্ষার কল্পনা আকাশকুসুম কল্পনার সামিল। গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারি নামমাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা থাকলেও তা

শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়ার ফলে এইসব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা অর্থের অভাবে অনেক সময় ব্যাহত হয়েছে। এর ফলেও বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু আর্থিক সংকট-ই নয় তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থাও ছিল গভীর উদ্বেগজনক। পশ্চিমবঙ্গ তথ্যানুসন্ধানকারীদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শতকরা ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী রোগাক্রান্ত।[১০] অন্য রাজ্যগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের হালও পশ্চিমবঙ্গের মতই। স্বাস্থ্যের এই অবনতির মূল কারণ পুষ্টির অভাব।

তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানের যে উন্নতিসাধন প্রতিনিয়ত ধাপে ধাপে হয়ে চলেছে সে দিক থেকে স্বাধীন ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বেশ পশ্চাদপদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত কৃত কৌশলের প্রতি সরকারি কর্তৃ পক্ষ ছিল অত্যন্ত উদাসীন । বরং উচ্চ শিক্ষারত ছাত্র সমাজকেই শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত কৌশলের জন্য আন্দোলনে সামিল হতে হয়েছিল।

চল্লিশের দশকের শেষ পর্যায়, পঞ্চাশের পুরো দশক এবং ষাটের দশকের শুরুর প্রথম পর্বে ভারতের শিক্ষা জগতের বিভিন্ন ঘটনার ইতিহাস হলো সামগ্রিকভাবে সংকট ও সমস্যার ইতিহাস। শিক্ষা জগতের এই সমস্যা ষাটের দশকের নয়া গতিবেগসম্পন্ন ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলনের অন্যতম বিস্ফোরক উপাদান।

(২) রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাত :

ভারতের ছাত্র আন্দোলন শুরু থেকেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক চিন্তার প্রভাব ছিল। সংগঠিত উভয়ক্ষেত্রেই ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথম স্তরের এই রাজনৈতিক চিন্তা ছিল মাতৃভূমির প্রতি দেশপ্রেমিক কর্তব্য, দেশের স্বাধীনতা অর্জন, সাম্রাজ্যবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। এইক্ষেত্রে ভারতের ছাত্র সমাজের চিন্তা-ভাবনা ঐতিহাসিক কারণেই ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং সংহতিমূলক। তাই ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে গঙ্গাধর মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রথম সম্মেলনে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং ছাত্র সমাজকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ তখনো ভারতের ছাত্র সমাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ। জাতীয় স্তরে তখন সবেমাত্র অসংগঠিত ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত রূপ নিচ্ছে। ঐ পর্যায়ে ছাত্র সমাজ এবং ছাত্র সংগঠনের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা অর্জন।

কিন্তু এই পর্যায়ের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পথ ও মত নিয়ে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীগুলির মতান্তর, চিন্তা-ভাবনার পারস্পরিক বিরোধিতার প্রতিফলন দেশের ছাত্র সমাজের উপরেও বর্তাতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা, সোভিয়েত নভেম্বর বিপ্লবের পৃথিবীব্যাপী প্রভাব 'লিবারেল'-'মডারেট', 'র‍্যাডিক্যাল' পন্থীদের মানসিকতা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উগ্রতা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহ এবং দেশপ্রেমিক কার্যকলাপের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় বিভক্ত হয়। এই জন্যেই ১৯৪০ সালে

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নাগপুর এবং পরে ১৯৪১ সালে পাটনা সম্মেলনে সংগঠন রাজনৈতিক কারণে ভাঙন ধরে।[১১] নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন [AISF] কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সহ প্রায় সকল রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছাত্রদের একটি ঐক্যবদ্ধ মিলিত মঞ্চ বা সংগঠন রূপেই ১৯৩৬ সালে গড়ে তেলা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের কারণে এই ঐক্যবদ্ধ মিলিত মঞ্চ ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়নি। AISF-এর নাগপুর এবং পাটনা সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠল 'নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস, 'ইউনাইটেড স্টুডেন্টস এ্যাসোশিয়েসন' ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

রাজনৈতিক চিন্তা-মতাদর্শ কেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠলেও প্রায় প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের লক্ষ্য এবং কর্মনীতিতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম-ই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক দলগুলির 'রণনীতি' ও 'রণকৌশল'ও ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন কেন্দ্রিক। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রধান ঐতিহাসিক বিষয় হলো— ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে, ভারতের ছাত্র আন্দোলনের অভ্যান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে রাজনৈত্তিক চিন্তার সংঘাতের অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পরেই শুধু ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাত আকস্মিক ঘটেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে, বিশেষ করে ত্রিশ-চল্লিশের দশক থেকে ভারতের ছাত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাত চলে আসছিল।

স্বাধীনতা অর্জনের পরে পঞ্চাশের দশকে এই রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাত অনেকটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখে এবং নতুন পরিস্থিতিতে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পরে। এর পরিস্থিতিগত বাস্তবতা ছিল।

প্রথমত, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটলো। দেশের শাসন ক্ষমতা এল দেশের-ই প্রধান রাজনৈতিক দল 'জাতীয় কংগ্রেসে'র হাতে। ১৯৪৭-৪৮ এর যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে কার্যত না মানায় ফলে এবং স্বাধীনতা অর্জনকে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলার পরিণতিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র সমাজকে ঐ চিন্তার অনুসারি করানোর প্রচেষ্টা হলো। এতেও শুরু হলো এক রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাত। তাছাড়া, নতুন পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলনের গতিমুখ কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে—তা নিয়েও দেখা দিল চিন্তার সংঘাত। চিন্তার সংঘাত এলো— ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনের কর্তব্য, দায়িত্ব, কর্মনীতি এবং কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে। ছাত্র আন্দোলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক হবে, না সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে— এটাও ছিল, একটা ভাবাদর্শগত কঠিন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন ছিল ছাত্র ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কি হবে এবং ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত হবে কিনা।

জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্রসংগঠন পঞ্চাশের দশকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে 'স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলন'[Selp-helf student movement]-এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ছাত্র আন্দেলনের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে ধোঁয়াটে দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি-ই প্রধানত 'স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলন'-এর কর্মধারাকে অগ্রাধিকার দেয়। তখনকার

এই 'স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলন'-এর প্রধান প্রধান কার্যক্রম ছিল— চীপ স্টোর, চীপ ক্যান্টিন, টেক্সটবুক লাইব্রেরি, ছাত্র সাহায্য ভান্ডার, স্টুডেন্টস হেলথহোম, যুব উৎসব, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিতর্ক সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ছাত্র উৎসব প্রভৃতি সংগঠিত করা।

১৯৪১ সালে যে জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪২-এর 'ভারতছাড়' আন্দোলনের প্রাক্কালে 'নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস' তৈরি করে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই জাতীয় কংগ্রেস পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই জাতীয় স্তরে প্রস্তাব রাখল সমস্ত ছাত্র সংগঠন তুলে দেবার। জাতীয় কংগ্রেস তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত ছাত্র ইউনিয়নকে নিয়ে 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' [National Union of Students বা সংক্ষেপে NUS] গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করলো। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থনে অনুষ্ঠিত হল ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্স-এর উদ্বোধনী সম্মেলন। ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। জওহরলাল নেহরু তাঁর ভাষণে সব ছাত্র সংগঠন তুলে দেবার-ই আহ্বান রাখলেন এবং ছাত্রদের দেশের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করলেন।

NUS-গঠনের এই প্রচেষ্টা জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক-বিতন্ডার সৃষ্টি করে। শাসকদল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের NUS গঠনের প্রস্তাব অনেকের কাছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতিভাত হয়। রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের অনেকেই মনে করলেন, কংগ্রেস শাসক দল হিসেবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগ্রাম থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে রাখতে চায়। NUS সংক্রান্ত প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরেও মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটায়।

পঞ্চাশের দশকে "স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলন" এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ছাত্র সংগ্রাম, তদুপরি NUS গঠনের প্রস্তাব ভারতের ছাত্র আন্দোলনে এক গতানুগতিকতার পরিমন্ডল তৈরি করে। অনেকের মতে এই পরিমন্ডল এক অচলায়তনের জন্ম দেয়। এক অংশের মতে রুদ্ধ করে দেয় ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে।

এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হলো আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত। যার ফল হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র যুব-সংগঠন এবং ছাত্র-যুব সমাজ এই বিভেদের শিকার হলো। পঞ্চাশের দশকে এই বিভেদের শুরু এবং ষাট-সত্তর-এর দশকে তা আরও ক্রমবর্ধমান।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শুধু কমিউনিস্ট আন্দোলন কেন্দ্রিক নয়। ভারতের ছাত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাতের ক্ষেত্রে অকমিউনিস্ট পশ্চিমী দেশগুলির বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী এবং র‍্যাডিক্যাল, মডারেট পন্থীদের প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের উত্তেজক ঘটনার অসংখ্য বিষয়বস্তু [পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যার বর্ণনা রয়েছে] প্রভাব বিস্তার করেছিল। পশ্চিমী দেশ ছাড়াও অকমিউনিস্ট প্রতিবেশী দেশের ছাত্র আন্দোলনের বহু ঘটনা ভারতের ছাত্র সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ছাত্র-যুব আন্দোলনের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এমনই একটি ভাবিয়ে তোলার বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশের ছাত্র আন্দোলনের কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

কানাডা

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কানাডা রাষ্ট্রের 'Canadian Union of Students'-এর নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে এক ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের দাবি ছিল (১) ছাত্রদের বেতন প্রথা [tution fees] তুলে দিতে হবে, (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য ছাত্রদের বেতন [salaries] দিতে হবে, (৩) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভিন্সগুলিকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিতে হবে এবং কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রভিন্সগুলিকে ফেডারেল গভর্নমেন্ট-এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। এইসব দাবির ভিত্তিতে কানাডার কুইবেক [Quebec] প্রভৃতি স্থানে আইন সভার সামনে প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

স্পেন

ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকলাপের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে বার্সিলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্ররা ধর্মঘটে সামিল হয়। ছাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণের অভিযোগে ২৭ জন ছাত্র এবং ৭০ জন সহকারি অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ছাত্র বিক্ষোভ জঙ্গীরূপ নেয় এবং ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্পেনের ছাত্র সমাজ ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

গ্রীস

১৯৬৬ সালের অক্টোবর গ্রীসে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে এক তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ গোটা দেশকে নাড়া দেয়। ছাত্রদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন ছিল সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে।

আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনায় তখন General Juran Carles organia's-এর সামরিক শাসন। এই সামরিক শাসনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশী হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ফলে 'আর্জেন্টিনা-স্টেট ইউনিভারসিটি', 'লাপ্লাটা বিশ্ববিদ্যালয়', 'বুয়েন্স বিশ্ব বিদ্যালয়'-সহ করডোবা (Cordoba), বুয়েন্স এ্যায়ার্স (Buenos Aires), সেন জুয়ান (Sen Juan), সানটা-ফি (Santa-Fe), কোরিয়েন্টস (Corrientes) প্রভৃতি স্থানে ছাত্র-অধ্যাপক মিলিতভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে। Argentine University Federation প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ এইসব ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতদসত্ত্বেও ছাত্র ধর্মঘট, অবরোধ বিক্ষোভ সমাবেশে আর্জেন্টিনার বিরাট অঞ্চল উত্তাল হয়ে ওঠে। গ্রেপ্তার, টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ করেও ছাত্র-অধ্যাপকদের মিলিত আন্দোলনকে দমন করা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই ছাত্ররা পুলিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। ছাত্র-অধ্যাপকদের এই মিলিত আন্দোলন শেষ পর্যায়ে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

ব্রাজিল

ব্রাজিলে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ছাত্র বিদ্রোহ এই দেশেব ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৬৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে এই ছাত্র বিদ্রোহ তীব্র রূপ ধারণা করে। একনায়কত্বের অবসানের দাবিতে রাজপথে, রাস্তায় সংগ্রামী ছাত্ররা বিরাট বিরাট বিক্ষোভে মিছিল বের করে। সরকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২৩শে সেপ্টেম্বর Rio de Janeiro, Sao paulo, Belo Horizonte প্রভৃতি স্থানে ছাত্র বিক্ষোভ এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষ তীব্ররূপ নেয়। এইসব ঘটনা ব্রাজিলের জনমনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল।

ইরান

ইরান প্রধান ছাত্র সংগঠনের নাম 'CIS' বা 'Confedaration of Iranian Students'। এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন Mr. Poumohdi। ইরান সরকারের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগে Mr Poumohdi-কে করা হলো কারারুদ্ধ। তাঁর মুক্তির দাবিতে ইরানের ছাত্রসমাজ প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললো। 'CIS'-এর নেতৃত্বে ১৯৬৬ -র ৬ সেপ্টেম্বরের প্রতিবাদ বিক্ষোভ ইরানের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পুয়ার্তো-রিকো

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামরত ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মার্কিন ঘাটিতে সৈন্যবাহিনিতে যোগদানের জন্য পুয়ার্তো-রিকো-র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাধ্য করাতে মার্কিন সরকার দীর্ঘদিন ধরে জোর জবরদস্তি চালায়। সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের এই জুলুমের বিরুদ্ধে পুয়ার্তো-রিকো বিশ্ব বিদ্যালয়ে ছাত্ররা এক দশক ধরে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়েছিল।

তুরস্ক

তুরস্কে মার্কিন সৈন্যবাহিনির উপস্থিতির প্রতিবাদে তুরস্কের ছাত্র সমাজ রাজপথে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। ১৯০৬৬-র ১২ নভেম্বর এইরূপ একটি বিক্ষোভ মিছিলের মুখোমুখি পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে এবং এরপর সারা তুরস্কে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

সিঙ্গাপুর

১৯৬৬-র ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল। এক্ষেত্রেও পুলিশের সাথে বিক্ষোভরত ছাত্রদের সংঘর্ষের ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আরও অনেক দেশে : লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সহ বহু দেশেই ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরনের ছাত্র আন্দোলনের বহু ঘটনা ঘটেছিল। কোথাও দেশের একনায়কত্বর বিরুদ্ধে, কোথাও শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, অথবা কোথাও সাম্রাজ্যবাদী জুলুমের বিরুদ্ধে। এইসব দেশের মধ্যে পেরু, তুজেলু (Trujello), সেন মার্কস, চিলি, ইকোয়ুডোর, পালাসা, ভেনেজুয়ালা, মেক্সিকো, ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ রোডেশিয়া, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৩]

ষাটের দশকে পৃথিবীর উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির ছাত্র আন্দোলন অথবা ছাত্রবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত দিক একরকম ছিল না। উন্নতদেশের ছাত্রসমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও উন্নত ব্যবস্থা, মানবতার বিভিন্ন দিক এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। আর অনুন্নত দেশের ছাত্র আন্দোলন বা বিদ্রোহের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীসহ জনসাধারণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থার প্রয়োজনকেন্দ্রিক এবং তার সাথে যুক্ত ছিল শিক্ষা জীবনে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার চাহিদা মেটনোর দাবি।

পৃথিবীর ছাত্র আন্দোলন-বিক্ষোভ বিদ্রোহের এইসব বৈশিষ্ট্য গুণগত দিক বা ইস্যুগুলির বিস্তারিত খবরাখবর ভারতের ছাত্র সমাজের কাছে না পৌঁছালেও পৃথিবীব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের মূল স্রোত (বিশ্ব ছাত্র আন্দোলনের) ভারতকে স্পর্শ করেছিল নিঃসন্দেহে। এই মূলস্রোতের ফল্গুধারায় নানা মতের রাজনৈতিক উপাদানও মিশ্রিত ছিল। বিশ্ব ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক উপাদান ভারতের ছাত্র সমাজের গণচেতনায় ১৯৬০-এর পরবর্তী সময়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। অর্থাৎ ছাত্র মানসিকতায় রাজনৈতিক চিন্তার সংঘাতকে তীব্র করে।

(৩) পঞ্চাশের দশকের গতানুগতিকতা বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা :

প্রত্যক্ষভাবে দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগ অবসানের পর ভারতের ছাত্র আন্দোলন কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে—এই চিন্তার দ্বন্দ্ব ছাড়াও শুধুমাত্র স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলনেই নয়, জনগণের বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণের প্রশ্ন, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে ছাত্রদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণের বিষয় ইত্যাদি নিয়ে যে সামগ্রিক চিন্তার সংঘাত শুরু হয়েছিল তা ভারতের ছাত্র আন্দোলনকে প্রায় এক দশকের উপরে গতানুগতিকতার গন্ডীতে বেঁধে রাখে। ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে এই গতানুগতিকতাই এক ধরনের অচলায়তন। এর স্থায়িত্ব গোটা পঞ্চাশ দশক জুড়েই ছিল, তা অনেকেরই অনুমান।

ভারতের ছাত্র আন্দোলনের এই গতানুগতিকতা এবং অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র সমাজের মনে, ভাবনা-চিন্তায় এক প্রতিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠে। প্রতিবাদী মানসিকতায় বিশ্ব ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক উপাদান এসে যুক্ত হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের অভ্যন্তরে এই প্রতিবাদী মানসিকতা ক্রমান্বয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে খুলে যায় ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ষাট-উত্তর নতুন মাত্রার উৎস মুখ।

(৪) বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র বিক্ষোভ :

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উপাদানগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ষাট-উত্তর ভারতের ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন গতিপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয় বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র বিক্ষোভ ও সংগ্রাম। ষাটের দশকের পটভূমিতে ভারতের ছাত্র আন্দোলনে শুরু হয় এক নতুন জঙ্গী অধ্যায়ের।

(৫) দেশের সামগ্রিক সংকটজনক পরিস্থিতি :

১৯৬০-এর সময়ে এবং তার পরবর্তী সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে সংকটের দিকে এগুতে থাকে। দেশ জুড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম উর্দ্ধগতি,

কালোবাজারী, মজুতদারী, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়গুলি জনজীবনকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। এর-ই পরিণতিতে ভারতের সব রাজ্যে গণ-বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। কংগ্রেস দলের শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিভিন্ন পর্যায়ের গণআন্দোলন। শাসকগোষ্ঠী বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি এই গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ফলে অর্থনৈতিক সংকট প্রতিরোধে গণ-আন্দোলন আরও শক্তিশালী রূপ নেয়।

তথ্যসূত্র :

১। Radhakrishanan commission Report on University Education (1948), PP. 374-375 & 377. [আলোচ্য অংশটি Dr. S. N. Sarker লিখিত "Student unrest : A socio-psychological study" বই-এর ১৮২, ১৮৩ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।]

২। Dr. S.N.Sarker এর উপরেল্লিখিত বই -এর ১২৩ পৃষ্ঠা।

৩। ঐ। পৃষ্ঠা, ১২২।

৪। ঐ। পৃষ্ঠা, ১২২।

৫। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন 'সপ্তদশ সম্মেলন' : শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে কার্যনির্বাহক কমিটির খসড়া প্রস্তাব : ৮,৯,১০ ই আগস্ট। ১৯৬৪, কলিকাতা পৃষ্ঠা - ২।

৬। ঐ। পৃষ্ঠা, ২,৩,৪।

৭। ঐ। পৃষ্ঠা, ৮।

৮। ঐ। পৃষ্ঠা, ৮।

৯। ঐ। পৃষ্ঠা. ৭, ৮।

১০। Dr. S.N.Sarker-এর Student unrest... বই-এর ১৬৮ পৃষ্ঠায়।

১১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের খসড়া প্রস্তাবের [পাদটীকা নং ৫]

১২। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। পৃষ্ঠা ২৫,২৬।

১৩। Dr.S.N.Sarkar লিখিত "Student unrest : A socio - psychoogial study"-বই এর ১৮ থেকে ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিবরণ থেকে সংগৃহীত।

ষাট-উত্তর ছাত্র আন্দোলনের চরিত্রায়ণ ও বিভাজন

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সুদীর্ঘ। এই সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উত্থান-পতনও অনেক ঘটনাবহুল। বিশেষ করে ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে এইসব রাজনৈতিক ভাবাদর্শ রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতের জনগণের সামনে উত্থাপিত হয়েছে। জনগণও তাঁদের চিন্তা-চেতনা মত বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি নিজেদের সমর্থন জানিয়েছেন এবং সাড়া দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে দেশের ছাত্র-যুব সমাজও জনগণের অংশ হিসাবে ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মতাদর্শ অনুসারে সাংগঠনিকভাবে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই

আগস্টের আগেকার বছরগুলিতে ভারতের রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির এবং তাদের গণসংগঠনগুলির চরিত্র জনসমক্ষে এইভাবেই ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ অনুসারে পরিস্ফুট হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কোন ঐক্যবদ্ধ রূপ ছিল না।

তাই, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পরে ভারতের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ঐ আগেকার পরিস্থিতি অনুসারে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। গড়ে ওঠে ১৯৪৭ পূর্ববর্তি গতানুগতিকতার পরিমন্ডল। কিন্তু নানা ধরণের ঘটনার সংঘাতে বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক সংকটের পটভূমিতে ষাটের দশকের শুরুতে এই গতানুগতিকতার গতিমুখ ভাটার টানের পরিবর্তে যখন উজানটানের দিকে মুখ ফেরাল, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবর্তে ভারতের ছাত্র সংগঠনগুলির চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়। সামগ্রিকভাবে ছাত্র আন্দোলনে ষাটের দশকে ছাত্র সংগঠনগুলির স্বরূপ ও চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগঠনগুলির রাজনৈতিক ভাবাদর্শ আর অন্তরালে চাপা থাকলো না। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি বিন্যাসের অনুগামী হয়ে উঠলো ছাত্র সংগঠনগুলি।

রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি বিন্যাসের প্রতি আনুগত্য অনুসারে ঐতিহাসিক কারণেই ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনেরও চরিত্রগত বিভাজন প্রয়োজন। এই বিভাজন অবশ্যই ঐতিহাসিক তথ্য সাপেক্ষ।

বিষয়গত এবং বস্তুগত তথ্যানুসারে ষাটের দশকের ভারতের ছাত্র আন্দোলনকে রাজনীতিগতভাবে নিম্নরূপে চরিত্রায়ণ ও বিভাজন করা যেতে পারে। যথা— (ক) কমিউনিস্ট - মতাদর্শ প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলন; (খ) অকমিউনিস্ট বামপন্থীদের প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলন; (গ) উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহ সহ সার্বিক-দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার অনুগামী ছাত্র আন্দোলন।

এই বিভাজনগুলিকে ঘিরে রয়েছে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ অসংখ্য ঘটনার বিবরণ। যা নিয়ে এক একটি পৃথক-পৃথক অধ্যায় সূচিত হতে পারে। আলোচ্য এই পুস্তকে সেজন্যই পৃথক পৃথক অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ সহ আলোচনারে সূত্রপাত হয়েছে।

কিন্তু, এই চরিত্রানুগ বিভাজন সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে প্রবেশের পূর্বে ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ষাট দশকের ইতিহাসে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও সংশ্লিষ্ট। এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি হল—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বা রাজ্যে কারো মতে ছাত্র বিক্ষোভ, কারো মতে ছাত্র অসন্তোষ কিংবা কারো মতে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা (Student unrest)-র সূচনা। এই অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে উক্ত বিষয় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সারবস্তুতে প্রবেশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে উত্তাল ছাত্র বিক্ষেভের সূচনা

১৯৬০-এর পরবর্তী সময়ে ভারতের ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামী চরিত্রকে ভারত সরকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এর বাস্তবতা ভিন্নরূপ।

ছাত্র সমাজ ভিন্ন অর্থে যুব সমাজেরও অংশ। একজন ছাত্রের জীবনে যুবক হিসাবে যৌবনধর্মী আচরণ স্বাভাবিক। একদিকে ছাত্র, অপরদিকে যুবক—প্রান্তিক জীবনের একটি

বিশেষ সন্ধিক্ষণ। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা, জীবনের চলমান সময়ে বহুবিধ প্রয়োজনীয় চাহিদা এবং নিজেকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে সামাজিক ও শিক্ষামূলক চাহিদাগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি একক হিসেবে একজন ছাত্রকে ঘিরে থাকে। একক ছাত্র জীবনের চাহিদাগুলি সমষ্টিগত চাহিদায় রূপান্তরিত হয়ে ছাত্র সমাজের চাহিদা ও দাবিতে পরিণত হয় খুব দ্রুততার সাথে। কারণ, ছাত্ররা একই সঙ্গে এমনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, পড়া-শুনা, মেলা-মেশা, ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান করার সুযোগ লাভ করে। এর পরিণতিতে ছাত্র জীবনের ঐক্যবদ্ধতা এবং গোষ্ঠীবদ্ধতা গড়ে ওঠে অতি সহজে। ঐক্যবদ্ধ ও গোষ্ঠীবদ্ধ ছাত্র সমাজের সমষ্টিগত চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি অবহেলিত হলে, পূরণ না হলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ, অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হয়। এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ এবং অসন্তোষ-এর বহিঃপ্রকাশ হলেই তা বিক্ষোভে পরিণত হয়ে আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আন্দোলনও যত তীব্রতার দিকে এগোবে, ততই তা বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে সংগ্রামী বা জঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। ভারত সরকার এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ১৯৬০-এর পরবর্তী সময়ের ছাত্র আন্দোলনের এইরূপ একটি স্তরকেই 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' নামে অভিহিত করেছে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের একাংশ এবং রাজনৈতিক দলগুলিরও একাংশ সরকার এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মতামতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু বিপরীতে যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করতেন, তাঁরা কখনো এই সময়কার ছাত্র আন্দোলনের এই স্তরকে 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' রূপে মেনে নেয়নি। বরং তারা সব সময় এর প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদীরা ছাত্র আন্দেলনের এই স্তরকে অভিহিত করেছেন 'ছাত্র বিক্ষোভ' বা 'ছাত্র অসন্তোষ' রূপে।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই স্মরণীয়, ছাত্র অসন্তোষ এবং ছাত্র বিক্ষোভ শুধুমাত্র বর্তমান আধুনিক যুগের বিষয়বস্তু নয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশ অনুসারে প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও ছাত্র বিক্ষোভের নজির বা উদাহরণ রয়েছে। 'ছাত্রানাং অধ্যয়ন তপঃ'-এর যুগে ছাত্র অর্থে গুরু গৃহে অধ্যয়নরত বা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণরত শিষ্যদের [Disciples] বোঝাত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কিংবা বেদ-বেদান্তচর্চার সময়ে গুরু [Teachers] এবং শিষ্যের [Disciples] বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়। গবেষকরা অনেকেই এই বিষয় নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছেন।

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ব [Psychology] বিভাগের রিডার S.N.Sarkar ভারতের 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তাঁর এই গবেষণালব্ধ কাজের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে "Student Unrest : A Socio-phychological Study" নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, সে পুস্তকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছাত্রবিক্ষোভের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকের পরিবেশিত তথ্য অনুসারে, প্রথম-দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে "মহাবৈশ্য" গ্রন্থে পাতঞ্জলী অনেকগুলি ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনার উল্লেখ করেছেন, পানিনীর আশ্রমের ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের চেয়ে তাঁদের খাদ্য সংস্থানে বিশেষ উৎসাহী ছিল; অনেক ছাত্র আবার ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশার আকাঙ্খায় দক্ষের আশ্রমে [যে আশ্রমে ছাত্রী অর্থাৎ 'কুমারী দক্ষ'রা থাকতো] যোগদান করতো; ভাল 'ঘৃত' পাওয়ার আশায় অনেক ছাত্র আবার রোধীর [Rudhir] আশ্রমে চলে যেত— যাদের পাতঞ্জলী 'ঘৃত রোধীরা' [Ghrita-Rudhira] বলে অভিহিত করেছেন; পানিনীর মতে 'খাট-আরুহা' [Khatwa-Aruha] নামে এক ধরনের অলস ছাত্র ছিল যারা ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতো। তাছাড়া পানিনীর

মতে এরকম অনেক ছাত্র ছিল, যারা মাঝে মধ্যেই গুরু এবং আশ্রম পাল্টাতো এবং এদের বলা হতো 'তীর্থ-কাক' [Tirtha-Kaka]— ছাত্রদের এইসব আচরণের ফলে দেখা দিত ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা।

এথেন্সের সেই মহান শিক্ষাবিদ সক্রেতিসের মতানুসারে ছাত্র অসন্তোষ সারা বিশ্বব্যাপী এক পুরানো দীর্ঘদিনের সমস্যা এবং এই সমস্যার মাত্রা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণের 'অযোধ্যা কান্ডে' এমন অনেক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে, যারা আশ্রমের নিয়মনীতি মানতেন না। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ভবভূতি রচিত 'উত্তর রামচরিত্রম' গ্রন্থে 'সৌদ্ধতাকি' [Saodhataki] নামে বিক্ষুব্ধ ছাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই সব তথ্য থেকে বলা যায়, ছাত্র অসন্তোষ বা ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে তদানিন্তন সমাজের অনেক ধরণের সামাজিক কারণ সম্পৃক্ত। ভারতীয় প্রাচীন সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ প্রাধান্য-গুরু বা শিক্ষক কুলের আচার আচরণ, ছাত্রদের প্রতি তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহার, ঘৃণা, উপেক্ষা প্রভৃতি কালক্রমে বর্ণবিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম দেয়— যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র বিক্ষোভের অঙ্কুরোদগমে ছিল সহায়ক। এইভাবেই প্রাচীন ও মধ্য যুগের কালপ্রবাহ ধরে ভারতসহ পৃথিবীর সবদেশেই যুগগত পরিস্থিতি অনুসারে ছাত্র বিক্ষোভ চলে এসেছে। আধুনিক যুগে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সাথে শাসক বা শাসনযন্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কিত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়গত দিকগুলিও বেশি বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং ছাত্র বিক্ষোভের বাস্তবতা বর্তমান যুগে আরও জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক ভারতের ছাত্র বিক্ষোভের মূল উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল ছাত্র বিক্ষোভের যৌথ উপাদান। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের ছাত্র-যুব সমাজের জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশের জন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেনি। তারা ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ভারতে চালু রাখার স্বার্থে। ১৩৮৫ সালে 'বেন্টিংক প্রস্তাব' এবং তারপর 'ম্যকলে রিপোর্ট' ঐ একই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।[১]

ব্রিটিশ শাসকরা যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে তার আর একটি তথ্যানুসন্ধানী আলোচনা ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষা ও চিন্তাবিদ K.M.Panikar-এর "Asia and Western Dominance" পুস্তকের প্রসঙ্গিক বিষয়ে পাওয়া যাবে।[২]

ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতের স্বদেশীয় শাসক গোষ্ঠী বা শাসককেরা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। স্বাধীনদেশের ছাত্র সমাজকে দেশ গঠনের কাজে এবং নিজের ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে ভারসাম্য যুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন—তা ভারতে সুদুর পরাহত। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর উপরেই যে শিক্ষাব্যবস্থার উপরিকাঠামো চাপান হয়েছে, সে উপরি কাঠামোও স্বাধীনদেশের ছাত্র সমাজের শিক্ষা জীবনের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যার সমাধান এবং যুগোপযোগী চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। তাই ক্রমান্বয়ে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৫০, ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ ভারতের ছাত্র সমাজের মানসিকতায়

হতাশা, ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়েছে। এই পুঞ্জিভূত হতাশা, ক্ষোভ ঘনীভূত হতে হতে ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের ছাত্র বিক্ষোভ-বিদ্রোহের পারিপার্শ্বিকতা ভারতের ছাত্র সমাজকে আলোড়িত করে। উপরন্তু যুক্ত হয় ভারতের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিশেষ করে এই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াপন্থী ক্রিয়াকলাপও ছিল বিদ্যমান। ছাত্র-যুব সমাজের পক্ষে এই সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে দুরে অবস্থান করা বা বিচ্ছিন্ন থাকা ছিল অসম্ভব। শুধুমাত্র ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছাত্ররা প্রান্তিক মানুষ হিসাবে নিজ-নিজ দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে নিজেদের চিন্তাভাবনা, মতাদর্শ অনুসারে বর্তমান যুগে বেশি বেশি করে যুক্ত হচ্ছে। ১৯৪৭-এর আগস্ট থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত কেন্দ্রে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস দলের প্রায় একচেটিয়া শাসন ছিল। দীর্ঘ প্রলম্বিত এই কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে বিক্ষোভ ছিল ক্রমবর্ধমান। অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলি [বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী নির্বিশেষে] কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় সব রাজ্যেই একদিকে গণ-আন্দোলন এবং অপরদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫৯-৬০ সালে বিভিন্ন রাজ্যের এই গণ-আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে। কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত প্রভৃতি জনগণের বিভিন্ন অংশের সাথে ছাত্র-যুব সমাজও সক্রিয়ভাবে নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে এই গণ-আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হতে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির ছাত্র ইউনিয়নগুলি বহুক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ঘাঁটি বা কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। যে রাজনৈতিক মতবাদের অনুসারি ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনা করে, সাধারণত সে ছাত্র সংগঠনের প্রধানই সে-সে শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি শিক্ষাগত সমস্যা সমাধানের আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপে ঐ সময়ে যখনই যুক্ত হয়েছে, তখনই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়েছে উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভ।

সরকারী প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভকে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে সরলীকরণ করেছেন। ১৯৬০ এবং ১৯৬০ পরবর্তী ছাত্র বিক্ষোভকে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভের চরিত্রায়ন হবে ভিন্নরূপ। অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ক্রমবর্ধমান ছাত্র বিক্ষোভ দেশের গণ-আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং গণ-বিক্ষোভের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবার দাবি রাখে। যার লক্ষ্য বিভিন্ন ধরনের। যেমন কোন লক্ষ্য সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কোন লক্ষ্য চালু রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করণ, ভিন্ন লক্ষ্য বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই শাসন ক্ষমতা দখলকরণ।

এই বর্ণিত লক্ষ্যগুলি ভেবে যখন ছাত্ররা নিজ নিজ সংগঠনের নেতৃত্বে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে, তখন অনেকেই ছাত্রদের এই কার্যকলাপকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন ছাত্র বিক্ষোভ 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' ছাড়া আর কিছু নয়।

ছাত্র বিক্ষোভ এবং 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা'-র ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও

গোষ্ঠীগুলি জাতীয় কংগ্রেস, বিভিন্ন নামে অভিহিত সোসালিস্ট পার্টি এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, সাম্প্রদায়িক দল— মুসলিম লীগ, জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলের পারস্পরিক মত পার্থক্য সে সময়ে অত্যন্ত ব্যাপক। কোন রাজনৈতিক দল 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার' যুক্তি মেনেছেন, আবার কোন রাজনৈতিক দল তা আগে মানতে পারেনি। আর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রায় ব্রিটিশ আমলের শাসকদের মতই। ছাত্র-বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলনকে গভর্নমেন্ট সব সময়ই ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল বলেই মনে করেছে।

এতদসত্ত্বেও কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ষাটের দশকের সূচনা পর্ব থেকে ছাত্র বিক্ষোভ উত্তাল রূপ ধারণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

পশ্চিমবঙ্গ

ষাটের দশকে শুরু হবার প্রাক্কালে ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট কলকাতা সহ সারা রাজ্যে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন এবং পুলিশের গুলিতে ৮০জন শহিদের আত্মবলীদান গোটা ভারতকে নাড়া দিয়েছিল। এই পুস্তকের পূর্ববর্তী বিবরণে বলা হয়েছে— ১৯৫৯-এর ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের অংশগ্রহণই নয়, এই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে ছাত্র সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরব উজ্জ্বল। ১৯৫৯-এর স্মৃতি ম্লান না হতেই এলো ১৯৬০ সাল। পশ্চিম বাংলার ছাত্রসমাজ ১৯৫৯-এর সংগ্রামী মেজাজে উদ্দীপিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্যের প্রায় সমস্ত কলেজে ছাত্ররা তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক সমস্যা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংগ্রামী আন্দোলন সংগঠিত করতে এবং পঞ্চাশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অচলায়তন ভাঙতে শুরু করলেন। স্কুলের ছাত্ররা ও বিভিন্ন জেলায় তাঁদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন। ছাত্রবিক্ষোভ দানা বাঁধতে লাগলো। যুক্ত হলো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন কর্মধারা। পশ্চিমবাংলা উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের এক প্রথম সারির ঘাঁটি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। আন্দোলনের গতিপ্রবাহ এগুতে লাগলো ১৯৬৪-৬৫-৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭০-৭১-এর দিকে।

[পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনের এই সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এই বই-এর বিভিন্ন অংশে ও অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে। তাই এই পরিচ্ছেদে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গের বিবরণকে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর করা হয়েছে। — লেখক]

বিহার

বিহার রাজ্যের ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তরাধিকারী। বিহারের ষাট দশকের পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিকে বুঝতে হলে বিহারের ছাত্র আন্দোলনের উত্তরাধিকারীকে স্মরণ করা প্রয়োজন। ১৯০৬ সাল থেকে 'বিহারী ছাত্র কনফারেন্স' ছাত্রদের সংগঠন হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। 'বিহারী ছাত্র সংগঠনে'র সক্রিয় ভূমিকা ছিল ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত। তারপর, জাতীয় স্তরে ছাত্র সংগঠন তৈরি হবার পরে

বিহারের ছাত্র সমাজ জাতীয় স্তরের ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে মূলত ছাত্র আন্দোলন ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিহারের ছাত্রসমাজ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সালের ১১ই আগস্ট বিহারে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এইদিন বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর গোর্খা মিলিটারী পুলিশ ১৩ থেকে ১৪ রাউণ্ড গুলি চালালে ৭ জন ছাত্র নিহত হন এবং প্রায় ২৫ জন ছাত্র আহত হন। এই ৭ জন ছাত্র শহিদের আত্মদানের ঘটনার ঐতিহ্যকে বহন করেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও বিহারের ছাত্রসমাজ নিজ নিজ মতাদর্শ ও ভাবনা-চিন্তা অনুসারে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে বিহার রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্র বিক্ষোভ ক্রমান্বয়ে জঙ্গীরূপ ধারণ করে। এই ইস্যুগুলি জনগণের কোন অংশের পক্ষে ছিল গ্রহণীয়, বিপরীতে অন্য অংশের মতে বর্জনীয়।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাগলপুর টি.এন.বি. কলেজের কর্তৃপক্ষের সাথে কলেজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয় এবং পরিণামে সংঘর্ষও ঘটে।

'সরকারী ভাষা (সংশোধনী) বিল' [The Official Languages (Amendment Bill)]-কে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। বিশেষ করে এই বিক্ষোভ ছিল বিহার রাজ্যে হিন্দি ভাষার সপক্ষে। ছাত্র বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থল ছিল পাটনা, রাঁচী, মুজাফফরপুর।

১৯৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মুজাফফরপুরে মূলত ইংরাজি ভাষার বিরুদ্ধে হিন্দি ভাষার সমর্থনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। পাটনাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যাঁদের ইংরাজি ভাষায় লেখা 'নামের ফলক' বা 'সাইনবোর্ড' ছিল, তাঁদের মধ্যে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক দেখা দেয়। লঙ্গত সিং কলেজের (Langat Singh College) ছাত্ররা দাবি তোলে—একমাত্র হিন্দির মাধ্যমে পড়াশুনা চালাতে হবে।

রাঁচী ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ছাত্ররা তাঁদের নিজস্ব শিক্ষাগত দাবি নিয়ে এই সময় ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ, সমাবেশ ইত্যাদি মারফৎ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারীং ছাত্রদের আন্দোলন ১৯৬৩ সালে রাঁচী সহ বিহারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে হাজারীবাগ, ছাপড়া এবং পাটনাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের শিক্ষাগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হলে, তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই জঙ্গী ছাত্র বিক্ষোভকে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা রূপেই চিহ্নিত করেছিল।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তর প্রদেশের গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ব্যতিরেকে প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র বিক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল 'সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল'।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে 'সরকারি ভাষা' (সংশোধনী) বিল ব্যতিরেকে অন্যসব ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা প্রধানত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি ও অভিযোগের ভিত্তিতে বেনারসের (বারানসী) আইন পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি ছিল—৩ বছরের শিক্ষাবর্ষ চালু করতে হবে। এই দাবির ভিত্তিতে

বহু কলেজের অধ্যক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘেরাও করে আটক রেখেছিল এবং এর ফলে পুলিশী হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৮ সালের পূর্ব থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র বিক্ষোভের ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬০ সালের পরেও দীর্ঘদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থা চলেছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র বিক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড। এইখানেও ছাত্রদের সাথে শিক্ষা ও সরকারি কর্তৃপক্ষের তীব্র সংঘর্ষ ঘটে।

১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ-এর অসংখ্য ছাত্র 'সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল'-এর বিরুদ্ধে এক তুমুল বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকঘরে আগুন ধরালে পুলিশের সাথে বিক্ষোভরত ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে। অনেক ছাত্র এবং পুলিশ আহত হয়। উত্তরপ্রদেশের ছাত্র বিক্ষোভের প্রধান কেন্দ্র ছিল বারানসী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর।

দিল্লি

দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররাও এই সময় পিছিয়ে ছিল না। বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলনের স্পর্শ লেগেছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে ইঞ্জিনিয়ারীং ছাত্রদের দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার বিক্ষোভ ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাঁচী সহ বিহারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারীং পঠন-পাঠনরত ছাত্র-ছাত্রীরা দিল্লির ইঞ্জিনিয়ারীং ছাত্রদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং বারবার একযোগে ছাত্র ধর্মঘটে সামিল হয়।

রাজস্থান

রাজস্থানের ছাত্র-যুবসমাজ একযোগে এই রাজ্যের পরীক্ষা পদ্ধতি [Prevailing System of Education] পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাজস্থানের ষাট দশকে ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল উদয়পুর।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের অমৃতসর-ই ছিল ১৯৬০ পরবর্তী সময়ের ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা আরও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্রদের জন্য আরও বেশি সুযোগ-সুবিধার দাবিতে সংগ্রাম শুরু করেন।

(পাঞ্জাবের ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও কিছু আলোকপাত করা হয়েছে।— লেখক)

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলন ছিল 'সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল' কেন্দ্রিক। বিহার-উত্তরপ্রদেশ-এর মত মধ্যপ্রদেশের ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল— হিন্দি ভাষাকে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করা। উজ্জয়িনী শহরকে কেন্দ্র করেই এই ইস্যুকেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন মধ্যপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তামিলনাড়ু

উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল'-কে কেন্দ্র করে হিন্দি ভাষার সমর্থনে যে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল, তেমনি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে গড়ে উঠেছিল হিন্দি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন-বিক্ষোভ। তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজ-ই ছিল হিন্দি ভাষা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫ দিন ধরে মাদ্রাজ শহরে হিন্দি-বিরোধী তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ চলেছিল। ২২শে ডিসেম্বর চূড়ান্ত রূপ নেয়। ছাত্ররা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রেল স্টেশনে বিভিন্ন ট্রেনে বিক্ষোভরত ছাত্ররা আগুন লাগায়। গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে সন্ত্রাসের আবহাওয়া।

অন্ধ্র প্রদেশ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের সকল স্তরের জনগণ এক গৌরব-উজ্জ্বল সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য 'হায়দারাবাদ স্টেট'-এর জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম আরও গৌরবজনক। বিশাল অন্ধ্রপ্রদেশের পঞ্চাশ দশক ছাত্রসমাজে ঐ গৌরবজনক সংগ্রামগুলির ঐতিহ্যবাহী।

(অন্ধ্রপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক ৫ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে— লেখক)

১৯৬০ সাল থেকে প্রায় একদশক অন্ধ্রপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলন ছিল প্রধানত 'সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল' কেন্দ্রিক। এর ৫ বৎসর পূর্বেও অন্ধ্রে তীব্র ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন [States Reorganisation Commission] নিয়োগ করার পর 'বিশাল অন্ধ্র' গঠনের দাবিতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন [A I S F], 'নিখিল হায়দারাবাদ ছাত্র ইউনিয়ন [A H S U] এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠন জঙ্গী সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলন পরে উত্তাল গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু 'সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল' কেন্দ্রিক আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দিভাষা বিরোধী আন্দোলন। ফলে এই সময়কার আন্দোলনে সকল স্তরের মতে ছাত্রসমাজের সামগ্রিক ঐক্য প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা নিজেদের শিক্ষাগত সমস্যা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সহ অন্ধ্রে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছিল। এই স্তরের আন্দোলনের প্রস্তুতি ওশমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের কিছু কিছু কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সফল হয়েছিল। তেলেগুভাষি ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশই হিন্দি ভাষা বিরোধী আন্দোলনে ছিল উৎসাহী। তবে, অন্ধ্রের তেলেগুভাষি ছাত্রদের আন্দোলন তামিলনাড়ুর মত 'উগ্ররূপ' ধারণ করেনি।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থানে আলোচ্য দশকের ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছিল এইসব রাজ্যের বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত। পার্শবর্তী তামিলনাড়ু, অন্ধ্রের ছাত্র বিক্ষোভের ঢেউ এই রাজ্যগুলিকে স্পর্শ করলেও তা কখনো সংগঠিত রূপ নেয়নি। স্থানীয় ইস্যুর উপরেই এই কয়টি রাজ্যের ছাত্র বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় বিষয় হলো— উত্তর ভারতের ছাত্র বিক্ষোভ ছিল ইংরাজি ভাষার বিরুদ্ধে হিন্দির সপক্ষে [anti English]-এর আর দক্ষিণ ভারতের ছাত্র বিক্ষোভ ছিল হিন্দি বিরোধী-ইংরাজি ভাষার সপক্ষে [anti Hindi-cum-pro-English]।[৩]

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্য

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সব রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এক নয়। বিশেষ করে আগেকার বৃহত্তর আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অংশ নিয়ে যে ছোট ছোট রাজ্যগুলি তৈরি হয়েছে, সেসব রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের স্বাতন্ত্রতা ভিন্নরূপ। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর-এর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত হলেও এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভাবনা চিন্তায় নৈকট্য লক্ষ্যণীয়। এইসব রাজ্যগুলির রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশগত পরিস্থিতি অনুসারে আঞ্চলিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির প্রতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ছাত্র সংগঠনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থন উপেক্ষণীয় নয়। আবার আসামেব প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলির ঝোঁক আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতার প্রতিই বেশি। ত্রিপুরার উপজাতি সমূহের ছাত্র-যুব সমাজের আগ্রহ তাঁদের জাতি গোষ্ঠীগত অধিকার অর্জনের আন্দোলনের দিকে। তাই এই রাজ্যসমূহে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের মূল্যগত চরিত্রে প্রতিফলন ছিল না বললেই চলে এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ঐ সময়কার ছাত্র আন্দোলনের সাথে তুলনামূলক পার্থক্য বিদ্যমান। উত্তর-পূর্ব ভারতের আলোচ্য রাজ্যগুলির ছাত্র আন্দোলনের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রতা পঞ্চাশের দশক থেকে বর্তমান দশক পর্যন্ত মূলত একইভাবে ধারবাহিক। এই জন্যই আলোচ্য রাজ্যসমূহের ছাত্র আন্দোলন ও বিক্ষোভ দমনে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পৃথক দৃষ্টীভঙ্গী গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সরকার আলোচ্য রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন এবং তৎসম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপকে 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা'-র পর্যায়ে বিবেচনা করেনি। রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবেই রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক তথা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মোকাবিলা করেছে।

উপরে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ-ই হলো ভারতে ষাটের দশকের ছাত্র বিক্ষোভ তথা 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলার' একটি চিত্রালেখ্য।

প্রাসঙ্গিকতা

ষাটের দশকের ছাত্র বিক্ষোভ প্রসঙ্গে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রনেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এঁদের অধিকাংশ-ই ছাত্র বিক্ষোভকে 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' পর্যায়ে বিবেচনা করেই মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতে— ভারতের ছাত্ররা সাধারণত 'ছাত্র ইউনিয়ন'-কে তাঁদের 'অভাব-অভিযোগ' জানাবার জন্য দরকষাকষির মঞ্চ রূপে মনে করে। এর ফলে ছাত্র ইউনিয়নগুলি এক বিশেষ ধরনের ট্রেড ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের মতই ছাত্র

ইউনিয়নের পদাধিকারীরা ছাত্রদের পক্ষ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চালায়। এটাও দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে সক্রিয় উদ্যোগ নেয় এবং রাজনৈতিক দলের নির্দ্দেশমত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনী লড়াই হয়ে থাকে। সাধারণত, ইউনিয়নের পদাধিকারীরূপে নির্বাচিত হন তাঁরাই, যাঁরা ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪-৫ বছর ধরে রয়েছেন এবং 'সিনিয়র' ছাত্ররূপে পরিচিত; কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা রয়েছেন, যাঁরা একনাগারে ৮-৯ কিংবা তারও অধিক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছেন। এই 'পেশাদারি' ছাত্রনেতারা প্রায়সই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নবাগত ছাত্রদের ভুলপথে পরিচালিত করার জন্য দায়ী এবং এই ছাত্রনেতারা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছাত্রদের সাথে সম্পর্কহীন 'ছাত্রদের অভাব অভিযোগগুলি তুলে ধরে।[৮]

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রনেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে : "ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার এবং তাঁদের পড়াশুনার অবনতির আরেকটি অন্যতম কারণ, চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়ে গুরুত্ব আরোপ। ছাত্ররা সারা বছর নিজেদের কাজকে অবহেলা করে এবং পরীক্ষার কয়েক মাস আগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এবং ডিগ্রিলাভের জন্য মুখস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।"[৫]

'... বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষা অনেক সময় নৈতিক ও নীতিবোধ থেকে সরে যাচ্ছে। ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কারো নৈতিক মূল্যবোধকে অশ্রদ্ধা করতে হবে। আমাদের রয়েছে এক বিশাল আত্মিক উন্নতির উত্তরাধিকার কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেক সময় এই বিষয়ে সর্তক নয়।"[৬]

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তথাকথিত 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা'-র উপর অনেক গবেষণা করে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। তাছাড়া, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার' কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করেছেন। এইসব প্রচেষ্টার তথ্য ও বিবরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার' জন্য দায়দায়িত্ব ছাত্র সমাজের উপরেই বর্তিয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো বা সরকারি ব্যবস্থাকে দায়ি করা হয়নি। অনুসন্ধান অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। যাকে 'ছাত্র ডচ্ছৃঙ্খলতা' বলা হচ্ছে—তা যে বাস্তবে ছাত্র-আন্দোলনের-ই অংশ। এই অভাববোধ-এর ফলে, বিশেষ করে বাম-গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার অনুগামী এক বিশাল ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ ঐ সরকারি-বেসরকারি তথ্যনুসন্ধানের সাথে বরাবরই দ্বিমত পোষণ করেছেন। (এই বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি তথ্যানুসন্ধানের কিছু সূত্র এই পরিচ্ছেদের তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হলো।— লেখক)[৭]

ভারত সরকারের তৎপরতা

১৯৬০ সাল থেকে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভের চাপে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। ১৯৬৪-৬৫-৬৬ সালে ছাত্র বিক্ষোভের চাপ বৃদ্ধি পায়। পুলিশের দমন-পীড়নকে অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু-তে ছাত্র সমাজ বেপরোয়া। কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত। ১৯৬৬ সালের ৬ই অক্টোবর রাজধানী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দা এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকের উদ্দেশ্য দেশব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের মোকাবিলার উপযোগী পন্থাদি উদ্ভাবন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল

নন্দা ছাড়াও এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি. এস. কোঠারী, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সি. ভি. দেশমুখ, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর প্রাক্তন ডিরেক্টর মেজর জেনারেল বীরেন্দ্র সিং।

আলোচনার বিবরণে জানা যায়, উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনী ও কতিপয় ছাত্রনেতার সাথে আলোচনা করে মেজর জেনারেল বীরেন্দ্র সিং-এর ধারণা হয়েছে— উত্তরপ্রদেশের বর্তমান ছাত্র হাঙ্গামা রাজনীতি প্ররোচিত এবং এর পেছনে আছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

এই বৈঠকের আগেই ভারত সরকার জন-অভিযোগ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিশনার আর. এল. মেটাকে চেয়ারম্যান করে এই বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহুত উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় এই কথাও উঠেছিল যে— অনেক সময় ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগকে কর্তৃপক্ষ পূরণ করেন না। যেমন, বৈঠকে শ্রী দেশমুখ বলেছিলেন : দিল্লির ছাত্রদের কয়েকটি অভিযোগ পূরণ করা হয়নি এবং আইন বিভাগের ছাত্রদের ভর্তি সংক্রান্ত বিরোধটিও অমীমাংসিত রয়েছে।

ইতিমধ্যে সংবাদ সংস্থাগুলির সংবাদ অনুসারে জানা যায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন—এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে উপাচার্যদেব সাথে পরামর্শ করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়—মধ্যপ্রদেশ সরকার উপাচার্যের সাথে আলোচনা না করেই উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ কোঠারী মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

এইভাবে ছাত্রবিক্ষোভ নিরসনের পন্থানুসন্ধানে কার্যত সরকার ও তার উচ্চ কর্তৃপক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু সঠিক কোন পন্থা নির্ধারণ না হওয়াতে ভারত সরকার একে আইন শৃঙ্খলার বিষয় হিসেবে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। এই উচ্চপর্যায়ের কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দা। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন : পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও; দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সি. ভি. দেশমুখ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি. এস. কোঠারী; সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাসন, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর প্রাক্তন ডিরেক্টর মেজর জেনারেল বীরেন্দ্র সিং।

১৯৬৬ সালের ১১ই, ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ছাত্রবিক্ষোভজনিত বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়। এই তিনদিন ব্যাপী বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের আই জি শান্তিপ্রসাদ, মাদ্রাজের আই জি এফ. ভি. আরুল এবং পশ্চিমবঙ্গের আই জি উপানন্দ মুখার্জির পরিবর্তে অতিরিক্ত আই জি শচীন্দ্রমোহন ঘোষ যোগদান করেন। এই বৈঠকে আসলে 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' দমনের নামে ছাত্র আন্দোলন দমনের কৌশল-ই ঠিক হয়েছিল।

এইভাবে সরকারি তৎপরতার ফলশ্রুতি হলো—ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র মিছিল-সমাবেশে ব্যাপক পুলিশী দমননীতি চালুকরণ। শেষ পর্যন্ত সরকারের দমনপীড়ন প্রায় অধিকাংশ

রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মধ্য ষাট দশকে সরকার এবং পুলিশী দমনপীড়ন আন্দোলনরত ছাত্রসমাজকে আরও জঙ্গী পথে ঠেলে দিল। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের জঙ্গী সংগঠন গড়তে বাধ্য হল। গড়ে তুললো দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পন্থা ও কৌশলগত প্রতিরোধ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মধ্য ষাট দশকের ভারতীয় ছাত্র আন্দোলন গতিবেগ পেল। নতুন পরিস্থিতিতে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশকে আলোড়িত করে। ১৯৬৯-৭০ ছাত্র সমাজের এই বিরাট অংশ এই সময়কার জঙ্গী ছাত্র-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, পাঞ্জাব এবং বিহারে গড়ে ওঠে এই জঙ্গী ছাত্রদের ঘাঁটি। শুধু পুলিশ নয়। ছাত্র আন্দোলন দমনে আধা সামরিক বাহিনীকেও উল্লিখিত এইসব রাজ্যে নামাতে সরকার বাধ্য হন। ১৯৬৯-৭০ সালে, অর্থাৎ ষাট দশকের শেষ অঙ্কে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর হাতে কত শত-শত ছাত্র-যুবক খুন হয়েছে, আজ তার হিসাব-নিকাশ কোথাও নেই। ইতিহাসের কালের গর্ভে আজ তা হারিয়ে গেছে।

ভারতের ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের নয়া মাত্রা [New Dimension] এইভাবেই সূচিত হয়েছিল এবং তা বহুমুখী পথে প্রবাহিত হয়ে কোন প্রবাহ হারিয়ে গেছে, কোন প্রবাহ চলমান।

তথ্যসূত্র :

১ Student Unrest : A Socio-phychological Study by S. N. Sarkar, পৃষ্ঠা ৩।

২ ঐ।

৩ ঐ। পৃষ্ঠা ১৫।

৪ ঐ। পৃষ্ঠা ১৪০ [The U.G.C. Report on the Problem of Student Indiscipline in Indian University, P. 10, 1960.]

৫ ঐ। পৃষ্ঠা ১৬০।

৬ ঐ। পৃষ্ঠা ১৭৩।

৭ তথ্যানুসন্ধানেব ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলি সহায়ক হতে পারে

i) Humayan Kabir : (1958) Letters on Indiscipline (preface). Ministry of Ed., Scientific Reserarch, Government of India. Pub.. No. 334.

ii) A Pamphlet entitled "The Unquiet campus" (1960) by Mr. C. Sarkar, the Statesman's representative.

iii) By Mr. S. Sinha 'Problem of Student Unrest' : Indian Journal of Psychology., Vol. XXXVII part 4, 1962.

iv) Dr. Shib Kumar Mitra and A. A. Khatri 'Understanding College Student Problems— A Methodical Paper', B. N. Institutes, Ahmedabad. 1961.

v) Dr. D. D. Karve -- The Universities and the public in India, Minerva, Vol 1, No. 3, Spring 1963.

vi) The U. G. C. Report on the problem of Student Indiscipline in Indian Universities, 1960.

vii) Letter of Pandit Nehru to the Chief Ministers of States on 28th August 1954; ref - Letters on Discipline by H. Kabir : 1958.

সপ্তম অধ্যায়

ষাট-উত্তর কমিউনিস্ট প্রভাবিত ভারতের ছাত্র আন্দোলন

কমিউনিস্ট পার্টিতে ছাত্রফ্রন্টের ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার যুগ থেকে অবিভক্ত ভারতের ছাত্র সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশের গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা রয়েছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি, ছাত্র সমাজের এক অগ্রণী অংশ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং পার্টি গঠনেব ক্ষেত্রে আর এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের অনেকেই সোভিয়েত নভেম্বর বিপ্লব,[১] মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতের ছাত্র আন্দোলনের সূচনা পর্ব যখন মূলত অসংগঠিত, সে অবস্থায় কমিউনিস্ট মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্ররা অসংগঠিত অথবা প্রাদেশিক স্তরের সংগঠনে অংশগ্রহণ করেন। (ভারতের ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রথম যুগের ইতিহাস অংশে এর বর্ণনা রয়েছে।) পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার সাথে সাথে ছাত্রসমাজ থেকে যাঁরা পার্টির সদস্য ও কর্মী হচ্ছেন, তাঁদের পার্টিগত কাজ, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য নির্দেশনের এবং নেতৃত্ব দানের প্রশ্ন আসে। এই বিষয়টি আরও যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গড়ে তোলার সময়ে। 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' একটি সংগঠিত জাতীয় স্তরের ছাত্র সংগঠন রূপে গড়ে ওঠায় কমিউনিস্ট ছাত্রদের কাছে তার সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এবং আন্দোলনগত বিভিন্ন বিষয়ে পার্টিগত পথ-নির্দেশ বা 'গাইড লাইন' ছিল অত্যন্ত জরুরী। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমাবেশ ঘটলেও কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মীদের প্রাধান্য ছিল উল্লেখযোগ্য।

তাই, ১৯৩৬ সাল থেকে ভারতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের সংগঠিত রূপ প্রকৃতপক্ষে সূচিত হয়েছিল বলা যায়। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠনের পরিচালন পদ্ধতি স্মরণযোগ্য।

পৃথিবীর সব দেশের-ই কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি [Methodology] প্রায় একই রকম। শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুব, শিক্ষক সহ জনজীবনের বিভিন্ন অংশের সংগঠনগুলির মতো ছাত্র সংগঠন একটি গণসংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত গণ সংগঠনগুলি-ই কমিউনিস্ট পার্টির গণ সংগঠন রূপে পরিচিত। এই সংগঠনগুলিকে কখনো কখনো পার্টিগত পরিভাষায় 'শ্রমিকফ্রন্ট', 'কৃষকফ্রন্ট', 'ছাত্রফ্রন্ট', 'যুবফ্রন্ট' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পার্টির বিভিন্ন ফ্রন্ট পরিচালনার জন্য নিজ নিজ ফ্রন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়ে গঠন করা হতো 'ফ্রাকসান

কমিটি' অথবা 'সাব কমিটি'। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়স্তরের কোন ফ্রন্ট বা গণ সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সে সব ক্ষেত্রে সাধারণত 'রাজ্য' বা 'কেন্দ্রীয়' সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা স্তরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'ফ্রাকসান কমিটি' গঠন করা হলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ জেলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ছিল। ফ্রাকসান এবং সাব-কমিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি সংগঠনের সর্বোচ্চ কমিটিগুলি একজন আহ্বায়ক নির্বাচন করে দেয়। 'ফ্রাকসান' বা 'সাব কমিটি'-র সদস্য নির্বাচন করে দেবার অধিকারও উচ্চতর কমিটির। এইসব 'সাব-কমিটি' অথবা 'ফ্রাকসান কমিটি'-তে সাধারণত নির্বচিত হয়ে থাকেন গণ-সংগঠনের প্রধান পদাধিকারী (যদি তিনি পার্টি সদস্য হন)। তাছাড়া উচ্চতর কমিটি থেকে একাধিক সদস্যকে মনোনীত করা হয়। গণসংগঠন পরিচালনার জন্য পার্টিগত এই সাংগঠনিক পদ্ধতি কমিউনিস্ট পার্টিতে অনুসৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় 'ছাত্রফ্রন্ট' পরিচালনার জন্য ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত একটি সাব কমিটি ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই সাব কমিটির দায়িত্বে ছিলেন কমরেড পি. সি. যোশী। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের শেষ পার্টি সাব কমিটি পি. সি. যোশী-র নেতৃত্বাধীন ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের বেজোওদায় অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯৬১, এপ্রিল) পর পার্টির সর্বভারতীয় ছাত্রফ্রন্টের ভূমিকা হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ, সামগ্রিকভাবে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের সূচনা পর্বে নতুন পরিস্থিতির আবির্ভাব। নতুন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনও ষাটের দশকে প্রবেশ করে গতানুগতিক প্রবাহকে অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেয়।

সর্বভারতীয় স্তরে পার্টির ছাত্রফ্রন্ট ক্রমান্বয়ে অকেজো হয়ে এলেও কোন কোন রাজ্যের ছাত্রফ্রন্ট ছিল সক্রিয়। রাজ্যস্তরে অন্যতম সক্রিয় ছাত্রফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রফ্রন্ট।

জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে পার্টির ছাত্রফ্রন্টের ভূমিকা সাধারণভাবে কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর বিতর্কিত, বিশ্লেষাত্মক এবং মতান্তর সাপেক্ষ। কিন্তু সাধারণভাবে এই আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে যে মতান্তরের অবকাশ কম, তা হলো— ছাত্রফ্রন্টেব প্রধান ভূমিকা সব সময়ই বিবেচিত হয়েছে গণ-আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির পথে; ছাত্রফ্রন্টকে সব সময় সক্রিয় রাখায়; গণ আন্দোলনে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে গতিবেগ সঞ্চার করায়; ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের পার্টি সংগঠন, শ্রমিকফ্রন্ট, কৃষকফ্রন্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে উন্নতকরণে। ছাত্রফ্রন্টের এই ভূমিকা তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যবে অতীতে এবং বর্তমানে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রফ্রন্ট পরিচালিত ছাত্র আন্দোলন ভারতের গণ আন্দোলনে, বিশেষ করে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনে[২] সময়ে সময়ে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করেছে এবং পার্টি সংগঠন থেকে শুরু করে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টগুলিতে[৩] অসংখ্য দায়িত্বশীল নেতৃত্বের যোগান দিয়েছে। এমন কি ষাটের দশকে এবং তার পরবর্তী দশকেও ছাত্রফ্রন্টের এই ভূমিকা অব্যাহত ছিল।

কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রফ্রন্টের ষাট পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ভূমিকার রাজনৈতিক, সাংগঠনিক তাৎপর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যা, ষাট পরবর্তী সময়ের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বুঝতে সহায়ক। কোন শ্রেণি সংগঠন না হলেও ছাত্রফ্রন্ট কমিউনিস্ট পার্টিতে সব সময় গুরুত্ব লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৭ সালের বিপ্লব-কে পুরানো ক্যালেণ্ডার অনুসারে 'মহান অক্টোবর বিপ্লব' এবং নতুন ক্যালেণ্ডার অনুসারে 'মহান নভেম্বর বিপ্লব' বলা হয়।

২। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বন্দিমুক্তি আন্দোলনে, রেল এবং ডাক-তার কর্মীদের সর্বভারতীয় ধর্মঘটে, নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলন, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন; পাঞ্জাবে ক্যানেলকর বিরোধী আন্দোলন; অন্ধ্রে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুণর্গঠনের দাবিতে আন্দোলনগুলিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রফ্রন্টের অবদান অসামান্য।

৩। এই প্রসঙ্গে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্ব পালন করে যাঁরা পার্টির এবং বিভিন্ন গণফ্রন্টের নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নাম হলো :

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বনাথ মুখার্জি— একাধারে পার্টির নেতা এবং কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। গীতা মুখার্জি— মহিলাফ্রন্টের নেত্রী ও পার্টি নেত্রী। সুশোভন সরকার, চিন্মোহন সেহানবিশ-- বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী। কনক মুখার্জি-- মহিলা নেত্রী ও পার্টি নেত্রী। রমেন ব্যানার্জি— পার্টি সংগঠনের নেতা। **কেরালার** অচ্যুত মেনন পার্টি নেতা এবং রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। **উত্তরপ্রদেশের** এস এম ফারুক্কী— পার্টি নেতা। **মধ্যপ্রদেশের** হোমী দার্জী-- পার্টি নেতা। **বিহারের** গণেশ বিদ্যার্থী-- পার্টি নেতা। এই স্তরের অসংখ্য নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাছাড়া ষাটের দশকের সময় থেকে যাঁরা এইভাবে নেতৃত্বে আসীন হয়েছেন, তাঁদেব মধ্যে অন্যতম হলেন :

সি পি আই (এম)-এর দীনেশ মজুমদার, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য (রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী), শ্যামল চক্রবর্তী (রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য), সুভাষ চক্রবর্তী (রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য), অনিল বিশ্বাস, বিপ্লব দাশগুপ্ত, প্রকাশ কারাত, শিবাজী পট্টনায়ক, সুহাসিনী সায়গল (আলী), সরলা মহেশ্বরী।

সি পি আই-এর গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, কেরালার বাসুদেবন নায়ার (মুখ্যমন্ত্রী, যদিও প্রধানত তিনি যুক্ত ছিলেন যুব আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় পদে, তবু তাঁর সাথে ছাত্র আন্দোলনেরও যোগসূত্র ছিল)।

সি পি আই (এম-এল) এই পার্টি ভেঙে অসংখ্য গ্রুপ গঠিত হয়েছে সত্তর দশকে। এই বিভক্ত পার্টি গ্রুপগুলির সাংগঠনিক নেতৃত্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতৃবৃন্দই আসীন। তাঁদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো— বিনোদ মিশ্র [সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন]; বিনোদ, কৃষ্ণরাও প্রমুখ [ইউ সি সি আর আই (এম এল)]; অসীম চ্যাটার্জী (সি আর এল আই); সন্তোষ রানা [সি পি আই (এম-এল)]; অসিত সিনহা, সুবোধ মিত্র প্রমুখ [সি ও আই (এম-এল)]; প্রদীপ ব্যানার্জী [পি সি সি (সি পি আই-এম-এল)]।

ছাত্রফ্রন্টে আন্তঃপার্টি বিরোধের প্রতিফলন

আগের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্রফ্রন্ট পার্টির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ গণফ্রন্ট। পার্টির অভ্যন্তরের রাজনৈতিক মতাদর্শগত মতবিরোধ ফ্রন্টে এবং গণ সংগঠনে ঘটা অস্বাভাবিক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে রণনীতি এবং রণকৌশলগত প্রশ্নে রাজনৈতিক বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই রাজনৈতিক মত বিরোধ দুই-লাইনের বিরোধ নামে খ্যাত। 'দুই লাইন' অর্থে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' [National Democratic Front = NDF] এবং 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' [Democratic Front = DF]-এর লড়াই। চল্লিশের দশকে এই দুই লাইনের লড়াই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে শুরু হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এবং জাতীয় পরিস্থিতির বিভিন্ন ঘটনা পঞ্চাশের দশকে 'দুই লাইন'-এর লড়াইকে তীব্র করে। ষাটের দশক শুরু হবার সময়েও এই বিরোধের জের বিদ্যমান ছিল।

'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' এবং 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর প্রধান মতপার্থক্যের বিষয় ছিল 'জাতীয় কংগ্রেস' দল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' পন্থীদের বক্তব্য— জাতীয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশসহ জাতীয় বুর্জোয়া এবং দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐকাবদ্ধ ফ্রন্ট গড়তে হবে। 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' পন্থীদের বক্তব্য—জাতীয় কংগ্রেসের কোন অংশের সাথে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়া চলবে না; ফ্রন্ট গঠিত হবে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও বুর্জোয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে বামগণতান্ত্রিক শক্তিসমুহকে নিয়ে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নির্ধারণেও পার্থক্য দেখা দেয়। 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' পন্থীদের মতে বিপ্লবের স্তর 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' এবং 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' পন্থীদের মতে বিপ্লবের স্তর 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই 'দুই লাইন'-কে কেন্দ্র করে কার্যত দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। যখন যে গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়েছে, তখন সে গোষ্ঠীর পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। এইভাবেই দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে '১৯৪৮' এবং '১৯৫১'-এর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮-এ ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন ভুল বলে পরিত্যক্ত হওয়ার পরে ১৯৫১ সালে নতুন পার্টি কর্মসূচি[১] গ্রহণ করা হলো। ১৯৫১ সালে গৃহীত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কিন্তু 'দুই লাইন'-এর বিরোধের অবসান ঘটলো না। বিরোধ প্রকটতর হতে থাকলো। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সব গণফ্রন্টে এই রাজনৈতিক বিরোধ ছড়িয়ে পরেছিল। পার্টির 'দুই লাইন'-এর অনুগামীরা তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সংগঠিত হতে শুরু করেছিলেন। ছাত্রফ্রন্টে এই মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটলো ১৯৫০ সালে। খুবই পরোক্ষভাবে ছাত্রফ্রন্টে এই মতবিরোধের প্রতিফলন ঘটে। মতবিরোধের বিষয়বস্তু ছিল 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' [National Students Union = NUS] গঠন ও তাতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

দেশের স্বাধীনতা অর্জন বা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপর-ই জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশের সমস্ত ছাত্রসংগঠন তুলে দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করে। জাতীয় কংগ্রেসের মতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা এবং পৃথক পৃথক প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে।

জাতীয় কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে ভারতের সমাজতন্ত্রী নেতারা। সমাজতন্ত্রী নেতাদের মধ্যে এই মতের সমর্থক ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অশোক মেহেতা প্রমুখ। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ভি কে কৃষ্ণমেনন। জাতীয় কংগ্রেস এবং সমাজতন্ত্রী নেতাদের অভিমত ছিল— ছাত্র সংগঠনগুলি তুলে দিয়ে

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে একটি জাতীয় মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা হবে। এই ঐক্যবদ্ধ মঞ্চকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হবে এবং তার নাম হবে 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' [National Union of Students = NUS]।

যদিও 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেকবার প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা হয়েছে, তবুও ষাটের দশকের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের মতবিরোধকে লোকায়ত পরিবেশে অনুধাবনের জন্য এই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়েই ১৯৫০ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ছাত্র-প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন থেকে 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' [NUS] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ["During 1950, the Congress and socialist leaders decided to form one central organisation of students based on college unions on a national scale. The National Unions of students (NUS) was formed at a conference in Bombay with the blessings of Pandit Nehru and Jayaprakash Narain."]।[২] ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে বারানসীতে অনুষ্ঠিত NUS-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারানসী সম্মেলন ছিল প্রতিনিধিস্থানীয়। কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত ছাত্র ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিরাই মূলত এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনে ছাত্র সংগঠন তুলে দিয়ে ছাত্র ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৩ সাল থেকে 'NUS'-কে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টে মতবিরোধ প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 'জাতীয় ফ্রন্ট'-এর অনুগামী উচ্চতর নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ 'NUS' গঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। অপরপক্ষে 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' নেতৃবৃন্দ ছিলেন 'NUS' গঠনের বিরোধী। পার্টির ঊর্ধতর নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা ছিলেন মধ্যপন্থী, তাঁরা প্রথম দিকে কার্যত নিরব ছিলেন। পার্টির উচ্চতর নেতৃত্বের মধ্যে এই মতপার্থক্যের পরিণতিতেই পার্টির ছাত্রফ্রন্টের সর্বভারতীয় এবং রাজ্যস্তরের ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্য মতপার্থক্যের প্রতিফলন ব্যাপকতর হতে থাকে। মত পার্থক্য ক্রমান্বয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে দুটি গোষ্ঠীতে চিহ্নিত করে দেয়। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে প্রচার হতে থাকে— এক গোষ্ঠী 'NUS'-এ যোগদানের নামে গণসংগঠন 'ছাত্র ফেডারেশন' তুলে দিয়ে চায়; অপর গোষ্ঠী ছাত্র ফেডারেশন তুলে দেবার বিরোধী এবং 'NUS' গঠনে এবং যোগদানে অনাগ্রহী। কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত মতবিরোধজনিত দ্বন্দ্ব-বিরোধ ষাটের দশকের দিকে এগিয়ে চলে।

১৯৫৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সুনীল সেনগুপ্ত। 'NUS'-কে কেন্দ্র করে পারস্পরিক মতবিরোধ তীব্র হতে থাকলে সুনীল সেনগুপ্ত "জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের পথে ছাত্র ঐক্য" শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখেন। এই পুস্তিকাটির ভূমিকা লিখেছিলেন "নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের" সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন অফিস সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী। এই পুস্তিকার কিছু সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো। উদ্ধৃতিগুলি 'NUS' গঠন সংক্রান্ত বিষয়বস্তুকে বুঝতে সব পক্ষকেই সাহায্য করতে পারে।

দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ মুখপত্র

"এই সমস্ত কথা থেকে একটা কথাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে ছাত্র ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে। আমরা ঐক্য গড়ে তুলতে চাই সমগ্র ছাত্রসমাজের জন্য। তাদের শিক্ষা ও সমগ্র জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তাদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য। ঐক্য আমাদের নীতি হিসাবেই প্রয়োজন, কর্মকৌশল হিসেবে নয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বনিম্ন কর্মসূচি যা সকলে গ্রহণ করতে পারে, যেখানে মতদ্বৈততার অবকাশ সব চাইতে কম সেইখানেই ঐক্য স্থাপিত হয়। সেদিক দিয়ে আজকে কলেজ ইউনিয়ন যে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা করা গেল। ছাত্র সমাজের মনোজগতের বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে, আর সেই পার্থক্য আছে নিজেদের মতবাদ বা আদর্শগত চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে। এবং এই চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই কোন ছাত্র মানসিক দিক দিয়ে কমিউনিজম, সোস্যালিজম বা অন্য কোন রাজনৈতিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়। এরই ফলে কেউ কংগ্রেস, কেউ কমিউনিস্ট, পি এস পি বা অন্য কোন দলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। মতবাদগত পার্থক্য সত্ত্বেও সাধারণ সর্বনিম্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছাত্র আন্দোলনের কাজ। সেই কাজ ইউনিয়নের যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রমাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, মতবাদগত পার্থক্য সাধারণ ছাত্রসমাজের কাছে তুলে ধরার সুযোগও কলেজ ইউনিয়নগুলি অনেক বেশি পরিমাণে দিতে সমর্থ। যেহেতু ছাত্র ইউনিয়নগুলির সাধারণ সভ্য সমস্ত ছাত্র দলমত নির্বিশেষে, সেইজন্য ইউনিয়নে যে কোন মতবাদে বিশ্বাসী ছাত্র যান না কেন, তার পক্ষে ইউনিয়নকে কোন গোঁড়ামির পথে, সাধারণ ছাত্রদের মতের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

নিজের নিজের রাজনৈতিক আর্দশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমেই সুযোগ আছে বিভিন্ন মতামত জ্ঞাপনের বিতর্কসভা, আলোচনা, সিম্পোজিয়াম, প্রাচীর পত্রিকা, ম্যাগাজিন, পাঠচক্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই মাধ্যমে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট যে কোন মতবাদে বিশ্বাসী ছাত্র তার মতকে উপস্থিত করতে পারে, ছাত্র হিসেবে সে স্বাধীনতা তার আছে। সেইজন্যই আমরা দেখতে পাই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিস্ট ছাত্ররা নাম্বুদ্রিপাদকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, আর সেইখানেই রামমনোহর লোহিয়া বা জয়প্রকাশ নারায়ণকে আহ্বান করে এনেছেন অন্য মতাবলম্বী ছাত্রবৃন্দ। এই বিরোধ মতবাদের ইউনিয়ন সকলের, তাই এ চলবে কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এমনকি হয়ত তার পরেও। তারই পাশে সম স্বার্থমূলক কাজের জন্য সেই ছাত্রকে আমরা ইউনিয়নে কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ দেখি।"[৩]

ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংস্থার জন্ম

"এর ফলে আজ ১৭ বছরের চেষ্টায় যেখানে ছাত্র আন্দোলনকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনে সমস্ত ছোটবড় সংগঠনের মিলিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে না সেখানে অনৈক্যের পাশাপাশি ঐক্যের শক্তিও জন্ম নিচ্ছে। শুধুমাত্র বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য মাঝে মাঝে কো-অর্ডিনেশন বা যোগাযোগ সৃষ্টি করেই নয়, ছাত্র আন্দোলন তার ঐতিহ্যা...

ঐক্যের গতিপথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে। জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্রকমিটি। অন্যদিকে তারই পাশাপাশি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদা থেকেই ফ্যাকালটিগতভাবে ছাত্রসংগঠন গড়ে উঠেছে। এইদিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে বর্তমানে ছাত্র আন্দোলনের এই যুগটা নতুন গতিপথের যুগ, নতুন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে ওঠার যুগ। ঐতিহাসিকভাবে এই সত্যকে উপলব্ধি করা দরকার।"[৪]

জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন

"পশ্চিমবাংলার সমগ্র ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন একমাত্র সেই রূপ দিতে সক্ষম। আজ ছাত্র আন্দোলনের সামনে ঐক্যবদ্ধ রূপে জাতীয় ছাত্রইউনিয়ন গড়ে তোলাই প্রধান সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ। আজ যদি আমরা কেউ সে দায়িত্ব অস্বীকার করি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে, তাহলে ছাত্র সমাজের কাছে ঐক্য বিরোধী বলে দোষী হব।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের '৫৭ সালের জুন মাসে দিল্লিতে কার্যকরী সমিতির অধিবেশন এই সত্য অনুধাবন করে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসংগঠনের প্রচেষ্টাকে রূপ দেবার জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পাঁচ বছর আগে হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে ইউনিয়নকে গণতন্ত্রীকরণের যে আহ্বান ছাত্র ফেডারেশন ছাত্র সমাজের সামনে রেখেছিল আজ তা সমগ্র ছাত্র আন্দোলনেব কর্মপ্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের রূপ নিয়েছে। তাই ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের ছাত্র আন্দোলনের গতিপথে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজে হাত লাগাবার ও এদের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টায় ছাত্র ইউনিয়গুলিকে ঐক্যের পথে ঠেলে দেবার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে।

আমরা জানি জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তোলার সপক্ষে যেমন বিরাট শক্তি রয়েছে, তেমনি তার বিরুদ্ধে বাধা আসবে অনেক। ক্ষুদ্র দলগত সঙ্কীর্ণতা, নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্খা, ছোটখাটো তথাকথিত ভয় ও আশংকা পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে।

এই সমস্ত বাধাকে কাটাতে হবে। নিজেদের মুক্ত করতে হবে সঙ্কীর্ণতা থেকে। কোনরকম নেতৃত্ব দখল বা সংগঠনকে নিজেদের হাত করার সমস্ত রকমের চেষ্টা বা ইচ্ছা দমন করে পশ্চিমবাংলার সমস্ত ছাত্র ইউনিয়নকেই মিলিতভাবে নিতে হবে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার দায়িত্ব।"[৫]

সর্বভারতীয় জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন
(হায়দ্রাবাদ বনাম দিল্লি)

"পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে যা গড়ার প্রয়োজন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই কাজটা কিছু এগিয়ে আছে। 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস অব ইণ্ডিয়া' নামে এক সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৮ বছর আগে। সেই সংগঠনে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার চাইতে নেতৃত্বের মধ্যে ছাত্রদের দলে টানার দিকেই বেশি ঝোঁক থাকায়, এর অভ্যন্তরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিহার করা সম্ভব হয়নি। তারই ফলে গত বছর নভেম্বর মাসে[৬] দিল্লি শহরে জাতীয় ছাত্র

ইউনিয়ন থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ বেরিয়ে ছাত্র সম্মেলনের নামে ২০/২২ জন এক সর্বভারতীয় তামাশার অনুষ্ঠান করেন। এরপরে হায়দ্রাবাদ শহরে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের বৃহৎ অংশটির সম্মেলন হয়। দুইটি প্রতিষ্ঠানই নিজেকে সর্বভারতীয় জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন নামে পরিচয় দেওয়াতে ছাত্রদের মধ্যে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা মনে করি, দিল্লির জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন যার মূল শক্তি একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্ভর করছে, সেই সংগঠন প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। যদিও দু-একটা ইউনিয়নের নেতৃত্ব থেকে থাকে তবে তাও অতি সামান্য এবং এই সংগঠন মূলত ইউনিয়নভিত্তিক বলে পরিচয় দিলেও এর কায়দাকানুন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। হায়দ্রাবাদের জাতীয় ছাত্রইউনিয়ন অনেক বেশী প্রতিনিধিমূলক এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিও অনেক। তা সত্ত্বেও জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের সীমাবদ্ধ অবস্থার বাইরে এই সংগঠন কখনই শক্তিশালী হতে পারে না পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যময় সংগঠিত আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে।

পশ্চিমবাংলার সচেতন ছাত্র আন্দোলনের যোগদান জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নকে ছাত্রদের সংগ্রামী ও বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত করবে। পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনের পক্ষেই জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের এই বিরোধকে মীমাংসা করে একটি জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নে পরিণত করা সম্ভব।''[৭]

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতি

''পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের কাছে ঐক্যের পথে জাতীয় ইউনিয়ন গড়ে তোলার আবেদন জানানোর আগে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে আমাদের আবেদন বর্তমান আন্দোলনের এই ধারাকে আপনারা শক্তিশালী করুন। নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সংগঠন দিয়ে জাতীয় ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। তবেই এতদিনের সমস্ত ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, আপনারা এই ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। আপনারাও চান বাংলাদেশে, সমগ্র ভারতবর্ষে ছাত্রদের মিলিত সংগঠন। যে যে কর্মসূচির ভিত্তিতে আপনারা, আমরা সকলে কাজ করি, তার প্রত্যেকটিই সাধারণ ছাত্রের দাবি হলে অবশ্যই ইউনিয়নের মাধ্যমে করা সম্ভব। গত কয়েক বছরে ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেই একথা বোঝা যায়। ইউনিয়নগুলির মধ্যে তার সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক গণতান্ত্রিকতার জন্য ও সমস্ত ছাত্রের সমর্থনের জন্য তার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রয়েছে। মতবাদগত যে পার্থক্য আছে, তা প্রচারের ও প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ইউনিয়নকে ছাত্রদের মিলিত সংগঠনে পরিণত করুন। ক্রমবর্দ্ধমান চেতনাকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবাংলার ও ভারতের ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গড়ার কাজকে শক্তিশালী করুন, ত্বরান্বিত করুন।

পশ্চিমবাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের নিকট আমাদের আবেদন যে, আপনারাই এই কাজে প্রধান শক্তি। অতএব উদ্যোগ আপনাদের কাছ থেকেই

প্রথমত আসা উচিত। আপনাদের কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব আপনাদেরই পালন করতে হবে। আজ যদি এ ঘটনা সম্ভব না হয় তবে আগামীকাল বা পরশু এই সম্ভাবনাও বসে থাকবে না। নেতৃত্বের দলাদলি, বিরোধের বিষাক্ত আবহাওয়া একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় আকাঙ্খাকেও ভেঙ্গে দেবে।

এর জন্যে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন ইউনিয়নগুলিকে রাজনীতির লড়াইয়ের মহড়ার স্থান হিসেবে না দেখে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখুন। দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিচালনার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখুন। এককভাবে ইউনিয়ন দখল বা কর্তৃত্ব করার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করতে হবে। ছাত্রসাধারণের স্বার্থ এক, তাদের কার্যক্রমও এক। মতবাদগত পার্থক্যকে ভিত্তি না করে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে এক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য মূল দায়িত্ব সর্ববৃহৎ সংগঠন হিসাবে আপনাদেরই প্রধানত নিতে হবে। দায়িত্ব আপনাদের অনেক বেশি, তাই সংকীর্ণতা যত কম হয়, ততই আমরা সফলতার দিকে এগিয়ে যাব।

আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজ যারা জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক বড় বড় আন্দোলনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, তাদের সমর্থনে ইতিহাসের এই দিকনির্দেশ অবশ্যই কার্যকরী হবে। তাদের সচেতনতা প্রহরীর মত রক্ষা করবে এই সম্ভাবনাময় জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সংস্থাকে বিভেদের হাত থেকে।তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ত্বরান্বিত করবে পশ্চিমবাংলার ও ভারতের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম আর ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন ধারা জন্মাবে।"[৮]

অন্ধ্রপ্রদেশের কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীদের অনেকেই ছাত্র ফেডারেশনের নিজস্ব অস্তিত্বকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এই ছাত্রকর্মীরা 'NUS'-এর সাথে মিশে যাওয়ার প্রস্তাবকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। 'All Hyderabad Students Union' [AHSU] নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের [AISF] সাথে সমন্বয় রক্ষা করে যুক্ত কর্ম করতো। AHSU এবং AISF পরিচালিত অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন কলেজের ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি দল বারাণসীতে অনুষ্ঠিত (১৯৫৩-জানুয়ারি) 'NUS' সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। অথচ, AISF-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ইউনিট স্বাধীন সংগঠন হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের যুক্ত হতে চেয়েছিল এবং ছাত্র ইউনিয়নগুলি AISF-এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।[৯]

কিন্তু 'NUS' গঠনের পর সাত আট বৎসর অতিবাহিত না হতেই ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে NUS-এ বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। NUS-এর একটি অংশ এই নভেম্বরে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে NUS-এ ভাঙন ধরায়। দিল্লি সম্মেলনে ২০/২২ জন অংশগ্রহণ করেছিল। "এরপরে হায়দ্রাবাদ শহরে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের বৃহৎ অংশটির সম্মেলন হয়।" এইভাবে NUS-এ ভাঙন শুরু হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনের অনেকেই জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের এই বিরোধকে মীমাংসা করে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে মনে করতেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই ধরনের ধারণা অনেকের মধ্যেই প্রবল ছিল।

"কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে একটি অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার নামে

এই ধরনের মনোভাবগুলিকে একটি সংগঠিত রূপ দেওয়ারয় চেষ্টা হলো।"[১০] কিন্তু এই প্রচেষ্টা যখন ষাটের দশক শুরুর প্রাক্কালে ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন "নেহরু সরকারের চরিত্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একাংশের এই ভ্রান্ত বিশ্লেষণ ছাত্র ফ্রন্ট সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও প্রতিফলিত হলো। ১৯৫৮ সালে 'নিউ এজ' পত্রিকায় এক বিশেষ নিবন্ধে এ.আই.এস.এ তুলে দিয়ে সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলিকে এক করে দিয়ে একটিমাত্র সংগঠন গড়ার কথা বলা হলো। বলা হলো, এখন আর আলাদা সংগঠন করার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে সমস্ত ছাত্রকে 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' বা এন.ইউ.এস নামে একটি মাত্র সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে হবে। এই নিবন্ধকে কেন্দ্র করে এ আই এস এফ সংগঠনের ভেতরে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়।[১১]

"ছাত্র ফেডারেশন তুলে দিলে এন ইউ এস-এর ঢোকার সঠিকতা প্রতিষ্ঠায় দলিল লিখলেন ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ।"[১২]

কিন্তু, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে "... এই ভ্রান্ত বিশ্লেষণ..." অর্থে কি বুঝান হয়েছে? ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ যে সি পি আই (এম) পার্টির (১৯৯১) সাধারণ সম্পাদক, সে পার্টির ছাত্র সংগঠন 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি' কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে 'এই ভ্রান্ত বিশ্লেষণ'-এর ব্যাখ্যা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক অংশটি নিম্নরূপ :

"এই বির্তক এসে আঘাত করে তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিকেও। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদের এবং জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেহরুর ভূমিকাকে 'প্রগতিশীল' বলে ভাবতে শুরু করে এবং এই সরকারের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। সে যুগের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, সোভিয়েত এবং চীন উভয় নেতৃত্বই ঐ সময় নেহরু সরকারের ভূমিকাকে প্রগতিশীল বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবার জন্য ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের জনগণের সংগ্রামের গতিপথ ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম-কৌশল কি হবে, তা নিয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। যেহেতু, এ আই এস এফ-এর নেতৃত্বের অধিকাংশ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই বিতর্ক এ আই এস এফ-এর নেতৃত্বের মধ্যেও এসে পৌছাল। অবশ্য প্রতিদিনের আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে তা ৫০ দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেনি।"[১৩]

প্রকৃতপক্ষে নেহরু সরকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশ্লেষণকেই 'ভ্রান্ত বিশ্লেষণ' বলা হয়েছে। কিন্তু ৫০ দশকে এই বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী 'বিশেষ বাধা' সৃষ্টি না করলেও ষাটের দশকে তা শুধু বাধা নয়, কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র রাজনীতিতে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলে।

'NUS'-এ অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিতর্কের পাশাপাশি আরও দুটো বিষয়ে ছাত্রফ্রন্টে বিতর্ক উঠেছিল। বির্তকের উৎসস্থল ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। একটি বিষয়— নেহরু পরিচালিত সরকারের শিক্ষানীতি 'প্রগতিশীল' কিনা? একপক্ষের অভিমত, নেহরু সরকারের শিক্ষানীতি 'প্রগতিশীল'। অপরপক্ষের অভিমত নেহরু সরকারের শিক্ষানীতি 'প্রগতিশীল' নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি—ছাত্র আন্দোলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এই বিষয়েও অভিমত দ্বিধা বিভক্ত। একপক্ষ মনে করলো শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'ক্যাম্পাসের' মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং কোন গণআন্দোলন বা

রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে ছাত্র আন্দোলনকে যুক্ত করা উচিত হবে না। বিপরীত পক্ষের অভিমত অনুসারে—ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্র আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সংগঠনের কাছে অবান্তর। ছাত্র সংগঠন গণসংগঠন হিসাবে তার গণআন্দোলন মুখী ভূমিকাকে অব্যাহত রাখবে। সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে এবং জনস্বার্থমুখীন গণআন্দোলনে সহমর্মিতা জানাবে, সংহতিমূলক কাজ করবে। ছাত্র ফ্রন্টের এই দুই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক গণসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছায়। পঞ্চাশের দশকের ছাত্র আন্দোলন যে গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করে এসেছিল, সেই গতানুগতিক পরিমণ্ডলে উল্লিখিত দু'বিষয়ক বিতর্ক যুক্ত হয়ে গতানুগতিক বিরোধী উপাদানকে শক্তিশালী করতে থাকে। সাথে 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' সংক্রান্ত মতবিরোধ গোটা ছাত্র আন্দোলনের স্থিতাবস্থামূলক পরিমণ্ডল বিভেদের ইন্ধন যোগায়।

ষাট দশক শুরুর আগে-ই 'ছাত্র ফ্রাকসান', 'ছাত্র সাব কমিটিগুলি' বিতর্কমূলক পরিবেশে পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এই গোষ্ঠীকরণ ছিল ব্যাপক এবং ক্রমান্বয়ে প্রকট থেকে প্রকটিত।

কিন্তু, উল্লিখিত গোষ্ঠীকরণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় রাজনৈতিক মতামত বিবেচ্য হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মাপকাঠি এই ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতে যাঁর স্বমতাবলম্বী গোষ্ঠীর ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবে তা না হয়ে সে হয়তো তাঁর বিপরীত মেরুতে রাজনৈতিকভাবে অবস্থানকারী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এই গোষ্ঠীকরণ প্রক্রিয়াটি বোঝার পক্ষে অত্যন্ত জটিল। বিশেষত পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফ্রন্টের এই গোষ্ঠীকরণ প্রক্রিয়াটি ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত ছিল জটিলতর।

বহুবিধ কারণের জন্য (যা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়, যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের অন্বেষার বিষয়।) পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনে বহুকথিত বামপন্থী ধারার সাথে দক্ষিণপন্থী ধারার দুই লাইনের বিতর্কে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর অনুগামীদের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির সর্বস্তরে 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর অনুগামীদের প্রাধান্য ছিল প্রবল। কিন্তু পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর অনুগামী নেতৃবৃন্দ এবং মধ্যপন্থীরা যুগ্মভাবে। পঞ্চাশের দশকের বেশিরভাগ সময় এই দায়িত্বে ছিলেন বিশ্বনাথ মুখার্জী, জলিমোহন কল, রমেশ ব্যানার্জী। সম্ভবত প্রাক্তন ছাত্রনেতা হিসাবে এই কমরেডদের উপরে ছাত্র-ফ্রন্টের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' এবং 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর রাজনৈতিক সংঘাত সমমতাবলম্বী বা চিন্তার নৈকট্য যাঁদের কিছুটা রয়েছে তাঁদের নিয়ে পশ্চিম বাংলায় ছাত্রফ্রন্টের গোষ্ঠী গড়ে উঠলো না। একই মতাবলম্বী বা কাছাকাছিদের মধ্যে দুটো প্রধান গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিশ্বনাথ মুখার্জীর অনুগামী বলে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে একটি গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে পরিচিতি লাভ করে। এই গোষ্ঠীতে তখনকার ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন— গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য (কলিকাতা); গৌরী বসু, সরল সেন (হাওড়া), নিমাই রাউথ (বর্ধমান), অশোক মাইতি (মেদিনীপুর) প্রমুখ। অপরপক্ষে যে গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল তাঁদের শীর্ষে কোন প্রাদেশিক স্তরের পার্টি নেতা ছিলেন না। মূলত

ছাত্রনেতাদের একটি বৃহৎ অংশ একসাথে চলতো এবং তাদের এই একসাথে চলাটাকেই গোষ্ঠীবদ্ধতা বলে মনে হতো। এইভাবে যাঁরা নিজেরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে চলতেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— হীরেন দাশগুপ্ত, সুনীল সেনগুপ্ত, প্রতুল লাহিড়ী, গোপাল মুখার্জী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পল্লব সেনগুপ্ত, সোমেশ হোমচৌধুরী, পার্থ সেনগুপ্ত (কলিকাতা); কালী ব্যানার্জী (হুগলী) দীনেশ মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ (২৪পরগণা), হরিনারায়ণ অধিকারী (নদীয়া)।

পশ্চিম বাংলার ছাত্র নেতাদের এইরূপ গোষ্ঠীবদ্ধতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাইন অনুসারী কোন মিল ছিল না। বিশ্বনাথ মুখার্জী নিজে পার্টি রাজনীতির ক্ষেত্রে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' অনুগামী! জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন [NUS] গঠন ও যোগদানের প্রশ্নে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' ভুক্তদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বিশ্বনাথ মুখার্জীর অনুগামী ছাত্র গোষ্ঠীর বিরোধীতা ছিল প্রবল। এটা ছিল নিজেদের অনুসরণকারী রাজনৈতিক লাইনের স্ববিরোধীতা।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের আমলে সর্ব-ভারতীয় স্তরে পার্টি ছাত্রফ্রন্টে 'NUS'-এর সমর্থনে লাইন গ্রহণ করেছিল। পি সি যোশী, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের মত শীর্ষস্থানীয় পার্টি নেতারা 'NUS'-এর লাইনকে সমর্থন করেছিলেন। এই সময় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের [AISF]-এর সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত। সর্বভারতীয় স্তরে পার্টির 'Student Fraction' 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন'-এর লাইনকে প্রয়োগের দায়িত্বে এই All India Student Fraction-এ হীরেন দাশগুপ্তও ছিলেন। কিন্তু 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নে'র পথে 'ছাত্র ঐক্য'— এই প্রচার অভিযানে হীরেন দাশগুপ্ত, সুনীল সেনগুপ্ত প্রমুখরা যখন পশ্চিম বাংলায় প্রচেষ্টা শুরু করেন, তখন পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোন সক্রিয় সমর্থন পাওয়া যায়নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অমৃতসর বিশেষ কংগ্রেসের পর পার্টি সংগঠনে ত্রিস্তর প্রথা চালু হয় এবং পার্টির রাজ্য পরিষদ ও জেলা পরিষদে ছাত্রফ্রন্ট থেকে ন্যূনপক্ষে একজন ছাত্রনেতাকে সদস্য করার রেওয়াজ চালু হয়। এই রেওয়াজ চালু হলে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রফ্রন্ট থেকে প্রথম রাজ্যপরিষদ সদস্য [P.C.M.] হয়েছিলেন গুরুদাস দাশগুপ্ত। অপরদিকে ব্যতিক্রম, পার্টির সর্বভারতীয় শীর্ষ সংগঠন 'জাতীয় পরিষদ' (National Council)-এ হীরেন দাশগুপ্ত প্রমুখদের মত শীর্ষস্থানীয় সর্বভারতীয় কোন ছাত্রনেতাকে-ই অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।[১৪]

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বনাথ মুখার্জীর অনুগামী গোষ্ঠীর গুরুদাস দাশগুপ্ত পার্টির প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হবার পরই পার্টির গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট-এর অনুগামীরা ছাত্রফ্রন্টে নিজেদের শক্তি বিন্যাসের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯৬০-৬১ সালে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তথা কট্টর বামপন্থী শিবিরভুক্ত ২৪ পরগণার পার্টি নেতা বিভূতি দেব-কে প্রাদেশিক ছাত্র সাব-কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই সময় বিশ্ব যুব উৎসবে AISF-এর প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়েও বিরোধ দেখা দিয়েছিল। দীনেশ মজুমদারকে A.I.S.F.-এর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান হবে— এই মর্মে A.I.S.F.-এর নেতৃত্ব পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়। AISF-এর সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্তের উদ্যোগেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বের তরফে বাধা এলো। দীনেশ মজুমদারকে প্রতিনিধি না করে অন্য কোন ছাত্রনেতাকে প্রতিনিধি নির্বাচনের

জন্য অনবরত চাপ সৃষ্টি হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের হস্তক্ষেপে দীনেশ মজুমদার-ই ঐ হেলসিঙ্কী বিশ্ব যুব উৎসবে AISF-এর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে তিক্ততার সূত্রপাত হলো তার জের আদৌ শুভদায়ক হলো না। গোষ্ঠীতন্ত্র আরও জটিলরূপ নিল।

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রফ্রন্টের দুই গোষ্ঠীতেই রাজনৈতিক সহ-অবস্থানের এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে অনেকে বিপরীত অবস্থানের অনুসারী হয়েও বিপরীত মেরুকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর কমরেডদের সাথে সামিল হয়েছেন, এক সাথে কাজ করেছেন, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রক্ষা করেছেন। কিন্তু স্বমতের অনুসাবী গোষ্ঠীতে সামিল হননি। স্বমতের অনুসারীদের অনেকের সাথেই অনেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তিক্ততার। অথচ বিপরীত মতের অনুসারীদের অনেকের সাথে অনেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ।

অন্ধ্রেপ্রদেশে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' এবং 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর সংঘাত ছিল তীব্র। বিশেষত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ প্রত্যাহার নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বসহ পার্টি সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বহুগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। ছাত্রফ্রন্টেও তার প্রতিফলন ঘটে। ছাত্রফ্রন্টের অনেকেই ছাত্র ফেডারেশন তুলে দেবার এবং জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। এই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে নিজাম কলেজ, ইউনিভার্সিটি আর্টস কলেজ, ভিভি কলেজ, সইফাবাদ কলেজ, ওমেনস্ কলেজ প্রভৃতি কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে মত পার্থক্য ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা দেখা যায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভাঙনের পটভূমি তৈরির সন্ধিক্ষণে ছাত্র ফ্রন্টে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের ওলট-পাল্‌ট অবস্থান শুরু হয়ে যায়। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে এই অবস্থানগত পরিবর্তনশীলতা ছিল লক্ষ্যণীয়। ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিপরীত রাজনৈতিক মতাবলম্বী অনুসারীদের পারস্পরিক যে সৌহার্দ্য ছিল এবং বিপরীত মতাবলম্বী অনুসারীদের একই গোষ্ঠীতে অবস্থান ছিল, তার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। এই সময় ছাত্রফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কোন রাজ্যে কি অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছিল, তা প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-র ছাত্রফ্রন্টে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিগত বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক পার্টির আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের প্রতিফলন-ই শুধু ঘটেনি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কেন্দ্রিক মতাদর্শগত মতবিরোধেরও প্রতিফলন ঘটেছিল।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপকতম ঐতিহাসিক মতাদর্শগত মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির [CPSU] ২০তম পার্টি কংগ্রেস। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক এন. এস. ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের অতীত কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা এবং ব্যক্তিপূজার নিন্দা করে বির্তকের সূত্রপাত ঘটান। মতাদর্শগতক্ষেত্রেও ২০তম পার্টি কংগ্রেসের উত্থাপিত রিপোর্টে—'সর্বহারার একনায়কত্ব', 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র,' 'শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান,' 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন', 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' এবং 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'নিরস্ত্রিকরণ' প্রভৃতি বিষয়ে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছিল সে সমস্ত বিষয়ে পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক আরম্ভ হয়। এই বিতর্ক-ই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'মহাবিতর্ক' বা 'Great Debate' নামে অভিহিত। 'মহাবিতর্ক' বাস্তবে লোকায়ত

বিতর্কে পরিণত হয়েছিল। 'মহাবিতর্ক'-কে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দুটো শিবিরে বিভক্ত হলো। এক শিবিরের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি। অপর শিবিরের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। এই দুই শিবিরের কমিউনিস্টদের এবং পার্টিগুলিকে চিহ্নিত করা হতে থাকলো 'রুশপন্থী' এবং চীনাপন্থী' বলে।

'রুশপন্থী' এবং 'চীনাপন্থী' দুই শিবিরের পক্ষ থেকে নিজ নিজ মতাদর্শগত বিষয়বস্তু ও যুক্তিকে বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে পুস্তিকায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এইসব প্রস্তাব, পুস্তিকার অন্যতম হলো :

১. ১৯৬০ সালের ২২শে এপ্রিল কমরেড লেনিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা 'হঙ্কী-তে (৮নং সংখ্যা, ১৬ই এপ্রিল ১৯৬০) প্রকাশিত "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক" শীর্ষক একটি তাত্ত্বিক দীর্ঘ নিবন্ধ।
২. ১৯৬৩ সালের ৩০শে মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা চিঠি।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির জবাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লেখা '১৪ই জুনের চিঠি'।
৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'-র সম্পাদকমণ্ডলীর ১৯৬৩ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রকাশিত নিবন্ধ।
৫. 'সর্বদেশের শ্রমজীবী মানুষ এক হও, আমাদের সকলের শত্রুকে প্রতিরোধ কর' ['Workers of All Countries Unite, oppose our Common Enemy'] শীর্ষক চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ৭টি নিবন্ধের সংকলন।
৬. 'কমরেড তোগলিয়ত্তী এবং আমাদের মতপার্থক্য ['The Differences between Comrade Togliatti and us']।
৭. 'লেনিনবাদ এবং আধুনিক সংশোধনবাদ' ['Leninism amd Modern Revisionism']।
৮. 'মস্কো ঘোষণা এবং মস্কো বিবৃতি অনুসারে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে দাও' ['Let us Unite on the basis of the Moscow Statement']।
৯. 'কিসে থেকে মতপার্থক্য?— থোরেজ এবং অন্যান্য কমরেডদের নিকট একটি জবাব' ['Whence the Differences— A Reply to Torez and other comrades']।
১০. 'কমরেড তোগলিয়ত্তি এবং আমাদের মতপার্থক্য প্রসঙ্গে আরও কিছু—সমসাময়িক দুনিয়ায় লেনিনবাদের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা' ['More on the Differences Between Comrade Togliatti and us—Some Important Problems of Lenisism in the Contemporary World']
১১. 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য' ['A Comment on the Statement of the Communist Party of the USA']
১২. দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লেখা 'আনআর্মড ভিক্টরি' ['Unarmed Victory']।
১৩. ১৯৬২ সালের ১৭ই আগস্ট 'পিকিং রিভ্যিউ'-র তেত্রিশতম সংখ্যা।
১৪. লিন পিয়াও-এর 'জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক' [Long live the victory of people's war] এবং লিন পিয়াও-এর ভূমিকাসহ চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর উদ্ধৃতি 'রেডবুক'।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'মহাবিতর্ক' কেন্দ্রিক উল্লিখিত প্রস্তাব, পুস্তিকা, চিঠি, বই, পত্র-পত্রিকা পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছেই পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাট দশক জুড়ে বিভিন্নভাবে পৌঁছে যায়। অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি-ই এইসব প্রচার পুস্তিকার বিষয়বস্তু অনুসারে 'রুশপন্থী' এবং 'চীনপন্থী' শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির গণ সংগঠনগুলির উপর কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিভেদের প্রতিফলন ঘটে। উন্নত-অনুন্নত সবদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার গণসংগঠনগুলির ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে ছাত্র সংগঠন একটি অন্যতম 'মিলিটান্ট' সংগঠন। গণআন্দোলন, গণসংগ্রামের গতিবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠন একটি প্রান্তিক সংগঠনও বটে। ফ্রান্স, বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র. স্পেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, নিউইয়র্ক, রোম, কলোম্বিয়া, পূর্ব পাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ) প্রভৃতি দেশ ও অঙ্গরাজ্যগুলির বেশিরভাগ ছাত্র সংগঠনগুলিই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতামতে প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের লোকায়ত আন্দোলনগুলিতে, বিশেষ করে পশ্চিমীদেশের ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও, এব ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তি আন্দোলনের বিজয় অর্জন এবং বাংলাদেশ গঠন পর্যন্ত এই দেশের ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের প্রতিফলন [Manifestation] ছিল লক্ষ্যনীয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা তার সাক্ষ্য।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৬৪-র পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বলাই শ্রেয়) প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনে ও ছাত্র সংগঠনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত মতবিরোধের প্রতিফলন [Manifestation] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই ঘটছে। উপরন্তু বলা যায়—ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'দুই লাইন' সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের মতবিরোধ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'মহাবিতর্ক'কেন্দ্রিক মতাদর্শগত মতবিরোধের প্রতিফলন ষাটের দশকে প্রায় একই সঙ্গে ভারতের ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়। শুরু হয় বিভিন্ন রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনে বিভেদ ও ভাঙনের রাজনীতি।

তথ্যসূত্র :

১। প্রকৃতপক্ষে এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ছিল না। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে গৃহীত লাইনকে সংশোধন করে যে দলিল গৃহীত হয়েছিল, তা "১৯৫১ সালের পার্টি দলিল" নামেই সমধিক পরিচিত।

২। "Political Awakening In Hyderabad Role of Youth and Students" by S. M. Mawad Razvi পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

৩। সুনীল সেনগুপ্ত লিখিত "জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের পথে ছাত্র ঐক্য" পুস্তিকার ১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

৪। ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮-১৯।

৫। ঐ পৃষ্ঠা নং ২১-২২।

৬। ঐ পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠার এই উদ্ধৃতিতে 'গত বছর নভেম্বর মাস' অর্থে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাস।
৭। ঐ পৃষ্ঠা নং ২২।
৮। ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩-২৪।
৯। "Political Awakening In Hyderabad Role of Youth And Students" পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠা।
১০। "সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার"— ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকার ৩৭ পৃষ্ঠা।
১১। ঐ পুস্তিকার ৪৭ পৃষ্ঠা।
১২। শৈবাল মিত্র লিখিত এবং আজকাল কর্তৃক প্রকাশিত "ষাটের ছাত্র আন্দোলন" পুস্তকের ৬৭ পৃষ্ঠা।
১৩। "সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনেব পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার পুস্তিকার ৪৭ পৃষ্ঠা।"
১৪। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ (অষ্টম) রাজ্য সম্মেলনে (মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, কলিকাতা, ৮ই হইতে ১২ই এপ্রিল ১৯৫৯-এ অনুষ্ঠিত) এবং ১৭ই-২২শে জানুয়ারি ১৯৬১-তে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত নবম রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে হরিনারায়ণ অধিকারী বিদায়ী রাজ্য কমিটির প্যানেলের বাইরে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য (P.C.M.) রূপে নির্বাচনের জন্য সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা হীরেন দাশগুপ্তের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু হীরেন দাশগুপ্ত ভোটে নির্বাচিত হতে পারেননি।

কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক ভাঙনের পূর্বেই ছাত্রফ্রন্টে ভাঙন

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৬ষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ৬ষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে-ই পরিষ্কার হয়ে যায়— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন আসন্ন। পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের লড়াই-এর পরিণামে দুই পক্ষ থেকেই পৃথক পৃথক ভাবে দুই প্রস্ত খসড়া কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল। দুই প্রস্ত খসড়া কর্মসূচি ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিনিধিদের আলোচনাকে কেন্দ্র করে পার্টি ঐ ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে-ই ভাঙনের মুখে উপস্থিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম তাত্ত্বিক প্রধান এম. সুসলভের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে কোন রকমে গোজামিল দিয়ে সাময়িকভাবে পার্টির ভাঙন রোধ করা হয়েছিল।

৬ষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস শেষ হতে না হতেই ভারত-চীন সীমান্তে সীমান্তবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভারত-চীনের দীর্ঘ সীমান্ত চিহ্নিতকরণ নিয়ে কোন স্থায়ী সমাধান উভয়দেশের মধ্যে হয়নি। এই অচিহ্নিত দীর্ঘ সীমান্তে উভয়দেশের সৈন্য চলাচল নিয়ে উভয়দেশের মধ্যে প্রায়ই সীমান্ত লঙ্ঘনের পারস্পরিক অভিযোগ উঠতে থাকে। সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে অমিত্রসুলভ বাতাবরণ তৈরি করে ভারত-চীন মৈত্রী বন্ধনে আঘাত হানতে শুরু করে। এই পরিবেশের মধ্যেই উভয় দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে এবং রাজনৈতিক স্তরে সীমান্তবিরোধ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। ১৯৬২ সালের ২রা অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জানালেন— "চীনের সঙ্গে বৈঠকে ভারত সর্বদাই প্রস্তুত"। ৭ই অক্টোবর ১৯৬২, 'সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনায় চীনের সম্মতি' পাওয়া গেল। কিন্তু ৮ই অক্টোবর ১৯৬২, ভারত চীনের নিঃশর্ত আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। ১৩ই অক্টোবর ১৯৬২, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু

'চীনা হানাদার' হটানোর হুকুম দিলেন।[১] এর ফল হলো ভয়ানক। ভারত-চীন 'সীমান্ত সংঘর্ষ' (অনেকের মতে ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ) শুরু হলো। ভারতের অভ্যন্তরে দেখা দিল উগ্রচীন বিরোধীতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী বন্যা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে 'চীন-ভারত সংঘর্ষ'-কে কেন্দ্র করে চরমতম বিরোধ দেখা দিল। ১৯৬২ সালের ৩১শে অক্টোবর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে পার্টি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। 'চীনাপন্থী' এবং 'রুশপন্থী' নামে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমে এই দুই শিবিরকে চিহ্নিত করা হয়। 'রুশপন্থী'-রা চীনকে আক্রমণকারী বলে মনে করে। কিন্তু 'চীনাপন্থী'-রা চীনকে আক্রমণকারী বলতে নারাজ, তাঁদের মতে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ কোন দেশকে আক্রমণ করতে পারে না। 'কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ কোন দেশকে আক্রমণ করতে পারে না'—এই বিশ্বাস মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ-এর মৌল শিক্ষাকেন্দ্রিক।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে 'চীনাপন্থী' এবং 'রুশপন্থী' নামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যে দুটি শিবির চিহ্নিত হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে চিহ্নিত হয়েছিল 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' এবং 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর লাইনের প্রতি অনুগতদের কেন্দ্র করে। অর্থাৎ পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে যে ধারা অনুসারে পার্টি বিভক্ত হতে যাচ্ছিল, সে ধারা অনুসারেই ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পার্টি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। ১৯৬২ সালের ৩১শে অক্টোবর জাতীয় পরিষদের বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো—তাতে চীনকে আক্রমণকারী রূপে নিন্দা করা হলো; ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানানো হলো; ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এই গৃহীত প্রস্তাব মত 'জাতীয় পরিষদ পন্থী'-রা চীনের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নামলেন এবং প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের অভিযান জোড়দার করলেন। জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব বিরোধীরা চীনাপন্থী বলে চিহ্নিত হতে থাকলেন। এইভাবে চীনাপন্থী বলে চিহ্নিত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু হলো উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক অভিযান। ভারত সরকারও চীনাপন্থী কমিউনিস্ট অভিযোগে ১৯৬২ সালের গোটা নভেম্বর মাস ধরে 'ভারতরক্ষা আইনে' শত শত কমিউনিস্টকে জেলে বন্দি করতে থাকে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বমডিলার পতনের পর চীন কর্তৃক একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার অভিযান চলে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিকস্তরের কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা ব্যাপক সংখ্যায় আটক হলেন। ১৯৬২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই আটক কমিউনিস্টদের বেশিরভাগ জেলে বন্দি ছিলেন। কিন্তু, আটক কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে এবং তাঁদের অনুগামীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছিল—'চীনপন্থী' কমিউনিস্টদের আটকে 'রুশপন্থী' কমিউনিস্টরা উল্লসিত হয়েছে এবং আটকের সুযোগে বিভেদমূলক প্রচার অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযোগ একতরফা হলেও বাস্তবে ছিল না। এই অভিযোগ ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধেই সমপর্যায়ের। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্টদের যে অংশকে জেলে বন্দি করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সংখ্যক ছিলেন জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের বিরোধী। ছাত্রফ্রন্টের হাতেগুনতি যে কয়জন বন্দি হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। অনেকের বিশ্লেষণ অনুসারে পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের ভুল রিপোর্টেই জাতীয় পরিষদের সমর্থকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের সময়ে 'চীনপন্থী' অভিযোগে শত শত কমিউনিস্টদের আটকের ঘটনাবলীর জের হলো সুদূরপ্রসারী। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণ বেড়ে চললো। চূড়ান্ত বিভেদ এগিয়ে আসতে এই ঘটনা ইন্ধন যোগাল। ছাত্রফ্রন্টের শত-শত ছাত্র-ছাত্রী কর্মীদের মানসিকতায় এই বিভেদের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রফ্রন্টে ভাঙন আনার উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হলো। ছাত্রসমাজের মানসিকতা এবং জীবন যৌবনের উন্মাদনা ছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তনমুখী। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রসমাজের চিন্তা ও ভাবাবেগ ছিল চীনের মতাদর্শগত ঘটনাপ্রবাহের সপক্ষে। যা স্বল্প সময়ান্তরে পর্যবসিত হয়েছিল ছাত্রফ্রন্টের ভাঙন সূচিত করার যুক্তির অনুকূলে।

ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রসমাজ ছিল সোচ্চার। যাটের দশকের শুরুতেই ছাত্র সমাজের এই সোচ্চার সমর্থন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আরও উৎসাহ উদ্দীপনার যোগান দেয়। কিন্তু, চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত মহাবিতর্কে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম অন্যতম ইস্যু হওয়াতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ছাত্র সমাজের চিন্তাভাবনায় দারুণ আড়োলন সৃষ্টি করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে চীনের যুক্তিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সমর্থন জানায়। এই বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তি ও বক্তব্য সংগ্রামী ছাত্রসমাজে এবং কমিউনিস্ট ছাত্র-যুবকদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। বরং সে সময় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রসমাজের ক্ষেত্রেও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের ইস্যুতে অনুরূপ ঘটনাই ঘটে। (এই বিষয়ে এই বই-এর পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ছাত্র আন্দোলনের বিবরণ দ্রষ্টব্য।) ভারতের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রসমাজেব মধ্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইস্যুকে কেন্দ্র করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তির সপক্ষে ভিত্তিভূমি তৈরি হতে থাকলো। অর্থাৎ ছাত্রফ্রন্টের ভাঙনে একটি মতাদর্শগত উপাদান যুক্ত হলো।

১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য আটক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ (একমাত্র কমরেড বি টি রণদিভে ব্যতীত) জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এরপর ১৯৬৪ সালের ১১ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের সভা থেকে ৩২জন জাতীয় পরিষদের সদস্য বেরিয়ে এলেন বা ওয়াক আউট করলেন। আরম্ভ হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের আনুষ্ঠানিক পর্ব। ৩২জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ১৪ই এপ্রিল সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি বিবৃতি দেন। এই ৩২জন জাতীয় পরিষদের সদস্যের উদ্যোগে তাঁদের সমর্থক প্রতিনিধিদের নিয়ে ১১ই জুলাই, ১৯৬৪ অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে অনুষ্ঠিত হল একটি কনভেনশন, যা 'তেনালী কনভেনশন' নামে খ্যাত।

তেনালী কনভেনশনের গৃহীত প্রস্তাবে-ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর মূল ইংরাজি থেকে অনূদিত মর্মার্থ নিম্নরূপ :

"এই পরিস্থিতি অনুসারে দেখা যাচ্ছে ৩২জন কমরেডের ১৪ই এপ্রিলের বিবৃতির বিষয়বস্তু সঠিক। অর্থাৎ ডাঙ্গেপন্থীরা তাঁদের প্রয়োজনে পার্টির যেকোন গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে স্তব্ধ করে দেবেন। আশা ছিল, পার্টি সভ্য ও দরদীদের সংখ্যাধিক্যের চাপে ৩২জন কমরেডের প্রস্তাবকে ডাঙ্গেপন্থীদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু তা মিথ্যায় পর্যবসিত। এখন

পরিস্কারভাবেই বলা যায়— ডাঙ্গেপন্থীরা তাঁদের পার্টিবিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন।

"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই কনভেনশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ৩২ জন কমরেডের ১৪ই এপ্রিল বিবৃতির বিষয়বস্তুকে প্রয়োগ করার সময় এসেছে। যদি, সম্পাদকমণ্ডলী ও তার অনুগামীরা তাঁদের মনোভাবে অটল থাকেন তাহলে পার্টি সদস্যদের নিকট আমরা আহ্বান জানাব— পার্টির ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগদান করুন।

"এই অবস্থান গ্রহণ আমাদের পক্ষে সুখের বিষয় নয়। বাধ্য হয়েই এই অবস্থান গ্রহণ করতে হলো। আমরা এই পথ পরিহার করতে চেয়েছি। আমরা যখনই সম্ভব তখনই পার্টির ঐক্যের আবেদন করছি। সব প্রশ্নটাই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যেকোন মূল্যে ক্ষমতায় যাঁরা থাকতে চায়, তাঁরাই ঐক্য প্রচেষ্টায় বাধ্য দিয়েছে। আমাদের কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য কমরেডদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনর্গঠনের প্রয়াসে আমরা পার্টি সদস্য ও দরদীদের কাছে আহ্বান জানাব। আহ্বান জানাব ভারতের জনগণের বিপ্লবী ঐতিহ্য অনুসারে শ্রমিকশ্রেণির একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পার্টিরূপে পার্টিকে গড়ে তোলার জন্য।[২]

জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবপন্থীরা ও ৩২জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের বিবৃতি, তেনালী কনভেনশনের প্রস্তাবের জবাব দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। দুই শিবির-ই নিজেদের পৃথক কেন্দ্র থেকে সাংগঠনিক কাজ চালাতে থাকে। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেস বোম্বাইতে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের ৩২জন সদস্য ও তাঁদের অনুগামীরা ঐ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামেই ৭ম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি শুরু করে কলকাতায়। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৭ম পার্টি কংগ্রেস-ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ভূমিষ্ঠ হবার প্রথম কংগ্রেস। দুই পক্ষের আসন্ন পার্টি কংগ্রেস এবং অনুগামীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ তাঁদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে ছাত্র-যুব কর্মীদের পার্টি ভাঙনপর্বে প্রকাশ্য মহড়ায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ছাত্র-যুব পার্টি কর্মীদের মানসিকতায় পার্টির অভ্যন্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি ভাঙনের পারিপার্শ্বিকতা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাঙন পর্বের শুরুতে ছাত্র-যুব পার্টি কর্মীদের ভাঙনের মহড়ার কাজে অনুপ্রাণিত করা কষ্টসাধ্য ছিল না। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শক্ত ঘাঁটি ছিল দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্ররাজ্য। ৩২জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের এবং তাঁদের অনুগামীদের শক্ত ঘাঁটি ছিল পশ্চিমবঙ্গে। অন্ধ্র ও পশ্চিমবঙ্গে-ই পার্টির দুই শিবিরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে পার্টি ভাঙন চূড়ান্ত হবার আগেই ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্রফ্রন্টের গণসংগঠনে (ছাত্র ফেডারেশন) প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাঙন শুরু হয়।

ছাত্রফ্রন্টে প্রথম ভাঙনের তথ্যনজির এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করলেই এই ভাঙনের পশ্চাদ্‌বর্তী কারণ অনুধাবন করা যাবে—

১৯৬৪ সালের ১২ থেকে ১৭ই জানুয়ারী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির [CEC] সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ১০জন সদস্য একটি 'নোট' উপস্থিত করেছিলেন। এই 'নোট'টি ছিল পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে পার্টি এবং পার্টির গণসংগঠনে বিভেদমূলক কাজের বিবরণে পূর্ণ। উক্ত 'নোটে' স্বাক্ষর করেছিলেন—কমরেড এম. বাসবপুন্নাইয়া,

পি. সুন্দরাইয়া, জ্যোতি বসু, এ. কে. গোপালন, হরকিষাণ সিং সুরজিৎ, এস. আর. ভেঙ্কটরমন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, জগজিৎ সিং লয়ালপুরী, পি. রামমূর্তি এবং সোহন সিং যোশ। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত তখনও জেল থেকে মুক্তি পাননি)। এই দশজন CEC সদস্যের নোটে ছাত্রফ্রন্ট সম্পর্কিত অংশে বলা হয়েছে : অন্ধ্রে পাল্টা প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে এবং পাল্টা সংগঠন গত দু'মাস ধরে কাজ চালাচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যায় সদস্যপদ বাতিল করে এবং ৬০জন প্রতিনিধিকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে হায়দ্রাবাদ ছাত্র ইউনিয়নকে ভাঙা হয়েছে।

এই বিবরণ অনুসারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামীরাই সর্বপ্রথম অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র সংগঠনে ভাঙন এনেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রফ্রন্টের আনুষ্ঠানিক ভাঙন হয়েছে ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে (৮ থেকে ১০ই আগস্টে অনুষ্ঠিত BPSF-এর সপ্তদশ সম্মেলন)। পশ্চিমবঙ্গে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র এই আনুষ্ঠানিক ভাঙনের সমর্থন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের ৩২জন সদস্য এবং তেনালী কনভেনশনের অনুগামী কমিউনিস্ট এবং ছাত্র-যুব ফ্রন্টের কমরেডরা।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে দুটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে কাজকর্ম করেছে, তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিভেদমূলক কাজকর্মের রাজনৈতিক রূপটি পার্টির অষ্টম রাজ্য সম্মেলনে উপস্থাপিত খসড়া রিপোর্টে ধরা পড়ে। এই রিপোর্টের 'ছাত্র ও যুব ফ্রন্ট' শীর্ষক উপশিরোনামে ছাত্রফ্রন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে।"

"যদিও ছাত্ররা কোন বিশেষ শ্রেণি নহে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি হতে তাহারা আসে এবং যদিও সেই কারণে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিসুলভ চিন্তা দেখা যায়, তথাপি গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মধ্যবিত্তপ্রধান ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তারুণ্যের স্বাভাবিক গুণাবলী তাহাদিগকে সজীবতা দান করে। সেইজন্যই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অন্যতম অংশগ্রহণকারী হিসাবে তাহাদের সংগঠিত করার উপায় বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না করিতে পারিলে ইহাদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজবিরোধী ধারণা প্রশ্রয় পায়। শিক্ষাজগতের বিশৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনিশ্চিত অবস্থা উপরোক্ত ভাবধারা প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যদি না ব্যাপক গণ-আন্দোলন ভবিষ্যৎমুখী জীবন গঠনের সংগ্রামে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করে। এই দিক দিয়া গণসংগঠন হিসাবে ছাত্র ফেডারেশনকে গড়িয়া তোলার তাৎপর্য রহিয়াছে। **কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা সম্বন্ধে পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মত থাকায় এই কাজ কিছুটা অবহেলিত হইয়াছে**। গত এক বৎসরে ছাত্র ফেডারেশনের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফী বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ফেডারেশনের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। কলিকাতার বেশিরভাগ কলেজ ও মফঃস্বলের অনেকগুলি কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে ফেডারেশনের প্রার্থীদের জয়লাভ ইহারই পরিচয় দেয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংগঠনের প্রসার সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। স্কুলগুলিতে ফেডারেশনের প্রায় কোন অস্তিত্বই নাই। **কিন্তু এই ফ্রন্টে প্রধান দুর্বলতা হইল গণসংগঠন হিসাবে ফেডারেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই পার্টির মধ্যে সন্দেহ। আগে ইহা সম্পূর্ণ উঠাইয়া দেওয়ার এবং বর্তমানে ইহাকে গণসংগঠন হিসাবে না রাখিয়া শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সংগঠনে রূপান্তরিত করার**

ঝোঁক পার্টির একাংশের মধ্যে রহিয়াছে। কাজেই ইউনিয়নগুলিই গণসংগঠনের কাজ করিবে এই যুক্তিতে উপরোক্ত কথা বলা হইতেছে। কিন্তু বোঝা প্রয়োজন যে অনেক কলেজেই ইউনিয়নের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত স্কুলগুলিতে ইউনিয়ন নাই, তৃতীয়ত কলেজ ইউনিয়নগুলিকেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের সংস্রবমুক্ত পৃথক গণসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া দেশের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া দেশের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে ছাত্রসমাজের ভূমিকা আছে। শাসকশ্রেণি ছাত্রদের ইহা হইতে সরাইয়া রাখিতে চায়। তাই, তাহাদের বক্তব্য হইল— ছাত্ররা যেন রাজনীতি না করে, যাহার সহজ অর্থ হইল ছাত্ররা যেন শাসকশ্রেণির রাজনীতিই মানিয়া লয়। কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্রদের ভূমিকা অস্বীকার করিতে পারে না। পৃথক গণ সংগঠন ব্যতীত ছাত্রদের পক্ষে এই ভূমিকা পালন করা সম্ভব নহে। **তাই ইহার অবলুপ্তির ঝোঁককে দূর করিতে হইবে।**”[৩]

উপরে উল্লিখিত রিপোর্টের বড় হরফের অংশগুলি পড়লেই বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট ১৯৬০ সালের আগেই রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। ১৯৬১ সালের ১৭ থেকে ২২শে জানুয়ারি বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ নবম রাজ্য সম্মেলন থেকে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য কমিটির নতুন রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য সম্পাদক হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের লড়াই আরও তীব্র হয়। তাই রাজনৈতিক কারণে ১৯৬০-এর পরবর্তী সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের চূড়ান্তপর্বে পার্টি ভাঙনের আনুষ্ঠানিকতার পূর্বেই ছাত্রফ্রন্ট এবং গণসংগঠন ছাত্র ফেডারেশন ভাঙা সহজসাধ্য হয়েছে। পার্টি ভাঙন প্রক্রিয়ার পরিণতির অগ্রিম ফল হলো ছাত্র ফেডারেশনের সরাসরি ভাঙন।

১৯৪০ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র নাগপুর সম্মেলনে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার বিতর্কে এই সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনটি ভাঙনের প্রচেষ্টা করেছিল মূলত জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশ। জাতীয় কংগ্রেস সফল হল ১৯৪১ সালে অনুষ্ঠিত AISF-এর পাটনা সম্মেলনে। এই সম্মেলনে কার্যত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' ভেঙ্গে যায় এবং কংগ্রেসীরা বেড়িয়ে গিয়ে 'ছাত্র কংগ্রেস' তৈরি করে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ছাত্র ফেডারেশন ভাঙনের বৈশিষ্ট্য হলো, এবার কমিউনিস্টরা-ই নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতিতে নিজেদের সংগঠন নিজেরা ভাঙলেন। 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' [NDF] বা 'রুশপন্থী' অথবা জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুগামীরা ছাত্র ফেডারেশন ভাঙলেন অন্ধ্রে ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে। 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' [DF] বা চীনপন্থী অথবা তেনালী কনভেনশনপন্থীরা ছাত্র ফেডারেশন ভাঙলেন ১৯৬৪ সালের আগস্টে পশ্চিমবঙ্গে। এটাই কমিউনিস্ট প্রভাবিত ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্নিহিত রয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক ভাঙনের পূর্বেই ছাত্রফ্রন্টের আনুষ্ঠনিক ভাঙন কেন হলো— তার কারণগুলি।

১৯৬৪ সাল থেকে ৮০-এর দশক পর্যন্ত কমিউনিস্ট প্রভাবিত ভারতের ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাগুলি-ই [Stream] পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। এই ধারাগুলি প্রধানত ৩টি ভাগে বিভক্ত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-কে কেন্দ্র করে এ তিনটি ধারা আবর্তিত।

তথ্যসূত্র :
১। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের বিভিন্ন বাংলা দৈনিকের বিবরণ থেকে এইসব তথ্য সংগৃহীত।
২। "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী"— হরিনারায়ণ অধিকারী, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৯।
৩। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৫ম পার্টি কংগ্রেস (যা 'অমৃতসর, বিশেষ পার্টি কংগ্রেস' বলে পরিচিত) উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ (অষ্টম) রাজ্য সম্মেলন মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, কলিকাতায় ৮ হইতে ১২ এপ্রিল ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির খসড়া রিপোর্ট থেকে এই অংশ গৃহীত হয়েছে। পৃষ্ঠা ৫০। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বড় হরফ মূল রিপোর্টে ছিল না, বড় হরফ এই বই-এর লেখকের।)

ছাত্র ফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক ভাঙনের আনুপূর্বিক বিবরণ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র আনুষ্ঠানিক ভাঙন-এর পূর্বাভাস এই অধ্যায়ের পূর্বেকার পরিচ্ছেদগুলির বিবরণ থেকেই অনুমেয়। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় হলো—১৯৪২ সালের পর 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন রূপেই পরিচিত লাভ করে। কারণ, ঐ ১৯৪১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা নিখিল 'ভারত ছাত্র ফেডারেশন' থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবার পরিণতিতে সংগঠনের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে ১৯৪১ সাল ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম ভাঙন রূপে চিহ্নিত হলেও ঐ ভাঙনকে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম ভাঙন বলা সঠিক হবে না।

কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম ভাঙনের বর্ষটি হবে ১৯৬৪ সাল। এই প্রসঙ্গেরও প্রাসঙ্গিকতা হলো-— জাতীয় স্তরে কিন্তু 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' ভাঙলো না। ভাঙন প্রথমে শুরু হয়েছিল রাজ্য স্তরে, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রে। যা ছিল ষাটের দশকে ভারতের ছাত্র আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সূচনাপর্ব।

সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক ভাঙনের আনুপূর্বিক বিবরণ এই পরিচ্ছেদে রাজ্য ভিত্তিক-ই আলোচনা করা হচ্ছে—

পশ্চিমবঙ্গে

'নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশন'-এর শাখা 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'। ইংরাজিতে 'All India Student Federation' (AISF)-এর State unit– 'Bengal Provincial Students Federation (BPSF)। দেশভাগের পর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভক্ত বঙ্গের অংশটুকুর নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' করা হলেও অবিভক্ত বঙ্গের সময়কার নামকরণ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' বা 'BPSF'-এর কোন পরিবর্তন ঘটলো না। 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা হিসাবে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' বা 'BPSF' পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র সমাজের কাছে আরও সমধিক পরিচয় লাভ করে।

১৯৬৪ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' দুই টুকরো হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যুক্ত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র কার্যালয় [Office] ছিল ১৮৬ নং বিপিন বিহারী

গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২-তে। দোতলায় অবস্থিত একরুমের ভাড়া নেওয়া এই কার্যালয়টি অনেক রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান। কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অসংখ্য ছাত্রনেতার মিলনক্ষেত্র এবং পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার শিক্ষানবিসি শিক্ষাগার। ১৯৬৪ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' দু'টুকরো করার মহড়ার কেন্দ্রস্থলও ছিল এই ১৮৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের BPSF কার্যালয়।

ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিত আগে থেকেই ছিল :

পশ্চিমবঙ্গ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিত অনেক আগে থেকেই ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'দু-লাইন'-এর অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পার্টি নেতাদের কেন্দ্রানুগ যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে উঠেছিল, তা প্রসারিত হয়েছিল পার্টি পরিচালিত বিভিন্ন গণ সংগঠনের অভ্যন্তরেও। পূর্বেই এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে, ছাত্রফ্রন্টও এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত ছিল না। ছাত্র ফ্রন্টের পার্টি 'ফ্রাকসান কমিটি' কিংবা 'সাব কমিটি'-তে এই গোষ্ঠী-কেন্দ্রিকতার পরিচয় বহুবার বিভিন্ন ঘটনায় অথবা ইস্যুতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ছাত্রফ্রন্টে এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার ধারাবাহিকতা সমান ভাবেই বজায় ছিল। গণ সংগঠন BPSF-এর অভ্যন্তরে প্রকাশ্যভাবেই প্রতিফলন ঘটে। ১৯৬৪ সালের আগে, অর্থাৎ ষাটের দশক শুরু হতেই ১৯৬০ থেকে এই প্রতিফলন বিভিন্ন ভাবে প্রকট হতে শুরু করে।

BPSF-এর রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রতিফলন যে সব ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ১৯৬৪ সালের ছাত্রফ্রন্টের বিভাজনকে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে ঐ সব বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি হলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের জন্য তার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন ১৯৬৪ সালের 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' [BPSF]-এর বিভাজনকে বিশ্লেষণ করতে হলে—১৯৬০ সালের BPSF-এর 'শিলিগুড়ি বর্দ্ধিত কাউন্সিল অধিবেশন'; ১৯৬১-তে[১] উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বেহরামপুরে অনুষ্ঠিত AISF-এর বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভা; ঐ ১৯৬১-তেই হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব যুব উৎসবে' AISF-এর প্রতিনিধি প্রেরণ তিক্ত বিরোধের ঘটনা; BPSF-এর ষোড়শ সম্মেলন উপলক্ষে ছাত্র ফ্রাকসন মিটিং-এ তীব্র মতবিরোধের মত ঘটনাবলীকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

১৯৬০ শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত BPSF-এর বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভা ছিল প্রকৃত অর্থে এক বিরাট রাজ্য সম্মেলন। আয়োজন-অনুষ্ঠানে এবং প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে রাজ্য সম্মেলনের সমপর্যায়ভুক্ত। কাউন্সিল সদস্য ছাড়াও প্রায় তিন শতাধিক আমন্ত্রিত প্রতিনিধি এই কাউন্সিল অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' বা BPSF শুধু রাজ্যের ছাত্র সমাজের কাছে নয়, পশ্চিমবঙ্গের জনসমর্থনের তুঙ্গে অবস্থান করছে। গণ-আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেই BPSF এই ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনায় বাস্তবে BPSF-এর একচেটিয়া আধিপত্য। কংগ্রেস রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তার ছাত্র সংগঠনের কোন সংগঠিত ভূমিকার পরিচয় রাজ্যের কোন অংশেই ছিল না।

অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির ছাত্র সংগঠনের শক্তি-সামর্থও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাই, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র রাজ্যে এই ধরনের একচেটিয়া আধিপত্যের যুগে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বর্দ্ধিত কাউন্সিল অধিবেশন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পদে ছিলেন কমরেড গুরুদাস দাশগুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। শিলিগুড়ির এই বর্দ্ধিত কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজনের তদারকির দায়িত্বে BPSF-এর পক্ষে ছিলেন শিলিগুড়ি তথা রাজ্যের অন্যতম ছাত্রনেতা কমরেড বীরেন চক্রবর্তী। (যদিও পশ্চাদ ভূমিকায় মূল দায়িত্বে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটি এবং শিলিগুড়ি মহকুমা লোকাল কমিটি)।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক মহাদর্শগত সম্পর্কের এক জটিল আবর্তকে কেন্দ্র করে BPSF-এর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে দুই সমান্তরাল গোষ্ঠীর নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল, তার প্রতিফলনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বরূপে শিলিগুড়ি কাউন্সিল অধিবেশনে প্রকাশ পায়। অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়েছিল, সে রিপোর্টের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার আক্রমণ উপস্থিত কাউন্সিল সদস্য এবং প্রতিনিধিদের এক বিরাট অংশ করতে থাকে। বিশেষকরে, কলকাতা জেলার সদস্য ও প্রতিনিধিদের এক বিরাট অংশ ছিল প্রাদেশিক নেতৃত্বের সমালোচনায় সোচ্চার। এঁদের মধ্যে সমালোচনায় মুখর ছিলেন বঙ্গবাসী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রতিনিধিসহ বিপ্লব দাশগুপ্ত,[২] জীবনলাল বন্দোপাধ্যায়[৩] প্রমুখ। কাউন্সিল অধিবেশনে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সমালোচনাকে (যদিও বাস্তবে ঐ প্রতিবেদনে রাজনৈতিক মতাদর্শগত এমন কোন বিরোধাত্মক বিষয় ছিল না, যাকে কেন্দ্র করে ঐ ধরনের কঠিন সমালোচনা হতে পারে) কেন্দ্র করে BPSF-এর নেতৃত্ব অর্থাৎ পদাধিকারীদের পবিবর্তনের দাবি ওঠে। এই দাবি সোচ্চার হলে বর্দ্ধিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী পার্টি সদস্যদের ফ্রাকসান মিটিং বসাতে নেতৃবৃন্দ বাধ্য হন। ফ্র্যাকসান মিটিং বসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শিলিগুড়ি মহকুমা আঞ্চলিক কমিটির অফিসে। এই ফ্রাকসান মিটিং-এ পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটির দুজন নেতা কমরেড চারু মজুমদার এবং কমরেড রাজেন সিনহা (এই দুজনই এখন মৃত) উপস্থিত ছিলেন। সারারাত জেগে সভা করেও কোন মীমাংসায় পৌছনো গেল না। ছাত্র নেতৃবৃন্দ দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। নেতৃত্ব পরিবর্তনের পক্ষভুক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— কমরেড প্রতুল লাহিড়ী, দীনেশ মজুমদার, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ, পার্থ সেনগুপ্ত, হরিনারায়ণ অধিকাবী (এরা সকলেই BPSF-এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য) প্রমুখ। নেতৃত্ব পরিবর্তনে বিরোধীপক্ষীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—কমরেড গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, পল্টু দাশগুপ্ত, অশোক মাইতি, গৌরী বসু, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় (এরাও সকলে BPSF-এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য) প্রমুখ। প্রথম দিন রাতের ছাত্র ফ্র্যাকসন মিটিং ব্যর্থ হলো। ইতিমধ্যে একটি কাকতালিয় ঘটনা ঘটে। দার্জিলিং শহরে এই সময়ে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নেতৃত্বের কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী, হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং বঙ্কিম মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তিনজনই কলকাতা ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি নেমে আসেন। শিলিগুড়ি এসে পার্টি নেতৃবৃন্দ ছাত্র ফ্র্যাকসনের সভার অমীমাংসিত বিরোধ-বিতর্কের বিবরণ জানতে পারেন। ঐ দিন রাতে আবার প্রাদেশিক পার্টি নেতা কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের (কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী অসুস্থ থাকায় সভায় ছিলেন না) উপস্থিতিতে ফ্রাকসান মিটিং শুরু হলো। তুমুল বিতর্ক। রাত

প্রায় শেষ হতে চলেছে। ভোরের আকাশ দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে BPSF সম্পাদকমণ্ডলীতে আগামী রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য 'ম্যানডেট' দেওয়া হলো। অর্থাৎ নেতৃত্বের কোন পরিবর্তন হলো না এবং পরের দিন এই 'ম্যানডেট' মেনে নিয়েই BPSF-এর শিলিগুড়ি বর্দ্ধিত কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হল।[৪] অমীমাংসিত থাকলো প্রাদেশিক ছাত্র নেতৃত্বের গোষ্ঠীবিরোধ।

'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র (AISF) বেহরমপুর কাউন্সিল অধিবেশনের মূল বিরোধ ছিল রাজনৈতিক। সেই অনেক দিনের অমীমাংসিত বিতর্কিত বিষয় ন্যাশনাল ছাত্র ইউনিয়ন (NUS) গঠন এবং তাতে অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে কি হবে না। এই সর্বভারতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের গোষ্ঠীবিভাজন ঐ BPSF-এর শিলিগুড়ি বর্দ্ধিত কাউন্সিল অধিবেশনের মত প্রায় একইরকম ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কমরেড পি. সি. যোশী। ছাত্র পার্টি সদস্যদের সভায় 'NUS' বিতর্কের কোন সমাধান সূত্র মেলে না। গতানুগতিকতার মধ্য দিয়েই গোষ্ঠী বিরোধের উপাদান ও অস্তিত্ব বজায় রেখে বেহরমপুর কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হয়।

ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে AISF-এর কোঠায় ছাত্র-প্রতিনিধি প্রেরণ নিয়ে বিশেষ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র নেতৃত্বের স্তরে যে চাপা বিরোধেব সূত্রপাত ঘটেছিল, তা-ও কিন্তু ১৯৬৪ সালের বিভাজনের ইন্ধন যোগানোর অন্যতম উপাদান। কমরেড দীনেশ মজুমদার AISF-এর প্রতিনিধিরূপে হেলসিঙ্কির বিশ্ব যুব উৎসবে যোগদান করে ফিরে আসার পর BPSF-এর ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে তিক্ততার দিকে এগোতে থাকে।

১৯৬০-এর 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র ষোড়শ সম্মেলন আরও ঘটনাবহুল। এই সম্মেলনে যোগদানকারী ছাত্র প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজারের কাছে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল এবং আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে বিভিন্ন কমিশনে বিভক্ত হয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মনমেজাজ ছিল সংগ্রামী উদ্দীপনায় ভরপুর। BPSF-এর নেতৃত্ব কার্যত সেই সময়ে দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকার ফলে সমবেত প্রতিনিধিরাও ছিল দুই শিবিরে বিভক্ত। সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্যে দুই শতাধিকের উপরে প্রতিনিধি ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এই ছাত্র প্রতিনিধি পার্টি সদস্যরাও ছিলেন দুই গোষ্ঠীতে সমানভাগে বিভক্ত। এই সময় কমরেড দীনেশ মজুমদার ছিলেন BPSF-এর অন্যতম জয়েন্ট সেক্রেটারি। নেতৃপদ পরিবর্তনকারী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি তোলা হলো কমরেড দীনেশ মজুমদারকে BPSF-এর সাধারণ সম্পাদক করতে হবে। কমরেড গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এবং তাদের অনুগামী ছাত্র নেতৃবৃন্দ দীনেশ মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক করার দাবির তীব্র বিরোধীতা করেন। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল অন্যতম আরেকজন যুগ্ম-সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের নামও সাধারণ সম্পাদকের পদের জন্য পার্টি পর্যায়ে উত্থাপিত হয়েছিল।) ৮০ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জেলা পরিষদের[৫] অফিসে নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি মীমাংসার জন্য ষোড়শ সম্মেলনে আগত ছাত্র পার্টি সদস্যদের ফ্র্যাকসান সভা পর পর দু'রাত ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের 'ছাত্র-যুব সাব কমিটি'-র পক্ষ থেকে পার্টির রাজ্য-নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী, কমরেড জলিমোহন কল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কখনো ছাত্র নেতৃবৃন্দদের সাথে সলাপরামর্শ করেও কোন পক্ষের দাবি থেকে কোন পক্ষকে এক চুলও সরানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত ফ্রাকসান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পার্টি কমরেডদের এক বিরাট অংশ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে রাত ভোর হবার ঘন্টাখানেক আগে পার্টির রাজ্য নেতারা তদানিন্তন পার্টির রাজ্য দপ্তর ৬৪/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে চলে গেলেন। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এই রাজ্য দপ্তরেই থাকতেন। সম্ভবত কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখ নেতারা কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের সাথে পরামর্শ করতেই রাজ্য দপ্তরে গিয়েছিলেন। সবে মাত্র ভোর হতে চলেছে, সে সময় কলকাতা জেলা পরিষদ দপ্তরে ফিরে এসে পরিষদের হলঘরে ঘুমন্ত কমরেডদের জাগিয়ে তুলে যা বলেছিলেন, তার অর্থ হলো : কমরেডস, আমরা সমগ্র পরিস্থিতি আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত পৌঁছেছি। এই সিদ্ধান্ত পার্টির নির্দেশ হিসাবে আপনাদের মানতে হবে। সিদ্ধান্তটি হলো—'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র আগামী সভাপতি হবেন কমরেড দীনেশ মজুমদার এবং সাধারণ সম্পাদক হবেন কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। পার্টির এই নির্দেশ অনুসারে ষোড়শ সম্মেলনের মঞ্চে এই সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নেবেন।

বলা যায়, পার্টির নির্দেশ অর্থে এটা ছিল এক ধরনের পার্টি 'ম্যানডেট'। শেষ পর্যন্ত পার্টির নির্দেশ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র ষোড়শ সম্মেলনে গৃহীত হলো। কার্যত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে BPSF-এর রাজ্য নেতৃত্বের সমান্তরাল দু'গোষ্ঠীর মধ্যে আপাতত একটা সমঝোতা হলো। বাস্তবে কিন্তু দু'গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকলো। কমরেড প্রতুল লাহিড়ীর নেতৃত্বের প্রভাব ছিল সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নে প্রশ্নাতীত।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মধুর ক্যান্টিনের' মতই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীপ ক্যান্টিনে বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্ট ছাত্রদের নিয়মিত আড্ডা বা মজলিস বসতো। সুতরাং সে সুবাদে কমরেড প্রতুল লাহিড়ী প্রমুখদের যোগাযোগ কেন্দ্র বাস্তবে এই ক্যান্টিন-ই হয়ে দাঁড়ায়। কমরেড দীনেশ মজুমদার BPSF-এর সভাপতি হবার পর এই ক্যান্টিন-ই হলো নতুন সভাপতিকে কেন্দ্র করে যোগাযোগ-দপ্তর। অনুরূপভাবে BPSF-এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সংগঠনের কাজ চালতে লাগলেন BPSF-এর রাজ্যদপ্তর ১৮৬নং বিপীন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট থেকে। সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এইভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের গোষ্ঠীগত বিভেদ চলতে থাকলো।

১৯৬০ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে গোষ্ঠীবিভেদ মাথাচারা দেবার বাস্তব ভিত্তি ছিল। বাস্তব ভিত্তির দুইটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের পর রাজ্যে পরবর্তী সময়ে আর কোন বড় মাপের সংগঠিত গণআন্দোলন হয়নি, এমনকি উল্লেখ করার মত গণআন্দোলন বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ত, পঞ্চাশের দশকে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের পর ছাত্র সমাজের শিক্ষাগত সমস্যাকেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র নেতৃবৃন্দ সংঘটিত করতে পারেনি এবং কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিও ছাত্র সমাজের কাছে ষাটের দশক শুরুর গোড়ায় উপস্থিত করেননি। ফলে মরশুমি আন্দোলনের ঢিমেতালে চলার পুরানো গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করা গেল না। খাদ্য আন্দোলনে এবং

কেরালার কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে দেবার বিরুদ্ধে আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ যে সংগ্রামী মেজাজে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, সে উদ্দীপনা আরও উদ্দীপনাময় সংগ্রামী আন্দোলনের অভাবে ঝিমিয়ে পড়লো। ছাত্রসমাজের তারুণ্য ও মনমেজাজ সব সময় যে সংগ্রামী উদ্দীপনার আঁচে উদ্দীপ্ত হয়, সে পরিস্থিতির অনুপস্থিতি ছাত্রসমাজে হতাশার সৃষ্টি করে এবং অলস সময়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীকোন্দল এবং বিভেদের পরিবেশকে বাড়িয়ে তোলে।

১৯৬১ সাল 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব' অনুষ্ঠানের বৎসর হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ বিরোধের পরিণতিতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' রাজ্যব্যাপী উদ্দীপনাময় কোন সাংগঠনিক কর্মসূচি নিতে পারেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্তের সভাপতিত্বে গঠিত ছাত্র-শিক্ষক ও যুবকদের এক যুক্তকমিটি গঠন করে কোনরকমে কিছু গতানুগতিক অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। অথচ ওপার বাংলায় (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে) রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সরকারের সংকীর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের সংগ্রাম এবং রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের প্রচেষ্টার তুলনায় পশ্চিম বাংলার ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ম্লান। ছাত্র ফেডারেশনের গোষ্ঠী বিরোধই সেজন্য দায়ী।

১৯৬০ থেকে ১৯৬২-র এই ছাত্র আন্দোলন বিমুখীন পরিবেশের মধ্যেও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র নেতৃত্বের একাংশের অনীহা সত্ত্বেও অপর অংশের সক্রিয়তার ফলে কিছু আঞ্চলিক স্তরের ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। যেমন :

পশ্চিমবাংলায় প্রাকস্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবার জন্য রাজ্য সরকার কিছু L. C. College [Licentiative Cource, College] স্থাপন করেছিল। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (B. P. C. Institute of Technology) এই ধরনের একটি অগ্রণী L. C. College ছিল। BPSF-এর নদীয়া জেলা কমিটি আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্রদাস ইনস্টিটিউটে ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের অধিকার আদায় করে। এরপর থেকে পরপর কয়েক বছর ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশন জয়লাভ করে। এই ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের লাইসেন্সসিয়েটিভ কোর্সের ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রাজ্য গোষ্ঠী আন্দোলন সংগঠনের জন্য E.W.B.T.S.F. নামে একটি নতুন সংগঠন তৈরি করা হলো। ১৯৬১ সালে 'West Bengal Engineering and Technological Students Federation' সংক্ষেপে W.B.E.T.S.F. বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সংগঠনটি একটি বিভাগীয় আন্দোলনও গড়ে তুলেছিল। বিশেষ করে কোর্স শেষ করার পর চাকরীর দাবিটি এইসময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক, যাদবপুর পলিটেকনিক এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বর্ধমান পলিটেকনিক, বীরভূম সিউড়ি পলিটেকনিক' বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর পলিটেকনিক, পুরুলিয়া পলিটেকনিক, জে. সি. ঘোষ পলিটেকনিক, কলকাতা প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা এই WBETSF-এর সদস্য হয়েছিল। মদন সাহা ছিলেন এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক। অন্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল নতুন ঐ সংগঠনের স্বীকৃতি দান এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্তির পর ডিগ্রি কোর্সে পড়ার সুযোগ দান। এই সংগঠনে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রধান নেতৃত্ব ও ভূমিকায় ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ও কর্মী কমরেড মদন সাহা, কিশোর সরকার, মঞ্জু বক্সি, অশোক ঘোষ, সুশীল চক্রবর্তী, সুনীল ব্যানার্জী, পার্থ হালদার প্রমুখ। কিন্তু BPSF-এর নেতৃত্বের প্রধান

অংশের এই সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনে অনিহার ফলে BPSF-এর নেতৃত্বের সংগ্রামী অংশের সাথেই L.C. কলেজগুলির ছাত্রদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। সারা রাজ্যে এই সময়ে L.C. কলেজের ছাত্র সংখ্যা ন্যূনপক্ষে দশ হাজারের অধিক ছিল। এই ছাত্রদের মধ্যে তাঁদের দাবি ও সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের একটি ক্ষীণধারা ১৯৭০ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু পরিবারের ছাত্রদের নিয়েও একটি আন্দোলন এই সময়ে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম বাংলার প্রায় সব জেলাতে বিভিন্ন স্তরের 'কলোনী' এবং 'ক্যাম্প'-এ প্রায় এক কোটির কাছাকাছি উদ্বাস্ত বসবাস করতেন। এই উদ্বাস্তুদের পরিবারগুলিতে প্রায় দু'লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় রত এই সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ভারত সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ পড়াশুনার জন্য বিশেষ বৃত্তি বা 'স্টাইপেণ্ড' দিত। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে ভারত সরকার এই উদ্বাস্তু ছাত্রবৃত্তি পর্যায়ক্রমে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে কলকাতা এবং ২৪ পরগণার, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, দমদম, বেলঘরিয়া, পানিহাটি প্রভৃতি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চল এবং নদীয়া, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার উদ্বাস্তু ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। BPSF.-এর প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের একাংশ এই ক্ষেত্রেও আন্দোলন সংগঠনে তাঁদের অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মতে উদ্বাস্তু ছাত্রবৃত্তি চালু রাখার দাবিতে আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজের কাছে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনরূপে বিবেচিত হবে, তাই এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা ঠিক হবে না। এই ক্ষেত্রেও BPSF-এর সংগ্রামী অংশ আন্দোলন সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি সাপেক্ষে আন্দোলন সংগনের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি সাপেক্ষে চাপ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পার্টির হস্তক্ষেপে আন্দোলন সংগঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় ভূমিকায় এবং শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ-এর সহযোগিতায় নদীয়া জেলার রাণাঘাটে 'স্বাস্থ্য উন্নতি হলে' উদ্বাস্তু ছাত্রদের বৃত্তি চালু রাখার দাবিতে প্রথম বিরাট কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশন উদ্বোধন করেছিলেন পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় শিক্ষক নেতা কমরেড সত্যপ্রিয় রায়। এই কনভেনশনের পরই কলকাতার থিয়েটার রোডে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সামনে BPSF-এর নেতৃত্বে উদ্বাস্তু ছাত্রদের এক বিরাট বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনের ফলে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন BPSF-এর তখনকার 'সংগ্রামী' নেতৃত্বের দিকেই ঝুঁকে ছিল।

স্কুলের ছাত্রদের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানো এবং স্কুলে ছাত্র ফেডারেশনের শাখা সংগঠন গড়ে তোলার বিষয় নিয়েও BPSF নেতৃত্বের অভ্যন্তরে ছিল বিতর্ক। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও এলাকাভিত্তিক কোন কোন ছাত্রনেতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুলে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। স্কুলের ছাত্রদের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছিল।

উপরে উল্লিখিত এই ছোটখাট আন্দোলনগুলির মর্মবস্তুও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র বিভাজন প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠী বিন্যাসের উপাদান হিসাবে কাজ করে।

বিভাজন প্রক্রিয়ার গোষ্ঠী বিন্যাসের ক্ষেত্রে সেই সময়ের কমিউনিস্ট রাজনীতির মতাদর্শগত বিষয়গুলিও কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা-ও ১৯৬০-৬২-র পটভূমিতে দেখা দরকার।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে মতাদর্শগত মতবিরোধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এবং বিতর্কের সূচনা হয়েছিল, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ছড়াতে শুরু করেছিল পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্বে এবং ষাটের দশকের আরম্ভের বছরগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-যুব কমিউনিস্ট কমরেডদের চিন্তাজগতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিরোধের আঁচ লেগেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। তাই, ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র ছাত্রনেতাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কেন্দ্রিক কোন গোষ্ঠী বিভাজনের প্রতিফলন ঘটেনি এবং সেভাবে কোন গোষ্ঠীও গঠন হয়নি। ছাত্র নেতৃত্বের মধ্যে যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা ছিল, তা প্রকৃতপক্ষে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রাজনীতির কেন্দ্রানুগ এবং পার্টি নেতৃত্বের ব্যক্তিগত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনে 'সংশোধনবাদ' এবং 'সংশোধনবাদী' কথাটি বহুল প্রচলিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৬১তে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ নবম রাজ্য সম্মেলন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধনবাদকে কেন্দ্র করে ছাত্র নেতৃত্বে গোষ্ঠী গঠন হয়নি বলেই পার্টির বর্ধমান রাজ্য সম্মেলনের ঐরূপ গোষ্ঠীভিত্তিক ছাত্র প্রতিনিধির উপস্থিতি ছিল না।[৬] পার্টির বর্ধমান রাজ্য সম্মেলন থেকেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের পর থেকেই মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও পারস্পরিক বিতর্ক দানা বাঁধতে থাকে। ছাত্রফ্রন্টে তার প্রতিফলনের একটি আবছা রেখা ফুটে ওঠে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস তিক্ততার পরিবেশে শেষ হবার পর পার্টির অভ্যন্তরীণ বিতর্ক পার্টির বিভিন্ন ফ্রন্ট ও গণসংগঠনে ছড়াতে শুরু করে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, কৃষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন এবং ছাত্র-যুব সংগঠন প্রভৃতি গণসংগঠন এবং পার্টির ফ্রন্টাল্ কমিটিগুলিতে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিতর্কের পটভূমিতে ৬ষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস মুখোমুখি পরস্পরবিরোধী দুটি গ্রুপ নতুন করে গঠনের ইন্ধন যোগায়। অপরদিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিরোধ এবং চীন ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তিক্ত সম্পর্ক ও মতবিরোধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সব ফ্রন্টেই দুটি করে গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে।

ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালের প্রারম্ভে ভারত এবং চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। 'পঞ্চশীলের নীতি'[৭] লঙ্ঘিত হয়। 'ম্যাকমোহন লাইন' নিয়ে তিক্ত বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। লাডাক প্রভৃতি দুরতিগম্য সীমান্ত অঞ্চলে চীন ও ভারতের সৈন্যবাহিনীর গুলি বিনিময়ের ঘটনা, ছোটখাট পর্যায়ের সীমান্ত সংঘর্ষ, উভয় দেশের সরকারী পর্যায়ে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত সব ফ্রন্ট এবং পার্টির মহলে বিভিন্ন ধরনেব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের বিভিন্ন তিক্ত ঘটনাবলী, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত মতবিরোধ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েতই ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তিক্ত সম্পর্ক, সর্বশেষে চীন- ভারত সীমান্ত

বিরোধ—পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টে নতুন মোড় নিয়ে এলো। মূলত ছাত্রনেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের গোষ্ঠীগত আগেকার প্রেক্ষাপট পাল্টানোর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে ১৯৬১-র শেষ এবং ১৯৬২-র শুরুতে ছাত্রনেতাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা, কান-কথা, পার্টির উচ্চস্তরের কোন নেতা কি ভাবছেন ইত্যাদি নানাবিধ আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এই সময়ে রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে থাকার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টে বিভিন্ন বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা এবং একের বিরুদ্ধে অপরের সমালোচনা, কুৎসা নিন্দামন্দ করে অলস সময় কাটানোর পরিবেশ বেশি করে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠলো।

রাজনৈতিক স্তরে ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও ব্যক্তিগত বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে ছাত্রনেতাদের যে দুটি গ্রুপ গড়ে উঠেছিল, সে দুটি গ্রুপের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মনে ১৯৬১-৬২-এর ঐ পরিপ্রেক্ষিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার বীজ বপন করে। অর্থাৎ ঘনায়মান হয়ে ওঠে বন্ধু বর্জনের নিজস্ব চিন্তাভাবনার রজ্জুতে এবার টান পড়ে। নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থানের স্রোতের দিকে মুখ ঘোরানোর সময় যেন হয়ে এলো প্রত্যাসন্ন।

পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান রাজ্য সম্মেলন থেকে প্রতিষ্ঠিত পার্টি নেতৃত্বের কব্জা ছাত্রফ্রন্টে খুবই দুর্বল ছিল। কিন্তু ঐ সময়কার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থান পার্টি নেতৃত্বের কব্জা সবল করার সুযোগ এনে দেয়। রাজনীতির ঘোলা জলে ছাত্রফ্রন্ট থেকে সমমতাবলম্বীর অনুসন্ধান চলে।

এইভাবে ঘটনার পরস্পরাগত বিষয়বস্তুকে ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাজালে দেখা যায়, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র আনুষ্ঠানিক ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিত অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল।

আনুষ্ঠানিক ভাঙন এল কিভাবে?

কমরেড দীনেশ মজুমদার বিশ্ব যুব উৎসব থেকে ফিরে আসার পর এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সভাপতির পদে আসীন হবার পর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। স্বল্পকালের মধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে চীন-ভারত বিরোধকে কেন্দ্র করে এক নতুন আবর্ত আসে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ১৯৬২-র ১৩ই অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'চীনা হানাদার' হটানোর হুকুম দিলেন। এদিন থেকে সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কমিউনিস্টদের একাংশের মতে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং কমিউনিস্টদের অপর অংশসহ জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতে চীন-ভারত যুদ্ধ যাই হোক না কেন, ঐ ১৩ই অক্টোবরের পর থেকে সারা ভারতে উগ্রজাতীয়তাবাদের বন্যা বইতে শুরু করে। দেশে আপতকালীন জরুরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়, ভারত রক্ষা আইনের নিবর্তনমূলক এবং আইনগত বিভিন্ন বাধা-নিষেধ জারি করা হয়। চালু হয় 'স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন'। ভারত সরকার দ্বারা গঠিত 'প্রতিরক্ষা তহবিলে' অর্থদানের আবেদন করা হলো।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের এক বিরাট অংশ চীনকে আক্রমণকারী বলতে নারাজ। এই অংশের মতে চীন ভারত যুদ্ধ নয়, এটা চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বহুদিনের পুরানো চালু নীতি অনুসারে কোন

সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করতে পারে না— এই বিশ্বাস এই অংশের কমরেডদের মনে বদ্ধমূল ছিল। তারা ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা তহবিলেও অর্থ দিতে অস্বীকার করলেন। কমিউনিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি একযোগে কমিউনিস্টদের 'দেশদ্রোহী'বলে চিহ্নিত করতে শুরু করলো এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চলতে থাকলো চরম বিষোদগার।

এই পটভূমিতে পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একপক্ষ জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে এবং অপরপক্ষ জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের বিপক্ষে।

ছাত্রফ্রন্টের পার্টি সদস্যদের মধ্যে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত সোচ্চার হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রাদেশিক নেতৃত্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছাত্র কমরেডদেরও বিপুল অংশের ঝোঁক পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের অনুকূলে প্রকাশিত হতে থাকে।

এই পরিস্থিতি চলতে চলতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিচ্ছিন্নভাবে 'ভারত রক্ষা আইনে' কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার শুরু হয়।[৮] নভেম্বরের ২১ তারিখের মধ্যরাতে চীনপন্থী অভিযোগে সারা ভারতে [All India Round up] সহস্রাধিক কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। পশ্চিমবাংলায় ২১শে নভেম্বরে পূর্বে ১১ই নভেম্বর 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কমরেড হরিনারায়ণ অধিকারীকে 'ভারত রক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার করা হয়। এরপরে ২১শে নভেম্বরের 'অল ইণ্ডিয়া রাউণ্ড আপে' গ্রেপ্তার হন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সাধারণ কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। পশ্চিমবাংলায় রাজ্যস্তরের এই দু'জন ছাত্রনেতাই চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সভাপতি কমরেড দীনেশ মজুমদার সহ আর সকল ছাত্রনেতাই জেলের বাইরে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও পুলিশের ভুল রিপোর্টে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবপন্থী কয়েকজন পার্টি নেতাকে পশ্চিমবাংলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সম্ভবত পুলিশের গোয়েন্দারা কমিউনিস্টদের কে 'চীনপন্থী' কে 'রুশপন্থী'—তা তখন সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি বলেই এই ধরনের গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র নেতৃত্বাধীন ছাত্র আন্দোলন এবং তার সাংগঠনিক শক্তি পশ্চিমবঙ্গে ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়া সত্ত্বেও এই রাজ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনই ছিল ছাত্র সমাজের প্রধান সংগঠন। কিন্তু চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের মুহূর্তে ছাত্র ফেডারেশন আরও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো, কার্যত প্রধান ছাত্র সংগঠনের তখন কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সাংগঠনিক নেতৃত্ব তখন গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্যকে কেন্দ্র করে তাঁদের অনুগামীদের হাতে। সাংগঠনিক নেতৃত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান এই অংশে বেশিরভাগ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের সমর্থক হবার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনের বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেল। পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজকে প্রভাবিত করতে শুরু করলো উগ্র জাতীয়তাবাদ। তীব্র চীন-বিরোধী জেহাদ পরিণত হলো

উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায়। কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা ও কর্মীরা অভিযোগ উত্থাপনকারীদের দ্বারা 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত হলো।

রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসের দিক থেকে পশ্চিমবাংলায় তখনও জাতীয় কংগ্রেস শাসকদল এবং শাসক গোষ্ঠী হিসাবে পশ্চিমবাংলায় প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়েছে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই। এরপর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। রাজ্য কংগ্রেস এবং তথা রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অতুল্য ঘোষ এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিব তদানিন্তন ইতিহাসে এঁদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা সুবিদিত। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং ভারত সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি অতুল্য ঘোষ এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখদের উগ্র জাতীয়তাবাদ তীব্র করার পক্ষে প্রচণ্ড সুযোগ এনে দেয়।

বিশেষ করে, অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনকে এই রাজ্যে চাঙ্গা করে তোলার কাজে চীন-ভারত সীমান্ত 'যুদ্ধের' সুযোগে বিশেষ নজর দেন। ১৯৪১ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' [AISF] থেকে কংগ্রেসী ছাত্র নেতা ও কর্মীরা বেরিয়ে গিয়ে ছাত্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় থেকে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠন অবিভক্ত বাংলায় এবং পরে পশ্চিমবঙ্গে কোন দিন-ই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৬১-৬২-৬৩ সালেও পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের কাছে 'ছাত্র পরিষদ'-এর নাম ছিল অজ্ঞাত। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের কোন ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল বলা হলে, তা অত্যুক্তি হবে না। কমিউনিস্ট বিরোধী কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা ইউনাইটেড স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন [USO], S.W.S.O. প্রভৃতি নামে সংগঠন গড়ে কংগ্রেসের রাজনীতির প্রচার করতেন। চীন-ভারত 'সীমান্ত যুদ্ধ'-এর সময়ে এইসব সংগঠনগুলির সক্রিয় হয়ে উঠলো। প্রকৃতপক্ষে এই সংগঠনগুলি ছিল কংগ্রেসের ছদ্ম সংগঠন। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারে এই ছদ্ম সংগঠনগুলি বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার কলেজগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এদের প্রচারের অভিমুখ ছিল কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন ও ছাত্রনেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ.এস.ও. 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র বিরুদ্ধে এক তীব্র ঘৃণা উদ্রেককারী অভিযান চালায়। এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ.এস.ও. তথা ছাত্রপরিষদের প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন শ্যামল ভট্টাচার্য।

এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্র সংগঠনগুলিও এই সময় তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানে সামিল হয়েছিল। আর এস পি-র ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ, ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র সংগঠন-ছাত্র ব্লক, এস ইউসি-র ছাত্র সংগঠন ডি এস ও— কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ঘৃণা উদ্রেগকারী অভিযান চালায়। ১৯৫৯ সালে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনেব প্রধান ভিত্তি ছিল পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্য। বামপন্থী দলগুলির এই ঐক্যের ফলেই গড়ে উঠেছিল 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ' কমিটি। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে খাদ্য আন্দোলন যত তীব্র হয়েছে, পশ্চিম বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও রূপ তত সুসংহত হয়েছিল। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' বা বি পি এস এফ বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান শক্তি হলেও ছোট বড় সকল স্তরের বামপন্থী দলগুলির ছাত্র সংগঠনগুলির মিলিত

ঐক্য শাসকগোষ্ঠীর প্রচণ্ড আক্রমণ মোকাবিলায় তখনকার দিনে ছিল এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। পশ্চিম বাংলার এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন ভারত তথা উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রেরণা ও অনুকরণীয় বলেই বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু 'চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে' একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং অপরদিকে বামপন্থী রাজনীতি ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নানাবিধ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বামপন্থী শক্তির অভ্যন্তরে বিভেদ ও অনৈক্যের জন্ম দেয়। ফাটল ধরে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ঐক্যে। পি এস ইউ, ছাত্র ব্লক, ডি এস ও প্রভৃতি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। এই তিনটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে ভারত সরকারের যাবতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন জানালো।

সংগঠনের কাঠামোগত পরিস্থিতির বিচারে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'ও প্রকাশ্যে পি এস ইউ, ছাত্র ব্লক এবং ডি এস ও-এর অনুরূপ ভূমিকা আগেই গ্রহণ করেছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিতর্কেব বিচারে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের আলোকে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণ ক্ষমতা ছিল একদিকে রুশপন্থী তথা জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবপন্থীদের হাতে। যা সাধারণভাবে পরিচিত ছিল নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ও গুরুদাস দাশগুপ্তের গোষ্ঠী-নেতৃত্ব বলে। নীতি নির্দ্ধারণ ক্ষমতা এঁদের হাতে থাকার ফলেই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র পক্ষ থেকে ১৯৬২ সালের ২য় সপ্তাহে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয় এবং প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানের জন্য ছাত্র ফেডারেশন পরিচালিত ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে এবং সামগ্রিকভাবে ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানান হয়। এতদসত্ত্বেও কিন্তু ২১শে নভেম্বরের 'অল ইণ্ডিয়া রাউণ্ড আপে' 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডাশেনে'র সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হলেন।

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে' দু'জন ছাত্রনেতা (নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এবং হরিনারায়ণ অধিকারী) গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনিক নেতৃত্ব ছাত্রবন্দিদের মুক্তির দাবিতে কোন আন্দোলনের আহ্বান জানালেন না, কিংবা অনেকের মতে ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিস্থিতির চাপে বন্দিমুক্তির আন্দোলন সংগঠিত করলেন না। যুক্তি হিসেবে বিষয়টিকে কৌশলগত কারণরূপে দেখানোর প্রচেষ্টা হলেও তা সকলের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যা ছিল বাস্তব, তা হলো— 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; সরকার ও উগ্রজাতীয়বাদীদের আক্রমণের মুখে নেতৃত্বের অনেকে নিজেদের আত্মরক্ষা ও গ্রেপ্তার এড়ানোতে ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কার্যালয়ে নেমে আসে নিস্তব্ধতা এবং বেশিরভাগ দিন-ই তখন এই কেন্দ্রীয় কার্যালয় বন্ধ থাকতো।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিতর্কে চীন-সোভিয়েত বিরোধ ১৯৫৬ সাল থেকে যা ঘটাতে সক্ষম হয়নি, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ বা সংঘর্ষ তা প্রকাশ্যে ঘটাতে সক্ষম হলো। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট এবং তার গণসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনে বিভেদ অনিবার্য হয়ে উঠলো। বিশেষকরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র কলকাতা মহানগরীকেন্দ্রিক পরিচিত ছাত্রনেতাদের মধ্যে—

প্রতুল লাহিড়ী, গুরুদাস দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, গোপাল মুখার্জী, পল্টু দাশগুপ্ত, পার্থ সেনগুপ্ত, কমল গাঙ্গুলী, বনদেব মুখার্জী প্রমুখরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়ালেন। এই অবস্থায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি দীনেশ মজুমদার কার্যত তখন নিঃসঙ্গ। তিনি গ্রেপ্তার না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে ঐ মুহূর্তে জেলাস্তরের তাঁর অনুগামীদের সংগঠিত করার পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। তাই, দীনেশ মজুমদারের পক্ষে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। চীন কর্তৃক একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা থেকেই এই পরিবর্তনের সূচনা। পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর উগ্রতা ক্রমান্বয়ে থিতিয়ে আসতে শুরু করে। কিন্তু উগ্রজাতীয়তাবাদকে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। ৬২-র ২৯শে অক্টোবর কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ৬৪/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য দপ্তরের সামনে এক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বিক্ষোভ মিছিলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তখনকার বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাওসেতুং-এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। জ্যোতি বসু চীনকে আক্রমণকারী বলতে অস্বীকার করেছিলেন। ছাত্র পরিষদের নেতা শ্যামল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক উত্তেজিত ছাত্রপ্রতিনিধিদল জ্যোতি বসুর পদত্যাগ দাবি করেন। জ্যোতি বসু নির্ভিকভাবেই ঐ উত্তেজিত প্রতিনিধি দলের মোকাবিলা করেছিলেন।

৩রা ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে 'দেশরক্ষার শপথ'-এর নামে যে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার বিবরণ অনুধাবনযোগ্য। ছাত্র সমাজের মানসিকতা এবং বিভিন্ন মতের ছাত্রদের ঐ বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়। ষাটের দশকের কলকাতার একজন উঠতি ছাত্রনেতার লিখিত পুস্তিকায় এই প্রাসঙ্গিক বিবরণ নিম্নরূপ :

"ছাত্র ফেডারেশনের যে অংশ চীনকে আক্রমণকারী বলেছিল, তাদের নেতা, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য তখন জেলে। ছাত্র ফেডারেশনের চীন বিরোধী অংশ প্রতিরক্ষার কাজে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে পুরোপুরি হাত মেলালেও ছাত্র পরিষদ সেই সহযোগিতাকে বিশেষ আমল দিল না। দেশরক্ষার শপথ নিতে তেসরা ডিসেম্বর, ১৯৬২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে বিশাল সমাবেশ হয়, সে সমাবেশে শতকরা আশিজন ছাত্রই ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে এলেও সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ছাত্র পরিষদের শ্যামল ভট্টাচার্য। ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা জেলার বেশ কিছু নেতা পার্থ সেনগুপ্ত, কমল গাঙ্গুলী, সুধীর চ্যাটার্জী, বনদেব মুখার্জী প্রমুখ সেখানে হাজির থাকলেও তাঁদের কাউকে বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। মঞ্চে ওঠারও সুযোগ পায়নি কেউ। শ্যামল ভট্টাচার্য ছাড়া ছাত্র ব্লক, পি এস ইউ এবং ডি এস ও-র বক্তারা বক্তৃতা করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ফেডারেশনকে শায়েস্তা করাই যে প্রকৃত দেশপ্রেমের কাজ, নানা ভাষায় সব বক্তা একথা বলেছিলেন। একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার, কলকাতায় তখন ছাত্র পরিষদের সংগঠন বিশেষ কিছু ছিল না। সচেতন ভদ্র ছেলেরা ছাত্র পরিষদ করতে লজ্জা পেতেন। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন ছাত্ররা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছদ্মনামে, যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ এস ও, স্কটিশচার্চ কলেজে এম ডব্লু এস ইত্যাদি পরিচয়ে ছাত্র সংগঠন করতেন।" (শৈবাল মিত্র, ষাটের ছাত্র আন্দোলন, পৃষ্ঠা— ১৭)

চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি যুদ্ধের আবহাওয়াজনিত উত্তেজক পরিস্থিতিকে প্রশমিত করে যখন স্থিতাবস্থার দিকে মোড় নিয়েছে তখন উপরে বর্ণিত উপায়ে পশ্চিম বাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যে উত্তেজনা জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা ছিল অব্যাহত।

ইতিমধ্যে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তিত্ব সোচ্চার হতে শুরু করেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'আনআর্মড ভিক্টরি' বইটির উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'দ্য সিনো ইণ্ডিয়ান বর্ডার কনফ্লিক্ট' কলকাতার বুদ্ধিজীবী এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হতে থাকে। পিকিং রিভিউ-এর বিভিন্ন সংখ্যা,[৯] মেজা গুনবর্ধনের 'হুইদার ইণ্ডিয়া চায়না রিলেসন', বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন দলিলপত্র পঠন-পাঠনে সচেতন ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শ্রীলঙ্কার তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি শিরোমাভো বন্দরনায়েক তাঁর বিখ্যাত 'কলম্বো প্রস্তাব' নিয়ে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসায় এগিয়ে আসেন। একদিকে ভারত সরকার এবং চীন সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে, অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই-এর মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় চলতে থাকে। ফল হলো উত্তেজনার প্রশমণ। কুৎসাসহ উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারে ভাটার টান। ঐ অবস্থায় সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের কাছে উগ্রজাতীয়তাবাদ বিশ্বাস-যোগ্যতা হারায়। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং জেনারেল কারি আপ্পার মত ব্যক্তিদের কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের কাছে ক্রমান্বয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

চীন বিরোধী এবং কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার মূল্যহীন হয়ে পড়ার সাথে সাথে পশ্চিম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চীন সম্পর্কে বাড়তে থাকে আগ্রহ। ষাটের দশকের শুরুতে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পশ্চিমী দুনিয়ার দেশে-দেশে যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার উৎসাহ উদ্দীপনার আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে চীন ও ভিয়েতনামের ভূমিকা। তখনকার পশ্চিমীদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব পাকিস্তানে ঐ আন্দোলনের স্পর্শ লাগে। ভারতের ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল পশ্চিম বাংলাও এই স্পর্শের বাইরে থাকলো না। পশ্চিম বাংলার ছাত্রসমাজের এক বিরাট অংশের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী সংগ্রামে চীন এক অনুকরণীয় প্রতীকরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। ছাত্র আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পটভূমি সংগ্রামী ছাত্র সমাজের মানসিকতায় চীনকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এই একই কারণে পশ্চিম বাংলার ছাত্র সমাজের কাছেও চীন হয়ে ওঠে সংগ্রামের প্রতীক, উগ্রজাতীয়তাবাদ হারাতে থাকে বিশ্বাসযোগ্যতা।

পশ্চিম বাংলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী এবং চীনাপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের বিরাট অংশকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করা হলেও নেতৃত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি।

যাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রভাবশালী সদস্য সমর মুখার্জি। সমর মুখার্জি আত্মগোপন অবস্থায় ছদ্মনাম

গ্রহণ করলেন পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজকে কেন্দ্র করে পার্টির শিক্ষা-সাহিত্য ও বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টের অন্যতম নেতা পীযূষ দাশগুপ্ত প্রমুখ 'চীনাপন্থী' বলে পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র গোপন সংগঠন [Under ground organisation] গড়ে তোলা হয়। সর্বভারতীয় স্তরে অনুরূপ একটি গোপন সংগঠনের কাঠামো সর্বভারতীয় পার্টিনেতা এ কে গোপালনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, গোপালন প্রকাশ্যেই কাজকর্ম চালাতেন এবং আত্মগোপনকারী নেতাদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ কে গোপালনের সাথে পশ্চিমবঙ্গের আত্মগোপনকারী সমর মুখার্জির (পৃথ্বীরাজ) যোগাযোগ ছিল। ভারত রক্ষা আইনে আটক পার্টিনেতারা ক্রমান্বয়েই সুনিশ্চিত হলেন যে— রুশপন্থী বা জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে এক সাথে পার্টি করা যাবে না, পার্টিতে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। তাই জেলে আটক নেতারা নিজেদের মধ্যে এই পরিণতির কথা ভেবেই সংগঠিত হতে শুরু করেন। 'জেল কমিটি' গড়ে তোলা হয়। জেল থেকে জেলের সরকারী সিপাই কর্মচারীদের সহযোগিতায় 'জেল কমিটি'-র সাথে পশ্চিমবঙ্গের আত্মগোপনকারী নেতৃত্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। জেলের ভেতর থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার-ই আত্মগোপনকারী নেতৃত্বের সাথে প্রধানত যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতেন। এই সময় জেলের মধ্যে আটক জ্যোতি বসু এবং তাঁর অনুগামী কয়েকজন নেতা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আলাদা পার্টিগঠনের উদ্যোগ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেন। ইতিমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের অনুগামী বিশ্বনাথ মুখার্জি, ভবানী সেন, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ পার্টিনেতারা পার্টি দপ্তর, পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, পার্টি সংগঠন নিজেদের দখলে নিয়েছেন। পার্টির পত্রিকায় নিজেদের মতামত প্রকাশ করছেন এবং ভারতরক্ষা আইনে আটক কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের মুক্তি সম্পর্কে অবলম্বন করলেন নিস্তব্ধ নীরবতা। প্রসঙ্গক্রমে এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকা ভারতের কমিউনিস্ট বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা চিহ্নিত 'চীনপন্থী' কমিউনিস্টদের কাছে জেলে আটক কমিউনিস্ট বন্দিদের মুক্তির বিষয়টি জরুরী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির সপক্ষে প্রচার অভিযানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া 'চীন- ভারত সীমান্ত যুদ্ধের' পরিণতিতে দেশের সর্বত্র জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের গণ-আন্দোলনগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়। বন্দি মুক্তি এবং জনজীবনের সমস্যা নিয়ে গণআন্দোলন সংগঠনের বিষয়ে 'জেল কমিটি' এবং আত্ম-গোপনকারী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বাধীন গোপন সংগঠনের সাথে মতামত বিনিময় হলো। সিদ্ধান্ত হলো 'বন্দিমুক্তি গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি' গঠনের। সমস্যা দেখা দিল প্রচারের মাধ্যম হাতিয়ার নিয়ে। কারণ, পার্টির গোপন সংগঠনের হাতে কোন পত্র-পত্রিকা-ই ছিল না। এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তার ফসল হলো 'দেশহিতৈষী' পাক্ষিক (পরে সাপ্তাহিক) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। 'হাওড়া হিতৈষী'-কে 'দেশহিতৈষী' নামে পরিবর্তিত করা হয়। 'দেশহিতৈষী' সম্পাদনা এবং প্রকাশনার দায়িত্বে এগিয়ে এলেন পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহিত মৈত্র।[১৩]

বন্দি মুক্তির প্রচার অভিযান শুরুর সূচনা পর্বে জেলে আটক কমিউনিস্ট বন্দিদের ফটোগ্রাফসহ পরিচিতি পর পর দেশহিতৈষী-র কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'দেশহিতৈষী'

বাস্তবে সংগঠকের ভূমিকা নেয়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কমরেডদের ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করে। দেশহিতৈষী আরেকটি নতুন পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। দেশহিতৈষী-র দপ্তর খোলা হয়েছিল ধর্মতলা স্ট্রীটে। ধর্মতলা স্ট্রীটের এই দপ্তরটিই গোপন পার্টির প্রকাশ্য দপ্তররূপে কাজ শুরু করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করছে বাংলার ছাত্রসমাজ। দেশভাগের পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিম বাংলার ছাত্র সমাজ ও সেই পুরানো ঐতিহ্যকে বহন করে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির সংগ্রামে বারবার সামিল হয়েছে। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ১৯৬২ সালের শেষার্ধে, কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিভেদ ছাত্রসমাজকে বন্দি মুক্তির প্রশ্নে তার কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করলো না। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' তার কর্তব্য পালনে ছিল অপারগ। প্রায় এক বৎসর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মী সহ সচেতন অগ্রণী ছাত্রসমাজ বন্দি মুক্তির প্রশ্নে ছিল নীরব।

'দেশহিতৈষী' পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার অভিযান এবং বন্দিমুক্তি গণদাবী প্রস্তুতি কমিটি গঠন, দেশহিতৈষী দপ্তরে যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন একদল ছাত্রকর্মীকে উৎসাহিত করে তোলে। 'বঙ্গীয় প্রদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সভাপতি দীনেশ মজুমদার সুযোগ পেলেন এই উৎসাহিত ছাত্র কর্মীদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের। জেল কমিটি এবং পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকে বন্দিমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের সংগঠিত করার নির্দেশও এলো। ইতিমধ্যে দীনেশ মজুমদার তার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থান নির্দ্ধারণ করে ফেলেছিলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর সাথে অর্থাৎ 'জেল কমিটি' এবং গোপন পার্টিকেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রেখে কাজ করবেন—এই মর্মে দীনেশ মজুমদার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সভাপতির পদাধিকার দীনেশ মজুমদার পক্ষে সহায়ক হল। তাছাড়া 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র পুরানো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে যে গোষ্ঠী দীনেশ মজুমদার প্রমুখদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অনেকের সাথেই দীনেশ মজুমদারের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ এলো। কিন্তু ঐ সময় ছাত্রদের সংগঠিত করার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ কলিকাতার অধিকাংশ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নগুলি, এমন কি মফঃস্বল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নগুলি 'চীন-ভারত যুদ্ধের' সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দিয়েছিল। বাতিল করার প্রধান কারণ ছিল ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনায় কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য। এইভাবে ছাত্র ইউনিয়ন বাতিল অর্থে কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা ১৯৬৩ সালে বন্দিমুক্তি আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের নতুন করে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাধা হয়েই দাঁড়িয়েছিল। বাস্তবে ছাত্র ইউনিয়নগুলি সচল থাকলে যা সহজ হতো তা তখন কঠিন হলো।

'দেশহিতৈষী' দপ্তরে যাতায়াতের মাধ্যমে ছাত্রনেতা ও কর্মীদের এবং পার্টি নেতা ও কর্মীদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় কিছু সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিল প্রথমে কমিউনিস্ট ছাত্র বন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করতে হবে। সিদ্ধান্ত মত শুরু হলো দুজন ছাত্রনেতার (নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এবং হরিনারায়ণ অধিকারী) মুক্তির দাবিতে প্রচার অভিযান। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরে প্রথমে

পোস্টারিং পরে সভা স্কোয়াডিং ইত্যাদি। ছাত্র বন্দিদের মুক্তির দাবিতে অভুতপূর্ব সাড়া এলো। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ছাত্র বন্দিদের মুক্তির দাবি পরিণত হলো সামগ্রিকভাবে ভারতরক্ষা আইনে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে। ছাত্রসমাজের এই সোচ্চার সাড়াতে গোপন পার্টি নেতৃত্বে উৎসাহিত হলো।

'বন্দিমুক্তি গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি'র পরিকল্পনা অনুসারে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যার উপরে বিশেষ করে খাদ্যের দাবিতে বামপন্থী সংগঠনগুলির পক্ষে ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ডাকা হলো বাংলা বন্ধ। ১৯৬২-র অক্টোবরে চীন-ভারত বিরোধের তিক্ত ঘটনার পর পশ্চিমবাংলার বুকে বামপন্থীদের প্রথম গণআন্দোলনের আহ্বান। এই বন্ধ সফল করতে স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল ছাত্রসমাজের এক বিরাট অংশ। এর পরবর্তী ধাপ, ঐ ১৯৬৩-র ২৮শে সেপ্টেম্বর 'বন্দিমুক্তি গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি'র ডাকে কলকাতার রাজপথে বিশাল মিছিল এবং মনুমেন্টের পাদদেশে বিশাল সমাবেশ। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন পার্লামেন্ট সদস্য এবং সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা ও কৃষকনেতা এ কে গোপালন। এই বিশাল মিছিল ও সমাবেশে কলিকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। যা ছিল তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কল্পনার বাইরে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্রসমাজের এক বিরাট অংশ যে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র আন্দোলনের গতানুগতিকতার বেড়াজাল ভেঙ্গে পরিবর্তনমুখী সংগঠিত সংগ্রামে অগ্রসর হতে চায়— ২৮শে সেপ্টেম্বরের মিছিল ও সমাবেশ ছিল তার প্রমাণ। ছাত্রসমাজের এই বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের সংগ্রামী মেজাজকে উজ্জীবিত করে। 'ভারতরক্ষা আইনে' গণআন্দোলনের অধিকার থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণিও আন্দোলনমুখীন হতে শুরু করে। এই সময় কলকাতার নিকটবর্তী জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শত শত শ্রমিক-কর্মচারী তাদের বিভিন্ন দাবিতে এক কঠিন সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। জয়ার এই শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ালো সে ছাত্র সমাজ, যাঁরা বন্দিমুক্তি গণদাবি প্রস্তুতি কমিটির সাথে সম্পর্ক রেখে গণআন্দোলনের সংগ্রামী পতাকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। ষাটের দশকের ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের সাথে বাংলার এই ঘটনার মিল রয়েছে। ফ্রান্সের বিভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে ফ্রান্সের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবাংলার শ্রমিক আন্দোলন ষাটের দশকে সেরকম উন্নত স্তরে না পৌঁছালেও ১৯৬৩তে নতুন করে যেটুকু শুরু হয়েছিল, সে পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো প্রতীকী হলেও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

১৯৬২-র অক্টোবরের 'সীমান্ত যুদ্ধের' পর এক বছর ঘুরে না আসতেই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু। উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবল তরঙ্গ স্তিমিত। যা স্বাভাবিক তা-ই ঘটলো। প্রবল তরঙ্গ বুদবুদে পরিণত।

১৯৬৩-র জুনে এবং সেপ্টেম্বরে বাংলা বন্ধ এবং মিছিলের ঘটনা শুধু জনমত সংগঠনে-ই সহায়ক হলো না, সহায়ক হলো সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টিতে। ৬৩-র শেষেরদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ভারতরক্ষা আইনে ধৃত বন্দিদের মুক্তি দানের বিষয়ে ভাবতে শুরু করে। ১৯৬৪ শুরু না হতেই পর্যায়ক্রমে বন্দিমুক্তি শুরু হয়ে যায়। ১৯৬৪-র এপ্রিল মে মাসের মধ্যে একমাত্র সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা বি টি রণদিভে ব্যতিরেকে

সকল বন্দি-ই মুক্তি লাভ করেন। পশ্চিমবাংলার দু'জন ছাত্রনেতার মধ্যে ৬৪-র প্রথম দিকে মুক্তি পান নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এবং এপ্রিলে মুক্তি পান হরিনারায়ণ অধিকারী। বন্দিমুক্তি আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজের অংশগ্রহণ কত দুর্বার ও শক্তিশালী হতে পারে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে—তা আবারও ভারতরক্ষা আইনে আটক বন্দিদের মুক্তিদানের ঘটনা প্রমাণ করলো।

১৯৬৩-র সেপ্টেম্বর থেকে ৬৪-র মার্চ পর্যন্ত 'বন্দিমুক্তি গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি'র সাথে সম্পর্কযুক্ত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র নেতা ও কর্মীদের নির্দিষ্ট কার্যালয় গড়ে ওঠেনি। দেশহিতৈষী দপ্তরকে সবসময় ছাত্র সংগঠনের দপ্তররূপে ব্যবহারের সুযোগ সীমাবদ্ধ। তাই বৈঠক, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির জন্য কিছু গোপন, কিছু প্রকাশ্য বসার কেন্দ্র বা পকেট তৈরি করতে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ-এর লন এবং কলকাতা ময়দানের নিকটবর্তী পার্কগুলি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনে কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা বা কর্মীর বাড়িও ব্যবহার করা হোত। কলকাতার মদন মিত্র লেনের চণ্ডী মুখার্জীর বাড়িটি ছিল এর মধ্যে অন্যতম।[১১]

সাংগঠনিক কাজকর্ম ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী সহ অন্যান্য দুরবর্তী জেলার ছাত্রনেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ বেশি বেশি করে স্থাপিত হবার ফলে গোপন পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে ৯৩/১/এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ 'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ' [UCRC]-এর কার্যালয়ে ছাত্রফ্রন্টের একটি পাল্টা দপ্তর খোলার সিদ্ধান্ত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র ১৮৬নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় বর্জন করা হবে। যদিও ইতিমধ্যে এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পরস্পর বিরোধী দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ছোট খাট সংঘর্ষ, বচসা, অশোভন তিক্ত ঘটনা প্রভৃতি ঘটে গেছে। এর-ই মধ্যে একদিন কেন্দ্রীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, গণসংগঠন স্তরের অফিস সম্পাদক পদাধিকারী সুধীর চক্রবর্তী[১২] 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র কেন্দ্রীয় দপ্তরের কিছু কাগজপত্র নিয়ে (যা সুধীর চক্রবর্তীর হেফাজতে ছিল) ৯৩/১/এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের নতুন দপ্তরে চলে আসেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র কেন্দ্রীয় অফিসের একবার মুখোমুখি রাস্তার বিপরীত দিকেই ছিল UCRC, তথা পাল্টা ছাত্র সংগঠনের নয়া দপ্তর। সুধীর চক্রবর্তী নিয়মিত নতুন দপ্তর খুলতে শুরু করলেন এবং বেশ ভালভাবেই গুছিয়ে নিয়ে দপ্তরকে সচল করে তুললেন। নয়া দপ্তরে প্রতিদিন ছাত্র কর্মীদের ভিড় লেগেই থাকছে। জেলা স্তরের ছাত্র নেতাদের সাথে আসা-যাওয়া করছেন অসংখ্য নতুন নতুন ছাত্র কর্মী, নতুন নতুন মুখ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে সব সময় অফিস জমজমাট। একতলার মেঝেতে পাটি পেতে বসার ব্যবস্থা। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে বসার ব্যবস্থা দূরের কথা, দাঁড়িয়ে একটু আধটু কথা বলার স্থান সংকুলান করা কঠিন। প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা। এই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যেই কিছু উৎসাহী ছাত্র কর্মীর নেতৃত্বে 'নওজোয়ান' এবং 'ছাত্র-ছাত্রী' নামে ছাত্রদের দুটি পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র মুখপত্র 'ছাত্র অভিযান' পঞ্চাশের দশকের সময় থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হত না। ষাটের দশকের শুরুতে 'ছাত্র অভিযান' কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া 'ছাত্র অভিযান' পরিচালনার ভার ছিল গুরুদাস দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য অনুগামীদের হাতে।

পাল্টা ছাত্রফ্রন্টের একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্রের এই সময় বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পরে। 'নওজোয়ান' কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'ছাত্র-ছাত্রী' পত্রিকাকেই পাল্টা কেন্দ্রের মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করা হলো। এই পত্রিকাটি মূলত প্রকাশিত হতো দক্ষিণ কলিকাতার ছাত্রনেতা ও কর্মীদের নেতৃত্বে। 'ছাত্র-ছাত্রী'-র মালিকানা সংক্রান্ত ডিক্লারেশান ছিল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক সুভাষ বসুর নামে। পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন নির্মল ব্রহ্মচারী (সম্পাদক), দিলীপ পাইন, বিমল করগুপ্ত প্রমুখ। 'ছাত্র-ছাত্রী' এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সংগ্রামী অংশের মুখপত্ররূপে 'ছাত্র-ছাত্রী' পত্রিকাও সমাজের কাছে পরিচিতি লাভ করে। 'ছাত্র-ছাত্রী'-তে পশ্চিমবঙ্গের পুনরুজ্জীবিত ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ বেশি করে প্রকাশিত হতো। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শগত রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে যুক্ত করে সংবাদ, নিবন্ধ, রিপোর্টাজও প্রকাশ করা হতো মাঝেমধ্যে।

ভারতরক্ষা আইনে আটক কমিউনিস্ট নেতারা মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙ্গনের কাজ প্রকাশ্যে শুরু হয়ে যায়। সব রাজ্য সহ কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লিতে দু'গোষ্ঠীর দুটি করে কেন্দ্র থেকে নিজ নিজ গোষ্ঠীর কাজকর্ম পরিচালিত হতে থাকে। জেল থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের কাজকর্মের কেন্দ্রীয় দপ্তর হলো দিল্লিতে এ কে গোপালনের সংসদীয় বাসভবন। পশ্চিমবঙ্গে হলো স্বাধীনতা পত্রিকার সেই পুরানো কার্যালয় ৩৩নং আলিমুদ্দিন স্ট্রীট (পার্ক লেনের নতুন কার্যালয় নয়)। এ যেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র দু'গোষ্ঠীর দু'কেন্দ্র থেকে কাজ চালাবার অনুকূল ব্যবস্থা। ছাত্রফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে যা শুরু করে দিয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টির দু'গোষ্ঠী তা কিছু পরে শুরু করেছিলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্যের বিবৃতি[১৩] এবং তেনালি কমিউনিস্ট কনভেনশন[১৪] এর পূর্বেই পার্টির জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে এবং তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষীয়রা অভিযোগ তুললো দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির দায়ে পার্টির জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট' নামে বিরোধী পক্ষীয়দের দ্বারা অভিহিত হতে থাকলেন। এর-ই মধ্যে পার্টির মতাদর্শগত বিরোধের সূত্র ধরে 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা আবার সংশোধনবাদী' পদবাচ্যে পরিচিত হলেন। কমিউনিস্ট অভিধানে 'দক্ষিণপন্থী' কমিউনিস্ট এবং 'সংশোধনবাদী' দুটি-ই 'নিন্দাসূচক বিশেষণ' বা 'নিন্দামূলক পদবাচ্য'। প্রকৃত অর্থে কমিউনিস্ট তত্ত্বগত গালমন্দ।

৯৩/১/এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ছাত্রফ্রন্টের পাল্টা কেন্দ্রের অনুগামী শত শত ছাত্রছাত্রীর মুখে মুখে 'দক্ষিণপন্থী' এবং 'সংশোধনবাদী' শব্দ দু'টি চালু হয়ে গেল এবং জনারণ্যে ছড়িয়ে পড়লো। এইভাবেই 'দক্ষিণপন্থী ছাত্র ফেডারেশন', 'সংশোধনবাদী ছাত্রনেতা' শব্দগুলির উৎপত্তি।

এক পক্ষ বা গোষ্ঠী সরব হলে, অন্যপক্ষ বা গোষ্ঠী নীরব থাকে না। পার্টির জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুগামীরা তার প্রতিপক্ষকে কমিউনিস্ট অভিধানের নিন্দাসূচক চোখা-চোখা শব্দের দ্বারা জর্জরিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। 'কট্টর বামপন্থী' [Ultra left], 'হঠকারী [Extrimist], 'চীনপন্থী' এবং শেষ পর্যায়ে 'দেশদ্রোহী'— শব্দগুলি ছিল ঐ নিন্দা বা গালমন্দের ভাষা।

কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের ক্ষেত্রের সংক্ষেপে এর সারমর্ম কথায় ১৮৬নং বিপিন

বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কার্যালয়ের সাথে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র যে অংশ যুক্ত রইলেন—তাঁরা হলেন 'দক্ষিণপন্থী' এবং সংশোধনবাদী অংশ বা গোষ্ঠী। ৯৩/১/এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের নতুন দপ্তরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র যে অংশ যুক্ত হলেন, তাঁদের পরিচিত হলো 'কট্টর বামপন্থী', 'হঠকারী', 'চীনাপন্থী' এবং 'দেশদ্রোহী' অংশ রূপে।

এইভাবে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র দু'গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-বিরোধ চরম পর্যায়ের দিকে এগুতে থাকলো। ১৯৬৩-র মধ্যবর্তী সময়ে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত ছাত্রনেতা কর্মীদের মনে 'গোপন সংগঠন' গড়ার প্রবণতা উৎসাহের সৃষ্টি করে। 'গোপন সংগঠন' গড়ার মানসিকতার প্রেরণা ছিল বিপ্লবী সংগঠন গড়ার ধ্যানধারণা এবং কমিউনিস্ট পার্টির দু'স্তরের সংগঠন গড়ার সংক্রান্ত (গোপন এবং প্রকাশ্য) বিতর্ককেন্দ্রিক। তাই এই মানসিকতাপ্রবন ছাত্ররা প্রকৃতপক্ষে গোপন ও প্রকাশ্য, আবার কখনো আধা-গোপন আধা-প্রকাশ্য ধরনের কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। কাজকর্মের এই পদ্ধতি এই উল্লিখিত অংশের ছাত্রনেতা কর্মীদের মধ্যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' আনুষ্ঠানিক ভাঙনের সময় পর্যন্ত বজায় ছিল।

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর পার্টি নেতারা ছাত্রকর্মীদের নিয়ে এই ধরনের অংশত গোপন, আধা গোপন, কিংবা প্রকাশ্য 'জি বি বৈঠক' আলোচনা সভা ইত্যাদিতে মিলিত হয়েছেন। আলোচনা হতো বিশেষ করে তখনকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে। এইসব আলোচনা বৈঠকগুলিতে প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার-ই প্রধানত অংশগ্রহণ করতেন। জ্যোতি বসু এই সময় মধ্যপন্থী বলে পরিচিত। ছাত্র-যুব কর্মীদের এই ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসু এবং তার অনুগামী নেতারা ছিলেন নিস্পৃহ। অনেকের মতে জ্যোতি বসু এই ধরনের ছাত্র-যুব কর্মী সভা-অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। কেন বিরোধী ছিলেন? তখনকার সমসাময়িক ছাত্রনেতাদের মধ্যে যারা এই ধরনের সভা-বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের অন্যতম ছাত্রনেতার মতে—প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার ছাত্রদের খোলাখুলি জানিয়েছিলেন যে, নতুন পার্টির মধ্যে রুশপন্থী জ্যোতি বসুর জায়গা হবে না। পার্টিতে সেন্ট্রিস্ট লাইন চলতে পারে না। জ্যোতি বসু এবং তার অনুগামীরা নতুন পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে তিনটি শর্ত রেখেছিলেন,

১। 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা তুলে দিতে হবে।

২। চীন-রাশিয়া প্রশ্নে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না।

৩। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠনের দরকার নেই।

এই তিনটি প্রস্তাব প্রমোদ দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন পার্টির নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও হঠাৎ কোন কারণে দু'পক্ষের মধ্যে রফা হয়ে যায়। 'দেশহিতৈষী' সম্পর্কে জ্যোতি বসুর শর্ত মানা হয় না। কিন্তু বাকি শর্ত প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং তার অনুগামীরা মেনে নেন।"[১৫]

এর থেকেই সহজে অনুমেয় জ্যোতি বসু সহ তাঁর অনুগামীরা ছাত্রকর্মীদের বৈঠক ও আলোচনা সভা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথম দিকে কেন এত নিস্পৃহ ছিলেন, কিন্তু এই নিস্পৃহতা বেশিদিনের জন্য নয়। তেনালী কমিউনিস্ট কনভেনশনে এবং তার পরবর্তী সময়ে 'মধ্যপন্থী' জ্যোতি বসু প্রমুখ এবং 'কট্টর বামপন্থী' প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখদের মধ্যে রফা হয়ে যাবার ফলে উভয় গোষ্ঠী একই সঙ্গে নতুন একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দিকে এগিয়ে চলেন। ছাত্রফ্রন্ট এতে প্রভাবিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যখন এইসব ঘটনা ঘটছে, তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের এক উল্লেখযোগ্য অংশ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত সংগ্রামে প্রভাবিত হয়েছিল। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁরাও নতুন নাটক রচনা অভিনয় ইত্যাদিতে এগিয়ে এলেন। অগ্রণী ভূমিকা নিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার অভিনেতা উৎপল দত্ত এবং তার সংগঠন। মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্তের পরিচালনায় অভিনিত 'কল্লোল' নাটক ছিল এই ধরনের একটি নাটক। এই নাটক ছাত্র-যুব মানসকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'চীন পন্থী' বলে অভিহিত কমিউনিস্টদের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'কল্লোল' নাটকের সমালোচক হলেও তখনকার তারুণ্যের ঝোঁক ছিল এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী সহ তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধীরা 'কল্লোল' নাটক বন্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র করে। এই পরিস্থিতিতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র পাল্টা কেন্দ্রপ্রয়াসী ছাত্রকর্মীরা রাতের পর রাত জেগে মির্নাভা থিয়েটার পাহারা দেন। শহর গ্রাম নগরে জনমত গড়ে তোলেন 'কল্লোল' নাটকের পক্ষে। এইভাবে ছাত্রফ্রন্ট ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নতুনভাবে ভাবনা চিন্তাকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সাযুজ্য ১৯৬৩-৬৪-র বিশেষ ঘটনা।

জেল থেকে মুক্তির পর প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার কয়েকজন সিলেকটেড ছাত্রনেতাদের সাথে কয়েকবার কলকাতায় গোপনে মিলিত হন। এই পর্যায়ের শেষ বৈঠকটি হয় তেনালী কমিউনিস্ট কনভেনশন অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে। পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং ছাত্রনেতৃত্বের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দীনেশ মজুমদার ও হরিনারায়ণ অধিকারী। বৈঠকে ইঙ্গিত মেলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন সপ্তম কংগ্রেসকে উপলক্ষ করে পার্টির ভাঙন চূড়ান্ত হবে এবং নতুন পার্টি গঠন করা হবে। উক্ত বৈঠকে এটাও জানা যায় কোন রাজ্য থেকেই ছাত্রফ্রন্টের কোন প্রতিনিধি তেনালী কমিউনিস্ট কনভেনশনে যোগদান করছে না। প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন : পার্টির বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রফ্রন্ট এবং BPSF (বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন)-কে পুনর্গঠিত করতে হবে। পুনর্গঠনের কাজের পাশাপাশি ছাত্রদের বিপুল অংশকে আন্দোলনমুখী করে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি নেতৃত্বের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। বিষয়টি ছিল—'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র পরস্পর বিরোধী দুটি কেন্দ্রের পার্থক্যকে কিভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে। সমস্যা ছিল কারণ, দু কেন্দ্রই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' নামের দাবিদার। এই ধরনের আলোচনার অনেক আগেই পার্থক্যের দেওয়াল খাড়া হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কেন্দ্রটিকে 'দক্ষিণপন্থী', 'সংশোধনবাদী', 'রুশপন্থী' ছাত্রনেতাদের কেন্দ্র হিসেবে বলা হচ্ছিল। পার্টি নেতৃত্বের সাথে পরামর্শক্রমে ঠিক হলো— নিজেদের পাল্টা ছাত্র ফেডারেশন রূপে চিহ্নিত করা হবে না; বলতে হবে— ৯৩/১/এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটে যে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে, সেটায় 'প্রকৃত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'; ১৮৬নং বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কেন্দ্রটিকে বলা হবে — 'দক্ষিণপন্থী' অথবা 'বিভেদপন্থী' ছাত্র ফেডারেশন। সেই থেকে ৯৩/১/এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কার্যালয়ের অনুগামীদের প্রচারে সভাপতি দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশ হলো 'প্রকৃত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' এবং সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন অংশ হলো 'বিভেদপন্থী ছাত্র ফেডারেশন' অথবা কখনো কখনো 'দক্ষিণপন্থী ছাত্র

ফেডারেশন'। অপরপক্ষে, নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন অংশ দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশকে 'পাল্টা ছাত্র ফেডারেশন' কিংবা 'চীনাপন্থী', 'কট্টরপন্থী' অথবা 'বিভেদপন্থী' বলে চিহ্নিত করতে থাকলেন। কিন্তু দু'পক্ষ দু'পক্ষকে 'বিভেদপন্থী' বলাটাই ছিল কৌতুকপ্রদ।

দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশের ছাত্রনেতারা মিলিত হয়ে নির্ধারণ করলেন লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি। কর্মসূচির দুটি অংশ। একটি জাতীয় পরিস্থিতি বিষয়ক এবং অপরটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ক। জাতীয় পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার পেল— সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলন; গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন; ছাত্র ইউনিয়নগুলির অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্ব দেওয়া হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে আন্দোলন এবং ভারত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি ও মহড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

কমিউনিস্ট নেতারা জেলে থাকাকালীন সময়েই ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে চক্রান্তকারীরা কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধান। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সংগ্রামী অংশের কর্মীরা ছাত্রসমাজের ঐতিহ্য অনুসারে দাঙ্গা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কর্মসূচিকে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় সভা সমিতি, মিছিল, বৈঠক, পোস্টারিং ইত্যাদি মারফৎ সফল করে তোলা হয়েছিল। বন্দিমুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শুরু করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন গতিবেগ পেয়েছিল এবং এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিপুল। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল—ছাত্র ইউনিয়নের অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। বনদেব মুখার্জী এবং কমল গাঙ্গুলী প্রমুখ ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের নেতারা যখন কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তখন শৈবাল মিত্র, প্রহ্লাদ সরকার প্রমুখদের নিয়ে গঠিত নবীন নেতৃত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সংবিধান চালু এবং বাতিল করা ছাত্র ইউনিয়নের অধিকার পুনরায় ফিরিয়ে দেবার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।[১৬] আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন ছাত্র ইউনিয়নের উপর থেকে বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করতে। এই পটভূমিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন হলো, তখন শৈবাল মিত্রদের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী ইউনিটই জয়লাভ করে। জয়লাভের ঘটনা দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সর্বত্র নতুন জোয়ার এনে দেয়। কলকাতার কলেজে কলেজে, এমনকি কলকাতার নিকটবর্তী জেলার কলেজগুলিতে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে বহু নতুন মুখ কর্মীপর্যায় থেকে উঠে আসে নেতৃত্বের পর্যায়ে। প্রাদেশিক ছাত্রনেতাদের গৃহিত কর্মসূচির সফলতা প্রমাণিত হয়।

ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম এবং ভারত মহাসাগের মার্কিন ৭ম নৌবহরের উপস্থিতি ও মহড়াবিরোধী আন্দোলন—এই ইস্যু দুটি পশ্চিমবাংলার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের গৌরবমণ্ডিত ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির দেওয়াল ও প্রাঙ্গন দু'টি ইস্যুর পোস্টার, ব্যানারে ভরে যায়। শুরু হয়ে যায় সভা

সমাবেশ, সেমিনার, আলোচনা চক্র, মিছিল ইত্যাদি। দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র পালে জনপ্রিয়তার হাওয়া লাগে।

৯৩/১/এ, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটের 'বি পি এস এফ' নামে কেন্দ্রটি যে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠে আসছে, তা পরপর কয়েকটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ১৯৬৪-র ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় 'সংশোধনবাদের' সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছুক ছাত্রদের নিয়ে জয়ার শ্রমিক নেতা হরিদাস মালাকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র কনভেনশন,[১৭] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে জয়লাভ এবং এই ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে 'প্রকৃত' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বিজয় অর্জন-এর ঘটনা থেকে পার্টি নেতা ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতারা অনুমান করেন—এবার ছাত্রকর্মী সহ ছাত্রসমাজের বিরাট অংশকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে সংগঠিত করা জরুরী।

১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর নদীয়া জেলার পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে হরিনারায়াণ অধিকারী আগের মতই রানাঘাট পার্টি অফিসে বসবাস শুরু করেন। পার্টি এবং ব্যক্তিগত বন্ধু হিসাবে ৬১-৬২ সাল থেকেই দীনেশ মজুমদার প্রায়শই রাণাঘাট যাতায়াত করতেন, একসঙ্গে দু'বন্ধু দু-তিন দিন কাটাতেন। ১৯৬৪ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে ঐ একইভাবে দীনেশ মজুমদার রাণাঘাট পার্টি অফিসে তিনদিন কাটালেন। এই সময় পার্টি নেতাদের সাথে দীনেশ মজুমদারের আলোচনার প্রয়োজনীয় বিবরণ হরিনারায়ণ অধিকারীকে বলেন। হরিনারায়ণ অধিকারী নদীয়া জেলার পার্টি নেতাদের সাথে আলোচনাক্রমে ছাত্র আন্দোলন ছেড়ে পার্টি সংগঠনের কাজে যুক্ত হবেন বলে মনস্থির করেছেন। কিন্তু দীনেশ মজুমদার ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করলেন ছাত্র আন্দোলনের বিশেষ পরিস্থিতিতে ছাত্রফ্রন্টের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করতে। আরও বললেন, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র প্রত্যাশিত ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রিপোর্টের খসড়া তৈরি করতে। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সমর মুখার্জীও ছাত্রফ্রন্টের কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন। ঐ সময় ঠিক হলো—পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের সদস্য এবং অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বিভূতি দেবের সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বিভূতি দেব এই সময় প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখদের পক্ষে ছাত্রফ্রন্টের কাজ দেখাশুনা করতেন। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে দীনেশ মজুমদার, হরিনারায়ণ অধিকারী দমদমে বিভূতি দেবের বাসস্থানে দীর্ঘসময় আলোচনা করেন এবং খসড়া রিপোর্ট তৈরির বিভিন্ন পয়েন্টগুলিও নির্ধারণ করা হয়। এই আলোচনায়ই ঠিক হলো, হরিনারায়ণ অধিকারী ছাত্রফ্রন্টের সাথে সাংগঠনিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং রিপোর্টের খসড়া তিনি তৈরি করবেন। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই খসড়া রিপোর্ট তৈরি করে ছাত্রফ্রন্টের পার্টি ইনচার্জদের কাছে দেওয়া হলো। সময়ান্তরে তা অনুমোদন হয়ে এলো। ঠিক হলো এই খসড়া-ই ছাত্র ফেডারেশনের ৯৩/১/এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটের কার্যালয়ের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের আলোচনাসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজন ইত্যাদি করে আগামী রাজ্য সম্মেলনে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র রাজ্য পরিষদের [State Council] রিপোর্ট হিসারে উপস্থিত করা হবে। (উক্ত খসড়াটিই 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম লিখিত দলিল)। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সপ্তদশ সম্মেলন অনেকদিন

আগেই করার কথা ছিল। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং তার জের সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ফলে সপ্তদশ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছিল না। নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের নেতৃত্ব অন্যদের দাবি সত্ত্বেও উক্ত সম্মেলন আহ্বান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন—''বি পি এস এফ-এর ৩৫জন কার্যকরী সমিতির সদস্যের মধ্যে তৎকালীন সভাপতি দীনেশ মজুমদারসহ ১৯ জনের স্বাক্ষরিত সম্মেলন অনুষ্ঠানের দাবিতে এক বিশেষ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত হয়, জেলায় জেলায় বি পি এস এফ-এর সম্মেলন করে অনুষ্ঠিত রাজ্য ভিত্তিতেও সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'' এরপর দীনেশ মজুমদার পরিচালিত 'প্রকৃত' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ঠিক করলেন এই সপ্তদশ সম্মেলন খুব শীঘ্রই তারা অনুষ্ঠিত করবেন এবং তার আগে কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিটকে পুনর্গঠন করা হবে। ইতিমধ্যে নন্দগোপাল ভট্টাচার্য পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন ('বিভেদপন্থী') ঐ প্রস্তুতির খবর জানতে পেরে, তাঁরাও সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেন। দুই তরফের পক্ষে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা পরিস্থিতিকে জমজমাট করে তোলে।

রাজ্যভিত্তিতে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা বা রিভিউ করার জন্য 'প্রকৃত' ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা জেলাগত দায়িত্ব বন্টন করেন। নবীন-পুরাতন সব মিলিয়েই এই দায়িত্ব যৌথভাবে ভাগ করা হয়। দায়িত্ব বন্টনের ছকটি ছিল মূলত এইরূপ : কলিকাতা জেলা—মলয় চ্যাটার্জী (চন্দন), শৈবাল মিত্র, বিমান বসু সহ আরও কয়েকজন; হাওড়া জেলা—সুবিনয় ঘোষ, নিমাই ঘোষ; হুগলী জেলা—মলয় চ্যাটার্জী (হুগলী জেলার লোক হিসেবে), দিলীপ বিশ্বাস, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ২৪ পরগনা—দীনেশ মজুমদার, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী নদীয়া— হরিনারায়ণ অধিকারী; বর্ধমান—সলিল ভট্টাচার্য, নিশিথ অধিকারী; মেদিনীপুর—ডহরেশ্বর সেন; মুর্শিদাবাদ—প্রভাত দাশগুপ্ত, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী; বাঁকুড়া—পার্থ দে; বীরভূম—তেজারত হোসেন; মালদহ—আনন্দ ব্যানার্জী, শৈলেন সরকার; কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি—হরিনারায়ণ অধিকারী; পুরুলিয়া, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর-এর দায়িত্বে পার্টির জেলা নেতৃত্বের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে দীনেশ মজুমদার।

এর-ই মধ্যে ১৯৬৪-র জুন মাসে পূর্বেকার সিদ্ধান্তমত দীনেশ মজুমদারের অনুগামীরা ছাত্র ফেডারেশনের কলিকাতা জেলা কমিটি পুনর্গঠন করলেন। কলিকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের দায়িত্বে এলেন—বিমান বসু, অসিত সিনহা, দিলীপ পাইন, বীরেশ ভট্টাচার্য্য, নির্মল ব্রহ্মচারী, রজত ব্যানার্জী, প্রলয়েশ মিশ্র, প্রলয় দাশগুপ্ত প্রমুখ।[১৮]

কলকাতা জেলা ছাত্রফেডারেশন পুনর্গঠন এবং সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত দীনেশ মজুমদার পরিচালিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনে'র অংশ বিশেষের সাথে পুরানো এবং নবীন মিলিয়ে যে সকল উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতা ও কর্মী যুক্ত হয়েছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত জেলাভিত্তিক তালিকা দেওয়া হলো—

কলকাতা—বিমান বসু, শৈবাল মিত্র, মলয় চ্যাটার্জী, আশিষ মজুমদার, নির্মল ব্রহ্মচারী, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল নন্দী, বাসব দাশগুপ্ত, অসিত সিন্‌হা, অতুল দাস, গণপতি চৌধুরী, আজিজুল হক, বিমল করগুপ্ত, শঙ্কর গুপ্ত, দিলীপ পাইন, বীরেশ ভট্টাচার্য, রণেন ঘোষ, সুভাষ বোস, প্রলয় দাশগুপ্ত, কণিকা গাঙ্গুলী, বনানী চক্রবর্তী (বিশ্বাস), শিপ্রা ভৌমিক (চক্রবর্তী), শ্যামলী দাশগুপ্ত (গুপ্ত)।

২৪ পরগণা— সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, নারায়ণ ফৌজদার, তড়িৎ তোপদার, বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী, রঞ্জিত কুণ্ডু, রঞ্জিত মিত্র, রমলা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)।
হুগলী—শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, দিলীপ বিশ্বাস।
নদীয়া—মদন সাহা, রবি ভট্টাচার্য, পতিতপাবন দে, চন্দন সান্ন্যাল, গোপাল মজুমদার, দেবু গুপ্ত, শুভ্র সান্ন্যাল, সৌরেন পাল, অরুণ ভট্টাচার্য, দেবু চট্টোপাধ্যায়, বীরেন দাস, দিলীপ বাগচী, মৃণাল চক্রবর্তী, মনু চ্যাটার্জি, ঝর্ণা ব্যানার্জী (চট্টোপাধ্যায়), অনিল বিশ্বাস, দীপক বিশ্বাস, রবি ভট্টাচার্য (দীপক), কাবু (ডাকনাম) চ্যাটার্জী, অজিত মুখার্জী (কালো)।
মুর্শিদাবাদ—প্রভাত দাশগুপ্ত, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।
হাওড়া—সুবিনয় ঘোষ, গৌরী বসু, দীপক দাশগুপ্ত, স্বদেশ চক্রবর্তী।
মেদিনীপুর—ডহরেশ্বর সেন, নন্দরানী ডল, অনুরূপ পাণ্ডা, সত্যগোপাল মিশ্র।
বীরভূম—তেজারত হোসেন।
বাঁকুড়া—পার্থ দে, অশনী মজুমদার।
মালদহ—আনন্দ ব্যানার্জি, শৈলেন সরকার।
জলপাইগুড়ি—মানিক স্যান্নাল।
কোচবিহার—খোন্দকার।

নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র অংশের সাথে যাঁরা থাকলেন বা এলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের তালিকা (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই অংশের সাথে সামান্য কয়েকটি জেলার ছাত্রনেতা ও কর্মীরা ছিলেন)—
কলকাতা— গুরুদাশ দাশগুপ্ত, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, পল্টু দাশগুপ্ত, পার্থ সেনগুপ্ত, বণদেব মুখার্জী, কমল গাঙ্গুলী।
নদীয়া— সুশান্ত হালদার, নিতাই সরকার, কিরণশঙ্কর সিংহরায়।
বর্ধমান—নিমাই রাউত।
দার্জিলিং— শিলিগুড়ির বীরেন চক্রবর্তী।
মেদিনীপুর— পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত।

রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরের ছাত্রনেতাদের এই সময়কার অবস্থান—হীরেন দাশগুপ্ত, প্রতুল লাহিড়ী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কালী বন্দোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ প্রাক্তন ছাত্রনেতারা কার্যত ছাত্র আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। লক্ষ্য রাখছিলেন পরিস্থিতির বাক বা মোড়ের দিকে।

রাজনৈতিক, মতাদর্শগত বিরোধ থেকে শুরু করে শেষ পর্যায়ে পার্টি এবং গণসংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক ভাঙনের প্রায় ছয় মাসাধিক কাল পূর্বে ছাত্রফ্রন্টে যুযুধান দুই শিবিরের জন্ম দেয়। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট হয়। সম্পর্ক পর্যবসিত হয় তিক্ততায়। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র সংগঠনের অনৈক্যর সুযোগে কমিউনিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্র সংগঠন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হলো না। কারণ, তখন পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের প্রবল ঝোঁককে মূলধন করতে সক্ষম হয়েছিল 'প্রকৃত' ছাত্র ফেডারেশনের দাবিদার অংশ। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, দেশ-বিদেশের ছাত্র আন্দোলনের বিবরণ পড়াশুনা করে, পর্যালোচনা করে এবং নানাভাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের বিরাট অংশ উৎসাহিত হয়েছিলেন।

এইরূপ পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপটে ১৯৬৪ সালেই বিধানসভার বর্ধমান সদর আসনের উপনির্বাচনে কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর জয়লাভের ঘটনা সারা রাজ্যের ছাত্রসমাজকে উদ্বেলিত করে তোলে। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ঘটনায় যে বিনয় চৌধুরীকে 'দেশদ্রোহী', 'চীনের দালাল' হিসাবে চিহ্নিত করে ভারতরক্ষা আইনে আটক করার জন্য রাজ্যসরকার ও তার পুলিশ হন্যে হয়েছিল, সে বিনয় চৌধুরীর জয়লাভ ছিল পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাৎপর্যপূর্ণ। বিনয় চৌধরী ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, জাতীয় পরিষদের প্রস্তাববিরোধী এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সমর মুখার্জী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা। বিনয় চৌধুরীর এই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল রাজনৈতিকভাবে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সুতরাং তাঁর জয়লাভ ও পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট রাজনীতি তথা সামগ্রিকভাবে রাজ্য রাজনীতির একটি বাঁক। কলকাতা সহ বর্ধমানের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার শত শত ছাত্র যুব-কর্মী বর্ধমানের উপনির্বাচনে প্রচার অভিযান ও বিভিন্ন নির্বাচনী কাজে সামিল হয়েছিলেন। বিনয় চৌধুরীর বিজয় সংবাদে 'প্রকৃত' ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কলকাতা মহানগরীর রাজপথে বিজয় মিছিলও বের করেছিলেন। কলকাতার ছাত্র হোস্টেলগুলিতে আনন্দ উৎসাহের বন্যা বয়ে যায়। হিন্দু হোস্টেল. বিদ্যাসাগর-হোস্টেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলি ছিল বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্র। এই হোস্টেলগুলিকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন আগেও এবং তখনও উত্তালভাবে আবর্তিত হয়েছে।

ভারতরক্ষা আইনে আটক কমিউনিস্ট বন্দিদের মুক্তির পরবর্তী অধ্যায়ের রাজ্য রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনাবলী সহ রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ৬৪-র জুন মাসের শেষ দিকে ৯৩/১/এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটের দপ্তরে শুরু হয়। বিস্তৃত আলোচনার পর ঠিক হলো—১৯৬৪ সালের ১৭, ১৮, ১৯শে আগস্ট কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সপ্তদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।[১৯]

এই সপ্তদশ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রফ্রন্টের পার্টি সদস্যদের কোন ফ্র্যাকসান মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ম অনুসারে ফ্র্যাকসান মিটিং-এর যে রীতি চালু হয়ে এসেছে, এবার তা অনুসরণ করা হলো না। এক্ষেত্রে তা হলো ব্যতিক্রম। পার্টি নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সমর মুখার্জি, বিভূতি দেব সহ ছাত্রনেতা দীনেশ মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রনেতার সাথে আলোচনাক্রমে ঠিক হয় সপ্তদশ সম্মেলন থেকে হাওড়ার ছাত্রনেতা সুবিনয় ঘোষকে সভাপতি এবং দীনেশ মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করা হবে। যুক্ত থাকাকালীন সংগঠনের সভাপতি পদ থেকে দীনেশ মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়ে আসার প্রস্তাবে খুবই সামান্য গুঞ্জন উঠেছিল। পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সংগঠনের স্বার্থে দীনেশ মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক করার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হলে এই গুঞ্জন চাপা পড়ে।

দীনেশ মজুমদার অনুগামী অংশের সপ্তদশ সম্মেলন : সিদ্ধান্ত মত ১৯৬৪-র ১৭, ১৮, ১৯ আগস্ট কলিকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অনুগামীদের প্রচেষ্টায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র 'সপ্তদশ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হলো। ইতিহাসের তথ্যের দিক থেকে উক্ত সম্মেলন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'কে দু'ভাগে বিভক্ত করলো। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্টদের দ্বারাই ছাত্র সংগঠন 'বঙ্গীয়

প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' [B.P.S.F.] ভেঙে গেল। উক্ত সম্মেলন থেকে যে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হলো, তার সদস্য ছিলেন—সুবিনয় ঘোষ [সভাপতি], দীনেশ মজুমদার [সাধারণ সম্পাদক], হরিনারায়ণ অধিকারী [সহ-সভাপতি], বিমান বসু [সহ-সভাপতি], শৈবাল মিত্র [সহ-সভাপতি], কনিকা গাঙ্গুলী [সহ-সভানেত্রী], সুভাষ চক্রবর্তী [যুগ্ম-সম্পাদক], শ্যামল চক্রবর্তী [যুগ্ম-সম্পাদক], সুধীর চক্রবর্তী [অফিস সম্পাদক, হিসাবরক্ষক, কোষাধ্যক্ষ],[২০] প্রফুল্ল চক্রবর্তী [সদস্য], দীপক বিশ্বাস [সদস্য], অশোক ঘোষ [সদস্য]। ১৯৬৪-র ২১শে আগস্ট প্রকাশিত 'দেশহিতৈষী'-র বিবরণ অনুসারে উক্ত সম্মেলনে যুক্ত ছাত্র ফেডারেশনের ১২৫ জন কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে ৮৩ জন, কার্যকরী সমিতির ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন, সম্পাদকমণ্ডলীর ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন উপস্থিত ছিলেন এবং মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৫৩০ জন।

সম্মেলনে পার্টি ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতাদের অনুমোদিত রিপোর্টটি উত্থাপিত হয় এবং আলোচনার ভিত্তিতে কিছু সংশোধনীসহ রিপোর্টটি গৃহীত হয়। কিন্তু রিপোর্ট সংক্রান্ত আলোচনায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সংবিধান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে সংবিধানের মুখবন্ধের প্রতীকী স্লোগান—'স্বাধীনতা', 'শান্তি', 'প্রগতি' পরিবর্তন করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে সংবিধান রচনা করার কথা উঠেছিল। প্রতিনিধিদের অনেকের বক্তব্যেই পার্টি এবং গণসংগঠন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই লাইনের বক্তব্য উত্থাপনকারীদের লাইনের মর্মার্থ ছিল ছাত্র ফেডারেশনকে কমিউনিস্ট পার্টির 'ক্যাডার অর্গানাইজেশন'-এ পরিণত করা। তাছাড়া তাঁরা মনে করতেন—ছাত্র সংগঠনও বিপ্লব পরিচালনা করতে পারে, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে, কিন্তু খুবই স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধির এই ধাঁচের বক্তব্য সম্মেলনে আদৌ সাড়া জাগাতে পারেনি। শুধু গৃহীত হয়েছিল—আগামী রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা ও গ্রহণের জন্য 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারশনে'র নতুন সংবিধানের খসড়া উত্থাপন করা হবে। 'শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে কার্যনির্বাহক কমিটিব খসড়া প্রস্তাব' শীর্ষক একটি পুস্তিকার বক্তব্যও সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই পুস্তিকায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সপ্তদশ সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ কভার পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—৮, ৯ ও ১০ই আগস্ট '৬৪। এই তারিখ অবশ্য পূর্বে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তন করে ১৭, ১৮, ১৯ আগস্ট করা হয়। এই পুস্তিকার প্রেস লাইনটি লক্ষ্যণীয়। কারণ, পুস্তিকাটিতে ১৮৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটকে প্রকাশনের স্থান হিসাবে দেখান হয়েছে। প্রেস লাইনটি এইরূপ—"বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীদীনেশ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচার উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রী বিমান বসু কর্তৃক ১৮৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। দশ নয়া পয়সা।"

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের [S.F.I.] উদ্যোগে ১৯৮৬ সালে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের 'সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে "সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার" শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইতে খুবই সংক্ষেপে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত। দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র অংশের দ্বারা অনুষ্ঠিত সপ্তদশ সম্মেলনের মূল্যায়ন এবং বিবরণ যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তার অংশবিশেষ দেওয়া হল :

"এইরকম একটি পরিস্থিতিতে এ আই এস এফ-কে আর এক রাখা গেল না। বেশ কিছুদিন ধরেই কংগ্রেস সরকারের মূল্যায়ন এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ কি হবে তা নিয়ে সংগঠনের ভেতরে বিতর্ক চলছিল। কিন্তু ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন এ আই এস এফ-এর নেতৃত্বের ভূমিকা সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের এযাবতকাল অনুসৃত মূলনীতিগুলিকেই বিপদাপন্ন করে তুলল। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের একেবারে গোড়ার যুগ থেকেই উগ্র জাতীয় ভাবাবেগের বদলে দুনিয়াজোড়া মুক্তিকামী মানুষের ঐক্য এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শই ছিল ছাত্র আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ আই এস এফ-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত বিষোদ্‌গারের অভিযানে গলা মিলিয়ে এই মূল বৈশিষ্ট্যই কার্যত জলাঞ্জলি দিলেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এ আই এস এফ-এর নেতৃত্বের সংগ্রাম বিমুখী ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। স্বাভাবিকভাবেই এ আই এস এফ-এর মধ্যে থেকে ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লো।"

"পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক সংগঠন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বেশিরভাগ কর্মী কিন্তু এ আই এস এফ-এর নেতৃত্বের এই ভূমিকা মেনে নিলেন না। অবিভক্ত বি পি এস এফ-এর শেষ সভাপতি দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বে বি পি এস এফ-এর কার্যকরী সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক নতুন সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বি পি এস এফ সংগঠনকে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কারণ, এছাড়া ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিকশিত করার কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। জেলায় জেলায় সংগঠনের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হলো। এরপর বিভিন্ন জেলায় প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে ১৯৬৪ সালের ১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে আগস্ট কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলের রাজ্যের সম্মেলন থেকে পুনর্গঠিত বি পি এস এফ-এর যাত্রারম্ভ হলো। এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক দীনেশ মজুমদার ও সভাপতি সুবিনয় ঘোষ। সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শকে, সংগ্রামের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে যারা তাৎক্ষণিক সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে সংশোধন বা কাটছাট করে নিতে চায়, সেই সংশোধনবাদী নেতৃত্বের কবল থেকে এ রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন মুক্ত হলো। আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পটভূমি রচনার প্রস্তুতির স্বার্থে ছিন্ন হলো সংশোধনবাদীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক।"

উপরের উদ্ধৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন এবং বর্ণনায় বারবার এ আই এস এফ-কে উল্লেখ করা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে—'এইরকম একটি পরিস্থিতিতে এ আই এস এফ -কে এক রাখা গেল না।' এই প্রসঙ্গে তৎকালীন সময়কার ছাত্রনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানা যায় এবং তাঁদের অনেকের মত অনুসারে বলা যায়—এই বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের অনেক আগেই এ আই এস এফ নিষ্ক্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়ে যায়, তার কোনস্তরেই কোন ভূমিকা ছিল না। মূল বিরোধের কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিমবঙ্গে বি পি এস এফ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এ পি এস এফ। এই দুই রাজ্যের ছাত্র সংগঠনেই ভাঙন এসেছে এবং পাল্টা সংগঠন তৈরি হয়েছে। এ আই এস এফ-এর সর্বভারতীয় স্তরে ১৯৬৪-তে কোন ভাঙন হয়নি বা সর্বভারতীয় পাল্টা সংগঠন তৈরি হয়নি।

ইতিহাসের তথ্য অনুসারে ১৯৬৪-র আগস্ট মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাঙলো।

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য-এর নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন :

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে দু'গোষ্ঠী নেতৃত্বের আবির্ভাব কিভাবে হলো— তার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিষয় ও তার আনুপূর্বিক বিবরণ এই পুস্তকের আগের অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তদানিন্তন সভাপতি দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত 'সপ্তদশ' সম্মেলনের মতই তদানিন্তন সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন আরেকটি 'সপ্তদশ' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অংশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৪-র ২৮, ২৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশের সম্মেলনের প্রায় দেড় মাস পরে। নন্দগোপাল ভট্টাচার্য-এর নেতৃত্বাধীন অংশের সপ্তদশ সম্মেলনে উত্থাপিত সম্পাদকমণ্ডলীর রিপোর্ট-এর শিরোনাম ছিল—"বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন ও রজত জয়ন্তী উৎসব।" এই রিপোর্টটি শ্রী পল্টু দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। এই রিপোর্টে দীনেশ মজুমদারের অনুগামী অংশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ভাঙনের জন্য দায়ী করা হয়েছে। তাছাড়া এই রিপোর্ট অনুসারে নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের অনুগামী অংশ যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছিল তার স্বীকৃতি রয়েছে। এই স্বীকৃতি-ই প্রকৃতপক্ষে ছাত্রফ্রন্টে রাজনৈতিক বিরোধের অন্যতম একটি মর্মবস্তু। এই প্রাসঙ্গিক অংশটুকু হলো— "১৯৬২ সালের শেষ দিকে চীনা আক্রমণের ফলে পরিস্থিতিতে যে গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্র ফেডারেশন সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এগিয়ে আসে আপন কর্তব্য পালনে। এই কর্তব্য পালনের দুটি দিক ছিল : একদিকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ছাত্রসমাজের শক্তিকে সংহত করা, অপরদিকে এই পরিস্থিতির সুযোগে প্রতিক্রিয়ার বিপুল আক্রমণ থেকে ছাত্রসমাজসহ জাতির বিভিন্ন অংশের অধিকারকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা। ফেডারেশন এই দ্বিবিধ দায়িত্বই সাধ্যমত পালন করেছে।"

"প্রতিরক্ষার জন্য ছাত্র ফেডারেশনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ছাত্র ফেডারেশনের পরিচালিত কলেজ ইউনিয়নগুলি এবং ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিটগুলি মিলে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মত অর্থদান করে। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কর্মী থেকে শুরু করে বহু সাধারণ কর্মী ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করেন। এক কলকাতাতেই প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী কর্মী এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন। মফঃস্বল জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ির উদ্যোগই এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রীকর্মীরা উলবোনা, উপহার সংগ্রহ প্রভৃতিতে অংশ নেন।"

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের এক বিরাট মিছিল হয়। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে কিছু বিপথগামী ছাত্রনেতার উদ্যোগে "দেশপ্রেমের" নামে এই মিছিলের উপর আতর্কিত আক্রমণ হয়।" [ঐ রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২০, ২১]

দীনেশ মজুমদারের অনুগামী অংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে চলার পক্ষপাতি ছিলেন না বলেই নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বাধীন অংশের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক বিরোধ তিক্ত হয়েছিল। সে কারণেই নন্দগোপাল ভট্টাচার্যদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষ ছিল 'বিপথগামী ছাত্রনেতা'।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন দুভাগে বিভক্ত হবার কারণগুলি আলোচ্য রিপোর্টের 'সাংগঠনিক পরিস্থিতি' শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কারণগুলি অবশ্যই নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের অংশের মতামত। প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

"বিগত সম্মেলনের সময় ছাত্র ফেডারেশন বাংলাদেশের[২১] সমস্ত জেলায় শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এক প্রবল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ কলেজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। চীনের আক্রমণজনিত পরিস্থিতির দরুণ বাংলাদেশের সর্বত্র ফেডারেশনের সংগঠনও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনকে সংহত করা ও সংগঠনকে রক্ষা করাই যখন সর্ববৃহৎ সাংগঠনিক এবং আন্দোলনগত কর্তব্য ছিল, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই সময়েই সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রাদেশিক সভাপতির নেতৃত্বের কিছু কর্মী বিভেদের পথ গ্রহণ করে। হঠাৎ দেখা যায় সংগঠনের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে নির্বাচিত কমিটিগুলিকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা পাল্টা সম্মেলন ও কমিটি গঠন করতে লাগলেন। যখন জেলা ও প্রাদেশিক সংগঠনের বহু নেতা কারারুদ্ধ এবং সংগঠনের অবস্থা সঙ্গীন, দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির অতি জটিল সেই সময়ে এঁরা সম্মেলনের দাবি তুলতে থাকেন।"

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ সালে ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর ১৯৬১ সালের ৬ই জুন প্রাদেশিক সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রজত জয়ন্তী উৎসব' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের রজত জয়ন্তী উৎসব ২৫শে থেকে ২৯শে অক্টোবর কানপুরে অনুষ্ঠিত হবে বলে ৩০শে সেপ্টেম্বর সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় সম্মেলনের কাল ও স্থান ঠিক করা হয়। আবার ১২ই অক্টোবরের কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় ডিসেম্বরের ৮ই থেকে ১৩ই রজয় জয়ন্তী উৎসব ও সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়। ২২শে অক্টোবরের সম্পাদকমণ্ডলীয় সভায় ১৫ই ডিসেম্বর থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত সভাগুলিতেই সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় এরাই (সভাপতি প্রমুখ) বলেছিলেন যে, যেহেতু সামনে সাধারণ নির্বাচন এবং সংগঠনের কিছু সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখন সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। তখন কিন্তু রজত জয়ন্তী উৎসব ও সপ্তদশ সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তার পক্ষ থেকে কাজও শুরু হয়েছিল।"

"এমনকি রনজি স্টেডিয়াম সম্মেলনের জন্য ভাড়াও করা হয়েছিল। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসের চীনা আক্রমণ এবং তারপর থেকেই তাদের বিভেদপন্থী কার্যকলাপের শুরু।"

"১৯৬০ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ষোড়শ সম্মেলনের যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় তার নবম পৃষ্ঠায় 'সংগঠনের কাঠামো' এই শীর্ষে প্রাথমিক ইউনিট থেকে রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত যে ৬টি সুস্পষ্ট বিভাজন করা আছে উত্তরবঙ্গ সম্মেলন তার কোনটির আওতায় পড়ে না। তাছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার কোন একজন নেতা বা কর্মী কোন অধিকার বলেই অপর কোন জেলার সভ্যদের সম্মেলন আহ্বান করতে পারেন না। প্রাদেশিক দপ্তরের অজ্ঞাতে কিছু সংখ্যক বিভেদপন্থী ছাত্রদের নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় প্রাদেশিক সম্পাদক উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পরে উক্ত অঞ্চলে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হন। অনুরূপভাবে

উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতায় ৩টি সম্মেলন করার আয়োজন চলে, তার প্রস্তুতি কমিটি ও আহ্বায়ক ঠিক হয়ে যায়। জেলা কমিটি বা প্রাদেশিক কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত জেলায় স্থানীয় ভিত্তিতে তো বটেই এমন কি নদীয়া, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলায় সম্মেলন থেকে নির্বাচিত জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির অজ্ঞাতে গুটি কয়েক ছাত্রকে নিয়ে (এদের মধ্যে অনেকে আবার ছাত্র আন্দোলন থেকে বহুদূরে) পাল্টা কার্যনিবাহক কমিটি গঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় আলাদা প্যানেলে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে প্রতিক্রিয়ার হাতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র ফেডারেশনের নামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন 'ছাত্রছাত্রী', 'ছাত্রদরদী', 'ছাত্রহিতৈষী'[২২] প্রভৃতি পত্রিকা প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে কুৎসিত গালিগালাজ করা ছাড়া আর কোন কাজই করেনি। ১৯৬৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণার কিছু ছাত্র জড় হয়ে এক 'গণতান্ত্রিক ছাত্র কনভেনশন'-এর মাধ্যমে এক-ছাত্র ফেডারেশন কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠন করে।"

"১৩/১/৬৩ তারিখের কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তদনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক কারামুক্ত হওয়ার পর ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তমলুক রাজ্যপরিষদের অধিবেশন আহুত হয়, যা আহ্বান করার এক্তিয়ার সাধারণ সম্পাদকের আছে। এই দুই সম্মেলনের অন্তবর্তীকালে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাজ্য পরিষদ সভার বিজ্ঞপ্তি রাজ্যপরিষদের সমস্ত সদস্যের নিকট বহু পূর্বে জানান সত্ত্বেও সে সভায় বিভেদপন্থীরা যোগদান করেননি। তমলুক, রাজ্যপরিষদে ষোড়শ সম্মেলনে নির্বাচিত ৩৫জন কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন, কয়েকজন উপস্থিত হতে অক্ষম হওয়ায় প্রাদেশিক সম্পাদকের কাছে লিখিত অভিনন্দন পত্র দেন এবং বিভেদপন্থীদের তীব্র নিন্দা করেন।"

"সাধারণ সম্পাদক তমলুক রাজ্যপরিষদে নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত সদস্যের নিকট ২রা জুলাই সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করে 'আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং' চিঠি দেন। গত ৪ঠা ও ৫ই জুলাইয়ের কার্যনির্বাহক কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তিও যথারীতি সমস্ত সদস্যের নিকট যায়। এই কার্যনির্বাহক কমিটির সভা নিয়ে বিভেদপন্থা চরমে ওঠে। ১৬/৬/৬৪ তারিখে স্বাক্ষরিত (যদিও ডাকঘরের ছাপসহ তা এসে পৌঁছায় ১/৭/৬৪) এক বিজ্ঞপ্তিতে সভাপতি নিজের দায়িত্বে দক্ষিণ কলিকাতার কোন এক বিদ্যায়তনে (প্রাদেশিক দপ্তরে নয়) কার্যনির্বাহক কমিটির বর্ধিত সভা আহ্বান করেন। কিন্তু সে সভা কোন কার্যনির্বাহক কমিটির সভা? ১৯৬৪ সালের তমলুক অধিবেশনে যে কমিটি গঠিত হয় তার সভা নয়। এই সভা নাকি ১৯৬০ সালে নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির সভা। বিভেদপন্থীরা তমলুক অধিবেশনে যোগ দেননি। তার একমাত্র কারণ সেখানে তারা ছিলেন সংখ্যলঘু অংশ, আজ কার্যনির্বাহক কমিটি নিয়ে তারা বলে বেড়ান যে মোট ৩৫ জনের মধ্যে ১৯ জন নাকি তাঁদের সভায় যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের চ্যালেঞ্জ এই ১৯ জনের নাম প্রকাশ করা হোক। আমরা জানি তাঁরা তা পারবেন না। সে কার্যনির্বাহক কমিটির ২০ জন সদস্য এখনও প্রাদেশিক দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, একজন সদস্য ভারত ইউনিয়নের বাইরে, একজন চাকুরীসূত্রে বাংলার বাইরে, ৩ জন নিতান্ত অরাজনৈতিক সংসারি জীবনযাপন করছেন। সুতরাং খুব বেশি হলে ঐ অবৈধ সভায় বড়জোর ১০ জন যোগ দিতে পারে। সেই

তথাকথিত সভা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন তথাকথিত প্রাদেশিক সম্মেলনের। প্রাদেশিক সম্পাদকমণ্ডলীর ঐক্যের আহ্বান, প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটি এবং ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী, বিভিন্ন ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের ঐক্যের আহ্বান বধির কর্ণে নিপতিত হল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিভেদমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে একই সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে ছাত্র কল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়ে কাজে নামার যে আবেদন ব্যক্তিগতভাবে ও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক শ্রীনন্দগোপাল ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন তা-ও অবহেলিত হল।"

"বন্ধুগণ, আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই বিভেদপন্থীদের চক্রান্তে জন্ম নিল একটি উপদলীয় সংগঠন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিচিত্রবীর্য সংগ্রামের কাহিনী এঁরা ভেবে দেখলেন না, দেখলেন না দেশের মধ্যকার দুঃসহ পরিস্থিতিকে, দেখলেন না দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া আবার কি নতুন সাজে দেখা দিচ্ছে। ভাবলেন না ছাত্র আন্দোলন এই ভাঙনের ফলে কি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শিক্ষা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন—এমন একটি আন্দোলনও আজও হয়নি, যার সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশন ছিল না। আজ কি দুঃসহ মূল্যে বিভেদপন্থীরা আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন তা তাঁরা আজও উপলব্ধি করতে পারেন নি। অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী ছাত্র ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তাঁরা সরকারী লেজুড়বৃত্তি, সংগ্রামবিমুখতা প্রভৃতি বহুবিধ অভিযোগ আনেন এবং বিভেদের যুক্তি হিসাবে এগুলিকে হাজির করেন।" [ঐ রিপোর্টের ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অংশের সপ্তদশ সম্মেলনে উপরে উল্লিখিত রিপোর্টটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। এই রিপোর্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ভাঙ্গন প্রসঙ্গে দীনেশ মজুমদার নিয়ন্ত্রিত অংশের পাল্টা বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে এবং ঐ পর্যায়ে যা স্বাভাবিক।

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য নিয়ন্ত্রিত অংশের আহুত সপ্তদশ সম্মেলন থেকে যে সম্পাদকমণ্ডলী, রাজ্যপরিষদ গঠিত হল, সে সংগঠনই কার্যত বিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির [এস এ ডাঙ্গে অনুগামী অংশ] পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের ছাত্রফ্রন্ট রূপে চিহ্নিত হলো। বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন বা বি পি এস এফ-এর নামাঙ্কিত সাংগঠনিক ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছে।

[দীনেশ মজুমদারের নিয়ন্ত্রিত অংশ প্রথম কয়েক বছর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে নাম বজায় রাখলেও পরে এই নাম বর্জন করে নতুন নাম গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।]

এইভাবে ১৯৬৪ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবাংলার ছাত্র রাজনীতিতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' নামে দুটি সমান্তরাল সংগঠন চলতে থাকলো।

ইতিহাস সত্যকে উদঘাটন করে, ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করা কঠিন। কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রফ্রন্টে ভাঙন প্রসঙ্গে নিজ নিজ সংগঠনের নিজস্ব বক্তব্য বিশ্লেষণ, সংগঠনের আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি-তর্ক অনেক কিছু থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনা যখন ইতিহাস হয়, তখন সে ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরা গতিধারার অনুসারী। তাই, কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের আগেই ছাত্রফ্রন্টের ভাঙনের পরিমণ্ডল রচনা এবং আনুষ্ঠানিক ভাঙন প্রকৃতঅর্থে পার্টি ভাঙনের পূর্ব পরিকল্পিত মহড়া। ১৯৬৪-র আগস্ট-সেপ্টেম্বরে

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রফ্রন্ট ভাঙনের আনুষ্ঠানিক কাজ সমাধা হবার পর ঐ ১৯৬৪-র নভেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক [৭ম পার্টি কংগ্রেস] ভাঙন হলো। পি সুন্দরাইয়াকে সম্পাদক করে যে নতুন পার্টি গঠিত হল, সে নতুন পার্টি প্রথমে ঐ ছাত্র ফেডারেশনের মতই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামেই পরিচিত হতে থাকে এবং ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের আগে নতুন পার্টির নাম হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) বা সংক্ষেপে সি পি আই (এম)। '৬৪-র আগস্টে অনুষ্ঠিত 'সপ্তদশ' সম্মেলন থেকে গঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-ই ১৯৭০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য ইউনিটের ছাত্রফ্রন্টরূপে কাজকর্ম পরিচালনা করে। অনেক পরে '৬৪-র সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত 'সপ্তদশ' সম্মেলন থেকে পুর্নগঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার ছাত্রফ্রন্টরূপে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠনের ভাঙনকে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজের প্রধান প্রবণতা ছিল—পরিবর্তনকামী নতুন কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে সংগ্রামমুখীন বিপ্লবমুখীন হওয়া এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম থেকে উৎসাহ প্রেরণা শিক্ষালাভ।

ছাত্র সমাজের এই সাধারণ প্রবণতাকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে লিপ্ত কমিউনিস্ট নেতারা নিজের মত করে কাজে লাগাতে সক্রিয় ছিলেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তদানিন্তন পরিস্থিতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্তদের অনেকের পক্ষে গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষায় ছিল সহায়ক। অর্থাৎ ইতিহাসের অন্বেষায় সার সংক্ষেপে—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক মতাদর্শগত মতবিরোধ পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ছাত্র আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিক ভাঙনের মত চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছিল।

অন্ধ্রে

তথ্য ও ঘটনা অনুসারে দেখা যায় অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের প্রভাব ছিল মূলত নিজাম নিয়ন্ত্রিত সামন্ত করদ রাজ্য হায়দারাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে হায়দারাবাদ রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'নিখিল হায়দরাবাদ ছাত্র ইউনিয়ন' [All Hyderabad Students Union বা AHSU] ছিল প্রধান ছাত্র সংগঠন। AHSU ছিল AISF-এর অনুমোদিত সংগঠন এবং কমিউনিস্ট ছাত্রনেতাদের নিয়ন্ত্রিত।

হায়দারাবাদ রাজ্যের প্রধান ৩টি অঞ্চল—তেলেঙ্গানা, মারাঠাওয়াড়া অঞ্চল এবং কর্ণাটক অঞ্চলে AHSU-এর সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু তেলেঙ্গানা অঞ্চলই ছিল AHSU-এর প্রধান ঘাঁটি। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের সময় তিনটি অঞ্চলেই AHSU-এর সংগঠনের প্রসার ঘটে এবং অসংখ্য উল্লেখযোগ্য ছাত্রকর্মী নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। অন্ধ্রপ্রদেশের গৌরব উজ্জ্বল ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এই তিনটি অঞ্চলের যেসব এলাকায় ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যাঁরা এর সংগঠক ছিলেন তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। তাই এই তিনটি অঞ্চলের এই প্রাসঙ্গিক বিবরণ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :

তেলেঙ্গানা : তেলেঙ্গানা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও তালুকগুলির মধ্যে AHSU-এর সংগঠন ছিল প্রধানত নালগোণ্ডা, ওরাঙ্গল, খাম্মাম, করিমনগর, মেডাক, মেহেবুবনগর-এ। এইসব অঞ্চলে পঞ্চাশ-এর দশকের উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতারা হলেন—তিগলা সত্যনারায়ণ, লিঙ্গা রেড্ডি, সীনা রেড্ডি, টি এল নরশিমা রাও, যাদব রেড্ডি, সি এইচ রাজেশ্বর রাও, ভেঙ্কট রেড্ডি, সি এইচ হনুমন্ত রাও, নাগেশ্বর রাও এবং কেওয়াল কিশান প্রমুখ। সব চাইতে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কে ভি নরসিং রাও, ভি রাজ্যেশ্বর রাও এবং পি মোহন রাও।[২৩]

মারাঠাওয়াড়া অঞ্চল : নানডেড, বিড, জালনা, পারবনী, ওসমানাবাদ এবং লাতুর-এ AHSU-র ইউনিট গড়ে ওঠেছিল। তাছাড়া এই অঞ্চলে 'ঔরঙ্গাবাদ বিদ্যার্থী সংঘ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের সাথে AHSU-র সম্পর্ক ছিল সহযোগিতামূলক। উভয় সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতারা হলেন—পালিমকার, ভিটল কুলকারণী, অনন্ত বাহেল রাও, জি চিতনিস, গোপাল রাও কুর্তাদিকর, নায়েক আহমেদ, ভি আর ভূসারি, সীতারাম মোহন পুরকার, আইজাজুদ্দিন, রাসেদ প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশই কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী। কিন্তু এঁদের সাথে কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল কংগ্রেসী ছাত্রকর্মীও একই সংগঠনে কাজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসী ছাত্রকর্মী হলেন—বারদাপুরকার, শ্যাম রাও এপসিংকার, ত্রিম্ভক ভালি রাও, গণপথ রাও।[২৪]

কর্ণাটক অঞ্চল : এই অঞ্চলে AHSU-এর সংগঠন ছিল অবশ্যই দুর্বল। একমাত্র গুলবর্ণাততে AHSU-র শক্তিশালী ইউনিট গঠন করা হয়েছিল। এই ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট ছাত্র নেতা ফারুকি এবং একজন সমাজতন্ত্রী নেতা বাসভারাজ।[২৫]

অন্ধ্রপ্রদেশের সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ থেকে শুরু করে গণসংগ্রামের কেন্দ্রস্থলগুলিতে গণসংগ্রামের পাশাপাশি পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলন। সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীরা অগ্রণী ভূমিকায়। এই জন্যই অন্ধ্রের বিভিন্ন কলেজগুলিতে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্রনেতারাই জয়লাভ করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ যেমন : ইউনিভার্সিটি আর্টস কলেজ [১৯৫৪-৫৫], সি এইচ, হনুমন্ত রাও, সহ-সভাপতি, নিজাম কলেজ ইউনিয়ন [১৯৫৪-৫৫], এম হনুমন্ত রাও, সভাপতি, ভি ভি কলেজ ইউনিয়ন [১৯৫৪-৫৫], গিয়াসউদ্দিন, সম্পাদক, সৈফবাদ কলেজ ইউনিয়ন, [১৯৫৪-৫৫], বসিরুদ্দিন আহমেদ—সভাপতি নিজাম কলেজ ইউনিয়ন [১৯৫৫-৫৬], জগদীশ চন্দ্র, সভাপতি, আর্ট কলেজ ইউনিয়ন [১৯৫৬-৫৭], এবং সূর্য ও সাজিদা, ওমেন্স কলেজ ইউনিয়ন।[২৬]

এই সময় অন্ধ্রপ্রদেশের [হায়দারাবাদ রাজ্যসহ] বিভিন্ন জেলার স্কুলে 'স্কুল ছাত্র ইউনিয়ন' চালু ছিল। কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার তীব্র থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকের মধ্য সময়ে এইসব 'স্কুল অনুমোদিত সংগঠন AHSU'-র প্রার্থীরা বিপুলভাবে জয়লাভ করে।

তাছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান দুটো বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে 'অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়', 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ছাত্র ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি। AISF এবং AHSU-এর যৌথশক্তি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং 'হায়দারাবাদ রাজ্যের' সেরা ছাত্র কর্মীদের কমিউনিস্ট আদর্শমুখী করেছিল। পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য আরও কিছু সংখ্যক ছাত্রনেতা হলেন : ১৯৫০ থেকে ৫৩-তে মৈনুদ্দিন, ইউসোফ খান, গোপাল রাও, মুরলীধর, সুদর্শন রাও, মুগনী তাবাসুম, কান্তি চন্দন এবং ১৯৫৩ থেকে

৫৬তে লক্ষমা রেড্ডি, আসাদ আলি, সফিয়া সুলতানা, গোপাল রাও, কালী মেধাকর, রামনন্দার রাও, রামরাও পমপাদকার, শিবগাতুল্লা, পামন মূর্ত্তি, বাকের আলী, জগদীশ চন্দ্র, সাজিদা রহমান, প্রেম আনন্দ, অনন্তভূমকার, গিয়াসুদ্দিন, সূর্য, সুধা শাস্ত্রী, কে ভেঙ্কোটেশ্বর রাও, ফতিমা, এম টি খান প্রমুখ।

১৯৫৬ সালে 'হায়দারাবাদ রাজ্য' পুনর্গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের সাথে মিশে যাওয়ার পর AHSU তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে AISF-এর অন্ধ্ররাজ্য ইউনিটের সাথে মিশে যায় [marged]। ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশন আরও শক্তিশালী হল।

অন্ধ্রের ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য থাকার ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত মতবিরোধের প্রতিফলন পশ্চিমবাংলার মতই প্রতিফলিত। অন্ধ্রের পঞ্চাশ দশকের ছাত্রনেতাদের অধিকাংশই ষাটের দশক শুরুর প্রাক্কালে দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পি. সুন্দরাইয়া, বাসব পুন্নাইয়া, নাগী রেড্ডি, ডি ভি রাও প্রমুখদের বামপন্থী [left line] শিবির এবং সি রাজেশ্বর রাও প্রমুখদের জাতীয় পরিষদপন্থী শিবির কিংবা প্রতিপক্ষদের ভাষায় 'দক্ষিণপন্থীদের' শিবির। যা প্রকৃতপক্ষে চীনপন্থী এবং রুশপন্থী লাইনের সংঘাত।

অন্ধ্রপ্রদেশ প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীদের মধ্যে রাজেশ্বর রাওদের অনুগামীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। সুতরাং সর্বভারতীয় স্তরে পার্টি ভাগের প্রস্তুতি যত বাড়তে থাকে, তার সাথে তালে তাল মিলিয়ে ছাত্রফ্রন্টেও ঐ একই প্রস্তুতি চলে। শুধুমাত্র সাংগঠনিক শক্তির তারতম্য অনুসারে একপক্ষের প্রস্তুতি আগে এবং আরেকপক্ষের প্রস্তুতি পরে। প্রস্তুতি পর্বের রণক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ।

অন্ধ্রপ্রদেশের গণসংগ্রাম, গণআন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামী অঞ্চল বলে পরিচিত এলাকাগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের যুগে একটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এইসব এলাকার অধিকাংশ পার্টি সদস্য এবং কর্মীর অনুগত্য জাতীয় পরিষদপন্থী রাজেশ্বর রাওদের দিকে প্রথমে ঝুঁকে পড়েছিল। তাই তারা এলাকায় পাল্টা পার্টি কমিটি গঠন করে। এরপর এরা নজর দেয় ছাত্রফ্রন্টের দিকে।

ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যর দিক থেকে পুরানো হায়দারাবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সহ বিশেষ করে হায়দারাবাদ শহরের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র ইউনিয়নগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ হায়দারাবাদের কলেজগুলি ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্র। রাজেশ্বর রাওদের অনুগামীরা এইসব কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রকর্মীদের একাংশের সহযোগিতায় ১৯৬৩-র শেষ দিকে অন্ধ্র প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের একটি পাল্টা রাজ্য কমিটি প্রথমে গঠন করে। এর কিছুদিন পরেই হায়দারাবাদ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের একটি সম্মেলন আহ্বান করে সম্মেলনের মাধ্যমে এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে দখল করে নেয়। পি সুন্দরাইয়া প্রমুখদের অনুগামী ছাত্রনেতৃত্ব অভিযোগ তোলে অবৈধভাবে হায়দারাবাদ ছাত্র ইউনিয়নের বিরাট সংখ্যক ছাত্রের সভ্যপদ বাতিল করে ঐ সংগঠনকে দখল করা হয়েছে। [উল্লেখ্য, পার্টি ভাঙনের যুগে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের ক্ষেত্রে ৩২ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য তাঁদের অভিযোগ পত্রে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন, যা পূর্বেই এই পুস্তকের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।] এইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশন

ভেঙ্গে যায় কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের প্রায় দেড় বৎসরাধিক কাল আগে। পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ভাঙনেরও প্রায় দেড় বৎসর আগে।

ভারতের অন্য কোন রাজ্যে ছাত্র ফেডারেশন ভাঙনের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় হয়ে উঠলো না। কেরালা, পাঞ্জাবের মত রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মোটামুটি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এই দুই রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনে ভাঙনের ঢেউ-এর আঘাত আসেনি। পরবর্তী সময়ে আস্তে-ধীরে ছাত্রফ্রন্টের ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রে ছাত্রফ্রন্টে তথা ছাত্র গণসংগঠনে ভাঙনের নিটফল হলো কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবাধীন ছাত্র আন্দোলনে দুটি ধারার উত্থান। ১৯৬৪-র পরবর্তী সময়ে এই দুটি ধারাই 'নতুন' কমিউনিস্ট পার্টি এবং 'পুরানো' কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় থেকে নানা ধরনের ঘটনার আবর্তে-সংঘাতে এগিয়ে চললো অবশিষ্ট ষাটের দশক। ৭০-এর দশক এবং ৮০-এর দশক অতিক্রমের পথে।

তথ্যসূত্র :

১। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে শিলিগুড়িতে এই বর্দ্ধিত কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন BPSF-এর সভাপতি গুরুদাস দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। ১৯৬১তে AISF-এর কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সময় AISF-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হীরেন দাশগুপ্ত এবং সভাপতি ছিলেন বিদ্যাসাগর নটিয়াল।

২। শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত BPSF-এর কাউন্সিল অধিবেশনের পর বিপ্লব দাশগুপ্ত ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, উচ্চশিক্ষার জন্যই ইংলণ্ডে চলে যান। ১৯৬০-এর পর ১৯৭০-এ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেই সি পি আই (এম)-এর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩। জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিলিগুড়ি কাউন্সিল অধিবেশনের পর ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাংবাদিকতাকে ব্যক্তিগত পেশা হিসেবে গ্রহণ করে 'বাংলাদেশ' এবং 'সত্যযুগ' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা ইত্যাদি কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

৪। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের শিলিগুড়ি কাউন্সিল অধিবেশনটি অন্যএক বিশেষ কারণেও উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। এই অধিবেশন উপলক্ষে সারারাত ধরে অনুষ্ঠিত ছাত্র পার্টি সদস্যদের ফ্রাকস্যান মিটিংটি তখনকার ছাত্রনেতাদের স্মৃতি থেকে অবশ্যই এখনও মিলিয়ে যায়নি। নেতৃত্ব বদলের প্রশ্নে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে ভোটা-ভুটি হয়েছিল। এই ভোটের ফল নিয়ে তিক্ত দ্বিমত দেখা দেয়। দীনেশ মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ছাত্রনেতারা দাবি করেন ভোটে সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য পরাজিত হয়েছেন এবং প্রতুল লাহিড়ী জিতেছেন, সুতরাং প্রতুল লাহিড়ীকে সাধারণ সম্পাদক করতে হবে। এই পর্যায়ে পার্টিনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জি, হরেকৃষ্ণ কোঙার, চারু মজুমদার-এর হস্তক্ষেপে ভোটের ফলাফল বাতিল করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

৫। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার ত্রিস্তর সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুসারে 'জেলাকমিটি'-কে 'জেলাপরিষদ' বলা হতো।

৬। তখনকার দিনে পার্টির রাজ্য সম্মেলনগুলিতে জেলাস্তরের ছাত্রনেতারা প্রতিনিধি হিসেবে পার্টির জেলা সম্মেলন থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসতেন। ফ্রন্টগত বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাজ্যস্তরে ছাত্রফ্রন্টের একজন/দুজন ছাত্রনেতা প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন। পার্টির বর্ধমান রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য ছাত্রফ্রন্টগতভাবে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন—

গুরুদাস দাশগুপ্ত এবং নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। এবং জেলা থেকে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে এই বর্ধমান রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন—নদীয়ার হরিনারায়ণ অধিকারী, বর্ধমানের নিমাই রাউত।

৭। ভারত-চীন কর্তৃক ঘোষিত পঞ্চশীল নীতির বিষয়বস্তু হলো— ক. সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিষয়ে পারস্পরিক সম্মান জানানো; খ. পারস্পরিক অনাক্রমণ; গ. পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না-হস্তক্ষেপের নীতি; ঘ. পারস্পরিক সমতা ও সুযোগ-সুবিধা আদান-প্রদান; ঙ. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সূত্র—গণশক্তিতে ১৯৯১, ১৩ই আগস্ট প্রকাশিত নিবন্ধ—'মার্কসবাদকে সি পি সি কিভাবে বিকশিত করছে?'—হু কিয়া ওমু।

৮। ৭-ই নভেম্বর ১৯৬২ থেকে ভারতরক্ষা আইনে প্রথমে গ্রেপ্তার হলেন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা বি টি রণদিভে। ৭ থেকে ২০শে নভেম্বর বিভিন্ন রাজ্যে দু'একজন করে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রেপ্তার চলে এবং ২১শে নভেম্বর হলো All India Round up।

৯। বিশেষ করে পিকিং রিভ্যুর ১৭ই আগস্ট, ১৯৬২-র ৩৩তম সংখ্যাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০। মোহিত মৈত্র তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হলেও প্রথমে কমিউনিস্ট ছিলেন না। ১৯৫৬ সালে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে সংসদের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থীরূপে জয়লাভের পর মোহিত মৈত্র ক্রমান্বয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ হন। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময়ে তিনি প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখদের পক্ষ অবলম্বন করে 'দেশহিতৈষী' প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নেন এবং পরে সি পি আই (এম) তৈরি হলে—এই পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সি পি আই (এম)-এর সদস্য ছিলেন।

১১। "উত্তর কলকাতার মদন মিত্র লেনে চণ্ডী মুখার্জির বাড়িতেও একটি ঘাঁটি হয়েছিল। জ্যোতি বসুর প্রভাবে চণ্ডী মুখার্জি মধ্যপন্থী হয়ে গেলে সে ঘাঁটিও উঠে যায়।"

[শৈবাল মিত্র, ষাটের ছাত্র আন্দোলন, আজকাল, পৃষ্ঠা : ১৮]

১২। সুধীর চক্রবর্তী ছাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী (Whole Timer) এবং পার্টি কর্তৃক ছাত্রফ্রন্টের অফিস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী।

১৩। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের যে বৈঠক নয়াদিল্লিতে ১৯৬৪ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ বৈঠক থেকে বেড়িয়ে এসে যে ৩২ জন সদস্য প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সে বিবৃতিকেই 'জাতীয় পরিষদের ৩২জন সদস্যের বিবৃতি' বলা হয়।

১৪। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৩২জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের আহূত কমিউনিস্ট কনভেনশনকেই 'তেনালী কনভেনশন' বলা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে ১৯৬৪ সালের ১১ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৫। তথ্যসূত্র—শৈবাল মিত্র : ষাটের ছাত্র আন্দোলন, পৃষ্ঠা : ২০।

১৬। জরুরী পরিস্থিতির অজুহাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৬২-র শেষের দিকে বাতিল করে দিয়েছিল।

১৭। তথ্যসূত্র—'ষাট দশকের চার অধ্যায়' শীর্ষক শ্যামল চক্রবর্তীর নিবন্ধ। গণশক্তি ২২শে ফেব্রুয়ারি বুধবার ১৯৮৯ (পাঁচ)।

১৮। তথ্যসূত্র—শৈবাল মিত্র : ষাটের ছাত্র আন্দোলন, পৃষ্ঠা : ২০।

১৯। ১৯৬৪-র ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত 'সংশোধনবাদের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী ছাত্র কনভেনশন' থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের 'সপ্তদশ' সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্মেলনের তারিখ সেই কনভেনশনে চূড়ান্ত হয়নি।

২০। যুক্ত ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীতেও সুধীর চক্রবর্তী একই দায়িত্বে ছিলেন।

২১। 'বাংলাদেশ' অর্থে এখানে পশ্চিমবাংলাকেই বুঝানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের অবলুপ্তির পরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ-কে এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি।

২২। 'ছাত্রছাত্রী' ছিল দীনেশ মজুমদার পরিচালিত অংশের কেন্দ্রীয় মুখপত্র। 'ছাত্রদরদী' 'ছাত্রহিতৈষী' ছিল ঐ অংশের-ই জেলা স্তরের পত্রিকা। এই দুটি পত্রিকাই নদীয়া জেলা থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল।

২৩। তথ্যসূত্র—Political Awakening in Hydarabad : Role of Youth and Students : S. M. Jawad Rarvi, পৃষ্ঠা : ৬৬।

২৪। তথ্যসূত্র—ঐ

২৫। তথ্যসূত্র—ঐ

২৬। তথ্যসূত্র—ঐ পৃষ্ঠা ৮৯

সি পি আই (এম) প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনে আবার ভাঙন

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অন্ধ্র ও পঃবঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের দু'শিবিরের ভাঙনের পর শুরু হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের পালা। তেনালী কমিউনিস্ট কনভেনশনপন্থীরা কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম পার্টি কংগ্রেস [যা প্রকৃতপক্ষে সি পি আই (এম)-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেস] প্রথমে ২৪শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

এই সপ্তম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা হবার আগেই ১৯৬৪'র আগস্টের শেষের দিকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের [AISF] পশ্চিমবঙ্গের আদলে পুনর্গঠন করার জন্য একটি নোট পার্টির সমতাবলম্বী সর্বভারতীয় নেতাদের কাছে পাঠান হয়। এই নোট কলকাতার কয়েকজন পার্টি ও ছাত্রনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দীনেশ মজুমদার ও হরিনারায়ণ অধিকারীর উদ্যোগে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু, সর্বভারতীয় পার্টি নেতৃত্ব উল্লিখিত নোটের সুপারিশকে স্থগিত রেখে পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে ছাত্রনেতাদের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শক্রমে AISF পুনর্গঠনের কাজ পরিত্যক্ত হয় এবং ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই কাজ কার্যত পরিত্যক্ত-ই ছিল। পার্টি নেতৃত্বের পরামর্শ অনুযায়ী 'পুনর্গঠিত'' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ও কর্মীরা পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রধানত এই জন্যই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন পুনর্গঠিত হওয়া সত্ত্বে আগস্ট থেকে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে কোন উল্লেখযোগ্য ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে আহুত ৭ম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকারে সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত রক্ষা আইনের ৩০ ধারায় উক্ত পার্টি কংগ্রেসের উদ্যোগী পার্টি নেতাদের সর্বভারতীয় স্তরে গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক শুরু হয়ে যায়। ফলে পার্টি কংগ্রেসের তারিখ পরিবর্তন করে তা করা হয় ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর। ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত এক পশ্চিমবঙ্গেই পার্টির 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ'-এর ১৪জন সদস্যসহ মোট ২৩জন পার্টিনেতাকে আটক করা হলো। এই পর্যায়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের কোন ছাত্রনেতাকেই গ্রেপ্তার করা হলো না। পার্টি কংগ্রেস শেষ হবার একদিন পরেই আবার গ্রেপ্তার ও আটক শুরু হলো। এবার ছাত্রনেতাদের মধ্যে প্রথম গ্রেপ্তার হলেন 'পুনর্গঠিত' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ মজুমদার। দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার

হতেই 'পুনর্গঠিত' ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য নেতৃত্ব সতর্ক হলেন, হলেন সক্রিয়। সংগঠন ও আন্দোলনের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ৭ম পার্টি কংগ্রেসের উদ্যোগী নেতাদের অধিকাংশ গ্রেপ্তার হয়ে আটক হবার ফলে পার্টি কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্ব বর্তায় ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ও জ্যোতি বসু প্রমুখ মধ্যপন্থী পার্টি নেতাদের উপর। পার্টি কংগ্রেসের পূর্বেই মধ্যপন্থী জ্যোতি বসুদের সাথে আপোস-রফা হবার পরিণতিতে ছাত্রনেতাদের এবং কর্মীদের একটি অংশ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিপ্লব ও পরিবর্তনমুখী সংগ্রামের প্রেরণা ও মানসিকতা নিয়ে নতুন করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গড়ার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন যাঁরা, তাঁরাই অনেকে এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ভাবনাচিন্তা এবং নতুন পথ অনুসন্ধানের কাজে উদ্যোগী হলেন। এই উদ্যোগকে ১৯৬৪-র শেষ দু'মাসে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা ছাত্রমহলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ঘটনাটির বিষয়বস্তু ছিল—কতিপয় বিক্ষুব্ধ ছাত্রনেতার নেপালস্থ চীনা দুতাবাসে যাবার কাহিনি। [এই বিষয়টি আলোচ্য পরিচ্ছেদের 'পুনর্গঠিত' ছাত্র ফেডারেশনের ভাঙন অংশে আলোচনা করা হয়েছে।—লেখক]

'পুনর্গঠিত' ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হবার পর সিদ্ধান্ত হয়েছিল—রাজ্য ও জেলাস্তরের ছাত্রনেতারা গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলবেন; সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠনের 'দ্বৈত' কৌশল গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে; ছাত্রনেতা দীনেশ মজুমদারের মুক্তিসহ ভারতরক্ষা আইনে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে সভা-সমিতি, কনভেনশন, প্রচার-মিছিল ইত্যাদি ব্যাপকভাবে করা হবে; জন-জীবনের আশু দাবির সংগ্রামে ছাত্রসমাজকে সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এইসব সিদ্ধান্ত ছাড়াও বৌ-বাজারের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছাড়াও কাজকর্ম পরিচালনার বিকল্প কেন্দ্র তথা গোপন যোগাযোগ কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু, ছাত্রনেতাদের এই অতি সতর্কতা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে সতর্কতার বাঁধন শিথিল হল। দীনেশ মজুমদারকে ডিসেম্বর ১৯৬৪তে গ্রেপ্তারের পর প্রায় একমাস পুলিশ সম্ভবত কৌশল হিসেবে পশ্চিমবাংলার কোন ছাত্রনেতাকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করলো না। ফলে, অজ্ঞাতেই ছাত্রনেতাদের চলাফেরায় শিথিলতা এসে যায়। একটি আকস্মিক ঘটনায় ছাত্রনেতাদের হুঁস হয় এবং সতর্কতা ফিরে আসে।

১৯৬৫ সালের ৩রা জানুয়ারি নদীয়া জেলা সদরের কৃষ্ণনগর টাউন হলে নদীয়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে বন্দিমুক্তির দাবিতে ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন 'পুনর্গঠিত' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সুবিনয় ঘোষ এবং সহ-সভাপতি হরিনারায়ণ অধিকারী। কনভেনশন চলাকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির[২] নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক অমৃতেন্দু মুখার্জি হন্তদন্ত হয়ে টাউন হলে ছুটে এলেন। তিনি খবর দিলেন বার্তাবাহক মারফৎ খবর এসেছে, রাণাঘাটে পার্টি অফিসে হরিনারায়ণ অধিকারীকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ হানা দিয়েছে; সম্ভবত সুবিনয় ঘোষের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকতে পারে।

এই অবস্থায় পার্টির সিদ্ধান্ত মত কনভেনশন স্থল থেকেই হরিনারায়ণ অধিকারীকে নদীয়া জেলার অন্যতম পার্টিনেতা ইন্দু ভৌমিকের অভিভাবকত্বে [গাইডেন্স] হাঁসখালির পথে আত্মগোপন করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নদীয়া জেলার অন্যতম ছাত্রনেতা এবং

দায়িত্বশীল পার্টি সদস্য বীরেন দাস-কে সঙ্গী করে শান্তিপুর হয়ে সুবিনয় ঘোষকে হাওড়ার পথে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো। সুবিনয় ঘোষ হাওড়া জেলায় তাঁর গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছে গেলেন। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে জানামাত্রই তিনি আত্মগোপন করলেন। ইতিমধ্যে কিছুদিন পরেই গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় গ্রেপ্তার হলেন সুবিনয় ঘোষ। তাছাড়া ১৯৬৫-র ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় রাজ্য ও জেলাস্তরের অধিকাংশ পার্টি নেতারাও বিনাবিচারে আটক হলেন।

গোপন সংগঠন

যাঁরা গ্রেপ্তার এড়ালেন এবং যাঁদের গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা আর রইলো না এই ধরনের নেতৃস্থানীয় পার্টি নেতাদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে নতুন পার্টির গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলো। ক্রমান্বয়ে ফ্রন্টভিত্তিকও এই গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। ফ্রন্টভিত্তিক প্রসারিত গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল পার্টির স্তরভিত্তিক গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থার অধীন। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রফ্রন্ট ও রাজ্যস্তরে এই গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়েছিল। সর্বভারতীয় স্তরে এবং অন্যান্য রাজ্যে ছাত্রসংগঠনে আনুষ্ঠানিক ভাঙন না হবার ফলে ঐ সময় সর্বভারতীয় স্তরে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ছাত্রফ্রন্টে গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। সংশ্লিষ্ট রাজ্যকমিটির নেতৃত্বই ঐসব রাজ্যের ছাত্রফ্রন্টের কাজকর্ম দেখাশুনা করতো। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির এবং পটভূমি ছিল অন্য রাজ্যের তুলনায় স্বতন্ত্র, তাই ছাত্রফ্রন্টে গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের গোপন পার্টি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রাজ্যস্তরে ছাত্রফ্রন্টের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন পীযুষ দাশগুপ্ত এবং অলোক মজুমদার। এই দু'জন পার্টিনেতার সাথে আত্মগোপনকারী ছাত্রনেতা হরিনারায়ণ অধিকারী এবং পরে বিমান বসুকে নিয়ে একটি গোপন ছাত্র-টিম গঠন করা হয়েছিল। বিমান বসু সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করেন ট্রাম আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ১৯৬৫-র জুলাইতে। এই গোপন টিম-ই মাঝেমধ্যে গোপন আস্তানাগুলিতে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। যোগাযোগ চালাতো পার্টি ক্যুরিয়ার মারফৎ। পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য দপ্তরকেও এই সময় প্রকাশ্যে সচল রাখা হয়েছিল। রাজ্য দপ্তরকে প্রকাশ্য সচল রাখার ক্ষেত্রে পুরানো এবং নতুন যে সব ছাত্রনেতারা প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, মলয় চ্যাটার্জ্জি, শৈবাল মিত্র, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ। আত্মগোপনকারী দুই ছাত্রনেতার তখনকার ছদ্মনাম ছিল—সঞ্জয় সেন [হরিনারায়ণ অধিকারী], লিট্টু [বিমান বসু]। এই দুই ছাত্রনেতার সমন্বয়ে গঠিত 'গোপন টিম'-এর ক্যুরিয়ার হিসাবে গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠনের সংযোগকারী ছিলেন দমদমের ছাত্রকর্মী রমলা ভট্টাচার্য [পরে সুভাষ চক্রবর্তীর সাথে পরিণয় সূত্রে চক্রবর্তী], ছাত্রনেত্রী শিপ্রা ভৌমিকের দিদি ঝর্ণা ভৌমিক [পরে হাওড়ার ছাত্রনেতা আদ্যনাথ ভট্টাচার্যের সাথে পরিণয় সূত্রে ভট্টাচার্য] এবং অনিল বিশ্বাস। বিশেষ করে অনিল বিশ্বাস এই সময় সংযোগকারী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

ছাত্র হোস্টেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে অনিল বিশ্বাস থাকতেন। অনিল বিশ্বাসের হোস্টেল রুমটি তখন ছাত্র সংগঠনের একটি গোপন আস্তানায় পরিণত হয়েছিল।[৩]

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রফ্রন্টের গোপন সাংগঠনিক ব্যবস্থার সমান্তরাল আরেকটি গোপন ঘটনাও ঘটে চলে। পার্টির গোপন টিমের কাছে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসে পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য এবং কলিকাতা জেলা স্তরের কতিপয় ছাত্রনেতা প্রায়সই গোপন বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। এই ছাত্রনেতাদের কোন নির্দ্দিষ্ট গোপন আস্থানা ছিল না। বিশেষ করে কলকাতার কোন পার্কে-ময়দানে, অথবা সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতাদের [বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার] বাড়িতে এই ধরনের গোপন আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। পার্টির কর্মপদ্ধতি, নতুন পার্টি গঠনে আপোষরফা, এবং পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মনীতি নিয়ে এই সংশ্লিষ্ট ছাত্র-নেতা ও কর্মীরা ক্ষুব্ধ ও সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁদের নিজেদের ভাবনাচিন্তা মত নিজেদের মতামতের আদান-প্রদানের এবং কাজকর্মের পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য প্রায়শই গোপন আলোচনা চালাতে থাকেন। কোন পাল্টা কেন্দ্র প্রাথমিক পর্যায়ে গঠন না করে এবং সাংগঠনিক রূপ না দিয়েই এই আলোচনা এবং গোপন বৈঠক ইত্যাদি চলতো। 'পুনর্গঠিত' ছাত্র ফেডারেশনের প্রকাশ্য কর্মসূচিগুলিতে এই অংশের ছাত্রনেতারা এবং তাঁদের অনুগামীগণ কিন্তু প্রথম সারিতে থেকেই অংশগ্রহণ করতেন। আন্দোলন এবং সংগঠনের কোন পর্যায়েই তাদের চিন্তাভাবনা অনুসারে কোন বিষয়কেই নিয়ে তখনো বিরোধ হয়নি। কিন্তু এই সমান্তরাল গোপন আলাপ-আলোচনা, বসা-বসি, বৈঠক ইত্যাদি-ই ভবিষ্যতে পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনে বড়রকমের ফাটলের ইঙ্গিত ছিল। সমান্তরাল গোপন আলোচনায় সামিল ছাত্রনেতারাই নতুন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টে রাজনৈতিক বিরোধের ক্ষেত্রকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত করেছিলেন।

নতুন পার্টির ছাত্রফ্রন্টের গোপন রাজ্য টিম ঐ কতিপয় ছাত্রনেতার সমান্তরাল গোপন আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করে। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। গোপন রাজ্যটিমের তাৎক্ষণিক ধারণা হয়েছিল—ছাত্র আন্দোলন তথা গণআন্দোলন জোরদার হলেই এই ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ কেটে যাবে এবং হতাশা ও ক্ষোভ থেকে উদ্ভুত গোপন শলাপরামর্শের পরিপ্রেক্ষিত স্তিমিত হয়ে যাবে।

গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি : ১৯৬৫

পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সব ইউনিটগুলিকে সক্রিয় রাখার লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু হলো। ছাত্রসমাজকে আন্দোলনমুখীন করার জন্য ভারতরক্ষা আইনে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি আন্দোলনকে দেওয়া হলো অগ্রাধিকার। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির বিষয় ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের বিষয়। তাই, এই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল করার দিকেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনেও সি পি আই-এর ছাত্র সংগঠন BPSF সম্মত হল না। অন্য বামপন্থী দলগুলির ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে আর এস পি-র PSU, ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র ব্লক, এস ইউ সি-র DSO রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলনে সামিল হতে সম্মত হলো। এই পর্যায়ে এক ছাত্র কনভেনশনের মাধ্যমে 'বন্দিমুক্তি ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা

হয়। এই কমিটির আহ্বানে ১৯৬৫-র ১০ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলার সর্বত্র সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট পালিত হলো এবং এই উপলক্ষে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হলো ছাত্র সমাবেশ। ৬৫'-র ফেব্রুয়ারি থেকে বন্দিমুক্তি আন্দোলন অব্যাহত থাকলো।

বন্দিমুক্তি আন্দোলন চলতে চলতেই এসে গেল এক প্রবল গণআন্দোলনের ঢেউ। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলো। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণাতে জনমত বিক্ষুব্ধ। প্রথমে পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নিল—ছাত্রসমাজকে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক সংগঠিত আন্দোলনে সামিল করা হবে। পরে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'-ও ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা পর্বে পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য পরিষদের অধিবেশন ১৭-১৮ জুলাই ১৯৬৫, ২৪ পরগণা জেলার বেলঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো। [এই পরিষদ অধিবেশনের প্রসঙ্গ এই পরিচ্ছেদের 'পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের ভাঙন' অংশে উল্লিখিত হয়েছে।—লেখক] ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে গোটা জুলাই মাস (১৯৬৫) ধরে চললো ছাত্র এবং ট্রাম শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতি। এক অভূতপূর্ব ছাত্র-শ্রমিক ঐক্য। বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যশালী কলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের সংগ্রামী অংশের নেতা তখন মহম্মদ ইসমাইল, ধীরেন মজুমদার, কালী ব্যানার্জি প্রমুখ। এই নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই নতুন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন। পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র নেতৃত্বের সাথে ঐ ট্রাম শ্রমিক নেতাদের ঘনিষ্ঠতা ও ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই বেশি। ফলে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে ছাত্র-ট্রাম শ্রমিক ঐক্য গড়ে ওঠা ছিল খুবই সহজসাধ্য। ছাত্রকর্মীরা প্রচার আন্দোলনের স্তরে ট্রামে উঠে যাত্রী সাধারণকে বাড়তি ভাড়া না দিতে অনুরোধ করেছেন। ট্রাম কণ্ডাক্টর কর্মীরা বাড়তি ভাড়া না দিলে যাত্রীদের উপর কোন জুলুম করেননি। উপরন্তু ছাত্র কর্মীদের এই প্রচার আন্দোলনে ট্রাম-শ্রমিক-কর্মচারীরা সহযোগিতা করেছেন। এই প্রচার আন্দোলনে জনসাধারণের সমর্থন ছিল সর্বব্যাপক। ট্রাম শ্রমিকরা আন্দোলনের সমর্থনে একদিন ধর্মঘট করলো। ২৯শে জুলাই সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ৩০শে জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল ছাত্র সমাবেশ। ৩১শে জুলাই বামপন্থী দলগুলি হরতাল ডাকলো। আগের দিন রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার সত্ত্বেও হরতাল সফল হলো। তারপর ১৯৬৫-র ৫ই আগস্ট 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে কলকাতায় কেন্দ্রীয় ছাত্রসমাবেশ ডাকলো। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে সমাবেশে সামিল হন। পুলিশ মিছিল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি চার্জ করে এবং টিয়ারগ্যাস ছোড়ে। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। নির্মম অত্যাচার চালিয়েও পুলিশ ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনকে দমন করতে পারলো না। এরপর থেকে প্রায় ১৭ দিন কলকাতায় ট্রামের চাকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ ছাত্রনেতা কর্মী এবং কমিউনিস্টদের নতুন করে ধরপাকড় শুরু করলো।

পার্টিগত নির্দেশ ছিল পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলবেন। কিন্তু পুলিশ গোয়েন্দাদের চোখ এড়ানো অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শ্যামল চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, শৈবাল মিত্র [অসুস্থতার জন্য পরে তিনি মুক্তি পান], নির্মল ব্রহ্মচারী, শিপ্রা ভৌমিক, অসিত সিন্‌হা, আজিজুল হক সহ আরও অনেক প্রথম সারির ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হলেন।

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন আরও ব্যাপক হবার মুখে-ই শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত যুদ্ধ। আবার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের পক্ষে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই আন্দোলন স্তিমিত হলো। এবার ছাত্র সংগঠনের তরফে প্রধান কর্তব্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলন সংগঠন এবং তার পাশাপাশি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা। দুটো কাজ-ই ছিল অত্যন্ত কঠিন। এতদ্‌সত্ত্বেও কলকাতার ছাত্রসমাজ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এগিয়ে আসে। অপরদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতির উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঢাকা শহরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কলকাতায়ও এর প্রভাব পড়ে। ফলে খুবই সীমাবদ্ধভাবে কলকাতায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছাত্র সংগঠনগুলি প্রচার আন্দোলন শুরু করেছিল। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়কার মত ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রাবল্য অত প্রবল ছিল না। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্রসমাজের সমর্থন ছিল অনেক বেশি। কলকাতার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতির মধ্যেও যুদ্ধ বন্ধ করে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আলোচনার দ্বারা বিরোধ মীমাংসার দাবিকে সোচ্চার করে তুলেছিল। ইতিমধ্যে দু'দেশের জনমতের চাপে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় পাক-ভারত যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখণ্ডে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনাবসান ঘটে। দু'দেশের মধ্যে এই সাময়িক যুদ্ধের পরিণতিতে উভয়দেশে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এই অর্থনৈতিক সংকটের পরিণামে জনজীবনের আশু দাবির ভিত্তিতে গণ আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তীব্র খাদ্য ও জ্বালানী তেলের সংকট দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গ ১৯৬৬-র ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের পটভূমি এই সময় থেকে শুরু হয়ে যায়।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হলেন। এই দু'রাজ্যে আন্দোলন দমনে শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার করা হলো। সংগঠিত শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিতে শুরু হল বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মঘট। মধ্যপ্রদেশের ভূপালের হেভি ইলেকট্রিক্যালসের শ্রমিক ধর্মঘট ছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একদিকে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ গণআন্দোলন, অপরদিকে শ্রমিক আন্দোলন সারা দেশে আন্দোলনের এক উত্তাল পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করে। দিল্লি, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও তাঁদের শিক্ষাগত জীবনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এই দাবিগুলির প্রধান বিষয় ছিল—ভর্ত্তির সমস্যা, উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ-সংকোচন, শিক্ষালাভের পর চাকুরীলাভ ও কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়কেন্দ্রিক। দেশের উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ সংগঠনের নেতৃত্বে অথবা কোথাও কোথাও স্বতস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করলেন। গোটা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ছাত্র বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, ভারত সরকার, শিক্ষাবিদরা 'ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা' বলে অভিহিত

করলেন। এই তথাকথিত 'ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা' দমনে তাঁরা বিভিন্ন দাওয়াই-এর সুপারিশ করলেন এবং বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তদানিন্তন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ ডি কে আর ভি রাও, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সি ভি দেশমুখ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুরজ ভান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন। ডঃ সেন এইসময় ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য অভিভাবকদের দায়ী করে বলেছিলেন—বাড়িতে এইসব ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পায় না।[৪] সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার নামে আসলে ছাত্র বিক্ষোভ দমনে পুলিশী জুলুম থেকে শুরু করে নানা ধরনের দমন পীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে—সর্বভারতীয় স্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনগুলির একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও আলোচ্য ছাত্রবিক্ষোভে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই নয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন ছাত্র ফেডারেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশন ভাঙনের অঙ্কুরোদগম : ১৯৬৫

নয়া কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)' নামে ঘোষিত হবার অনেক পূর্বেই এবং নকশালবাড়ি সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম শুরুরও অনেক আগে 'পুনর্গঠিত' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে বিভেদ, বিরোধ এবং ভাঙনের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। নয়া কমিউনিস্ট পার্টি গঠন নিয়েই নতুন পার্টির পশ্চিমবাংলার ছাত্রকর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই ক্ষোভ থেকে বিকল্প পথের সন্ধানে কতিপয় ছাত্রকর্মী ও নেতা উদ্যোগী হন এবং তাঁদের কেহ কেহ নেপালেও যান। নেপালে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৫-জুলাইতে ট্রাম আন্দোলনের সমসাময়িক সময়ে। আসলে এই ঘটনাটি ছিল ছাত্র-নেতা ও কর্মীদের রাজনৈতিক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই ঘটনার পরে ক্ষোভ ধীরে ধীরে বিরোধ, বিভেদ এবং ভাঙনে রূপ নিয়েছিল। তাই, ইতিহাসের বিচারে এই ঘটনাটি ছিল ভাঙনের অঙ্কুরোদগম। সেই সময়কার পুনর্গঠিত বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সহসভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা শৈবাল মিত্র এই ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল। শৈবাল মিত্র-র লিখিত 'ষাটের ছাত্র আন্দোলন' পুস্তিকায় তিনি নেপাল যাওয়ার ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখেছেন। সুতরাং, তাঁর লিখিত বিবরণ-ই অনেকাংশ তথ্যনিষ্ঠ। এই বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃতি আকারে তুলে দেওয়া হলো :

"ছাত্র কর্মীদের একাধিক সাধারণ সভায় জ্যোতি বসুর তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং হরেকৃষ্ণ কোনার এমনভাবে বিষোদগার করলেন যে, মনে হল, জ্যোতিবাবু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তখন রাশিয়া ও চীনের মধ্যে যে তাত্ত্বিক মহাবিতর্ক ছিল, সে বিতর্কে রুশপন্থী। প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং হরেকৃষ্ণ কোনার ছাত্রদের খোলাখুলি জানিয়ে ছিলেন যে, নতুন পার্টির মধ্যে রুশপন্থী জ্যোতি বসুর জায়গা হবে না। পার্টিতে সেন্টিস্ট লাইন চলতে পারে না। জ্যোতি বসু এবং তাঁর অনুগামীরা নতুন পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন— ১। দেশহিতৈষী পত্রিকা তুলে দিতে হবে। ২। চীন-রাশিয়া প্রশ্নে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না। ৩। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আণ্ডার গ্রাউণ্ড সংগঠনের দরকার নেই।

এই তিনটি প্রস্তাব প্রমোদ দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন পার্টি নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও হঠাৎ কোন কারণে দু-পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায়। দেশহিতৈষী সম্পর্কে জ্যোতি বসুর শর্ত জানা হয় না। কিন্তু বাকি দুটি শর্ত প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং তাঁর অনুগামীরা মেনে নেন।

'দেশহিতৈষী' পত্রিকা আগের মত বেরতে থাকলেও আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত প্রশ্নের আলোচনা পত্রিকায় বন্ধ হয়ে গেল। আণ্ডার গ্রাউণ্ড সংগঠন গুটিয়ে নেওয়া হল। পার্টি গঠনের আগেই এই অশুভ আপসে পার্টির ঘনিষ্ঠ ছাত্রকর্মীদের একাংশ হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হলেন। ছাত্র আন্দোলনেও এই ঘটনার প্রভাব পড়ে। ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের একটা বড় অংশ, যারা এক সময়ে মানবিক কারণে আন্দোলনে এসেছিলেন, তাঁরা দু-বছরেই যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, পার্টি গড়ার প্রশ্নে অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে এখন তারা আরও বেশি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং-এর প্রয়োজনীয় লেখাগুলি পড়া, আলোচনা এবং বিতর্কের ধূম পড়ে গেল। ছাত্র আন্দোলনের এগিয়ে থাকা অংশ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক সুনির্দিষ্ট বাম-মনোভাব ছাত্র আন্দোলনের মানসিক এবং গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে দ্রুত ছড়াতে থাকল। এই সময়ে রতন লাহিড়ী নামে সিটি কলেজের জনৈক ছাত্র, যে নিজেকে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী বলে পরিচয় দিত, খুব রহস্যময় ভূমিকা পালন করেছিল। পার্টির রাজনীতি সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ কলকাতার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকর্মীকে নেপাল থেকে চীনা দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির লেখা একটি চিঠি দেখিয়ে রতন বলেছিল যে, কলকাতার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকর্মীর সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে দূতাবাসের সচিব কথা বলতে চান। কলকাতায় চীনা পত্র-পুস্তিকার একটি দোকান খোলা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে।

"গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের নেপাল দূতাবাসের ছাপানো লেটারহেডে লেখা চিঠিতে বলা ছিল চার বা পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধির কলকাতা থেকে কাঠমাণ্ডু যাতায়াতের খরচ নেপালের চীনা দূতাবাস বহন করবে। চিঠি দেখে কলকাতার ছাত্রনেতারা বিশ্বাস করেছিলেন। রতন এমনিতে ধোঁয়াটে চরিত্রের ছেলে হলেও তার সঙ্গে কয়েকজন পার্টিনেতার ভালো সম্পর্ক ছিল। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য দপ্তরেও রতন যাতায়াত করত। নিজের হাতে রতনের নাম লিখে, স্বাক্ষর করে, তাকে দুটো বই উপহার দিয়েছিলেন স্বয়ং মুজফর আহমেদ। সেই বই দুটি রতন অনেককে দেখিয়েছিল। এরকম এক তালেবর কর্মীকে কলকাতার ছাত্রনেতারা অবিশ্বাস করতে পারেননি। তাছাড়া কুড়ি, একুশ, বাইশ বছরের একজন তরুণের বিশ্বাস করার ক্ষমতা সীমাহীন। শয়তানকেও সে বিশ্বাস করে। রতনের সঙ্গে কলকাতার তিনজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকর্মী কাঠমাণ্ডু চীনা দূতাবাসে গিয়ে বিপুল ধোঁকা খেয়েছিলেন। পুরো ব্যাপারটাই যে বানানো, রতনের তৈরি একটা ফাঁদ, চীনা দূতাবাসের সচিব এবং আরো দু-তিনজনের সঙ্গে কথা বলে ছাত্রনেতারা বুঝতে পেড়েছিলেন। মুখ চুন করে তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে কাঠমাণ্ডু অভিযানের কাহিনি জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। পার্টির দপ্তরে রতন নিজে গিয়ে এ খবর জানিয়ে এসেছিল। ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ হলো যে, এরপরই ছাত্র আন্দোলনে পার্টি নেতৃত্বের অনুগামী ছাত্রনেতারা ক্ষুব্ধ ছাত্রকর্মীদের কোণঠাসা করার জোর আয়োজন শুরু করে দিলেন।..."

[উল্লিখিত পুস্তিকার ২০, ২৩ পৃষ্ঠা। উল্লেখ্য, উক্ত উদ্ধৃতির প্রথম প্যারার কিছু অংশ এই পুস্তকের অন্য বিষয় প্রসঙ্গেও উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং ঐ একই অংশ প্রসঙ্গান্তরে আবার এখানে পুনরাবৃত্তি হয়েছে।—লেখক]

উপরে বর্ণিত নেপালে চীনা দূতাবাসে যাওয়ার এই কাহিনি থেকেই সহজে অনুমেয় 'পুনর্গঠিত' বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে বিরোধ এবং সন্দেহের অঙ্কুর কিভাবে রোপিত হলো। এরপরের ঘটনাগুলি আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

এরই মধ্যে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছাত্রটিমের সাথে পার্টির পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্টিনেতারা জরুরী আলোচনা করলেন। প্রকাশ্যে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতাদের সাথেও জরুরী আলোচনা হলো। পশ্চিমবাংলার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং রাজ্য সংগঠনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে 'পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য পরিষদ (কাউন্সিল)-এর অধিবেশন অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে আহ্বানের সিদ্ধান্ত হলো। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ['পুনর্গঠিত']-এর সপ্তদশ সম্মেলন থেকে গঠিত রাজ্যপরিষদ বা রাজ্য কাউন্সিলের এটাই ছিল প্রথম অধিবেশন। ১৯৬৫-র ১৭ই ও ১৮ই জুলাই তখনকার অবিভক্ত ২৪ পরগণার বেলঘরিয়াতে এই রাজ্যপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বেলঘরিয়া অঞ্চলের ছাত্রনেতা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল সদস্য রঞ্জন গোস্বামী বেলঘরিয়াতে রাজ্য পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্যপরিষদের এই অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর হাতে সময় ছিল খুবই অল্প। পুনর্গঠিত সংগঠনের উপর চলছে সরকারি আক্রমণ, যে কোন সময় ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কা। ঐ পরিস্থিতিতে বন্দিমুক্তি আন্দোলন এবং ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সংঘটিত করতে হচ্ছে। এরই মধ্যে সংগঠনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য পরিষদের বেলঘরিয়া অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমান ও আশঙ্কা ছিল, সংগঠনের অভ্যন্তরে ছাত্র আন্দোলনের দিশা এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মতবিরোধ ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে এবং বেলঘরিয়া অধিবেশনে তার প্রতিফলন ঘটতে পারে। তাই, সপ্তদশ সম্মেলনের পরবর্তী সময়ের সাধারণ মূল্যায়নমূলক একটি রিপোর্ট রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে উপস্থিত করার কথা অধিবেশন অনুষ্ঠানের ৩ দিন আগে ঠিক হলো। স্বল্প সময়ের মধ্যে রিপোর্ট লিখে, তা ছাপার ব্যবস্থা করে অধিবেশনে উপস্থিত করা ছিল এক কঠিন কাজ। কিন্তু তখন ছাত্রফ্রন্টের আধা গোপন এবং আধা প্রকাশ্য সংগঠনের ভিত্তি ছিল অনেক সংগঠিত ও মজবুত। খুব দ্রুততার সাথে শিয়ালদহের নিকটবর্তী সার্পেন্টাইন লেনে জনৈক সাংবাদিক বন্ধুর আস্তানায় শ্যামল চক্রবর্তী ব্যবস্থা করলেন গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলা হরিনারায়ণ অধিকারীর থাকার। সারা রাত জেগে হরিনারায়ণ অধিকারী রিপোর্টের খসড়া তৈরি করলেন। শ্যামল চক্রবর্তী পরের দিন ১৭/১ মদন গোপাল লেন, কলকাতা ১২-তে অবস্থিত এস. সি. প্রিন্টার্স থেকে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ১৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টটি ছেপে এনেছিলেন। পরের দিন ১৭ই জুলাই বেলঘরিয়ায় শুরু হলো রাজ্য পরিষদের অধিবেশন। রাজ্য পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হলো রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ছাপানো রিপোর্ট।

এই রিপোর্ট-এর মুখবন্ধে বলা হয়েছিল—"সমবেত সহযোদ্ধা বন্ধুগণ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ঐতিহাসিক সপ্তদশ সম্মেলনের পর এই সর্বপ্রথম আমাদের সংগঠনের বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশের ছাত্র

আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধা ভাই ও ভগ্নীগণ সমবেত হয়েছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সংগ্রামের মঞ্চ হতে আন্তরিকভাবে আপনাদের সংগ্রামী সেলাম জানাচ্ছি। আপনারা, বন্ধুগণ, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শোধনবাদের বিরুদ্ধে, সমস্ত প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, দলত্যাগী বিভেদপন্থীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপনারা পরীক্ষিত কর্মী। আপনাদের বজ্রমুষ্টিতে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের কবর রচনার অমিত তেজ ও বাহুবল। আপনাদের দেশপ্রেমিকতা সংগ্রামের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে। তাই এহেন কর্মীদলের পুনর্মিলনে আমরা সকলেই আনন্দিত গর্বিত। পুনরায় আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের সংগঠনের বিবরণ শুরু হচ্ছে।

খুবই সাদামাটা সরল রিপোর্ট। বিতর্ক-বিরোধবর্জিত। 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে', 'আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে', 'গণ আন্দোলনের প্রসার', 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন', 'বন্দিমুক্তি আন্দোলন' এবং 'গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম', 'ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারহরণ বিরোধী আন্দোলন', 'বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'শিক্ষা সমস্যা ও শিক্ষা সংকট দূরীকরণের আন্দোলন', 'যুব আন্দোলন', 'কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচন', 'ছাত্র আন্দোলনে ঐক্যের সমস্যা', 'সাংগঠনিক পরিস্থিতি', 'দলগত অবস্থা', 'WBNTSF', 'ছাত্র-ছাত্রী', 'আর্থিক অবস্থা', 'অন্যান্য সংগঠনসমূহের শক্তি', 'আমাদের আগামী দিনের কর্মসূচি'—এই ১৮টি উপশিরোনামে এই রিপোর্টটি বিভক্ত ছিল।

এই রিপোর্টে 'আমাদের আগামী দিনের কর্মসূচি' উপশিরোনামে ৬ দফা আশু কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই ছয় দফা কর্মসূচি হলো—"১। ট্রামে-বাসে ৫০% কনসেশনের দাবিতে আন্দোলন সংগঠন, ২। জরুরী সমস্যার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠন, ৩। বন্দিমুক্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, ৪। ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ, ৫। প্রতিটি জেলায় ব্যাপকভাবে সভ্য সংগ্রহ, ৬। আঞ্চলিক ও জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান।"[৪]

সম্পাদকমণ্ডলীর উত্থাপিত রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে আলোচনা চলাকালীন—"এই প্রথম শৈবাল মিত্র প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ছাত্রদের নেতৃত্বে বিপ্লব করতে হবে। আজিজুল হক সেই প্রস্তাব সমর্থন করে।"[৫]

শৈবাল মিত্র উত্থাপিত এই প্রস্তাব ছিল আসলে সম্পাদকমণ্ডলীর উত্থাপিত রিপোর্টের বিকল্প দলিল। মুদ্রিত নয়, লিখিত। এই বিকল্প দলিলের একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল ছাত্র ফেডারেশনের পতাকায় লিখিত স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতির বদলে লিখতে হবে—জনগণতন্ত্র, শান্তি, প্রগতি। কাউন্সিল অধিবেশনে এই বিকল্প প্রস্তাবের পক্ষে আরও যাঁরা ছিলেন—"তাঁরা হলেন দিলীপ পাইন, বীরেশ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক, অসিত সিনহা, নির্মল ব্রহ্মচারী, দীপক বিশ্বাস, অশোক ঘোষ এবং আর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী।"[৬]

বিকল্প প্রস্তাবের সমর্থকদের চিন্তা-ভাবনায় ছাত্র আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী কি ধরনের হওয়া উচিত, তা এই রাজ্য পরিষদের অধিবেশনে ছাত্রনেতা অশোক ঘোষের বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছিল। "এই সভায় উত্তরবঙ্গের ছাত্রনেতা অশোক ঘোষ জানিয়েছিলেন যে, দার্জিলিং জেলার ছাত্র ফেডারেশনের কিছু কর্মী গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রযন্ত্র এবং পুলিশকে মোকাবিলা করার জন্য ছাত্রকর্মীরা যে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব অনুশীলনে নেমেছেন, অশোক সে খবর সভায় দিয়েছিলেন।"[৭]

শৈবাল মিত্রদের এই বিকল্প প্রস্তাবে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বিচলিত বোধ করেন। তাঁদের বিচলিত হবার কারণ ছিল—ছাত্র সংগঠনকে প্রাদেশিক পার্টি নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করা হয়। জ্যোতি বসু তখনও ভারতরক্ষা আইনে দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তার হননি এবং প্রবীন নেতা আবদুল হালিমও অসুস্থ অবস্থায় পার্টির কাজ-কর্মের খোঁজ খবর রাখতেন। প্রকাশ্য ও গোপন পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্দেশ এল—১৭ই জুলাই রাতে কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত ছাত্র পার্টি সভ্যদের ফ্র্যাকসান মিটিং করে এই বিপদজনক ঝোঁকের বিরোধিতা করতে এবং সম্পাদক মণ্ডলীর রিপোর্ট-কে অনুমোদন করিয়ে নিতে। সেই মতো রাতে বৈঠক হলো। বিকল্প প্রস্তাবের উত্থাপক পার্টি সদস্যরা জানালেন—তাঁরা ছাত্র সংগঠনকে পার্টি সংগঠনে রূপান্তরিত করতে চাইছেন না। এতদসত্ত্বেও বিকল্প প্রস্তাবের উত্থাপকরা পার্টি সদস্যদের বৈঠকে নিন্দিত হলেন। বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর রিপোর্ট অনুমোদন পেল। অর্থাৎ 'প্রদেশ নেতৃত্বের নিন্দা প্রস্তাব সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিল। প্রদেশ নেতৃত্বের মধ্যে যে একটা বড় ফাটল তৈরি হয়েছে এবং এ ফাটল যে বাড়বে, এটা সে রাতের সভার পর বোঝা গিয়েছিল।[৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হলো—১৯৬৫ সালে বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনের সময়ে 'নককশালবাড়ি সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের' কোন ইঙ্গিত ছিল না, তা সত্ত্বেও কিন্তু নতুন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের নেতাদের একটি অংশের ভাবনা-চিন্তায় নকশালবাড়ির ঘটনার একটি রূপরেখার আদল ছিল। যা, পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনে কিছুটা প্রতিফলিত হয়। এই কারণে বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনের তাৎপর্য ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে অনস্বীকার্য।

বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনেই ঠিক হয়েছিল জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা হবে। কিন্তু আশঙ্কা ছিল, বেলঘরিয়া কাউন্সিল সভাকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছাত্রনেতা ও কর্মীদের মধ্যে যে মতবিরোধ মাথা চাড়া দিয়েছে, তারপর ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণ আন্দোলন সংগঠিত করা যাবে কিনা। না, সংগঠনে ফাটল ত্বরান্বিত হবে। বাস্তবে এই আশঙ্কা অমূলক বলেই প্রমাণিত হল। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি রূপায়নে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী হলেন। বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে পথ অবরোধ করা হলে সমবেত ছাত্র জমায়েতের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে। এর ফলে ছাত্র কর্মীদের মধ্যে জেহাদের মনোভাব লক্ষিত হয়। ছাত্রসমাজের বিপুলভাবে অংশগ্রহণের ফলে পশ্চিমবাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ২৭শে জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লন থেকে এসপ্লানেড ইস্ট অভিমুখে ছাত্রনেতাদের প্রায় সকলের উপস্থিতিতে এক বিশাল ছাত্র মিছিল এসপ্ল্যানেড ইস্টে পৌঁছায়। মিছিল পৌঁছানোমাত্র-ই পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ এবং খণ্ডযুদ্ধে গোটা ধর্মতলা সেদিন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। শ্যামল চক্রবর্তীসহ অধিকাংশ ছাত্রনেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। বিমান বসু এবং সুভাষ চক্রবর্তীকে সেদিন পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল না। ১২ই আগস্ট কলকাতার নিকটস্থ সিঁথিতে ছাত্রকর্মীদের একটি সভা করতে গিয়ে সুভাষ চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হলেন। সুভাষ চক্রবর্তীর গ্রেপ্তারের ঘটনা থেকে জানা গেল বিমান বসুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে। বিমান বসু এতদিন আধাগোপন আধাপ্রকাশ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছিলেন। কিন্তু ২৭শে জুলাই এবং ১২ই আগস্টের ঘটনার পর বিমান বসু সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করলেন। ইতিমধ্যে ছাত্রনেতা শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, আবদুল হালিম প্রমুখরাও গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সর্বভারতীয় স্তরে নতুন পার্টির শীর্ষনেতাদের অন্যতম জ্যোতি বসু পার্টির কাজকর্ম প্রকাশ্যে দেখাশুনা করছিলেন, তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন পার্টির প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্টিনেতা বিভূতি দেব। এবার পার্টির ছাত্রফ্রন্টসহ সব গণফ্রন্টের নেতৃত্ব বর্তালো পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ড নেতৃত্বের উপর। শুরু হয়ে গেল পাক-ভারত যুদ্ধ। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলো, স্বাভাবিকভাবেই সবরকম গণ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লো।

পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশন থেকেই পরস্পরবিরোধী দুই গোষ্ঠীকে 'রক্ষণশীল' এবং 'র‍্যাডিক্যাল' নামে চিহ্নিত করা হতে থাকে। প্রাদেশিক ছাত্র নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বলা হল 'রক্ষণশীল' এবং বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনে যাঁরা বিকল্প প্রস্তাব অথবা দলিল উপস্থিত করেছিলেন, তাঁদের বলা হতো 'র‍্যাডিক্যাল'। যদিও বিভাজনের এই ভাষ্য 'র‍্যাডিক্যাল'-দের প্রদত্ত। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠিত ছাত্র নেতৃত্বের পক্ষ থেকে 'র‍্যাডিক্যালদের' পার্টিবিরোধী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হতো।

ছাত্র-ছাত্রী : বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনের সময় থেকেই পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র বলে পরিচিত "ছাত্র-ছাত্রী" পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে মতবিরোধ প্রকট হতে থাকে। 'র‍্যাডিক্যাল' বলে পরিচিতরা পত্রিকাটিকে আবার নিজেদের কব্জায় নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া পত্রিকাটির ডিক্লারেশন ছিল অন্যতম প্রাক্তন 'র‍্যাডিক্যাল' ছাত্রনেতা অধ্যাপক সুভাষ বসুর নামে। এই সময় থেকেই গোপন ছাত্রটিমের নেতৃবৃন্দ ভাবলেন 'ছাত্র-ছাত্রী' নিয়ে সংকট আসন্ন। 'র‍্যাডিক্যাল' অংশ ভাবলেন 'ছাত্র-ছাত্রী' হয়তো তাঁদের দখলে নেওয়া যাবে না, তাই বিকল্প পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি প্রয়োজন। তাঁরা সেভাবে প্রস্তুত হতে থাকলেন। এই দিকে যতদিন তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম ছাত্রনেতা অনিল বিশ্বাস গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত, তিনি-ই গোপন টিমের পরামর্শ ও সহযোগিতায় 'ছাত্র-ছাত্রী' প্রকাশের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অনিল বিশ্বাসের প্রদত্ত সে-সময়কার রিপোর্ট থেকে ছাত্রটিমের গোপন নেতৃত্ব-ও 'ছাত্র-ছাত্রী'-র বিকল্প পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দেয়।

১৯৬৫-র আগস্ট মাসেই গোপন ছাত্রটিমের বর্দ্ধিত বৈঠক বসলো সোদপুরের রবীন্দ্রনগরে দীনেশ মজুমদারের স্ত্রী জ্যোৎস্না মজুমদারের ভাইয়েদের বাড়িতে। অনিল বিশ্বাসের রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো—অবিলম্বে 'ছাত্র-ছাত্রী'-র ডিক্লারেশন কোর্টে সারেণ্ডার করাতে হবে এবং 'ছাত্র-সংগ্রাম' নামে নতুন পত্রিকার রেজিস্ট্রেশনের আবেদন জমা দিতে হবে। প্রস্তাবিত 'ছাত্র সংগ্রাম'-এর মালিকানা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নামে হবে। এই সিদ্ধান্তমত 'ছাত্র-ছাত্রী'-র সম্পাদক নির্মল ব্রহ্মচারীর উপর পার্টিগত চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে ডিক্লারেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে নেওয়া হলো। অনিল বিশ্বাস ব্যাঙ্কশাল কোর্টে 'ছাত্র-ছাত্রী'-র ডিক্লারেশন সারেণ্ডার করলেন এবং 'ছাত্র সংগ্রাম'-এর আইনানুগ আবেদন করলেন। 'ছাত্র-সংগ্রাম' প্রকাশের জন্য সুবিনয় ঘোষকে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য করে ৭ জনের একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন—সুবিনয় ঘোষ, হরিনারায়ণ অধিকারী, বিমান বসু, শ্যামল চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে কয়েকজন জেলে এবং কয়েকজন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। 'ছাত্র সংগ্রাম' প্রকাশের প্রকাশ্য দায়িত্ব বর্তায় অনিল বিশ্বাসের উপর। কিন্তু 'ছাত্র-সংগ্রাম' প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই অনিল বিশ্বাস গ্রেপ্তার হন। গোপন ছাত্রটিমের ব্যবস্থাপনায় ঐ অবস্থায় ছাত্র-

সংগ্রাম প্রকাশ অব্যাহত থাকে। কিন্তু 'ছাত্র-সংগ্রাম' প্রকাশের মাধ্যমে পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে দুটো পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়ে গেল এবং সূচিত হলো ভাঙনের পূর্বাভাষ। 'ছাত্র-ছাত্রী' পত্রিকা এইভাবে বন্ধ করে দেবার ফলে 'র‍্যাডিক্যাল' বলে পরিচিতরা 'রক্ষণশীল'-দের বিরুদ্ধে জোট বাঁধলেন। তাঁরাও 'ছাত্র ফৌজ' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছেন। 'ছাত্র ফৌজ'-কে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের পাল্টা ছাত্র ফেডারেশন গঠনের প্রচেষ্টা।

১৯৬৫-র আগস্ট-এর শেষ দিক থেকে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়া; পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের 'রক্ষণশীল' এবং 'র‍্যাডিক্যাল' বা 'পার্টিবিরোধী' বলে পরিচিতদের অধিকাংশ ছাত্রনেতারা জেলে কারারুদ্ধ থাকার ঘটনার ফলে ১৯৬৫-র শেষ তিন-চার মাস নতুন কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন এবং ছাত্র সংগঠনের কাজ প্রকাশ্য বিশেষ কিছু ছিল না বল্লেই চলে। সুতরাং এই সময়ে ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরে বিতর্ক সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। ছাত্রফ্রন্টের গোপন টিম তখন সাংগঠনিক কাজকর্মের পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনের অঞ্চলভিত্তিক ছোট ছোট ছাত্র-যুব বৈঠক, আলোচনা সভার উপর। এইসব কার্যক্রমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ করে নতুন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিগত বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পেত। এই ধরনের বৈঠক-সভাগুলির আয়োজনে পার্টির আঞ্চলিক কমিটিগুলির সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত কার্যকরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসভিত্তিক সংগঠন ও আন্দোলনের চেয়ে পাড়া-পল্লী, অঞ্চলভিত্তিক ছাত্র-যুব কর্মীদের বৈঠক, সভা, আলোচনাগুলি ছিল অনেক ফলপ্রদ। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে এবং আরও পরে পার্টিবিরোধী শক্তিকে মোকাবিলায় এই সাংগঠনিক পদ্ধতি গ্রহণের সাফল্যকে প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে ছাত্র কর্মীদের মিলিটেন্সি এবং সংগ্রামী মেজাজ গঠনে এই ব্যবস্থা গ্রহণের সুফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

'র‍্যাডিক্যাল' বলে আত্মপরিচয় দানকারীরাও এই সময়ে ছিলেন সক্রিয়। জেলের অভ্যন্তরে কিংবা জেলের বাইরে অবস্থানকারী এই অংশের ছাত্রনেতা-কর্মী এবং তাঁদের অনুগামীরা নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও অভীষ্টকে উদ্দীপিত করার জন্য ব্যাপকভাবে তত্ত্বগত পড়াশুনা [Self Study] শুরু করে। মাওসেতুং-এর 'ওরিয়েন্টেশন অব্ দ্য ইয়ুথ মুভমেন্ট', রেজিস দ্যব্রের 'রেভোলুশন উইদিন রেভোল্যুশান', ফ্রান্জ ফ্যাননের 'দ্য রেচেড্ অব্ দ্য আর্থ', মার্কুইস-এর 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান', রোলাণ্ড মোগলের 'ক্রাইসিস ইন ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বইগুলি হয়ে দাঁড়ালো এই 'র‍্যাডিক্যাল' অংশের ছাত্রনেতা ও কর্মীদের ভাবনা-চিন্তার উৎস।

এইভাবে ১৯৬৫ সালের পর্ব শেষ হলো।

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন

ভারতের ষাটের দশকের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৬৬-র পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি বিদ্যমান ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের সুযোগে স্বনামে বেনামে জোতদার,

ভূস্বামী, জমির বৃহৎ মালিকরা জমি লুকিয়ে রেখে প্রায় জমিকে অনাবাদী রেখে দেয়। ফলে ধান-চাল সহ যাবতীয় কৃষি উৎপাদনের হার কমতে থাকে। চাউল কলগুলির উপর যে লেভিনীতি ধার্য হয়েছিল, চালকল মালিকরা তা ফাঁকি দেয়। এই সময় প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন। কংগ্রেস সরকারের লেভি মারফৎ চাউল সংগ্রহের নীতি সরকারের প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই কার্যকরি হয়নি। নির্দিষ্ট সংগ্রহের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। তাছাড়া পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র তখনকার 'পূর্বপাকিস্তানে' প্রচুর পরিমাণে চাল পাচার হতে থাকে। তাছাড়া পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণতি হিসাবে আর্থিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পায়। জ্বালানী তেল এবং রেশনে প্রয়োজনীয় জিনিস-এর সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থা হলো সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। দেখা দিল রাজ্য জুড়ে, বিশেষ করে রাজ্যের মফস্‌ফল ও গ্রামাঞ্চলে তীব্র খাদ্য ও জ্বালানী তেলের সংকট।

এই খাদ্য ও কেরোসিন তেলের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬-র ৩০শে জানুয়ারি কলকাতার শহিদ মিনারে (তখন মনুমেন্ট ময়দান নামে পরিচিত) নয়া কমিউনিস্ট পার্টি [তখনও এই পার্টির নাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) হয় নি।]-র আহ্বানে এক বিশাল গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই গণ জমায়েত থেকে খাদ্য ও কেরোসিন তেলের দাবিতে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উচ্চমূল্য প্রতিরোধ করতে রাজ্যের সর্বত্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হলো।

গণ আন্দোলন গড়ে তোলার এই আহ্বান ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় থেকেই পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গণ আন্দোলনমুখী সাংগঠনিক প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। বিশেষ করে পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী আধা গোপন-আধা প্রকাশ্য সাংগঠনিক কার্যক্রম যেন এই ধরনের গণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতিই রেখেছিল।

১৯৬৬-র ১৬ই ফেব্রুয়ারি সস্তাদরে চাল এবং নিয়মিত কেরোসিন তেল সরবরাহের দাবিতে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটের মহকুমা শাসকের দপ্তরে কয়েক হাজার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে। এই ঘটনায় আহত হলেন ৬ জন ছাত্র এবং গ্রেপ্তার হলেন ৪০ জন। ঐ দিনই এই ঘটনার বিবরণ ২৪ পরগণা জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়লো। পরের দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারি বসিরহাটের অনতিদুরে স্বরূপনগরে চাল-তেলের ঐ একই দাবিতে এবং বসিরহাটে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত স্কুলের ছাত্রদের উপরে পুলিশ গুলি চালালো। পুলিশের গুলিতে নিহত হলো তেঁতুলিয়া মালটিপারপাস স্কুলের ১২ বৎসরের কিশোরছাত্র নুরুল ইসলাম। নুরুল ইসলাম ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের প্রথম শহিদ। স্বরূপনগরে এই দিনের পুলিশের গুলিতে ঐ একই স্কুলের কিশোর ছাত্র মনীন্দ্র বিশ্বাসও গুরুতর আহত হলো। ১৭ই ফেব্রুয়ারি শুধু বসিরহাট স্বরূপনগরে নয়, সেদিন ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছিল ব্যারাকপুর, নৈহাটি, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সকালের সংবাদপত্রে স্বরূপনগরে নুরুল ইসলামের নিহতের ঘটনা দেখার পর কলকাতাসহ নিকটবর্তী জেলাগুলির স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বতস্ফূর্তভাবে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ধর্মঘটি ছাত্রসমাজ রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

খুবই তৎপরতার সাথে বামপন্থী দলগুলির ছাত্রসংগঠনগুলির সমন্বয়ে গড়া হলো 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'। ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাজপথে বসিরহাট স্বরূপনগরের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল ছাত্র মিছিলের সংগ্রামী মেজাজ প্রত্যক্ষ করে পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের তথা নয়া কমিউনিস্ট পার্টির গোপন ছাত্রটিম সিদ্ধান্ত নিল—বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ছাত্র বিক্ষোভকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং জনগণকে এর সাথে যুক্ত করতে হবে। আরও যে তাৎপর্যমূলক সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা হল পুলিশ সংঘর্ষ বাধালে বা ছাত্রদের সাথে পুলিশ সংঘর্ষে লিপ্ত হলে—ছাত্ররা পুলিশী আক্রমণকে সাহসের সাথে প্রতিরোধ করবে। এই সিদ্ধান্তের অনেকটা মিল রয়েছে আগেকার পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচির সাথে। পশ্চিমবাংলার ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের শুরুতেই ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্ব ১৯৫৯-র খাদ্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে আন্দোলনের গতিকে চড়া মেজাজে প্রতিরোধের খাতে বইয়ে দিলেন। অর্থাৎ ১৯৫৯-র মত নিরবে মার খেয়ে বিপুল সংখ্যায় একই স্থানে শহিদ হওয়া নয়। আন্দোলনের ধ্বনি ছিল—পুলিশী আক্রমণ, দমন, পীড়ন প্রতিরোধ কর; শহিদ হও। খাদ্য ও কেরোসিন তেলের দাবির সাথে যুক্ত হলো রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির দাবি। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ২২শে ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের আহ্বান জানালো। বামপন্থীদলগুলি সারা রাজ্যে ঐ ২২শে ফেব্রুয়ারি আহ্বান জানালো শহিদ দিবস পালনের। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে নিয়ে গঠিত 'রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি'ও এই আহ্বানে এগিয়ে এলো। সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারি আহূত ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিপদের আশঙ্কায় ২১শে থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমস্ত স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার হুকুম জারি করলো। সরকারি হুকুম প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাগুলিতে থাকলেও রাজ্যের সর্বত্র কলকাতা সহ জেলার শহরগুলিতে ছাত্র বিক্ষোভ এবং শহিদ দিবস পালিত হয়। যে জেলাগুলি সরকারি হুকুমের আওতার বাইরে ছিল, সে সব জেলাতে আরও স্বতস্ফূর্তভাবে পালিত হলো ছাত্র ধর্মঘট।

খাদ্য ও কেরোসিন তেলের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হলেও ছাত্র বিক্ষোভ পরিণত হলো গণ বিক্ষোভে। ছাত্র বিক্ষোভের সমর্থনে এগিয়ে এলো শিক্ষকসমাজ এবং শিক্ষক সংগঠন। ছাত্র বিক্ষোভের প্রাবল্যে ঝিমিয়ে পড়া বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে CPI সবদিক থেকে কমজোড়ি হয়ে পড়ে। ১৯৬৪-৬৫-৬৬ সালে CPI এবং তার গণ সংগঠনগুলির কোন কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। তাই, ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনেও CPI ও তার ছাত্র সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির ভূমিকার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এতদসত্ত্বে CPI-এর গণ সংগঠনগুলি ছাত্র বিক্ষোভকে সমর্থন করেছিল এবং প্রতিবাদ জানিয়েছিল পুলিশী দমন-পীড়নের। বামপন্থী দল ও তাদের প্রধান গণসংগঠন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ২২শে মার্চের পর আন্দোলনকে আরও জোরদার করার কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে।

খাদ্য আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব এবং স্টিয়ারিং ছিল নতুন কমিউনিস্ট পার্টি [যা পরে CPI(M) নামে পরিচিত]-র হাতে। এই নতুন পার্টির ছাত্রফ্রন্ট-ই ছিল ছাত্র বিক্ষোভ এবং খাদ্য আন্দোলনের কর্মসূচি প্রয়োগের প্রধান চাবিকাঠি। এইজন্যই এই ছাত্রফ্রন্টের অর্থাৎ পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের তখনকার কাজকর্মের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি বসিরহাটে ছাত্রবিক্ষোভ অনেক আগে থেকেই ছাত্র ফেডারেশনের নেতা এবং সক্রিয় কর্মীদের প্রধান অংশ জেলে বন্দি। তবু নেতৃত্ব এবং কর্মীদের যে অংশ জেলের বাইরে প্রকাশ্য ও আত্মগোপন অবস্থায় ছিল, তাদের পারস্পরিক সাংগঠনিক যোগাযোগ খুব তৎপরতার সাথে ১৬ই ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর থেকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে গড়ে তোলা হয়। শুধু ছাত্রফ্রন্টে নয়। সমগ্র সাংগঠনিক ব্যবস্থাটি ছিল একটি বৃত্তাকার পদ্ধতির অনুসারি। আত্মগোপনকারী পার্টি নেতৃত্বের সাথে প্রকাশ্যে পার্টিকেন্দ্রের, আত্মগোপনকারী ছাত্রটিমের সাথে প্রকাশ্য ছাত্র নেতৃত্ব ও কেন্দ্রের এবং শেষ পর্যায়ে প্রকাশ্য পার্টি কেন্দ্রের সাথে প্রকাশ্য ছাত্র সংগঠন কেন্দ্রের। বৃত্তাকারে এই সাংগঠনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলিতে [ফেব্রুয়ারি শেষ থেকে গোটা মার্চ পর্যন্ত] খুবই দ্রুততার সাথে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী যোগাযোগকারী হিসেবে 'পার্টি ক্যুরিয়ার' সব চাইতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। 'পার্টি ক্যুরিয়ার'-এর কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল খুব বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল পার্টি সভ্যদের। কলকাতা জেলায় পার্টি ক্যুরিয়ারদের ইনচার্জ হিসেবে পার্টির জেলা কমিটির প্রবীণ অভিজ্ঞ কমরেডদের দায়িত্ব দেওয়া হতো। পার্টি ও গণসংগঠনের সর্বস্তরে যোগাযোগের এই পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল বলে, প্রতিটি ঘটনার বিবরণ আদান-প্রদান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা চটপট প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল। ছাত্রফ্রন্টের কাজকর্ম এই পদ্ধতিতে চলার ফলে প্রচণ্ড পুলিশী তাণ্ডব সত্ত্বেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কলকাতা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া ও হুগলী এবং নদীয়া জেলার পার্টির জেলা কমিটি ও লোকাল কমিটিগুলিকে পার্টিগত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ছাত্রফ্রন্টের আন্দোলনগত কর্মসূচিগুলি প্রয়োগ সব রকমের সহযোগিতার জন্য।

পার্টির সহযোগিতায় গোপন ছাত্রটিম, তার কাজকর্ম চালনার জন্য কতগুলি সেন্টার বা কেন্দ্র অথবা গোপন ডেরা ঠিক করে নিয়েছিল। এই গোপন ডেরাগুলির মধ্যে ছিল— কলকাতার বাগবাজার; বরানগরে জ্যোতিনগর; সোদপুর-পানিহাটির বঙ্কিমপল্লী, রবীন্দ্রনগর; হাওড়ার হনুমান জুটমিলের নিকটস্থ বস্তি এলাকা। হাওড়ার হনুমান জুটমিলের নিকটস্থ বস্তির ডেরাটি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দু'জন ট্রাম শ্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এইসব গোপন ডেরাগুলিতে আত্মগোপনকারী নেতারা অনেকে থাকতো এবং তাঁরা এক সঙ্গে মাঝেমাঝে মিলিত হতেন এবং তাঁদের সাথে প্রকাশ্যে কাজে নিয়োজিত ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা গোপন সভা বৈঠকে মিলিত হতেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি এইরূপ একটি মিলিত সভা সোদপুর বঙ্কিমপল্লীর নিকটস্থ একজন স্থানীয় পার্টিনেতার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গোপন ছাত্রটিমের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হরিনারায়ণ অধিকারী, বিমান বসু। তাছাড়া কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী-র নেতৃস্থানীয় ছাত্র পার্টি সভ্যরা। এঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দীপক দাশগুপ্ত, স্বদেশ চক্রবর্তী, ঝর্ণা ভৌমিক, শিপ্রা ভৌমিকের দিদি, রমলা ভট্টাচার্য, দিলীপ বিশ্বাস প্রমুখ সহ প্রায় ৩০ জন নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্য। সোদপুরের এই সভা থেকে ৭ দিনের একটি 'জঙ্গী আন্দোলনের' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি-ই ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্বের দাবানল সারা পশ্চিমবঙ্গে জ্বেলেছিল। আন্দোলনের 'ফর্ম' হিসেবে নিদ্ধারিত হয়েছিল—আইন অমান্য, রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে ট্রাম-বাস প্রভৃতি যানবাহন চলাচল বন্ধ করে ছাত্র সমাবেশ ও পথ অবরোধ, পুলিশী জুলুম-আক্রমণ মোকাবিলা, এবং উদ্ভুত পরিস্থিতি অনুসারে ৪ঠা মার্চ সারা বাংলা ছাত্র

ধর্মঘট আহ্বান। কিন্তু এই কর্মসূচি আলোচনার সময় পুলিশী সন্ত্রাস মোকাবিলার প্রশ্নে ছাত্রনেতাদের মধ্যে দ্বিমত প্রকাশ পেয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৬৫-তে অনুষ্ঠিত বেলঘরিয়ার কাউন্সিল অধিবেশনের কথা স্মরণ করে আলোচনার সময় অনেকে অনেক রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও কলকাতার পথ অবরোধ-সমাবেশ এবং ছাত্র বিক্ষোভের স্পট বা স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটার মোড়, শিয়ালদহের সুরেন্দ্রনাথ ও বঙ্গবাসী কলেজের নিকটস্থ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সহ কলেজ স্কোয়ার ও কলেজ স্ট্রিট এবং অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে জেলার প্রধান প্রধান সম্ভাব্য শহরগুলি। ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় ধাপে ধাপে এই কর্মসূচি অনুসারে ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হলো। সর্বত্র থমথমে পরিস্থিতি। পুলিশের সাথে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে কতগুলি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে গেছে। ১লা, ২রা, এবং ৩রা মার্চ পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অগ্নিগর্ভ হতে থাকে। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ছাত্রকর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস এবং প্রতিরোধকারীদের সংগঠিত প্রতিরোধে কলকাতা মহানগরীতে আগুনে পরিস্থিতি। অন্যান্য জেলাতেও পুলিশ-ছাত্র খণ্ডযুদ্ধ।

এই পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ডাকে আহ্বান জানানো হলো ৪ঠা মার্চ '৬৬ সারা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের। এই আহ্বানের ব্যাপকতা রাজ্য সরকার এবং এমনকি ছাত্রনেতৃবৃন্দের পক্ষেও বুঝে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সারা রাজ্যের গোটা ছাত্রসমাজ যেন নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছাত্রসমাজ সরকারের রক্ত চক্ষুকে, হুমকিকে এবং লাঠিগুলিকে উপেক্ষা করে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। ৪ঠা মার্চের ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ ছাত্রবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। এইদিন ছাত্র বিদ্রোহকে দমন করার জন্য পুলিশ গুলি চালায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপরে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে গুলিতে ৪ঠা মার্চ, ১৭ বৎসর বয়স্ক ছাত্র আনন্দ হাইত নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক, গুরুতর আহতদের মধ্যে ৭ জনকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। ছাত্র আনন্দ হাইতের মৃত্যু সংবাদে পুলিশী ব্যারিকেড অগ্রাহ্য করে গোটা শহরের মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন। ছাত্র-যুবক এবং সাধারণ মানুষ নিজেরা পাল্টা ব্যারিকেড গড়ে রাস্তার মোড়গুলি অবরোধ করে পুলিশের মোকাবিলা শুরু করলেন। ৪ঠা মার্চ রাতভর চললো পুলিশের সাথে সংঘর্ষ এবং পুলিশের আক্রমণ প্রতিরোধ। বহু ছাত্র-যুব কর্মীকে গ্রেপ্তার করেও উত্তাল বিক্ষোভকে দমন করা সম্ভব হলো না। সরকারের জারি করা সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারা সবাই ব্যর্থ। ৪ঠা মার্চের ঘটনার পরেও ৫ই মার্চ বিক্ষোভ অব্যাহত। সব চাইতে বীরত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে সদর হাসপাতালের মোড়ে। বিক্ষোভরত ছাত্র-যুবকরা জেলাশাসকেরা অফিসের দিকে যেতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাঁরা যাবেনই, নিরস্ত্র কয়েকশত ছাত্র-যুবক কোন বাধাই মানবে না। বিক্ষোভকারী ছাত্র-যুবকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েক ব্যাটেলিয়ান সশস্ত্র পুলিশ। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা পুলিশকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছে। সশস্ত্র পুলিশ এবং ছাত্র-যুবকদের মধ্যকার ব্যবধান মাত্র পাঁচ-সাত গজ। নিরস্ত্র ছাত্র-যুবকরা সশস্ত্র পুলিশের কর্ডন ভাঙার উদ্যোগ নিতেই পুলিশ অফিসারদের নির্দেশ—'গুলি চালাও, fire, fire, গুলি চালাও।' অর্ডার মত সশস্ত্র পুলিশ রাইফেল তাক করে গুলি চালানোর পজিশন নিয়েছে। পুলিশের এই পজিশন গ্রহণ দেখামাত্র, সংখ্যায় সাত আটজন ছাত্র-যুবক গায়ের জামা খুলে নিজেদের বুক চেতিয়ে পুলিশের দিকে

ছুটে এসে চিৎকার করে বললো—'গুলি কর, দেখি তোমাদের কতগুলি আছে, মার আমাদের, মার, মৃত্যুকে কুচপরোয়া'। চারদিকের সমবেত মানুষ নিস্তব্ধ। রাইফেলধারী পুলিশ বাহিনী হতবাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ পুলিশ তাঁদের পজিশন ঘুরিয়ে রাইফেল নামিয়ে নিল। পুলিশ পিছু হটতে শুরু করেছে এবং নিজেদের ব্যারাক অভিমুখী হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমবেত ছাত্র-যুবক এবং সমবেত সাধারণ মানুষের মিলিত কণ্ঠে উচ্চরবের শ্লোগান ধ্বনিতে কৃষ্ণনগর শহর প্রকম্পিত। মুহূর্মুহু জনতার উচ্চরবে শ্লোগান। পুলিশের বড়কর্তারা গা-ঢাকা দিয়েছেন। সশস্ত্র সাধারণ পুলিশবাহিনী তাঁদের ব্যারাকের দিকে এগুচ্ছে, বিক্ষোভকারীরাও শ্লোগান দিতে দিতে পুলিশের পিছুপিছু এগুচ্ছে। কোন পুলিশের গায়ে বিক্ষোভকারীরা হাত দেয়নি, একটি ইট পাটকেল ছোড়েনি। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী জনসমুদ্রের বিক্ষোভের চাপে নিরবে নিজেদের ব্যারাকে ঢুকে গেছে। মূল সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে ব্যারাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বিক্ষোভকারীদের বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা শুরু করে। মিছিলে শ্লোগান ছিল—নিয়মিত সস্তাদরে খাদ্য চাই, তেল চাই, ছাত্র হত্যার-জবাব চাই, রাজবন্দিদের[১] মুক্তি চাই। জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষ শহর থেকে যাবতীয় পুলিশ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিল। কিন্তু পুলিশ অনেকগুলি বিভক্ত দলে ব্যারাকে ফিরে আসার পথে কোন কোন পুলিশ ও পুলিশ অফিসারের হটকারী নির্দেশের ফলে ক্রুদ্ধ জনতার সাথে পুলিশের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে। এই ধরনের সংঘর্ষে একজন পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর ক্রুদ্ধ জনতার হাতে খুন হলেন। শহিদ হলেন আরও দুজন বিক্ষোভকারী হরি বিশ্বাস এবং অর্জুন ঘোষ।

৪ঠা এবং ৫ই মার্চের কৃষ্ণনগরের ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহর সহ শান্তিপুর, রাণাঘাট, পায়রাডাঙ্গা, চাকদহ, নবদ্বীপধাম, বেতুয়াডহরী, পলাশীপাড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর এবং গঞ্জগুলিতে সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন ভয়ঙ্করভাবে ক্রুদ্ধ মানুষরা দল বেধে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নেবাতে দমকলবাহিনী এবং অন্য কোন সংস্থা সাহস পেল না। বিক্ষোভকারীদের আক্রোশে আরও চরমে আক্রান্ত হলো শাসকদল কংগ্রেসের উচ্চস্তরের জেলা নেতা ও মন্ত্রী ফজলুর রহমানের বাড়ি। কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি এম এল এ, এম পি রা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আত্মগোপন করলো। গণ বিক্ষোভের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে সরকারি প্রশাসন বিচলিত। সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হলো। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সেই বিখ্যাত উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো—"শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায় রে"।

শুধু নদীয়া নয়। ২৪ পরগণার বনগাঁ, হাবড়া, অশোকনগর; হুগলীর হিন্দমোটর, কোন্নগর, চন্দননগর; বর্ধমানের শক্তিগড়, মেমারী, আসানসোল; মুর্শিদাবাদের বহরমপুর; দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি; কোচবিহার জেলার কোচবিহার সদর শহর প্রভৃতিস্থানে ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল—রেল স্টেশন, পোস্ট অফিস, খাদ্যবিভাগের অফিস, ব্যাঙ্ক এবং সরকারি আধা-সরকারি কার্যালয়, যানবাহন, কলকাতায় ট্রাম-বাস। চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। সরকারি কার্যালয়, দপ্তর, যানবাহন, স্টেশন ইত্যাদি জ্বলছে। বনগাঁর খাদ্যদপ্তরের কার্যালয় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের টেলিফোন ব্যবস্থাও অচল হয়ে পড়েছিল, কারণ অধিকাংশ সরকারি দপ্তরের টেলিফোনের তার বিক্ষোভকারীরা কেটে দেয়। রাজ্য সরকার প্রায় জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে

আরও ব্যাপক সন্ত্রাস ও আক্রমণ হানার চেষ্টা করলো। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কয়েকশত মানুষকে গ্রেপ্তার করা হলো। হাবড়ার পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন আলি হামেজ, গুলিবদ্ধ কালু মণ্ডলের মৃত্যু হলো হাসপাতালে। ৪ঠা মার্চের পর রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে যে খাদ্য আন্দোলনের সূত্রপাত, মার্চের প্রথম সপ্তাহে তা চরম পর্যায়ে উত্তীর্ণ।

১০ই মার্চ বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং একই সাথে ছাত্রসংগ্রাম কমিটি সারা রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট এবং হরতালের আহ্বান জানায়। এই সাধারণ ধর্মঘট এবং হরতালের জনগণের সমর্থন ছিল স্বতস্ফূর্ত এবং ব্যাপক। রাজ্যের সবকিছু অচল। ২৪ ঘন্টার আহূত সাধারণ ধর্মঘট এবং হরতাল ৭২ ঘন্টা বা ৩ দিনের লাগাতার ধর্মঘট হরতালে পরিণত হলো। পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণে ধর্মঘট ও হরতাল ছিল অভূতপূর্ব।

রাজ্য সরকার বুঝে নিল এই খাদ্য আন্দোলন দমন করা অসাধ্য। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের স্মরণাপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করলো। জেলে বন্দি বিরোধী নেতাদের সাথে দূত মারফৎ শুরু হলো শলাপরামর্শ এবং আলাপ আলোচনা। সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত [সি পি আই-এর নেতা কর্মীরা সরকারের পক্ষে থাকায় কেউ গ্রেপ্তার হননি] জেলের বাইরে থেকে জেলের অভ্যন্তরে আটক জ্যোতি বসুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য জেলের অভ্যন্তরে আটক বামপন্থী নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছাতে থাকে।

ইতিমধ্যে নতুন কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য ও গোপন কেন্দ্র থেকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত হল পুলিশী জুলুম এবং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৪ই মার্চ মৌন মিছিল করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত বেরলো হাজার হাজার মানুষের এক বিশাল মৌন মিছিল।

এরপরের ঘটনা— প্রথমে আটক জ্যোতি বসু মুক্ত হলেন। জ্যোতি বসু জেল থেকে মুক্ত হয়েই নদীয়ার জেলার সদর কৃষ্ণনগরে গেলেন। কৃষ্ণনগর টাউন হল ময়দানে বিশাল সমাবেশ। নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক মধ্যবিত্ত মানুষের ভিড়ে সকলের দাঁড়াবার স্থান ছিল না। গোটা শহরের অধিকাংশ মানুষ সেদিন উপচে পড়েছে টাউন হল ময়দান ও তার চারপাশের রাস্তা ও গলিতে। জ্যোতি বসুর ভাষণের শেষে সমবেত মানুষের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ, সমস্ত রাজবন্দির মুক্তির দাবির শ্লোগান কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে দু'তিন কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এযেন জনতার বজ্রনির্ঘোষ, [এই পুস্তকের লেখক গোপন ছাত্র টিমের পক্ষ থেকে এই সমাবেশের অন্যতম সাংগঠনিক দায়িত্বে কৃষ্ণনগরেই উপস্থিত ছিলেন। খড়ে নদীর ধারে সমাবেশেব স্থান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে তাঁর গোপন আস্তানা থেকে লেখক ঐ সমাবেশের জনকল্লোল এবং বজ্রনির্ঘোষ শুনে অবাক হয়েছিলেন এবং পরে জেনেছিলেন সে সমাবেশে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। অতো বড় সমাবেশের জনকল্লোল শহর ছড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।] কৃষ্ণনগরের গণ- সমাবেশের পর কলকাতাসহ নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে গণসমাবেশ করা হয়। সমাবেশগুলিতে প্রধান দাবি

হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল, রাজবন্দিদের মুক্তি এবং অতিরিক্ত খাদ্যবরাদ্দ।

গণ আন্দোলনের এই ব্যাপক ভয়ঙ্কর চাপ সরকারের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না। সরকারি হিসেবে ৫৩ জন মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন সরকারের পক্ষে দমন করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার জ্যোতি বসু সহ কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে মৌখিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় পৌঁছে যায়। রাজ্য সরকার ঘোষণা করলো—সমস্ত রাজনৈতিক বন্দি সহ খাদ্য আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হবে এবং "পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্যে মাথাপিছু আড়াই ছটাক, আনুমানিক একশ গ্রাম, রেশন বাড়িয়ে দেওয়া হবে।" এই সিদ্ধান্তমত ১৯৬৬-র মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে রাজ্যের সকল স্তরের রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি পেলেন। সরকার রাজনৈতিক স্তরে বাস্তবে নয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতা করে গণ বিক্ষোভকে চাপা দিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং তাঁদের জেলের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত ১৯৬৬-র ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

নয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলো। রাজনৈতিক স্তরে ইঙ্গিত মিলল, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অর্থাৎ লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সম্ভবত ১৯৬৭-র গোড়ার দিকেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ইঙ্গিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পটভূমির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। নয়া কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী নেতা ও কর্মীরা প্রকাশ্যে বেড়িয়ে এলেন। গোপন পার্টিটিম, ছাত্রটিম এবং রাজনৈতিক গোপন কাজকর্ম চালানোর কেন্দ্রগুলি তুলে দেওয়া হলো। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময় থেকে পার্টির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা তথা ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি গোপন পার্টি ব্যবস্থা খাদ্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে ওপেন হয়ে গেল বা প্রকাশ্যে এসে গেল।

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রথমত—এই আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদিকে ছিল সংগঠিত রাজনৈতিক প্রস্তুতি, অপরদিকে ছিল ব্যাপক স্বতস্ফূর্ততা ও অসংগঠিত ছাত্র ও জনগণের বিভিন্ন অংশের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ।

দ্বিতীয়ত—এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ছাত্রসমাজ ও ছাত্র সংগঠনকে কেন্দ্র করে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে প্রধান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অনেকটা '৬০-এর দশকের পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমীদেশের ছাত্র আন্দোলনের মত-ই। পশ্চিমী দেশে ষাটের দশকে ছাত্র সমাজ যে আন্দোলন শুরু করেছিল, সে আন্দোলনের বিশেষ পর্যায়ে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকশ্রেণি অংশ নেয় এবং গণবিদ্রোহের সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গের '৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে বহুলাংশে ছিল সেই একই পরিস্থিতি।

তৃতীয়ত— পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন যেমনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে শক্তি যুগিয়েছিল, তেমনি পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের

মুখ্যভূমিকায় পরিচালিত আন্দোলন পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থত—এই আন্দোলনের নতুন বৈশিষ্ট্য হলো কলকাতা সহ মফস্বল জেলাগুলির স্কুলের ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণে। '৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে স্কুলের ছাত্ররা অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রদের সাথে এবার মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিল।

পঞ্চমত— ১৯৬২-র ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ, ১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং উগ্রজাতীয়তাবাদী পরিবেশ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী গণআন্দোলনকে যেভাবে নিস্তেজ করে দিয়েছিল, সে নিস্তেজ গণ আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলে মূলত পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের পরিচালিত ছাত্র আন্দোলন তথা খাদ্য আন্দোলন।

খাদ্য আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

১। রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস তখন একটানা ১৯ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায়। '৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল শাসক দল জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশি। খাদ্য আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষ হল কংগ্রেস জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। জাতীয় কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় স্তরে পুনর্গঠনের উদ্যোগ হিসাবে 'কামরাজ পরিকল্পনা' সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ঐ সময়েই ছিল পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনের তীব্র চাপ। সব মিলিয়ে পশ্চিমবাংলার জাতীয় কংগ্রেস ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ালো। 'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুসারে রাজ্যের সেচমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগী অজয় মুখার্জি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। গঠন করলেন রাজ্যভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল 'বাংলা কংগ্রেস'। অর্থাৎ খাদ্য আন্দোলন গণ বিক্ষোভের স্তরে উন্নত হবার ফলশ্রুতিতে প্রথম ভাঙল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজনীতিতে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

২। খাদ্য আন্দোলন তথা এই তীব্র গণবিক্ষোভ যেসব শর্তে মীমাংসা হল এবং আন্দোলন কার্যত প্রত্যাহৃত হয়েছিল, তাতে এই আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সকল অংশের ছাত্রনেতৃত্ব ও কর্মীদের সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যৌবন তারুণ্যের ভাবাবেগ, সমাজ পরিবর্তনের বিদ্রোহী রোমান্টিক স্বপ্ন. ত্যাগের আদর্শে এবং বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে লিপ্ত মানসিকতায় ছাত্রনেতৃত্ব এবং কর্মীদের যে অংশ আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র। এই প্রতিক্রিয়া আস্তে আস্তে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের রূপ নিতে শুরু করে এবং পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে অভ্যন্তরে বিভেদপন্থী মতাদর্শগত কার্যকলাপ এবং মতবিরোধ তীব্র হতে থাকল।

৩। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ভূমিকা বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রসমাজকে, বিশেষ করে তামিলনাড়ু এবং বিহারের ছাত্রসমাজকে এবং রাজধানী দিল্লির ছাত্র সংগঠনগুলিকে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আন্দোলনমুখী হতে উৎসাহিত করে। '৬৬-র মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলি প্রভাবিত ছাত্রসংগঠনের বিশেষ কোন নেতৃত্ব বা ভূমিকা ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনের পরোক্ষ

ভূমিকা ছিল। ইস্যুগুলি ছিল অবশ্যই আঞ্চলিক। যেমন—তামিলনাড়ুর ডি এম কে প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন জবরদস্তি হিন্দি ভাষা চাপানোর প্রতিবাদে সারা রাজ্যে এক অগ্নিগর্ভ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল অন্ধ্রসহ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে। অন্ধ্রে ঐ সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে শিল্পোন্নয়নের দাবিতে গণ আন্দোলনে প্রায় সব বিরোধী দলগুলির ছাত্রসংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করেছিল এবং পুলিশের গুলিতে নিহতদের মধ্যে ছিল ৪ জন ছাত্র। আসামেও কালোবাজারী বন্ধ সহ জিনিষপত্রের মূল্য কমানোর দাবির আন্দোলনে কলেজ ছাত্র ইউনিযনগুলির নেতৃত্বে ছাত্ররা ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে এবং গৌহাটি, নওগাঁ, শিবসাগরে পুলিশের গুলিতে ৭জন ছাত্র শহিদ হন। ভারতের টাকার মূল্য সাম্রাজ্যবাদী অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্তে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ সামিল হয়। এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৬৬-র পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন কেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতার ফলশ্রুতি ছিল সারা ভারতে উদ্বেল ছাত্র আন্দোলনের সৃষ্টি— যা ছিল ঐক্যবদ্ধ না হয়েও একের প্রভাবে অন্যে প্রভাবিত অনুপ্রাণিত।

৪। সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া হলো, ছাত্র আন্দোলনের তীব্র গতিবেগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি সংগ্রহে উৎসাহদান।

১৯৬৬-র কমিউনিস্ট প্রভাবিত পশ্চিমবাংলার খাদ্য আন্দোলনের পরে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহ ভারতের পরবর্তী রাজনৈতিক পটভূমিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

খাদ্য আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়

১৯৬৬-র জুন মাসের মধ্যে ভারতরক্ষা আইনে আটক কমিউনিস্ট নেতা কর্মীদের মুক্তিপর্ব শেষ হয়ে যায়। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হয়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে আটক এবং বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত খাদ্য আন্দোলনের বন্দিদেরও মুক্তির কাজ শেষ। ভারতরক্ষা আইনে আটক অন্যান্য রাজ্যের কমিউনিস্ট বন্দিদেরও মুক্তি ঐ সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং জেল থেকে সদ্যমুক্ত পার্টি নেতৃবৃন্দ এবং আত্মগোপন থেকে বেড়িয়ে আসা নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ-এর পরে. নয়া কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সাংগঠনিক স্তরে ঐবং গণ সংগঠনগুলির স্তরে অন্য ভাবনা-চিন্তার উদ্ভব হলো। খাদ্য আন্দোলন ও রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলনের মত গণ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইস্যুর যবনিকা পতনের ফলে, তাৎক্ষণিক আর কোন ইস্যুভিত্তিক গণ আন্দোলনের কর্মসূচি হাতের কাছে ছিল না অথবা আন্দোলনমুখী কোন নতুন ইস্যুর কথা ভাবাও হয়নি। তাই সাংগঠনিক বিষয়বস্তুর দিকেই নয়া পার্টির দৃষ্টি বেশি করে আকৃষ্ট হয়। পশ্চিমবাংলার পার্টি নেতৃত্ব ভারত সরকারের কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ইঙ্গিত পেয়েই পার্টি সংগঠন এবং গণ সংগঠনগুলিকে নির্বাচনী লড়াইয়ে যোগ্য করে তোলার জন্য প্রস্তুতি নিল। ছাত্র সংগঠনও এই প্রস্তুতিপর্ব থেকে বাদ গেল না। পার্টির রাজ্য ছাত্র-সাবকমিটির পক্ষ থেকে ঐ মর্মে নির্দেশ এল। পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাংগঠনিক কাজকর্মের দিকে নজর দেবার সিদ্ধান্ত নিল।

পার্টি এবং গণ সংগঠনের স্তরে সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করার সময়ে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মতবিরোধের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মতবিরোধের

এই ক্ষেত্রটি ছিল সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত '৭ম পার্টি কংগ্রেস' বহু রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত বিষয়ের মীমাংসা করতে পারেনি। ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মীমাংসা না করেই নতুন পার্টি গঠন করা হয়েছিল। ফলে মতবিরোধের বিষয়গুলি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেন, তাঁদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠী পার্টির অভ্যন্তরে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রে এই ধরনের গোষ্ঠী বেশি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু, পার্টি কংগ্রেস শুরু হবার কিছু পূর্ব থেকে সরকারের আক্রমণ, পাক-ভারত যুদ্ধ, খাদ্য ও গণ আন্দোলন প্রভৃতি পরপর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনাকেন্দ্রিক পরিস্থিতির জন্য এই গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় হতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং বন্দি মুক্তির পরবর্তী সময়ে '৬৬-র জুন, জুলাই, আগস্ট মাসের এই গোষ্ঠীগুলি তাঁদের রাজনৈতিক ও মততাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলো। পরিণতিতে পার্টির অভ্যন্তরে একটা চিন্তার সংঘাতের সূত্রপাত হলো। সংঘাতটা এলো এভাবে—নয়া পার্টির সর্বভারতীয় এবং রাজ্যস্তরের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব চাইলো চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পার্টিকে সক্রিয় করে তুলতে। অপরদিকে গোষ্ঠীনেতৃত্ব চাইলো রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অমীমাংসিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে পার্টিকে সচল করতে। শেষোক্তদের সব চাইতে বড় গোষ্ঠীটি ছিল অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা টি নাগী রেড্ডির নেতৃত্বে। পশ্চিমবঙ্গের গোষ্ঠীগুলি ছিল বিভিন্ন নামে। যেমন—আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটি, উত্তরবঙ্গ কমিটি, দক্ষিণ দেশ, সন্ত্রাস, কষ্টিপাথর, কমিউন প্রভৃতি। এর মধ্যে আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটি ছিল পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য সুশীতল রায়চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এবং উত্তরবঙ্গ কমিটি ছিল চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন।[৯]

পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের 'র‍্যাডিক্যাল' নামে পরিচিত অংশের এবং খাদ্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে যাঁরা অসন্তুষ্ট ছিল তাঁদের অনেকেই উপরে উল্লিখিত পার্টির বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল বা সমর্থক হিসেবে কাজ করছিল। এই জন্যই পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে পার্টি গোষ্ঠীর সাথে জড়িত ছাত্রনেতা কর্মীদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। শুরু হয়ে যায় পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্র। বিরোধের মূল দু'পক্ষ হয়ে দাঁড়ালো পুর্নগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব [যাদের রক্ষণশীল বলা হতো] বনাম 'র‍্যাডিক্যাল পন্থী'-র।

নয়া কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফ্রন্টে তখন থমথমে অবস্থা। সন্দেহের বাতাবরণ। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ সহ মৌলানা আজাদ কলেজ, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ এবং সিটি কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের বেছে বেছে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্রদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের মূলে ছিল রাজ্য সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের এক গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র প্রয়োগের প্রধান টারগেট হিসেবে গ্রহণ করা হলো প্রেসিডেন্সি কলেজকে। প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হলো পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনের এক নয়া পরিস্থিতি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন্দ্রিক নয়া পরিস্থিতি :

পুর্নগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে শ্যামল চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজের এবং বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে

সহযোগিতা করতেন কলকাতা জেলা কমিটির অন্যতম প্রধান নেতা সুধাংশু পালিত। কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্র বহিষ্কারের হিড়িককে প্রতিরোধ করার জন্য পার্টির পরামর্শে আন্দোলন সংগঠনের সিদ্ধান্ত হয়। খাদ্য আন্দোলন এবং বন্দিমুক্তি আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ঝিমিয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলনে 'ছাত্র বহিষ্কার বিরোধী আন্দোলন' নতুন করে প্রাণসঞ্চার করে। কিন্তু, 'ছাত্র বহিষ্কারের বিরোধী' এই আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক বিবরণ বর্ণনায় পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতারা তাঁদের লেখায় যা উল্লেখ করেছেন, তাতে মতপার্থক্যের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই এই সম্পর্কে দু'জন সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতার লিখিত বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ নিচে দেওয়া হলো—

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রনেতা দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী লিখছেন :

"দেশ জুড়ে মানুষের উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিছু সাহসী ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এল কলেজের 'এস-এফ'-কে একটা সংগঠিত রূপ দিতে, ইউনিট তৈরি করতে এদের পুরোভাগে ছিল অসীম চট্টোপাধ্যায়। কলেজে সে তখন পরিচিত 'কাকা' নামে। নানা অসুবিধা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইডেন হস্টেলে গড়ে উঠল আন্দোলন। ১৯৬৬-র ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সংগঠিত 'এস-এফ' সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল।"

"টনক নড়ল সরকারি শিক্ষা বিভাগের। আমলা ও বশংবদ বুদ্ধিজীবী তৈরির কেন্দ্রে একী উপদ্রব? আটজন সক্রিয় ছাত্র-সংগঠককে কর্তারা বহিষ্কার করলেন, কাকা ও আরো দু'জনকে কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি করতে অস্বীকার করলেন। কর্তারা নানা ওজর খাড়া করেছিলেন। কিন্তু বামপন্থী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রছাত্রীরা প্রেসিডেন্সি কলেজে খোলাখুলি কোনো সংগঠন বানাতে পারবে কিনা এটাই ছিল লড়াইয়ে আসল বিষয়বস্তু।"

"প্রতিবাদে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট শুরু করল। ধর্মঘট খুব সফল হয়। মাসের পর মাস কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও 'এস-এফ'-এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাড়তে থাকে। যদিও এগারজনকে কলেজে আনা গেল না আসল লড়াইতে। অর্থাৎ নির্ভয়ে ও খোলাখুলি কলেজ 'এস-এফ' সংগঠন চালু করার প্রশ্নে কর্তারা হেরে গেলেন।"[১০]

"কিন্তু ১৯৬৭-র নির্বাচন যত কাছে আসতে থাকল, বি.পি.এস.এফ ও সি.পি.আই(এম) দলের আগ্রহ ও উৎসাহ ভাটা পড়তে থাকল। নেতাদের হাবভাবে প্রকাশ পেতে লাগল যে, তাঁরা খুশী হন যদি আন্দোলন গুটিয়ে নেওয়া হয়। ওদিকে কর্তৃপক্ষ এতদিনে আবার অনমনীয়, কোনো বোঝাপড়াতেই তাঁরা আসতে অনিচ্ছুক।"

"প্রেসিডেন্সি সংগঠকরা পড়লেন ফাঁপড়ে। কলেজ কতদিন বন্ধ থাকবে? শিক্ষা বিভাগ যেটাকে মর্যাদা ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য লড়াই বলে নিয়েছে, তাতে জিততে হলে সমস্ত সহানুভূতিশীল মানুষকে জড়ো করতে হবে। এই কাজে বামপন্থী দলগুলির, বিশেষত সি পি আই (এম) দলের সাহায্য অপরিহার্য। তারা যদি এখন তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ি কাজ না করে তবে তো সমুহ বিপদ।

"ছোটা হচ্ছে এক নেতার কাছ থেকে আরেক নেতার খোঁজে। ছাত্রনেতারা সব বলে দিলেন, 'দীনেশদা'র সঙ্গে কথা বল। কিন্তু দীনেশ মজুমদার জ্যোতিবাবুর নির্বাচনের এক মুখ্য দায়িত্ব নিয়ে বরানগরে। সমর মুখোপাধ্যায়ের কাছে যেতে বলা হ'ল। তিনিও নির্বাচনী মরশুমে ডুমুরের ফুল। অবশেষে তালতলার 'বসন্ত কেবিন'-এর সামনে প্রমোদবাবুকে একদিন পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে নামছেন। আমাদের দিকে তাঁর রোষ-কষায়িত দৃষ্টিপাত এখনও

ভোলা যায় না। তিনি বললেন, 'পার্টি দিয়ে এস'। অর্থাৎ স্নেকস এ্যাণ্ড ল্যাডার্স-এর খেলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ফের সাপের মুখে পড়তে হবে।" "সি.পি.আই. (এম) যদি অত জঙ্গী সব আওয়াজ না তুলে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসতে উপদেশ দিতেন, যদি সততার সঙ্গে বলতেন, সামনেই নির্বাচন—এখনতো আমরা বেশি সাহায্য করতে পারবো না, মিটমাটের দিকে এগোও, তাহ'লে অনেকের অনেক ঝক্কি-ঝামেলা কম হত। কলেজও আগে খুলে যেত। অবশ্য এতবড় ধাপ্পার শিকার না হলে আমাদেরও চোখ ফুটতে দেরি হ'ত।"

"মনে পড়ে এই চোখ ফোটার প্রক্রিয়ার একটি ধাপ। বহু চাপের পর বি.পি.এস.এফ প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে বড়ো প্রতিবাদ সভা ডেকেছে। সমাবেশের সময় এগিয়ে এলে দেখা গেল কেবল আমাদের নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এসেছে। সব মিলিয়ে তখন তাদেরও সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু সি.পি.আই(এম) দল তার প্রভাব খাটায়নি, বোঝাই গেল। পার্টি সদস্য এক ছাত্রবন্ধুকে চেপে ধরতে সে কবুল করল যে, পার্টির নির্দেশই ছিল, নিজে যেও, লোকজন জড়ো করে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।"

"প্রায় একই সময় আমরা দেখলাম যে, জীবন বীমা কর্মীদের আন্দোলন শুরু হলে ফের রাশ টেনে ধরা হ'ল। স্টেটবাস কর্মীদের ধর্মঘট দু'দিনের মাথায় প্রত্যাহার করা হ'ল। ধীরে ধীরে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হ'ল। নির্বাচনী প্রচারের 'টেম্পো' তোলার জন্যই আন্দোলনগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। কাজ মিটে গেছে। এবার আন্দোলন বন্ধ করে নামতে হবে আসল কার্যক্রমে—'ভোট দেবেন বাঁচতে...'।"

"প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলনকেও বামপন্থী নেতারা নির্বাচনী প্রচারের একটা অঙ্গ হিসেবে নিয়েছিলেন। তাই যে মাঝরাতে কলেজ গেটে পুলিশ লাঠি চার্জ করে অবস্থানকারীদের গ্রেপ্তার করে, সেই রাতে বারবার 'প্রতিরোধের' ভুয়া 'টেম্পো' তুলে বিপিএসএফ-এর নেতারা পুলিশ আসা পর্যন্ত সমাবেশ ধরে রেখে দিয়েছিলেন। লাঠি, গ্রেপ্তার, ছাত্রপীড়ন খবরের কাগজে উঠবে, তবে না ভোটের বাক্স ভরবে।"

"পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসীম চট্টোপাধ্যায় ঐ রাতে গ্রেপ্তার হয়নি। তাকে তারপর পার্টি 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' রাখার নাম করে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রেসিডেন্সির সংগঠকদের কাছ থেকে যদিও আন্দোলন যাতে চলতে পারে সেজন্যই তার গ্রেপ্তার না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সে নিজে ঝুঁকি নিয়ে চলে আসে ও সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ করে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে সে'ও গ্রেপ্তার হয়।"

"প্রেসিডেন্সি ছাত্র ধর্মঘট তাই একদিকে যেমন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন তৈরী করার বাধা সরিয়ে দিল, তেমনই অন্যদিকে কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি সচেতন একটা বড় অংশের সামনে খুলে দিল সাবেকী বামপন্থী দলগুলোর মুখোস।[১১]

পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের তদানিন্তন যুগ্ম-সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী লিখছেন :

"... যাইহোক, আন্দোলনের মুখে সরকার পিছু হটলেন। '৬৬-র ৬ই মের মধ্যে সকলকে মুক্তি দেওয়া হলো।"

"এর কিছুদিন পড়ে কোন এক কারণে, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অসীম চ্যাটার্জীকে এবং আরো দশজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিবাদে আমরা প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে এবং পরে একদিন বাধ্য হয়ে গভীর রাত অবধি অধ্যক্ষ সনৎ বসুকে ঘেরাও করলাম। পুলিশ তাঁকে ঘেরাও মুক্ত করতে এসে লাঠিচার্জ করলো। বিমান বসুর পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগলো।

পরদিন আমরা গেঠ ভেঙে কলেজে ঢুকে ল্যাবরেটরিতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

"সে সময় কলকাতায় আমাদের পার্টির পলিটব্যুরোর সভা চলছিল। কমরেড জ্যোতি বসু আমাদের ডেকে বিশৃঙ্খল আন্দোলনের জন্য তিরস্কার করেন। বলেন যে, এ ধরনের কার্যকলাপ ফ্যাসিস্টদের মানায়, কমিউনিস্টদের নয়। আমরা তখন ভুল ত্রুটি উপলব্ধি করে আন্দোলন উঠিয়ে নিয়েছিলাম।"[১২]

উপরে উল্লিখিত দু'টি বিবরণ থেকে অনুমেয়, ছাত্রনেতাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রেসিডেন্সি কলেজ আন্দোলনের কেন্দ্র হলেও, মৌলানা আজাদ, সি টি এবং মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতার এই ৪টি প্রধান কলেজে বহিষ্কার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ধর্মঘট এবং পিকেটিং চলে ১২৩ দিন। ৭০ দিন বন্ধ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সারা রাজ্যে ৫ বার ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছিল।[১৩] এইভাবে আন্দোলনের রূপ 'মিলিটেন্ট' হতে থাকে। তখন-ই নির্দেশ আসে আন্দোলন প্রত্যাহারের।

আন্দোলন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রকাশিত "ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা : দলিল সংকলন" শীর্ষক পুস্তিকায় যে বিশ্লেষাত্মক বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা লক্ষ্যণীয়। এই বিবরণে বলা হয়েছে :

'ইতিমধ্যে সরকার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। নির্বাচনী কার্যকলাপে ছাত্রকর্মীদের অংশগ্রহণ করার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে সি পি আই (এম) পার্টি নেতৃত্ব ছাত্র সংগঠকদের আন্দোলন তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিপিএসএফ ইউনিট সহ অন্যান্য কলেজের বহু কর্মী এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না। তবু বিপিএসএফ (বাম)-এর নেতৃবৃন্দ বহিষ্কৃত ছাত্রদের কর্তৃপক্ষের তরফে শুধুমাত্র ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আন্দোলন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে ব্যাপক আন্দোলনকারী ছাত্রদের কাছে পার্টি ও BPSF নেতৃত্বের নির্বাচনকেন্দ্রিক সংগ্রামবিমুখ নয়া শোধনবাদী চিন্তা ধরা পড়ে যায়।"[১৪]

এইভাবে ১৯৬৬-তে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন এবং তারপরে ছাত্র বহিষ্কার বিরোধী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি টানাতে পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রায় সব স্তরে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

এই পটভূমিতেই ইডেন হোস্টেলের ছাত্র আবাসিক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অতিবাম অথবা 'র‍্যাডিক্যাল' ছাত্রদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল "প্রেসিডেন্সি কন্‌সোলিডেশন"। অসীম চ্যাটার্জী, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী, অরুণ দাস প্রমুখ এই সংগঠনের নেতা ছিলেন। "প্রেসিডেন্সি কন্‌সোলিডেশন" প্রকৃতপক্ষে ছিল পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের পাল্টা সংগঠন। গৌতম ভদ্র প্রমুখ তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসা ছাত্রনেতারাও "প্রেসিডেন্সি কন্‌সোলিডেশন"-এর সাথে সংযোগস্থাপন করেছিলেন। এই সংগঠনটি ষাটের দশকের শেষ দিকে তৈরি হয়েও ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তখন কমিউনিস্ট চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উত্তাল প্রবাহ। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক প্রভাব "প্রেসিডেন্সি কন্‌সোলিডেশন"-এর ছাত্র নেতৃত্বকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রদর্শিত রাজনৈতিক লাইনকেই "প্রেসিডেন্সি কন্‌সোলিডেশন"-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রনেতা কর্মীরা ভারতীয় বিপ্লবের পথ হিসেবে ভাবতে থাকলেন। তাদের

মানসিকতা তখন চীনের পথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে ও প্রস্তুতিতে চালিত। এইজন্যই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষতম নেতা মাও সেতুং-এর লিখিত 'ওরিয়েন্টশন অব দ্য ইয়ুথ মুভমেন্ট' বইটি এঁদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই বই-এর শিক্ষা প্রয়োগ করতে নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করেন।

সরাসরি বিরোধের আরেকটি দিক :

এই পরিচ্ছেদ আগেই বলা হয়েছে, খাদ্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব পার্টির নির্দেশে ছাত্র ফেডারেশনের জেলাস্তরে এবং ইউনিট স্তরে সম্মেলন করে সংগঠনকে মজবুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্টি ও গণ সংগঠন স্তরে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল, সে কার্যক্রম রূপায়ণের সময়েই দেখা দিল প্রকাশ্যে গোষ্ঠী বিরোধ।

প্রথমত খাদ্য আন্দোলন ও বন্দিমুক্তি আন্দোলনে গণ সংগঠন হিসেবে ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য ৮০নং লোয়ার সার্কুলার রোডে পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির অফিসের প্রশস্ত হলঘরে রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ছাত্র পার্টিসভ্যদের সভা ডাকা হয়। পার্টির রাজ্য কমিটির পক্ষে রাজ্য কমিটির সদস্য এবং কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণপদ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই সভাতে 'র‍্যাডিক্যাল' বলে পরিচিত ছাত্র পার্টি সভ্যদের নেতৃস্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না। 'র‍্যাডিক্যাল'-দের মধ্যে কলকাতা জেলার কতিপয় যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই হরিনারায়ণ অধিকারী লিখিত 'রিভিউ রিপোর্ট' উপস্থিত করার সময় নিরবে একে একে সভা ছেড়ে চলে যান। যা ওয়াকআউট না হলেও অনেকটা ওয়াকআউট পর্যায়ের সমতুল্য। এই সভা ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটি ছিল, ভবিষ্যতে যা ঘটতে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিতরহ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটলো ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সাথে যুক্ত ছাত্র পার্টি সদস্যদের সভা ডাকা হলো ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এবং সম্পাদক ঠিক করার জন্য। পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে ছাত্র পার্টি সদস্যদের সভা তত্ত্বাবধান করছিলেন পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুধাংশু পালিত [মাস্টারদা]। সভায় উক্ত দু'পদে নির্বাচিত হলেন 'র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠী'র প্রার্থী দিলীপ পাইন এবং অসিত সিনহা। কিন্তু 'স্টুডেন্টস হল' না পাওয়ার অজুহাতে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। কার্যকরি করা যায়নি ছাত্র পার্টি সদস্যদের অধিকাংশের মতে গৃহীত সিদ্ধান্ত। শৈবাল মিত্র এই প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত পুস্তিকায় যা লিখেছেন, তা অনেকটা অভিযোগের উদ্রেক করে। তিনি লিখেছেন—"জেলা সম্মেলনের দায়িত্ব সাধারণত গ্রহণ করে চালু জেলা কমিটি। সেই জেলা কমিটির নেতা বিমান বসু জেলা সম্মেলনের জন্যে 'স্টুডেন্টস হল' ভাড়া করার দায়িত্ব নিলেন। দিনক্ষণ ঠিক হলো, অন্যান্য কাজও ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্মেলনের দু'একদিন আগে জানা গেল যে, 'স্টুডেন্টস হল' ভাড়া করা হয়নি। জেলা সম্মেলন বাতিল হয়ে গেল। পার্টির নির্দেশে রক্ষণশীল প্রদেশ নেতৃত্ব তারপর শুরু করলেন এলোপাথারি বহিষ্কার, র‍্যাডিক্যালদের তাড়িয়ে আদর্শগত বিতর্ককে সাংগঠনিকভাবে রক্ষণশীলরা মোকাবিলা করতে চাইলেন। সংগঠন ভেঙে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হল।"[১৫]

তৃতীয় এই ১৯৬৬তে ছাত্র ফেডারেশনের বিদ্যাসাগর কলেজ ইউনিটের বিদায়ী সম্পাদকমণ্ডলীর রিপোর্টে ছাত্রফ্রন্টের মতবিরোধের আভাষ মিলে। এই রিপোর্টে লেখা হয়েছে—"সমস্ত ফ্রন্টের আন্দোলনগুলির বিপথগামীতা ও দুর্বলতার সমাহারে আজ আমাদের দেশের গণ আন্দোলন, লক্ষ্য ও পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে অসুস্থতায় ভুগছে। শোধনবাদ ও প্রতিক্রিয়া এবং তার সহযোগী শক্তিগুলি সংস্কারপন্থী চিন্তার এক জোয়ার সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত। যদিও এখন পর্যন্ত জনগণের ব্যাপক হতে ব্যাপকতর অংশ আন্দোলনের সামিল হচ্ছে। তথাপি এই আন্দোলনগুলির ফলাফল যথোপযুক্ত হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।... প্রকৃতপক্ষে গত ট্রাম আন্দোলন থেকে বিগত '৪৮ ঘন্টার বন্ধ' পর্যন্ত নারীঘাতী, শিশুঘাতী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে গতানুগতিক ঘৃণার সঞ্চারে আরও কিছু যোগ ছাড়া আর কি যে হলো তাতো বুঝি না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে গণ আন্দোলনের ভূমিকা কি এই?" এইভাবে ছাত্রফ্রন্টে বিরোধ প্রকাশ্যে শুরু হলো ১৯৬৬-র শেষ পর্বে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে নতুন প্রাসঙ্গিকতা

ডিসেম্বর মাসে জানা গেল ১৯৬৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। লোকসভার সাথে বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানাল। তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলিতে শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী প্রস্তুতি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি [CPI] এবং নয়া কমিউনিস্ট পার্টি-কে নিয়ে নির্বাচনে কমিশন খুবই জটিল অবস্থার সম্মুখীন। নয়া কমিউনিস্ট পার্টিও নিজেদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচয় দিচ্ছে এবং দাবি করছে, তারা-ই প্রকৃত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'। অর্থাৎ একই নামে দু'ই কমিউনিস্ট পার্টি। নির্বাচন কমিশন জানাল একই নামে দু'ই কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিক দল হিসাবে অনুমোদন দেওয়া যাবে না। তাছাড়া 'কাস্তে ধানের শীষ' প্রতীক নয়া কমিউনিস্ট পার্টি পেতে পারে না। এই অবস্থায় নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার তাগিদে নয়া কমিউনিস্ট পার্টি নতুন নাম গ্রহণ করতে একপ্রকার বাধ্য হলো। নাম হলো—'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)' বা সংক্ষেপে 'সিপিআই(এম)'। নির্বাচনী প্রতীক নির্ধারিত হলো 'কাস্তে হাতুড়ী তারা'। অর্থাৎ নয়া কমিউনিস্ট পার্টি গঠন থেকে সিপিআই(এম) নামগ্রহণ পর্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে এবং পার্টিকে নির্বাচনী মোহমুক্ত করতে যে বিতর্ক চলছিল, সে বিতর্কের রাজনৈতিক মীমাংসা হবার পূর্বে-ই নির্বাচনে অংশগ্রহণের তাগিদে পার্টিকে নির্বাচনমুখী করে তুলতে হলো। এই ঘটনা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্র ফেডারেশনের বিক্ষুব্ধ অংশকে আরও সন্দিহান করে তুলতে সাহায্য করে। সন্দেহের হেতু ছিল—এই বুঝি পার্টি বিপ্লবের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংশোধনবাদী লাইনের পথে এগোচ্ছে এবং নির্বাচনী মোহে জড়িয়ে পড়ছে।

নতুন নাম গ্রহণ করে, অর্থাৎ নয়া কমিউনিস্ট পার্টি 'সি পি আই (এম)' নাম গ্রহণ করে [এখন থেকে এই পুস্তকের পরবর্তী অংশগুলিতে সি পি আই (এম) নামই ব্যবহার করা হবে—লেখক]। তার ছাত্রফ্রন্টে নির্দেশ পাঠাল ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরে রাজনৈতিকভাবে বিক্ষুব্ধদের সম্পর্কে সতর্ক হতে। প্রয়োজনে এই বিক্ষুব্ধদের সংকীর্ণতাবাদী রূপে চিহ্নিত করে এবং গণ সংগঠনের স্তরে ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ্যের বিরুদ্ধে বিভেদকারী কার্যের লিপ্ত বলে

সংগঠন থেকে বহিষ্কারের নির্দেশও পার্টি নেতৃত্বের কাছ থেকে এলো। এর ফলে সি পি আই (এম) পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন থেকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রনেতা বা কর্মীদের বহিষ্কারের এক বিরাট তালিকাও তৈরি করা হয়েছিল। সামনে ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন ছিল বলেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বহিষ্কারের কাজ শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে ধাপেধাপে এই বহিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফেডারেশনের প্রাথমিক ইউনিটগুলির সাধারণ পার্টি সভ্য ও কর্মীদের কিছু সংখ্যককে বহিষ্কার করা হয় এবং পরবর্তী ধাপে 'সংকীর্ণতাবাদী' অভিযোগে অভিযুক্ত নেতৃস্থানীয়দের বহিষ্কারের প্রস্তুতি চলে। চলতে থাকে 'শো-কজ' ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রাক প্রস্তুতি।

এইসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটা ছিল রাজনৈতিক মতাদর্শগত 'দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিণতি'। স্বাভাবিক পরিণতি তার নিজস্ব গতিতে এগুলোও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও তিক্ততার পরিবেশের মধ্যে কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক ছিল। ছাত্র ফেডারেশনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সহযোগী মিত্রশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামী ক্ষেত্রটি ছিল তাজা এবং সক্রিয়। এইজন্যই ১৯৬৬-র ৫ই জুলাই ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে পালিত হয় সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট ; ২০শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল ও ধর্মঘট ; ছাত্র ভর্তি সমস্যা নিয়ে ৩০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সারা বাংলা কনভেনশন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ও অবস্থান। তাছাড়া পুনর্গঠিত ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বেই সহযোগী বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এই সময়ে শিক্ষক আন্দোলন, অশিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলন, স্টেটসম্যান পত্রিকার কর্মচারীদের আন্দোলন সহ অন্যান্য গণ আন্দোলনের সমর্থনে সংহতিমূলক আন্দোলন গড়ে তোলাা হয়।[১৭]

এইসব আন্দোলনের সুফলকে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনের লড়াইতে কাজে লাগাবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়াস নেয়। এতদসত্ত্বেও শাসকদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সার্বিক ঐক্য হল না। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে এস ইউ সি প্রভৃতি দলকে নিয়ে হলো একটি ফ্রন্ট [সংযুক্ত বামফ্রন্ট, U L F]। সি পি আই-এর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস সহ আরও কয়েকটি দলকে নিয়ে হলো অপর একটি ফ্রন্ট [P U L F]। এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬-তে ১৯৬৭-র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বের ছক তৈরি হলো।

সর্বভারতীয় স্তরের পরিস্থিতি

ষাটের দশকের ১৯৬৬-তে দু'ই কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থীদের সর্বভারতীয় স্তরে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ছাত্র আন্দোলনে কোন প্রভাব বা ছাপ ছিল না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন ছিল খুবই দুর্বল। তবু ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার অন্যান্য রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। ষাটের দশকের '৬৬-তে অন্যান্য রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন ছিল দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী অথবা আঞ্চলিক স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্র সংগঠনের হাতে কিংবা অরাজনৈতিক ছাত্রনেতৃত্বের হাতে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের বিভেদ এবং গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অন্য রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের চৌহদ্দিকে স্পর্শ করতে পারেনি।

শুধুমাত্র, অন্য রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন অসংগঠিত ছিল বলেই, তা সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের চাপে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৫-৬৬তে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তার একটি ক্ষুদ্র চিত্র সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন ছাত্রনেতা বিমান বসুর ১৯৮৯-র একটি নিবন্ধে পাওয়া যায়। বিমান বসু তাঁর ঐ নিবন্ধে এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা নিম্নরূপ :

"একই সময়সীমায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে স্বতস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন, কোথাও বা সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্র আন্দোলনের সঠিক দিশার অভাবে ভারতের কোন কোন রাজ্যে ছাত্রদের সঙ্গে বাম কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। যাকে সঠিক ছাত্র আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার দিল্লি, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সংঘটিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে বিহারে একবার রাজ্যব্যাপী যে ছাত্র আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তা ছাত্র আন্দোলনের বিষয়বস্তু হতে পারে না। সমস্তিপুরে কলেজের জনৈক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটে। ছাত্রটি কলেজ যাওয়ার পথে 'মুচি' সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈককে দিয়ে তার জুতা রঙ করায়। মজুরি ২০ পয়সা হবে না ৩০ পয়সা হবে তা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা হয়। ছাত্রটি মজুরি হিসাবে ২০ পয়সা সে ব্যক্তিকে দেয়। তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রটি অপমানবোধে সে লোকটিকে চপেটাঘাত করে। ব্যক্তিটিও এই ছাত্রকে প্রত্যাঘাত করে। ছাত্রটি সোজা কলেজে গিয়ে প্রচার করে মুচি সম্প্রদায়ের একজন তাকে মেরেছে। ছাত্ররা কলেজ থেকে সোজা বেরিয়ে এসে সেই ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করে। তাকে না পেয়ে ঐ সম্প্রদায়ের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। গুলিতে জনৈক ছাত্র মারা যান। এই ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। একে কি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছাত্র আন্দোলন বলা চলে? এইসব বিষয় প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের কাছে এসে হাজির হয়। আবার ১৯৬২তে গৃহীত অ্যাডভোকেট অ্যাক্ট কার্যকরি করতে গেলে ১৯৬৫-'৬৬ সাল ব্যাপী ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্র বিক্ষোভ মোকাবিলা করতে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি ও গুলি চালায়। প্রথম বিক্ষোভের দিনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এলাহাবাদ, কানপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, শ্রীনগরে পুলিশের আক্রমণে অসংখ্য ছাত্র আহত হয়। পরে কয়েকজন হাসপাতালে মারা যান। কলকাতাতেও হয় এর প্রতিবাদ মিছিল। ১৯৬৬ সালে নভেম্বর মাসে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, পুলিশী বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদ এবং শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে দিল্লির বুকে ব্যাপক ছাত্র সমাবেশ করার জন্য ছাত্রদের জাতীয় প্রচার কমিটি গড়ে ওঠে। ১৮ জন সদস্যের এই প্রচার কমিটির নেতৃত্বে ১৯শে ডিসেম্বর দিল্লিতে ছাত্রদের ধরণার কর্মসূচি হয়। কিন্তু ৭ই ডিসেম্বর সাধুদের বিক্ষোভ সমাবেশের এবং ব্যাপক পুলিশী অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সরকার ছাত্রদের কর্মসূচিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের অভাবে পুলিশী অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতিকে ডেপুটেশন দিয়ে তৎকালীন কর্মসূচি শেষ হয়।"[১৮]

১৯৬৬-তে সর্বভারতীয় স্তরে এটাই ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত রূপরেখা।

১৯৬৭-র পর্যায়

ষাটের দশকের শুরু থেকে ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালা, পাঞ্জাব, দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠিত এবং অসংগঠিত ছাত্র আন্দোলনে ছিল উত্তাল। এই উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে শাসকদল জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ চরমে উঠেছিল। ভাঙন ধরেছিল কংগ্রেসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হল। এই রাজ্যগুলি যথাক্রমে—পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কেরালা।

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ষাটের দশক এবং তারপরেও অনেকগুলি সরকার পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের এই পূর্ব পাকিস্তানের সরকার পরিবর্তনের প্রতিটি ঘটনায় ঐ দেশের ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ও চাপ ছিল প্রধান কার্যকরী শক্তি। কিন্তু, ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনেই প্রথম কংগ্রেসী শাসনের একচেটিয়া ক্ষমতায় আঘাত আসে এবং ৮টি রাজ্যে কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা খর্ব হয়। কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা খর্বের মূলে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতাকে অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের মত ছাত্র আন্দোলনের ভয়ঙ্কর চাপ-ই প্রধান কারণ ছিল না। ভারতের রাজ্য সরকারগুলি ১৯৬৭-তে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্কের বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। আঞ্চলিক পরিস্থিতির বিভিন্ন পার্থক্যজনিত কারণের মধ্য থেকে শাসকদল কংগ্রেস বিরোধী যে ক্ষোভ উত্থিত হয়েছিল, তাতে এইসব রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন শক্তির যোগান দিয়েছে। বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে-ই ছাত্র আন্দোলনের চাপ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে সবচাইতে সক্রিয় পরিমণ্ডল রচনা করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে দু'ই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কংগ্রেস বিরোধী দু'টি ফ্রন্টে নির্বাচনী ঐক্য না হলেও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। কংগ্রেস ১২৭টি আসন পেয়েও বিধানসভায় সরকার গঠনের ক্ষমতা অর্জন করলো না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলত্যাগী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তনমন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মধ্যস্থতায় দু'ই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করে গঠিত হল 'যুক্তফ্রন্ট'। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ২০ বৎসরের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কংগ্রেস বিরোধী সরকার শাসন ক্ষমতায় এল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রীত্বের শপথ নিয়েছিল ১৯৬৭-র মার্চ মাসে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সিপিআই(এম) পরিচালিত যে সংগ্রামী ভূমিকা ছিল, সে ছাত্র ফেডারেশন কিন্তু এই সরকার গঠনে সামগ্রিকভাবে উৎসাহিত হল না। ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও তার অনুগামীরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সিপিআই(এম) পার্টির রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে সমর্থনে এগিয়ে এলেন। অপরগোষ্ঠী যাঁরা ইতিমধ্যে 'র‍্যাডিক্যাল' বা 'সংকীর্ণতাবাদী' বলে পরিচিত, তাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে সিপিআই(এম)-এর ভূমিকার মধ্যে পার্টির মতাদর্শগত বিচ্যুতির লাইনকে দেখতে পেলেন। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র ফেডারেশনের এই অংশ বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি মোহের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এই ভূমিকাই প্রাধান্য পায়। ফলে সিপিআই(এম)-এর ছাত্রফ্রন্টে ১৯৬৭-র শুরুতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও তীব্র হলো।

হিন্দু হোস্টেল ছিল 'র‍্যাডিক্যাল' বা 'সংকীর্ণতাবাদী' অভিহিত ছাত্রদের ডেন বা আড্ডার স্থল। এই হোস্টেল তাই সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তর্কে-বিতর্কে ও আলোচনা-সমালোচনায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থক এবং এই সরকারের সমালোচনায় ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংঘর্ষের পরিণামে ১৯৬৯ সালের ১৩ই মার্চ একজন যুব কর্মী খুনও হয়েছেন।[১৯]

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র ফেডারেশন [P G S F]-এর সম্মেলন। এই সম্মেলন উপলক্ষে সিপিআই(এম) পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের দু'ই গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকাশ্যে প্রকাশ পেল। ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দেওয়া প্যানেল অগ্রাহ্য হলে নেতৃত্ব এই সম্মেলনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে। কিন্তু 'র‍্যাডিক্যাল'পন্থীরা এই সম্মেলন চালিয়ে তাঁদের নিজস্ব কর্মীদের নিয়ে 'পি জি এস এফ'-এর ইউনিট গঠন করে। 'পি জি এস এফ' পদগুলি 'পি জি এস এফ'-এর হাতছাড়া হয়ে যায়। '৬৭-র এপ্রিল থেকে এইভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পি জি এস এফ' ইউনিট হয়ে দাঁড়ায় কলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা-প্রশাখাগুলিতে উচ্চশিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বের প্রধান কেন্দ্র।

পি জি এস এফ-এর সম্মেলনের পরবর্তী ঘটনা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রায় দু'-তিন মাস চলেছিল। পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের আন্দোলনে দাবিসমূহে বিশেষত্ব এবং অভিনবত্ব ছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 'কালপুরুষ'-এর ১৯৬৭-র সংকলন ৪-এর বিবরণ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত স্মারকলিপির কথা জানা যায়। এই স্মারকলিপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল—"আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন প্রয়োজন এই জন্য যে, এ দু'টি রাষ্ট্র হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থারূপে জগতের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র। এশিয়ার মধ্যে চীনের অধ্যয়ন আমরা দাবি করি এই জন্য যে এটি হচ্ছে জগতের সব থেকে বড় যে দেশ সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন সম্বন্ধীয় বিতর্কে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকায় মোটামুটিভাবে মিশর তার ফৌজি ফ্যাসিস্ট নেতৃত্বে একটি ধনতান্ত্রিক দেশরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে এবং কিউবা এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে যা বিপ্লব থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যে দেশ এখন সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছে।" ছাত্ররা আরও দাবি করে—"যে রাষ্ট্রনৈতিক ভাববাদী হেগেলীয় ইত্যাদি দর্শন যেমন পড়ানো হয়, তেমনি মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনও শেখাতে হবে। এই প্রসঙ্গে ছাত্ররা স্ট্যালিনের Dialectical & Historical Matirialism এবং মাও সেতুং-এর On Contradiction, on Practice ইত্যাদি পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"[২০]

১৪ দলের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেনামী জমি উদ্ধারের আন্দোলন তীব্ররূপ নেয়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত নকশালবাড়ি থানাতে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে সিপিআই(এম) এবং তার কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে বেনামী জমি উদ্ধারের আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং

বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জির সমর্থক এক জোতদারের প্রাসাদবাড়ির বেনামী জমি দখল নিতে গেলে আদিবাসী কৃষক জনসাধারণের সাথে জোতদারের বাহিনী এবং পুলিশের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। ২২শে মে থেকে ২৫শে মে চললো তীব্র সশস্ত্র লড়াই। ২৫শে মে কৃষকদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে পুলিশের সাবইন্সপেক্টর সোনম ওয়াংদি নিহত হয়। পুলিশের আক্রমণে এবং গুলিতে ১০ জন আদিবাসী কৃষক রমণীসহ অনেক কৃষক খুন হন। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির হাতে পুলিশ দপ্তর। তিনি পুলিশকে যে কোন প্রকারে নকশালবাড়ির কৃষকদের বেনামী জমি উদ্ধারের আন্দোলন দমনের নির্দেশ দিলেন। এদিকে কলকাতায় নকশালবাড়ির কৃষকদের এই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নাড়া দিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার শাসনে দেখা দিল তীব্র সংকট। অজয় মুখার্জি সিপিআই(এম)-এর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন। সিপিআই(এম)-কে দিয়ে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন প্রত্যাহারের কৌশল নিলেন বাংলা কংগ্রেস ও অজয় মুখার্জি। সিপিআই(এম)-এর তখন উভয় সঙ্কট। একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার রক্ষার তাগিদ এবং অপরদিকে পার্টির ঐক্য রক্ষার সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সিপিআই(এম)-এর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষার পথ বেছে দিলেন— সিপিআই(এম) নেতৃত্ব শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ির সংশ্লিষ্ট কমরেডদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে। বহিষ্কৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—চারু মজুমদার, কানু সান্ন্যাল, সৌরেন বোস, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ।

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের ফলে সিপিআই(এম)-এ ভাঙনের সূত্রপাত হলো। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংযোজিত হলো আরেকটি নতুন অধ্যায়। উপস্থিত হলো আরেকটি পার্টির জন্মলগ্নের প্রথম ধাপ।

২২ থেকে ২৫শে-র নকশালবাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিল তীব্র প্রতিক্রিয়া। সিপিআই(এম) পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশ নকশালবাড়ির ঘটনা কেন্দ্রিক সিপিআই(এম)-এর সিদ্ধান্তের পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার আন্দোলন শুরু করলেন। অপরপক্ষ শৈবাল মিত্র, অসীম চ্যাটার্জি, সন্তোষ রানা, দিলীপ পাইন প্রমুখদের পরিচালিত গ্রুপ নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ালো।

নকশালবাড়ির ঘটনা এবং কলকাতার ছাত্রদের এক বিরাট অংশের মানসিক প্রস্তুতি চমকপ্রদ। এই অংশের ছাত্ররা যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত-ই ছিলেন। ১৯৬৭-র মে-এর শেষ দিকে নকশালবাড়িতে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটার সাথে সাথে এই কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে এবং পুলিশী দমনপীড়ন এবং গুলিচালনা ও কৃষক নারী পুরুষ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্ররা এগিয়ে এলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ সহ তার চারপাশে রাত জেগে এই সংগ্রামের সমর্থনে ব্যাপক পোস্টারিং করা হলো। পরে কলকাতার বৃহৎ বৃহৎ কলেজগুলিতে ব্যাপকভাবে পোস্টারিং ছড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল 'প্রেসিডেন্সি কনসলিডেশন'-এর নেতা ও কর্মীরা। তারপরে এগিয়ে এলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পি জি এস এফ'।

১৯৬৭-র ১৪ই জুন কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম-এর সমর্থনে অনুষ্ঠিত হয় এক কনভেনশন। সিপিআই(এম)-এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন নামে যে সব গ্রুপ বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছিল সেসব গোষ্ঠী-ই ছিল রামমোহন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের উদ্যোক্তা। এই কনভেনশনের অংশগ্রহণ-

কারীদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই কনভেনশন থেকেই গড়া হয়েছিল 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি'। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান প্রধান কলেজগুলির এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অগ্রণী অংশ নকশালবাড়ির ঘটনার প্রভাবিত। যে ছাত্ররা নকশালবাড়ির ঘটনায় প্রভাবিত হলেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠনের সমর্থক এবং নেতা ও কর্মী। এই ছাত্ররা জীবন-যৌবনচিত তারুণ্যের রোমান্টিকতায় স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজ পরিবর্তনকারী বিপ্লবের। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্লেষিত 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'[২১]-এর মত মুহূর্তের বিদ্যুতালোকে চমকে উঠলো নকশালবাড়ির ঘটনায় কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের ছাত্ররা। এই অংশের ছাত্রদের মানসিক দৃষ্টির লক্ষ্যে ঝলসে উঠলো—'ছাত্র শক্তি বা Student Power' 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব', 'কৃষি বিপ্লব', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব', 'শ্রেণি শত্রু খতম', 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা' এবং 'দেশের কাজে ঘর ছেড়ে ত্যাগ স্বীকার'-এর স্বপ্ন।

সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন-এর অফিসিয়াল নেতৃত্ব রাজনৈতিক ভাবে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। সব জেলা সংগঠনগুলিকে নির্দেশ পাঠান হলো এই মর্মে প্রচার আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য। ১৪ই জুনের রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত কনভেনশন ও 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি' গঠনের মধ্যে দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের সমর্থক ছাত্র নেতৃত্ব ও কর্মীদের আর ছাত্র ফেডারেশনে রাখা যাবে না। তাই, ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক নেতৃত্ব নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের সমর্থক ছাত্রদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য সাংগঠনিক-রাজনৈতিক যাবতীয় কৌশল নিলেন। এবার শুধু নকশালবাড়ির সমর্থকদের সংকীর্ণতাবাদী বলে চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত থাকলো না। নতুন মাত্রা যোগ হলো। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের সমর্থক ছাত্রদের এবার চিহ্নিত করা হতে থাকলো 'হটকারী' বলে। ওদের রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধেও প্রচার চললো। এই পরিস্থিতিগত পটভূমিতে ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্পাদকমণ্ডলী এবং কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত নিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠানের। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল—নকশালবাড়ি কেন্দ্রিক রাজনীতির সমর্থকদের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

১৯৬৭-তে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ সম্মেলনের সুপারিশমত এই সম্মেলনে সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নতুন সংবিধান গ্রহণ করা হয়। নতুন সংবিধানে ছাত্র ফেডারেশনের পতাকায় লিখিত শ্লোগান—'স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি'-র পরিবর্তন সাধন করে লেখা হল—'সমাজতন্ত্র, শান্তি, প্রগতি'। [এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'সংকীর্ণতাবাদী'রা তখন র‍্যাডিক্যাল বা বেলঘরিয়া কাউন্সিল অধিবেশনে ছাত্র ফেডারেশনের পতাকায় 'স্বাধীনতা'-র পরিবর্তে 'জনগণতন্ত্র' লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ সম্মেলনে 'সমাজতন্ত্র' শ্লোগান হিসাবে গৃহীত হওয়ায় র‍্যাডিক্যালপন্থীরা সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছিলেন—সমাজ বিপ্লবের স্তরে 'জনগণতন্ত্র' আগে না 'সমাজতন্ত্র' আগে?] শ্রীরামপুর সম্মেলনে প্রেসিডেন্সি কনসলিডেশন পি জি এস এফ, ছাত্র-ছাত্রী গোষ্ঠী সহ নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম-এর সমর্থক ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ না করার ফলে ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্যনেতৃত্ব

পুনর্গঠন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এই অষ্টাদশ সম্মেলন থেকেই পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে দীনেশ মজুমদার, সুবিনয় ঘোষ, হরিনারায়ণ অধিকারী ছাত্র আন্দোলন থেকে বিদায় নিলেন। নতুন নেতৃত্বের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন বিমান বসু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন সুভাষ চক্রবর্তী।

এরপর ১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ খুব দ্রুত লয়ে এগুতে থাকে। যুক্তফ্রন্টে বাংলা কংগ্রেসের সাথে শরিকী দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠে যায়; মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি সরকার ভেঙে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিতে ষড়যন্ত্রের দায়ে বামপন্থী দলের দ্বারা অভিযুক্ত।

এরই মধ্যে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র গোষ্ঠীগুলি পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১২টি জেলার তিন শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১৯৬৭-র ৩১শে অক্টোবর এক কনভেনশনে মিলিত হয়েছিল। ঢাকুরিয়ার রামচন্দ্র হাইস্কুলে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধের জন্য এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল এবং কোন রাজ্য সংগঠন গড়া সম্ভব হয়নি।[২২]

১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস ব্যাপী এক অস্থির পরিস্থিতি। যুক্তফ্রন্ট সরকার আজ ভাঙে-কাল ভাঙে এই পরিস্থিতি চলছে। সংবাদপত্রে একটার পর একটা চক্রান্তের খবর। সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বামপন্থী ছাত্রদের এক মিছিল সমাবেশ থেকে ৪ঠা অক্টোবর দাবি তোলা হল—'যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া চলবে না'। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের কিছু সংখ্যক বিধানসভার সদস্য [বেশিরভাগ বাংলা কংগ্রেসের এম এল এ] যুক্তফ্রন্ট থেকে বেড়িয়ে এসে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন অনিবার্য করে তোলে। ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে দেন এবং কংগ্রেসের সমর্থনে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বে 'পি ডি এফ মন্ত্রীসভা' নামে এক সংখ্যালঘু সরকার গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র ফেডারেশন সহ চারটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পক্ষে ২২শে নভেম্বর সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট ডাকা-ই ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাতিল হবার ঘটনার প্রতিবাদে ঐ ২২শে নভেম্বর বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে সারা রাজ্যে হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলো। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এই হরতাল ধর্মঘট সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ২৪শে নভেম্বর আবার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের প্রতিবাদে সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট পালনের আহ্বান দেয়। ঐ দিন পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র মিছিল ও সমাবেশের উপরে লাঠি গুলি চালালে ৪জন নিহত হন। তারপর ১৮ই ডিসেম্বর ঘোষ মন্ত্রীসভা বাতিলের দাবিতে আবার পালিত হলো সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট। যুক্তফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলি পিডিএফ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আইন অমান্যের কর্মসূচিতে নিয়েছিল। এই কর্মসূচি ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে। ২০শে ডিসেম্বর কলকাতা সহ রাজ্যের সমস্ত জেলায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র আইন অমান্য করে গ্রেপ্তারবরণ করে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এইভাবে আন্দোলনের চাপ তীব্র হওয়াতে এই মন্ত্রীসভা বাতিল করতে রাজ্যপাল বাধ্য হলেন। পশ্চিমবঙ্গে জারি হলো রাষ্ট্রপতির শাসন।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা থেকে শুরু করে এই সরকারকে বাতিলের প্রতিবাদ আন্দোলন এবং ৬৭'র শেষ দু'মাসে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা বাতিলের দাবির আন্দোলনে

ছাত্রসমাজের যে বিরাট অংশ অংশগ্রহণ করেছিল, তারও নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকায় ছিল সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। কিন্তু এই ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এটাও প্রতিপন্ন হলো—সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন দ্বিধাবিভক্ত। এক পক্ষ হাঁটছে—যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা কিংবা তাকে আবার শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের পথে। আর একপক্ষ হাঁটছে—নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামের প্রদর্শিত পথে।

সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্ধ্র, কেরালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যেটুকু ছিল, সেটুকু প্রভাবেও পশ্চিমবঙ্গের ছায়া পড়লো। ১৯৬৭-তে বাস্তব সত্য যা দাঁড়ালো, তাহলো—কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন তিন ভাগে বিভক্ত। যথা— সি পি আই নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন, সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন এবং নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের অনুগামী বা র‍্যাডিক্যাল পন্থী ছাত্র ফেডারেশন।

তথ্যসূত্র :

১। ১৯৬৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন বিভক্ত হবার পর দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন অংশকে 'চীনাপন্থী', 'বামপন্থী', 'কট্টরপন্থী' ছাত্র ফেডারেশন বলে অভিহিত করা হত। বিশেষত বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ধরনের মজুমদার পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনকে 'পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' নামে পরিচিত।

২। ১৯৬৪-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৭ম পার্টি কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলো, সে পার্টি ১৯৬৬ পর্যন্ত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' নামেই পরিচয় দিত।

৩। আত্মগোপন অবস্থায় হরিনারায়ণ অধিকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে প্রায়ই অনিল বিশ্বাসের গেস্ট হিসাবে থাকতেন। সে কারণে ছাত্রফ্রন্টের যোগাযোগের অন্যতম একটি গোপন কেন্দ্র হিসাবে অনিল বিশ্বাসের রুমটি পরিণত হয়েছিল।

৪। শৈবাল মিত্র 'ষাটের ছাত্র আন্দোলন' ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। 'সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর . ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার'-এর ১০৯ পৃষ্ঠার প্রাক্তন ছাত্রনেতা এবং বামফ্রন্ট সরকারের পরিবহনমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীর বিবরণ থেকে সংগৃহীত।

৬। শৈবাল মিত্র : 'ষাটের ছাত্র আন্দোলন' পৃষ্ঠা ২৫।

৭। ঐ, ঐ, ঐ।

৮। ঐ, ঐ, ঐ।

৯। সূত্র—ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ) 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন।' ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ১৫।

১০। অনুষ্টুপ : একবিংশতি বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা : ১৯৮৭—'ছাত্র আন্দোলন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ'— দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

১২। 'সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার', পৃষ্ঠা ১১০।

১৩। সূত্র · 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংগ্রহ' : পৃষ্ঠা ১৮।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮।

১৫। শৈবাল মিত্র : 'ষাটের ছাত্র আন্দোলন', পৃষ্ঠা ৩৫।

১৬। সূত্র : 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংকলন', পৃষ্ঠা ১৫।

১৭। ঐ : পৃষ্ঠা ১৭।

১৮। গণশক্তি : ২২শে ফেব্রুয়ারি বুধবার, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৪-৫ : 'সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য এবং কিছু ভাবনা'— বিমান বসু।

১৯। সূত্র : হরিনারায়ণ অধিকারী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী' পৃষ্ঠা ১৮৩।

২০। সূত্র : 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংকলন' পৃষ্ঠা ১৯-২০।

২১। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম মুখপত্র 'পিকিং রিভিউ'-র ১৯৬৮-র ১২ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতীয় বিপ্লবের ঐতিহাসিক মোড়' নিবন্ধে নকশালবাড়ি প্রসঙ্গে 'বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ' ব্যবহার করা হয়।

২২। এই কনভেনশনে আগত প্রতিনিধিদের জেলাগত হিসাবে কলকাতা - ১৫০, ২৪ পরগণা - ৭০, নদীয়া - ২৫, হাওড়া - ২৫, হুগলী - ৩০, জলপাইগুড়ি - ১৮, কোচবিহার - ৬, দার্জিলিং - ৬, মেদিনীপুর - ৮, বর্ধমান - ৫, বীরভূম - ৩। [সূত্র—দেশব্রতী, ৯ই নভেম্বর, ১৯৬৭]

ষাট দশকের নকশালবাড়ি প্রভাবিত বিপ্লবমুখি চিন্তাভাবনা

প্রয়োগিক কৌশল ও চিন্তাভাবনা

১৯৬৭-র মে মাসে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যে ধারার উত্থান হলো, সে ধারার প্রতিফলন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে হতে থাকে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এই প্রতিফলনের প্রক্রিয়া ছিল সব চাইতে বেশি এবং দ্রুতগামী। ছাত্র-যুব সমাজে এই প্রক্রিয়ার প্রভাব ছিল ব্যাপক।

ষাটের দশকের শেষ কয়েক বৎসরে ভারতের ছাত্র আন্দোলনে নকশালবাড়ি প্রভাবিত রাজনৈতিক ধারার 'বিপ্লবমুখি' চিন্তাভাবনা এবং তার প্রয়োগিক কৌশল এবং দ্বন্দ্ব বিরোধের পরিণতিতে যা ঘটেছিল, তার উল্লেখযোগ্য রাজ্যভিত্তিক বিবরণ ছিল নিম্নরূপ :

পশ্চিমবঙ্গ

নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামের ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে সিপিআই(এম) থেকে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়িপন্থীদের ধাপে ধাপে বহিষ্কারের কাজ শুরু হয়ে যায়। রাজ্যকমিটি, জেলা কমিটি এবং আঞ্চলিক কমিটি স্তরের বহু পার্টি সভ্য ১৯৬৭-র মধ্যেই বহিষ্কৃত হন। বহিষ্কৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, চারু মজুমদার, সৌরেন বসু, কানু সান্যাল প্রমুখ। পার্টির এই বহিষ্কৃত নেতাদের উদ্যোগেই ১৯৬৭-র ১৩ই নভেম্বর কলকাতায় গঠিত হয়েছিল "বিপ্লবীদের সারা ভারত সমন্বয় কমিটি" [All India Co-ordination Committee of Revolutions, সংক্ষেপে -AICCR]। বহিষ্কৃত এই পার্টিনেতারা পাল্টা সংগঠন গড়া ছাড়াও বাংলাভাষায় 'দেশব্রতী' নামে একটি সাপ্তাহিক এবং 'লিবারেশন' নামে ইংরাজি ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

'AICCR' এবং উপরে উল্লিখিত পত্রপত্রিকার দ্বারা নকশালবাড়ির সমর্থক অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, যুবক এবং র‍্যাডিক্যালপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীগুলি তখন বিশেষভাবে প্রভাবিত। র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের প্রকাশিত 'ছাত্র ফৌজ' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনৈতিক ঝোঁকের সাথে

'দেশব্রতী', 'লিবারেশন' পত্রিকার প্রকাশিত বক্তব্যের সাযুজ্য ছিল বহুলাংশে। তাছাড়া নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের সংগঠক এবং অদূর ভবিষ্যতে আরেকটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দ্রষ্টা ও স্রষ্টাদের সাথে ছাত্র ফেডারেশনের র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীগুলির সংযোগ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, বিভিন্নভাবে স্থাপিত হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের জুন মাসে গঠিত হয়েছিল "All India Co-ordination Committee of Communist Revolutionary"। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয়েছিল– 'Andhra Pradesh Revolutionary Communist Committee'—APRCC। ১৯৬৭-র "নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি" এবং 'AICCR', ১৯৬৮-র জুনের 'AICCCR' এবং ১৯৬৮-র সেপ্টেম্বরের 'APRCC'-ই ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৯-এর এপ্রিলে CPI(ML) নামে গঠিত আরেকটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া বা প্রসেস। এই সমগ্র প্রসেস বা প্রক্রিয়ার সাথে 'বিপ্লবী' ছাত্র-ছাত্রীরা বা তাঁদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে জড়িত ছিল। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল—

প্রধান দুটি গোষ্ঠী :

নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের ঘটনা ঘটার পর পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'বিপ্লবী ছাত্রদের' কার্যকলাপ দুটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ছিল। এই গোষ্ঠী দুটি 'ছাত্র ফৌজ' এবং 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন'। উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য কলকাতার প্রায় সব কলেজ এবং কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই দু'গোষ্ঠী-র সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামকে তাঁরা ভারতীয় জনসমাজের মুক্তি সংগ্রাম এবং ভারতের সমাজ বিপ্লবের দিশা বলে-ই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করায় 'র‍্যাডিক্যাল' বা 'বিপ্লবী' ছাত্ররা অকল্পনীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। নকশালবাড়ি সংক্রান্ত যে কোন কর্মসূচিতে তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল আন্তরিক। এই অংশের ছাত্রদের চেতনামত নকশালবাড়ির পথে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়া ছিল দেশপ্রেমিক কর্তব্য। জনগণের শত্রু শ্রেণিগুলির ঘাঁটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, গ্রামীণ সামন্ত শোষণের কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করা এবং ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সাম্রাজ্যবাদের শিখরগুলিকে উৎখাত করার স্বপ্ন-ই ছিল এই ছাত্র-ছাত্রীদের 'দেশপ্রেমিক কর্তব্যের' উৎস। যা সে সময়ের রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং সমালোচকদের অনেকের মতে—নৈরাজ্যবাদী রোমান্টিকতা, পাতিবুর্জোয়া ভাবালুতা বলে আলোচিত। কিন্তু সমালোচনা কঠিন, নির্মম, অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক যা-ই হোক না কেন, বাস্তবে যা ঘটেছে তাকে অস্বীকার করা কঠিন। 'ছাত্রফৌজ' এবং 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন'-এর অনুগামী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমাজের সব অংশের পরিবারের সন্তানেরা-ই ছিল। গরীব, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, ধনী এবং এলিট পরিবারের সন্তানেরা তাঁদের ছাত্রজীবনের ক্যারিয়ার গঠনের স্বপ্নকে ভুলে গিয়ে এক বিপ্লবী উন্মাদনার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা যেমন বাধাবন্ধন হারা হয়ে ওঠে, তেমনি পশ্চিমবাংলার ছাত্র-যুব মানসে নকশালবাড়ির ঘটনা এক 'বিপ্লবী উন্মাদনা' সৃষ্টি করেছিল।

১৯৬৭-র ৩১শে অক্টোবর ঢাকুরিয়ার অনুষ্ঠিত 'বিপ্লবী' ছাত্রদের কনভেনশনে যে ১২টি জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিল, তারাই মূলত নিজেদের পছন্দ অনুসারে

'ছাত্রফৌজ' এবং 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশান'-এ যুক্ত ছিল। এই গোষ্ঠী দুটি কলকাতাকেন্দ্রিক হলেও কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলা এবং মফস্বল জেলাগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা নকশালবাড়ির ঘটনার পর উৎসাহ নিয়ে এই দুই গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করে। এই দু'গোষ্ঠীভুক্ত সমর্থক ও কর্মীরা নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি আহুত প্রোগ্রামগুলিতে বেশি করে অংশগ্রহণ করতো। এই ধরনের কর্মধারা অব্যাহত ছিল AICCR এবং AICCCR গঠন পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত। ১৯৬৮-র ২২শে মার্চ কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' কলকাতা জেলা গণতান্ত্রিক কনভেনশন আহ্বান করে। এই কনভেনশনে 'ছাত্রফৌজ' এবং 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন'-এর প্রতিনিধিরা যোগদান করে। কিন্তু, 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন'-এর প্রতিনিধিরা কলকাতা জেলা গণতান্ত্রিক কনভেনশন আহ্বানের পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে। ফলে কনভেনশনে প্রচণ্ড গোলমাল হয়। 'দেশব্রতী' পত্রিকায় এক চিঠি প্রকাশ করে প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের এই কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা হয়। এর মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন—"সংগঠন ও পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে চেতনার ভূমিকা কি? সেই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এরা সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে?"

এই প্রশ্ন তুলেই বেনামী পত্রলেখক আহ্বান জানালেন—"বন্ধুগণ, ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া ট্রট্স্কিবাদ এবং জঙ্গী অর্থনীতিবাদের প্রবর্তকেরা অনেকক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কৃষি বিপ্লবের মূল রাজনীতির ভিত্তিতে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত না করে দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে তার ভিত্তিতে রাজনীতি প্রচার ও সংগঠন গড়ার বিভ্রান্তিকর এবং নয়া সংশোধনবাদী চিন্তাভাবনা এরা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে এখনই সংগ্রাম শুরু করুন।" [সূত্র—দেশব্রতী, ২৮শে মার্চ, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১২][১]

'দেশব্রতী'-তে প্রকাশিত এই চিঠি-র বক্তব্য মূলত 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন' থেকে, যাঁরা ঐ মুহূর্তে আর একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের বিরুদ্ধমত পোষণ করতো। 'ছাত্রফৌজ' গোষ্ঠী ছিল পার্টি গঠনের পক্ষাবলম্বীদের সমর্থক। এই গোষ্ঠীর অনুগামীরা নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি গঠন থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন এবং পরে পার্টি গঠনের ধারাবাহিক পর্যায়গুলিতে সব সময়ই আনুগত্য প্রকাশ করে এসেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং সাম্রাজ্যবাদ হলো তখনকার বিশ্বের প্রধান দ্বন্দ্ব—এইমত পোষণ করতো প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের কমিউনিস্ট ছাত্রনেতৃত্ব। এই নেতৃত্বের সংযোগ ছিল প্রধানত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের PGSF ইউনিট এবং 'বিপ্লবী' বলে পরিচিত ছাত্রনেতৃত্বের সাথে।

'ছাত্রফৌজ' এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ কনসোলিডেশন গোষ্ঠী দু'টির মধ্যে রাজনৈতিক মতামতের দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও উভয় গোষ্ঠী-ই নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের ঘটনায় ছিল অনুপ্রাণিত। উভয়গোষ্ঠী-ই নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের কথা ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে। উভয় গোষ্ঠীর অনুগামী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নকশালবাড়ির ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মজুত উদ্ধার আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই আন্দোলন তীব্র হলে কর্তৃপক্ষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দখল নেয়। এক পর্যালোচনার তথ্য অনুসারে—"বিপ্লবীদের নেতৃত্বে হুগলী

জেলা ছাত্র ফেডারেশন, হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশন, মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র ফেডারেশন সহ কলকাতা জেলায় ১৭টি কলেজের ছাত্র সংসদ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখে।"[২]

নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের শক্তিবৃদ্ধি :

১৯৬৮ শুরুর প্রথমার্দ্ধেই নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামপন্থী ছাত্রদের শক্তিবৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই ছাত্রদের কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন অথবা সংগঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও স্বতস্ফূর্তভাবে এই শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। পশ্চিমবাংলার প্রায় সব কলেজেই নকশালবাড়ির এক ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছিল। "১৯৬৮-র প্রথম দিক নাগাদ বঙ্গবাসী কলেজের নির্বাচনে নতুন রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ ছাত্র ফেডারেশন ৬৮টি আসনের মধ্যে ৬০টি আসন দখল করে ছাত্রসংসদ অধিকার করে। বিপক্ষে ছিল সুব্রত মুখার্জির নেতৃত্বে ছাত্র পরিষদ। একই সময়ে স্কটিশ চার্চ ও সিটি কমার্স কলেজে ছাত্র সংসদ দখল কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় হৈ চৈ ফেলে দেয়।"[৩] শুধু কলকাতার কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের শক্তিবৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে, তা-ই নয়; শক্তিবৃদ্ধি ছিল রাজ্যের সর্বত্র। ১৯৬৮-র ৯ই মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়—এই সময়ে অনুষ্ঠিত সরকারি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে রাজ্যের শতকরা ৬৫টি কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে নকশালবাড়ি সমর্থক প্রার্থীরা জয়ী হয়।[৪]

নকশালবাড়ি সমর্থক ছাত্ররা কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে উত্থাপন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে চীন-সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনামূলক ভূমিকা, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম, চীনের বিপ্লবী পথ, দেশের কৃষি বিপ্লব, নকশালবাড়ির সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা—ইত্যাদি ছিল ছাত্রসংসদ নির্বাচনে উত্থাপিতঙ্গ রাজনৈতিক বিষয়বস্তু। এইসব রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই নকশালবাড়িপন্থী 'বিপ্লবী' ছাত্রদের শক্তিবৃদ্ধির ভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

উল্লেখযোগ্য ছাত্র আন্দোলন :

নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম-এর সমর্থক ছাত্রগোষ্ঠীগুলি এই সময় কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কতকগুলি স্থানীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। প্রায় সব গোষ্ঠী-ই নিজেদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্থানীয় আন্দোলনগুলিতে সামিল হয়েছে। স্থানীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আশুতোষ, যোগমায়া ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজে বেতনবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিহারীলাল কলেজে কলেজগত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন; স্কটিশ চার্চ, ডনবসকো ও হাওড়া গার্লস কলেজে ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফেল করানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন।

এইসব স্থানীয় আন্দোলন ছাড়াও এই ছাত্রগোষ্ঠীগুলির সমর্থকরা সংহতিমূলক আন্দোলনেও সামিল হয়েছিল। ৮০ দিন ব্যাপী সংবাদপত্র কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রদের এগিয়ে আসার ঘটনা সংহতিমূলক আন্দোলনের একটি স্মরণীয় উদাহরণ।

তাছাড়া ১৯৬৮-তে কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে মিছিলে, সমাবেশে তখন শ্লোগান উঠেছিল—'তোমার নাম আমার নাম রক্তে রাঙ্গা ভিয়েতনাম।' এই ধ্বনিতে সি পি আই (এম)-এর ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের সাথে নকশালপন্থী ছাত্র গোষ্ঠীগুলির সমর্থকদের কোন তফাৎ ছিল না, সকলেই ছিল মুখর। এই সময়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবল বিক্ষোভে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রভাবিত ছাত্রসমাজ সামিল হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৬৮-র নভেম্বর মাসে ম্যাকনামারা বিরোধী বিক্ষোভ ছিল ষাটের দশকে কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। "বিশালতম বিক্ষোভগুলির একটি ঘটলো ১৯৬৮-তে ভিয়েতনামের ঘাতক প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে, কলকাতায় সে তখন এসেছিল বিশ্বব্যাংক প্রধানরূপে। সারাদিনব্যাপী এই বিক্ষোভে অংশ নিল প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র। ম্যাকনামারা রাজপথ দিয়ে কলকাতা আসতে পারল না, তাকে নিয়ে আসতে হল হেলিকপটারে। সারাদিন ধরে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ চলল, মহানগরীর এক প্রান্তে অবস্থিত বিমানবন্দর থেকে শহরের মধ্যস্থল পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা পরিণত হল রণক্ষেত্রে। ভিয়েতনামের জল্লাদের সাথে নৈশভোজে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিন্দিত হলেন; শত শত ছাত্র ধিক্কার জানাল তাকে ঘেরাও করে।"[৫]

ছাত্রফৌজ গোষ্ঠীর নীতিগত ঘোষণা :

১৯৬৮ সালের ১৫ই জুলাই ছাত্রফৌজ গোষ্ঠী তাঁদের পত্রিকা 'ছাত্রফৌজ'-এর প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় একটি নীতি সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে—"বিপ্লবী লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলন গড়ার কাজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে ছাত্রফৌজ তত্ত্বগত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকা নেবে। ছাত্রফৌজ মনে করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের প্রধান শত্রু হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সর্বস্তরের সংশোধনবাদ। পাশাপাশি এই সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও মহান চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ-এর চিন্তাধারা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ভারতের জনগণের শত্রু হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ও সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের সহযোগিতায় পুরানো ও নতুন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ এবং এদের এদেশীয় সেবাদাস বড় বড় নামজাদা জোতদার শ্রেণি, আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্ধি পুঁজিপতি শ্রেণি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বা সংস্কার সাধনের মাধ্যমে নয়—একমাত্র সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারতের জনগণের মুক্তি অর্জন সম্ভব। বর্তমান স্তরে ভারতের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবী জনগণের বিপ্লব—জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব : এর মূল কর্তব্য হল কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করা। নকশালবাড়ি যার সূচনা করেছে। কৃষি বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ছাত্রসমাজ ব্যাপক প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির সাথে একাত্ম হবে, বিপ্লবী জনগণের গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনে কাজ করবে এবং সর্বোপরি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে সহায়ক শক্তিরূপে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।

'ছাত্রফৌজে আধুনিক শোধনবাদসহ সর্বস্তরের শোধনবাদ, অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ,

ব্যক্তিস্বার্থ এবং পেটি-বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।'

'উপরোক্ত কেন্দ্রীয় নীতির ভিত্তিতে আরও বিকশিত ও শক্তিশালী করে তুলে ছাত্রফৌজ যাতে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন গঠনে যৌথ সংগঠকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে—তারই জন্য বিপ্লবী ছাত্র কর্মীদের সহযোগিতা ছাত্রফৌজ দাবি করছে। ছাত্রফৌজ যদি উপরোক্ত কেন্দ্রীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হয়—তবে তার সংশোধন করার অধিকার প্রতিটি ছাত্র কর্মীরই থাকবে।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ
ছাত্রফৌজ সম্পাদক মণ্ডলী''[৬]

পিকিং রিভিউ-তে প্রবন্ধ :

ছাত্রফৌজ গোষ্ঠীর এই নীতিগত ঘোষণার অনেক আগেই পিকিং রিভিউ-এর ২২নং সংখ্যায় "বিপ্লবী যুবকরা অবশ্যই শ্রমিক কৃষকের সাথে একাত্ম হবেন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি বাংলাভাষায় পশ্চিমবঙ্গেও প্রচারিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি ছাত্রফৌজ পত্রিকায় প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় (৯ই নভেম্বর ১৯৬৮) পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মৌল বক্তব্যের সাথে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনার সাযুয্য ছিল। প্রবন্ধটি নিম্নে প্রকাশ করা হলো :

"বিপ্লবী যুবকরা অবশ্যই শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হবেন।"

"শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে না পারলে বুদ্ধিজীবীরা কিছু করে উঠতে পারবেন না। তারা নিজেদের শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম করতে রাজি অথবা রাজি নয় এবং সত্যি সত্যি একাত্ম হয়েছেন কিনা—সবশেষের বিশ্লেষণে এটাই হবে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং অবিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিজীবী নির্ণয়ের সীমারেখা। যেহেতু বুদ্ধিজীবীদের কাজই হলো শ্রমিক ও কৃষক জনতার সেবা করা, তাই বুদ্ধিজীবীদের প্রথম কাজ হলো শ্রমিক ও কৃষকের জীবন, কাজ ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তাদের সম্যকরূপে জানা। আমরা বুদ্ধিজীবীদের কলকারখানা ও গ্রামে যেতে উৎসাহ দিই, উৎসাহ দিই জনতার সঙ্গে মিশতে।

কারা বিপ্লব সম্ভব করেন? কি বিপ্লবের প্রধান শক্তি?—চীনের সাধারণ মানুষ। বিপ্লবের চালক শক্তিগুলো হলো জনসাধারণ, কৃষকদল এবং অন্যান্য শ্রেণিগুলির সমস্ত সভ্যেরা যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তপ্রথার বিরোধিতায় ইচ্ছুক। এই বিপ্লবী শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু এইসব শক্তির মধ্যে কোন শক্তি মূল শক্তি বা বিপ্লবের মানদণ্ড? দেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই অংশ যাঁরা, অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকেরা।

আমাদের যুবক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের আমাদের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই অংশের অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মিশে তাদের সংগঠিত করতেই হবে। শ্রমিক ও কৃষকদের এই প্রধান শক্তি ছাড়া আমরা সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে জিততে পারি না। কেবলমাত্র যুবক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র দিয়ে তৈরি সৈন্যদের উপর নির্ভর করে আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে জিততে পারি না। সুতরাং সমস্ত দেশব্যাপী যুবক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের, শ্রমিক ও কৃষকের বৃহত্তর জনতার সঙ্গে এক হয়ে তাদের একজন হতে হবে এবং তবেই শুধুমাত্র একটা প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হবে। যে শক্তি শত শত লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে তৈরি।

কেবলমাত্র এই ব্যাপক ও বিরাট শক্তি দিয়েই শত্রুর দুর্গগুলি দখল করা যায় ও তার শেষ ঘাঁটি ধ্বংস করা যায়।

যদি বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম করে দেন এবং তাদের বন্ধু হন, কেবলমাত্র তবেই যে মার্কসীয় তত্ত্ব তারা বই থেকে শিখেছেন তা সত্যি সত্যি তাদের নিজের হবে। বুদ্ধিজীবীরা যদি তাদের চিন্তা বিকৃতমুক্ত না করেন তবে তারা অপরকে শিক্ষিত করার কাজ নিতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই যখন শিক্ষা দিচ্ছি তখন আমাদেরও শিখতে হবে এবং যখন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছি তখন ছাত্র হতে হবে। ভাল শিক্ষক হতে হলে ভাল ছাত্র হতে হয়। অনেক শিখবার আছে যা শুধুমাত্র বই পড়ে শেখা যায় না। তাই যারা উৎপাদনে রত, যারা শ্রম করছেন এবং গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষকদের কাছ থেকে শিখতে হবে।

আমরা আশা করি আমাদের বুদ্ধিজীবীরা প্রগতির কাজ চালিয়ে যাবেন এবং সেই কাজ ও পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে তারা ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টি লাভ করবেন। মার্কসীয় ও লেনিনীয় তত্ত্ব আরও ভালভাবে আয়ত্ত করে শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে একীভূত হবেন। আমরা আশা করি তারা মাঝপথে থামবেন না কিংবা পেছনে পড়ে যাবেন না—সেটা আরও খারাপ। কারণ পেছনে পেছনে চললে তাদের জন্য কোনো ভবিষ্যতই তো থাকবে না।''

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার :

১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভাকে খারিজ করে দেওয়া হয়। প্রবর্তন করা হয় রাষ্ট্রপতিব শাসন। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে নকশালবাড়িপন্থী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের উপরে পুলিশী জুলুম চালান হয়। অধিকাংশ নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং বাকিরা আত্মগোপন করেন। এইরূপ অবস্থা চলতে চলতেই ১৯৬৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আসে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়। গঠিত হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের কিছুদিন পরেই সিপিআই(এম)-এর ছাত্র-যুব সংগঠনের কর্মীদের সাথে 'বিপ্লবী' ছাত্রদের রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে। ''পি.জি.এস.এফ.-এর নেতৃত্বে ছাত্ররা যখন বেআইনীভাবে কার্যরত ইউনিয়ন বাতিল করার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও করে, তখন সিপিআই(এম)-এর কর্মীরা উপাচার্যকে মুক্ত করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মিছিল নিয়ে চড়াও হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পি.জি.এস.এফ.-এর ছাত্রকর্মীদের সাথে সংঘর্ষ বেধে যায় এবং সংঘর্ষে ডিওয়াইএফ-এর কর্মী কৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু ঘটে। গোটা কলেজ স্ট্রীট চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র বিপ্লবী ছাত্রদের ওপর সিপিআই(এম)-এর ক্যাডারদের যৌথ আক্রমণ নেমে আসে।''[৭] এটাই ছিল নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের সাথে সিপিআই(এম)-এর সমর্থক যুব-ছাত্রকর্মীদের প্রথম রাজনৈতিক খুনের ঘটনা। পরবর্তী সময়ের প্রতিহিংসাপরায়ণ পরিকল্পিত খুন ও ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি শুরুর ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই নকশালবাড়ির রাজনীতির ধারাকে অনুসরণ করে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির গোপন

বৈঠকে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা CPI(ML) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৯-এর ১লা মে শহিদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কানু সান্ন্যাল এই নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। সিপিআই(এম-এল) গঠনের ঘোষণার দিনের এই সমাবেশে "বিপ্লবী ছাত্র-যুব" কর্মীদের উপস্থিতি ছিল বেশি এবং উৎসাহজনক।

বিপ্লবী ছাত্র-যুব ফেডারেশন :

নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের অনুগামী 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুবকদের প্রথম দিকে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। ক্রমান্বয়েই একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই ধরনের কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও, এর বাস্তব রূপ পরিগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৬৯-এর প্রথম দিকে। ১৯৬৯-এর ১৩ এবং ১৪ই এপ্রিল কলিকাতায় ৮০০ জন প্রতিনিধি এবং ৩০০ জন দর্শকের উপস্থিতিতে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপ্লবী যুব ছাত্র কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশন থেকে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপ্লবী যুব-ছাত্র সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি' গঠন করা হয়েছিল এবং 'বিপ্লবী যুব-ছাত্র আন্দোলনের খসড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি' শীর্ষক একটি দলিলও গৃহীত হয়েছিল। উক্ত কনভেনশনের খবর এবং গৃহীত কর্মসূচির সারাংশ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলি এবং পিকিং রেডিও মারফৎ প্রচার করা হয়। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিপ্লবী যুব-ছাত্র প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে 'বিপ্লবী যুব-ছাত্র ফেডারেশন' [R.Y.S.F.] গঠন করা হয়। ইতিমধ্যে দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। পুলিশী গুলি চালনার প্রতিবাদে 'বিপ্লবী' ছাত্রদের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল নতুন গঠিত এই আর.ওয়াই.এস.এফ.।

আর.ওয়াই.এস.এফ গঠনের জন্য গঠিত প্রস্তুতি কমিটি গঠনের সময়েই [এপ্রিলে অনুষ্ঠিত রাজ্য কনভেনশনে] রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক প্রশ্নে মতপার্থক্য ও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। জুলাই মাসে এই মতপার্থক্য ও বিতর্ক আর.ওয়াই.এস.এফ-এর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে।

১৯৬৯-র ১৩ ও ১৪ই জুলাই-এর রাজ্য কনভেনশনে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচির মৌল রাজনৈতিক বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দুই দেশীয় তাঁবেদার বৃহৎ মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি শ্রেণি, সামন্ত শ্রেণি—এই চার শত্রুর নির্মম শোষণ শাসনে সারা দেশের সামগ্রিক বিকাশ এক অচল অবস্থায় পৌঁচেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের শোষণের স্বার্থে দেশের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে বেনামীতে টিকিয়ে রেখে একদিকে দেশের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষক শ্রেণিকে নির্মমভাবে শোষণ করে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং অন্যদিকে দেশের মধ্যে শিল্পব্যবস্থার স্বাধীন ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।"

"ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের প্রথম শর্ত হোল—বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণি ও তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং বিপ্লবের উপরোক্ত সঠিক পথে জনগণ ও বিপ্লবকে পরিচালনা করা। ভারতের তথাকথিত কমিউনিস্ট নামধারী সহ অন্যকোন

রাজনৈতিক দল এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেনি। প্রচুর সাহসিক আত্মত্যাগ ঘটা সত্ত্বেও সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে ১৯৪৭ সালে বৃহৎ মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের প্রধান রাজনৈতিক মুখপাত্র কংগ্রেসের পক্ষে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভবপর হয়েছিল—যার ফলে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য পূরণ অপূর্ণ থেকে যায়।"

"কংগ্রেসী আমল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনগুলি চলে তথাকথিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে। এরা মুখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বুলি কপচালেও—বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক-যুবছাত্র সহ ব্যাপক জনগণ ও তাদের সংগ্রামকে ঐ চেতনা ও পথে শিক্ষিত এবং পরিচালিত না করে মূলত শোষণ ভিত্তিক আইন-কানুনের চৌহদ্দি, অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ ও সংসদীয় পার্লামেন্টারি ধোঁকাবাজীর চোরাবালির মধ্যেই এরা আন্দোলনগুলিকে আটকে রেখে দেয়। ফলে আন্দোলনগুলিতে প্রচুর গৌরবজনক আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয় ঘটা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান ঘটেনি, মুক্তি অর্জিত হয়নি। এই সমস্ত রং-বেরঙের সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদী দলগুলি সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের মতনই বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে নানা কৌশলে টিকিয়ে রাখতে চায়, বিপ্লবী জনগণ ও তাদের সংগ্রামকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এইভাবে তারা সকলেই শোষক-শাসক শ্রেণির পদসেবা করছে এবং নিজেদেরকে প্রতিবিপ্লবী বলে প্রতিষ্ঠা করেছে।"

"এইভাবে চেয়ারম্যান মাও'য়ের চিন্তাধারায় নির্দেশিত পথে বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রচার ও সংগ্রামের মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অগ্রগামী সচেতন অংশ যেমন একদিকে ব্যাপক যুব-ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী তথ্য ও কর্মে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলবে—তেমনি তারই সাথে সাথে অন্যদিকে নিজ নিজ সংগ্রামী কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায়, শহরাঞ্চলে, কলে-কারখানায়, শ্রমিক ও বস্তি অঞ্চলের নিরক্ষর জনতা এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষক জনতার মধ্যে যোগাযোগ করবেন, তাদের সাথে একাত্ম হবেন, জনতার ছাত্ররূপে কৃষি বিপ্লবী সংগ্রাম গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন। যুব-ছাত্রদের মধ্যে যারা তত্ত্বে ও কর্মে আরও অগ্রণী এবং বাস্তবতার নিরিখে যাদের পক্ষে সম্ভবপর, তাদের অতি অবশ্যই বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, কৃষক শ্রেণির সর্বক্ষণের কর্মীরূপে সেখানে আত্মনিয়োগ করতে হবে।"

"বিপ্লবী রাজনৈতিক শ্লোগানের ভিত্তিতে অন্যান্য বিপ্লবী জনতার সংগ্রামের সমর্থনে যুব-ছাত্রদের রাজনৈতিক সমাবেশ ও কর্মোদ্যোগ সংগঠিত করতে হবে। অন্যান্য সংগ্রামী জনতার সাথে মিলিত যুক্ত কর্মোদ্যোগ, যুক্ত সমাবেশ, সভামিছিল ও আলোচনা সংগঠিত করতে হবে। যখনই কোনো বিপ্লবী জনতার উপর, তাদের সংগ্রামের উপর অত্যাচার চালানো হবে—তখনই তার বিরুদ্ধে যুব-ছাত্রদের বিক্ষোভে ও প্রতিরোধে সামিল করতে হবে, সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশসহ বিশ্বের যেখানেই মুক্তি সংগ্রাম তারই সমর্থনে যুব-ছাত্রদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ব্যাপক জনমত গঠন করতে হবে, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

যুব-ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ক্লাস চালু করতে হবে—রাজনৈতিক প্রচার-পুস্তিকা, ইস্তাহার ব্যাপক প্রচার করতে হবে। প্রচারের প্রত্যেকটি গণ মাধ্যমকেই ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে দেশের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তরুণ বুদ্ধিজীবী

যুব-ছাত্র সমাজকে শুধুমাত্র একটি অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।"

"আমরা আজ চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের চিন্তাধারার যুগে এবং সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত ও দ্রুত পতনের যুগে বাস করছি। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় দালালরা চূড়ান্ত অবলুপ্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড, বার্মা, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের দানা বেঁধে উঠেছে, জনযুদ্ধের দাবানলে বিশ্বে প্রতিক্রিয়া... এরা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে নকশালবাড়ি থেকে শ্রীকাকুলাম এবং মুশাহারি থেকে উত্তরে লখিমপুর খেরীতে কৃষি বিপ্লবের লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কেরালার বিপ্লবী কৃষকদের বিদ্রোহ সারা ভারতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এই সময়ই ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনতা অপ্রতিহত গতিতে মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে। এই সময়েই নাগা, মিজো ও কুকীদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন স্তরে পৌঁছেছে। কাজেই চেয়ারম্যান মাও'এর চিন্তাধারার সঠিক প্রয়োগ ও ৫০ কোটি ভারতীয় বীর জনগণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা রেখে আমরা নিশ্চয়ই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারব এবং আগামী দিনে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালালদের কবল মুক্ত করে এক স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক ভারত গঠন করতে পারব।"

[ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রকাশিত 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংকলন' শীর্ষক পুস্তিকায় "বিপ্লবী যুব-ছাত্র কনভেনশনে" উত্থাপিত দলিলটি আরও নয়টি দলিলের সাথে একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত দলিল নং-১০। এই দশ নং দলিলে মোট ১২টি ধারা আছে। ৪, ৭, ১০ এবং ১২ নং ধারা থেকে উপরের অংশগুলি উদ্ধৃত।][৮]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপ্লবী যুব-ছাত্র কনভেনশনে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচিটি প্রকাশ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ দেশব্রতী পত্রিকায়, ২৮শে মার্চ ১৯৬৯ ছাত্রফৌজ এবং ১৯৬৯-এর এপ্রিল মাসে লিবারেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হবাব পর পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রভাবিত ছাত্র রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ওঠে। এই আলোচনার একটি দিক ছিল সমালোচনামূলক এবং আরেকটি দিক ছিল সমর্থনমূলক। সমালোচনার দৃষ্টিতে যাঁরা এই কর্মসূচিকে দেখেছিলেন তাঁদের মতে—এই কর্মসূচিটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির আদলে রচিত, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মতই রণনীতি রণকৌশল ব্যক্ত হয়েছে, ছাত্র সংগঠনের মত গণ সংগঠনের কর্মসূচি এইভাবে রচনা করা অনভিপ্রেত। অপরদিকে যাঁরা সমর্থনমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন তাঁদের মতে—কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনের একটি রাজনৈতিক দিশা থাকবে, ছাত্ররা বিপ্লব সংগঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তাই তাঁদের সংগঠনেরও রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকবে এবং এইজন্যই সঠিকভাবে কর্মসূচির শিরোনাম করা হয়েছে 'বিপ্লবী যুব-ছাত্র আন্দোলনের খসড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি'।

উক্ত কর্মসূচিটি ১৯৬৯-র এপ্রিল কনভেনশনে গৃহীত হলেও আর.ওয়াই.এস.এফ.-এর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে RYSF-কে বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের একটি মজবুত কেন্দ্রীয় সংগঠনে পরিণত করা যায়নি। তাছাড়া RYSF-কে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সংগঠনের রূপ দেওয়া যায়নি। নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে যে মতপার্থক্য ঘণীভূত হয়েছিল, তা মূলত ছিল প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন এবং ছাত্রফৌজ

গোষ্ঠী-র সমর্থক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এতদসত্ত্বেও ১৯৬৯-এর ১লা মে CPI(M-L) ঘোষিত হবার পর বিপ্লবী ছাত্র-যুব কর্মীরা RYSF-এর রাজনৈতিক দিশাকে সামনে রেখে CPI(M-L)-এর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সে সময়কার চীনের কমিউনিস্ট নেতা লিন পিয়াও-এর নেতৃত্বের প্রতি নকশালবাড়িপন্থী পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা ও 'রেডবুক'-এর বক্তব্যকে প্রচার করে। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' শ্লোগান সোচ্চার হয়। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার কল্পনাও উৎসাহ পায়। শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে সর্বক্ষণের কর্মীরূপে 'বিপ্লবী' কার্যক্রমে অংশ নিতে এগিয়ে যায়। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান আরম্ভ করে। গ্রামে কৃষি বিপ্লবের ঘাঁটি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মতই গোপন আস্থানা, গোপন সংগঠন এবং ছোট-খাট আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রাখে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জনস্বার্থ বিরোধী সরকার এবং শাসকগোষ্ঠীরূপে শ্রেণি শত্রুর পর্যায়ে চিহ্নিত করে। গ্রামের জোতদার ভূস্বামীদের অত্যাচার প্রতিরোধে প্রয়োজনে এই শ্রেণি শত্রুদেব খতমের চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে যায়। প্রয়োজনে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি গ্রহণ-এর সপক্ষে লিন পিয়াও নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ ও পড়াশুনা শুরু হয়। বিপ্লবী শিক্ষা সংস্কৃতির প্রয়োগ-এর কৌশলের অনুসন্ধান চলে। ছাত্র-যুবকদের নেতৃত্বে বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এই চিন্তা বিকাশ লাভ করে।

এইভাবে ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের ভাবনাচিন্তা এবং 'বিপ্লবী যুব-ছাত্র ফেডারেশন'-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে কলকাতা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রকাশ পেতে থাকে।

বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের ভাবনাচিন্তার প্রয়োগ :

কলকাতার বড় বড় কলেজের বিশেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বিপ্লবী' ছাত্ররা শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের চিন্তাভাবনা অনুসারে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে।

শ্রমিকদের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য ছিল অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা—এই লক্ষ্যে বিপ্লবী ছাত্ররা শ্রমিক বস্তি এবং শ্রমিক অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করেছিল। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ছোট ছোট বৈঠক এবং আলোচনা সভার অনুষ্ঠান। তাছাড়া বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে চালু সংগ্রামগুলিকে সমর্থন ও সংগ্রামী সভা মিছিলে অংশগ্রহণ। এইভাবেই শিবপুরের গেস্টকীন উইলিয়ামস এবং দি স্টেটসম্যান পত্রিকার শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে নকশালবাড়িপন্থী যুব-ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কলকাতার বস্তি এলাকার ছোট ছোট কারখানার শ্রমিকদের সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কৃষকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয় ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর অঞ্চলের কালিকাপুরে। প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের কর্মীরা এই অঞ্চলে যাতায়াতের মধ্য

দিয়ে কৃষকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই অঞ্চলের তখনকার সি পি আই (এম)-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী আশু মজুমদার এবং কান্তি গাঙ্গুলী 'বিপ্লবী' ছাত্রদের সাথে যথেষ্ট আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন। সিপিআই(এম)-এর জেলা নেতৃত্বের শিব ভট্টাচার্য্য এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য 'বিপ্লবী' ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলে সিপিআই(এম)-এর বাধার ফলে কোন 'ঘাঁটি' গড়া সম্ভব হয়নি।

সোনারপুরের পরেই উল্লেখ করতে হয় মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরের কথা। নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রনেতা সন্তোষ রাণা ও তার ভাই মিহির রাণা গোপীবল্লভপুরের সন্তান। সন্তোষ রাণা তখন কলকাতায় পড়াশুনা করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার জন্মস্থানে ফিরে গিয়ে গ্রামের গরিব কৃষকদের বিশেষ করে আদিবাসী গরিব মানুষকে বিপ্লবী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবেন। সে মতো তিনি কলকাতা থেকে তাঁর ছাত্রকর্মীদের একটি দল-কে নিয়ে গোপীবল্লভপুরে চলে যান। এই থেকেই শুরু হয় নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের "গ্রামে চলো" অভিযান।

গোপীবল্লভপুরের লাগোয়া হলো বিহারের বহরাগোড়া। এই অঞ্চলে প্রবীণ কমিউনিস্ট সংগঠক ছিলেন মণী চক্রবর্তী। তিনি নকশালবাড়িপন্থী 'বিপ্লবী' ছাত্রদের গোপীবল্লভপুর এবং বহরাগোড়ায় 'ঘাঁটি এলাকা' গড়ে তোলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাছাড়া এই অঞ্চলের মানুষের চরম দারিদ্র্য, জমির মালিক এবং সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের জমা ক্ষোভ 'ঘাঁটি এলাকা' গড়ে তোলায় পরিস্থিতিগতভাবে অনুকূল ছিল। কলকাতা থেকে আগত ছাত্ররা গরীব কৃষক ও পিছিঁয়ে পরা মানুষের সাথে মিলেমিশে গোপন সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করে। অল্প দিনের মধ্যেই জোতদার মহাজন ও বড় জমির মালিকদের সাথে কৃষকদের কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনায় গোপীবল্লভপুরে জোতদার খুনের ঘটনা ঘটে। গোপীবল্লভপুরের উৎসাহ-উদ্দীপনা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পরার ফলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জ্যোতি বসু তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পুলিশমন্ত্রী। জ্যোতি বসুর নির্দেশে গোপীবল্লভপুরে নামানো হলো ইস্টার্ণ রাইফেলস-এর আধা সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশের ছাউনি বসলো। গোপীবল্লভপুরের কথা অন্য জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে। নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রনেতা অসীম চ্যাটার্জী 'গ্রামে চলো' অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন অনেক অগ্রণী ছাত্রী। গোপীবল্লভপুরের এই উল্লেখযোগ্য ছাত্র-যুব সংগ্রামে অবিভক্ত বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের এবং মেদিনীপুর জেলার প্রখ্যাত ছাত্রনেতা অশোক মাইতিও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরও ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

বিপ্লবী ছাত্রদের 'গ্রামে চলো' অভিযানে ছাত্রকর্মীসহ সাধারণ মানুষও খুন হয়েছিলেন। "...কেশপুর থানায় জোতদার ও গুণ্ডাদের হাতে প্রথম তিন শহিদ সুদেব, শশী, গুরুদাসের একজন সুদেব চক্রবর্তী ছিলেন ছাত্র, বাকি দুজন কৃষক। কলকাতা শহরের র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘর্ষ হয়েছিল। রাজ্য সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নকশালদের বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হতে হবে। (৭ মে ১৯৬৯, আনন্দবাজার পত্রিকা)"[৯]

"মার্কসবাদী পার্টির নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, নকশালপন্থী হল সমাজ বিরোধীদের আখড়া।"[১০]

"জ্যোতি বসু বললেন, নকশালরা আধা রাজনীতিক, আধা সমাজবিরোধী।"

৫ মে, ১৯৬৯।[১১]

"কানু সান্যাল বললেন, হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেব।"[১২]

এইভাবে "গ্রামে চলো"-র সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং খুন ও পুলিশী দমন পীড়নে পর্যবসিত হলো রক্ত ঝড়া সন্ত্রাসের ইতিহাসে। সি পি আই (এম-এল)-এর ইতিহাস, যে ইতিহাসে হত্যার রাজনীতিতে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 'মূর্তি ভাঙার' রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়ে সারা পশ্চিমবাংলা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উদ্বেল হয়ে পড়েছিল। নকশালবাড়িপন্থী পশ্চিমবাংলার এক বিরাট ছাত্র সমাজ হয়েছিল সি পি আই (এম-এল)-এর এই রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশীদার।

চারু মজুমদারের আহ্বান : সি পি আই (এম-এল)-এর প্রধান সংগঠক এবং প্রথম সম্পাদক চারু মজুমদার তাঁর লেখা এক নিবন্ধে ছাত্র-যুবকদের কাছে এক আহ্বান জানালেন। এই নিবন্ধটি দেশব্রতী পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ২৯শে আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল—

ছাত্র-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান

"দুশো বছরের পরাধীন ও শোষিত ভারতবর্ষে ছাত্র ও যুবকরাই হচ্ছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যাপক জনতাকে অশিক্ষিত ও অন্ধ রেখে দিয়েছে। তাই বিপ্লবী আন্দোলনে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্র-যুবক শুধু শিক্ষিতই নন, তাঁদের আছে বিরাট উৎসাহ, ত্যাগ স্বীকারের শক্তি এবং যে কোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। তাই তাঁরাই বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হয়ে ব্যাপক জনতার মধ্যে, বিশেষ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক জনতার মধ্যে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কৃষকের বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা শিক্ষিত, তাই দেশের অশিক্ষিত মানুষের কাছে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের সবচেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি স্তরে বাংলাদেশের যুবক ও ছাত্ররা অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, পুলিশের দমন নীতির মোকাবিলা করেছেন, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে 'ক্যারিয়ার' তৈরি করার স্বপ্নকে নিজ হাতে ধ্বংস করে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। আজকের এই নতুন যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসোন্মুখ, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী আগুন জ্বলছে, যখন সে বিপ্লবী আগুন ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছে নকশালবাড়ি থেকে শ্রীকাকুলামে, আসাম থেকে পাঞ্জাবে, তখন বাংলাদেশের সেই ছাত্ররা-যুবকরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবেন এবং শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের কাজে নামবেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ছাত্র-যুবকদের এই বিপ্লবী সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে এবং সামনে তুলে ধরেছে কলেজ ইউনিয়নের টোপ। কলেজ ইউনিয়নগুলো যুবক ও ছাত্রদের শিক্ষার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, শুধু তাই নয়, এই ইউনিয়নগুলোর অংশগ্রহণ করে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব ছাত্রদের বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়। এগুলো মূলত বিপ্লবী ছাত্র সমাজের সামনে একটা অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে। তাই কলেজ ইউনিয়নগুলি ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী প্রতিভাকে নষ্ট করে,

শ্রমিক কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো বিরাট বাধা। তারই ফলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউনিয়নের নেতৃত্ব সুবিধাবাদে ডুবে যায়, তাদের মধ্যে 'ক্যারিয়ারিজম' মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, নেতৃত্বের মোহ তাদের নানারকম সুবিধাবাদী 'ঐক্যের' দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের বিপ্লবী নীতিবোধকে ধ্বংস করে। সাম্রাজ্যবাদ এইভাবেই একদিন জনতার বিক্ষোভকে শান্ত করার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড আর মিউনিসিপ্যালিটি দিয়েছিল, এবং তার উপর দিয়েছে আইনসভা। ভারতবর্ষের ধনিকশ্রেণি কোনদিনই বিপ্লব চায়নি, চায়নি কোনদিনই সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করতে ; তাই স্বেচ্ছায় তারা এইসব টোপ গিলেছে, আর নানা কথায় বিপ্লবী জনতাকে ধোঁকা দিয়েছে।

ভারতবর্ষের কোন 'বামপন্থী' নেতৃত্বই কোনদিন এই ধনিকশ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান নি, তাই তাঁরাও সহজেই টোপ্ গিলেছেন। তাই আজ যখন চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের চিন্তাধারা আমরা পেয়েছি, আমরা পেয়েছি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ, তখন সে আলোকে আমাদের নতুন করে বিচার করে দেখতে হবে, নতুন করে পথ তৈরি করে এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই ধনিকশ্রেণির কুৎসিত আত্মসমর্পণের পথ নয়, আজ তাই বলিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী পথ।

তাই ছাত্র-যুবক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে, চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করা, আত্মসমর্পণের পথ বর্জন করে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়া। ভারতবর্ষের শতসহস্র শহীদ আজ আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁদের কাছে। আজ দিন এসেছে রক্তের ঋণ শোধ করবার; দিন এসেছে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শোষকশ্রেণিকে ধ্বংস করার। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বিপ্লবী আহ্বান জানাচ্ছেন যুব-ছাত্রদের কাছে; দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও ওই শ্রমিক ও দরিদ্র ও ভুমিহীন কৃষকের কাছে, কারণ তারাই পারে এই লাঞ্ছনা, এই অবমাননার অবসান ঘটাতে। অতএব ছাত্র-যুবকদের কাছে আজ পার্টির একটিই আবেদন—শ্রমিক এবং দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হও, একাত্ম হও, একাত্ম হও।"[১৩]

"এবার স্কুল কলেজ ছেড়ে দাও, বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো" শীর্ষক আরেকটি আহ্বান জানালেন চারু মজুমদার।

চারু মজুমদারের ২য় আহ্বান

"এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা গরীব কৃষক-শ্রমিক জনগণকে হেয় চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সব কিছুরই ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদাস বা অনুচর হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ সারাজীবনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুব-ছাত্রদের এই জনবিরোধী লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন : যতো বেশি পড়াশোনা করবে, তত বেশি মূর্খ হবে। আমি সবচেয়ে খুশি হবো যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। চীনের যুব-ছাত্রসমাজও মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরুতে স্কুল কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্জন করে। সেগুলো আবার চালু হয় প্রায় দুবছর বাদে ১৯৬৯ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে।"

[১৯৭০ সালের প্রথম দিকে বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের একটি বৈঠকে কমঃ চারু মজুমদার 'এখন তাদের কি করণীয়' সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছিলেন যা দেশব্রতীতে ৫ই মার্চ ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমান অংশটি সেই প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। লেখাটি 'বিপ্লবী যুব ছাত্রদের প্রতি কয়েকটি কথা' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।]

বিপ্লবী ছাত্রদের সংগঠন গড়ার কাজ বাধাপ্রাপ্ত :

র‍্যাডিক্যাল বা বিপ্লবী ছাত্ররা পুনর্গঠিত B.P.S.F. এবং পরে সি পি আই (এম)-এর ছাত্রফ্রন্টের পাল্টা যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ার উদ্যোগ ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু করেছিল, সেই উদ্যোগ ১৯৭০ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলো। সি পি আই (এম. এল.) এই সময় গণসংগঠন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে—"পার্টির সঙ্গে ছাত্র যুব সংগঠন একাকার হয়ে গেল।"[১৫]

৭০-এর দশকে পদার্পণ :

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের নকশালবাড়িমুখী বিপ্লবী ধারা সিপিআই(এম-এল.) পার্টির সাথে মিলেমিশে যাবার ফলে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। সিপিআই(এম-এল.)-এর নামে এই ধারার ছাত্রকর্মীরা তাঁদের পার্টিগত কর্মসূচির রাজনৈতিক প্রায়োগিক কৌশল প্রয়োগ শুরু করলেন। এই প্রায়োগিক কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং আক্রমণস্থল ছিল প্রধানত জোতদারদের দ্বারা অত্যাচারিত বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ এলাকা এবং শহর নগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংঘর্ষে, জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে এবং খুন, পাল্টা খুনে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি এক ভয়ানক রূপ নিল।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় দু'দশক পরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও কয়েকজন ছাত্রনেতা বিভিন্ন পুস্তক ও নিবন্ধে যে মূল্যায়ন করেছেন, সে মূল্যায়ন থেকে তখনকার পরিস্থিতি সহজে অনুমেয়। ঐসব মূল্যায়নের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল—

১। ভারতের ছাত্রফেডারেশন [SFI] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মূল্যায়ন "...কংগ্রেসের এই হীন কৌশল কার্যকরি করার জন্য মহড়ার ক্ষেত্র হিসেবে প্রথম বেছে নেওয়া হলো শিক্ষায়তনগুলিকে, নকশালদের ব্যবহার করে ১২'শর বেশি আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছিল। ৭০ থেকে ৭১-এর মধ্যে আড়াইশো স্কুলে পরীক্ষা হতে পারলো না। বহু স্কুল বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ দিলেন বিপিএসএফ-এর বেশি কিছু কর্মী ও নেতা। খুন হলেন এবং আক্রান্ত হলেন শিক্ষক অধ্যাপক এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন পরীক্ষা নেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সি আর পি তুলে নিতে বলার অপরাধে নিহত হলেন। দুর্গাপুরে প্রধানশিক্ষক বিমল দাশগুপ্তকে চেয়ারে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হলো। বি পি এস এফ-এর নদীয়া জেলার যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত সরকার পরীক্ষা দিতে গিয়ে খুন হলেন। অজস্র সংখ্যায় প্রতিদিন এসব ঘটনা ঘটতে শুরু করলো।"[১৬]

২। ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ)-এর বিশ্লেষণ—"সময়ের সাথে সাথে

সিপিআই(এম. এল.) পার্টিতে অতি বামপন্থী লাইন আরও ঘনীভূত রূপ নেয়। গণ আন্দোলন, গণ সংগঠন বয়কট করার লাইনের পরে পরেই আসে খতম লাইন, মূর্তি ভাঙা, স্কুল কলেজে হামলা ইত্যাদি। ব্যাপক ছাত্র-যুবকরা পার্টির নির্দেশে এই কাজে নিয়োজিত থাকে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, শরিকী সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। ভীতি. হতাশা ও সন্ত্রাস বড় হয়ে দেখা দেয়। ১৯৬৫-৬৮ সালে ছাত্র আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই বিপুল অংশগ্রহণ কমতে শুরু করে। ছাত্র সংসদগুলি কোথাও শোধনবাদী, কোথাও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে কার্যত তুলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছাত্র-যুবদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, হত্যা শুরু করা হয়। প্রতিক্রিয়ার শ্বেত পতাকা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে প্রবল গতিতে। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন সাময়িকভাবে হলেও পরাস্ত হয়।"[১৭]

৩। নকশালবাড়ি আন্দোলনে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং প্রাক্তন ছাত্রনেতা শৈবাল মিত্রের লেখা অনুসারে—"কলকাতা সমেত সারা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভ নিয়ত বাড়ছিল। কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগঠন এবং নেতৃত্ব না থাকায় দুঃসাহসিক, রোমাঞ্চকর নানা কাজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মূর্তি ভাঙা, স্কুল কলেজ, লাইব্রেরি পোড়ানো, এমনকি অনন্ত সিং পরিচালিত এমএমজি গোষ্ঠীতে ঢুকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে কেউ কেউ জড়িয়ে পড়লেন। গ্রামে শহরে কত তরুণ এবং ছাত্র শহিদ হলেন, সঠিক হিসেব এখনো পাওয়া যায়নি। ছাত্রদের ত্যাগ বীরত্ব এবং আদর্শবোধের যে অপচয় হচ্ছে, বেশ কিছু র‍্যাডিক্যাল ছাত্রনেতা এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবী তখন একথা বুঝতে পেরেছিলেন। সুশীতল রায়চৌধুরী লিখেছিলেন মূর্তি ভাঙা এবং স্কুল কলেজ পোড়ানোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলিল। বিপ্লবী ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়েও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অসিত সেন ১০ মার্চ ১৯৭০ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন, "শিক্ষায়তনে হামলা করে গান্ধীবাদ মুছে ফেলা যাবে না।" জনসংগঠন এবং গণআন্দোলন আপাতভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিল, সভাসমাবেশ কখনও একদন থেমে যায়নি। ১৯৭০ সালের ১৯ এবং ২০ জানুয়ারিও ট্রামবাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির দাবিতে কলকাতার বিপ্লবী ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন।"[১৮]

৪। প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশনের নেতৃস্থানীয় এবং সংগঠক দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী লিখেছেন—"১৯৭০ সালের মধ্যে কলকাতায় তো বটেই, জেলাগুলির অনেক কলেজেও ছাত্রদের ভিতরে সাবেকী বামপন্থীদের প্রভাব প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বামপন্থী ছাত্ররা এসে ভিড় করছিল নতুন ধারার সংগঠনে। এমন অবস্থায় হঠাৎ নতুন ছাত্র সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিয়ে 'এ্যাকশন' লাইন চালু করেন সিপিআই(এম. এল) নেতৃত্ব। এর ফলে সেই শহরাঞ্চলে সাংঘাতিক পুলিশী সন্ত্রাসের মুখে সিপিআই(এম-এল)-এর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে, এমনকি পুলিশ ও গুণ্ডাদের প্রত্যক্ষ মদতে শূন্যতা ভরতে লাফিয়ে আসে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠনগুলি।..."[১৯]

ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে পালা বদল শুরু হয়েছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণামে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হল ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ রাতে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের প্রতিবাদে সারা রাজ্যে সাধারণ

হরতাল ও ধর্মঘটের দিনে মিছিল সমাবেশের উপর পুলিশের গুলিতে ২৪ জন শহিদ হলেন। কলকাতার বামপন্থী ছাত্রসমাজ প্রায় ঐক্যবদ্ধভাবেই যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের কোন সংগঠন না থাকার ফলে তাঁদের কলকাতাকেন্দ্রিক যে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিল, তা ছিল বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমবাংলায় আবার জারি হলো রাষ্ট্রপতির শাসন।

যুক্তফ্রন্ট আর ঐক্যবদ্ধ থাকলো না। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হলো লোকসভার নির্বাচন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনে লোকসভার ৫১৮টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি আসন লাভ করে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করলো। এরপরই অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়ে গঠিত হল দুটো মোর্চা। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে 'সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট' এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট ১২৩টি আসন লাভ করেও সরকার গঠন করতে পারলো না। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট মাত্র ২৫টি আসন পেয়ে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করে রাজ্যে একটি সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হলো। কিন্তু অজয় মুখার্জির নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু সরকারও স্বল্পস্থায়ী হলো। আবার চালু হলো রাষ্ট্রপতির শাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্যপালকে তদারকি করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল তদানিন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে।

১৯৭০-এর মার্চে ২য় বারের রাষ্ট্রপতির শাসনের আমল থেকে শুরু করে ১৯৭১-এ কংগ্রেস সমর্থিত অজয় মুখার্জির সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারের স্বল্পকালীন সময়ের শাসনের আমল এবং ঐ ১৯৭১-এ তৃতীয় বারের রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে-ই শুরু হয়েছিল নকশালবাড়িপন্থীদের দমনের সরকারি ব্যাপক অভিযান। এই সময়ে প্রায় সব জেলায় সি পি আই (এম-এল)-এর সাথে যুক্ত নেতা কর্মীদের বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার ও জেলে আটক শুরু হয়। 'কুম্বিং অপারেশনের' নামে ছাত্র-যুবকদের পুলিশ ও সি আর পি দিয়ে অনেকগুলি পরিকল্পিত খুনের ঘটনাও ঘটে। ঘটতে থাকে রাজনৈতিক দলগুলির তরফেও পারস্পরিক খুনের ঘটনা। এই সময়েই ঘটেছিল বরানগরের গণহত্যা নামে খ্যাত নারকীয় ঘটনাটি। ব্যাপক দমননীতি এবং সন্ত্রাসে সত্তর দশকের প্রথম পর্বের পরিবেশ রক্তাক্ত।

এই সময়ের মধ্যেই খুন হয়ে গেল নকশালবাড়িপন্থী কয়েকশত ছাত্র-যুবক। যাঁরা নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী সংগ্রাম মনে করে মৃত্যুকে কুছপরোয়া না করে শহিদ হলেন দলে দলে—তাঁদের না আছে কোন রেকর্ড, তালিকা অথবা প্রামাণ্য দলিলপত্র। একটি সংগঠন উদ্যোগী হয়ে এই শহিদদের যে তালিকা রেকর্ড ইত্যাদি তৈরি শুরু করেছিল, তাও অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির আরও দ্রুত পট পরিবর্তন হল। ১৯৭২ সালের পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি [CPI]-র সাথে কংগ্রেসের আঁতাত এবং নির্বাচনী বোঝাপড়া হলো। ভারতের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে পশ্চিমবাংলার বিধানসভার ১৯৭২-এর নির্বাচন 'জাল নির্বাচন' বা 'রিগ্‌ড ইলেকসান' রূপে অভিযুক্ত হয়েছে। সি পি আই (এম) প্রভাবিত দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বিধানসভাকে অভিহিত করা হলো 'সাজান' বিধানসভা রূপে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করলো, মুখ্যমন্ত্রী

হলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। সি পি আই (এম) ছয় বছরের জন্য [Full Term] বিধানসভা বয়কট করলো। ভারতে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটাও এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নকশালবাড়িপন্থী সবরকম আন্দোলনকে এবং সি পি আই (এম-এল)-কে স্তব্ধ করে দিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পশ্চিমবঙ্গে 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুবরা এবং সি পি আই (এম-এল) দমন-পীড়নকে প্রতিরোধ করে নিজেদের সংগঠিত করার এবং মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন অবকাশ পায়নি।

পশ্চিমবাংলার রাজনীতির এই পটভূমিতে ১৯৭০-এর দশকের শুরুতেই বোঝা গিয়েছিল ষাট দশকের পরিস্থিতির মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। 'র‍্যাডিক্যাল' বা 'বিপ্লবী' ছাত্র আন্দোলনের জোয়ারে ভাটার টান শুরু হয়েছে। মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সুশীতল রায়চৌধুরী, অসিত সেন-এর মত সি পি আই (এম-এল) পন্থী তাত্ত্বিক নেতারা প্রকাশ্যে 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ, দেশের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-রাজনৈতিক নেতাদের মূর্তি ভাঙার রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ষাটের দশকে উদ্বেলিত 'বিপ্লবী' ছাত্রদের সংগ্রামী ধারা নকশালবাড়িমুখী প্রায়োগিক কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হলো ভাঙনের। সি পি আই (এম-এল)-এর প্রত্যাসন্ন ভাঙন-ই 'বিপ্লবী' বা র‍্যাডিক্যাল ছাত্র আন্দোলনে ভাঙনের সূচনা করল। সি পি আই (এম-এল) রাজনীতির সমালোচকদের একপক্ষ বলতে শুরু করলেন—বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের সংগ্রামমুখী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিল সি পি আই (এম-এল)-এর হটকারী এবং ভুল রাজনীতি।

সমালোচকদের সমালোচনা যা-ই হোক না কেন, ষাটের দশকের পশ্চিমবাংলার 'বিপ্লবী' বা র‍্যাডিক্যাল বলে পরিচিত এবং পরে নকশালবাড়িপন্থী বলে খ্যাত ছাত্র-যুবদের আত্মত্যাগ, দেশ-প্রেম, বীরত্ব ছিল তুলনাহীন। এঁদের সংগ্রামের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন সূত্রে কয়জন ছাত্রশহিদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তারা হলেন— (১) বঙ্গবাসী কলেজের বিজন বিশ্বাস, নিহত হন হাজারিবাগ জেলে। (২) প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সুদেব চক্রবর্তী, নিহত হন মেদিনীপুর-কেশপুরের গ্রামে। (৩) প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রবীর, নিহত হন হাওড়া জেলে। (৪) প্রেসিডেন্সি লন গ্রুপের ছাত্র কাজল ব্যানার্জি, নিহত হলেন তালতলায়। তাছাড়া কলকাতার ভবানী দত্ত লেনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রেসিডেন্সি 'লন' গ্রুপের যাঁরা নিহত হলেন—(৫) বিধু সরকার, (৬) শম্ভু দত্ত, (৭) গোবিন্দ চক্রবর্তী, (৮) অনুপ ভোঁস, (৯) সুকুমার ভট্টাচার্য, (১০) শেখর গুহ, (১১) কেষ্ট সান্ন্যাল, (১২) শংকর দাস, (১৩) সমীর ভৌমিক। (১৪) যাদবপুরে নিহত হলেন আশু মজুমদার। (১৫) রাসবিহারীতে নিহত হন সর্বানী বসু। (১৬) বাগবাজারে নিহত হন সমীর। (১৭) হাওড়ার শিবপুরে নিহত হন শক্তি রায়। (১৮) নদীয়ার কৃষ্ণনগরে নিহত হলেন শুভ্রাংশু ঘোষ। (১৯) বারাসতে খুন করা হলো শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, (২০) প্রবীর মিত্র, (২১) গণেশ ঘটক, (২২) সমীরেন্দ্র দত্ত, (২৩) তরুণ দাস। (২৪) আড়িয়াদহের মুরারী মুখোপাধ্যায় নিহত হন হাজারিবাগ জেলে। (২৫) ক্যানিং অঞ্চলে নিহত হন মৃত্যুঞ্জয় নস্কর। (২৬) প্রবীর নিহত হয় খড়গপুরে। (২৭) মেদিনীপুর জেলে নিহত হয় চপল দাশ অধিকারী। (২৮) মৌলানা আজাদ কলেজের ছাত্র অনুপ আচার্য্য নিহত হয় আসানসোলে।[২১]

এই শহিদরা কলকাতার প্রেসিডেন্সি 'লন' থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই রকম অসংখ্য তালিকা অজ্ঞাত-ই রয়ে গেছে।

ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ-ঢেউ যখন সত্তরের দশকে বেলাভূমিতে আঁছড়ে পড়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করলো, তখন একটি আত্মসমীক্ষার কয়েকটি লাইন:

"এখন বুঝি আমাদের মধ্যে যে অধৈর্য্যপনা ছিল, দ্রুত একটা পরিবর্তন সংঘটিত করার যে ছটফটানি ছিল তাই আমাদের অন্ধ করেছিল। আমরা এই তাগিদেই গ্রহণ করেছিলাম 'নতুন যুগের' লাইন : 'লেনিনের তত্ত্বগুলি এ যুগে আর সব প্রযোজ্য নয়', 'এ যুগে কোনো অতিবাম বিচ্যুতি ঘটতে পারে না', 'আত্মরক্ষার কোনো চিন্তা না করে কেবল আক্রমণ করা দরকার', 'নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা দরকার, অপরকে গড়ে তোলা দরকার—যে মানুষের মৃত্যু ভয় নেই।' যে দীর্ঘ আন্দোলনের টানাপোড়েনে মানুষ পোড় খায়, তার মতে দৃঢ়তা আসে, মৃত্যু ভয় দূর হয়, সেই কষ্টকর দীর্ঘস্থায়ী গণ-আন্দোলনের ধাপগুলি অতিক্রম না করেই এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম।"[২২]

RE-College-এর ঘটনাবলী :

দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ [সংক্ষেপে RE-College] পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হলেও ষাট দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের শুরুতে ভারতের নকশালবাড়ি ভাবধারার ছাত্র আন্দোলনে এক বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। তাই, RE-College-এর ঘটনাবলীকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হল :

'দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'-এর ছাত্র আন্দোলন ১৯৬০-৭০-এর দশকে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। এই কলেজের ছাত্র আন্দোলনের সময়কাল ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০। 'দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'-এর ছাত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত সময়ের ইতিহাসের সাথে যাঁর নাম জড়িয়ে আছে, তিনি সিপিআই(এম-এল)-এর একজন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বিনোদ মিশ্র। ১৯৬৬ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিনোদ মিশ্র ১৮ বৎসর বয়সে এই কলেজে ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করতে এসেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে এক শ্রমিক কলোনীতে বিনোদ মিশ্রের পরিবার বসবাস করতো। পিতা ছিলেন প্রতিরক্ষা সংস্থার করণিক। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বিনোদ মিশ্র খুবই মেধাবী ছাত্ররূপে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকই ছিল পশ্চিমবাংলার বাইরের অন্য রাজ্যের অবাঙালি ছাত্র।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ছিল খুবই অত্যাচারী। ছাত্রদের ব্যারাক জীবনযাপন করতে বাধ্য করতো। ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকলাপ সহ যে কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ কলেজের অভ্যন্তরে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বললেই চলে। এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিনোদ মিশ্র কলেজে ভর্তি হয়েই দুর্গাপুরের স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। কানপুরে থাকাকালীন-ই কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত নির্দল লোকসভা সদস্য এবং প্রখ্যাত শ্রমিকনেতা এস. এম. ব্যানার্জির সাথে এবং বিধানসভা সদস্য এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতা মস্ত সিং ইউসোফ্-এর সাথে বিনোদ মিশ্রের যোগ থাকায় তাঁর উপর কমিউনিস্ট প্রভাব ছিল। দুর্গাপুরে এসে কমিউনিস্টদের সাথে যোগসাজসে, কলেজের অভ্যন্তরে ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজে উদ্যোগী হলেন। এই সময় দুর্গাপুর RE-College-এর ছাত্রদের সম্পর্কে দুর্গাপুরের শ্রমিক-মেহনতী মানুষের ধারণা খুবই উন্নাসিক স্তরের ছিল। কারণ ছাত্ররা কোন রাজনৈতিক

এবং সামাজিক কার্যকলাপের সাথে নিজেদের জড়িত করতো না। এমনকি ছাত্রদের ক্রীড়া পর্ষদ [Gymkhana Body] নির্বাচনও ছিল খুবই গতানুগতিক স্তরের, ছাত্ররাজনীতির কোন প্রভাব ছিল না। বেশিরভাগ ছাত্রই ছিল অরাজনৈতিক। বিনোদ মিশ্র ও তাঁর সতীর্থ তামিলনাড়ু থেকে আগত ছাত্র রভিচন্দ্রন-এর প্রচেষ্টায় এই অরাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। বাঙালি-অবাঙালি ছাত্ররা রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজেদের সক্রিয় সংগঠন গড়ার দিকে আগ্রহশীল হয়। এই সময় পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে আগত দু'জন ছাত্র ওমস্বরূপ এবং ব্রীজ বিহারী পাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সি পি আই (এম)-এর সাথে যখন এই RE-College ছাত্র কর্মীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তখনই কিন্তু নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটলো। নকশালবাড়ির ঘটনার প্রতি RE-College-এর এই অগ্রণী ছাত্র গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবেই আকৃষ্ট হলেন এবং নিজেদের নকশালবাড়ির লাইনে সংগঠিত করতে শুরু করলো। ১৯৬৮-র 'Gymkhana Body'-র নির্বাচনে এই গোষ্ঠীর কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে। বিনোদ মিশ্রের পূর্ববর্তি ব্যাচের কয়েকজন ছাত্র ও নকশালবাড়িকেন্দ্রিক রাজনীতিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— শান্তি চ্যাটার্জি, প্রবাল রায়, আশীষ দাশগুপ্ত প্রমুখ। Gymkhana-র গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করেই নকশালবাড়িপন্থী ছাত্ররা কলেজ পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করলো 'ভ্যানগার্ড'। ভ্যানগার্ডের প্রথম সংখ্যাতেই বিভিন্ন লেখায় 'চেয়ারম্যান মাও সেতুং'-এর চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উপর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করা হয়। এই ঘটনায় কলেজ অধ্যক্ষ সহ কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের RE-College থেকে বিতারণের [Rustication] চক্রান্ত শুরু করে দেয়।

তাছাড়া সাধারণ ছাত্ররা কিন্তু কলেজ পত্রিকায় এই ধরনের রাজনীতি প্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং প্রতিবাদে এই ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে ও 'ভ্যানগার্ড'-এর অনেকগুলি কপি জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় বিনোদ মিশ্র প্রমুখ পাঁচ-ছয় জন নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র মাও সেতুং এবং চীনের সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকে। কিন্তু মিছিলকারী ছাত্ররা ফেরার পথে শ্লোগানদানকারী বিনোদ মিশ্র প্রমুখের উপর দৈহিক আক্রমণ করে। এই ঘটনার পরই কলেজ কর্তৃপক্ষ পার্সেনটেজ-এর অভাবের অজুহাতে নকশালবাড়িপন্থী কতিপয় ছাত্রের পরীক্ষা বন্ধের উদ্যোগ নেয়। এর ফলে সমগ্র পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। এবার সাধারণ ছাত্ররাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ডাকা হলো RE-College ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট। সাধারণ ধর্মঘট অভূতপূর্বরূপে সফল হলো। গড়ে উঠলো ছাত্র ঐক্য। ছাত্ররা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করলো। শেষ রাতের দিকে কলেজ শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ কর্ডন ভেঙ্গে ঘেরাও মুক্ত হতে চেষ্টা করলে ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। হোস্টেল থেকে দলে দরে ছাত্ররা ছুটে এসে কলেজ শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের বাসস্থানগুলি আক্রমণ করে। কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকে। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকার করে ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেয়। দাবি মানা সত্ত্বেও কিন্তু পরে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এর পর ১৯৬৯ সালে RE-College-এ শুরু হলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। কাশীপুর এবং ইছাপুরে শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে RE-College-এর ছাত্ররা দুর্গাপুর টাউনশীপ অঞ্চলে প্রতিবাদ মার্চ করে। এই অবস্থানেই ছাত্রদের একাংশের সাথে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের বিরোধ শুরু হয়ে যায়। একদিন প্রগতিশীল নাট্যানুষ্ঠান চলার

সময় নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের উপর উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। এই ঘটনার পর কলেজের নকশালপন্থী ছাত্ররা পড়াশুনা পরিত্যাগ করে অনেকেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীরূপে সি পি আই (এম-এল) সক্রিয়ভাবে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইতিমধ্যে ১৯৬৯-এর জুন একটি ঘটনা ঘটে। একজন ট্রাক ড্রাইভারকে ট্রাফিক পুলিশ মারধোর করছিল। RE-College-এর দু'জন ছাত্রকেই গ্রেপ্তার করে। কলেজে এই খবর পৌঁছানোমাত্র দলে দলে ছাত্ররা লাঠি-ডান্ডা নিয়ে বেড়িয়ে পরে এবং নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে পুলিশদের মারধোর করে এবং জি টি রোড অবরোধ করে রাখে। পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ছাত্রদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। কিন্তু উত্তেজিত ছাত্ররা পুলিশ ইনস্‌পেক্টরকে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে নিয়ে এসে আটক করে রেখে শর্ত আরোপ করে। শর্ত ছিল আটক দু'জন ছাত্রকে মুক্তি দিলে, পুলিশ ইনস্‌পেক্টরকে মুক্তি দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ তা মেনে নেয়। ছাত্ররা বিজয়লাভের আনন্দে উল্লসিত। কিন্তু পুলিশ বাহিনী প্রতিশোধ নিল পরের দিন। পরের দিন সকালে চারদিকে থেকে পুলিশ বাহিনী কলেজকে ঘিরে ফেলে, এবং কলেজে ঢুকে ছাত্রদের ছাত্রাবাস, পরীক্ষা হলে যেখানে যে ছাত্রকে পেয়েছে তাকে নির্মম ও নির্দয়ভাবে প্রহার করে। ছাত্ররা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় এবং কলেজের ছাত্র প্রকাশ পোদ্দার পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। RE-College-এ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ জানায়। এই ১লা জুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'Red Star Over Durgapur' শিরোনামে The Statesman পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখে। সিপিআই(এম)-এর দুর্গাপুরের ইউনিট নকশালবাড়িপন্থী RE-College-এর ছাত্রদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে একদিন কলেজ থেকে বিনোদ মিশ্র সহ প্রায় ১৫জন ছাত্রকে ধরে এনে শ্রমিক কোয়ার্টারে আটক করে। নিজেদের মুক্তির দাবিতে এই ১৫জন ছাত্র নেতা ও কর্মী অনশন ধর্মঘট শুরু করে দেয়। অনশন শুরু হলে এক বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। সিপিআই(এম)-এর সাধারণ কর্মী ও সভ্যরা অনশনকারী ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ নকশালবাড়িপন্থী এই আটক ছাত্রদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এর পরবর্তী ঘটনা হলো—কম্বোডিয়ার উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের প্রতিবাদে RE-College-এর ছাত্ররা ছাত্রধর্মঘটে সামিল হয়। তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় দু'হাজার ছাত্রের উপস্থিতিতে দুর্গাপুর RE-College Building-এর শীর্ষে রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হলো। ১৯৬৯-এর শেষ এবং ১৯৭০-এর প্রথমার্ধে সিপিআই(এম-এল)-এর আহ্বানে দুর্গাপুর RE-College-এর নকশালপন্থী ছাত্রনেতারা একে একে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন— ধূর্জটি বক্সী, গৌতম সেন প্রমুখ। আর বিনোদ মিশ্র ঠিক করলেন, তিনি পেশাগত বিপ্লবী [Professional Revolutionary] হিসেবে পার্টির কাজ করবেন।

দুর্গাপুর RE-College-এর নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের উপর যাঁরা 'শ্বেত সন্ত্রাস' চালিয়েছিল তাঁদের উপর ১৯৭০-এ নকশালবাড়িপন্থীরাও 'লালসন্ত্রাস' চালিয়েছিল। যেমন, 'শ্বেতসন্ত্রাস'কারী মধুসূদন ছাত্রদের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আত্মসমর্পণ করলে, ছাত্ররা তাকে ক্ষমার পরিবর্তে তীব্র ঘৃণায় প্রচন্ড প্রহার করে মধুসূদনকে

খুন করে। মধুসূদনের হত্যার ঘটনাও RE-College-এর নকশালপন্থী ছাত্রদের 'লাল সন্ত্রাস'-এর শেষ ঘটনা ।

দুর্গাপুর RE-College-এর ছাত্রদের এক বিরাট অংশ নকশালবাড়ি ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হলেও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীদের সাথে সব ক্ষেত্রে সহমত ছিল না, বহু ক্ষেত্রেই মত পার্থক্য ছিল। বিনোদ মিশ্রের লিখিত ভাষ্যে এই মত বিরোধ নিম্নরূপ :

"We neither advocated nor practised Che's theory of urban guerilla actions, nor any kaka-style super-hero emerged from among us. We always remained loyal to the party's mainstream and through we engaged in intensive debates. We had no fractions among us. We paid lot of attention to reading a wide range of Marxist literature and on making political propaganda. At a junctive nearly 100 students volunteered to became party whole-timers and scores of them did go to work in the countryside. Four worker comrades who become party whole timers in interactions with us in those periods are still working in our party in responsible positions and many workers and their families still retain the fond memories of the RE-College boys. The rest is history."[২৩]

অন্ধ্র

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের অনেক পূর্বে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ১৯৬৪ সালে বিভক্ত হয়েছিল। বিভক্ত গোষ্ঠী ছিল সিপিআই এবং সিপিআই(এম) কেন্দ্রিক। কিন্তু ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম কেন্দ্র করে সিপিআই(এম)-এর অন্ধ্রপ্রদেশ ইউনিটে আনুষ্ঠনিক ভাঙন এলেও সিপিআই(এম)-এর ছাত্রফ্রন্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশনে কোন আনুষ্ঠানিক ভাঙন হয়নি। গড়ে তোলা হয়নি কোন পৃথক বা পাল্টা গোষ্ঠী বা ছাত্র সংগঠন।

১৯৬৯ সালের ১০ থেকে ১২ই এপ্রিল 'অন্ধ্রপ্রদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট কমিটি'-র অনুষ্ঠিত কনভেনশনে একটি 'আশু কর্মসূচি' গৃহীত হয়েছিল। ১১ দফা সমন্বিত এই আশু কর্মসূচির ১০ দফাতে বলা হয়েছিল—"সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবিরোধী শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি চালু করতে হবে, মধ্যবিত্ত জনগণের বেকার সমস্যাকে সমাধান করতে হবে।" অন্ধ্রের বিভিন্ন জেলার ছাত্র-যুবদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ 'অন্ধ্রপ্রদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট কমিটি'-র আশু কর্মসূচিগত এই মূলনীতিকে মেনে গেরিলা যুদ্ধ স্কোয়াডগুলিতে সামিল হয়েছিল। হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ শহরসহ শ্রীকাকুলাম, ওরঙ্গল, খাম্মাম, কৃষ্ণা, করিমনগর, পূর্ব-গোদাবরী, আলিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের যে অংশ নকশালবাড়ির প্রভাবে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের পথ অনুকরণ করেছিল তাঁরা পৃথকভাবে কোন ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। অনেকটা পশ্চিমবাংলার 'বিপ্লবী' এবং 'র‍্যাডিক্যাল' ছাত্রদের মতই শহর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে গ্রাম ও বনাঞ্চলে গেরিলা-যুদ্ধ স্কোয়াডগুলির কার্যক্রমে অংশ নিতে চলে যায়। সুতরাং ৭০-এর দশকে সিপিআই(এম-এল)-এর ভাঙন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্তিকরণ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের 'বিপ্লবী' ও র‍্যাডিক্যাল

ছাত্রদের কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জেলে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত যে প্রায় ২৫০০ জন কমিউনিস্ট বিপ্লবী কর্মীকে আটক রাখা হয়েছিল এবং জেলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনগুলিতে যে ৪৫ জন কমিউনিস্ট বিপ্লবীর মৃত্যু হয়েছিল— তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছাত্র যুব কর্মী। 'অন্ধ্রপ্রদেশ কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমিটি' এবং সি পি আই (এম-এল) এই দুই শিবিরেই[২৪] কমিউনিস্ট বিপ্লবী ছাত্ররা ছড়িয়ে ছিল এবং সশস্ত্র সংগ্রামে 'ব্যক্তি হত্যার' রাজনীতিতে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৭০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন' [PWA] ভেঙে কবিশ্রী শ্রী কুটম্বা রাও রবিশাস্ত্রী প্রমুখদের নেতৃত্বে 'রেভ্যুলিউশনারী রাইটার্স এ্যাসোশিয়েশন' [RWA] গঠিত হয়। এই 'RWA'-র সাথে ছিল 'বিপ্লবী' ছাত্রদের সংযোগ। ১৯৬৯-৭১-এ যে বিপ্লবী ছাত্ররা গ্রাম ও বনাঞ্চলের গিরিজন, হরিজন এবং গরিব মানুষের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদেরই বিভিন্ন অংশ ৭০-দশকের মধ্যবর্তী সময়ে 'Andhra Pradesh Radical Students Union' এবং 'Progressive Democratic Students Union [PDSU], Andhra Pradesh' গড়ে তুলেছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিজাম কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ভাবধারার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মত অন্ধ্রে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মতপার্থক্যের জন্যই ছাত্র সংগঠন সহ কোন গণ সংগঠনই গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই সময়ে পশ্চিমবাংলার সাথে তুলনামূলক বিচারে অন্ধ্রপ্রদেশে 'বিপ্লবী' বা নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণের ঘটনা অথবা মূর্তি ভাঙার রাজনীতির ঘটনা ছিল খুবই বিরল।

বিহার

ষাটের দশকের শেষদিকে এবং ৭০ দশকের প্রথম দিকে জামসেদপুর, সিংভূম, ঘাটশিলা, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে ছাত্রদের একাংশের উপর নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। পশ্চিমবাংলার নিকটবর্তী রাজ্য বিহারের সর্বত্র না হলেও পশ্চিমবাংলার লাগোয়া অঞ্চলে এই প্রভাব পড়াটা ছিল স্বাভাবিক। সি পি আই (এম-এল) গড়ার যুগের অন্যতম নেতা সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বাধীন কার্যকলাপের এলাকাগুলিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু অংশ ছাত্র সিপিআই(এম-এল)-এর কাজকর্মে এগিয়ে আসে। পশ্চিমবাংলার 'বিপ্লবী' এবং র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের অনেকেই জামসেদপুর অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল। পশ্চিমবাংলার এই আত্মগোপনকারী ছাত্র-নেতা ও কর্মীদের সংস্পর্শে এসে এইসব অঞ্চলের বহু সংখ্যক ছাত্র-যুবক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। টিস্কো পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ছিল এই অংশের ছাত্র-যুবদের প্রধান ঘাঁটি। ১৯৭০ সালের ১লা আগস্ট পরিকল্পিতভাবে ইস্পাত নগরী জামসেদপুরের বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে আক্রমণ চালান হয়েছিল। ১৯৭০-এর ১৩ই আগস্ট জামসেদজী টাটার ১২ ফুট উচ্চ ব্রোঞ্চ মূর্তিটি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এইভাবে ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের অভিযান অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ পুলিশ কে.এম.পি.এস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের উপর চরম আঘাত হানে। স্কুলের দরজা-জানালা বন্ধ করে পুলিশ নির্দয়ভাবে পিটিয়ে ছিল। পুলিশের এই আক্রমণে

তিনজন ছাত্র ঐদিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। প্রতিবাদে সব রাজনৈতিক দলের আহ্বানে জামসেদপুরে একদিনের বন্ধ পালন করা হয়েছিল।

চাঁইবাসার বিভিন্ন কলেজ হোস্টেলগুলিতে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। পুলিশও এই হোস্টেলগুলিতে কয়েকবার হামলা চালিয়েছিল।

১৯৭০-এর আগস্ট ঘাটশিলার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'বিপ্লবী' ছাত্ররা অভিযান চালায়। তাছাড়া রাঁচী শহর, ধানবাদের ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, উত্তরবিহারের মুজফ্‌ফরপুর, মুঙ্গেরের সুরজগড়, কাটিহার, পূর্ণিয়া এবং রাজধানী পাটনাতে সিপিআই(এম-এল)-এর পরিকল্পিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিহারেও নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের কোন সংগঠন না থাকায় তাঁদের কোন ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেনি। উপরন্তু সিপিআই(এম-এল)-এর ভাঙনজনিত কারণে বিহারের নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলি ৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকেই স্তিমিত হয়ে আসে।

অন্যান্য রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, বিহার রাজ্যেই ষাট এবং সত্তর-এর দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নকশালবাড়িপন্থী 'বিপ্লবী' এবং 'র‍্যাডিক্যাল' ছাত্রদের সংগ্রামী প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য হারে। কিন্তু এই রাজ্যগুলি বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে পাঞ্জাব রাজ্যের ভাতিন্দা জেলা, জলন্ধর জেলা, কপুরথালা জেলা, হোশিয়ারপুর জেলা এবং রেপার জেলার কতগুলি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে যে সমস্ত সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের ঘটনা ঘটে তাতে পাঞ্জাবের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক ছাত্রও অংশগ্রহণ করেছিল। তাছাড়া উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যে নকশালবাড়ি এবং সিপিআই(এম-এল) কেন্দ্রিক আঞ্চলিক কৃষক সংগ্রামগুলিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ হলেও তা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এই সব রাজ্যে ছাত্রদের যে অংশগ্রহণ ঘটেছিল, তা সংগঠিত নয়, তা ছিল স্বতস্ফূর্ত। ছাত্রদের শিক্ষা জীবনের কোন সমস্যাকে ইস্যু করে এইসব রাজ্যে 'বিপ্লবী' বলে অভিহিত ছাত্রদের নেতৃত্বে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে নকশালবাড়ি প্রভাবিত ধারার বিপ্লবমুখী চিন্তা ভাবনার প্রায়োগিক কৌশলের প্রয়োগ এবং সত্তরের দশকে তার দ্বন্দ্ব-বিরোধের পরিণতির ইতিহাস উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা তথ্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত।

তথ্যসূত্র :

১। 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন' পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ২৪।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ২৫।
৩। অনষ্টুপ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৮৩।
৪। সূত্র : 'ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন' পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ২৬।

৫। অনুষ্টুপ, অষ্টাদশ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ১৩৯০। নিবন্ধ : বাংলার বিদ্রোহী যুব-ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬-৭০/রণবীর সমাদ্দার, পৃষ্ঠা ৫।
৬। "ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন" পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ১।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা ২৮।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩ থেকে ৫০।
৯। শৈবাল মিত্র : ষাটের ছাত্র আন্দোলন, পৃষ্ঠা ৫৪।
১০। ঐ
১১। ঐ
১২। ঐ
১৩। ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন, পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ৫-৬।
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৭।
১৫। শৈবাল মিত্র : ষাটের ছাত্র আন্দোলন, পৃষ্ঠা ৭৭।
১৬। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, ভাবতের ছাত্র ফেডারেশন. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, পৃষ্ঠা ৬৮।
১৭। ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন, পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ৩১।
১৮। শৈবাল মিত্র : ষাটের ছাত্র আন্দোলন, পৃষ্ঠা ৫৫।
১৯। অনুষ্টুপ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৯১।
২০। এই সময় ভারতের সংবিধান সংশোধন করে বিধানসভার প্রতিটি Term ৫ বৎসরের স্থলে ৬ বৎসর করা হয়েছিল। পরে আবার জনতা সরকারের আমলে ৫ বৎসরে ফিরিয়ে আনা হয়।
২১। অনুষ্টুপ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৯৮৭, নিবন্ধ : ছাত্র আন্দোলন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী।
২২। ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬, ছাত্রনেতা দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর আত্মসমীক্ষা।
২৩। সি পি আই (এম-এল)-এর একটি প্রধানগোষ্ঠীর নেতা বিনোদ মিশ্রের নিকট এই পুস্তকের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নাবলী পাঠান হয়েছিল। সেই প্রশ্নাবলীর একটি লিখিত উত্তর পাঠিয়েছেন বিনোদ মিশ্র। সেই লিখিত উত্তর থেকেই এই উদ্ধৃতিটি সংগৃহীত।
২৪। 'অন্ধ্রপ্রদেশ কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমিটি' এবং সি পি আই (এম-এল) দুটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন এবং উভয় সংগঠন পৃথক হলেও নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের ভাবধারায় পরিচালিত।

সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠনের নাম পরিবর্তন ও পরবর্তী ঘটনাবলী

ছাত্র ফেডারেশনের ১৯৬৪'র ভাঙনের প্রস্তুতি পর্বে সর্বভারতীয় স্তরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে ভাঙন ঘটিয়ে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনকে রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত-ভাবে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা খুব সন্তর্পণে গোপনে শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টা পার্টি নেতৃত্বের একাংশের নির্দেশে স্থগিত হয়ে যায়। প্রস্তুতি হিসেবে যে সব ছাত্রফ্রন্ট সংক্রান্ত দলিল তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলির আর কোন স্তরেই আলোচনা হয় না। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রে রাজ্যস্তরে ছাত্র ফেডারেশনের ভাঙন সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং ইতিমধ্যে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন নিষ্ক্রিয় সংগঠনে পর্যবসিত হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিত, ১৯৬৭-র নির্বাচনে ৮টি রাজ্যে অকংগ্রেসী

সরকার গঠন, পশ্চিমবাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ষাট দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং গণবিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার পটভূমিতে সিপিআই(এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ছাত্রফ্রন্টে একটি সর্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা আবার নতুন করে ওঠে। সি পি আই (এম)-এর ছাত্র সংগঠন বিপিএসএফ-এর শীর্ষস্থানীয় নেতারা এই বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। এই আলোচনার বিষয়বস্তু রাজ্যের ছাত্রফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত পার্টি নেতাদের গোচরেও আনা হয়। তখন সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় সদরদপ্তর কলকাতায় অবস্থিত। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে পরামর্শক্রমে পশ্চিমবাংলার পার্টি ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে ১৯৬৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যের সি পি আই (এম)-এর ছাত্রফ্রন্টের নেতাদের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করা। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণ হাওড়াতে। কিন্তু এই বৈঠকের আলোচনা কোন সাফল্যের পথ দেখাতে পারেনি। শুধু বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পশ্চিমবাংলার 'কমরেডরা-ই এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেবে।'

১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১১টি আসনে জয়লাভ করে [কংগ্রেস পেয়েছিল ৫৫টি আসন] নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে পরিস্থিতির এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্র ফেডারেশন, সি পি আই-এর নেতৃত্বাধীন-ছাত্র ফেডারেশন, আর এস পি-র নেতৃত্বাধীন প্রোগেসিভ ছাত্র ইউনিয়ন, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ব্লক, এস ইউ সি-র নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন পশ্চিমবঙ্গের ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হল। কারণ, ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির নিজেদের মধ্যে মত বিরোধ। এতদসত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টকে রক্ষার আন্দোলনে শরিকদলগুলির ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ঐক্য বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সালের শুরুতে ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আসন্ন হয়ে উঠলে 'বামপন্থী ছাত্র সংগঠন' ছাত্র ঐক্যে আবার ভাটার টান শুরু হলো। ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হলে ছাত্র আন্দোলনেও উদ্ভব হলো নতুন পরিস্থিতি। শুধু বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনেই নয়, বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের অংশ কমিউনিস্ট ছাত্র-আন্দোলনে দলগত গোষ্ঠীগত বিরোধ তীব্রভাবে শুরু হয়েছিল।

সি পি আই (এম)-এর ছাত্রনেতারা নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রনেতা ও কর্মীদের 'তথাকথিত নয়াবাম ছাত্র-যুব নেতৃত্ব' বলে বিদ্রুপ করতে থাকে। এই বিদ্রুপের সাথে এই 'নয়াবাম'-দের 'বিপ্লবের তত্ত্ব', 'ছাত্র-শক্তি (Student power)-র তত্ত্বকে নস্যাৎ করার জন্য ব্যাপক প্রচার চলতে থাকে। উভয়পক্ষের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। অপরপক্ষে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রপরিষদ' সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংঘর্ষ, মারামারি, সন্ত্রাসের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। সি পি আই (এম) নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন অভিযোগ তোলে 'নকশালপন্থীরা' 'কংগ্রেসী ছাত্র গুন্ডা'-দের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের উপর আক্রমণ

চালাচ্ছে। এই অবস্থায় সি পি আই (এম)-এর ছাত্রফ্রন্ট দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার অবসানের পর নিজেদের সংগঠনকে আরও মজবুত করার প্রয়াসের কথা ভাবতে শুরু করে। সর্বভারতীয় স্তরে প্রচার আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করার জন্য এবং বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন অবিলম্বে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

যদিও এই প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি প্রগাঢ় হবার আগেই সি পি আই (এম) নিয়ন্ত্রিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের '৬৭-তে শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত ১৮-তম সম্মেলন এবং ১৯৬৯-এর ২৫-২৮শে ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত ১৯-তম রাজ্য সম্মেলনেও বহু সংখ্যক প্রতিনিধি উল্লাসের অনুভূতিতেই অবিলম্বে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়টিকে উত্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ ১৯৬৭ সাল থেকেই পুণর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন মঞ্চে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গঠনের কথা বারবার উত্থাপিত হচ্ছিল। এই উচ্ছ্বাস উল্লাস অনুভূতির মূল উৎস ছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবস্থিতি এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্ব।

সি পি আই (এম)-এর সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এই পটভূমিকায় কিভাবে গঠিত হল, তা ভারতের ছাত্রফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কর্তৃক লিখিত পুস্তকের বিবরণ অনুসারে—

"একটি সর্বভারতীয় ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের সংগ্রামী ছাত্রনেতারা প্রথম মিলিত হলেন কলকাতায় নেতাজীনগরে। ১লা-৭ই জুন এই বৈঠকে বিমান বসুকে আহ্বায়ক করে ১৪জনকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। মোট দশটি রাজ্যের ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা এই বৈঠকে যোগ দেন। বিমান বসু ছাড়াও সুভাষ চক্রবর্তী এবং শ্যামল চক্রবর্তী এই প্রস্তুতি কমিটির সভ্য ছিলেন। পরবর্তী সময় ১১ই এবং ১২ই অক্টোবর এই প্রস্তুতি কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় দমদমে। প্রস্তুতি কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১২ই অক্টোবর। ছাত্রনেতারা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পি সুন্দরাইয়া ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। এই অধিবেশন থেকেই ২৭ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ত্রিবান্দম শহরে একটি সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ২৭ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর এই সম্মেলন থেকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র— এই শ্লোগান নিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন তৈরি হলো। প্রথম সম্মেলনে একটি নতুন কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করে। সম্মেলন থেকে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষা আন্দোলনকে বিকশিত করবার জন্য আলাদা প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল। সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার সভাপতি এ কে গোপালন। এই সম্মেলন থেকে সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বিমান বসু এবং সি ভাস্করণ। এছাড়াও পশ্চিমবাংলা থেকে সুভাষ চক্রবর্তী সহ-সভাপতি এবং শ্যামল চক্রবর্তী যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।"[১] [এই উদ্ধৃতিতে যে তারিখগুলি উল্লিখিত হয়েছে, সে তারিখের কোন সাল মূল পুস্তকে উল্লেখ নেই। কিন্তু, সব তারিখগুলিই ১৯৭০ সালের পঞ্জিভুক্ত এবং ঘটনা— লেখক।]

সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের [S.F.I.] প্রথম সম্মেলনে অপর একটি গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল কোনও রাজ্যে অন্য নামে ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর গঠনতন্ত্র মান্য করে নিয়মাবলী পালন করতে দায়বদ্ধ থাকলে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র-এর বক্তব্য গ্রহণ

করলে সেই সংগঠনও এসএফআই-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্য শাখা হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে। যেমন পাঞ্জাব স্টুডেন্টস ইউনিয়ন [পি এস ইউ] এসএফআই-এর পাঞ্জাব রাজ্য শাখা হিসেবে বিবেচিত হলো।[২]

পাঞ্জাবের পরই এসএফআই-এর রাজ্য শাখা সংগঠন যথাক্রমে গড়ে ওঠে আসাম, বিহার, কেরালা, ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে।

১৯৭১-এর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন ফ্রন্টকে এসএফআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করেছিল। দল হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েও সিপিআই(এম)-কে সরকার গঠনে কোন সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন সংগঠনের প্রচেষ্টা হয়, তাতে এস এফ আই-এর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নামে খ্যাত। পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৯৭১-এর ২৭শে মার্চ রাজ্যব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হল এবং ঐদিনই অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় বিশাল ছাত্র সমাবেশ। এই ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র সমাবেশে এস এফ আই অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সাথে একযোগে মুখ্যভূমিকা পালন করে।

১৯৭১-এর পরেই ১৯৭২-এর মার্চে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় আসে। সিপিআই(এম) বিধানসভা বয়কট করে। সিপিআই(এম)-এর মতে ঐ বিধানসভা নির্বাচন ছিল জাল নির্বাচন। তাই তাদের যুক্তি ছিল, ঐ কারণে তারা বিধানসভা বয়কট করেছে। সিপিআই(এম)-এর এই ভূমিকা গ্রহণে বিশেষ করে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র-যুবকরা কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল। কারণ, নকশালবাড়িপন্থীদের 'নির্বাচন বয়কট' রাজনীতিকে সিপিআই(এম) তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল বলেই সিপিআই(এম) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পর বিধানসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে ঐ বিস্ময় ঘটে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন। সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ রাজ্যে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস চলছে।

প্রকৃত পরিস্থিতি— সিপিআই(এম) এবং সিপিআই(এম-এল)-এ সংঘর্ষ। কংগ্রেস এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে সংঘর্ষে মদতদানকারী ভূমিকায়; প্রশাসন শাসক দলের কৌশল প্রয়োগে সহায়ক; প্রতিদিন জেলায় জেলায় পরিকল্পিত খুন ও হত্যার ঘটনা; ফলে সন্ত্রাসে জনজীবন সন্ত্রস্ত। এই ধরনের সন্ত্রাসমূলক পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগঠনগুলি নিজ নিজ রাজনৈতিক আদর্শে এবং রাজনৈতিক দলের নির্দেশে তখন পরিচালিত হচ্ছে। বামপন্থী দলের ঐক্য নেই। সিপিআই তখন সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রীসভার এবং কংগ্রেসদলের সমর্থক। সুতরাং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিও অনুরূপভাবে বিভক্ত। এই সন্ত্রাসের কবলে সিপিআই(এম)-এর শতশত সভ্যকর্মী নিজ নিজ এলাকা ও ঘর ছাড়া। স্বাভাবিকভাবেই সি পি আই (এম) এবং তার গণ সংগঠনগুলি আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে। এসএফআই-এর অবস্থানেও ব্যতিক্রম ঘটলো না। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ তখন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুব্রত মুখার্জি প্রমুখদের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক (অফেনসিভ) ভূমিকায়। ছাত্র পরিষদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ছিল প্রধানত এসএফআই-এর বিরুদ্ধে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে এসএফআই সাংগঠনিক এবং আন্দোলনমুখীন যে কার্যকলাপ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত চালিয়েছিল,

তার একটি সংক্ষিপ্ত সালতামামী নিম্নরূপ:

১৯৭২— ১২ই এপ্রিল, ১৮ই এপ্রিল, ৬ই মে, ১০ই মে, ১৩ই মে, ২২-২৭ শে মে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্বদান ও অংশগ্রহণ। অক্টোবরে খাদ্য মিছিলে ছাত্রদের অংশগ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

১৯৭৩— ২৮শে মার্চ ২৬টি গণ সংগঠনের ডাকে 'বেকার বিরোধী দিবস' পালন। তাছাড়া এই বছরে মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। তাছাড়া এই পটভূমিতেই হাওড়ার শিবপুরে বিপিএফএফ-এর ২০তম সম্মেলন [প্রকৃতঅর্থে এসএফআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার প্রথম সম্মেলন] অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে নতুন করে ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এবং এসএফআই-এর রাজ্য শাখার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে শ্যামল চক্রবর্তী ও সুভাষ চক্রবর্তী ।

১৯৭৪— ২রা থেকে ৫ই জানুয়ারি কলিকাতার ত্যাগরাজ হলে এসএফআই-এর ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রায় সব জেলার শাখা সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় এই সম্মেলন থেকে সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে বিমান বসু এবং সি ভাস্করণ। পরে সাংগঠনিক কারণে সি ভাস্করণ পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রকাশ কারাত। এই সম্মেলনে থেকে আন্দোলনের কিছু কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছিল। সেই কর্মসূচি অনুসারে ছাত্র সমাজের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে গোটা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস জুড়ে রাজ্যব্যাপী প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা হয় এবং ৬-৭ই এপ্রিল বিভিন্ন জেলায় এবং ৮ই এপ্রিল কলিকাতায় এসএফআই-এর নেতৃত্বে ছাত্রেরা আইন অমান্য করে। তাছাড়া এই সময়ে রেলশ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট এবং সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে এসএফআই সহযোগী সংগঠনের ভূমিকা পালন করে। এইভাবে ১৯৭৪ সাল থেকেই সিপিআই(এম)-এর এই ছাত্র সংগঠন ধাপেধাপে নিজেকে সক্রিয় করে তোলে।

১৯৭৫— এই বছরটি ছিল এসএফআই-এর সর্বভারতীয় ছাত্র আন্দোলনে ভূমিকা পালনের বছর। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ ক্রমান্বয়েই দানা বেঁধে উঠেছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গুজরাট ও বিহারে ছাত্ররা গণ আন্দোলনে এগিয়ে এলে এসএফআই-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্ররাও এগিয়ে আসে। কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্র সংগঠনগুলি (একমাত্র সিপিআই-এর ছাত্র সংগঠন ছাড়া) জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই আন্দোলন ভারতের প্রায় সব রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ পশ্চিমবাংলায় এলেন। ৫ই জুন কলকাতায় এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হলো এবং এরপর ২০ই জুন সারা রাজ্যে পালিত হলো সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল।

১৯৭৬— এই বৎসরের শুরু থেকেই পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সব রাজ্যেই উত্তাল কংগ্রেস সরকার বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ২৬শে জুন সারা ভারতে জারি করা হলো জরুরী পরিস্থিতি। গ্রেপ্তার ও দমনমূলক ব্যবস্থাব ফলে প্রকাশ্যে গণ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে

পড়লো। কিন্তু কংগ্রেস সরকার বিরোধী চাপা বিক্ষোভ জনমানসে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। এই সময় সিপিআই(এম) এবং তার গণ সংগঠনের নেতা কর্মীদের ভারতের কোন রাজ্যেই ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার না করলেও তাঁদের আন্দোলনমুখী কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এসএফআই-এর কার্যক্রমও এই সময় ছিল সর্বভারতীয় স্তরে অবরুদ্ধ। ১৯৭৬-এর শেষের দিকে কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস (ই) দল মনে করলো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে পরিস্থিতি তাদের অনুকূল। তাই জরুরী পরিস্থিতি তুলে নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা করা হলো।

লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও পরাজিত হলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হলো জনতা পার্টি এবং জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। সিপিআই(এম) সহ অন্যান্য বামপন্থী দল জনতা পার্টি ও তার নেতৃত্বাধীন সরকারে সামিল হল না। সিপিআই(এম) মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে 'বন্ধু সরকার' বলে ঘোষণা করলো।

এই পটভূমিতে এসএফআই তার সাংগঠনিক ভূমিকাকে সক্রিয় করার সুযোগ পেল। তার নেতৃত্বাধীন অবরুদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে এলো প্রাণস্পন্দন। ৭ই এপ্রিল এসএফআই-এর প্রধান ভূমিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে অনুষ্ঠিত হল এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পরিচালিত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার অবসানের ফলে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন। সিপিআই(এম) নির্বাচনে লড়াই-এর জন্য সিপিআই এবং এসইউসি-কে বাদ দিয়ে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে 'বামপন্থী ফ্রন্ট' বা 'লেফট ফ্রন্ট' গঠন করে। জুন মাসে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্ট বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে এবং মুখ্যমন্ত্রী হন সিপিআই(এম) নেতা জ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের এই সাফল্যের পর কেরালা এবং ত্রিপুরায় সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে রাজ্য সরকার গঠন করে। এইভাবে তিনটি রাজ্যে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের ফলে সিপিআই(এম)-ছাত্র সংগঠনের ভূমিকারও সার্বিক পরিবর্তন ঘটে।

সাতাত্তর পরবর্তী এসএফআই :

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরাতে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পরবর্তী সময়ে এস এফ আই-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্র আন্দোলনের গতিমুখের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে এই তিনটি রাজ্যে এই গুণগত পরিবর্তনের মাত্রা রাজ্যের কোয়ালিশন সরকারগুলির স্থায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই গুণগত পরিবর্তনের বিষয়গত মর্মবস্তু ছিল— ভারতীয় সংবিধানের চৌহদ্দির মতো থেকে সিপিআই (এম) পরিচালিত কোয়ালিশন সরকারগুলিকে রক্ষা করা এবং এক একটি মেয়াদ [Term] শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মেয়াদের জন্য নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে আসার কর্মসূচি গ্রহণ। অর্থাৎ ছাত্র ইউনিয়নের পরিচালনা থেকে শুরু করে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার আন্দোলন এবং সার্মগ্রিকভাবে এসএফআই নিয়ন্ত্রিত ছাত্র আন্দোলনের যাবতীয় কর্মসূচি হয়ে দাঁড়ালো সংসদীয় নির্বাচনের অক্ষকেন্দ্রিক। কোয়ালিশন সরকারের তিনটি রাজ্যের রাজনৈতিক শরিকদলগুলির

ছাত্র সংগঠন ও তাদের ভূমিকা নির্বাচনে হয়ে উঠলো এইএফআই-এর অনুসারী।

১৯৭৯ সালের ২রা থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এসএফআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সম্মেলন থেকেই এই গুণগত পরিবর্তনের সূচনা পর্বের শুরু। তার পরবর্তী সম্মেলন ও বর্দ্ধিত অধিবেশনগুলিতে তা আরও স্পষ্ট। এই সম্মেলনে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন সমীর পুততুন্ড এবং মৃণাল দাস।

এসএফআই-এর বিশ্লেষণ অনুসারে—"ব্যারাকপুর সম্মেলন, পরবর্তী সময়ে বহরমপুরে বর্ধিত অধিবেশন, একাশির মালদা সম্মেলন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল বামফ্রন্ট এবং ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক নিয়ে। এই সমস্ত সম্মেলনগুলি থেকে সাধারণ যে দু'একটি অভিজ্ঞতার কথা বেরিয়ে এসেছে—

"(১) অতীতের ছাত্র আন্দোলনকে প্রতিটি প্রশ্নে, সরকারের প্রচন্ড বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই; সুতরাং শুধুমাত্র সরকার বিরোধিতার চেতনা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একদিকে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে কেন্দ্রের শিক্ষা বিরোধী এবং জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে উন্নত রাজনৈতিক উপাদানে সমৃদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

"(২) বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি ও অন্যান্য নীতিসমূহের মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবিগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে। আমলাতন্ত্রের প্রশাসন যন্ত্রের বাধা কাটিয়ে তা কার্যকরী করার জন্য ব্যাপকতম আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। শুধু নেতিবাচক মনোভাব না, ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েই সমস্ত বিষয়টি ছাত্রসমাজের উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। সংগ্রাম আন্দোলন সম্পর্কে এই শিক্ষায় ছাত্রসমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

"(৩) বামফ্রন্টের অবস্থান অনেক মৌলিক প্রশ্নকেও প্রাত্যহিক আন্দোলনের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। যেমন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্ন, আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন, বর্তমান শাসন-কাঠামোর মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন। এ সম্পর্কে লাগাতার প্রচার অভিযান চালিয়ে যেতে হবে।

"(৪) বামফ্রন্ট কোনও মৌলিক সমস্যারই পূর্ণ সমাধান করতে পারে না। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও বিকশিত করে নিয়ে যাবার প্রশ্নে বামফ্রন্ট সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে।

"(৫) বামফ্রন্টের এই ভূমিকা প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। একদিনের জন্যও চক্রান্ত থেকে তারা বিরত হয়নি। তাই দৈনন্দিন আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি আমাদেরও বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে । এটা বাদ দিয়ে ছাত্র আন্দোলন বিকশিত করার আশা দুরাশামাত্র।"[৪]

১৯৮০-র ২৮শে অক্টোবর সি পি আই (এম)-এর ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রধান নেতা দীনেশ মজুমদারের জীবনাবসান হয়। দীনেশ মজুমদারের মৃত্যুর কিছুদিন আগে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এসএফআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন। এই বর্ধিত অধিবেশনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে এবং ছাত্র কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে এক ব্যাখ্যামূলক দীর্ঘ ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে সংসদীয় গণতন্ত্রে বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-এর রাজনীতির মৌলনীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঐ ভাষণের সামান্য কিছু অংশ এইরূপ—

"প্রাইমারি বাদ দিয়ে বারো বছরের উর্ধ্বে যে ছাত্ররা এসএফআই-এর সদস্য হতে পারে সেই সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় অন্তন্ত পক্ষে ১৫ লক্ষ হবে। এবং বেশিরভাগ ছাত্রকে রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে আনতে হবে।"...

"শেষ করার আগে আবার বলছি এই বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচার গড়ে তুলতে হবে। ...বর্গা অপারেশন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে অধিকার মর্যাদা সৃষ্টি হয়েছে, তা কি কম? নিচের তলাকার মানুষের ৭০ শতাংশ মানুষের মধ্যে বামফ্রন্ট, সিপিআই(এম), বিপ্লবী গণ সংগঠনগুলি সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা, যে মর্যাদা সৃষ্টি হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে, এটাই তো পুঁজি।

"আগামীদিনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে এটাই তো শক্তিশালী হাতিয়ার। আমাদের গর্ববোধ হওয়া উচিত। এবং সেই গর্ববোধ শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তো চলবে না। ব্যাপক ছাত্রসমাজের মধ্যে, জনজীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তা নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে।"[৫]

১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ এবং তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত এস এফ আই-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্র আন্দোলন এইভাবেই কোয়ালিশন সরকারে গঠন, রক্ষা এবং নির্বাচনী অক্ষকেন্দ্রিক এবং এই অক্ষের চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। সি পি আই (এম) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার ছাত্রফ্রন্ট ও সংগঠনের ষাট-সত্তরের দশকের কর্মনীতির সাথে আশি-নব্বই-এর দশকের কর্মনীতির এখানেই মৌলিক পার্থক্য। ষাট, সত্তর, আশি এবং নব্বই দশকের উল্লিখিত তিনটি রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবরণ এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ।

১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত এস এফ আই বা সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭টি। এই সাতটি সম্মেলনের অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে ১৯৮৬ সালে কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ৫০ বৎসর পূর্তি বৎসর বা সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ এসএফআই-এর নেতৃত্বে তার প্রচারিত রাজ্যগুলিতে বেশ ঘটা করেই উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

এসএফআই নামগ্রহণের পর ১৯ বৎসর (১৯৯০ পর্যন্ত) এই সংগঠন ভারতের সব রাজ্যে সমানভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। এই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের বিকাশ ঘটেছে অত্যন্ত অসম পর্যায়ে। দুই তিনটি রাজ্যেই এর প্রধান শক্তি সীমাবদ্ধ। ১৯৯০-তে এবং সর্বভারতীয় সভ্য সংখ্যা ২০ লক্ষ ঘোষিত হলেও এই সভ্য সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের উপর পশ্চিমবঙ্গের। এসএফআই তৈরির সময় ১৯৭০ সালে সভ্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার।

ছাত্র আন্দোলনের সর্বভারতীয় যেসব কর্মসূচিতে এসএফআই অংশগ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ১৯৮৭-র ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ছাত্র-যুবদের কেন্দ্রীয় বিশাল জমায়েত; ১৯৮৮-র ২৬শে সেপ্টেম্বর সারা ভারত ছাত্র ধর্মঘটে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে কিউবার রাজধানী হাভানায় অনুষ্ঠিত আইইউএস-এর পঞ্চদশ কংগ্রেসে এসএফআই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনে এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে এসএফআই-এর লক্ষ্য ছিল—"যে সর্বপ্রধান কাজটি আমাদের

করতে হবে তা হলো শান্তিকে সুনিশ্চিত করা এবং নিউক্লিয়ার যুদ্ধকে ঠেকানো।[৬]

১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ ছিল এস এফ আই-এর নামগ্রহণ ও আত্মরক্ষার সময়। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ তার শক্তিবৃদ্ধি এবং বিকাশের সময়। ১৯৮৭-র পর থেকে সি পি আই (এম) পরিচালিত সরকারগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে নেতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধির সঙ্গে এসএফআই-এরও শক্তি ও সমর্থনের ক্রমহ্রাসমান যুগের শুরু। এই সময়কার বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নগুলির নির্বাচনে এসএফআই বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির [যেমন কংগ্রেস (ই) দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ বা সি পি] ক্রমবর্ধমান সাফল্য এসএফআই-এর শক্তিহ্রাসের পর্যায়কে সূচিত করে।

এসএফআই-এর প্রথম সম্মেলন থেকে সপ্তম সম্মেলন পর্যন্ত এই ছাত্র সংগঠনের পদাধিকারী কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—বিমান বসু, সি ভাস্করণ, প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরী, নীলোৎপল বসু প্রমুখ। এক হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং দর্শকের উপস্থিতিতে ১৯৮৯-এর ২৪ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এস এফ আই-এর সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এই সম্মেলন ছিল নজিরবিহীন। এর বিপুল আড়ম্বর, আয়োজন, বর্ণাঢ্যতা এবং চাকচিক্য ছিল তুলনারহিত ঘটনা। কিন্তু ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতির মানদন্ডে এই সম্মেলন ১৯৭০-এর প্রথম সম্মেলন ও পরবর্তী সম্মেলনগুলির ধারাবাহিকতাকেই বজায় রেখেছে। এইভাবেই এসএফআই বিংশ শতাব্দির শেষ দশকের দিকে পা বাড়ালো।

তথ্যসূত্র :

১। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনেব পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, পৃষ্ঠা ৭০।
২। গণশক্তি ২২শে ফেব্রুয়ারি বুধবার ১৯৮৯ (পাঁচ) বিমান বসুর নিবন্ধ।
৩। সি পি আই ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।
৪। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।
৫। ঐ : পৃষ্ঠা ১২৪।
৬। "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতায় সুদৃঢ় অবস্থান" শীর্ষক নিবন্ধ : প্রকাশ কারাত : গণশক্তি ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ (চার)।

সি পি আই-এর ছাত্র সংগঠন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান যখন যে দিকে মোড় নিয়েছে, ঠিক তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হয়েছে। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্যশাখা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকলাপের মাধ্যমেই হতো। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হলে দুই কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠন দুই ছাত্র ফেডারেশনের নৈকট্য গড়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্য যতদিন ছিল, ততদিন-ই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচি বজায় ছিল। ঐ পরিস্থিতিতে সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাবকে কিন্তু কখনো সিপিআই নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন ছাপিয়ে যেতে

পারেনি। একমাত্র ১৯৬৯ সালে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন কলকাতায় তার উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের কর্মসূচি সফলভাবে নিষ্পন্ন করেছিল। এই জাতীয় শিক্ষা সেমিনারে শিক্ষাবিদ কোঠারীসহ দেশের অসংখ্য শিক্ষাবিদ এবং জ্ঞানীগুণী মানুষ উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন IUS [International Union of Students]-এর তদানিন্তন সাধারণ সম্পদক এবং সহ-সভাপতি। সত্তর দশক সূচনার পূর্ব-মুহূর্তে এই কর্মসূচিই ছিল AISF-এর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি।

সত্তর দশক শুরুর দু-তিন মাসের মধ্যেই AISF-এর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। সিপিআই ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলকে নিয়ে সিপিআই(এম)-এর বিপরীতে আলাদা ফ্রন্ট গড়ে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই AISF ১৯৭০-এর এপ্রিল মাস থেকে সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠনের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। কেরালায় সিপিআই নেতা অচ্যুতমেননের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সমর্থনে কোয়ালিশন সরকার ঐ সময়ে গঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৭১ থেকে কংগ্রেস দলের সাথে সিপিআই-এর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। ১৯৭২ সালে সরাসরি সিপিআই পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করে। সুতরাং, এই ধরনের পটভূমিতে AISF নিয়ন্ত্রিত ছাত্র রাজনীতিরও কৌশল পরিবর্তন হয়। সর্বভারতীয় স্তরে সিপিআই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সাথে মিত্রতার বন্ধনে সামিল হলে AISF কংগ্রেস সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষানীতি বা কোন জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই অসুবিধা আরও চরমে ওঠে সিপিআই ১৯৭৬-এ কংগ্রেস সরকারের জারি করা জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিকে সমর্থন জানাবার পর। AISF-এর সাংগঠনিক এবং আন্দোলনগত কর্মসূচি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ প্রায় সাত বৎসর AISF এবং তার রাজ্য শাখা সংগঠনগুলিকে এই পরিস্থিতির পরিমন্ডলে তার ক্রিয়াকলাপ চালাতে হয়েছে। এর-ই মধ্যে তার সর্বভারতীয় এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলন ইত্যাদি চালাতে হয়েছে। ১৯৬৯-এ পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত AISF-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা BPSF-এর সম্মেলনে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির আভাস ছিল।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ৪০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে দেবদাস ভট্টাচার্য লিখিত 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' শীর্ষক নিবন্ধে ছাত্র আন্দোলনের যে মূল্যায়ণ করেছেন— তাতে সত্তরের দশকে AISF-এর সিপিআই(এম) বিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত মেলে। এই নিবন্ধে লিখিত প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিম্নরূপ—

"দুর্ভাগ্যবশত আগেকার কংগ্রেসী সন্ত্রাস অন্য শ্লোগানের আড়ালে ভয়াবহভাবে ফিরে আসে এবং যুক্তফ্রন্টের সোনার দিনগুলিকে কালিমালিপ্ত করে। 'বড়' দলের ক্ষমতার দম্ভ প্রকট হয়ে পড়ে। প্রকটরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ— এমনকি বিড়লার মত অভিশপ্ত মানুষকেও রাজনীতির অঙ্গনে ঘেরাফেরা করতে দেখা যায়। মার্কস্‌বাদী দর্শনের অনুগামী বলে যাঁরা দাবি করেন এমন অনেক শ্রেণি সংগ্রামের হোতারাও হয়ে দাঁড়ান চরম নিয়মতান্ত্রিক। শ্রমিক কৃষকের প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় ও কোন দলের? নিহত ব্যক্তি দলের কাছে শহিদ এবং সংগ্রামী হলেও অপরদলের কাছে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে—আবার এর উল্টোটাও হয়, সমাজবিরোধী শহিদ হয়, অথচ কৃষকের মৃতদেহ পুষ্পমালা

পায় না। সুতরাং, শ্রেণি সংঘর্ষের বদলে শরীকী সংঘর্ষ পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাপঞ্জিতে প্রধানতম স্থান গ্রহণ করতে থাকে।"

১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হলে এবং ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাচ্যুত হলে পরিস্থিতির আবার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ অভ্যন্তরীণ তর্ক-বিতর্কের পর সিপিআই কংগ্রেসের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করে বামপন্থী রাজনীতির পরিমন্ডলে ফিরে আসে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় যোগদান করে। AISF-এর এবং তার রাজ্য সংগঠনগুলির ছাত্র আন্দোলনের গতিমুখ পাল্‌টে যায়। অর্থাৎ সত্তরের দশকের শেষ অধ্যায়ে আবার সি পি আই (এম)-এর ছাত্র সংগঠনের সাথে সিপিআই-এর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। SFI, AISF, PSU, SB আবার একই মঞ্চে সামিল। কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে যৌথ ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি ১৯৯০ পর্যন্ত চালু রয়েছে এবং যা বহুলাংশে দেশের সংসদীয় রাজনীতির কেন্দ্রানুগ।

সি পি আই (এম-এল)-এ ভাঙনকেন্দ্রিক নতুন নতুন ছাত্র সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়

১৯৬৯-এর ৪ঠা জুলাই পিকিং রেডিও থেকে সম্প্রচারিত সংবাদে সারা বিশ্বকে জানান হয়েছিল— ১৩ই এপ্রিল '৬৯ এক প্রতিনিধিত্বমূলক কনভেনশনে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপ্লবী যুব-ছাত্র সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি" গঠন করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সিপিআই(এম-এল)-এর পার্টি এবং তার নেতৃবৃন্দের নির্দেশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয়স্তরে সিপিআই(এম-এল)-এর কোন ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা হয়নি।

পার্টির নির্দেশে 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুবকরা সিপিআই(এমএল)-এর কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।

সিপিআই (এম-এল)-এর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— ছাত্র-যুব কর্মীদের অনেকে 'গণসংগঠন গড়ে না তোলার নির্দেশে' মেনে নিতে পারেননি। প্রেসিডেন্সি কনসলিডেশনের অভ্যন্তরে এই বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। পার্টির নির্দেশে 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুব কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সুশীতল রায়চৌধুরীর মত নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর-হামলা, খতম, মূর্তি ভাঙার কার্যক্রমকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিমধ্যে চীনের সাংস্কৃতিক-বিপ্লবের পরবর্তী জমানায় ভাইস-চেয়ারম্যান লিন পিয়াওকে সরিয়ে দেওয়ার পর কানু সান্যাল, সৌরেন বসু গোপনে চীন ঘুরে এসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার বিবরণ জানানোর ফলে সিপিআই(এম-এল)-এর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই(এম-এল)-এর খতমের রাজনীতি থেকে শুরু করে 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান' প্রভৃতি শ্লোগান অনুমোদন করলো না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এরই মধ্যে নকশালবাড়ির রূপজাগরণের মধ্যে নিহত ও প্রয়াত হয়েছেন চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখরা। সুতরাং ১৯৭২-৭৩-৭৪ সালে এই পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ মত-বিরোধকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম-এল) ক্রমান্বয়ে ভাঙনের দিকে এগিয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে সিপিআই(এম-এল)-এর সত্যনারায়ণ সিং, নাগী রেড্ডি, চন্দ্রপোল্লা রেড্ডি প্রমুখদের পারস্পরিক মত-বিরোধ, পুলিশী

অত্যাচার, নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার, জেলে দীর্ঘদিন আটক রাখা প্রভৃতি ঘটনা এই পার্টিকে চূড়ান্ত ভাঙনের দিকে নিয়ে যায়। যে সব রাজ্যে সিপিআই(এম-এল) প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সব রাজ্যে বিভিন্ন নামে অসংখ্য গোষ্ঠী এবং উপদল গড়ে ওঠে। এইভাবে সিপিআই(এম-এল) ভাঙনের প্রতিক্রিয়া এই পার্টির 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুব কর্মীদের মনে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪ সালের বিভিন্ন সময়ে জেলে আটক ছাত্র-যুব কর্মীদের অনেকেই মুক্তি পেতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয়ভাবে কোন পার্টিগত নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে বিশেষ করে ছাত্রকর্মীরা সম-মনোভাবাপন্ন কমরেডদের সাথে মত-বিনিময় শুরু করেন। ছাত্র কর্মীদের সম-মতাবলম্বীদের এই পারস্পরিক মত বিনিময়ই ছিল ভবিষ্যতে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রদের বিভিন্ন নামে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রক্রিয়া। এইভাবেই সত্তরের দশকে অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে সিপিআই(এম-এল) ভাঙনকেন্দ্রিক বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের ছাত্র সংগঠনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

অন্ধ্রপ্রদেশ

পি ডি এস ইউ, অন্ধ্রপ্রদেশ :

১৯৭৪ সালের ১২ এবং ১৩ই অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র কর্মীদের একটি বিরাট অংশ হায়দারাবাদ শহরে একটি ছাত্র সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলন থেকে 'পিডিএইইউ, অন্ধ্রপ্রদেশ' বা 'Progressive Democratic Students Union ; Andhra Pradesh' নামে একটি সংগঠন জন্মলাভ করে। এই সম্মেলন থেকে একটি কর্মনীতি ও সংগঠনের খসড়া প্রচার করা হয়েছিল। PDSU-এর কেন্দ্রীয় অফিস হায়দারাবাদ শহরে খোলা হয়।

সংবিধানের ঘোষিত লক্ষ্যে [Aims and objective] বলা হয়েছে— (ক) জনগণের প্রয়োজনে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা অর্জনের জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করা হবে; (খ) মেধাবৃত্তি, হোস্টেল সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় এবং অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদসহ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে সংগ্রামের জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করা হবে।[১]

ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে এই ছাত্র সংগঠনের বিশ্লেষণ ছিল—ভারত হলো বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিশেষ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার একটি নয়া উপনিবেশ।[২]

জনজীবন ও শিক্ষা সংক্রান্ত ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে PDSU অন্ধ্রের বিভিন্ন জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ দু'শকের উপর ছাত্র আন্দোলন তার শক্তি অনুসারে চালাচ্ছে। এই ছাত্র সংগঠনটি হলো, সিপিআই(এম-এল)-এর অন্যতম গোষ্ঠী 'জনযুদ্ধ গোষ্ঠী'-এর ছাত্র সংগঠন।

অন্ধ্রপ্রদেশ আর এস ইউ :

বহুধাবিভক্ত সিপিআই(এম-এল)-এর অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী হলো অন্ধ্রপ্রদেশের 'পিপলস্ ওয়ার গোষ্ঠী'। এই গোষ্ঠীর ছাত্র সংগঠনের নাম "Andhra Pradesh : Radical Students' Union" সংক্ষেপে 'RSU'। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়েই এই ছাত্র সংগঠনের উৎপত্তি। এর কার্যক্রম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক হলেও, এই সংগঠন প্রধানত গোপন

সংগঠনের ধারাকে অনুসরণ করে। RSU-এর গৃহীত ইস্তাহার ও সংবিধানে ছাত্রদের দাবির ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে ১২ দফা দাবিরও উল্লেখ আছে।[৩] সিডিউলকাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব [SC & ST] ভুক্ত ছাত্রদের দাবি নিয়ে সংগ্রামের উপর RSU বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

RSU তার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে— সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংযুক্ত শক্তিরূপে ছাত্রসমাজকে উদ্দীপ্ত করার প্রচেষ্টা চালাবে RSU।[৪]

তেলেঙ্গানা, নকশালবাড়ি এবং শ্রীকাকুলামের কৃষি বিপ্লবের পথকে অনুসরণের জন্য ছাত্রসমাজকে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয়েছে। বিশেষ করে সংগঠনের ইস্তাহারে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানান হয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। যেমন— By resecting the right of self-determination of each nationality including the right to secession as agianst the intrignes of the ruling classes, the RSU supports the proletarian path of uniting all the democratic forces of different nationalities in the peoples, democratic revolution. It therefore, whole heartedly supports the sturggles of the Kashmiris fighting for the right of self determination and the armed sturggles of the Nagas, Mizos and other North-eastern Indian people to decide for themselves their own future as a separte nationality."[৫]

আশির দশকেও RSU-এর ছাত্রকর্মীরা বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশের উপজাতি এলাকাগুলিতে তাঁদের গৃহীত কর্মনীতি অনুসারে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে হায়দারাবাদ থেকে সিপিআই(এম-এল)-এর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটির নামে একটি সাইক্লোস্টাইলড প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তিকায় ছাত্র-যুব কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে 'স্কোয়াড' করে প্রচার সংগঠিত করার জন্য 'লালসেলাম' [Red salutes] জানান হয়েছিল। এই পুস্তিকায় ছাত্র কর্মীদের বিশেষ করে RSU-র কি কি করণীয়, তার বিস্তারিত নির্দেশিকা ছিল। পুস্তিকাটি "To the student comrades of the propaganda squads launching the 'Go to Villages', Compaign" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই পুস্তিকার বক্তব্য থেকে সহজে অনুমেয় অন্ধ্রে Peoples' War গোষ্ঠী এখন যে কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করানোর সংগঠিত প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন :

১৯৭৬ সালের জরুরী পরিস্থিতির অবসানের পর সারা দেশে আবার কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসতে শুরু করে। নকশালপন্থী ছাত্ররা পশ্চিমবঙ্গে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবেই বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত অবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন শুরু করে দেয়। এই গ্রুপগুলির মূল্যায়ন অনুসারে—কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে; অপরদিকে SFI, PSU প্রভৃতি বামপন্থী ছাত্র

সংগঠনগুলির আপোষকামী, সংগ্রাম বিমুখীন হয়ে পড়েছে ও মেকী বামপন্থার লেজুর বৃত্তি করছে। তাই 'বিপ্লবী' ছাত্ররা নিজেদের নতুন করে সংগঠিত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৭৭-৭৮ সালে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন কলেজে কলেজভিত্তিক ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিশেষ করে কলকাতার কলেজগুলিতে। প্রথমে এই ধরনের যে সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হল SA [Student Association], DSA [Democratic Student Association]। SA সমূহের পক্ষ থেকে বাণীব্রত সিংহ রায় (২৩, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯) কর্তৃক SA সমূহের কর্মসূচি শীর্ষক এক পুস্তিকায় জানা যায়— রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ এবং ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজের SA, DSA সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে একটি কর্মসূচি ও সংবিধান তৈরি করেছিল। এই সংবিধানে শ্লোগান হিসাবে লেখা ছিল "স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র"। এদের কর্মসূচিতে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন-এর ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা তখনই গুরুত্বপূর্ণ— যখন সমাজে একটা রাজনৈতিক আওয়াজ জনগণ-এর সমস্ত স্তরকে নাড়া দিতে পারছে। তাই বর্তমানে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক দাবির আওয়াজ মূলত থাকবে শিক্ষামূলক চরিত্রের।"[৬]

পশ্চিমবাংলার কয়েকটি কলেজে কলেজভিত্তিক DSF [Democratic Student Federation] নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই সংগঠনটির কর্মসূচিও পূর্বোক্ত সংগঠনগুলির অনুরূপ।

ডি এস সি সি :

কলেজভিত্তিক ছাত্রসংগঠনগুলিকে একটি মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগের ফলে ১৯৮০ সালে 'DSCC' [Democratic Students Co-ordination Committee] নামে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগঠনের জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গে। SA, DSA, DSF নামক ছাত্র সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তিতেই এই DSCC গড়ে উঠেছিল। কিন্তু DSCC-র সমন্বয়কারী ভূমিকা অচিরেই নিঃশেষ হতে থাকে। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন ওঠে। ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যায়ে DSCC ভেঙ্গে জন্ম নেয় আরও দুটি ছাত্র সংগঠনের।

আই এস এ :

DSCC ভেঙ্গে যাঁরা বেড়িয়ে এসেছিলেন সেই ছাত্রদের একটি সংগঠনের অংশের দ্বারা গঠিত ছাত্র সংগঠনের নামই হলো ISA (Indian Student Association)। ISA-এর প্রথমে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বীরভূম জেলার বোলপুরে। বোলপুর সম্মেলনে একটি কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিতে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"আই-এস-এ স্বভাবতই সচেতন যে বিদেশী পুঁজি ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা শাসকজোটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আপোষহীন তীব্র আন্দোলন ব্যতীত সমগ্র দেশের ছাত্রদের কোনও সমস্যাই ভারতের মতো মহান দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমাধিত হতে পারে না— আই-এস-এ তাই এই বিদেশী লুণ্ঠক এবং যে দেশীয় সেবাদাস শক্তি এই শোষণকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাদের ধ্বংস সাধনের শপথ গ্রহণ করেছে।"[৭]

ISA নিজেদের একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগঠন রূপেই পরিচিত করে। এই সংগঠনটির ঘোষণা করা হয়েছিল দিল্লি থেকে ।

এ বি এস এ :

DSCC থেকে বেড়িয়ে আসা আবার আরেকটি অংশের ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ছাত্র সংগঠনের নাম ABSA [All Bengal Students Association]। এই সংগঠনটি বিনোদ মিশ্র পন্থীদের। ABSA-এর আহ্বায়কমন্ডলীর পক্ষে প্রভাস চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক জুপিটার হতে মুদ্রিত পুস্তিকায় এই সংগঠনের লক্ষ্য বর্ণনায় বলা হয়েছে— "ছাত্র আন্দোলনের বিপ্লবী দিশা প্রণয়নের গুরুত্ব, বাস্তব সংগ্রামের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গঠে তোলা আজ পরিস্থিতির দাবি। আমরা সেই দাবিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ।"[৮] এই সংগঠনের কর্মসূচিগত রাজনৈতিক শ্লোগান ছিল— "ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের বিরূদ্ধে জঙ্গী গণসংগ্রাম গড়ে তুলুন" এবং "রাশিয়া ও আমেরিকা, বিশেষত রাশিয়ার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠনের বিরূদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন।"[৯]

ABSA মূলত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠন।

কলেজ কেন্দ্রিক সংগঠন সম্পর্কে অন্য একটি মত :

"প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ও দাবিগত কর্মসূচি সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা" শীর্ষক বাংলাভাষায় লিখিত একটি পুস্তিকা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তিকার কোন প্রেস লাইন নেই এবং কারা প্রকাশ করেছেন তারও কোন সন্ধান নেই। কিন্তু পুস্তিকাটির ২১ পাতার পরিশিষ্টে যা লেখা হয়েছে. তা থেকে কলেজকেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠনগুলি কেন একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে মিলিত হতে পারলো না—তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে। পরিশিষ্ট-টি হুবহু তুলে দেওয়া হল—

পরিশিষ্ট : "উপরের কর্মসূচিটি হস্তলিখিত আকারে প্রচারিত হবার কয়েক মাস পরে ডি.এস.সি.সি.-র কিছু কর্মী পৃথক পৃথকভাবে দুটি পৃথক ছাত্র সংগঠননের জন্ম ঘোষণা করেছেন—একটি দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় স্তরের আই.এস.এ., অপরটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যস্তরে এ.বি.এস.এ। বলা বাহুল্য "ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সংগ্রামের জন্য" আই.এস.এ-র ঘোষিত কর্মসূচি ও সংবিধানের সঙ্গে 'এস.এফ.আই' জাতের সংগঠনগুলির কোন মৌলিক পার্থক্য নেই বরং বহুল সাদৃশ্যপূর্ণ, এক রুশ-মার্কিন প্রসঙ্গ ছাড়া। আর এ.বি.এস.এ.-র তো কোন কর্মসূচিই প্রাথমিক ঘোষণার সাথে ঘোষিত হয়নি। তাদের প্রচারিত অংশ থেকে দেখা যায় যে, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিষয়গত অবস্থার উপর নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য নেই, কেবল আছে কতগুলি বুলি। বুলি সর্বস্বতার দ্বারা সমাজের কোন স্তরকেই নাড়া দেওয়া যায় না ; ছাত্রদেরও না। পরন্তু এই সংগঠন দুটি ঘোষণা করে (যার সঙ্গে ছাত্র জনগণের সম্পর্ক বাহ্যিক ও ক্ষীণ) দুটি অংশের নেতৃত্ব ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করেছেন মাত্র, কোন সমাধান দিতে পারেননি। তাঁরা যদি প্রকৃতই দেশের সার্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের স্বার্থে ছাত্র আন্দোলনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ধারার সঙ্গে থেকে একযোগে চলতে চান তবে তাদের উচিত মনোগত ধারায় যান্ত্রিক সংগঠন গড়ার পন্থা পরিহার করে ছাত্রদের মধ্যে আসা, বিষয়গত অবস্থানগুলি জানা এবং বিষয়গত অবস্থাকে পরিপক্ক করে তোলা।"

ছাত্র সংগঠনগুলির বিভিন্ন পত্রিকা ও গোষ্ঠী :

১৯৭৭ সালে দেশের সামগ্রিক নতুন পরিস্থিতিতে নকশালবাড়িপন্থী 'বিপ্লবী' ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি সংগঠিতভাবে অথবা কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই সমস্ত পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও 'বিপ্লবী' ছাত্রদের কিছু কিছু গোষ্ঠীগত কার্যকলাপ চলে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই ধরনের উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলি হলো— ছাত্র ঐক্য, আহ্বান, ছাত্রফৌজ, ছাত্র বুলেটিন, ছাত্রদিশা, আমার দেশ, নিশান। উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা হলো— সমকালীন অভিব্যক্তি।

পশ্চিমবাংলার ছাত্র ঐক্য পত্রিকা ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসের সংখ্যায় DSCC, ABSA, ISA প্রভৃতি ছাত্রসংগঠনের ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে, সেসব বাধা সম্পর্কে একটি প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে পারস্পরিক মতামত বিনিময় নতুন করে শুরু করেছিল। কিন্তু কোন কোন সংগঠন সাড়া দিলেও সকলে সমানভাবে সাড়া দেয়নি। 'ছাত্রঐক্য'-র পক্ষ থেকে ঐক্য তথা জনজীবনে সমস্যা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ইস্যুগুলিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ [Joint Action Committee] গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবিত Joint Action Committee বা JAC প্রশ্নে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত হবার ফলে এই উদ্যোগও কার্যকরী হতে পারেনি। 'ছাত্রঐক্য' পত্রিকা ১৯৮৩-৮৪ সালে 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন' শীর্ষক দুটো আলোচনা সভার আয়োজন করে এ সময়কার ছাত্র আন্দোলনের মূল্যায়ন করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে এই পত্রিকার উদ্যোগে ষাটের দশকের নকশালবাড়িপন্থী ছাত্রনেতাদের সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হতে শুরু করে । ১৯৮৫-র জানুয়ারি সংখ্যায় শৈবাল মিত্রের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। যার মূল কথা ছিল—এ ব্যাপারে আমরা সে সময়ে বেশ কিছু ভুল করেছিলাম। আত্মসমালোচনার অবশ্যই দরকার আছে । আমাদের রাজনৈতিক অস্বচ্ছতার জন্যই ছাত্র সংগঠনের গণচরিত্রকে শেষ দিকে ঠিকমত ধরে রাখতে পারিনি।"[১০]

এই পত্রিকাগুলিও শেষ পর্যায়ে নিয়মিত প্রকাশ করা যায়নি। ৯০-এর দশক শুরুর অনেক আগেই অধিকাংশ এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। পত্রিকাকেন্দ্রিক গোষ্ঠিগুলির ছাত্র আন্দোলনগত কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে গেছে ।

পি.ডি.এস.এফ. :

প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশন সংক্ষেপে P.D.S.F পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক একটি ছাত্র সংগঠন। এই সংগঠনটিও ৭০-এর দশকের শেষ পর্যায়ের সমসাময়িক সংগঠন। এই সংগঠনের পক্ষে প্রচারিত সাইক্লোস্টাইলড খসড়া কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। যেমন— "আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও পাশাপাশি চলছে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ। এই অবস্থায় দিশাহারা ছাত্রসমাজে সরকার নির্ভরশীল SFI, PSU, এবং সংস্কারপন্থী DSO সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলির দেউলিয়া রাজনীতি আর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাতে পারছে না। নিপীড়িত জাতি, জাতিসত্ত্বা এবং অঞ্চলভিত্তিক গড়ে ওঠা বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে আজ এক নতুন জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এর উপর ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি, হতাশার পাশাপাশি চেপে বসে আছে ক্যারিয়ারসর্বস্ব 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'-র আত্মকেন্দ্রিক আদর্শ। এই অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

যে সমস্ত শক্তি ছাত্রদের সংগঠিত করছে, সরকার নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে, বিপ্লবী দিশায় ছাত্রদের পথ দেখাতে চাইছে— পি. ডি.এস.এফ তাদেরই সারিতে।"[১১]

PDSF নিজেই তার গঠনতন্ত্রে ঘোষণা করেছে— এটি একটি অন্তবর্তীকালীন চরিত্রের সংগঠন। একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে উঠলে প্রয়োজনে সে ঐ কেন্দ্রীয় সংগঠনের সাথে মিশেও যেতে পারে ।

ডি এস সি (পঃবঙ্গ) :

ডি এস সি (পঃবঙ্গ) অর্থাৎ Democratic Student Centre [W.Bengal] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যভিত্তিক একটি ছাত্র সংগঠন। RSP দলের বিক্ষুব্ধদের নিয়ে M.L.G. [Marxist-Leninst group] নামে যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেই MLG-র ই ছাত্র সংগঠন হল এই DSC। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, খড়গপুর, মেদিনীপুরের আরও দু'একটি কলেজে এই সংগঠনের কিছু কার্যক্রম ৮০-র দশকের শুরুতে লক্ষ্যণীয় ছিল। সিপিআই(এম)-এর বিক্ষুব্ধদের অন্যতম একটি সংগঠন 'গণসংগ্রাম প্রস্তুতি কমিটি'-র কিছু ছাত্রকর্মীও এক সময় DSC-র সাথে যুক্ত হয়েছিল। "ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংকলন" পুস্তকটি DSC-র রাজ্য কমিটির পক্ষে শ্যামল মজুমদার প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটিতে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অনেক তথ্য-বিবরণের সংগ্রহ রয়েছে। DSC ছাত্রদের শিক্ষাগত সমস্যার ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অনেক নকশালবাড়িপন্থী ছাত্ররাও এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে সংগঠনের প্রসার ঘটেনি।

এ.বি.এম.এস.এ.সি. :

ABMSAC [ALL Bengal Medical Students Action Committee] মেডিক্যাল ছাত্রদের সংগঠন। ষাটের দশক থেকে পশ্চিমবাংলার মেডিক্যাল ছাত্রদের আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ ; দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৭; তৃতীয় পর্যায় ১৯৭৭-এর পরবর্তী বৎসরগুলি। এই সময়ে All Bengal Junior Doctor Federation [ABJDF]-এর আন্দোলনের সময় মেডিক্যাল ছাত্রদের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। মেডিক্যাল ছাত্রদের নিজস্ব শিক্ষাগত দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই গড়ে ওঠে All Bengal Student Action Committee। এই সংগঠনের প্রথম আন্দোলনগত সাফল্য হলো— North Bengal Medical College [NBMC]-এর স্বীকৃতি বাতিলের আদেশকে প্রতিরোধ। এরপরই এই সংগঠনটি দলমত নির্বিশেষে মেডিক্যাল ছাত্রদের একটি জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল ছাত্রদের শিক্ষাগত সমস্যা বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজগুলিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে কলেজগুলির ছাত্রদের সাথে সমন্বয় গড়ে তোলার প্রশ্ন দেখা দেয়। R.G. Kar Medical College [RGKMC] এবং Calcutta National Medical College [CNMC]-র ছাত্ররা এগিয়ে এসে "Convening Body of Medical Students Forum" নামে একটি অস্থায়ী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এই অস্থায়ী সংস্থাটি মেডিক্যাল ছাত্রদের শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চালায়। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন এবং

মেডিক্যাল ছাত্রদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দলগুলির ছাত্রসংগঠন সমূহের চেয়ে এই নতুন চিন্তার অনুসারী (যা বহুলাংশে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের চিন্তা-ভাবনা প্রসূত) ছাত্রদের প্রভাব ৮০-র দশকের শেষ প্রান্তেও ক্রমবর্ধমান।

এ.আই.এস.এ.:

A.I.S.A.[All India Students Association] একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সংগঠন। আশির দশকে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। বিনোদ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন সিপিআই(এম-এল) গোষ্ঠীর গণফ্রন্ট IPF [Indian People's Front]-এর ছাত্র সংগঠন হলো এই AISA। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য— Education ! Progress !! Democracy !!! কয়েক বছর ধরেই AISA বিপ্লবী গণতন্ত্রের [Revolutioary Democracy] জন্য ছাত্র আন্দোলনের একটি জাতীয় কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রচেষ্টায় ফলস্বরূপ ১৯৯০-এর ৯ থেকে ১১ আগস্ট Allahabad University Union Hall-এ প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় সম্মেলন সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় AISA-এর সাথে আরও অনেক ছাত্র সংগঠন সামিল হয়েছিল। যে ছাত্র সংগঠন সামিল হয়েছিল তারা হলো— Progressive Students Organisation (PSO,UP) All Bihar Students Union (ABSU), All Bengal Students Association (ABSA), All Tamil Students Association (ATSA), Forum for Students Union (FSU, Andhra Pradesh), Panjab Students Union (PSU), All Tripura Students-Youth Association, Karbi Anglong Students Union (KASU), AISA, Preparitory committee, Delhi.

এই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন IPF-এর জাতীয় সভাপতি নাগভূষণ পট্টনায়ক। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের বাইরের অনেক দেশের ছাত্রনেতারা যোগ দিয়েছিলেন। যে সব দেশের ছাত্রনেতারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, সে দেশগুলি হলো যথাক্রমে— অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইনস, হংকং, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা। তাছাড়া ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্প সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের এই জাতীয় সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন উত্তরপ্রদেশের লালবাহাদুর সিং এবং সহ-আহ্বায়ক ছিলেন বিহারের ধীরেন্দ্রকুমার ঝাঁও, বাংলার অনিন্দ্য সেন। সম্মেলন থেকে যুক্ত আন্দোলনের প্রয়োজনে একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ [Joint Front] গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।

অন্যান্য রাজ্য

সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'বিপ্লবী' ছাত্রদের আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই সংগঠনগুলির একটি রাজ্যগত পরিচিতি যথাক্রমে—

উত্তরপ্রদেশ : Progressive Students Union (PSO)-র প্রভাব এলাহাবাদ, বারানসী, প্রয়াগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনের হিন্দিভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 'সমকালীন অভিব্যক্তি' উল্লিখিত অঞ্চলের ছাত্রসমাজের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল।

বিহার : বিহারে All Bihar Students Union (ABSU)-এর প্রভাব পাটনা এবং পাটনার সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

তামিলনাড়ু : তামিলনাড়ুর All Tamil Students Association (ATSA)-এর প্রভাব রাজধানী মাদ্রাজকেন্দ্রিক ।

অন্ধ্রপ্রদেশ : RSU এবং PDSU ছাড়াও FSU নামে আরেকটি ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে।

পাঞ্জাব : পাঞ্জাবে এই ধরনের সংগঠনটির নাম Panjab Students Union (PSU)। চন্ডীগড় এবং জলন্ধরে এই সংগঠনের সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

ত্রিপুরা : ত্রিপুরাতে ছাত্র এবং যুব কর্মীদের মিলিতভাবে সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এই মিলিত সংগঠনের নাম All Tripura Students-Youth Association.

সি পি আই (এম-এল) ভাঙন পরবর্তী 'বিপ্লবী' ছাত্রদের যে ছাত্র সংগঠনগুলি উপরে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে গড়ে উঠেছিলন ১৯৯০-এর শেষ প্রান্তে তাদের অধিকাংশ-ই নিষ্ক্রিয়। ১৯৭০-৮০-র দশকে এই সকল সংগঠনের রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ও অগ্রগতি বিশেষ কিছু ঘটেনি। ষাটের দশকের 'বিপ্লবী' বা 'র‍্যাডিক্যাল' ছাত্রসমাজ যেভাবে সমাজ বিপ্লবের রাজনীতিতে উদ্দীপ্ত হয়েছিল ৭০-৮০ দশকে অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্র আন্দোলনের গতিমুখকে ষাট দশকাভিমুখী করা যায়নি।

তথ্যসূত্র :

১। হায়দ্রাবাদ থেকে Nacena Printers কর্তৃক মুদ্রিত PDSU-এর Constitution [Draft]-এর ভূমিকা থেকে গৃহীত।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ২
৩। Andhra Pradesh Radidal Students' Union : Manisfesto and Constitution-এর ৮-৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৫।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৭-৮ ।
৬। S.A. সমূহের কর্মসূচি, পৃষ্ঠা ২।
৭। ISA-এর কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র; পৃষ্ঠা ২।
৮। ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন— শ্রমিক কৃষকের সাথে একাত্ম হোন। (কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলুন) শীর্ষক পুস্তিকার ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৯। ঐ
১০। ছাত্র ঐক্য/১৫ জানুয়ারি, ৮৫; পৃষ্ঠা ৬।
১১। PDSF-এর কর্মসূচি ও গঠণতন্ত্রের খসড়ার প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিকতা-জাতি-ধর্মভিত্তিক এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠন

আঞ্চলিক ছাত্র সংগঠন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছাত্র আন্দোলনের শুরুর পর্বে ভারতের সব জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নামে সে যুগে ছাত্র সংগঠনের নামকরণের প্রবণতা দেখা যায়নি। উপজাতি বা খন্ডজাতি কিংবা কোন বিশেষ অঞ্চলের নামে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা এবং ঐ ধরনের ছাত্র সংগঠনের নামকরণ করার ঘটনাও ছিল বিরল। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যপর্বে 'মুসলিম ছাত্র লীগ' নামে একটি এই ধরনের ছাত্র সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেনি অথবা ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান ছাত্রদের সংগঠিত করার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও এই সংগঠন গ্রহণ করতে পারেনি।

কিন্তু ভারত বিভক্ত হবার প্রাক্কালে এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-অঞ্চলের ভিত্তিতে ছাত্র সংগঠন গড়ার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিতেও এই ধরনের সংগঠন বেশি সংখ্যায় গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অসম অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পরিণতিতে যে আঞ্চলিকতাবাদ জন্মলাভ করেছে, সে আঞ্চলিকতাবাদের ভিত্তির উপরেই বিশেষ করে গড়ে উঠেছে অনেক আঞ্চলিক ছাত্র সংগঠন। সমস্যা সংকুল উত্তর-পূর্ব ভারতে এই স্তরের সংগঠন গড়ার প্রবণতা বেশি। দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির ট্র্যাডিশনাল ছাত্র সংগঠনের বেড়াজাল-কে ছিন্ন করেই এই ধরনের সংগঠনের আওতায় ছাত্র সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ যোগ দিচ্ছে ।

এইরূপ ছাত্র সংগঠনের কিছু পরিচিতি খুবই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে :

'আসু' (AASU) : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে আসাম রাজ্য কয়েকবার বিভক্ত হয়েছে। এই বিযুক্তিকরণের প্রধান কারণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে এই রাজ্যের দীর্ঘদিনের অনগ্রসরতা। তদুপরি রয়েছে আসাম রাজ্যের জাতি, উপজাতি, পার্বত্যজাতি, খন্ডজাতিগুলির ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতিগত অসংখ্য সমস্যা। আসাম রাজ্যের সামগ্রিক অনগ্রসরতা, জাতিগত বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে বারবার বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়েছে। এই আঞ্চলিকতাবাদ থেকে এসেছে প্রাদেশিক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতি, সন্ত্রাসবাদ এবং শেষ পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রবণতা।

ভারতের আসাম এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদেরও কিছু অংশের দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশী অভাবী মানুষ ঐ সীমান্ত

অতিক্রম করে আসাম রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া এই অনুপ্রবেশ ধারাবাহিকভাবেই ঘটে চলেছে। দেশভাগজনিত কারণে হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুদের কিছু ভারও আসাম রাজ্যের কাছাড়, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জেলাকে বহন করতে হয়েছে। অনগ্রসর আসামের উপর এই অতিরিক্ত বোঝা অসমীয়া জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাদের নিজেদের স্বার্থে আসামের পরিস্থিতিগত এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে তৎপর হয়ে উঠল।

কর্মসংস্থান, চাকরি ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে আসামের ছাত্র-যুব সমাজকে উত্তেজিত করার প্রচেষ্টা চললো। 'আসাম অসমীয়াদের জন্য' এই ধরনের আঞ্চলিকতাবাদী শ্লোগান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তুলে দেওয়া হল। শ্লোগান পর্যবসিত হলো 'বিদেশী বিতারণ' নামক আন্দোলনে।

আসামের পরিস্থিতিতে এই পটভূমিতেই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে অসমীয়া ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'আসু'[AASU বা All Assam Student Union] নামে ছাত্র সংগঠন। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে এবং আসাম রাজ্যে জনতা পার্টি-র নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হলে AASU 'বিদেশী বিতারণ আন্দোলনে' প্রধান ভূমিকায় আসতে শুরু করে। আন্দোলন গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ অতিক্রম করে সন্ত্রাসবাদী ঝোঁকে এবং কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জনতা পার্টির সরকারের আমলেও এবং জনতা পার্টির সরকারের কেন্দ্র ও রাজ্যে অপসারণের পরেও 'আসু'-র নেতৃত্বাধীন বিদেশী বিতারণ আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সামরিক বাহিনীর প্রচন্ড দমনমূলক অভিযান, অপারেশন, কোন কিছুতেই আন্দোলন দমন সম্ভব হল না। ছাত্র-যুবকরা দলে দলে গ্রেপ্তার হল, খুন হল। অসমীয়া জনগণের এক বিরাট অংশ AASU-র নেতৃত্বের পাশে এসে দাঁড়াল। ১৯৮০-৮৪ তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দীর্ঘ চার বৎসর প্রচেষ্টা করেও আন্দোলন দমন করতে পারলেন না, মীমাংসার কোন পথ খুঁজে পেলেন না। 'নেলী'-র মত গণহত্যার ঘটনাও আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এই প্রথম একটি ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির করণীয় ভূমিকাকে নস্যাৎ করে বা দাবিয়ে রেখে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে এল। আসামে সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে ছাত্র সংগঠন AASU-র সাথেই বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে এবং আলোচনার টেবিলে বসতে হয়েছে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 'আসু'-র প্রধান ঘাঁটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হোস্টেলগুলি আন্দোলন পরিচালনার এক-একটি দুর্গে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহুবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও এবং হোস্টেলে পুলিশ মিলিটারী অভিযান চালিয়েও AASU-র ঘাঁটি তুলে দেওয়া যায়নি।

কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন 'আসু'-র আন্দোলনের বিরোধিতা করেও অসমের ছাত্র সমাজকে বিদেশী বিতাড়নের আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন SFI-এর গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি জগন্নাথ দাস এবং সম্পাদক ইসফাকুর রহমানের এক যৌথ আবেদনে [১লা এপ্রিল, ১৯৮১] জানা যায়, AASU-র সাথে প্রগতিশীল শিক্ষক ছাত্রদের অনেকগুলি সংঘর্ষ, মারামারির ঘটনা ঘটেছে। যেমন—১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে, ১৯৮০ সালের জুনে, ১৯৮১ সালে ২৫শে মার্চ। SFI-এর মতে AASU-র আন্দোলন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং উপজাতীয়বাদী।

AASU-র আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্লেষণ যা-ই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলন কতিপয় শিক্ষক বা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীর ছিল, এই আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন ছিল অসমীয়া জনগণের।

তাই ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী রূপে আসামে সমস্যা সমাধানের জন্য 'আসু' উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সে 'চুক্তি' অনুসারে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিধানসভা নির্বাচনে AASU-এর নেতৃত্বাধীন ছাত্র যুবকরা 'অসম গণপরিষদ'-এর নামে [অ.গ.প.] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল এবং 'আসু'-র ছাত্রনেতা প্রফুল্ল মহন্তের নেতৃত্বে অ.গ.প. গঠন করল রাজ্য সরকার। প্রফুল্ল মহান্তের মন্ত্রীসভায় অধিকাংশ মন্ত্রী-ই ছিলেন ছাত্র-যুবনেতা। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে কোন একজন ছাত্রনেতার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রফুল্ল মহান্তের মন্ত্রীসভা তারই ছাত্র আন্দোলনের সহকর্মী বন্ধুদের সাথে মতবিরোধে জর্জরিত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত আসামে উলফা প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ বৃদ্ধিজনিত আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে ১৯৯১ সালে চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রফুল্ল মহান্তের নেতৃত্বাধীন সরকারকে খারিজ করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে। এইভাবেই আসামে ছাত্র সংগঠন 'আসু'-র ছাত্র নেতাদের প্রায় ৫ বৎসরের রাজ্য শাসনের অবসান ঘটে। আঞ্চলিকতাবাদ ও জাতিসত্ত্বার দাবির উপর ভিত্তি করে অসমীয়া ছাত্ররা ইতিহাসে এই নজির স্থাপন করেছেন।

ABSU এবং ATSU : জাতিসত্তার দাবির আন্দোলনের উপর ভিত্তি করেই আসামে আরও দুটি ছাত্র সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। একটি হলো— ABSU [Asam Boro Students Union] এবং অপরটি হলো— ATSU [Asam Tribal Students Union] । কিন্তু এই দুটি সংগঠন উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাচ্ছে।

কার্বি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন : দেশবিভাগের পর ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্য আসামে জাতি উপজাতি সমস্যা প্রচন্ডভাবে দেখা দেয়। পার্বত্য জাতি, উপজাতি, খন্ডজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ও জেলাগুলি নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুসারে স্বায়ত্তশাসন, আলাদা রাজ্যগঠন, জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের দাবি উত্থাপন করে। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনও গড়ে তুলে। উত্থাপিত দাবিগুলি অর্জনের লক্ষ্যে নাগা এবং মিজোরা বিদ্রোহীবাহিনী তৈরি করে সশস্ত্র সংগ্রামে দীর্ঘদিন লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সংবিধান সংশোধন করে আসাম রাজ্যকে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল, মেঘালয় নামে নতুন রাজ্য পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুটি পার্বত্য জেলা কার্বি এ্যালং [Karbi Anglong] এবং কাছার পার্বত্য জেলা [N.C.Hills District] আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বর্তমান কার্বি এ্যালং জেলা গঠিত হয়েছে পার্বত্য মিকিরকে পুনর্গঠনের সময়।

কার্বি পার্বত্য জাতির ভাষা কার্বি। এই কার্বি ভাষা ও তার সংস্কৃতির উন্নতিসাধনের প্রয়াসে কার্বি পার্বত্যজাতির মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। কার্বি এ্যালং এবং উত্তর কাছার পার্বত্য জেলাকে একত্র করে একটি Autonomous State গঠনের দাবিতে আন্দোলনও চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

এই পটভূমিতেই ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই তখনকার মিকির ও উত্তর কাছার নিয়ে

যুক্ত পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কার্বি এ্যালং-এর দিলাজী বেসিক এল. পি. স্কুল ডিফু-তে কার্বি ছাত্রদের এক সম্মেলন থেকে 'Karbi Students Association' তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠনটিই পার্বত্য কার্বি জাতির ছাত্রদের সব চাইতে পুরাতন সংগঠন। প্রায় ৩১ বৎসর ধরে এই ছাত্র সংগঠন কার্বি পার্বত্যজাতির ছাত্র এবং জনগণের বিভিন্ন দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক পথেই ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে। Karbi Students Association-এর সংক্ষিপ্ত নাম K.S.A.। K.S.A. এর প্রধান দপ্তর Diphu-782460, Karbi Anglong-এ অবস্থিত। KSA-এর একটি নিজস্ব সংবিধানও আছে।

১৯৮৫ সালের ২, ৩, ৪ ডিসেম্বর চুকিহলা-তে অনুষ্ঠিত ১৫তম সম্মেলনে KSA-এর সংবিধান সংশোধনীসহ গ্রহণ করা হয়। এই সংবিধানের Article No. 2 : Aim & Object-এর e এবং f ধারাটি লক্ষ্যণীয়। এই দুটি ধারায় রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা বলা হয়েছে। যেমন— "(e) The K.S.A. pledge to support the right of the exploited nationalities to self determination (economic, social, political) in their localities and to resist colonial exploitation and capitalist economy. এবং "(f) To inspire the idology of scientific socialism in the minds of the students community for establishing socialism."

কার্বি ভাষায় এই সংগঠনের নাম— "Karbi Lo Charli Asoing." ১৯৮৭ সালের ১৮ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট Karbi Anglong এবং North Cachar Hills-কে নিয়ে একটি 'Autonomous State' গঠনের দাবিতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে Karbi Students Association-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বরসিং রংপহার [Borsing Rongphar] এবং Autonomous State Demand Committee-র পক্ষ থেকে আহ্বায়ক ভরতকুমার তিসাং স্বাক্ষর করেছিলেন। এই স্মারকলিপির ভিত্তিতে এই পার্বত্য অঞ্চলে এখনো গণ-আন্দোলন চলছে। এদের গণআন্দোলনে বিদেশী বিতারণের দাবিও রয়েছে। এই অঞ্চলের গণ-আন্দোলনে Karbi Students Association অন্যতম উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বদানকারী সংগঠন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে এই ছাত্র সংগঠন তাদের একটি আদর্শ বলেন মনে করে, তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এদের সংবিধানে উল্লিখিত আছে।

এ. জে. এস. ইউ : স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবির আন্দোলনে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণার উপজাতিভুক্ত ছাত্র সমাজের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অঞ্চলের ছাত্রদের শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন এ. জে. এস. ইউ [All Jharkhand Students Union— A.J.S.U.]। ছাত্রনেতা বেসরার নেতৃত্বাধীন এই ছাত্র সংগঠনটি ঝাড়খন্ডী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠিত শক্তি। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সংগঠনের শাখা সংগঠন আছে। ১৯৮৯-এর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ঘাটশিলা অঞ্চল থেকে AJSU-এর ছাত্রনেতা সুরজ সিং বেসরা নির্বাচিত হন। বিহারের এই অংশের জনসাধারণের মধ্যে AJSU-র জনপ্রিয়তা আছে।

জি এন এল এফ : পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় "গোর্খা জাতীয় মুক্তি মোর্চা"-র [GNLF]

নেতৃত্বে স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য গঠনের যে আন্দোলন ১৯৮৭ থেকে যে চরম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তার অন্তরালেও গোর্খা ছাত্র সমাজের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। GNLF-এর নেতা সুভাষ ঘিসিং পরিকল্পিতভাবেই দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের গোর্খা ছাত্রদের আন্দোলনে টেনে আনার জন্য 'Gorkha National Student Federation' সংক্ষেপে GNSF নামে ছাত্র সংগঠন তৈরি করেছিলেন। GNSF একটি আঞ্চলিক ছাত্র সংগঠন। এই সংগঠনের কার্যকলাপ দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলেও সীমাবদ্ধ।

তথ্যসূত্র :

১। An Appeal : Rally To Resist the Anti-Academic Forces in the Gauhati University; Page 2.

জাতি-ধর্মভিত্তিক ছাত্র সংগঠন

শিখ ছাত্র ফেডারেশন : শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক দল হিসাবে আকালী দলের প্রতিষ্ঠা দীর্ঘদিনের। কিন্তু সরাসরি 'শিখ' নাম ব্যবহার করে কোন রাজনৈতিক দল পরাধীন বা স্বাধীন ভারতে এখনো গড়া হয়নি। স্বাধীন ভারতে ৭০-এর দশকে 'আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব'-কে কেন্দ্র করে 'খালিস্তান' বা শিখদের জন্য আলাদা 'শিখস্থানের' দাবি সোচ্চার হলে ধর্মের ভিত্তিতে শিখ জাতির স্বাতন্ত্রতার প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উঠতে শুরু করে। 'খালিস্থানের' দাবিতে শুরু হয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরুর সন্ধিক্ষণেই পাঞ্জাবে 'শিখ ছাত্র ফেডারেশন' গড়ে ওঠে এবং পাঞ্জাবের প্রায় সব শহরে এই সংগঠনের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। অমৃতসর স্বর্ণমন্দির থেকে সন্ত্রাসবাদীদের অপসারণের সময় 'শিখ ছাত্র ফেডারেশন'-এর অসংখ্য কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিল। বিভিন্ন গুরুদ্বারে 'শিখ ছাত্র ফেডারেশন'-এর অসংখ্য কর্মীর অবস্থান আছে এবং এদের সাথে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ আছে— এই মর্মে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে গত এক দশক ধরে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ছাত্র ফেডারেশন-এর আগে 'শিখ' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যেই জাতি ও ধর্মগত আশা-আশঙ্কার অভিব্যক্তি প্রছন্নভাবে লুক্কায়িত।

পাঞ্জাবের শিখ ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক এবং সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন। তারাও প্রতিক্রিয়া ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। এই জন্য-ই 'শিখ ছাত্র ফেডারেশন' সমগ্র শিখ ধর্মাবলম্বী ছাত্র সমাজের একমাত্র সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শুধু ধর্মীয় বা জাতিভিত্তিক সংগঠন নয়, উপরন্তু আঞ্চলিকতাবাদী ছাত্র সংগঠনের সাথে এর মিল বেশি।

বিদ্যার্থী পরিষদ: 'বিদ্যার্থী পরিষদ' সংক্ষেপে B.P. একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন। ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে এককথায় বিদ্যার্থী পরিষদকে সাম্প্রদায়িক অথবা জাতি-ধর্মগত চরিত্রের ছাত্র সংগঠনরূপে চিহ্নিত করাও কঠিন। অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট এই সর্বভারতীয় স্তরের ছাত্র সংগঠনটিতে প্রায় সব ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু না কিছু সংখ্যায় অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই, একে শুধু 'হিন্দু' ছাত্রদের সংগঠনরূপে চিহ্নিত করা যায় না।

কিন্তু বিদ্যার্থী পরিষদের রাজনীতি অনুশীলনের ধারাবাহিকতার পশ্চাতে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। প্রথমে হিন্দু মহাসভা, পরে জনসঙ্ঘ এবং তার ওপরে ভারতীয় জনতা পার্টি-র রাজনীতির মৌল বিষয়বস্তুতেই বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র রাজনীতিকে অনুসরণ করে চলেছে। বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টি-র এই ক্রমরূপান্তরের ধারাবাহিকতা থেকে বিদ্যার্থী পরিষদকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যাবে না। বিদ্যার্থী পরিষদ ভারতীয় জনতা পার্টির অতীত রূপান্তরের ধাপগুলির সাথে সব সময়ই যুক্ত থেকেছে এবং বর্তমান পর্যায়ে বি জে পি বা ভারতীয় জনতা পার্টির ছাত্র সংগঠনরূপে 'অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ' পরিচিত।

হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ, ভারতীয় জনতা পার্টি-র এই রাজনৈতিক স্তরগুলি ঐতিহাসিকদের একটি বিশিষ্ট অংশের মতে সব সময়েই প্রধানত উগ্রহিন্দু জাতীয়তাবাদ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বোপরি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। এই অর্থে হিন্দু জাতি ও ধর্মগত স্বার্থের সাথে উল্লিখিত রাজনীতির চিন্তা-ভাবনার নৈকট্য সর্বাধিক। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন ব্যতিক্রম সাধারণভাবে ধরা পড়ে না। এইজন্যই ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বামপন্থী, মধ্যপন্থী প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলি বিদ্যার্থী পরিষদ-কে উগ্রহিন্দু জাতীয়তাবাদী কিংবা হিন্দু সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনরূপে মনে করে এবং চরিত্রায়ণ করে। অপরপক্ষে এই কথাও স্মরণীয়— বিদ্যার্থী পরিষদ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগকে কখনো স্বীকার করে না।

বিদ্যার্থী পরিষদের সংগঠন শক্তি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে, এমনকি রাজধানী দিল্লিতে খুবই শক্তিশালী। তাছাড়া এইসব রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের ছাত্র ইউনিয়নগুলির অধিকাংশ-ই বিদ্যার্থী পরিষদ পরিচালনা করে। ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে এইসব রাজ্যে বিদ্যার্থী পরিষদ এক জবরদস্ত শক্তিশালী, সংগঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। শুধু হিন্দিভাষী রাজ্য নয়, ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই বিদ্যার্থী পরিষদের শাখা সংগঠন গড়ে উঠেছে। ১৯৯০-এর দশকে বিদ্যার্থী পরিষদের শক্তিও ক্রমবর্ধমান।

অ-কমিউনিস্ট বামপন্থীদল প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন

ভারতের অ-কমিউনিস্ট বামপন্থীদের দলগুলি প্রকৃতপক্ষে রাজ্যস্তরের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তুলনায় অকমিউনিস্ট বামপন্থী দলগুলির সংগঠনশক্তি, জনভিত্তি, বিস্তার খুবই দুর্বল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরায় এদের সংগঠন শক্তি সীমাবদ্ধ।

আর.এস.পি., ফরওয়ার্ড ব্লক, এস.ইউ.সি., আর.সি.পি.আই, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী দলগুলি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে। উল্লিখিত এই দলগুলি গড়ে ওঠার পরে এদের অন্যতম গণ সংগঠন রূপে ছাত্র সংগঠনও গড়ে তুলেছিল। এদের এই ছাত্র সংগঠনগুলিরও 'বামপন্থী ছাত্র সংগঠন' রূপে পরিচিত। প্রথমে অবিভিক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরে বিভক্ত দুই কমিউনিস্ট পার্টি CPI এবং

CPI(M) -এর ছাত্র সংগঠনের সাথেই এই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ঐক্য ও ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছে। সময়ে সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের বিভেদের সময় বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনেও বিভেদ অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লককে বাদ দিয়ে একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এই বৈশিষ্ট্য হল মার্কসবাদ-লেলিনবাদের প্রতি আনুগত্য [যদিও এই আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল ব্যাপক]। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিজনিত পার্থক্য থাকলেও আদর্শগতভাবে সমাজ বিপ্লবের প্রতি প্রতিশ্রুতিগতভাবে একটি দায়বদ্ধতা এদের সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ ছিল। এদের ছাত্র সংগঠনগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যজনিত দায়বদ্ধতা ঐ একইভাবে বিন্যস্ত। অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি যথাক্রমে :

পি.এস.ইউ.: Progressive Students Union সংক্ষেপে P.S.U. হলো R.S.P.-র ছাত্র সংগঠন। পশ্চিমবাংলায়ই-এর কিছুটা সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে। এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন ছাত্রনেতারা হলেন— বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, বারীন রায়, তুষার কাঞ্জিলাল, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতি গোস্বামী প্রমুখ।

ডি এস ও : SUCI-এর ছাত্র সংগঠনের নাম DSO [Democratic Students Organisation]। পশ্চিমবাংলায় এক সময় প্রতিভা মুখার্জি, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সলিল ভট্টাচার্য এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন।

ছাত্র ব্লক : Students Block [S.B.] বা ছাত্র ব্লক হলো ফরওয়ার্ড ব্লক-এর ছাত্র সংগঠন। এই সংগঠনের ছাত্রকর্মীরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শে বিশ্বাসী। ফরওয়ার্ড ব্লক ভাগ হয়ে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলেও 'ছাত্র ব্লক' মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ছিল। মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুগামী ছাত্ররা 'ছাত্র ব্লকে' থেকেই কার্যকলাপ চালিয়েছেন। নির্মল বসু, রণজয় রায়, প্রভাত পালিত প্রমুখ এই সংগঠনের নেতা ছিলেন।

এস. এ. : ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি [RCPI] পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং সৌমেন্দ্র ঠাকুর-এর দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী S.A.[Students Association] নামে একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি করেছিলেন। এই সংগঠনের নেতা ছিলেন শান্তি দাশগুপ্ত, সোমেশ বসু প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকেই এই ছাত্র সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

আরও কিছু প্রচেষ্টা : বলশেভিক পার্টি, ডেমোক্রেটিক ভ্যান গার্ড, ওয়ার্কার্স পার্টি নামে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলও তাদের নিজস্ব ছাত্র সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা পঞ্চাশের দশকে করেছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হবার পরিণামে এদের ছাত্র সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডের 'স্টুডেন্টস ভ্যানগার্ড' নামে একটি ছাত্রসংগঠন ছিল।

সমাজ সেবামূলক কাজে ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা

ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ছাত্র সংগঠনগুলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপেই অংশগ্রহণ করেনি। সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধও ছিল। বিভিন্নভাবে পিছিয়ে পরা মানুষকে, প্রাকৃতিক বা আর্থ সামাজিক কারণে বিপদগ্রস্ত জনসাধারণকে সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন

করেছে। সমাজ সেবামূলক কাজে [Social Service]-এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা-ই ছিল অগ্রগণ্য। দুঃস্থ ছাত্রদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবেই কমিউনিস্ট ছাত্ররা সেবামূলক সংগঠন গড়ে তুলতেও এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গড়ার পর থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ছাত্র ফেডারেশনের এই ধরনের সেবামূলক কাজের অসংখ্য নজির রয়েছে। ষাটের দশকের পরে সেবামূলক কাজে সামগ্রিকভাবে ছাত্রসমাজের উদ্যোগী ভূমিকা পূর্বেকার তুলনায় হ্রাসমান। ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি পরিবর্তনও এর অন্যতম কারণ। সেবামূলক কাজের প্রতি ছাত্রসমাজের উদ্যোগ-অংশগ্রহণ হ্রাসমান হলেও এই কাজের ধারাবাহিকতা এখনো কোন কোন সংগঠনের ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ত্রিশের দশক থেকে সমাজ সেবামূলক কাজে যে সব উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করেছে, তাঁর কয়েকটি নজির নিচে উল্লেখ করা হল।

গণসাক্ষরতা অভিযান : ১৯৩৮-৩৯শে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-কে কেন্দ্র করে দশ-বারোজনের স্কোয়াড তৈরি করে গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে বেরতেন। নিরক্ষর মানুষকে বোঝাবার জন্য প্রতিটি স্কোয়াডের সঙ্গে থাকতো 'ল্যানটার্ন-স্লাইড'। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কে. এম. আহমদ তাঁর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন— "১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে বি.পি.এস.এফ. গণস্বাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিল। দেশবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিবরণ দিতে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড তৈরি হল। সেই নিয়ে দল ছড়িয়ে পড়ল। অবনী লাহিড়ীর নেতৃত্বে পরিচালিত দলটির সঙ্গে বার্মার একদল ছাত্রনেতাও যোগ দিলেন। আমাদের গণস্বাক্ষরতা অভিযানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁরা উৎসুক ছিলেন। দলটি যখন ২৪-পরগণার শ্রমিক ও কৃষক এলাকায় ঘুরতে শুরু করলো, তখন সত্যি সত্যিই হাজার হাজার লোক তাঁদের কথা শোনার জন্য সন্ধ্যায় জড়ো হতে লাগলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিশী তৎপরতা শুরু হল। আদেশ জারি হল এই দল গ্রামের ভিতরে গিয়ে প্রচার করতে পারবে না।" (কে. এম. আহমদ : বাংলার ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের দিনগুলির স্মৃতিচারণ, স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৬)।[১]

বাংলার মন্বন্তর : ১৩৫০ বঙ্গাব্দের [১৯৪১-৪২] বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে বাংলা প্রদেশসহ অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা দুর্ভিক্ষগ্রস্থ মানুষের ত্রাণকার্যে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বিশেষ করে 'People Relief Committee' [PRC], গণনাট্য সঙ্গ [IPTA] প্রভৃতি সংগঠনের সংগঠিত ত্রাণ স্কোয়াডের নিরলস স্বেচ্ছাসেবী কর্মী হিসাবে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন। জামা, কাপড়, চাল, ডাল ইত্যাদি ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহে এইসব স্কোয়াডের অগ্রণী কর্মী ছিল ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা চিকিৎসার কাজের সহযোগিতায় মুখ্যভূমিকা পালন করেছেন। দুর্ভিক্ষের চিত্র অঙ্কনে, গানের স্কোয়াডে গণসঙ্গীতে অংশগ্রহণে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়।

ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সারা হায়দারাবাদ ছাত্র ইউনিয়নের [AHSU] উদ্যোগে একটি "Medical Relief Squad" গঠন করা হয়েছিল। বি.এস.পরাঞ্জপের নেতৃত্বে

বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায় ত্রাণকার্যের জন্য এই মেডিক্যাল স্কোয়াডকে তিন সপ্তাহের জন্য পাঠান হয়। তাছাড়া হায়দারাবাদের শ্রীমতি সরোজিনী নাইডুর পৃষ্ঠপোষকতায় যে 'Bengal Relief Committee' গঠন করা হয়েছিল তার প্রধান সক্রিয় শাখা [Active wing] ছিল All Hydrabad Students Union [AHSU] ।

অন্ধ্রের দুর্ভিক্ষে : এই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন নিজাম পরিচালিত সামন্ত রাজ্য হায়দারাবাদে রেশন ব্যবস্থা চালু হলে, তা প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ঐ অবস্থায় 'সারা হায়দারাবাদ ছাত্র ইউনিয়ন'-এর কর্মীরা রেশন কার্ড বিলি বন্টন, রেশন দোকান পরিচালনা প্রভৃতি কাজে দল বেঁধে এগিয়ে আসেন। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রকর্মীরা ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা তলে এই স্বেচ্ছাসেবকমূলক কাজে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

১৯৫৪ সালে অন্ধ্রের মহারাষ্ট্রীয় অঞ্চলে [Mrathwada region]-এ দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থা দেখা দিলে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা বস্ত্র, অর্থ, খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষগ্রস্থদের সাহায্য করেন।

দাঙ্গা দূর্গতদের ত্রাণে: ১৯৪৬-এর কলকাতা, নোয়াখালি-র ত্রাণকার্যে এবং শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সংহতি স্থাপনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসে তুলনাহীন।

তেমনি পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ভারতে ১৯৫৪-তে অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদ ও গুলবর্গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ত্রাণ কার্যে AHSU -এর ছাত্র কর্মীরা অনুরূপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ছাত্রনেতা বি নরসিং রাও ছিলেন এই স্বেচ্ছাসেবমূলক কাজের নেতৃত্বে।

কোচিং স্কুল পরিচালনায়: ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করার জন্য 'কোচিং স্কুল'ও পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশ, অন্ধ্র রাজ্যে এই ধরনের 'কোচিং স্কুল' গড়ে তোলা হয়েছিল। স্কুল-কলেজের বহু শিক্ষক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা এইসব অবৈতনিক 'কোচিং স্কুলে' পড়াবার কাজে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। 'AIISU' পরিচালিত হায়দ্রাবাদের চন্দ্রাঘাট হাই স্কুলের [১৯৫৩-৫৫] কোচিং স্কুলটি সমাজসেবামূলক কাজের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।[২]

বন্যা দূর্গতদের সাহায্যে : যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে ছাত্র ফেডরেশনের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৫৬-তে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের সেবাকার্য তুলনাহীন। ছাত্র ফেডারেশনের মেডিক্যাল কলেজ ইউনিটের কর্মীরা PRC-র সাথে যুক্ত হয়ে ১৯৫৬-র বন্যায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে সেবাকার্য চালিয়েছেন। এই এতিহ্য ১৯৭৮-এর বন্যায়ও অব্যাহত ছিল।

ছাত্র স্বাস্থ্য নিবাস [Student Health Home] : স্বাবলম্বী ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে কলকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত Students Health Home এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক বৎসরের প্রচেষ্টায় কলকাতা মহনগরীর মৌলালীর মোড়ে NRS হাসপাতালের নিকটে বর্তমান Students Health Home-এর বহুতল বাড়ি গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে এই পুস্তকে পূর্বেই কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। Students Health Home-এর সদস্য ছাত্ররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিনা ব্যয়ে

এবং কঠিন চিকিৎসায় স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনুদান এবং সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ছাত্রদের জন্য ৭০টি এবং চাষীদের ৪০টি শয্যার ব্যবস্থা আছে। Out-Door, In-Door, Emergency প্রভৃতি চিকিৎসার ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে। কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের অনেকেই এখানে স্বেচ্ছায় চিকিৎসার কাজে অংশগ্রহণ করেন। এক কথায় Students' Health Home-কে ছাত্রদের একটি নিজস্ব হাসপাতাল বলা যায়। দীঘাতেও SHH-এর একটি Centre খোলার প্রচেষ্টা চলেছে। এই Students' Health Home ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আগেকার ধর্মতলা স্ট্রীটে ডঃ অমিয় বসুর চেম্বারে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। Students' Health Home প্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ অমিয় বসু, ডঃ তরুণ সেন, ডঃ সুবীর দাশগুপ্ত প্রমুখ। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন SHH প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিল প্রধান উদ্যোগী। ছাত্রদের রক্তদানের অর্থে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। যথেষ্ট অবদান ও সহযোগিতা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের। তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল এই প্রতিষ্ঠান গড়ার পাথেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট ছাত্রকমরেডদের উদ্যোগেই ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ছাত্রদের এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি প্রথম গড়ে উঠেছে। পরে সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক গন্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপকভিত্তিতে সম্প্রসারিত হবার প্রচেষ্টা Students' Health Home-এর পরিচালক ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকের মধ্যেই ছিল এবং আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজনৈতিক সংকীর্ণতা মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করলেও তাকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টাও সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। সরকারি অনুদান, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নধরনের সহযোগিতা এই প্রতিষ্ঠানটিকে ছাত্রকল্যাণে একটি সক্রিয় সংগঠনে পরিণত করেছে। Students' Health Home ভারতের ছাত্র আন্দোলনের একটি গর্ব।

তথ্যসূত্র :

১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় : স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, ১৯৮০, চারু প্রকাশ, কলকাতা। পৃষ্ঠা ৪৫ থেকে উদ্ধৃত।

২। Political Awakening In Hyderabad : Role of Youth and Students : S. M. Jawad Razvi, পৃষ্ঠা ৯২।

বুর্জোয়া উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী এবং দক্ষিণপন্থীদের ছাত্র সংগঠন

কংগ্রেস দলের ছাত্র সংগঠন : ভারতের সবচাইতে প্রাচীন এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হল 'জাতীয় কংগ্রেস'। ১৮৮৫ সালে এই রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৯ সালে এই দলের আনুষ্ঠানিক বড় রকমের ভাঙনের পরবর্তী অধ্যায়ে নামের ক্ষেত্রে এর বহুরকম রূপান্তর ঘটেছে। কংগ্রেস(ই) নামে পরিচিত অংশটিকেই আদালতের রায় অনুসারে আইনানুগ ক্ষেত্রে জাতীয় বলা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের Student Wing বা ছাত্রফ্রন্টও রয়েছে।

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রথম যুগে জাতীয় কংগ্রেসের নিজস্ব কোন ছাত্রফ্রন্ট বা ছাত্র সংগঠন ছিল না। জাতীয়তাবাদী এবং কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা থেকে ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত থেকেই ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতো। ১৯৪১ সালে AISF-এর পাটনা সম্মেলনে কংগ্রেসের অনুগামী ছাত্ররা AISF থেকে বেড়িয়ে যায় এবং এই সময় থেকেই 'ছাত্র কংগ্রেস' নামে জাতীয় কংগ্রেস দলের নিজস্ব ছাত্র সংগঠনের জন্মলাভ ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে দেশভাগের পরেও স্বাধীন ভারতে 'ছাত্র কংগ্রেস'-ই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন।

তৎপরবর্তী ঘটনা হল ১৯৫০ সালে কংগ্রেস এবং সমাজতান্ত্রিক নেতারা মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে ভিত্তি করে জাতীয় স্তরে 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' [National Students' Union, NSU] নামে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়া হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের আর্শীবাদ ও প্রেরণায় বোম্বাইতে NSU-এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর এই সংগঠনটি কংগ্রেসের ছাত্রফ্রন্ট হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি যেসব রাজ্যে এখনো NSU-এর প্রভাব ও অস্তিত্ব আছে, সে সব রাজ্যে NSU কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন রূপেই পরিচিত।

কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠনের নামের ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। পশ্চিমবাংলায় ১৯৫০-এর দশকের আগে অন্য কোন নামেই কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের পরিচিতি ছিল না। 'ছাত্র কংগ্রেস' যা ছিল, তা কাগুজে সংগঠনের বেশি কিছু নয়। পঞ্চাশের দশকের প্রথম ভাগে 'ছাত্র পরিষদ' [CP] নামে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের ভ্রূণ পশ্চিমবঙ্গে জন্মলাভ করে। [১৯৯১ সালের ২৮শে আগস্ট কলকাতায় মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এই হিসাব অনুসারে ১৯৫৩ সালে ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।] এমন কি ষাটের দশকের প্রথম দিকে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় উগ্রজাতীয়তাবাদের দিনেও কংগ্রেস প্রভাবিত ছাত্রকর্মীরা ইউএসও, এসডব্লুএস প্রভৃতি ছদ্ম সংগঠনের নামে কলকাতায় তাঁদের কার্যক্রম চালাত। এরপরই 'ছাত্র পরিষদ' নামে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠনের আবির্ভাব প্রকাশ্যে ঘটতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে ছাত্র পরিষদকে গড়ে তোলার যুগে পশ্চিমবাংলার নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্যামল ভট্টাচার্য [৭০-র দশকে কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ৯০-এর দশকে জনতা দলে যোগ দেন], প্রণব মুখার্জি প্রমুখ। ষাটের দশকের শেষদিকে ছাত্র পরিষদের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুব্রত মুখার্জী প্রমুখ কংগ্রেসী ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতন থেকে ১৯৭২ সালে কংগ্রেসকে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ছাত্রপরিষদের এই কর্মীরা ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ কে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও অরাজকতার যুগ বলা হয়, সে সময় প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনরূপে কাজকর্ম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা ছাত্র পরিষদেরই বেশি ছিল।

১৯৪১ থেকে ১৯৯০ জাতীয় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনরূপে 'ছাত্র কংগ্রেস', 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন', 'ছাত্র পরিষদ' বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে যখন যে ধরনের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছে, কংগ্রেসের ছাত্র

সংগঠনগুলিও সেই রাজনীতিকে তাদের নিজস্ব মঞ্চে অনুসরণ করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনগুলি অধিকাংশ সময়ই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে ছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ষাট দশক থেকে মাঝে মধ্যে কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে একমাত্র CPI-এর ছাত্র সংগঠনের সাথে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠনের নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। CPI(M) এবং নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র সংগঠনের সাথে কংগ্রেসী ছাত্র সংগঠনের সম্পর্ক সব সময়-ই তিক্ত এবং বিরোধপূর্ণ শত্রুতার।

সমাজতন্ত্রীদের ছাত্র সংগঠন : ভারতের সমাজতন্ত্রীদের [Socialists] রাজনৈতিক দলের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি [PSP], সমাজতন্ত্রীদল [SP], সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি [SSP] ইত্যাদি বহু দল ও গোষ্ঠীতে ভারতের সমাজতন্ত্রীরা বার বার বিভক্ত হয়েছে। এক সময়ে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে সমাজতন্ত্রের একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। সমাজতন্ত্রীদের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল 'সমাজবাদী ছাত্র সংগঠন' [S.S.O— Socialist Student Organisation]। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদে, বিহারের পাটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে S.S.O.-এর কিছু সাংগঠনিক প্রভাব ছিল। উত্তরপ্রদেশে S.S.O.-র প্রভাব অর্থে রামমনোহর লোহিয়াপন্থী সমাজতন্ত্রী ছাত্রদের প্রভাব ছিল বেশি। পশ্চিমবঙ্গ ও খুবই বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জেলায় S.S.O.-এর শাখা সংগঠন ছিল। তখনকার অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের দিবা বিভাগে পঞ্চাশের দশকে SSO-র ভালই প্রভাব ছিল। এই কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে BPSF-এর সাথে S.S.O.-রই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ছাত্রনেতা রঞ্জিত দাসই ছিলেন S.S.O.-র অন্যতম রাজ্য ছাত্রনেতা।

ভারতের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ছাত্র সংগঠন S.S.O. তত-ই দুর্বল হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকের শেষে এই সংগঠন নামসর্বস্ব সংগঠনে পরিণত হয়। নব্বই-এর দশকে 'সমাজবাদী ছাত্র সংগঠন' বা S.S.O.-র অস্তিত্ব কোথাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

মধ্যপন্থীদের ছাত্র সংগঠন : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের সমাজতন্ত্রী দলের কয়েকবার ভাঙনের ফলে ভারতের রাজনীতিতে এক ধরনের মধ্যপন্থী রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে। কংগ্রেস এবং সমাজতন্ত্রী দল থেকে বিভিন্ন কারণে বেরিয়ে আসা রাজনীতিকরা বিভিন্ন গোষ্ঠী-উপদল ইত্যাদি গঠন করেন। নানা সময়ে গড়ে ওঠা এইসব গোষ্ঠী ও উপদলের নেতারা আবার বিভিন্ন সময়ে মিলিত হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক দলও গঠন করেছেন। কংগ্রেস (সংগঠন), কংগ্রেস (জ), জনতা পার্টি, জনতা দল, সমাজতন্ত্রী জনতা দল, বাংলা কংগ্রেস, লোক দল, ভারতীয় ক্রান্তিদল [বি কে ডি] ইত্যাদি হল এই ধরনের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের দল। এই দলগুলিকেই মধ্যপন্থী দল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মধ্যপন্থী এই রাজনৈতিক দলগুলি কখনো তাদের ছাত্র-যুব সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। যেমন, জনতা পার্টি বা জনতা দল 'ছাত্র জনতা' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু এই প্রয়াসগুলি সংগঠিতভাবে সর্বভারতীয় বা রাজ্যস্তরে দানা বাধতে পারেনি। কারণ, মধ্যপন্থীদের বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক উত্থান-পতন-ই এরজন্য দায়ী।

নবম অধ্যায়

ভারতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব আন্দোলন

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যুব আন্দোলনের উপর সব সময়ই গুরুত্ব দিয়েছে। সমাজ বিপ্লবের কাজে যুবসমাজ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিপ্লবের সংগঠিত বাহিনীতে, রণক্ষেত্রে, সংগ্রামের ময়দানে জীবন-যৌবনে তারুণ্যে উদ্দীপ্ত যুবক-যুবতীরাই প্রাণবন্ত চালিকাশক্তি। যুব জীবনের সামগ্রিক দিক নিয়ে যে যুব আন্দোলন, সেই যুব আন্দোলনের বিস্তীর্ণক্ষেত্র থেকেই কমিউনিস্ট যুবকর্মীদের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব। এই বিবেচনা এবং বাস্তবতা থেকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যুব আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। প্রায় সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির-ই যুব সংগঠন এবং 'যুবফ্রন্ট' রয়েছে। তাছাড়া সবদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেই দেখা যায়, বিভিন্ন মতাদর্শকেন্দ্রিক সব রাজনৈতিক দলেরই যুব সংগঠন রয়েছে। গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীদের [Social Democratic], ধনতন্ত্রীদের [Capitalist], র‍্যাডিক্যাল-মডারেটদের, জাতীয়তা-বাদীদের যেমন যুব সংগঠন আছে— তেমনি কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত যুব আন্দোলন ও যুব সংগঠন থাকাও স্বাভাবিক।

সোভিয়েত নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বেই 'যুব কমিউনিস্ট লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং বিপ্লবের পূর্বেই 'যুব কমিউনিস্ট লীগ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে 'যুব কমিউনিস্ট লিগ-এর তৃতীয় কংগ্রেসে নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী সময়ে যুব সমাজের কর্তব্য সম্পর্কে ভি. আই. লেনিন ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু পৃথিবীর কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব আন্দোলনের দিশা বলে বিবেচিত।

১৯২৭-২৮-২৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে, তখন অষ্টম রুশ আর্মি কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত যুবকরাই বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিল।

ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র জাতীয়মুক্তি সংগ্রামে ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি [কমিউনিস্ট পার্টি]-র প্রভাবিত যুবফ্রন্টের কর্মীরাই ছিল নিয়মিত গেরিলা বাহিনীর অন্যতম প্রধান শক্তি।

কিউবার বিপ্লবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বাতিস্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে কিউবার যুব সমাজ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

এইভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কমিউনিস্টদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম এবং কিউবাতে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সংগঠিত

যুবসমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া মানুষের বিভিন্ন অংশের যুব সমাজের মিলিত শক্তি এক দুর্বার শক্তি। শুধু রাষ্ট্র বিপ্লবে নয়, সমাজ পুনর্গঠনে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানব জাতিকে রক্ষার আন্দোলনে যুব সংগঠন-যুব আন্দোলন এক মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব সংগঠনগুলি সে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেছে।

আন্তর্জাতিক কেন্দ্র : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত যুব সংগঠনগুলিকে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে সমন্বিত করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সহযোগিতায় বিশ্ব যুব আন্দোলনের এইরূপ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠলো। সংগঠনের নাম হলো— 'World Federation of Democratic Youth' [সংক্ষেপে WFDY]। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে WFDY-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অনৈক্য ও বিভেদের পরিণতিতে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মতোই WFDY নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

WFDY-যখন সক্রিয় ছিল— তখন এই সংগঠনের আহ্বানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে "বিশ্বযুব উৎসব" অনুষ্ঠিত হতো। শুধু কমিউনিস্ট যুব সংগঠন নয়, অকমিউনিস্ট যুব সংগঠনগুলিও বিশ্ব যুব উৎসবে আমন্ত্রিত হতো। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যুব সংগঠন 'যুব কংগ্রেস'-এর প্রতিনিধিরা বহুবার বিশ্ব যুব উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছে। বিশ্ব যুব উৎসব ছিল পৃথিবীর যুব আন্দোলনের একটি আকর্ষণীয় বিষয়।

ভারতে কমিউনিস্ট যুব আন্দোলনের সূচনা :

ভারত তখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেনি। ১৯৪৬-এ দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অন্যদিকে চলছে নৌবিদ্রোহের মত ঘটনা। দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা চলছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে 'বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন' ভারতের যুব সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৪টি দেশের যুব প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যুব- প্রতিনিধিদল ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস [তখনও ভারতবর্ষ ভাগ হয়নি] এই যুব প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষ সফরে আসেন। কমিউনিস্ট প্রভাবিত কোন আন্তর্জাতিক যুব সংগঠনের এটাই ছিল ভারতবর্ষে প্রথম সফর। অবিভক্ত ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি এই প্রতিনিধিদল সফর করেছিলেন।

তখনকার নিখিল ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় প্রাক্তন ছাত্রনেতা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় এই বিশ্ব যুব প্রতিনিধিদল সম্পর্কে তাঁর লিখিত পুস্তকে লিখেছেন— "১৯৪৭-এর মার্চ মাসে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সংঘের প্রথম প্রতিনিধি দল ভারতে আসেন। এই দলে ছিলেন সোভিয়েত, ড্যানিস, ফরাসী ও যুগোস্লাভ প্রতিনিধি। বাংলার ছাত্র সমাজকে তাঁরা সারা বিশ্বের প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সমাজের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানান। কলকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন কলেজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় প্রতিনিধিদল। কলকাতায় বিরাট প্রকাশ্য সংবর্ধনা সভায়

ভিয়েতনাম দিবসের সংগ্রামে আহত জনৈক ছাত্রকর্মীর দেহে বিদ্ধ বুলেটটি ছাত্রনেতা দেবকুমার বোস ফরাসী যুবনেতা জ্যাঁ লাতু সিয়েরকে দিলে, তিনি আবেগে কেঁদে ফেলেন। ঘোষণা করেন : কলকাতার সংগ্রামী ছাত্রদের কথা দিচ্ছি, আমরা তাঁদের বন্ধুতার মর্যাদা রক্ষা করব, ফরাসী দেশের কোন বন্দর থেকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র যেতে দেব না।"[১]

এইভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র-যুব কর্মীদের সাথে বিশ্ব যুব সংগঠন WFDY-এর সংযোগ চলার সময়েই বাংলার কমিউনিস্ট যুবকর্মীরা বিশেষ করে কলকাতার যুবকর্মীরা WFDY-এ ধাঁচে 'যুব সংঘ' নামে যুব সংগঠন গড়ে তোলেন। কলকাতা-ই ছিল 'যুব সংঘ'-এব প্রধান কার্যালয়। পরে দেশভাগজনিত কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হবার পর এই সংগঠনের নাম হলো— 'পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ'। ক্রিক রো-তে ছিল এর প্রধান কার্যালয়। যুব সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ থেকেই সুকুমার গুপ্ত [পরে CPI-এর রাজ্য নেতা] ছিলেন এই সংগঠনের অন্যতম সংগঠক নেতা। যুব সংঘ-এর প্রধান কার্যক্রম ছিল এক বা দু'বৎসর অন্তর এক যুব উৎসবের আয়োজন করা। এইসব যুব উৎসব থেকে বিশ্ব যুব উৎসবের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তুতি চলতো। এই যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে এক ধরনের উদ্দীপনাও দেখা দিত।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন :

১৯৫০ সাল থেকে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় স্তরে যুব সংগঠন গড়ার প্রয়াসী হয়। ১৯৫৩ সালে এই প্রচেষ্টা সফলতা অর্জন করে। দিল্লিতে প্রথম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। অন্ধ্র, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের যুব প্রতিনিধিরা দিল্লি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দিল্লি সম্মেলন থেকে কেরেলার বাসুদেবন নায়ারকে[২] সভাপতি এবং পশ্চিমবাংলার সারদা মিত্রকে সাধারণ সম্পাদক করে "সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন" [All India Democratic Youth Federation বা AIDYF] গঠন করা হয়। যতদিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে এইরূপ কেন্দ্রীয় যুব সংগঠন গড়ে ওঠেনি, ততদিন AISF-এর কোঠায় WFDY-তে ভারতের যুব সমাজের প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ছাত্রনেতা সুখেন্দু মজুমদার। AIDYF গঠনের পর এই সংগঠন WFDY-এর স্বীকৃতি পেল।

'সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন'-এর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তির প্রশ্নে যুব উৎসবের আয়োজনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। যুব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংগঠনের এবং গণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে যুব আন্দোলনকে গড়ে তোলার প্রতি এই সর্বভারতীয় যুব সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি ছিল না। যে সকল রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিক প্রভাব ছিল, সেসব রাজ্যেও এই সর্বভারতীয় যুব সংগঠনের শক্তিশালী রাজ্য সংগঠন গড়ে তোলা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ তার নামের অবলুপ্তি ঘটিয়ে AIDYF-এ মিশে না গিয়ে তার স্বাতন্ত্র বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

'সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন'-এর প্রতিনিধিদল ১৯৫৩ সালে বুখারেস্টে, ১৯৫৫ সালে ওয়ারসতে এবং ১৯৫৭ সালে মস্কোতে এবং ১৯৫৯ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবেই অংশগ্রহণ করেছিল। এইভাবে ভারতে রাজ্য ও কেন্দ্রভিত্তিক যুব উৎসব এবং বিশ্ব যুব উৎসব-এর কার্যক্রম চলতে চলতেই সারা ভারত যুব সংগঠনের ভাঙন এবং নিষ্ক্রিয়তা অনিবার্য হয়ে উঠলো।

ভাঙন :

ভারতের কমিউনিস্ট ছাত্র আন্দোলনে যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে বিভেদ ও ভাঙন এসেছিল, সেইসব কারণে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ভারতের যুব আন্দোলনে বিভেদ ও ভাঙন এল। ১৯৬৪ সালে দুটি কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়ে যাবার পর AIDYF একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো। নামেমাত্র এই সংগঠনের কাঠামোটি CPI-এর নিয়ন্ত্রণে থাকলো। আর CPI-এর নিয়ন্ত্রণে থাকলো 'পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ'। সদ্যগঠিত CPI(M)-ও তার নিজস্ব যুব সংগঠন গড়ার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিল।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন :

কলকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সি পি আই (এম)-এর পার্টি কর্মসূচিতেই ইঙ্গিত ছিল— সিপিআই(এম) তার নিজস্ব যুব সংগঠন গড়ার দিকে এগুবে। "নতুন প্রগতিশীল জন সংস্কৃতি" গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুব সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই পার্টি কর্মসূচির ৩০ নং ধারাটি বিশ্লেষিত।

সি পি আই (এম)-এর যুব ছাত্র কর্মীরা যুব সংগঠনের অভ্যন্তরে পার্টির বুর্জোয়া প্রধান্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবে 'কবরী বন্ধন' প্রতিযোগিতার কাঠামোটি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ১৯৬৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবের প্রাক-মুহূর্তে যুব আন্দোলনে সংস্কারবাদী চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে সমালোচনা তীব্ররূপ নেয়। ১৯৬৫-র পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব সংগঠনের পরিকাঠামো সি পি আই-এর রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে যুব সংগঠনের কোন কাঠামো-ই তখন ছিল না। পার্টির যুব কর্মীর সংখ্যাও খুবই অল্প। যে স্বল্প সংখ্যক যুব কর্মী সি পি আই (এম)-এর সাথে যুক্ত তার বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গে এবং তাও বিচ্ছিন্নভাবে রাজ্যের বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এই বছরের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ যুব সংগঠন গড়ার চিন্তাভাবনা প্রথমে সি পি আই (এম)-এর কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র-যুব কর্মীর মধ্যে শুরু হয়। পুনর্গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের শ্রীরামপুর সম্মেলনকে [অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন] সামনে রেখে দীনেশ মজুমদার, সুবিনয় ঘোষ, হরিনারায়ণ অধিকারী প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রনেতার ছাত্র আন্দোলন থেকে বিদায় নেবার কথা ওঠে। এই ছাত্রনেতারা পার্টির কোন ফ্রন্টে কাজ করবেন— এই নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বিশেষ করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যুব আন্দোলন এবং যুব সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়।

৭ম পার্টি কংগ্রেসের পর পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ছাত্রফ্রন্টের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য তিনজনের একটি ছাত্র সাবকমিটি গঠন করেছিল। ১৯৬৭-তে যুব আন্দোলনের প্রসঙ্গটি যখন আলোচনার স্তরে, তখন এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে দায়দায়িত্ব ঐ সাবকমিটির উপর অর্পণ করা হলো। এই সাবকমিটির সদস্য ছিলেন— সমর মুখার্জি, বিভূতি দেব, দীনেশ মজুমদার। ছাত্র-সাবকমিটি কার্যত ছাত্র যুব সাব-কমিটিতে রূপান্তরিত হল। সাব-কমিটির পক্ষ থেকে দীনেশ মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হল পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির

সংশ্লিষ্ট পার্টি নেতাদের সাথে কথা বলার জন্য। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কৃষ্ণপদ ঘোষ, সুধাংশু পালিত, অলোক মজুমদার প্রমুখদের সাথে আলোপ-আলোচনা হল। উত্তর কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে সভা করে একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। এই প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন সুধাংশু পালিত। ঠিক হয়েছিল প্রথমে ছোট-বড় শতাধিক অঞ্চলে কলকাতা জেলাকে ভাগ করে পার্টির যুব সদস্য এবং সমর্থক কর্মীদের নিয়ে সংগ্রামী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আলোচনা সভা কিংবা প্রস্তুতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা জেলা যুব সম্মেলনে।

১৯৬৭ সালের ২রা এবং ৩রা অক্টোবর ছয় শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কলকাতা জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে একটি কর্মসূচি ও সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। সংগঠনের নামকরণ হয়েছিল— 'কলকাতা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন'। এই জেলাভিত্তিক নতুন যুব সংগঠনটি-ই ছিল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডরেশন'-এর ভ্রূণ। 'কলকাতা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন'-এর পরিচালক কমিটিতে দীনেশ মজুমদার, অলোক মজুমদার, হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি, মনোজপ্রতীম গাঙ্গুলী, মলয় চ্যাটার্জি প্রমুখরা অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। সম্মেলন থেকে সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মনোজপ্রতীম গাঙ্গুলী ও মলয় চ্যাটার্জী। পার্টিগত এবং গণসংগঠনগতভাবে প্রধান দায়িত্বে ছিলেন দীনেশ মজুমদার।

কলকাতা যুব সম্মেলনের পরই প্রশ্ন এল সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে যুব আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কিভাবে যুবকর্মী ও যুব সমাজের কাছে তুলে ধরা হবে। এই সময় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙনের ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী এবং সিপিআই(এম)-এর পার্টিনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার তখন পার্ক সার্কাসের সিদ্দিক ম্যানশনে থাকতেন। হরিনারায়ণ অধিকারীও তখন হরেকৃষ্ণ কোঙারের এই বাসায় থাকতেন। একদিন দীনেশ মজুমদার সিদ্দিক ম্যানশনে এসে সারাদিন ধরে যুব আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রসঙ্গ নিয়ে হরিনারায়ণ অধিকারীর সাথে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় বর্ধমানের যুব-পার্টি নেতা কালনার মহাদেব মুখার্জিও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন পয়েন্ট ঠিক করে সিদ্ধান্ত হলো— "যুব আন্দোলন প্রসঙ্গে" শিরোনামে একটি নিবন্ধ হরিনারায়ণ অধিকারী লিখবেন এবং তা পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশহিতৈষী'-তে প্রকাশ করা হবে। সে মত ঐ নিবন্ধটি ১৯৬৭-র ১৫ই ডিসেম্বর 'দেশহিতৈষী'-তে প্রকাশিত হয় [এই বই-এর পরিশিষ্টে উক্ত নিবন্ধটি সংযুক্ত করা হয়েছে]।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের পর রাজ্যের পরিস্থিতি নতুন দিকে মোড় নেয়। সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন। এবার ভাবনা চিন্তা শুরু হলো— রাজ্যস্তরে যুব সংগঠনের। 'কলকাতা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনে'র পক্ষ থেকেই রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হল। ১৯৬৮ সালে হাওড়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া সম্মেলন থেকেই প্রথম গঠিত হল সিপিআই(এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকেন্দ্রিক যুব সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন'। দীনেশ মজুমদারকে সভাপতি এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক করে এই যুব সম্মেলন থেকে একটি রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। যুব আন্দোলনকে সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশহিসাবে গড়ে তোলার কর্মনীতিও এই সম্মেলন থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল 'যুবশক্তি' নামে রাজ্য সংগঠনের বাংলা মুখপত্র প্রকাশের। পশ্চিমবঙ্গে যখন রাজ্যকেন্দ্রিক যুব সংগঠন গড়ে উঠলো, তখনও কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে যুব সংগঠন গড়ে তোলার রাজনৈতিক প্রস্তুতি সিপিআই(এম) গ্রহণ করেনি।

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই প্রথম কোন কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত একটি যুব সংগঠন প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলো। তাছাড়া দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার রক্ষার আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সময়কার অভিজ্ঞতা থেকেই প্রমাণ হল, যুব সংগঠন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যুব সংগঠন যুব কমিউনিস্ট লীগ [YCL]-এর উচ্চনেতৃত্বের মধ্যে ও এই ধারণা ক্রমান্বয়ে বদ্ধমূল হতে শুরু করে। এই সময়ে আরেকটি প্রশ্নও ওঠে— ছাত্র সংগঠন এবং যুব সংগঠনের ক্ষেত্রে কাজকর্মের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দেবে কিনা। সমধর্মী ছাত্র-যুব সংগঠনের কার্যধারার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। যেমন— "এমনি ধারা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অনেককেই ভাবতে হবে তিনি ছাত্র কিংবা যুব সংগঠনের কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। এই অবস্থার একটিমাত্রই সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসাবে ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পাড়াতে যুবক হিসাবে যতটুকু সম্ভব যুব সংগঠনের আওতায় তাকে প্রয়োজনীয় কাজ করার ঝুঁকিও নিতে হবে।"[৩]

১৯৭০-৭২ পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বামপন্থী দলগুলির সবরকম গণসংগঠনের মতই গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ক্রিয়াকলাপ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। সন্ত্রাস মোকাবিলা করে সি পি আই (এম)-এর যুব গণসংগঠন খুবই কৌশলে সংগঠনকে রক্ষা করেছিল এবং সংগঠিত করেছিল তাদের অনুগামী যুব সমাজকে। ১৯৭৭ সালে ভারতের রাজনীতির পট পরিবর্তন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কাজকর্মের এই ধারা অব্যাহত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা অনুসারে কেরালা, অন্ধ্র এবং পাঞ্জাবে সিপিআই(এম) ঐ একই ধাঁচে রাজ্যভিত্তিক যুব সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় বামদলগুলির কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে সিপিআই(এম)-এর যুব সংগঠন সম্প্রসারণের সুবিধাজনক পরিস্থিতির সুযোগ আসে। উদ্যোগ শুরু হয় সর্বভারতীয় যুব সংগঠন গড়ার।

১৯৮০ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত হলো সিপিআই(এম)-এর ব্যবস্থাপনায় সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন। এই সম্মেলনে 'ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন' [Democratic Youth Federation of India— DYFI] গঠন করা হয়।

১৯৯১ সালের নভেম্বরে ৪র্থ সম্মেলন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে ৩টি রাজ্যে বামপন্থী দলগুলির কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর ৩টি রাজ্যেই গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পদে যাঁরা উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে হান্নান মোল্লা, বেবীজন, অমিতাভ নন্দী, বয়েন বসু প্রমুখ।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয়, নাম— 'ইয়ুথলীগ'। ১৯৭৭ সাল থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের যুব আন্দোলনগত কর্মসূচি বহুলাংশে সমধর্মী সংগঠন 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশন' [S.F.I]-এর মতই এবং ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুসারী। সংসদীয় নির্বাচনে বামদলগুলির পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ, ধর্মঘট-সমাবেশ-বনধ্ প্রভৃতি গণ আন্দোলনের ফরম্ অনুসরণ, বামদলগুলি পরিচালিত সরকারগুলিকে রক্ষা ও তার কার্যক্রমের পক্ষে সোচ্চার হওয়া, যুব সমাজ এবং জনজীবনের সমস্যা সমাধান, নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে সামিল হওয়া প্রভৃতিই হলো ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ২৩ বৎসরের (১৯৬৭-৯০) বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রম। ভারতের ২৬টি রাজ্যের মধ্যে পাঁচ-ছয়টি রাজ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কম-বেশি সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই সংগঠনটি সি পি আই (এম)-এর অন্যতম প্রধান গণসংগঠনে পরিণত হয়েছে।

CPI-এর যুব সংগঠন :

"সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন" ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় যুব সংগঠন। কিন্তু পার্টি ১৯৬৪ সালে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর CPI ঐ সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ধারাবাহিকতাকেই বজায় রেখেছে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত CPI-এর যুব সংগঠনের ৯টি সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই সংগঠনের নাম 'সারা ভারত যুব ফেডারেশন' [All India Youth Federation— AIYF] ব্যবহার করা হয়।

এই সংগঠনের কর্মনীতি সাধারণভাবে অনেকটাই গতানুগতিক ছিল। ১৯৮০ থেকে কিছু গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। অর্থাৎ সিপিআই(এম)-এর সাথে সি পি আই কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রহণ করার পর সিপিআই(এম)-এর যুব সংগঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই যৌথ যুব আন্দোলনের কর্মসূচিকে অনুসরণ করে চলেছে।

১৯৯০ সালের ৬ই মে কেরালার কোচিন শহরে AIYF-এর নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যে সর্বভারতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তাতে আছে : সভাপতি— তারা সিং (পাঞ্জাব), সাধারণ সম্পাদক—রাজাই ম্যাথুথমাস (কেরালা), কোষাধ্যক্ষ— কে.পি.জয়দীপ (কেরালা) এবং সহ সভাপতিগণ যথাক্রমে পল্লব সেনগুপ্ত (পঃ বঙ্গ), সত্যেন মেলেরি (কেরালা), শ্রীনিবাস (অন্ধ্র), মুখতার মহম্মদ (উত্তরপ্রদেশ)।

নকশালবাড়িপন্থী যুব সংগঠন :

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়িপন্থী ছাত্র এবং যুবকদের 'RYSF' [Revolutionary Youth Student Federation] নামে একটি মিলিত সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপ্লবী যুব-ছাত্র প্রস্তুতি কমিটি" গঠন করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। সত্তরের দশকে সি পি আই (এম-এল) পার্টি ভেঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যাবার পর কয়েকটি গোষ্ঠী ছাত্র এবং যুব সংগঠন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। যুব সংগঠন গড়ার এই প্রচেষ্টা কোন রাজ্যেই কোন গোষ্ঠী দানা বাধতে সক্ষম হয় না। একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশে CPI(M.L)-এর Peoples War গোষ্ঠী ১৯৭৮ সালে Radical Youth League

[RYL] নামে নিজস্ব যুব সংগঠন গড়ে তুলেছে। এখনও এই নকশালবাড়িপন্থী যুব সংগঠনটি অন্ধ্রপ্রদেশকে কেন্দ্র করে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠনের প্রতি CPI(M.L) গোষ্ঠীটির পার্টিগত নির্দেশ হলো—জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে নির্যাতিত মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা উদ্বুদ্ধ করানো।[৪]

'নওজোয়ান সভা'(Young Patriot) নামে যুব সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টাও নকশালপন্থী যুবকদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির যুব সংগঠন :

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ছাড়াও ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় সকলের-ই যুব সংগঠন রয়েছে। এইসব যুব সংগঠনের বিস্তৃত বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক নয় বলেই শুধু তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি দেওয়া হল—

কংগ্রেস(ই)-র— যুব কংগ্রেস

জনতা দলের— যুবজনতা

বি জে পি— [এখনো এই দলের আনুষ্ঠনিক কোন যুব সংগঠনের স্বতন্ত্র পরিচিতি লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠেনি।]

বামপন্থী দলগুলির ক্ষেত্রে :

আর. এস. পি.-র— রেভিনিউশনারী ইউথ লীগ [R.Y.L]

এস. ইউ. সি-র— ডেমোক্রাটিক ইউথ্ অর্গাইনেজশন [D.Y.O]

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর— যুব লীগ [Y.L.= Youth League]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল, ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের যুব সংগঠন যুব কংগ্রেসের সাথে কমিউনিস্টদের যুব সংগঠনের সম্পর্ক সবসময় বিরোধিতার। জনতাদলের যুব সংগঠন যুবজনতার সাথে কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের ইস্যুভিত্তিক কখনো কখনো ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। R.S.P, F.B.-র সংগঠনের সাথে কমিউনিস্টদের যুব সংগঠনের সম্পর্ক প্রায় বেশিরভাগ সময়েই মিত্রতার। ষাটের দশকে পরবর্তী অধ্যায়ে SUCI-এর যুব সংগঠনের সাথে কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব সংগঠনের সম্পর্কের যে চিড় ধরেছিল, তা ১৯৯০ পর্যন্ত জোড়া লাগেনি।

এইটাই হল ১৯৯০ পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

তথ্যসূত্র :

১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ। পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।

২। বাসুদেব নারায়ণ কেরালায় মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

৩। ১৯৬৭, ১৫ই ডিসেম্বর দেশহিতৈষী-তে প্রকাশিত "যুব আন্দোলন প্রসঙ্গে" শীর্ষক হরিনারায়ণ অধিকারীর নিবন্ধ। পৃষ্ঠা ৮।

৪। To the Student Comrades of the Propaganda Squads Launching the "Go to Villages Campaign." পৃষ্ঠা ১৭।

উপমহাদেশের ছাত্র-যুব আন্দোলনের ইতিহাস পরিক্রমার শেষে

ভারত উপমহাদেশের ছাত্র-যুব আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট প্রভাব-এর দীর্ঘ পরিক্রমায় উত্থিত হয়েছে ঘটনার পর ঘটনা, নানা ভাবনা-চিন্তা, ছাত্র-যুব জীবনের মানসিকতার বিস্ফোরণ, জীবনধর্মী স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি ও নির্বান এবং বহুমুখী ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার নিঃস্ক্রমণ। দীর্ঘ ইতিহাসের প্রহেলিকাগুলি ঘটনার বিবরণে হয়েছে অপসৃয়মান। কিন্তু অতীতের বহু ঘটনার অন্তরালে রয়েছে অসংখ্য সুপ্ত প্রশ্ন। ভবিষ্যতের জন্য রয়েছে বিচার বিশ্লেষণ, গবেষণা, অন্বেষা এবং জিজ্ঞাসা।

ইতিহাস পরিক্রমার বিবরণে প্রতীয়মান— ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ছাত্র-যুব আন্দোলনের দুর্বার শক্তিসম্পন্ন তেজদীপ্ত প্রবাহ উপমহাদেশের প্রান্তে প্রান্তে বার বার আছড়ে পড়েছে, রাষ্ট্র-কাঠামোকে করেছে উদ্বেলিত এবং কোথাও কোথাও ঝড়ের তান্ডবের মতো দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। এমনকি তারপরেও ১৯৭৭-র কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বাধীন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অবসানের প্রেক্ষাপটে ছিল বিহার, গুজরাটের ছাত্র আন্দোলনের গতিশীল ঝড়। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৭ ভারতের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারগুলির পতন ও উত্থান, বহুমুখী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছাত্র আন্দোলনের প্রচন্ড চাপেরও ছিল এক কার্যকরী ভূমিকা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বহুধারার সাথে যুক্ত এবং বিভক্ত কমিউনিস্ট পরিচালিত ছাত্র সংগঠনগুলি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনেও নিজেদের যুক্ত রেখেছিল— তা ইতিহাসের বিবরণেই প্রকাশ। কিন্তু ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনের ফলে ১৯৬০-এর দশকের হাওয়া আর নেই। ছাত্র-যুব আন্দোলনের সেই দুর্বার শক্তি '৮০-র' দশকে ক্রমমৃয়মান। কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে ভারতের ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি তাদের নিজ নিজ দলীয় সরকার রক্ষায় ষাটের দশকের বিপরীতে ভিন্নমুখী আন্দোলন সংগঠনে লিপ্ত।

প্যারিসের সোবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ডানিয়েল কো-বেন্দিত, বার্লিনের ছাত্র নেতা রুডিদুৎশকে-র দুনিয়া কাঁপানো ছাত্র আন্দোলন এবং পশ্চিমী দুনিয়ার 'স্টুডেন্ট পাওয়ার'-এর তত্ত্ব ১৯৭০-৮০ থেকে ভারতের ছাত্র সমাজের স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ভারতের ছাত্রসমাজের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহাসিক ভূমিকা আজকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভারতের ছাত্র সমাজকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে সন্দিহান। নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়ার ঘটনায় ১৯৮০-৯০তে ভারতের ছাত্রসমাজের ক্ষোভ থাকলেও সে ক্ষোভ ফেটে পড়ে না। পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তী বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রামে ঐ দেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের প্রতি ভারতের ছাত্রসমাজের সেই সহমর্মীতা ৯০-এর সামরিক শাসনের পতনের দিনে ক্ষীণ কণ্ঠ, নীরব। ভারতের ছাত্রসমাজ যেন প্রেরণাহীন। বার্মার শহীদ কমিউনিস্ট নেতা আঙ সানের কন্যা বর্তমান বার্মার গণজাগরণের নেত্রী আউন সান সূচি ১৯৯০ থেকে যখন নজরবন্দি, তখন প্রতিবেশী ভারতের কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনগুলি কার্যত নিরব ভূমিকায়। কেন? এটাই জিজ্ঞাসা!! দেশ-বিদেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এটাই উত্তরকালের জন্য ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পরিক্রমণার বিষয়।

ষাটের দশকের তুলনায় সত্তর-আশির দশকে ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনে

সংখ্যাতথ্যের নিরিখে অনেক বেশি ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ষাটের দশকের মতো এই ঘটনাবহুল ছাত্র-যুব আন্দোলন শাসকশ্রেণির কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠেনি। ভারতের প্রখ্যাত একজন সংবাদিক এবং বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত ভারতের প্রাক্তন 'হাই কমিশনার' কুলদীপ নায়ার ১৯৮৩ সালের ভারতের ছাত্র আন্দোলনের একটি সরকারি হিসাব প্রকাশ করেছেন। এই হিসাবটি এইরূপ—"সারাদেশে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে ১৯৮৩ সালের সরকারি হিসাব পাওয়া গিয়েছে। তাতেই মোটামুটি আন্দোলনের ধাঁচটা বোঝা যায়। ৬৩% আন্দোলনের (৪৫০০ বার) মূলে ছিল শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সমস্যা, যেমন পরিবহন ব্যবস্থা, ২৯% আন্দোলনের (২০০০ বার) মূলে ছিল শিক্ষাগত সমস্যা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার জন্য আন্দোলন হয়েছে মাত্র ৮% (৫০০ বার)।

"মোট যতবার আন্দোলন হয়েছে তার ৪০% করেছে ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি, অন্যান্য সংস্থা করেছে ৬০%। ছাত্র ও যুব সংগঠনের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ, ন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন ও অল ইন্ডিয়া ইয়ুথ ফেডারেশন।

"অসমে এইসময় আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে সর্বাধিক ৭৭০টি। তখন এ রাজ্যে 'বিদেশী' বিতাড়নের আন্দোলন চলছিল। বিহারে ৭৩০, পশ্চিমবঙ্গে ৭০০, উত্তরপ্রদেশে ৬৭০, কেরলে ৫৮৫ ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৫২০টি ঘটনা ঘটেছে। হিংসাত্মক আন্দোলনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কেরলে— ২১৫টি। তারপর উত্তরপ্রদেশে—১৭৫টি, অসমে— ১৬০টি, বিহারে—১৬০টি, অন্ধ্রপ্রদেশে— ৯৫টি এবং পশ্চিমবঙ্গে— ৭৫টি।

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দেওয়া ১৯৮৩ সালের এই আন্দোলন তালিকায় দেখা যাচ্ছে, টানা বেশি দিন আন্দোলন হয়েছে বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে, বিহারের চম্পারণ জেলায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে, বরোদার পুলিশ কমিশনারকে বদলির প্রতিবাদে, অসমে নির্বাচন করার প্রতিবাদে, মহারাষ্ট্রে ইতিহাস বই সংশোধনের প্রতিবাদে এবং সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবাদে।"[১]

এই হিসাব আরেকটি চিত্রকে উন্মুক্ত করেছে। তা হল ছাত্র আন্দোলনের তরঙ্গক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গ ক্রমান্বয়েই শান্ত, সমাহিত, নিরুত্তাপ পথে হাঁটছে। এ-এক রাজনৈতিক আবর্তের উল্টো পুরাণ।

বাংলাদেশের সামরিক শাসক এরশাদ-এর ৯ বৎসরের শাসনের অবসান প্রচন্ড ছাত্র বিদ্রোহের চাপে ঘটলেও এবার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রসমাজের মধ্যে উল্লাস, সহানুভূতি, সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশের হাওয়া দেখা যায়নি। ভারতের কোন ছাত্র-যুব সংগঠন 'ভাষা আন্দোলন', 'মুক্তিসংগ্রাম'-এর সময়ের মত উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। অথচ জেনারেল এরশাদ-এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের আন্দোলনও একটি গৌরবময় ইতিহাস।

এই ইতিহাসের সংক্ষিপ্তায়ন :

১৯৮২ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' [বি এন পি] অভ্যন্তরীণ সংঘাতে জর্জরিত হলে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৮শে মার্চ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এরপর এই বছরেই সামরিক সরকার ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি শিক্ষানীতির প্রণয়ন

করে। এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। '১৯৮২ সালের ২১শে নভেম্বর প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি বাতিল, পুলিশী দমননীতি বন্ধ ও জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে নির্মিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৮৩ সালের ১১ই জানুয়ারি শিক্ষাভবন ঘেরাও করার কেন্দ্রীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তারপর থেকেই ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপ্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ৮-৭-৫ দলীয় রাজনৈতিক জোটগুলিও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনকে গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে রাজনৈতিক জোটগুলির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয়। রাজনৈতিক জোটগুলির লক্ষ্য ছিল এরশাদ প্রবর্তিত শাসন কাঠামোকে বজায় রেখে একটি সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের লক্ষ্য ছিল সামরিক তন্ত্রের উচ্ছেদ করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের লক্ষ্যে ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। ১৯৮৩-র ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ মিছিলে সমাবেশে সারা দেশে সামরিক নায়ক এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবাদ জানায়। দমনপীড়ন মোকাবিলা করেই ছাত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দল ছাত্র আন্দোলনকে চিরাচরিত প্রথায় 'হঠকারী' আন্দোলন বলে অভিহিত করে। ১৯৮৪-র ২৮শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র আন্দোলনের দু'জন সংগঠক সেলিম ও দেলোয়ারকে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট করে সামরিক বাহিনী হত্যা করে। এতে ছাত্র আন্দোলন বিদ্রোহে পরিণত হয়। ১৯৮৪-৮৫-৮৬ ছাত্র আন্দোলন ক্রমান্বয়েই শক্তিশালী হতে থাকে। ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলনও তীব্রতা পায়। ১৯৮৬ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে সরকার বাধ্য হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, ১৫ ও ৭ দলীয় রাজনৈতিক জোট প্রভৃতি 'সামরিক শাসকের কর্তৃত্বে কোন নির্বাচন নয়,— এই দাবীতে পার্লামেন্ট নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১৯৮৬-র ২১শে মার্চ তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। 'বি এন পি'-র নেতৃত্বাধীন ৭ দলের জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তই বহাল রাখে। রাজনৈতিক দল ও জোটগুলির এই পরস্পর বিরোধী ভূমিকার ফলে ১৯৮৬ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন হোঁচট খায়।

সংগ্রামী ছাত্রসমাজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটের সমর্থন ও আহ্বান ১৯৭৮-র ২৭-২৮-২৯শে জুলাই-এর ৫৪ ঘন্টাব্যাপী লাগাতার হরতালের মধ্য দিয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আবার সক্রিয় হয়। দাবি ওঠে— 'অবৈধ' পার্লামেন্ট বাতিল কর। সারা দেশে ছাত্র, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠার ফলে ১৯৮৬ সালের গঠিত সংসদ ১৯৮৮-র ৭ই জানুয়ারি ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জনসভায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে বহু মানুষকে হতাহত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায় গণবিক্ষোভ। এরশাদ দ্রুততার সাথে 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে, ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ, আরেকটি ভোটারবিহীন সংসদ নির্বাচন করে নেয়— রীতিমত বিনা প্রতিরোধে।'[৩]

কিন্তু এতে কোন কাজ হল না। বিশেষ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্র সংগঠনগুলির উদ্যোগে রাজনৈতিক জোটগুলি একসঙ্গে ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর ঢাকায়

কেন্দ্রীয় সচিবালয় অবরোধ করে। হাজার হাজার অবরোধকারী জঙ্গী সমাবেশের উপর পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলিতে নিহত হয় 'বিশ্ববিদ্যালয়-এর তরুণ ছাত্র জেহাদ'।

শহিদ ছাত্র জেহাদ-এর নাম নিয়ে ঢাকা মহানগরীর ছাত্রসমাজ আবার উত্তাল। প্রতিশোধে মরিয়া। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন এবার অপ্রতিরোধ্য। সারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের গর্জন— এরশাদ-এর পতন ঘটাও।

১০ই অক্টোবরের পর ছাত্রবিক্ষোভ ছাত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এরশাদ বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীরা রাজপথে বিক্ষোভ জানাচ্ছে এবং সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করে চলেছে। "১০ই অক্টোবর উত্তাল আন্দোলনের এ পর্যায়ে তিন জোট ২০ ও ২১শে নভেম্বরব্যাপী ৪৮ ঘন্টা হরতাল আহ্বান বাহিনীর একটি উৎসবের দিন। এই উৎসব ব্যাহত না করার অনুরোধ জানিয়ে সামরিক বাহিনী তিন জোটের কাছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞাপন দেয় এবং জোটগুলি সে অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সে দিনের হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়।"[৪]

রাজনৈতিক তিন জোটে এরশাদের 'সাংবিধানিক' বিদায়ের জন্য ১৯শে নভেম্বর একটি রূপরেখা তৈরি করেছিল। কিন্তু ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন গণসংগঠন এই আপোষ রফার দিকে যেতে নারাজ। তারা আন্দোলনকে জোড়দার করে এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য করাতে ইচ্ছুক। এরশাদ বুঝে নিল কোন মীমাংসার রাস্তা আর খোলা নেই। ছাত্র বিদ্রোহের সাথে জনগণ সামিল। এই অবস্থায় শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ২৭শে নভেম্বর এরশাদ সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলো। শুরু হলো সশস্ত্র সংঘর্ষ। নিহত হলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ডঃ মিলন। পরিণতি হল ভয়ঙ্কর, গোটা ঢাকা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে কার্ফ্যু জারি করলো। বাধ ভাঙা বন্যার বেগে সাধারণ মানুষ কার্ফ্যু অগ্রাহ্য করে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল। পুলিশ-মিলিটারির নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাজধানী ঢাকা এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি। অনেক পুলিশী কর্তা এবং সৈন্যবাহিনীর পদস্থ অফিসাররা লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ মানুষের উপর অত্যাচার ও আক্রমণ চালাতে অসম্মতি জানালেন। ১৯৯০, ৪ঠা ডিসেম্বর-ই অনুমিত হল জনগণের অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে একটি দুর্নীতিপরায়ণ, স্বৈরাচারি সামরিক জেনারেলের পরিচালিত সরকারের পতন অনিবার্য। ১৯৯০-এর ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হলো। গঠিত হল বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার এবং এই সরকার ঘোষণা করলো দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি। প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদসহ তার মন্ত্রীসভার কয়েকজন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হলো বিচার।

১৯৯০-এর বাংলাদেশের ছাত্রবিদ্রোহ সম্ভব করে তুলল সামরিক নায়কের একটানা নয় বৎসরের শাসনের অবসান ঘটাতে এবং বাধ্য করলো রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল এরশাদকে বিচারের কাঠগড়ার দাঁড় করিয়ে বন্দিজীবন যাপনে। বাংলাদেশের এই সকল ছাত্র বিদ্রোহের দিনে প্রশ্ন ওঠেনি কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্টের। সামরিক নায়কের শাসনের অবসান চাই— এই কমন ইস্যুতে সকলেই ছিল সংগ্রামের ময়দানে ঐক্যবদ্ধ। তাই, আশির দশকের শেষ এবং নব্বই-এর দশকের সূচনার প্রারম্ভে বাংলাদেশের ছাত্রবিদ্রোহের এই সাফল্য এবং গৌরবময় বিজয় ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রহ্মদেশের সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে গণমুক্তি সংগ্রামে এই দেশের ছাত্রসমাজের ভূমিকা ৮০-র দশকের শেষে আরও গৌরবজনক। কমিউনিস্টরা বিভেদ অনৈক্যের পথে চলা সত্ত্বেও ছাত্র-যুব সমাজ স্বৈরতন্ত্রের নায়ক নে উইনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ১৯৯০-র সামরিক বেড়াজালের মধ্যে ব্রহ্মদেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নে উইনের দলবল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। শতকরা ৮০ ভাগের বেশি ভোট পেয়ে আউন সান সুচির নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি' ব্রহ্মদেশের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। এই জয়ের মূলে রয়েছে ব্রহ্মদেশের ছাত্র-যুবদের ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী আন্দোলন। কিন্তু এই জয় সত্ত্বেও স্বৈরাচারী নে উইন 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি'-কে সরকার গঠন করতে দেয়নি। উপরন্তু নেত্রী আউন সান সুচিকে নজরবন্দি করে রেখেছে। সামরিক শাসনের এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাই শুরু হয়েছে নতুন করে আরও দুর্বার গণমুক্তি সংগ্রাম। ছাত্র-যুব সমাজ লড়ছে সে সংগ্রামে প্রবল বিক্রমে।

মতাদর্শগত সংগ্রামের চক্রব্যূহে কমিউনিস্টরা বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে আবদ্ধ। তাই, ভারত উপমহাদেশের সমকালীন ছাত্র-যুব আন্দোলনে কমিউনিস্ট প্রভাবও নজরবন্দি। বিংশশতাব্দীর বিশ-তিরিশের দশকে ভারতের ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট প্রভাবের যে অগ্রগতি সূচিত হয়ে দুর্বার বেগে অনেক আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছিল, বিশেষ করে সত্তর-আশি-নব্বই দশকে-চোরাবালিতে সে অগ্র-প্রবাহ আটকে পড়েছে। সামনে একবিংশ শতাব্দী। নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী, নতুন মানবজাতি এবং মুক্ত মানবিকতার পথের খোঁজে বেরুতে হবে সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ জীবন-যৌবন-তারুণ্যকে। উত্তরকালের আন্দোলন সংগ্রামের কঠিন পথের যাত্রী হিসেবে ইতিহাসের পথে পথে শুরু করতে হবে পরিক্রমা।

তথ্যসূত্র :

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা জুন, ১৯৮৯; পৃষ্ঠা ৪।
২। গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন : মানুষের সৃজনশীল উত্থান প্রসঙ্গে, নুরুল কবীর; পৃষ্ঠা ১৬৫।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৫।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৬।

দশম অধ্যায়

এক নজরে কিছু তথ্য-ঘটনা

প্রথম যুগের ছাত্র সংগঠন
বাংলাপ্রদেশ (১৮২৬-১৯৩০)

১। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮১৭ সালে। ১৮২৬ সালে হেনরি লুই ভিভিয়েন ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হয়ে আসার পর, তাঁর বাড়িতে ১৮২৭-২৮ সালে ছাত্রদের নিয়ে গড়া হলো— 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'।

২। 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা'— ১৮৩৩ সালে।

৩। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'— ১৮৩৮ সালে।

৪। 'দেশহিতৈষী সভা'— ১৮৪১ সালে।

৫। ১৮৭৫ সালে ছাত্ররা নিজেরাই গড়ে 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'।

৬। ৪/১, কলেজ স্কোয়ারে ১৯০৫ সালে— 'এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'।

৭। কৃষ্ণনগরে 'ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' [সাল উল্লেখ নেই]।

৮। ১৯২৪ সালে 'ক্যালকাটা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'।

৯। 'All Bengal Students Association — ABSA [নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন] —১৯২৮ এর ২২-২৫শে সেপ্টেম্বর।

১০। ১৯২৯ সালে 'ABSA' ভেঙে হলো 'BPSA'।

১১। 'তরুণ ছাত্র সংঘ' [সাল উল্লেখ নেই]।

১২। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রলীগ' [সঠিক সাল-তারিখ পাওয়া যায়নি।]

১৮৩৮-এর প্রগতিশীল যুবনেতা

১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত ২০০ ব্যক্তির সভা থেকে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' নামে যে সংগঠন গড়া হয়েছিল, তার উদ্যোক্তরা ছিলেন প্রগতিশীল যুবনেতা। ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি পাঁচজন প্রগতিবাদী যুব নেতার স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্রে ১২ই মার্চের ঐ সভা আহুত হয়েছিল। এই পাঁচজন প্রগতিবাদী যুব নেতারা হলেন—তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে।

প্রথম যুগে ছাত্রদের রাজনৈতিক সংগঠন

১। ১৮৪৩-এর ২৫শে এপ্রিল "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি";
২। আত্মরক্ষা সমিতি;
৩। স্বদেশী বান্ধব সমিতি;
৪। ছাত্রদল (১৯৩২)।

ছাত্র আন্দোলনের প্রথম যুগে সংবাদ প্রকাশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

'বেঙ্গল হরকরা' বা জনবুল। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', কলকাতা ১৮৪২। 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' ১৮৩১। 'রিফর্মার', কলকাতা, ১৮৩৩। 'ক্যালকাটা লিটারেরি গেজেট', জুন ১৮৩৫। 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩৩। 'সোমপ্রকাশ'। 'সঞ্জিবনী'। 'বেঙ্গলী'। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগান্তর'। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'। নজরুল ইসলাম সম্পাদিত "ধূমকেতু'। ১৯২১-২২ সালে 'শঙ্খ'। 'ফরোয়ার্ড' ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮। 'লিবার্টি' আগস্ট ১৯২৯। 'সমাচার চন্দ্রিকা'। 'রিফর্মার' কলিকাতা, ১৮৩৩। 'মাসিক বসুমতী', ফাল্গুন, ১৯৩১। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। 'দি স্টেটসম্যান' (১৯৩৭, ৩রা মার্চ)। ' প্রবাসী' মাঘ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

ছাত্র আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহের সহায়ক পুস্তকাদি

১। কৃষ্ণকুমার মিত্র : 'আত্মচরিত'।
২। বিপিনচন্দ্র পাল : 'নবযুগের বাংলা'।
৩। চারুচন্দ্র দত্ত : 'পুরানো কথা'।
৪। তেন্ডুলকর : 'মহাত্মা গান্ধী' ২য় খন্ড।
৫। তুষার চট্রোপাধ্যায় : 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ২০ বৎসর', ১৯৭৫।
৬। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : 'কমিউনিস্ট হলাম', মে, ১৯৭৬।
৭। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু : 'আত্মজীবনী'।
৮। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'আত্মচরিত'।
৯। প্রশান্ত চন্দ্র মহলনাবীশ : 'কবিকথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৫০।
১০। গোলাম কুদ্দুস : 'দুই মূর্তি'; সম্বোধন, আগস্ট ১৯৬৫।
১১। বিজন রায় (সুশোভন সরকার) : 'জাপানী শাসনের আসল রূপ', জুলাই, ১৯৪২।

ভারতের ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনার প্রচার

১। ১৯২১-২২ সালে 'শঙ্খ' পত্রিকায় শচীন সান্ন্যাল-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ।
২। ১৯২২ সালে 'শঙ্খ' পত্রিকায় প্রকাশিত বার্লিন থেকে লেখা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের দীর্ঘ চিঠি।
৩। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তর প্রবন্ধ।

৪। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত তরুণ সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখদের ভাষণ।

৫। ১৯২৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর মৈমনসিং-এ অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলনে তখনকার ছাত্রনেতা রেবতী বর্মণের দীর্ঘ ভাষণ।

৬। বিশের দশকের শেষে অসংখ্য ছাত্র সম্মেলন সভা-সমিতিতে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্রের উপর তাত্ত্বিক ভাষণ।

৭। ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী-র 'সমদর্শী গোষ্ঠী' মারফৎ সমাজতন্ত্রের ভাবনা-চিন্তা প্রচার।

প্রথম যুগের কয়েকজন শহিদ [১৯২২-৪৭]

১। গুণধর হাজরা

[১৯২২, ২৮শে এপ্রিল। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার প্রথম ছাত্র শহিদ।]

২। সুকুমার ব্যানার্জি [৩০-এর দশকের শেষে, রাণীগঞ্জ কাগজ কলের শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট আন্দোলনে এই ছাত্রকর্মী যোগ দেন এবং শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।]

৩। সোমেন চন্দ্র [১৯৪২, ৮ই মার্চ, ঢাকা, ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন কর্মী।]

৪। ফণী চক্রবর্ত্তী [১৯৪২, মৈমনসিং।]

৫। ভানু মজুমদার [ঐ, ঐ।]

৬। কচি নাগ [ঐ, ঐ।]

৭। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯৪৫, ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের বিচারের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘটের দিনে কলকাতায়। আরেকজনও শহিদ হলেন এইদিন—আবদুস সালাম (তিনি ছাত্র ছিলেন না)]।

৮। কমল দোন্দে [১৯৪৬, বোম্বাই]।

৯। ধীর রঞ্জন [১৯৪৭, ২১শে জানুয়ারি কলকাতায় ভিয়েতনাম দিবসে]

১০। সুখেন্দু বিকাশ [ঐ]

১১। অমলেন্দু [১৯৪৭, ২২শে জানুয়ারি ভিয়েতনাম দিবসে গুলিচালনা ও খুনের প্রতিবাদে মৈমনসিং-এ।]

প্রথম যুগের ছাত্র গোষ্ঠী ও সংগঠনের কয়েকটি পত্রিকা [১৯২৮-৪৭]

(১) এ বি এস এ-র মুখপত্র 'ছাত্র' (১৯২৮)। (২) 'পার্থেনন' নামে ডিরোজিওর নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রদের একটি পত্রিকা (১৯২৮-২৯)। (৩) 'ছাত্রদল' ছাত্রগোষ্ঠী পরিচালিত (১৯৩২)। (৪) 'ছাত্র অভিযান'— বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের মাসিক মুখপত্র (১৯৩৮)। (৫) 'ছাত্রশক্তি' (১৯৪০)। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী মারুফ হোসেন। (৬) নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র 'দি স্টুডেন্ট' (১৯৪৩)।

লন্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রচারের জন্য লন্ডনে প্রথম যে ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তার নাম ছিল— 'ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস গ্রুপ'। তারপর ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় 'লন্ডন মজলিস্'। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন জ্যোতি বসু। ছাত্রদের এই কমিউনিস্ট গ্রুপের সাথে কুমার মঙ্গলম, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী, এস কে কৃষ্ণণ, পার্বতী মঙ্গলম, নিখিল চক্রবর্তী, অরুণ বসু, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য্য প্রমুখ যুক্ত ছিলেন।

[সূত্র : দেশ : ৫ মাঘ ১৩৯৭, ১৯ জানুয়ারি ১৯১১, ৫৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

-"বাবুদের মার্কসবাদ" - শঙ্কর ঘোষ, পৃষ্ঠা ১৯।]

লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের কমিউনিজমের প্রতি আর্কষণ

১৯২৭-২৮ সালে ইংলন্ডে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সাম্যবাদের প্রতি একটা ঝোঁক দেখা দেয়। যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন— সাহেবজাদা মাহমুদ উজ্‌জফর, সাজ্জাদ জহীর, কোণ্ডার আশরফ, সিংমান, প্রমোদরঞ্জন সেন, বীরেশ গুহ, অমিয় বসু (টগরদা)।

১৯২৮ সালে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত World Youth Peace Conference-এ ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন— নলিনাক্ষ সান্যাল, বীরেশ গুহ, শ্রীমতি হাতি সিং, অর্জুন রায়, নির্মল সেনগুপ্ত, রাজেন্দ্র প্রসাদ। [এই সম্মেলন ছিল মূলত কমিউনিস্ট প্রভাবিত— লেখক]

অক্সফোর্ডে ভারতীয় ছাত্রদের একটি পত্রিকা বেরতো, তার নাম ছিল "ভারত", পরে নাম হয়েছিল "নিউ ভারত"। প্রথম সম্পাদক— সাজ্জাদ জহীর, পরে নির্মল সেনগুপ্ত। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই কাগজের (ত্রৈমাসিক) দেখাশুনা করতন ক্লেমেন্স দত্ত, টী. এ জ্যাকসন।

[সূত্র: "লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রভাব" শীর্ষক পুস্তক; নির্মল সেনগুপ্ত।]

কলকাতায় প্রথম ফরাসী বিপ্লবকে অভিবাদন

"১৮৩০-এ কলকাতার একদল ছাত্র ফরাসী বিপ্লবকে অভিবাদন জানিয়ে, মনুমেন্টের মাথায় উড়িয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর জয় পতাকাকে।"

[সূত্র: গৌতম চট্টোপাধ্যায়; স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ; পৃষ্ঠা ৪৮]

'নো পাসারান'

আর তার শতবর্ষ পরে [ফরাসী বিপ্লবকে কলকাতায় অভিবাদন জানাবার একশত বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩০ থেকে ১৯৩০— লেখক।] তাদেরই পতাকাবাহী বাংলার ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে এসে দাঁড়াল স্পেন ও চীনের মরণজয়ী ছাত্র যুব সমাজের পাশে, বিশ্বের যুবশক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘোষণা করল 'নো পাসারান'— ফ্যাসিবাদকে রুখবই।"

[সূত্র : গৌতম চট্টোপাধ্যায়; স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ; পৃষ্ঠা ৪৮]

বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রনেতৃত্ব

তিরিশের দশকে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে আবার মাথা চাড়া দেয় বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলন। তার পুরোভাগে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আউন সান, থান টুন ও তাঁদের ভারতীয় বন্ধুরা হরিনারায়ণ ঘোষাল, অমর নাগ, সুবোধ মুখার্জি, অমর দে, মাধব ও গোপাল মুন্সী প্রমুখ। গড়ে ওঠে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদলে এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চ—দো বার্মা (আমাদের বার্মা)।

[কালান্তর, কলকাতা ১১ নভেম্বর ১৯১১, পৃষ্ঠা-২, গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য— ১৯৪০ সালে গোপনে বামার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা— আউন সান।

সব চাইতে বেশি কারাদন্ডে দন্ডিত একজন ছাত্রনেতা

"ভারতে সব চাইতে বেশি কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ছাত্রনেতা রবিদাস মেহরোত্রীকে। শান্তিভঙ্গের দায়ে ১৯০ বার জেলে গেছেন তিনি।"

[সূত্র : সাপ্তাহিক বর্তমান, ১২ই মে ১৯৯০, মধুবন্তীর কলাম, পৃষ্ঠা-৫৪]

ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনের সাথে যুক্ত উল্লেখযোগ্য যাঁরা

অবিভক্ত বাংলায় : ১৮৩৩-১৯০৫

১। রাজা রামমোহন রায়ের ছোট ছেলে রমাপ্রসাদ রায় (হিন্দু কলেজ)
২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (হিন্দু কলেজ)
৩। নবীন মাধব দে (হিন্দু কলেজ)
৪। দ্বারকানাথ মিত্র (হিন্দু কলেজ)
৫। শ্যামাচরণ গুপ্ত (হিন্দু কলেজ)
৬। জয়গোপাল বসু
৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৮। মধুসূদন দত্ত
৯। প্যারীচাঁদ মিত্র
১০। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। রামগোপাল ঘোষ
১২। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৩। মহেশ চন্দ্র দেব
১৪। সারদাপ্রসাদ ঘোষ (হিন্দু কলেজ)
১৫। আনন্দমোহন বসু
১৬। কৃষ্ণকুমার মিত্র

১৯০৫-১৯০৭

১। শচীন্দ্র প্রসাদ বসু (সি টি কলেজ)
২। রমাকান্ত রায় (জাপান ফেরৎ তরুণ ইঞ্জিনিয়ার)
৩। ক্ষুদিরাম বসু (মেদিনীপুর)
৪। শচীন্দ্রনাথ বসু
৫। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা (বরিশাল)
৬। সুশীল সেন

১৯২১-১৯৩০

১। গুণধর হাজরা (মেদিনীপুর)
২। শ্রীপতিচরণ করাল (বঙ্গবাসী কলেজ)
৩। সতীশ চন্দ্র সামন্ত (যাঃ ইঃ কলেজ)
৪। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (বহরমপুর কলেজ)
৫। প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (কৃষ্ণনগর কলেজ)
৬। প্রমোদ ঘোষাল (প্রেসিডেন্সি কলেজ)
৭। শচীন্দ্র নাথ মিত্র (স্কটিশ চার্চ কলেজ)
৮। বীরেন দাশগুপ্ত (যাঃ ইঃ কলেজ)
৯। অক্ষয় সরকার (যাঃ ইঃ কলেজ)
১০। রেবতী বর্মন
১১। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৩১-১৯৪৭

১। কমল সরকার ('ছাত্রদল' গ্রুপ)
২। সুশীল ভদ্র ('ছাত্রদল' গ্রুপ)
৩। সুশীল চ্যাটার্জী ('ছাত্রদল' গ্রুপ)
৪। দেবাংশু সেনগুপ্ত ('ছাত্রদল' গ্রুপ)
৫। ধরিত্রী গাঙ্গুলী (বিদ্যাসাগর কলেজ)
৬। উমাপ্রসাদ মজুমদার (বিদ্যাসাগর কলেজ)
৭। সনৎ রায়চৌধুরী
৮। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। বিশ্বনাথ দুবে
১০। নন্দ বসু
১১। নৃপেন চক্রবর্তী
১২। কালীপদ মুখোপাধ্যায় (ছোট)
১৩। কে এস আহমদ
১৪। উমাপদ মুখোপাধ্যায়
১৫। নন্দলাল বসু
১৬। প্রশান্ত সান্যাল
১৭। অমিয় মুখার্জি
১৮। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য
১৯। দিলীপ রায়চৌধুরী
২০। সুভাষ মখোপাধ্যায় (কবি)
২১। মৃণাল সেন (চলচ্চিত্র পরিচালক)
২২। অরবিন্দ বসু
২৩। কল্যাণ বসু
২৪। রামকৃষ্ণ মৈত্র
২৫। শুভ্রাংশু মৈত্র
২৬। যজ্ঞদত্ত শর্মা
২৭। সুকান্ত ভট্টাচার্য (কবি)
২৮। গোলাম কুদ্দুস (কবি)
২৯। রাম বসু (কবি)
৩০। সুচিত্রা মিত্র (গায়িকা)
৩১। সাধন গুপ্ত
৩২। তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী-র শিল্পী)
৩৩। সোমনাথ হোড় (চিত্রকর)
৩৪। সলিল চৌধুরী (সংগীতকার)
৩৫। গৌতম চট্টোপাধ্যায়
৩৬। রমেন মুখার্জি
৩৭। গীতা মুখার্জি
৩৮। অরুণ সেন
৩৯। কমলাপতি রায়
৪০। অলকা মজুমদার
৪১। দেবকুমার বসু
৪২। হরিপদ মুখার্জি

অন্যান্য প্রদেশে [চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে]

পাঞ্জাব

১। প্রবোধ চন্দ (১৯৩৮) ২। সত্যপাল ডাং (১৯৪৫) ৩। ও. পি. আগরওয়াল ৪। বলরাজ মেহেতা ৫। বিমলা ভাকনা ৬। প্রেম সিং

উত্তরপ্রদেশ

১। এস, ফারুক্কী ২। কালীপ্রসাদ শুক্লা ৩। রমেশ সিনহা ৪। কৈলাস আনন্দ ৫। ইকবাল নেয়াজী ৬। সুলতান নেয়াজী ৭। জাবেদ আসরাফ ৮। ইকতেদার আলম ৯। ইকবাল হবীর ১০। নকভি।

বিহার

১। সুনীল মুখার্জি ২। চন্দরপ্রকাশ ৩। গণেশ বিদ্যার্থী ৪। গয়া প্রসাদ ৫। সুরেশ ভাট।

উড়িষ্যা

১। দয়মন্তী পানী ২। ভারতী মিশ্র ৩। শিবাজী পট্টনায়ক ৪। প্রবীর পালিত ৫। রমেশ পান্ডা ৬। বসন্ত।

অন্ধ্র

১। নরসিং রাও ২। দাসরী থিম্মা রেড্ডি ৩। নারায়ণ রাও ৪। তলনট রাও।

কেরালা

১। বাসুদেবন নায়ার ২। সি কে এন্টানি ৩। চন্দ্রাপ্পান।

বোম্বাই

১। ঘানেকার

দিল্লী

১। জিতেন্দর ২। অর্জ্জুন দেব।

আসাম

১। দেবু বড়ুয়া ২। হীরেন বড় গোঁসাই ৩। কমল বড়ুয়া

১৯৪৭ পরবর্তী কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনের উল্লেখযোগ্য যাঁরা

পশ্চিমবঙ্গ (১৯৪৮-১৯৬৩)

হীরেন দাশগুপ্ত (কলকাতা)
প্রতুল লাহিড়ী (কলকাতা)
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (কলকাতা)
পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা)
গোপাল মুখার্জি (কলকাতা)
পার্থ সেনগুপ্ত (কলকাতা)
পল্টু দাশগুপ্ত (কলকাতা)
বিমান বসু (কলকাতা)
মলয় চ্যাটার্জী (কলকাতা)
আশিষ মজুমদার (কলকাতা)
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা)
গুরুদাস দাশগুপ্ত (কলকাতা)
নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য (কলকাতা)
জ্যোতি চ্যাটার্জি (কলকাতা)
সোমেশ হোমচৌধুরী (কলকাতা)
বিপ্লব দাশগুপ্ত (কলকাতা)
সুভাষ চক্রবর্তী (২৪ পরগণা)
শ্যামল চক্রবর্তী (২৪ পরগণা)
অরবিন্দ ঘোষ (২৪ পরগণা)
দীনেশ মজুমদার (নদীয়া-২৪ পরগণা)
হরিনারায়ণ অধিকারী (নদীয়া)
সুশান্ত হালদার (নদীয়া)
নিতাই সরকার (নদীয়া)
মদন সাহা (নদীয়া)
বিভা ঘোষ গোস্বামী (নদীয়া)
রবি ভট্টাচার্য (নদীয়া)
গোরীশঙ্কর বসু (হাওড়া)
সুবিনয় ঘোষ (হাওড়া)

সরল সেন (হাওড়া)
শান্তশ্রী চ্যাটার্জি (হুগলী)
কালী ব্যানার্জি (হুগলী)
নিমাই রাউথ (বর্ধমান)
অশোক মাইতি (মেদিনীপুর)
পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত (মেদিনীপুর)
জগন্নাথ পান্ডে (শান্তিনিকেতন)
প্রভাত রায়চৌধুরী (মুর্শিদাবাদ)
আনন্দ ব্যানার্জী (মালদহ)
শৈলেন সরকার (মালদহ)
তেজারত হোসেন (বীরভূম)
সুনীল সেনগুপ্ত (বীরভূম)
বীরেন চক্রবর্তী (দার্জিলিং)
মানিক সরকার (জলপাইগুড়ি)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিগণ

[১৯৬৪-র ভাঙন পর্যন্ত]

কালিপদ মুখার্জী— সাধারণ সম্পাদক	কে.এম.আহমেদ— সভাপতি
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়— সাধারণ সম্পাদক	কে.এম.আহমেদ— সভাপতি
অবনী লাহিড়ী— সাধারণ সম্পাদক	কে.এম.আহমেদ— সভাপতি
প্রশান্ত সান্যাল— সাধারণ সম্পাদক	কে.এম.আহমেদ— সভাপতি
শংকর রায়চৌধুরী— সাধারণ সম্পাদক	সাধন গুপ্ত— সভাপতি
অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য— সাধারণ সম্পাদক	অমলেন্দু চ্যাটার্জি— সভাপতি
গীতা মুখার্জি— সাধারণ সম্পাদক	গৌতম চ্যাটার্জি— সভাপতি
সুখেন্দু মজুমদার— সাধারণ সম্পাদক	সরোজ হাজরা— সভাপতি
নৃপেন ব্যানার্জি— সাধারণ সম্পাদক	সুখেন্দু মজুমদার— সভাপতি
হীরেন দাশগুপ্ত— সাধারণ সম্পাদক	সুখেন্দু মজুমদার— সভাপতি
প্রবীর রায়চৌধুরী— সাধারণ সম্পাদক	হীরেন দাশগুপ্ত— সভাপতি
সুনীল সেনগুপ্ত— সাধারণ সম্পাদক	হীরেন দাশগুপ্ত— সভাপতি
গুরুদাস দাশগুপ্ত— সাধারণ সম্পাদক	সুনীল সেনগুপ্ত— সভাপতি
নন্দগোপাল ভট্টাচার্য— সাধারণ সম্পাদক	গুরুদাস দাশগুপ্ত— সভাপতি
নন্দগোপাল ভট্টাচার্য— সাধারণ সম্পাদক	দীনেশ মজুমদার— সভাপতি

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ পর্ব

১৯৭০ সালের জুন মাসের ১লা থেকে ৭ই কলিকাতায় সিপিআই(এম)-এর বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত একটি সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনের মাধ্যমে সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগঠন 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশন' গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে একটি সারা ভারত প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

এই প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা হলেন—

১। বিমান বসু, আহ্বায়ক— সভাপতি, বি. পি. এস. এফ।
২। সুভাষ চক্রবর্তী— সাধারণ সম্পাদক, বি. পি. এস. এফ।
৩। শ্যামল চক্রবর্তী— সহ-সভাপতি, বি. পি. এস. এফ।

৪। সি ভাস্করণ— সাধারণ সম্পাদক, কেরল, এস, এফ।
৫। পি. পি. আবুবকর— সভাপতি, কেরল, এস, এফ।
৬। আর রামস্বামী— সভাপতি, তামিলনাড়ু এস. এফ।
৭। আর নারায়নন্— সাধারণ সম্পাদক, তামিলনাড়ু এস, এফ।
৮। মানিক সরকার— সাধারণ সম্পাদক, ত্রিপুরা এস. এফ।
৯। উদ্ধব বর্মন— সাধারণ সম্পাদক, এ. পি. এস. এফ।
১০। উমেন্দ্রপ্রসাদ সিং— সভাপতি, বিহার এস. এফ।
১১। শক্তিধর দাস— উড়িষ্যা, এস. এফ।
১২। এ. পি. ভিট্রল— অন্ধ্র, এস. এফ।
১৩। বলদেব সিং— পাঞ্জাব, এস. এফ।
১৪। আই. আর. দুর্গাপ্রসাদ— কর্ণাটক এস. এফ।

উপরে উল্লিখিত প্রস্তুতি কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০-এর অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গের দমদমে। এই উপলক্ষে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই অভ্যর্থনা কমিটিতে ছিলেন— চেয়ারম্যান সুধীর ভট্টাচার্য (চেয়ারম্যান, দমদম মিউনিসিপ্যালিটি), সম্পাদক শিবেশ চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ— রমলা ভট্টাচার্য, রবি সরকার, কাটু বসু, প্রবীর গাঙ্গুলী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, রাণী বিশ্বাস, তপন চক্রবর্তী, কনক চক্রবর্তী, ফণী সাহা, তারক চক্রবর্তী, বিতানবিহারী গুহঠাকুরতা।

১৯৭০-১২ই অক্টোবর দমদম ক্লাইভ হাউস ময়দানে এই সারা ভারত সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে সি পি আই (এম)-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত ভাষণ দেন। তাছাড়া প্রকাশ্য অধিবেশনে ছাত্রনেতৃবৃন্দ বিমান বসু, ভাস্করণ (কেরালা), বলদেব সিং (পাঞ্জাব) এবং সুভাষ চক্রবর্তী বক্তৃতা করেন।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের (S.F.I) প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ১৯৭১ সালে কেরলের ত্রিবান্দমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ২রা থেকে ৬ই জানুয়ারি কলিকাতায়।

A.I.S.F.-এর সাধারণ সম্পাদক
(১৯৩৬ থেকে ১৯৬২)

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের জন্মকাল থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের নাম (১৯৬২ পর্যন্ত) নিম্নে দেওয়া হল। কারণ এর পরেই ছাত্র ফেডারেশন চীন-সোভিয়েতের বিরোধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

এম, এল সা
আনসার হারবাণী
জায়দী
রবীন্দ্র ভার্মা
এম, এ, ফারুক্কী
সত্যপাল ডাং
অন্নদা শঙ্কর
সত্যপাল ডাং
ও, পি, সরবওফাল (অস্থায়ী, কার্যকরী)
এন, আর, দাসরী
সুখেন্দু মজুমদার
হীরেন দাশগুপ্ত

পরিশিষ্ট - ১

'নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতি'র প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে জওহরলাল নেহরুর ভাষণ

(কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯২৮)

[গৌতম চট্টোপাধ্যায়-এর "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ" থেকে পুনর্মুদ্রিত— লেখক]

তোমরা, বাংলার তরুণ-তরুণীরা তোমরা কি সাহসের সঙ্গে চিন্তা ও কাজ করতে রাজি আছো? তোমরা কি সারা পৃথিবীর তরুণ-তরুণীর কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়তে রাজি আছো? শুধু তোমাদের স্বদেশ থেকে উদ্ধত বিদেশী রাজকে উচ্ছেদ করার জন্যই নয়, এই দুর্ভাগা জগৎকে বদলে উন্নততর ও সুখী সমাজ গড়ার জন্যও লড়তে কি তোমরা রাজি? এই তোমাদের সামনে সমস্যা। আর তোমরা যদি আন্তরিকভাবে, সাহসের সঙ্গে মনস্থির করে পথের যাবতীয় বাধা ভাঙতে এগোও— তবে সব বাধাই ভাঙতে হবে, বিদেশী শাসকের চাপিয়ে দেওয়া বাধাই হোক, আর দেশের প্রাচীন লোকাচারের বাধাই হোক। তোমাদের আদর্শকে পরিষ্কার রাখতে হবে, নয়তো তোমাদের স্বপ্নের প্রাসাদ তোমরা কেমন করে গড়ে তুলবে? কাদামাটি দিয়ে কি বিশাল প্রাসাদ গড়া যায়, না খড় দিয়ে সেতু রচনা করা যায়?

সেই আদর্শ কি রকম হবে? যে কোন প্রগতির জন্যই চাই জাতীয় স্বাধীনতা এবং ইচ্ছেমত এগিয়ে যাবার পরিপূর্ণ অধিকার। তা বাদ দিয়ে কোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার মানে যেন না হয় যে আমরা যুদ্ধকামী দেশগুলির সংখ্যা বাড়াব। আমাদের স্বাধীনতা যেন সেই বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের পথে একটা পদক্ষেপ হয়, যা পৃথিবীতে শান্তি এবং মৈত্রী আনতে সাহায্য করবে।

...আমাদের বলা হয় যে জমিদার এবং চাষী, ধনিক এবং শ্রমিক—সকলের প্রতিই ন্যায়বিচার করতে হবে এবং ন্যায়বিচারের মানে হচ্ছে স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করা। এই ধরনের ন্যায়বিচারই পৃথিবীতে পরিবেশন করছে রাষ্ট্রসংঘ। স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করে, যার মানে দাঁড়াচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অর্ধেক পৃথিবীকে পদদলিত করে শোষণ করছে। এই স্থিতাবস্থা তো জঘন্য অবিচার, এবং একে যারা রক্ষা করতে চায়, তারা আসলে অবিচারের সমর্থক।

তোমাদের আদর্শ যদি হয় সামাজিক সমানাধিকার এবং বিশ্বমৈত্রী, তাহলে তোমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লড়তে হবে। দেশের বহু লোক সামজতন্ত্র কথাটা শুনলেই ঘাবড়ে যায়। তাতে কিছু আসে যায় না, কেন না ভয় ঐসব মানুষদের নিত্যসঙ্গী। তারা ইস্কুলে লেখাপড়া শেষ করার পর পৃথিবীতে যত কিছু বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে তাদের কোনও জ্ঞানই নেই, এবং সেইজন্যই যা তারা জানে না, যা তারা বোঝে না, তাকে তারা ভয় পায়। যেসব নতুন চিন্তা ও আদর্শ আজ সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে তুলছে, তোমরা, দেশের তরুণরাই তো তাদের বুঝবার চেষ্টা করবে, তাদের তোমাদের স্বদেশে প্রয়োগ করার চেষ্টা

করবে। আজকের দীর্ণ-বিদীর্ণ পৃথিবীর একমাত্র আশাভরসা সমাজতন্ত্রই।

....সমাজতন্ত্রের নাম শুনলেই আমাদের যেসব বন্ধুরা ভয় পেয়ে যান, কমিউনিজমের কথা শুনলেই তাঁরা কি বলবেন? কমিউনিজম শব্দটি শুনলেই আমাদের পাকাচুল নেতারা ঘরে বসে ঘন ঘন মাথা নাড়েন আর পাকা দাড়িতে হাত বুলান। আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে যে কমিউনিজম বলতে যে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে তাঁদের সামান্য জ্ঞানও আছে কিনা! তোমরা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছ যে কেন্দ্রীয় আইনসভার সরকার তাড়াহুড়ো করে দুটো আইন পাশ করতে চাইছে— একটা আইন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গলা টিপে মারবার জন্য, অপরটা কমিউনিস্ট বলে সরকার সন্দেহ করে এমন সব লোককে বন্দি রাখার জন্য। তোমাদের খুব আশ্চর্য লাগছে না, যে মহাপরাক্রান্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, যাদের এত কামান, বিমান আর ট্যাঙ্ক রয়েছে, তারা সামান্য কয়েকটি মানুষকে এত ভয় পাচ্ছে কেন, যে মানুষগুলি একটা নতুন আদর্শ প্রচার করতে চাইছে মাত্র? কি আছে এই আদর্শের ভিতরে যার জোরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাসের বাড়ির মতো ভেঙ্গে পড়ার ভয় পাচ্ছে? যে বিরাট সাম্রাজ্য অর্দ্ধেক পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে, সেটা যে আসলে কত ফোঁপরা, তার সেরা প্রমাণ তো এখানেই। এই দৈত্যের পা দুটো একেবারেই নড়বড়ে। যদি মতবাদ বিপজ্জনক হয়, তো তাকে ধরাছোঁয়াও খুব শক্ত। মতবাদ সীমান্ত পেরিয়ে যায় ছাড়পত্র ছাড়াই, শুল্ক না দিয়ে। বেয়নেট কিংবা যুদ্ধের জাহাজ তার পথরোধ করতে পারে না। ভাবত সরকারকে খুবই বোকা বলতে হবে, যদি তারা ভেবে থাকে যে আইন পাশ করে তারা ভারতে ঐ মতবাদের প্রবেশ রোধ করতে পারবে।

যে মতবাদের সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থরথর করে কাঁপছে, সেই কমিউনিজমের আদর্শ আসলে কি? আমি এখানে তার আলোচনা করতে চাই না! ব্যক্তিগতভাবে আমি কমিউনিস্টদের বহু কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে একমত নই এবং ভারতের বর্তমান বাস্তব অবস্থায় কমিউনিজম কতটা উপযোগী হবে, যে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু আমি মনে করি যে কমিউনিজম সমাজের একটা উপযুক্ত আদর্শ। কারণ আসলে তা সমাজতন্ত্র। আর দুর্যোগের হাত থেকে পৃথিবীর রক্ষা পাবার একমাত্র পথ সমাজতন্ত্রের মধ্যেই আছে।

আর রাশিয়া? তার সম্বন্ধে কি ভাবছে? আমাদেরই মতো সে দেশ অন্ত্যজ, তার কুৎসায় অনেকেই মুখর এবং অনেক ভুলভ্রান্তিও তারা করছে। কিন্তু তার সমস্ত ভুলচুক সত্ত্বেও রাশিয়াই হচ্ছে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের প্রধানতম শত্রু, আর পূর্ব জগতের জাতিগুলির প্রতি তার ব্যবহার উদারতর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চীন, তুরস্ক এবং পারশ্যে রাশিয়া স্বেচ্ছায় নিজেদের মূল্যবান সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ অধিকার ও সুযোগসমূহ পরিহার করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার অপরাধে ইংরেজরা জনবহুল চীন শহরে যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দেগে শত শত চৈনিক নরনারীকে হত্যা করছে।

পারশ্যের তাব্রিজ শহরে রুশ রাষ্ট্রদূত যখন প্রথম গেলেন, তখন বিরাট জনসমাবেশ ডেকে, তাদের সামনে জারতন্ত্রের পুরাতন অন্যায়ের জন্য সমগ্র রুশ জাতির হয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাশিয়া পূর্বজগতে আসছে সমান মর্যাদার দাবিতে, উদ্ধত শাসকের ভূমিকা নিয়ে নয়। অবাক হবার কোনও কারণ আছে কি যে, রাশিয়াকে সবাই সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে?

...মনে রেখো মহাপুরুষের কথা, যাঁরা যুগে যুগে এই দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্র মানবের ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন তৎকালীন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। আড়াই হাজার বছর আগে মহান বুদ্ধ জাতি ও বর্ণের সাম্যের আদর্শ প্রচার করেছিলেন এবং পুরোহিততন্ত্র ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। যারা জনসাধারণকে শোষণ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন জনগণের স্বার্থরক্ষক। তারপর এলেন আর এক মহান বিদ্রোহী যীশু খ্রিস্ট, এবং তারও পরে আরব দেশের সেই পয়গম্বর, তাঁরাও সংস্কারের শিকল ছিঁড়ে, চারিপাশের জগৎকে ভেঙ্গেচুরে, খোলনলচে বদলে দিতে ইতস্তত করেননি। তাঁরা সবাই ছিলেন বাস্তববাদী। তাঁরা বুঝেছিলেন যে প্রচলিত রীতিনীতি ও লোকাচার অচল হয়ে গেছে এবং তাদের বদলে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। এ যুগের অবতার হচ্ছে নতুন ঐ আদর্শবাদ, যা এসেছে পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে। সেই আদর্শ সামাজিক সাম্যের। এসো, আমরা সে আহ্বানে সাড়া দিই এবং পৃথিবীকে রূপান্তরিত করে, মানুষের বাসযোগ্য সুন্দরতর স্থানে পরিণত করার উদ্যমে হাত লাগাই।...”

পরিশিষ্ট - ২

নতুন কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র রাজ্য পরিষদের অধিবেশন

সম্পাদকমন্ডলীর রিপোর্ট

১৭ই ও ১৮ই জুলাই, ১৯৬৫, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

সমবেত সহযোদ্ধা বন্ধুগণ,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ঐতিহাসিক সপ্তদশ সম্মেলনের পর এই সর্বপ্রথম আমাদের সংগঠনের বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধা ভাই ও ভগ্নীগণ সমবেত হয়েছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডাবেশনের সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে সংগ্রামের মঞ্চ হতে আন্তরিকভাবে আপনাদের সেলাম জানাচ্ছি। আপনারা, বন্ধুগণ, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শোধনবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, দলত্যাগী বিভেদপন্থীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপনারা পরীক্ষিত কর্মী। আপনাদের বজ্রমুষ্টিতে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের কবর রচনার অমিত তেজ ও বাহুবল। আপনাদের দেশপ্রেমিকতা সংগ্রামের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে। তাই এহেন কর্মীদলের পুনর্মিলনে আমরা সকলেই আনন্দিত গর্বিত। পুনরায় আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের সংগঠনের বিবরণ শুরু করছি।

বন্ধুগণ,

সপ্তদশ সম্মেলনের পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের মাতৃভূমি এবং বিশ্ব জগতের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে আমাদের বিচার করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

সপ্তদশ সম্মেলনের গৃহীত বিবরণীর মূল বিশ্লেষণ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তন সাধন হচ্ছে বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। আমাদের যুগের মূল্যায়ন মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দশা, নয়া উপনিবেশবাদের আগ্রাসী ক্ষুধা ও ষড়যন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জয়যাত্রা, শোধনবাদের বিপদ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি বর্তমান সময়ে পৃথিবীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবাদর্শে পূর্বের তুলনায় বেশি করে গুরুত্ব অর্জন করেছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে সাধারণ মানুষ আজ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্বের তুলনায় অধিকরূপে সংগঠিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষকেরা ক্রমান্বয়ে হীনবল হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্যের পাল্লা আজ সাধারণ মানুষের দিকে। বর্তমান

জগতের সর্বাধুনিক ঘটনা হল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দুর্বার অগ্রগতি এবং অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অত্যাচারকে বজায় রাখার জন্য আফ্রো-এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে নয়া উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক শোষণ। কিন্তু যাবতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির উর্দ্ধে ভিয়েতনাম ও ডমিনিকানের উপরে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আক্রমণের প্রতি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ ও অশান্তির সৃষ্টির জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী জনগণের উপরে বর্বর যুদ্ধ ও নরহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সর্বব্যাপক যুদ্ধের জন্য অন্যায়ভাবে আমেরিকার সৈন্য উত্তর ভিয়েতনামের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই নিন্দনীয় অপরাধ জগতের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর ও বিবেক দ্বারা ধিকৃত। এমনকি নিজ দেশেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনাম নীতি সমর্থন লাভ করতে অক্ষম। বর্বর আক্রমণ ও অত্যাচার সত্ত্বেও দঃ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীরা তাদের সফল অবরোধের দ্বারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ক্রীড়নকদের নিত্যনতুন পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করছে। আজ ভিয়েতনামে কোরিয়ার উচিত শিক্ষা পুনরায় মার্কিনীদের জন্য অপেক্ষমান। এককথায় বলা যায় ভিয়েতনাম, কঙ্গো, ডমিনিকান সহ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির গতি পরিবর্তনের মূল নিয়ামক বিপ্লবী শক্তি।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে

আমাদের সপ্তদশ সম্মেলনের সমাপ্তির পরমুহূর্তে ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখোস জনারণ্যে খসে যায় এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংস্র বীভৎস রূপটি জনসাধারণের সামনে ধরা পড়ে। ১৯৬২ সালের প্রথমার্দ্ধ থেকে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীরা ভারতের জনগণের উপর যে অত্যাচার, দমন, পীড়ন, শোষণ, দারিদ্রতা চাপিয়ে দিয়েছিল সেই সমস্ত জঘন্য কাজগুলি ১৯৬৪-৬৫তে আরো ব্যাপক ও গভীর রূপ ধারণ করেছে। খাদ্যাভাব, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চ মূল্য, শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষা সংকট, বেকারত্ব এবং জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-যুবক, সরকারি কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ভারতের বর্তমান শাসকেরা নাগরিকদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অদ্ভুত নজির স্থাপন করেছে। ভারতের সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত নীতিকে লঙ্ঘন করে ভারতরক্ষা আইন ও জরুরী পরিস্থিতির সুযোগে সমস্ত গণসংগঠন ও গণ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিনা বিচারে বিনা কৈফিয়তে কারাগারে আটক করা হয়। আমাদের ছাত্র সংগঠনও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীনেশ মজুমদার, সহঃ সভাপতি শৈবাল মিত্র (অসুস্থতার জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত), কার্যকরী কমিটির সদস্য রঞ্জিৎ মিত্র এবং কাউন্সিল সদস্য আজিজুল হককে ভারতরক্ষা আইন বলে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়েছে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অধ্যাপক মোহিত মৈত্র আজো একই অবস্থায় জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত। ভুয়া মিথ্যা কুৎসার দ্বারা দেশপ্রেমিক জননেতা, শিক্ষক অধ্যাপক প্রভৃতি স্তরের সহস্রাধিক ব্যক্তিকে এইভাবে জেলে আটক রাখার নীতি ফ্যাসিস্ত স্বৈরতন্ত্রের দেশে ব্যতিরেকে অন্য কোথাও তুলনা মিলে না।

১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে গণআন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক গ্রেপ্তারীর কৌশল কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের বিরাট অংশ কংগ্রেসী নীতি এবং কৌশলকে বিশ্বাস করেনি। উপরন্তু জনসাধারণ কেরালা, গুজরাট, কলকাতার বেহালা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন নির্বাচনে বন্দিদের নির্বাচিত করে কংগ্রেসীদের মুখের মত জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের ইদানীং কালের নির্বাচনগুলির ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ।

জনসাধারণের কাছ থেকে শাসকেরা যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ততই তারা মরিয়া হয়ে একদিকে জনসাধারণে গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করেছে এবং জনজীবনে নিত্যনতুন সংকট সৃষ্টি করে জমিদার, ধনী, একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রভৃতির স্বার্থরক্ষার জন্য কালোবাজারী, ঘুষ, দুনীর্তির আশ্রয় নিচ্ছে। তাই আজ দিকে দিকে খাদ্য সংকট দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। রুজি জীবিকার লড়াইতে সাধারণ মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন। জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিদেশী নয়া উপনিবেশবাদীদের নিকট বিকিয়ে দেবার জন্য ভারতের শাসকেরা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বিভিন্ন চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছেন। ভারত সরকারের নীতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের উপর অসন্তুষ্ট। সামগ্রিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে আমরা নিঃসন্দেহে যে ভারতের আভ্যন্তরীণ চিত্র আদৌ সুখকর নয়। আমাদের সম্মেলনের পর ভারতীয় জনগণের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত দমনপীড়ন ছাড়া অন্য কোন গুণগত পরিবর্তন হয়নি।

গণ আন্দোলনের প্রসার

জরুরী পরিস্থিতি ও ভারতরক্ষা আইনের অপব্যবহার এবং গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের আটক সত্ত্বেও গণ আন্দোলনকে কংগ্রেস সরকার স্তব্ধ করতে পারেনি। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরের মানুষ তাদের জীবনের আশু দাবি নিয়ে অধিক সংখ্যায় সংগঠিতরূপে গণআন্দোলনে সামিল হয়েছে। ইদানীংকালে অধ্যাপকরা তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছেন। শিক্ষকরা কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন, খাদ্যের দাবিতে দেশবাসী হরতাল ধর্মঘটে সামিল হয়েছে, কেরানী কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছেন। ছাত্ররা ১লা সেপ্টেম্বর এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি এবং ১৪ই জুলাই ছাত্রধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে সর্বস্তরে গণআন্দোলন শহর ও গ্রামাঞ্চলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা সংস্কৃতির আন্দোলনও পিছিয়ে নেই।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন

ভারতের ছাত্রসমাজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বহুকাল থেকেই গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজ এবং আমাদের সংগঠন এই গৌরবের অংশীদার। আফ্রো-এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে মিছিল সভা সমিতি ইত্যাদি মারফৎ বহুবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ অংশগ্রহণ করে। ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে এবং উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের প্রতিবাদে মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে মে মাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং ১৪ই জুলাই এর সারা বাংলাব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও কলকাতা মার্কিন কনসালের সম্মুখে বিক্ষোভ ও অবস্থান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বন্দিমুক্তি আন্দোলন এবং গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সর্বত্র বন্দিমুক্তি এবং গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। শহরে, সুদুর গ্রামাঞ্চলে 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই— মুক্তি চাই', 'ভারতরক্ষা আইন বাতিল কর,' 'জরুরী পরিস্থিতি প্রত্যাহার কর, 'গণতন্ত্রকে হত্যা করা চলবে না' ইত্যাদি আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে। গণআন্দোলনের সহিত অংগীভূত হয়ে বন্দিমুক্তি আন্দোলন ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ ও আমাদের সংগঠন নিজ ভূমিকা পালনে পরাঙ্মুখ নয়। অসংখ্য টেলিগ্রাম, দাবিপত্র, সভা সমিতি, কনভেনশন, মিছিল, ১০ই ফেব্রুয়ারির ছাত্র ধর্মঘট ইত্যাদি মারফৎ কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও তার ইউনিটগুলি বন্দিমুক্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে রূপ দিচ্ছে। এই আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি। স্মরণ রাখতে হবে উক্ত আন্দোলন সংগঠনে ছাত্রসমাজে আরো অনেক কিছু করার আছে। আমাদের সংগঠন ও ছাত্রসমাজের দায়িত্ব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে বন্দিমুক্তি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে সারা বাংলা কনভেনশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ বিরোধী আন্দোলন

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার নামে ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রীরা এক ফতোয়া প্রকাশ করেন। তাদের মতে যেহেতু ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন দায়ী, সেহেতু ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের মৌলিক অধিকারই বাতিল করে দাও। মুখ্যমন্ত্রীদের এই সুপারিশ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ছাত্রসমাজের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাতস্বরূপ। আমাদের সংগঠন অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতায় ছাত্রদের মৌলিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠন করে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে হুগলী প্যারীমোহন কলেজে, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে এবং কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা কর্মীদের উপরে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার মিথ্যা অভিযোগে ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের অধিকার হরণের জন্য কলেজ হতে বহিষ্কারের আদেশ হয়। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হতে আন্দোলন সংগঠনের দ্বারা ভিক্টোরিয়া ও কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজের ছাত্রনেতাদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার সম্ভব হয়। কিন্তু উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে তা সম্ভব হয়নি। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুসারে সতর্ক না হলে যে কোন মুহূর্তে ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অপচেষ্টা শুরু হতে পারে।

বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সপ্তদশ সম্মেলনের অন্যতম মূল মর্মবাণী ছিল— আদর্শগত ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলনে বিভেদকারী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি এবং শাসকশ্রেণির তল্পিবাহক শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম। আদর্শগত ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের রণধ্বনির মধ্য দিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। সপ্তদশ সম্মেলনের প্রাক মুহূর্ত থেকেই আমাদের এই আদর্শগত সংগ্রাম স্তরে স্তরে অগ্রসর হতে থাকে। বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে আমাদের আদর্শগত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি না হলেও আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজের অন্তরে বিভেদপন্থী শোধনকারী ছাত্র সংগঠন এবং তার নেতাদের আর স্থান নাই। আদর্শচ্যুত

বিভেদপন্থীরা ক্রমান্বয়ে ছাত্রসমাজ ও ছাত্র আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাত্র পরিষদ, ইউ.এস.ও. প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের সহিত জোটবদ্ধ হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচন এই সত্যকে প্রমাণ করে। তাই বিভেদকারী আদর্শচ্যুতদের বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শ অনুযায়ী আমাদের সংগ্রামকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে।

শিক্ষা সমস্যা ও শিক্ষা সংকট দূরীকরণের আন্দোলন

পশ্চিমবাংলার শিক্ষা সংকট সম্পর্কে সপ্তদশ সম্মেলনে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আলোচনান্তে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের পর আমরা যে শিক্ষা প্রস্তাব গ্রহণ করি সে প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের আজও কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং শিক্ষাকে সংকোচনের জন্য সরকারের ঝোঁক বিশেষভাবে ইদানীংকালে আরো প্রকট হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সরকারের উদ্দেশ্য হল মূলত শিক্ষাকে সংকোচন করা। শিক্ষাবিদদের মতে চতুর্থ পরিকল্পনায় কমপক্ষে ১২০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্য সরকার ৭০ কোটির বেশি মঞ্জুর করতে রাজি নয়। এই সামান্য অর্থে সর্ব্বস্তরে শিক্ষার অগ্রগতিকে রক্ষার জন্য বাস্তব চাহিদা পূরণ করা যাবে না। তাছাড়া ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা সহ ছাত্র জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের প্রস্তাবে যে একুশ দফা দাবি সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়েছিল সে দাবিগুলি সরকার এবং শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেনি। পরে বর্তমান বছরের ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা সহ অন্যান্য সমস্যাগুলি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আরো কঠিন রূপে দেখা দেবে।

বিশেষত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে জরুরী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যেমন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত বিষয়ে M.A., M.Sc. ক্লাসের ব্যবস্থা নেই, এম. কম, ও 'ল' পড়ার ব্যবস্থা নেই, অধিকাংশ কলেজে কমার্স ও অনার্স পড়ার সুবন্দোবস্ত নেই, পরীক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন, মেডিকেল কলেজ নেই। তাছাড়া পরীক্ষার Result কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরে প্রকাশিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলকাতায় Pre-medical অথবা Pre-engineering-এ ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পায় না এবং উচ্চতর পাঠ্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রেও অসুবিধা ঘটে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ এম, এ, ক্লাস, ট্রামে-বাসে সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীদের Student Concession চালু, নতুন কলেজ স্থাপন, শিফট প্রথা চালু, কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি মারফৎ ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা সমাধানের দাবিও আজ প্রবল রূপ ধারণ করেছে।

আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি নিয়ে গণস্বাক্ষর অভিযান, প্রচার আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠন করা হয়। কিন্তু কঠিন আন্দোলন ব্যতিরেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান অসম্ভব। তাই পশ্চিমবাংলায় কঠিন শিক্ষা আন্দোলন সংগঠনের জন্য সম্মেলনের গৃহীত শিক্ষা প্রস্তাবের সহিত সঙ্গতি রেখে অবিলম্বে অগ্রসর হতে হবে।

যুব আন্দোলন

ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুব আন্দোলনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকটতম। যুব আন্দোলনের সাথে ছাত্র আন্দোলনের একটি আত্মিক যোগসূত্র আছে। তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের

অগণিত নেতা ও কর্মী এবারের পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবে অংশগ্রহণ করে অন্যান্য সহযোগীদের সাথে একযোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আওয়াজ ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শোধনবাদীদের চক্রান্তকে বানচাল করে দেয় এবং যুব উৎসবের গুণগত পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করে।

কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচন

সপ্তদশ সম্মেলনের পর আমাদের সংগঠন পশ্চিমবাংলার শতকরা ৫০টি ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে সাফল্যলাভ করে। দলত্যাগী বিভেদপন্থীদের চক্রান্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলির বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এই সাফল্য আমাদের সংগঠনের পক্ষে অবশ্যই গৌরবের বিষয়। স্মরণ রাখতে হবে ১৯৬৩-৬৪ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে প্রতিক্রিয়াশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকাসত্ত্বেও সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক আমাদের ছাত্রনেতাদ্বয় শ্রী শৈবাল মিত্র ও বলাই মুখার্জ্জী নির্বাচিত হয়। ১৯৬৫ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে শোধনবাদী ছাত্র সংগঠন কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল ও কংগ্রেসীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের সংগঠনের কর্মীরা তুলনামূলকভাবে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সাফল্য অর্জন করেছে। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সংগঠন আজ শক্তিশালী হচ্ছে।

তাছাড়া বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলেজে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলি ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুন্ডামীর আশ্রয় নেয়। অনেকক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনকে সাহায্য করে। তাই বিগতদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সংগঠনের জনপ্রিয়তাকে অম্লান রাখার জন্য ছাত্র কল্যাণের স্বার্থে আগামীদিনের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে আমাদের সংগঠন ও নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

ছাত্র আন্দোলনে ঐক্যের সমস্যা

কংগ্রেস সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আন্দোলনে, গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বা যে কোন প্রকার গণ আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অগ্রসরের ক্ষেত্রে অসংখ্য দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা বর্তমান। আমাদের তরফ থেকে পূর্বাহ্নেই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষত দক্ষিণপন্থী বিভেদকারীদের শাসকগোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি এবং বহুক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের সহিত জোটবদ্ধতা ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের মূল বাধা। তাছাড়া পি. এস. ইউ., এবং ডি. এস. ও.-এর মধ্যে পরস্পর তিক্ত বিরোধ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে আরেকটি বিশেষ সমস্যা। পি এস ইউ, ডি এস ও, কোন প্রকারেই একসঙ্গে আন্দোলনের মঞ্চে সামিল হবে না। যদিও আমাদের সংগঠনের সাথে P. S.U., D.S.O.,-এর কোন বিরোধ নেই। আমরা P.S.U.-এর সাথে বন্দিমুক্তি ছাত্রসংগ্রাম কমিটিতে সামিল হয়েছি এবং D. S. O. ও বিভেদপন্থী ছাত্র সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের সাথে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে শিক্ষক ধর্মঘট ও ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির আলোকে ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের কর্মপন্থা ও নীতি সর্বাগ্রে আমাদের নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

সাংগঠনিক পরিস্থিতি

সপ্তদশ সম্মেলনের সমবেত প্রতিনিধিরা ছাত্র ফেডারেশনকে সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী সংগঠনরূপে গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেছিল। এই শপথকে রক্ষা করতে আমাদের নেতা ও কর্মীরা বহু দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ দেখায়নি। অকস্মাৎ আমাদের সংগঠনের উপরে সরকারের আক্রমণ নেমে আসে। আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক সহ অনেক নেতা ও কর্মী জেলে বিনা বিচারে আটক হন। ফলে আমাদের সংগঠনের নিঃসন্দেহে ক্ষতি সাধন হয়েছে। কিন্তু সরকারের ঘৃণ্য আক্রমণ এবং বহু বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে আমাদের অবশিষ্ট নেতা ও কর্মীরা যৌথভাবে সংগঠনের ভূমিকাকে চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে। কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের সংগঠনের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য।

অপরপক্ষে সংগঠনের এই চিত্র দেখে উল্লসিত হবার কিছু নেই। কারণ সপ্তদশ সম্মেলনে আমরা যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম তা সরকারি আক্রমণ ও আশু কাজের চাপে (যেমন বন্দিমুক্তি আন্দোলন) সম্পূর্ণরূপে সফল করা যায়নি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীদল আমাদের এখন গড়ে উঠেনি। সভ্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট কোটায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি। স্কুলভিত্তিক আমাদের সংগঠনের প্রসার লাভ হয়নি। শিক্ষা শিবির ইত্যাদি সংগঠিত করা যায়নি।

সপ্তদশ সম্মেলনের পর সম্পাদকমন্ডলী এবং কার্যকরী কমিটি যৌথভাবে কাজ পরিচালনার চেষ্টা করেছে। সরকারি দমননীতির বেড়াজালকে অতিক্রম করে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জেলাগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। বন্দিমুক্তি আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন এবং শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটে আমাদের সংগঠন তার ভূমিকা পালন করে। পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন সংগঠন করা হয়।

জেলাগত অবস্থা

পুরুলিয়াতে আমাদের কোন জেলা ইউনিট গড়ে ওঠেনি। পশ্চিম দিনাজপুরে জেলা ইউনিট গঠনের ভিত্তি রচনা হয়েছে। বাঁকুড়াতে জেলাগত ইউনিট না থাকলেও আঞ্চলিক ইউনিট আছে।

অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুব, বর্দ্ধমান, নদীয়ার সাংগঠনিক অবস্থা সক্রিয়। এই জেলাগুলিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলন, বর্দ্ধিত কাউন্সিল সভা, জেলা কনভেনশন ইত্যাদি ব্যাপকরূপে সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষত কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের সংগঠনের গৌরবকে উজ্জ্বল রাখতে সবিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

উত্তরবঙ্গে মালদহ, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার ইউনিট তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্র ফেডারেশনের কর্মধারাকে বজায় রেখেছে। তাছাড়া এই ইউনিটগুলি কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা চলছে।

W.B.E.T.S.F.

W.B.E.T.S.F.-এর সাথে আমাদের সংগঠনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু কারিগরী শিক্ষারত ছাত্রদের এই সংগঠনটিকে আরো আধিক সাহায্য সহযোগীতার জন্য আমাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত। বিষ্ণুপুর পলিটেক্‌নিক ছাত্রদের উপরে স্থানীয় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশী দমননীতি ও কর্তৃপক্ষের অন্যায় জুলুম শুরু হবার দায়ে W.B.E.T.S.F.-এর সহিত একযোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের হস্তক্ষেপ করে। দমননীতি ও জুলুমের প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠন করে সাফল্য অর্জন করে। অনুরূপ ঘটনা জলপাইগুড়ি পলিটেক্‌নিকেও ঘটে।

ছাত্র-ছাত্রী

সপ্তদশ সম্মেলন 'ছাত্র-ছাত্রী'কে আমাদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র রূপে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বিশেষ কতগুলি অসুবিধার জন্য আইনত ছাত্র-ছাত্রীর মালিকানা এখনো বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নামে স্থানান্তর করা যায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও 'ছাত্র-ছাত্রী' আমাদের সংগঠনের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। আর্থিক দুরবস্থার জন্য নিয়মিত প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া পরিচালনার ত্রুটির জন্য বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় বাস্তব চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রেরণ করা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিশেষ সংখ্যারূপে ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষক আন্দোলনের সময় থেকে 'ছাত্র-ছাত্রী'র বিক্রয় বেড়েছে। সকলের সক্রিয় সাহায্য সহযোগীতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা হলে 'ছাত্র-ছাত্রী' একটি স্বাবলম্বী সংবাদপত্ররূপে দাঁড়াতে পারে।

আর্থিক অবস্থা

আমাদের সংগঠনের আর্থিক দুরবস্থা চরম। বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে প্রেসে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ঋণ। বাস্তবক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার সকল জেলা থেকে কেন্দ্রকে চালু রাখার জন্য কোন আর্থিক সাহায্য আসে না। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে যে সামান্য অর্থ আসে সে অর্থ দিয়ে দৈনন্দিন কাজ কোন রূপে চালান হয়। এই অবস্থা আর চলতে পারে না। জেলা ইউনিটগুলি তার নির্দিষ্ট কোটা না দিলে কেন্দ্রীয় সংগঠনের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়বে। কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে ১০৩০ টাকার যে বিশেষ তহবিলের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল— সে বিশেষ তহবিলও পূরণ হয়নি।

অন্যান্য সংগঠন সমূহের শক্তি

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ও সমাজ জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ দানা বেঁধে উঠে। দক্ষিণপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। ন্যাশনালিস্ট স্টুডেন্টস্ ফ্রন্ট নামে একটি ছাত্র সংগঠনের আবির্ভাব হয়। ছাত্র পরিষদও কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠে। কিন্তু এই ভারসাম্যের পরিবর্তন করে আমরা ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থী প্রভাবকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

কলকাতার ক্ষেত্রে ছাত্র পরিষদের প্রভাব না থাকলেও মেদিনীপুর, হাওড়া, নদীয়ায় ঐ সংগঠনটি কিছুটা শক্তি অর্জন করেছে। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

কলকাতার ছোট ছোট কলেজগুলিতে পি.এস.ইউ-এর কোন প্রভাব না থাকলেও ৭টি কলেজের তিনটিতেই পি.এই.ইউ প্রভাবশালী। বাইরের জেলাগুলির ক্ষেত্রে মাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই পি.এস.ইউ যথেষ্ট শক্তি রাখে। ডি.এস.ও. সম্পর্কে তাদের অনমনীয় মনোভাবই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একমাত্র বাধা।

ডি.এস.ও. সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্ব্বল। আশুতোষ কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ ব্যতীত বাংলাদেশে এই সংগঠনের কোনও অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি নিজস্ব সিদ্ধান্তে আকস্মিকভাবে পরিবর্তনের ঝোঁক এই সংগঠনটির মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এই সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বিভেদকামীদের এখনও পর্যন্ত ছাত্রসমাজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কলকাতার উপরে তাদের কিছুটা শক্তি আছে। অন্যান্য অধিকাংশ জেলায় তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। যেখানে তাদের সামান্য শক্তি আছে তা উল্লেখ কববার অপেক্ষা রাখে না।

সংক্ষেপে পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনে আমরাই যে মুল শক্তি তা গত বৎসরের কার্যাবলীতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের আগামী কর্মসূচি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সপ্তদশ সম্মেলনের গৃহীত মুল কর্মসূচিকেই ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত করতে হবে। কিন্তু সম্পাদকমন্ডলী মনে করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুসারে— আমাদের অবিলম্বে আশু কর্মসূচি গ্রহণ করে আন্দোলনে অগ্রসর হতে হবে। তাই আমাদের আশু কর্মসূচি হবে, যথা—

১। ট্রামে বাসে ৫০% কনশেসনের দাবিতে আন্দোলন সংগঠন
২। জরুরী সমস্যার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠন
৩। বন্দি মুক্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করা
৪। ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ
৫। প্রতিটি জেলায় ব্যাপকভাবে সভ্য সংগ্রহ
৬। আঞ্চলিক ও জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান

সর্বশেষে নেতৃত্বের বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিকে স্বীকার করে আপনাদের আর একবার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকমন্ডলীর বিবরণ শেষ করছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হোক।
ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।

অভিনন্দন সহ
সম্পাদকমন্ডলী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে ৯৩/১-এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও এসৃসি প্রিন্টার্স, ১৭/১ মদনগোপাল সেন, কলি ১২ হইতে মুদ্রিত।

পরিশিষ্ট - ৩

যুব আন্দোলন প্রসঙ্গে

হরিনারায়ণ অধিকারী

(১৫ই ডিসেম্বর, শুক্রবার ১৯৬৭-এ 'দেশহিতৈষী'তে প্রকাশিত নিবন্ধ)

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমাদের দেশের যুব আন্দোলনে এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যুব আন্দোলনের এই নতুন সম্ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুব আন্দোলনের বর্তমান সম্ভাবনা, লক্ষ্য, নীতি ও কৌশল এবং সর্বোপরি মজবুত সংগঠন ও সংগঠনের প্রসারে স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে সর্বাগ্রে কতকগুলো সত্য ঘটনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থাৎ যুব আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যুব আন্দোলনের পশ্চাতে কোন্ শক্তি মূল শক্তিরূপে কাজ করবে এবং সংগঠনের সম্মুখ সারিতে কারা অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব ও নেতৃত্ব পালন করবে, সমাজ বিপ্লবের বিরাট কর্মকান্ডে যুব আন্দোলন বা সংগঠনের ভূমিকা কি হবে, এবং যদি কোনো ভূমিকা থেকে থাকে তা হলে সে ভূমিকা ফলদায়িনী হবে কিনা, যুব আন্দোলনের মূল চরিত্র ও কর্মসূচি কি হবে এবং চরিত্র ও কর্মসূচি নির্ধারণের সময়ে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার বাস্তব ভিত্তিই বা কি হবে, সমধর্মী গণসংগঠনগুলোর সাথে যুব সংগঠনের ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য অথবা সহযোদ্ধার ঐক্য কত সময় পর্যন্ত দৃঢ় ও স্থায়ী করা যাবে।

উল্লিখিত ঘটনাগুলো বা প্রশ্নাবলীর বিশ্লেষণ ও মীমাংসা ভারতবর্ষের যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন দিন হয়নি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব ও পরবর্তী যুগে এই বিশ্লেষণ মীমাংসাকে দীর্ঘসূত্রতার গর্ভে নিক্ষেপের ফলে যুব আন্দোলন গতানুগতিকতার বন্ধনমুক্ত হতে পারেনি। এমনকি যুব আন্দোলনে অনেক কিছু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুগপোযোগীরূপে গড়ে ওঠেনি। যুব আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা, ন্যাক্কারজনক মনোভাব ইত্যাদি কারণে যুব আন্দোলন যে তিমিরে থাকা উচিত সে তিমিরেই ছিল। যারা যুব আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বে ও নেতৃত্বে ছিলেন তাদের চিন্তাধারা বিষয়ীভূত গন্ডীকে অতিক্রম করে বাস্তবতার পথে পরিচালিত হতে পারেনি, উপরন্তু তাদের চিন্তাধারা ছিল কল্পনাবিলাসী ভাবপ্রধান ও ভোঁতা।

স্বাভাবিক কারণেই যুব আন্দোলনের দুর্বলতার দিক আলোচনা করতে হলে রাজনৈতিক প্রশ্নাবলীকে পরিহার করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজ ব্যবস্থার যে স্তরে বর্তমান যুগটি অতিক্রান্ত হচ্ছে যে সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি ঘটনার সাথে রাজনীতি সম্পর্কিত ও সংযুক্ত। রাজনীতির অতিক্রান্তিকালীন আবর্তে সমাজব্যবস্থায় যে মৌলিক দ্বন্দ্বগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব, গণতান্ত্রিক শক্তি ও অগণতান্ত্রিক শক্তির দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বই প্রাধান্যলাভ করেছে। দুনিয়ার

যাবতীয় দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুরূপে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বই মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সমগ্র দুনিয়াও দুইটি শিবিরে বিভক্ত— সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং ধনতান্ত্রিক শিবির। প্রথমোক্ত শিবির সমাজ বিকাশের বহুমুখী স্তরে বিকাশোন্মুখ এবং দ্বিতীয় শিবির ক্ষয়িষ্ণু অথবা মৃতকল্প। বিকাশোন্মুখ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মর্মবস্তু হলো— বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

যে কোন দেশের যুব আন্দোলনের পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীদের নৈকট্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি এবং মূলগতভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী শক্তির সাথে সব চাইতে বেশি। জীবন ও যৌবনের ধর্ম বিকাশোন্মুখ। সভ্যতার অগ্রগতির যুগে যৌবনের উদ্দামতা ও কার্যকরী সৃজনশীল শক্তিমৃতকল্প কোন ভাবাদর্শের যাঁতাকলে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সুতরাং যুব সমাজ ও যুব আন্দোলনকে বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শক্তির কর্মনীতি কর্মকৌশল অনুসারে বিচার করতে হবে।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও বিচারের মানদন্ড একইরূপ। পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে— যুব আন্দোলন সংগঠকদের চিন্তাধারা ছিল অস্বচ্ছ কল্পনাবিলাসী, ভাবপ্রবণ ও ভোঁতা। এইরূপ চিন্তাধারার অনুপ্রবেশের বাস্তব কারণরূপে আমাদের দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী শক্তির কর্মনীতি ও কর্মকৌশল ও ভাবাদর্শকে দায়ী করা যায়। বিশেষত স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকে ১৯৬৪ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত উল্লিখিত শক্তিনিচয়ের চারদিকে সংস্কারবাদী মনোভাব, বহুবিধ বিচ্যুতিমূলক ধ্যানধারণা, বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ভাবধারা ও আপসমুখী সংশোধনবাদী মনোবৃত্তি পরিবৃত ছিল। ফলে এহেন উপাদানভিত্তিক শক্তিনিচয়ের কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় করে যুব আন্দোলন থেকে শুরু করে যে কোন গণসংগঠন ও গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে যে সমস্ত আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তীক্ষ্ণ সহায়ক শক্তি গড়ে না উঠে ভোঁতা ও কল্পনাশ্রয়ী হতে বাধ্য হয়। তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আন্দোলন বিরোধী উপাদানগুলোকে বর্জনের জন্য সংগ্রাম অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই সংগ্রাম চলার সময়েও বিশেষত যুব আন্দোলনেব কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে (All India Democratic Youth Federation) রাজ্য সংগঠনের সমস্ত স্তরেই সংগ্রামী আন্দোলনের কোন ছাপ বা প্রতিফলন ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে যুব সংগঠন কাগজী সংগঠনের পর্যায়ভুক্ত। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে 'পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘে'র পরিচালনায় পালা-পার্বণের ন্যায় যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্য যুব সমাজের একটি অংশে পরিলক্ষিত হতো। উৎসবান্তে রাজ্যব্যাপী এই সংগঠনের ভূমিকা কিছু থাকে না বললে অত্যুক্তি হবে না। কবরী বন্ধন থেকে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া কারুকার্যের প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যুব উৎসব অনুষ্ঠান এক রীতিনীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। সংস্কারবাদী ও পুরোপুরি সংশোধনবাদী চিন্তাধারা ১৯৬৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত যুব সমাজের মূল সংগ্রামী শক্তিকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে কার্যত বিফল হয়। এই যুব উৎসবেই তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠকে ভেদ করে যুব আন্দোলনের সংগ্রামী একটি অংশ আলোর সন্ধান লাভ করে।

বহুবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং অসুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোথাও যুব

সমাজের সংগ্রামী অংশ ১৯৬৫ সালের যুব উৎসবের পরবর্তীকালে সংগঠিত হতে পারেনি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর কলকাতা জেলাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে যুব সমাজকে একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রায় ছোট বড় শতাধিক অঞ্চলভিত্তিতে প্রস্তুতিমূলক আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৭ সালের ২রা-৩রা অক্টোবর একটি বিদ্যাপীঠে প্রায় ছয় শতাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কলকাতা জেলা যুব সম্মেলন সাফল্য লাভ করে। এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে একটি কর্মসূচি ও সংবিধান সহ "কলকাতা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন" জন্মলাভ সর্বাধুনিক যুব আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলকাতায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জন্মকাল থেকে যুব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। (১) বন্যাত্রাণ সংগ্রহ ও বন্যাপ্লাবিত এলাকায় ত্রাণ সংগঠন করা, (২) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পক্ষ উদ্‌যাপন, (৩) সামন্ততন্ত্রবিরোধী পক্ষ উদ্‌যাপন—এই তিনটি কার্যক্রমের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তার সাংগঠনিক শক্তির কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে দিতে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র ঘটনাবলীর যোগফল হিসেবে রাজ্যভিত্তিক যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ আরম্ভ হয়। একই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠন ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ সমাপ্তির পথে। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি সংগ্রামী যুব আন্দোলন সংগঠনের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই বিচার্য বিষয় এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যাবে কিনা— না, যথাপূর্বং তথা পরম অবস্থায় এই উদ্যোগেরও সমাপ্তি ঘটবে।

শ্রেণি সংগ্রামের যুগে বিভিন্ন শ্রেণি থেকে যুব সমাজের উৎপত্তি। যুব সমাজ কোন বিশেষ শ্রেণি নয়। বিভিন্ন শ্রেণি অর্থে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, পেটিবুর্জোয়া ইত্যাদি শ্রেণিগত বিভাগ থেকে আগত অসংখ্য যুবক-যুবতীদের গোষ্ঠীবদ্ধতার আধুনিক নামকরণ যুবসমাজ। এই যুবসমাজের মধ্যে যখন নিজেদের সংগঠনের জন্মলাভ হয়ে থাকে এবং সে সংগঠন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আদর্শকে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে তখন এইরূপ প্রকৃতির যুব সংগঠনকে লালনপালন করার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শক্তিকে গ্রহণ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় থাকে না। বাস্তবক্ষেত্রে আলোচ্য যুব আন্দোলন ও যুব সংগঠনের পশ্চাতে মূল শক্তিরূপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তি কাজ করবে। অনুরূপভাবে গণসংগঠনের সম্মুখ সারিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে ও দর্শনে দীক্ষিত তরুণদল অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্নের সময়কালীন বিভিন্ন স্তরে বিপ্লবী শক্তিকে অসংখ্য সংগ্রামী ফ্রন্ট খুলে এই সমস্ত ফ্রন্টে লড়াই-এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। আমাদের দেশের যুব সংগঠনকেও এইরূপ একটি সংগ্রামী ফ্রন্টরূপে দেখা প্রয়োজন।

মৌলিক সত্যকে কোনদিন অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শক্তি অর্থে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আদর্শে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টিকেই বুঝায়। আকস্মিক কমিউনিস্ট পার্টির অবতারণা করার ফলে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। যুব সংগঠনকে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে এক করে দেখতে হবে না। যুব সংগঠন অবশ্যই একটি গণসংগঠন। বিভিন্ন দলমত নির্বেশেষে নিরপেক্ষ যুবক-যুবতীরা এই গণসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু আসল প্রশ্নটি বিপরীত দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যুব সংগঠনে

যখন সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, তখন কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীরা এই সংগঠনে প্রবেশ লাভের পর কী ভূমিকা পালন করবেন? কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীদের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখ নিশ্চয়ই অবাস্তব হবে না। উপরন্তু সংগঠনের মঞ্চ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আওতায় মৃতকল্প জীর্ণ সমাজের পরিবর্তনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করার সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিকে অবশ্যই আর অস্বীকার করা যাবে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্টগণ যুব সংগঠনে অংশগ্রহণের অর্থ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে প্রাণবন্ত করা এবং যুব সংগঠনকে একটি সক্রিয় সংগঠনে পরিণত করা। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্টগণ যুব সংগঠনকে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যের একটি ফ্রন্টরূপে গ্রহণ করলে যুব আন্দোলনের লাভ বই লোকসান কিছু নেই।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টিকেই যুবসমাজের দিকে বেশি করে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় ভারতীয় যুবসমাজের দেশ ও জাতি গঠনের আশা আকাঙ্খা ও দেশপ্রেমকে নিঃশেষিত করে বর্তমান যুবসমাজকে এক ভয়াবহ নৈতিক অধঃপতনের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি তার ৭ম কংগ্রেসের (কলকাতা) গৃহীত কর্মসূচিতে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছে—

"...তারা চেষ্টা করছে আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে— সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ক্ষেত্রসহ সমস্ত ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে। তারা স্থাপন করছে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তারা দূষিত করছে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন— যার প্রকাশ দেখা যায় আমাদের দেশে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিস্তারের মধ্যে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহ ও আদান প্রদানের নীতিকে সমর্থন করে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির আমদানীকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে। ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ছিল তাকে অবিচলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিবর্তে ভারত সরকার আমাদের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিল্প ও চলচ্চিত্রের অনুপ্রবেশ ও বিস্তারকে নানাভাবে উৎসাহ দান করছে। তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে কাজে লাগানো হয় পশ্চিমী বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্যে— যার ফলে আবার আমাদের সন্তান-সন্ততিদের ভাবাদর্শগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পড়ে ক্ষতিকর প্রভাব। এইসব কিছুই আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে গুরুতর বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই বিশ্লেষণ অনুসারে— ভারতের যুবসমাজের ভয়াবহ বিপদকেই বেশি বেশি করে সূচিত করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি অধঃপতিত হলে যুবসমাজই সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধঃপতিত শিক্ষা, সংস্কৃতির অন্তরালে যুবক যুবতীরা প্রতিক্রিয়ার ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং দেশের ক্ষতি সাধন করে। এমতাবস্থায় প্রগতিশীল যুব আন্দোলনই ভুল পথে পরিচালিত যুবসমাজকে একমাত্র প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে দেশ ও সমাজের স্বার্থকে রক্ষা করতে সক্ষম।

পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অনুসারে বলা যায়, আমাদের দেশের প্রতি রাজ্যে, প্রতি

জেলায়, অঞ্চলে, মহল্লায় যুব সংগঠন গড়ে কৃষক, শ্রমিক, উপজাতি, মধ্যবিত্ত বিভিন্ন স্তরের যুবকদের এক যুব আন্দোলনের একটি সংগ্রামী মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অপরিসীম। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতাও আমাদের দেশের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। ১৯২৭-২৮-২৯ সালে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় চীনের কম্যিউনিস্ট পার্টি যুবসমাজের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবকেরাই সেই সময়ে অষ্টম রুট আর্মিতে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব ও পরবর্তী অধ্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) যুব আন্দোলনের উপরে সব সময়ই কার্যকরী চেকআপ রেখেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর যুব কমিউনিস্ট লিগের ৩য় কংগ্রেসে স্বয়ং লেনিনের বক্তৃতা (যে বক্তৃতা পরে The Tasks of the Youth Leagues বলে খ্যাত) থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, যুব সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম না হলে আগামী সমাজের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা কঠিন। তা ছাড়া আজকের বিপ্লবী মুক্তি যুদ্ধগুলিতেও যুবসমাজ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শোষকের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় কঠিন যুদ্ধরত। বাতিস্তার এবং মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কিউবার বিপ্লবে এবং দঃ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের মুক্তিফৌজে যুবসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রমাণ করে অধঃপাতিত শিক্ষা সংস্কৃতির ধ্বংসের বাঁক থেকে যুবসমাজের চিন্তা চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রগতিশীল শিক্ষা সংস্কৃতির খাতে প্রবাহিত করতে পারলে যুবসমাজ তার জীবন ও যৌবনের শক্তিকে প্রয়োগ করে যে কোন দেশের সমাজ ও শাসনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত করতে পারে। শ্রেণিসংগ্রামে সচেতনভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারে।

আমাদের দেশে শাসকেরা ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য সচেষ্ট। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং ধনতন্ত্রের অন্যান্য মিত্ররা আমাদের দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নীতি নির্ধারক। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দেশের প্রতিটি সংগ্রামী আন্দোলনের মূল চরিত্র বা লক্ষ্য হবে— সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও গণতান্ত্রিক। যুব আন্দোলনও এই চরিত্র ও লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে না। মূল লক্ষ্য ও চরিত্রকে ঠিক করে সংগঠন পর্যায়ে অধুনা গঠিত যুবফেডারেশন বা আগামী দিনের রাজ্য সংগঠন তার বহুবিধ কর্মসূচিকে পরিবর্ধিত ও সংযোজিত করবে নিঃসন্দেহে। লক্ষ্য রাখতে হবে গণসংগঠন পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচি অবশ্যই যুবসমাজকে উৎসাহিত ও সক্রিয় করতে সক্ষম হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের দেশে যুব সংগঠনের উপরে নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে বহুদিন থেকে। কংগ্রেসের পরিচালিত যুব কংগ্রেসে, এস. ইউ. সি পরিচালিত যুব সংগঠন এবং দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী কমিউনিস্টদের পশ্চিমবঙ্গ যুব সঙ্ঘের মধ্যে শক্তি সংহত করার চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রভাবান্বিত যুবক-যুবতী ব্যতিরেকেও বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী রাজ্যে বিভিন্ন অংশে আছেন— যারা কার্যত প্রগতি ও গণতন্ত্রের প্রশস্ত পথে চলার জন্য উল্লিখিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুব সংগঠনগুলি বর্জন করে ভিন্ন ধরনের একটি যুব সংগঠনের মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়।

কলকাতায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং রাজ্যভিত্তিক সংগঠনের আশু কর্তব্যও হবে ঐ বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীকে ঐক্যবদ্ধ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা। এইরূপ কার্যক্রমের প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসেবে কলকাতা ও কলকাতার শহরতলীকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ

করতে হবে। কলকাতা ও শহরতলীকে ঘিরে প্রায় সকল শ্রেণির মানুষ বাস করে। বস্তি থেকে মধ্যবিত্ত পাড়া, শ্রমিক অঞ্চল ইত্যাদি কলকাতা ও শহরতলীর মধ্যে আছে। যুব মানসের সুস্থ খোরাক সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে কলকাতার ও শহরতলীর বিভিন্ন অংশে যুব সংগঠন গড়ার দায়িত্ব দিয়ে কর্মীদল প্রেরণ করলে অবশ্যই স্থায়ী সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা কার্যকর হবে। এইভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতা ও শহরতলীকে কেন্দ্র করে যে যুব সংগঠন গড়ে উঠবে তার ছাপ ও অভিজ্ঞতা পাশাপাশি জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক বা গ্রামভিত্তিক গড়ে ওঠা যুব সংগঠনগুলোকেও মজবুত করতে বা নতুন পর্যায়ে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে— যে অঞ্চলে যে শ্রেণির মানুষেরা বাস করেন সেই শ্রেণির যুবক-যুবতীদের সাথে মিশতে ও সংগঠন গড়তে হলে, তাদের জীবনের সমস্যাবলীর গভীরে প্রবেশ করতে হবে, তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। ধাপে ধাপে সেই অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের সমস্যা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে নিজ সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে এবং সর্বোপরি আদর্শকে সংযোজিত করতে হবে। এইরূপ কার্যক্রমের দ্বারাই যুবক শ্রেণিকে একটি সংগ্রামী মঞ্চে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব।

সমধর্মী গণসংগঠনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি জটিল প্রশ্ন ভবিষ্যতে দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন ছাত্র সংগঠন ও যুব সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে। কারণ অনেক স্থানে অনেক কর্মীদল আছেন— যারা যুব আন্দোলনেও অপরিহার্য। তাছাড়া যিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র— কিন্তু পাড়াতে তিনি যুবক। এমনি ধারা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অনেককেই ভাবতে হবে তিনি ছাত্র কিংবা যুব সংগঠনের কোন্‌টিতে বেশি গুরুত্ব দেবেন। এই অবস্থায় একটিমাত্রই সমাধান হতে পারে।। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে ছাত্র আন্দোলনের মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পাড়াতে যুবক হিসাবে যতটুকু সম্ভব যুব সংগঠনের আওতায় তাকে প্রয়োজনীয় কাজ করার ঝুঁকিও নিতে হবে। তাছাড়া যুবক হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে ছাত্র আন্দোলনে এমন কতগুলি ভূমিকা অনুপস্থিত থাকে যেগুলি একমাত্র যুব সংগঠনের মধ্যেই কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু কর্মী বিশেষে ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রয়োজনানুযায়ী অবশ্যই বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ঘটানো স্বাভাবিক। ক্লাবগুলোর ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক যুব সংগঠনের সম্পর্কের জটিলতা দেখা দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যুব সংগঠনটি গঠিত হবে একটা সংবিধান, আদর্শ ও কর্মসূচি অনুযায়ী। যুব সংগঠনের সংবিধান আদর্শ ও কর্মসূচিকে ক্লাবের মধ্যে যেমন অনুপ্রবেশ করানো কঠিন, তেমন কোন ক্লাব বা ক্লাব ধরনের কোন সমিতির মাধ্যমে যুব সংগঠনের আদর্শ সংবিধান ও কর্মসূচিকে কার্যকর যাবে না। তাই যিনি ক্লাবের সভ্য তাকে নিশ্চয়ই দুই ক্ষেত্রে দুইটি সংগঠনের পৃথক পৃথক কার্যপদ্ধতি অনুসারে ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যিনি যুব সংগঠনে যোগদান করছেন তিনি যুব সংগঠনের আদর্শ অনুসারে ক্লাবের অস্তিত্বকে বজায় রেখেই বেশি বেশি করে ক্লাবের অনুগামীদের যুব সংগঠনের প্রভাবাধীন করার জন্য সচেষ্ট হবেন। অবশ্যই এই ক্ষেত্রে স্থিরভাবে বিবেচনা করতে হবে কোনো পর্যায়েই ক্লাব ও যুব সংগঠন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন হবে না।

সর্বশেষে যুব সংগঠনের মঞ্চে কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে বর্তমান সময়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সরকারের কর্মসূচিকে যুবসমাজের মধ্যে জনপ্রিয় করার একটি সর্বপ্রধান দায়িত্ব। দৃঢ়তার সাথে

যুবসমাজকে কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীদের বলতে হবে—জনগণতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনাময় যুগ দেখা দেবে। যুবসমাজ সেই নতুন শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকে নিজেদের সুখী সমৃদ্ধিশালী করতে সক্ষম হবে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে—"নতুন প্রগতিশীল জনসংস্কৃতি—যার চরিত্র হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও গণতান্ত্রিক,—সেই সংস্কৃতির সৃষ্টি ও বিস্তৃতির উদ্দেশ্য জনগণের সৃজনশীল প্রতিভাকে বাধামুক্ত করে দেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার গ্রহণ করবে। এমন ধরনের সাহিত্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে লালন করা হবে, উৎসাহ দেওয়া হবে, বিকশিত করে তোলা হবে, যে সাহিত্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সমগ্রভাবে দেশের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ নির্বিশেষে আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব বিশেষ ধারাকে বিকশিত করবার জন্য প্রত্যেকটি জাতি সত্তাকে ও উপজাতিকে সাহায্য করবে।

নিজেদের জীবনাবস্থার উন্নতি বিধান ও জীবনের সমৃদ্ধি সাধনের সংগ্রামে গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে সাহায্য করবে।

বর্ণগত ও সম্প্রদায়গত ঘৃণা ও বিরুদ্ধভাব এবং দাস্যভাব কুসংস্কার থেকে জনগণকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

সমস্ত দেশের শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃভাব গড়ে তুলতে এবং রক্তগত ও জাতিগত ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে দিতে সাহায্য করবে।"

(৭ম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি)

পরিশিষ্ট - ৪

ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের মুখে মুখে গান ও কবিতা

রঙ্গলাল

১৮৬৭ সালে কলকাতার স্কুলে কলেজে ছাত্রদের মুখে মুখে তখন রঙ্গলালের গান—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে।

মধুসূদন দত্ত

১৮৬৭-৭০ এর যুগে কবি মধুসূদন দত্তের রচিত গান গাইত কলকাতার ছাত্ররা—

'রেখো মা দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে গান রচনা করে গাইলেন—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান!"

"বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হোক হে ভগবান।"

বিশ্ব কবির গান তখন ছাত্রদের মুখে মুখে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আলোচনা তুলতো।

[এই সময় ছাত্ররা আর একটি গান গাইতেন—
"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই।"]

কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ

১৯০৫-৬তে কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ রচিত গান গাইতেন ছাত্ররা—

"যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে, তোমার কাজে, বন্দেমাতরম
বলে ..."

"বেত মেরে কি মা ভোলাবি
আমরা কি মা সেই ছেলে ?
হবে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?"

নজরুল ইসলাম

১৯২১-২২ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ছাত্রাবাসে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাত্রদের কণ্ঠে কণ্ঠে তখন আবৃত্তি চলতো ছাত্ররা সমবেত কণ্ঠে নজরুলের গান গাইতেন—

"লাথি মার, ভাঙরে তালা,
যতসব বন্দিশালা,
আগুন জ্বালা ফেল উপড়ি।"

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৮ সালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। তখন তিনি ছাত্র ফেডারেশনেরও সক্রিয় কর্মী। তিনি কবিতা লিখলেন—

"জাপ পুষ্পকে
ঝরে ফুলঝুরি
জ্বলে ডঙ্গাও !
কমরেড আজ
বজ্র কঠিন
বন্ধুতা চাও ?
লাল নিশানের
নিচে উল্লাসী
মুক্তির ডাক!
রাইফেল আজ
শত্রুপাতের
সম্মান পাক।"

ছাত্ররা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সভা সমিতিতে দীপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন।১৯৪২ সালে ৮ই মার্চ ঢাকায় ছাত্র ফেডারেশনের পুরনো কর্মী সোমেন চন্দের হত্যার প্রতিবাদে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গান লিখলেন—

"বজ্র কণ্ঠে তোল আওয়াজ
রুখবো দস্যুদলকে আজ
দেবেনা জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।"

১৯৪২-এ কবি সুভাষ মুখো পাধ্যায় ২৫শে অক্টোবর জাপানী বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে আবার লিখলেন—

"এখানেও আজ তাই প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।
গড়ে তুলি দুর্জয় প্রাকার
সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুর
মুক্তির পদাঙ্ক রাখে।"

১৯৪৬ সালে গোয়ালিয়রের ছাত্রসমাজের উপর এবং কলকাতায় খিদিরপুরের ব্রেথওয়েট

কোম্পানীর শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় লিখলেন—

"রক্তের ধার রক্তে শুধ্‌বো, কসম ভাই,
ব্রেথওয়েট, গোয়ালিয়রের জবাব চাই।"

সুকান্ত ভটাচার্য

১৯৪৩-এ কবি সুকান্তের কবিতা ছাত্রদের মুখে মুখে আবৃত্তি হচ্ছে—

"চট্টগ্রাম! বীর চট্টগ্রাম
... তোমার সংকল্প স্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম
আমার হৃৎপিন্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।"

১৯৪৫-এর ডিসেম্বরের শেষদিকে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রচিত এবং পঠিত—

"জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে, রক্তের অক্ষরে।"

"বন্ধু আজকে বিদায়।
দেখেছো উঠলো— যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইলো,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো।"

[ছোড়দা (অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যে)-র অনুরোধে সুকান্ত এই কবিতা লিখেছিলেন। সুকান্তের কাব্যগ্রন্থে এই কবিতার নাম 'ঠিকানা'।]

১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে রশিদ আলী দিবসে ৫ দিনের সাধারণ ধর্মঘটে কলকাতা অচল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কলকাতার সংগ্রামী ছাত্রদের নিন্দা করলেন "গুন্ডা" বলে। এর প্রতিবাদে সুকান্ত কবিতা লিখে জবাব দিলেন, কবিতাটি প্রকাশিত হলো স্বাধীনতা পত্রিকায়—

"মুখে মৃদুহাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাইনা ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে উদ্ধত তবু মাথা
হাতে হাতে ফেরে দেনা পাওনার খাতা
শোনো হুংকার কোটি অবরুদ্ধের।"

"হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কতকাল?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল;

তুমি কোন দলে? জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
"গুন্ডার দলে আজো লেখাওনি নাম?"

১৯৪৬-এ ২৪শে জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বন্দিমুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত সভায় সুকান্তের রচিত ও পঠিত কবিতাংশ—

"ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়,
ওদের কাহিনি বিদেশী খুনে
গুলি বন্দুক বোমার আগুনে
আজও রোমাঞ্চকর।
ওদের স্মৃতিরা শিরায় শিরায়,
কে আছে আজকে ওদের ফিরায়,
কে ভাবে ওদের পর?

"হে খাতক, নির্বোধ,
রক্ত দিয়েই সব ঋণ কর শোধ।
শোনো দুনিয়ার মানুষেরা শোনো,
শোনো স্বদেশের ভাই,
রক্তের বিনিময় হয় হোক—
আমরা ওদের চাই।"

রাজবন্দিরা মুক্তি পেলে বন্দিদের অভিনন্দন জানিয়ে সুকান্ত রোগশয্যা থেকে লিখলেন—

"তোমরা এসেছো বিপ্লবী-বীর; অবাক অভ্যুদয়।
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।
তবু দ্যাখো আজ রক্তে রক্তে সাড়া
আমরা এসেছি উদ্দাম ভয় হারা!"

ছাত্র কবি দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে ১৯৪৬-এর ২১শে নভেম্বর ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ছাত্র সমাবেশে তখনকার তরুণ ছাত্রকবি দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী তাঁর লিখিত কবিতায় বললেন—

"এই তো সে দিন, বারো মাস আগে
সব ক্ষয়ক্ষতি ভুলে ছিলাম :
উদ্দাম বেগে দুর্দম ক্রোধে
বণিকের টুঁটি ধরেছিলাম
আর আজকে?

"ম্যানহোল-ভীত আমাদের চোখে
স্বপ্ন আনো,
তরুণ সূর্য, এখানে নামো।"

ছাত্র-কর্মী সলিল চৌধুরী

তখনকার ছাত্র কর্মী [বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী] সলিল চৌধুরী গান বাঁধলেন—

"রামেশ্বর শপথ তোমার
ভুলো না ধর্মতলা
কদম রসুল শপথ তোমার,
ভুলো না ধর্মতলা,
ভুলো না মিছিলে, রাজপথে পথে
পতাকা পতাকা মেলা।"

আরও অনেকে

ছাত্রকবি রাম বসু শহিদ তর্পণ করে যে কবিতা লিখেছিলেন, তার একটি কলি তখন ছাত্রদের মুখে মুখে—

"আমিও তোমার শবাধার এই কমরেড"

[এই কবিতাটি যে প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সরকার তাকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল]

ঔপন্যাসিক **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** ছাত্র আন্দোলনের কাহিনিগুলির ভিত্তিতে লিখেছিলেন এক স্মরণীয় উপন্যাস— "চিহ্ন"।

এক ছাত্র কবির-ই লেখা ছাত্রদের মুখে মুখে তখন উচ্চারিত হতো—

"A Song and a Verse
is a Bomb and Banner!"

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার মানুষকে বাঁচার জন্য সাহায্য সংগ্রহ অভিযানে বাংলার গণনাট্য শিল্পী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিত কণ্ঠে গাইতেন—

"শুনো হিন্দ্‌কে রহনেওয়ালো, শুনো-শুনো—
... ইয়ে হিন্দুস্থানকে পুর দুয়ারী বাংলাকো ইনসান...।"

বিনয় রায় 'জনযুদ্ধের গান'-এ গান বাঁধলেন, আর তাতে ছাত্ররা কণ্ঠ মেলালেন—

"হৌই হৌই হৌই
জাপান ঐ
আসো বুঝি,
হামার টারীত,
ব্যারাও গাঁয়ের
গেরিল্লা জুয়ান।"

পরিশিষ্ট - ৫

ষাটের দশকের কয়েকটি পোস্টারের ভাষা

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ভারতরক্ষা আইনে আটক রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগ্রামী ছাত্র ফেডারেশনের পোস্টারে লেখা থাকতো—

১। "যখনি প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ না শান্তি
আমাদের বেছে নিতে হয় নাকো ভ্রান্তি
আমরা জবাব দিই, শান্তি শান্তি।"

২। "যখনই জনতা চায় চাকরি ও খাদ্য
সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।"

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রাক্কালে নকশালবাড়িপন্থী 'বিপ্লবী' ছাত্রদের পোস্টারে লেখা হতো—

৩। "সাম্রাজ্যবাদের দুটি ফ্রন্ট
কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট।"

৪। "ভোট ভোট করে কারা
সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা।"

ছড়া

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় কমিউনিস্টদের বিদ্রুপ করে কংগ্রেস এবং জনসংঘের ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে ছাত্র পরিষদ এবং বিদ্যার্থী পরিষদ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রমথনাথ বিশীর ছড়াকে উদ্ধৃত করে পোস্টার লিখতো—

১। "হরে কৃষ্ণ কোঁয়ার
লাল ঘোড়েকা সওয়ার
বঙ্গ দেশে রঙ্গ কেন
খোলা চীনের খোঁয়াড়।"

২। "রণদিভে, রণদিভে
আর কত হে রণ দিবে।"

[১ থেকে ৪ পোস্টারের উদ্ধৃতিগুলি শৈবাল মিত্রের 'ষাটের ছাত্র আন্দোলন' পুস্তক থেকে সংগৃহীত। ছড়ার ১-২ উদ্ধৃতি দুটি 'সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার' পুস্তিকায় শ্যামল চক্রবর্তী লিখিত 'কীভাবে ছাত্র আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হল' নিবন্ধ থেকে সংগৃহীত।]

তথ্যসূত্র

১। Student Movement in India by Prabodh Chandra, M.A., Published by 'All India Students Federation', Lahore (1938).

২। ষাট দশকের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন : ঘটনা পর্যালোচনা দলিল সংকলন। ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ); প্রথম প্রকাশ— ডিসেম্বর '৮৬; প্রকাশক; রাজ্য কমিটি, ডি এস সি (পঃবঙ্গ)-র পক্ষে কমরেড শ্যামল মজুমদার।

৩। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা— নন্দ বসু; দৈনিক বসুমতী, ২৮শে আগস্ট, ১৯৮৩, রবিবারের সাময়িকী।

৪। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ; ১৯৮০, গৌতম চট্টোপাধ্যায়; চারুপ্রকাশ। কলকাতা।

৫। Andhra Pradesh Radical Students Union: Manifesto and Constitution.

৬। প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কর্মসূচি (PDSF), গঠনতন্ত্র (খসড়া)।

৭। বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি : সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৩); অমিতাভ চন্দ্র।

৮। জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের পথে : ছাত্র ঐক্য; সুনীল সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। প্রকাশের সময় ১৫.১.৫৮। প্রকাশক সুধীর চক্রবর্তী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ১৮৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২।

৯। সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। প্রথম প্রকাশ— ১লা অক্টোবর ১৯৮৬।

১০। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন ও রজত জয়ন্তী উৎসব। সম্পাদক-মন্ডলীর রিপোর্ট, ২৮-২৯-৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪। শ্রী পল্টু দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

১১। ষাটের ছাত্র আন্দোলন : শৈবাল মিত্র। প্রকাশক প্রতাপকুমার রায়। আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, বইমেলা ১৯৯০।

১২। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিতাই দাস।
প্রকাশক-রঞ্জন কর্মকার, নয়া পল্টন, ঢাকা।

১৩। পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট; বদরুদ্দীন উমর। প্রথম প্রকাশ ১০ই জুন ১৯৭১; প্রকাশক- মজহারুল ইসলাম, ৬, এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

১৪। দেশ; ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় "শহীদ মিনারের ইতিকথা"— এম আর আখতার মুকুল [বিদেশের চিঠি] পৃ.-৩৯।

১৫। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস; প্রথম খণ্ড-১৮৩০-১৯৫২। মোহম্মদ হান্নান। দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ২৫ অগ্রহায়ন, ৯৩, ১২ই ডিসেম্বর, ৮৬। প্রকাশক-বিমল সরকার, গ্রন্থলোক; ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

১৬। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৫৩-১৯৬০। মোহাম্মদ হান্নান। ওয়াসী প্রকাশনী, ঢাকা।

১৭। বদরুদ্দীন উমর : পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি। প্রথম খণ্ড, মন্ডল ব্রাদার্স, ঢাকা। দ্বিতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। তৃতীয় খণ্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম, ঢাকা।

১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা। যশোর খুলনা যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ— নভেম্বর, ১৯৮৯। প্রাপ্তিস্থান : মণীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ, ৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা - ৭০০০৭৩।

১৯। Telengana People's Struggle And its Lessons. P. Sundarayya, December 1972; Publisher Desraj Chandra, on behalf of the Communist Party of India (Marxist), 49, Lake place, Cal-29.

২০। SL. 95/185. PB-105(MR) Modern Readers; Long March, Short Spring, The Student uprising at Honie and Aborad--Barbara and John Ehrenrich : First Modern Reader, Peperbak Edition 1969; Second printing New York and London.

২১। French Revolution 1968—Patirick Seale and Moureen Mcconvillee; Pengnin Books.

২২। Pelican Original; Reflections on the Revolution in France; 1968; Edited by Charles Posner.

২৩। Student Unrest: A Socio-psychological Study; S.N.Sarkar, MA. Dip in Ed.phd, Reader in psychology, University of Ranchi; sponsored by Universities.

২৪। অনুষ্টুপ; সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক; অষ্টাদশবর্ষ; ২য় সংখ্যা, ১৩৯০। রণবীর সমাদ্দার-এর নিবন্ধ।

২৫। অনুষ্টুপ; বিংশতী বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৫; পরমেশ আচার্য-এর নিবন্ধ।

২৬। অনুষ্টুপ; একবিংশতী বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৮৭; দীপঙ্কর রায়চৌধুরীর নিবন্ধ।

২৭। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রভাব—নির্মল সেনগুপ্ত; নিশান প্রকাশনী প্রযত্নে 'কুইন প্রেস', ৩৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯।

২৮। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সপ্তদশ সম্মেলন : শিক্ষা সম্পর্কে কার্যনির্বাহক কমিটির খসড়া প্রস্তাব।

২৯। Political Awakening in Hyderabad : Role of Youth And Students— S M.Jawad Razvi; First Edition, December 1985; Visalandra Publishing House, Vignana Bhavan, 4-1-435, Bank Street, Hyderabad-1.

৩০। দেশ; ৫ মাঘ ১৩৯৭, ১৯ জানুয়ারি ১৯৯১, ৫৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা; বাবুদের মার্কসবাদ—শংকর ঘোষ, পৃষ্ঠা, ২৯।

৩১। গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন : মানুষের সৃজনশীল উত্থান প্রসঙ্গে; নুরুল কবির। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, 'নদী' কর্তৃক ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। স্বত্ব; ফৌজিয়া সুলতানা। কম্পিউটার প্রকাশন; আমিরুল ইসলাম, ম্যাসিভ কম্পিউটার সিস্টেমস, ঢাকা। মূল্য ৭৫ টাকা।

৩২। নিশান : ছাত্র সংগ্রামের মুখপত্র, দশবৎসর পূর্তি (১৯৭৯-৮৯) বিশেষ সংখ্যা।

৩৩। Progressive Democratic Students Union (PDSU). Andhra Pradesh; পুস্তিকা।

৩৪। বিপ্লবী যুব-ছাত্র আন্দোলনের খসড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি (পরিমার্জিত ও সংশোধিত); বুক ক্লাব, ১৮৮/২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

৩৫। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ও দাবিগত কর্মসূচি সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা; একটি প্রচার পত্র।

৩৬। DSCC-র পক্ষ থেকে কনভেনশনে উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাব। এটি একটি হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইলড্ খসড়া।

৩৭। ছাত্র-ঐক্য; ২৯শে মার্চ ১৯৮৩।

৩৮। ছাত্র-ঐক্য; ১৫ই জানুয়ারি ১৯৮৫ সংখ্যা।

৩৯। ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (ISA), কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র, ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন; [All Bengal Students Association (ABSA)-এর পুস্তিকা।]

৪০। S.A. সমূহের কর্মসূচি।

৪১। মেডিক্যাল ছাত্রদের বর্তমান সংকট— একটি পর্যালোচনা; By Convening Body of Medical Students Forum.

৪২। To The Student Comrades of the Propaganda : Squads Launching The "Go to Villages" Campaign; একটি প্রচার পুস্তিকা।

৪৩। AISA : A Student organisation of IPF: It's First National Conference was held on 9-11 August '90 at Allahabad University Union Hall; একটি ছাপান Folder.

৪৪। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন [PSO]-র 'সমকালীন অভিব্যক্তি' শীর্ষক হিন্দি বুলেটিন এবং পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

৪৫। গণশক্তি; ২২শে ফেব্রুয়ারি বুধবার ১৮৮৯।

৪৬। আনন্দবাজার পত্রিকা; ২রা জুন শুক্রবার ১৯৮৯।

৪৭। The Statesman Miscellany; May 12, 1991.

৪৮। কালান্তর; ১১ নভেম্বর সোমবার ১৯৯১।

৪৯। আনন্দবাজার পত্রিকা; ২৯শে আগস্ট ১৯৯১।

৫০। ছাত্র সংগ্রাম; ৫ম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ১লা অক্টোবর ১৯৭০।

৫১। Spontaneous Revolution, The Quit India Movement— Frances Hutchens

৫২। A week with Gandhiji— Lui Fisher

৫৩। Selected Speeches of Subash Chandra Bose, New Delhi. 1955, P. 218

৫৪। Transfer of Power. Ed. by Uansergh & Lumby Vol-3. 6.

৫৫। Homepolitical Development Reports Files (National Archives). New delhi

৫৬। Congress Working Committee Report—Vol. 76, 77.

৫৭। Indipendent Struggle of India— Bipon Chandra

৫৮। Extremist Challenge— N. K. Surjha - C. U.

৫৯। The R. I. N. A. Strike— Subrata Bondopadhyaya— 1954

সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ—

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

গীতা মুখোপাধ্যায়

সুশীল সেন—শান্তিনিকেতন। নিষিদ্ধ 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিক (১৯৪৮ — ১৯৫২)

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

নন্দ বসু

সাধন গুপ্ত।

জেলান্তর থেকে, রাজ্য ও সর্বভারতীয় পর্যায়ের গৃহীত প্রস্তাব ও রিপোর্ট—১৯৩৬ এর পর থেকে।

নির্ঘন্ট

আ

ই

ঈ

ক

ঝ

ট

ড

ঢ

ন

প

ভ

হ